জ্যৈষ্ঠ ১৩২৫

৬৭-৭৪ পৃ. নাই

মাসিক পত্র ও সমালোচন।

শ্রীদেবীপ্রসন্ন রায়চৌধুরী সম্পাদিত।

৩৬শ খণ্ড

ষট্‌ত্রিংশ খণ্ড—১৩২৫

কলিকাতা

৩ এ রাধাপ্রসাদ লেন, "মণিকা প্রেসে"

শ্রীহরিচরণ দে দ্বারা মুদ্রিত ও

২১০।৪ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট নব্যভারত-কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত।

মূল্য ৩৲ তিন টাকা।

ষট্‌ত্রিংশ খণ্ড

নব্যভারত

ষট্‌ত্রিংশ খণ্ড, ১৩২৫।

নিত্যযোগ।

প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি, সংসার ও কৈবল্য, এবং মিথ্যা ও সত্যের সংগ্রামে নব্যভারতের জীবনের সুদীর্ঘকাল কাটিয়া গিয়াছে; ফলাফল বিধাতার হাতে, আমরা তাঁহারই প্রেরণায় শুধু খাটিয়া খাটিয়া শ্রান্ত ও অবসন্ন হইয়া এখন মৃত্যুর অন্বেষণে ছুটিতেছি। সে মৃত্যু কোথায়, কত দিন পর আসিবে, কে জানে?

নব্যভারত আমাদের আশার স্বপ্ন, উন্নতির সোপান, বাল্যের সহায়, প্রৌঢ়ের চিন্তা এবং বার্দ্ধক্যের আশ্রয়। নব্যভারতই পরিবার পরিজন, নব্যভারতই কাম্য এবং কামনা, নব্যভারতই সাধ্য এবং সাধনা, নব্যভারতই কৈবল্য এবং স্বর্গ। আমরা ছিলাম নব্যভারতের জন্য, আছি নব্যভারতের জন্য, এবং বিধাতার ইচ্ছা হইলে, আরো থাকিব ও নব্যভারতের জন্য। নব্যভারত আমাদের বাহুর শক্তি, হৃদয়ের ভক্তি, ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ সকলই। নব্যভারতের জন্য আমরা সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছি, নব্যভারতের জন্য শ্রান্ত এবং ক্লান্ত হইয়াছি, নব্যভারতের জন্য মান সম্ভ্রম ডুবাইয়া পথের কাঙ্গাল সাজিয়াছি, নব্যভারতের জন্য শত্রুদ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়াছি, নব্যভারতের জন্য শত শত গ্লানি ও নিন্দা অঙ্গের ভূষণ করিয়াছি। সোণার নব্যভারত আমাদের গতি মুক্তি সহায় সম্বল—সকলই। নব্যভারত জাগিলে আমরা জাগিব, নব্যভারত বাঁচিলে আমরা বাঁচিব, নব্যভারতের উন্নতি হইলে আমাদের উন্নতি হইবে, নব্যভারতের অবনতি হইলে আমাদের অবনতি হইবে। দেশাত্ম বোধ লইয়াই জীবনের আরম্ভ, উহা লইয়াই স্থিতি, উহার ক্রোড়েই মৃত্যু। নব্যভারতই সাধনা, নব্যভারতই কৈবল্য, নব্যভারতই সিদ্ধি।

যুগ যুগান্তর ধরিয়া নব্যভারত শুধু সংগ্রামের ভিতর দিয়াই চলিয়াছেন। যিনি ইহার নিয়ন্তা, তিনি ইহার ললাটে যে বিজয়ের তিলক অঙ্কিত করিয়া দিয়াছেন, তাহার গৌরবে, সকল সংগ্রামকে পরাস্ত করিয়া এখন স্বাধীন চিন্তা, স্বাধীন কামনা, স্বাধীন সাধনার পথে উপনীত হইয়াছেন। সকল সংগ্রাম যেন দিন দিন পরাস্ত হইয়া আসিতেছে।

আজ নববর্ষে বন্দেমাতরম মন্ত্রের ঋষি-

কেই স্মরণ হইতেছে; আজ তাঁহার দৈবী শক্তির উদ্দেশে কোটী কোটী প্রণাম। তিনি যে লোকেই থাকুন, নব্যভারতের উন্নতিতে তাঁহার পরম আনন্দ। জয়, জয়, বঙ্কিমচন্দ্রের জয়।

বঙ্কিমচন্দ্র যখন বঙ্গদর্শনে বিষবৃক্ষ লেখেন, আমরা তখন "শরচ্চন্দ্রের" সাধনায় তৎপর। বিধাতার নিকট প্রার্থনা করিতাম, "পিতা, অসাধারণ প্রতিভার খনি বঙ্কিমচন্দ্রের মতি গতি দেশের মঙ্গলের দিকে ফিরাইয়া দেও।" বাস্তে আমাদের প্রার্থনার ফল ফলিয়াছিল, দেশাত্মবোধই যে ধর্ম্ম, এই কথা প্রচার করিতে শেষে তিনি প্রবৃত্ত হইলেন। ধন্য তাঁহার জীবন, সার্থক তাঁহার সাধনা। আজ নববর্ষে তাঁহার উদ্দেশে কোটী কোটী প্রণাম।

আমরা যৌবন হইতে এই বার্দ্ধক্য পর্য্যন্ত কীর্ত্তন করিয়াছি, সাহিত্যই দেশোন্নতির মূল সোপান। যদিও আজ এদেশের শত শত পুস্তক বাজেয়াপ্ত হইয়াছে, তবু বাঙ্গালা ভাষা বাঁচিয়া আছে বলিয়াই নব্যভারত যে বাঁচিয়া আছে, এ কথা লিখিতে আমাদের কোন সঙ্কোচ নাই। এমন মধুর ভাষা, প্রাণস্পর্শী গাথা আর কোন দেশে আছে কি না, জানি না। জয়দেব, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, গোবিন্দদাস, রামমোহন, কেরী, মার্সম্যান, অক্ষয়কুমার, বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র ও বাঙ্গালা ভাষার পরম সহায় গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের সাধনা আজ সফল,—আজ বাঙ্গালা ভাষা জাগতিক ভাষার রাজ্যে আসন পাইবার যোগ্য হইয়াছেন। আজ উপরোক্ত মহাজনবর্গকে ভক্তির সহিত প্রণাম করিতেছি। মুদ্রাযন্ত্রের উপর দিয়া কঠোর সংগ্রাম চলিয়া যাইতেছে বটে, তবু যে বাঙ্গালা ভাষা আজও বাঁচিয়া আছেন, সে কেবল ঐ সকল মহাজনবর্গেরই পুণ্যের ফলে। দুঃখী, বিপন্ন, নিরন্ন, পরিত্যক্ত, পরিশ্রান্ত, হত-মান, হত-জ্ঞান, হতশ্রী যে সকল সাধকের অক্ষয় সাধনার ফলে এই ভাষা জীবিত, আজ তাঁহাদিগকেও প্রণাম করিতেছি। তাঁহাদের জয়-জয়কারে দেশ পরিপূরিত হউক।

তাঁহারা বড় ভুল বুঝিতেছেন। দেশের কর্ণধার কে? অসিধারী, না মসিধারী? অসিধারীর তেজে জগৎ কম্পিত, না মসিধারীর পুণ্যে দেশ সম্মোহিত? পরামর্শদাতা কে? ধনসম্পদের পূজা করিয়া করিয়া তাঁহারা বড় ভুল করিতেছেন। অসিধারীর সম্মান বাড়াইয়া ও মসিধারীর নিষ্পেষণ করিয়া তাঁহারা বড় ভুল করিতেছেন! কি মহা-ভুল!! এমন করিয়া কে কবে ইতিহাস ভুলিয়াছে গো?

ভুলের মধ্যেই অত্যাচার ও নিষ্পেষণ পুঞ্জীকৃত। তাহা না হইলে দেশাত্মবোধ জাগে না। তাই ত দিনের পর দিন নানা অত্যাচার আসিতেছে। আসিতেছে, আসিতে দেও। নিষ্পেষণের ভিতর দিয়া দেশ নবজীবন লাভ করুক, বন্দেমাতরম মন্ত্র সার্থক হউক।

কামিনীকাঞ্চন বর্জ্জন করিতে যে ঋষিরা এ দেশে আদেশ করিলেন, তাঁহারা বহু দিন এ দেশে অনাদৃত থাকিবেন না। নব-সাধনায়, সংযমের ভিতর দিয়া নবশক্তির উত্থান হইবে। প্রবৃত্তি-অসুরকুলের বিনাশ না হইলে নিবৃত্তি-বীর লক্ষ্মণ এ দেশে জাগিবেন না। নিবৃত্তি-মার্গের সাধনা ভিন্ন এ দেশের জাগরণের সম্ভাবনা নাই। আনন্দ-মঠের নব সন্ন্যাসীগণের উত্থান দেখিতেছ কি? দেহাত্মবোধের স্থলে পরার্থবোধ জাগিতেছে না কি? দেখ, দেখ, দেখ—নব্য-ভারত কি স্বপ্নে কিরূপ হইয়া যাইতেছে,

চক্ষু মেলিয়া চাহিয়া দেখ। পরার্থবোধের সঙ্গে সঙ্গে এদেশে সংযমপূত দেশাত্মবোধ জাগিয়া উঠিতেছে। ভয় কি, ভাবনা কিসের? দেশাত্মবোধের সঙ্গে সঙ্গে এদেশে একতা অবতরণ করিবে। একতার পর কি আসিবে? বন্দেমাতরম-মন্ত্রের ঋষি তাহাও কীর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন। নর-নারায়ণ মন্ত্রের ঋষির আদেশে যে দল গঠিত হইতেছে, সেই নিষ্কাম-যোগী দলের ললাটে তাহা অঙ্কিত, ঐ দেখ, ঐ দেখ।

আমরা অত্যাচারিত? তাত ভালই। আগুনে না পুড়িলে ধাতু বিশুদ্ধ হয় কি? জীবন যজ্ঞে জীবন চাই। আমরা মৃত্যুর দ্বারে উপস্থিত হইয়াছি বলিয়া, শত্রু, তোমার হৃদয়ে আনন্দ আর ধরে না? তাহা ত ভালই; যাইতেছি, চলিয়াছি, আর চিন্তা করিও না। মহাজনেরা বলেন, সৎকথা এ জগতে কখনও বিনষ্ট হয় না। মসির অঙ্কনে যে সৎকথা বহিয়া যাইতেছে, তাহার বেগ, ভাই, তুমি সম্বরণ কর। অত্যাচারকেই আমরা অঙ্গের ভূষণ করিয়াছি, নিষ্পেষণ-কেই জীবনের সম্বল করিয়াছি। আসুক, আসুক—দিন দিন আরো অত্যাচার ও নিষ্পেষণ আসুক। আমরা সে জন্য চিন্তিত, বা কাতর নহি। তাহাই নব্য-ভারতের নিত্যযোগ। প্রবৃত্তির পথেই নিবৃত্তি, নিবৃত্তির ধারেই প্রবৃত্তি। সংসারের মধ্যেই কৈবল্য, কৈবল্যের ধারেই সংসার। অথবা মিথ্যা অন্ধকার, সত্য-আলোকের সোপান। এই যোগ-পথ ধরিয়া নব্যভারতে একতা অব-তরণ করিবে। বন্ধু, তুমি নিরাশ হইও না; নিশ্চয় একতা এদেশে আসিবে; হিন্দু মুসলমান আবার এক হইবে। মহা সাধনা, মহা সিদ্ধি অবতরণ করিবে। ভয় কি, বন্ধু, নিষ্কাম স্বদেশ-সেবারূপ নিত্যযোগে নির্ভয়ে আত্মসমর্পণ কর। তাহা হইলে আপনিও সুরক্ষিত হইবে এবং দেশও সুরক্ষিত রহিবে। বল, জয়, নব্যভারতের মহা সাধনার জয়। বল, নিত্যসেবা যোগের জয়।

অথ রাজাদ্যানয়নম্।

কালপুরুষে হুকুম দিচ্ছে—বাজা বাদ্যি বাজা,
অভিষিক্ত হবেন এবার জগজ্জয়ী রাজা!
স্তূপে স্তূপে অস্থি দিয়ে পাহাড় খাড়া কর,
অতলস্ত প্রশান্ত দুই সাগর তটের পর!
কোটি কোটি নরচর্ম্মে—সদ্য রক্তে রাঙ্গা—
আকাশ ঢাকা চর্ম্মাতপ তার মাথায় মাথায় টাঙ্গা!
চারি পাশে গেঁথে দে তার থরের উপর থর,
নরকরতলের সারি ঝালর ভয়ঙ্কর!
বাঘ ভালুকের পিঠের উপর সাজা সিংহাসন,
রক্তপানে মত্ত যে সব হিংস্র পশুগণ!
গাদি গাদি মাংস দিয়ে পাতিয়ে দে গদি,
বেলজিয়ম আর সাইবিরিয়ার সাগর সীমাবধি!

বিরাট আসন বিরাট শাসন বিরাট দণ্ডধর,
অভিষেকে লাগবে তাহার শোণিত সাত সাগর!
তুবড়ি জ্বল্‌বে বিস্ববিয়স হাউই জ্বালা বোম্‌,
উল্‌কা ছুটবে ফুল্‌কা তাহার কোটি সূর্য্য সোম!
তরুবল্লী নগরপল্লী প্রাসাদ কুঁড়ে ঘর,
ভেঙ্গে চুরে গিরি মেরু সকল সমান কর!
মঠ মন্দির গির্জ্জা মজিদ স্কুল্‌ কলেজ পাঠশালা,
পাপের আলয় বিচারালয় দেশটা শুদ্ধ আলা!
ছেয়ে আছে ধুলা বালু—বুকের ভিতর শ্বাস,
পাপের বীজ পাপের আরম্ পাপের ব্যাসিলাস!
বংশ সহিত বিনাশ কর্ পাপ অংশ যে না রয়,
ধ্বংস পথে আস্‌বে এবার নূতন অভ্যুদয়!
মজ্জা মেদে রক্ত ক্লেদে অবিচ্ছেদে মাখা,
চিহ্ন এঁকে আস্‌বে রেখে তারি রথের চাকা!

২

ক্যামস্কাট্‌কা—তোপাট্‌কা আর মেজাভিভষ্টক্‌,
শবের বুকে শড়ক বাঁধা জেলের সীমা তক!
আল্পসে আর ইউরেলে হবে সিংহদ্বার,
আলটাইয়ে আর হ্বানোভাইয়ে পুবের ফটক তার!
ঝুলায়ে সে মুণ্ডমালা তোরণ শিরে শিরে,
শূন্য হতে পুণ্য ঝরবে রুধিরে রুধিরে!
উড়বে শকুন লাখে লাখে ছড়ায়ে দিয়ে পাখা,
সারা জগৎ ফেলবে ছেয়ে তারি জয় পতাকা!
মহানন্দে কবন্ধ আর প্রেত্‌ পিশাচীর দল,
রক্ত পিয়া তাধেই ধিয়া নাচ্‌বে সুখে 'বল্'!
মাংস খেয়ে তুষ্ট হয়ে শিয়াল কুকুর কাক,
বিশ্বে সাড়া দিবে তারা যমের কাড়া ঢাক!
রক্তমাখা প্রবাল ঢাকা বসার পালিশ মাজা,
এই পথেই আস্‌বে এবার জগজ্জয়ী রাজা!

৩

শোকের আগুন দগ্ধ করে মনের ময়লা পাপ
অত্যাচারের ঝড়ে জুড়ায় প্রাণের পরিতাপ!
গলায় দড়ী কলসী ডোবে কূপের অতল তলে,
নইলে তাহা পূর্ণ হয় না সুধা-শীতল জলে!
পতন-ই যতনের খনি রতন ভরা তার,
পদাঘাতে ডুব্‌লে তাতে মানুষ তাহা পায়!
রসাতলে সিঁড়ির গোড়া স্বর্গে তাহার আগা,
চক্ষু মেলে হাত বাড়ালে পাওয়া যায় তা লাগা!
হৃদয় করে ছিন্ন ভিন্ন লাঙ্গল চষে' পেষে',
শান্তি সুখের বীজ বোনে সে সকল দেশে দেশে!
অশ্রুজলে উপ্ত হয় সে লুপ্ত নাহি থাকে,
আপনা জোরে ঠেলে তোলে আপ্‌নি আপনাকে!
পীড়নে তার নিড়ানি দেয় বেছে ফেলায় কত,
আচ্‌ড়াতে আগাছড়া মারে সংখ্যা নাহি তত!
হাড়ের গুড়া বিনা পুষ্ট ফসল হয় না তার,
জীবন শক্তি কর্ম্মশক্তি সব্‌ শুকায়ে যায়!
তাই সে পেষণ তাই সে শাসন তাই সে মরণ ক্ষয়,
কচ্ছে বহন বজ্রদহন সে অসহন জয়!
ধ্বজা রথে শতে শতে হেলির ধূমকেতু,
দৃশ্য হয় সে বিশ্বময় আজ পাপের বিনাশ হেতু!
উদাস্ত নৈরাশ্য দাস্ত কাপৌরুষ্য ভয়,
ভীষণ বলে রথের তলে সকল চূর্ণ হয়!
রক্তকুম্ভ 'লেডোগা' 'ভেন' যাত্রাকলস সাজা,
অভিষিক্ত হবেন এবার জগজ্জয়ী রাজা!

শ্রীগোবিন্দচন্দ্র দাস।

সতী বিনোদিনী গঙ্গোপাধ্যায়।

জন্ম—৮ই অগ্রহায়ণ, উলা, ১২৭৪ সাল।
মৃত্যু—৩রা বৈশাখ, মঙ্গলবার অপরাহ্ণ ৩॥০ ঘটিকা, ১৩২৫।

(১)

লোকে বলে, আকাশের তারা ও পাতালের বালি গণনা করা যায় না। আমরা বলি, সাধুতা ও সদ্ভাবও কেহ কখনও ব্যাখ্যা করিতে পারে নাই। পৃথিবীর ইতিহাসবেত্তারা নরনারীর সংখ্যা করিতে পারিয়াছেন, কিন্তু নরনারীর হৃদয়ে যে কত প্রকার মহত্ত্ব বাস করে, তাহার প্রকৃত ব্যাখ্যা করিতে পারেন নাই। কিন্তু তবু ধর্ম্ম, চরিত্র—পুণ্য ও পবিত্রতার কাহিনী এ জগতে কীর্ত্তিত হইয়াছে। নরনারীতে নারায়ণরূপ যখন প্রকটিত হয়, তখন মানুষ ভয়ে বা বিস্ময়ে কোটী কোটী বার প্রণাম করেন। নারায়ণী-শক্তিতে যখন নারী অনুরঞ্জিতা, তখন মানুষ—"যা দেবী সর্ব্বভূতেষু মাতৃরূপেণ সংস্থিতা, নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমঃ নমঃ" বলিয়া প্রণাম করিয়া কৃতার্থ হন। কিন্তু সে দৈবী-শক্তি-সম্ভূতাদের সম্যক ব্যাখ্যা এ জগতে হয় নাই।

(২)

পুরুষের সাধুতার বরং ব্যাখ্যা করা সম্ভব, কিন্তু নারীর সাধুতার ব্যাখ্যা হয় নাই। ঈশা মুসা, নানক কবীর, বুদ্ধ মহম্মদ, চৈতন্য কনফিউসদিগের সাধুতার ব্যাখ্যা পাঠ করা গিয়াছে বটে, কিন্তু মেরী বা মণিকা, গোপা বা খাজিদা, শচী বা বিষ্ণুপ্রিয়া, সীতা, দময়ন্তী বা সাবিত্রীর সাধুতা এবং সহিষ্ণুতার এ জগতে সম্যক ব্যাখ্যা হয় নাই। তাহার কারণ, নারী নীরবে আসেন, নীরবেই প্রস্থান করেন। নীরবতা সাধন করিতেই তাঁহাদের যেন আগমন। সহগুণই মাতৃত্বের চরম নিদর্শন। কখনও কখনও ক্ষমতাশালী পুরুষেরা কিছু কিছু তাঁহাদের গুণ ব্যাখ্যা করিয়াছেন বটে, কিন্তু সম্যক বর্ণনা কুত্রাপি হয় নাই। মাতৃমূর্ত্তি দেখিয়াছি, দেখিয়া সম্মোহিত হইয়াছি; কিন্তু অতল সাগরের ন্যায় তাঁহাদের যে গভীর হৃদয়, তাহার অনুধাবন করিতে পারি নাই। বরং সময়ে সময়ে মনে হইয়াছে, কি দেখিলাম, কি দেখিলাম!! মাতৃমূর্ত্তির ব্যাখ্যা কেহ কি কখনও করিতে পারিয়াছে? তাহা চির অসম্ভব, চির-প্রহেলিকাবৎ।

(৩)

সাগরের উর্ম্মিমালা, কুসুমের সৌন্দর্য্য ও সৌরভ, পাখীর কলকণ্ঠধ্বনি এবং ঝরণার মাধুর্য্যের বর্ণনা কবি-লেখায় পাঠ করিয়াছিলাম। পাঠ করিয়া এক সময়ে মোহিতও হইয়াছিলাম, কিন্তু যখন ঐ সকলের সংস্পর্শে আসিলাম, তখন কবির অক্ষমতা স্মরণে নয়নে জলধারা বহিয়াছিল। মাতাদের কথা কত রূপে কত কাব্যে পাঠ করিয়াছিলাম, কিন্তু সতীমাতার সংস্পর্শে যখন আসিলাম, নয়নে সেই যে জলধারা বহিল, তাহা আর ফুরায় না। বুঝিলাম, কোন কাব্যেই তাহার স্বরূপের সম্যক বর্ণনা হয় নাই। অমিয়মাখা মাতৃমূর্ত্তি কি শক্তি, কে তাহা বলিতে পারে?

(৪)

ঘরে ঘরেই মাতৃমূর্ত্তি প্রকটিত, কিন্তু ঘরে ঘরেই অবহেলা ও অবমাননা! মাতার আদর যে দিন জগতে সম্যকরূপে হইবে, জগৎ বুঝি বা সে দিন স্বর্গে পরিণত হইবে। সে দিন আসুরবিজয়িনী শক্তিতে ধরা টলমল করিবে।

(৫)

উজ্জ্বল উলার মুকুর্য্যে বংশের একটী মেয়ে কালনার আরো উজ্জ্বল গাঙ্গুলীকুলে সম্মিলিতা। তিনি নীরবে চলিতে, নীরবে থাকিতে ভালবাসিতেন। আমি তাহার মধ্যে সতী মাতৃমূর্ত্তির বিকাশ দেখিয়াছিলাম। প্রথম বয়সে তিনি কিছু স্বেচ্ছাপ্রণোদিতা ছিলেন বটে, তাঁহার মধ্যে কিছু কিছু সংসার-বিমুখতার পরিচয় পাওয়া যাইত বটে, কিন্তু কমলকামিনীর সংস্পর্শের পর, সে মেয়ে যেন কেমন হইয়া গেল, যেন আর এক রূপ ধারণ করিল। স্বেচ্ছা, সংসার-বিমুখতা খিতাইয়া সোণার প্রেম-মূর্ত্তি ফুটিয়া বাহির হইল। একটী হলেন কায়া, আর একটী হলেন যেন ছায়া। ভাবে ভাবের মিলন, প্রেমে প্রেমের নিমজ্জন। কি হইতে কি যেন হইয়া গেল। সে মেয়েকে পূর্ব্বে যাহারা দেখিয়াছিলেন, কমলকামিনীর সংস্পর্শের পর আর সে মেয়েকে তাঁহারা দেখিতে পান নাই। শেষের মূর্ত্তি যেন পৃথক মূর্ত্তি। মৃণ্ময়ের এক পরিবর্ত্তিত চিন্ময় মূর্ত্তি যেন ফুটিয়া বাহির হইয়াছিল। তাহা ত্রিদিবধামের এক অহেতুকী ভাবমূর্ত্তি—সে এক অপরূপ মাতৃমূর্ত্তি। কিন্তু সে মূর্ত্তি ব্যাখ্যাত হওয়ার নয়।

(৬)

সুধাংশুর যখন জন্ম হয় নাই—কুলবধূর তখন এক মূর্ত্তি; আর সুধাংশুর জন্মের পর সতীমাতার আর এক মূর্ত্তি। ইতিমধ্যে সাধ্বী কমলকামিনীর সংস্পর্শ লাভ হইয়াছে। তিনি আনন্দ-আশ্রমকে তাহার পিতৃভূমি বা মাতৃভূমির ন্যায় মনে করিতেন। সেখানে যাইতে ও থাকিতে বড়ই ভালবাসিতেন। সেখানে নির্ভয়ে চলিতেন, নির্ভয়ে সেবা করিতেন, নির্ভয়ে মধুর স্বরে মায়ের নামকীর্ত্তন করিতেন। সে সঙ্গীত যে শুনিত, সে-ই মোহিত হইয়া যাইত। কথা বেশী বলিতেন না, কোন্ কুলবধূই বা বেশী কথা বলিয়া থাকে? কিন্তু সকলকে ভালবাসিবার সময় তিনি আত্মহারা হইয়া যাইতেন। কর্কশ স্বভাব তখন মাধুর্য্যে পূর্ণ হইয়াছে—মধুরে মধুরতা মিশিয়াছে। সে যেন এক স্বর্গের ছবি। আমি দেখিয়া দেখিয়া আত্মহারা হইয়া যাইতাম।

(৭)

মাকে দারুণ ব্যাধি বাল্যেই আক্রমণ করিয়াছিল। বিনোদিনীর জীবনের ইতিহাস, সে যেন মরণেরই ইতিহাস। সহিষ্ণুতার পরীক্ষার জন্যই যেন সে জীবন গঠিত হইয়াছিল, এত রোগের সেবা এ জগতে কেহ করিয়াছে কি না, জানি না। রোগের সেবার জন্যই যেন তিনি আসিয়াছিলেন। দেখিলাম—সহিষ্ণুতার এক অক্ষয় মূর্ত্তি,—আর আমার ভাই আসিয়াছিলেন যেন রোগীর শুশ্রূষার জন্য; সেখানেও সহিষ্ণুতার সুন্দর চিত্র। দুটীই জীবনের আদর্শ—যেন সহিষ্ণুতাময় মাতৃমূর্ত্তি এবং পিতৃমূর্ত্তি। সহিষ্ণুতার প্রকট মূর্ত্তি দেখাইয়া মোহিত করিবার জন্যই যেন বিধাতা নরদেহে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। ধন্য তিনি, ধন্য তাঁহার মাতৃ ও পিতৃভাব।

(৮)

আমি যাহা দেখিয়াছি, তাহা আজ শ্রাদ্ধের দিন বিবৃত করিয়া ধন্য হইলাম। আর তাঁহার মধ্যে যাঁহারা যাহা দেখিয়াছেন, ব্যাখ্যা করুন। আমার বিশ্বাস, বিনোদিনী-চরিত্র,কমলকামিনীর চরিত্রের ন্যায় দুরবগাহ, তাহা আদর্শ সতীর কমনীয় মূর্ত্তি, তাহা সম্যকরূপে কিছুতেই ব্যাখ্যাত হইবার নয়। নীরবে আগমন, নীরবেই রোগ যন্ত্রণা সহিতে সহিতে তিরোধান হইল। প্রস্ফুটিত কুসুম যেন অসময়ে ঝরিয়া পড়িল। মা পাতিব্রত্য-সিংহাসনে উপবেশন করিয়া যখন সতী মূর্ত্তি ধারণ করিলেন, তখন স্বর্গ হইতে যেন কত আশীর্ব্বাদ পুষ্প বর্ষিত হইল। শ্বশ্রূ-ঠাকুরাণীকে মাতৃনামে সম্বোধন করিয়া বারম্বার ক্ষমা চাহিলেন এবং স্বামী পুত্রপৌত্র পুত্রবধূদের শাশুড়ীর হাতে দিয়া সতী বিশ্বমাতার ক্রোড়ে আত্মসমর্পণ করিলেন। পিতৃকুল ও স্বামীর কুল ধন্য হইয়া গেল।

(৯)

বসন্তের অগণ্য ফুল ফুটিতেছে, নব পল্লবে বৃক্ষ সকল সুশোভিত হইতেছে। নববর্ষের নবানন্দে সকল গৃহ পূর্ণ, কিন্তু কালের দুর্লঙ্ঘ্য বিধানে আমাদের প্রাণ আজ শোকে ম্রিয়মাণ। সব রহিয়াছে—কিন্তু এক সতীর বিহনে আজ সব যেন শূন্য! দিদি-গত-প্রাণা সতী তদীয়া সতী দিদির সহিত একাত্মিকা হইয়া মায়ের নাম করিয়া আজ ধন্যা হইতেছেন। চতুর্দ্দিকে সতী-ধর্ম্মের জয় জয়কার হইতেছে। বিধাতার মহা ইচ্ছার জয় হউক। ওঁ শান্তি শান্তি শান্তি।

বিলাপ।

রঙ্গলাল, জাগি তব ধ্রুপদ সঙ্গীতে
কোন্ রঙ্গে, দেখ, মাতিয়াছে গৌড় পুনঃ
নির্লজ্জ বিলাসী, শূন্য টপ্পার সাধনে?
হে মধুসূদন, তব দুন্দুভি নিনাদে
চমকি জাগিলা যবে গৌড়জন সবে,
দেখিয়া লইলা বিশ্ব মুহূর্ত্তের তরে,
"স্পন্দিত মুখরিত জীবকর্ম্ম ভূমি,—
প্রতিধ্বনি তার উঠিল হৃদয়মাঝে
নিদ্রালস ত্যজি। কিন্তু কৈ", কোথা সেই
প্রতিধ্বনি, গভীর আরাব? আজি মাত্র
উঠিছে আকাশে, বিলাসের ক্ষীণকণ্ঠে
কৌতুকের রঙ্গভরা থলথল হাসি।
হেমচন্দ্র, তব শিঙ্গা ধ্বনি গৌড়জন-
কর্ণে যবে পশিল আসিয়া অকস্মাৎ,
প্রাণের স্পন্দনে উঠিল কাঁপিয়া তার
সর্ব্ব অঙ্গ, অস্থি মজ্জা শিরা। হুহুঙ্কারি
সবে যেন ঊর্দ্ধে বাহু তুলি, গগনের
চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ তারা নক্ষত্র মণ্ডল
ভাঙ্গি চূর্ণ চূর্ণ করি, নূতন করিয়া
গড়িতে ধাইল জীর্ণ বিশ্ব সুবিশাল।

হারে হতবিধি! কোথা সেই দিন আজি
কোথা সেই হুহুঙ্কার, প্রাণের স্পন্দন?
গভীর আঁধারে বসি মৌন নীরবতা।
মেঘের গর্জ্জন গৌড় চাহে না শুনিতে,
ক্ষণপ্রভা প্রভাময়ী পারে না দেখিতে;
ঝিল্লি ঝি ঝি রব আজি মধুর সঙ্গীত,
জোনাকীর ক্ষীণরশ্মি আজিরে সুন্দর!
নব জীবনের সেই তন্ময় মত্ততা
নবীন গর্ব্বের সেই দৃঢ় পাদক্ষেপ,
অর্থহীন বাক্যে আজি হ'ল পরিণত,
নটীর বিলাস নৃত্য উথলিছে আজি।
ভাব গেছে, গেছে চলি চরিত্র-গৌরব;
আপনি বুঝি না, হায়, বুঝাইব কারে?
কৃত্রিম মোহের বশে মুদিত নয়নে
অজ্ঞাত দেশের ছবি দেখিছি বসিয়া,
অজ্ঞাত কণ্ঠের ধ্বনি শুনিছি শ্রবণে,
বুঝিতে পারি না, তবু শুনি মৌন হ'য়ে।
আপনার জন আজি দূরে চলি গেছে,
পরের পরস্ব ল'য়ে মাতিয়াছি সবে।

শ্রীশশধর রায়।

শান্তিশতকম্।*

দুর্নিবার বেগ সনে দেখ যে সময়
বাহিরায় চিত্তমাতঙ্গের মদগুল,
মদরসে-মজ্জি' তা'র সে সময় হয়
কি উদ্দাম, কি ভীষণ করম সকল!
ধৈর্য্যের আলান রহে পড়িয়া কোথায়,
কোথায় চলিয়া যায় লজ্জার বাঁধন,
আচার-নিগড় কোথা সেই কালে হায়,
কোথা রহে বিনয়ের অঙ্কুশ তাড়ন। ২১।

জীর্ণ বস্ত্র খণ্ডে করি' কন্থা নিরমিত
যেই জন করে তা'র লজ্জা নিবারণ,
গৃহপ্রান্তে বাস যা'র, অন্ন ভিক্ষার্জ্জিত,
ভূমিতে শয়ন, দেহমাত্র পরিজন,—
—হায় রে এমনও দীন মানবের মন
বিষয়-লালসা দেখ ত্যজে না কখন। ২২

বাখানি, উদর! আমি সাধুতা তোমার,
শাকমাত্র লভি' তব পরিতোষ হয়,

* কবিবর-শিহ্লন-প্রণীত।

অনন্ত বাসনা যথা উঠে অনিবার
কিছুতেই তৃপ্ত নয় এ হত হৃদয়! ২৩।

নিঃস্ব শত চায়, শতী দশ শত চায়,
সহস্র-অধিপ লক্ষ ইচ্ছে লভিবারে,
লক্ষপতি ইচ্ছে দেখ হ'তে ক্ষিতিরায়,
ক্ষিতিপতি চক্রপতি চায় হইবারে;
ইন্দ্রত্ব লভিতে হয় চক্রেশের আশ,
লভিতে ব্রহ্মত্ব ইচ্ছা করয়ে বাসব,
বিষ্ণুপদে ব্রহ্মা সদা করে অভিলাষ,
—আশার পারেতে কোন্ যাইবে
মানব? ২৪।

মাতৃগর্ভ হ'তে যাহা হয়েছে বাহির,
যা'র তরে ভাবি' ভাবি' কাটাই সময়,
অপবিত্র দ্রব্যাধার ভৌতিক শরীর,—
ভাব দেখি কোন্ দশা তাহার না হয়!
'আমি' 'আমি' করে সবে ভুলিয়া মায়ায়,
ধীর হ'লে দেহে যত্ন কেবা করে হায়? ২৫।

এই যে শরীর যা'র এত গর্ব্ব কর,
শুক্র শোণিতের তাহা হয় পরিণাম,
শোকের আশ্রয় আর মরণের ঘর,
আধিব্যাধি আসি' তথা করয়ে বিশ্রাম
অবশী জনের আছে এ সব বিদিত,
না হয় তথাপি তা'র বিবেক-উদয়,
অবিদ্যা-সাগরে তাই হয়ে নিমজ্জিত
ক্ষেত্র, নারী চায় আর শৃঙ্গার, তনয়! ২৬।

"সুন্দর অধর কোথা বদন-কমল,
"আয়ত কটাক্ষ তব এখন কোথায়,
"কোথায় তোমার এবে আলাপ কোমল,
বক্র ভ্রূবিলাস কোথা কামধনু প্রায়?"
—মধুর গুঞ্জনে হেন সমীরণ ভরে
মৃত মানবের অই বিকট বদন,
খট্টাঙ্গ-প্রান্তেতে পড়ি' প্রকাশি' দশন
মোহজাল প্রতি যেন উপহাস করে!* ২৭।

মুনি-উপদেশ মন করহে শ্রবণ,
না কর গমন কভু রমণী-সকাশ,
আঁখি অস্ত্রে হরিণাক্ষী ভাবি' দেখ মন,
কত শত মানবের চিত্ত করে নাশ;—
সাধু মানবেরও শম-সুরক্ষিত মন
ছিন্ন ভিন্ন করি' ফেলে রমণী-নয়ন! ২৮।

কঠিন পিশিত পিণ্ডে স্তনবোধ করি'
কামাতুর জন দেখ করে আলিঙ্গন,
মধুপূর্ণ সুরাপাত্র সম মনে করি'
পান করে লালাময় রমণী বদন!
অতি অপবিত্র পথ সেই ক্লেদময়
হেন স্থানে কামমূঢ় করয়ে রমণ!—
হায়রে কি বস্তু তা'র রমণীয় নয়
মহা মোহে অন্ধপ্রায় হয় যেই জন? ২৯।

ইতি "বিবেকোদয়" নামক ১ম পরিচ্ছেদ।

ক্রমশঃ।

শ্রীহরিসত্য ভট্টাচার্য্য।

---

* শ্মশানস্থ কোন বিকট নরকপাল দেখিয়া কবির মনে হইতেছিল, "যে মুখের এক সময় কত শ্রী, কত আদর ছিল, সে মুখের শেষে এই পরিণাম!" শ্মশান-বায়ু-তাড়িত হইয়া সেই নরকপাল হইতে অস্ফুট শব্দ হইতেছিল; ভাবপ্রবণ কবি বলিতেছেন—"এ শব্দ নয়! নরকপাল মানবের মোহান্ধতার প্রতি লক্ষ্য করিয়া উপহাস-বাক্য প্রয়োগ করিতেছে!"—অনু-বাদক।

নব বর্ষ।

হে মোর স্বদেশ !
তোমার কুটীর-দ্বারে লয়ে আজি বিচিত্র সন্দেশ
দেব-বার্ত্তাবহ ওই স্মিতমুখে দাঁড়াইল এসে
ডেকে লও ডেকে লও সারা প্রাণ দিয়ে
ভালবেসে !

এস ত্বরা নিয়ে
সুনির্ম্মল পাদ্য অর্ঘ্য—পর্ণাসন তূর্ণ বিছাইয়ে !
তোমার ভবন-গৃহে আছে যাহা শ্রেষ্ঠ উপাচার
তাই দিয়ে অভ্যাগতে কর আজি সানন্দে
সৎকার !

হের চারি ধার
নব প্রভা ঢালে রবি আলোকিয়া নিখিল
সংসার !
আঙিনায় হাসে ফুল, বিহঙ্গম মত্ত কলরবে
নবীনে তুষিতে যেন মগ্ন সবে সজীব উৎসবে !

হয়ত গো আজ
নব আশা নব শক্তি নবোৎসাহ শুভ নব কাজ
করিতে নির্জীব চিত্তে মুহূর্ত্তেকে চেতনা সঞ্চার
এনেছে সে তব তরে হে বরেণ্য স্বদেশ
আমার !

ভক্তিপূত মনে
সকলি গ্রহণ কর চেতাইতে সুসন্তানগণে !
আসিবে আবার তব গৌরব উজ্জ্বল শুভ দিন
বুঝি বা তাহারি বার্ত্তা নিয়ে এল অতিথি
নবীন !

তীব্র জয়নাদ
ঘোষে দিক্ দিকে দিকে আজিকার এ নব
সংবাদ !
কে কোথায় আছে সুপ্ত, কে কোথায় আছে
ম্রিয়মাণ
এক সূত্রে বাঁধি সবে তব পাশে করুক
আহ্বান !

আজি জনে জনে
তব যোগ্য সুত করি লও তুমি হরষিত মনে !
প্রীতি প্রেম ঐক্য সখ্য বিশ্বপ্রেমী বিশ্বাস নির্ভর
উথলি উঠুক আজি পূর্ণ করি সকল অন্তর !

বিন্দু আবিলতা
নব পাছে ক্ষুণ্ণ যেন নাহি করে হে বিশ্বদেবতা !
অভাগা স্বদেশে মোর বেষ্টি' চির-আশীর্ব্বাদ তব
মোদেরে তুলুক গড়ি' শৌর্য্যে বীর্য্যে নিত্য
অভিনব !

শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত।

গীতোক্ত ত্রিগুণতত্ত্ব।

গীতার চতুর্দ্দশ অধ্যায়ে এই ত্রিগুণতত্ত্ব প্রাধানতঃ বিবৃত হইয়াছে। এই ত্রিগুণতত্ত্ব বুঝিবার জন্য গীতায় এ সম্বন্ধে যাহা উল্লিখিত হইয়াছে, তাহা এ স্থলে সংক্ষেপে আলোচনা করিতে হইবে। ভগবান্ বলিয়াছেন যে, সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ এই তিনটী গুণ প্রকৃতি-সম্ভব। ইহারা প্রকৃতি হইতে সমুদ্ভূত। ভগবান্ (৭।১২ শ্লোকে) পূর্ব্বে বলিয়াছেন যে, সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক ভাবসমূহ তাঁহা হইতেই সমুদ্ভূত। ইহা হইতে বুঝা

যায় যে, পরমেশ্বর হইতে পরমা প্রকৃতির গর্ভে এই তিন গুণের উদ্ভব হয়। পরমেশ্বর ইহাঁদের বীজপ্রদ পিতা। ইহাদের মূল বা বীজ (মূলভাব) পরমেশ্বরেরই ভাব। সাংখ্য-দর্শন অনুসারে এই ত্রিগুণ মূলপ্রকৃতিরই স্বরূপ। প্রকৃতি বা প্রধান এই ত্রিগুণেরই সমষ্টি। ত্রিগুণের সাম্যাবস্থাই মূল প্রকৃতি ও ত্রিগুণের বৈষম্য হইতে প্রকৃতি বিকৃতি সমুদায় উদ্ভূত হয়। এই ত্রিগুণের সহিত পুরুষের কোন সম্বন্ধ নাই। সাংখ্যদর্শনে পরমেশ্বর পরম পুরুষ-রূপে স্বীকৃত হন নাই। সুতরাং পরমেশ্বর হইতে যে এই ত্রিগুণজ ভাবের উৎপত্তি, তাহা সাংখ্য দর্শন হইতে পাওয়া যায় না এবং এই ত্রিগুণ যে প্রকৃতি-সম্ভব, তাহাও সাংখ্যদর্শন হইতে জানা যায় না। আমরা পরে সাংখ্য দর্শন হইতে এই ত্রিগুণ-তত্ত্ব বুঝিতে চেষ্টা করিব।

ভগবান্ বলিয়াছেন যে, এই ত্রিগুণই অব্যয় দেহীকে দেহবদ্ধ করে। দেহী যে অব্যয়, অধিকারী এবং দেহ নাশে তাহার যে নাশ হয় না, এই তত্ত্ব পূর্ব্বে ২য় অধ্যায়ে বিবৃত হইয়াছে। এই দেহী প্রকৃতিস্থ পুরুষ, প্রকৃতি হইতে অভিব্যক্ত দেহ বা ক্ষেত্র সংযোগে ক্ষেত্রজ্ঞ হন; এবং এই ক্ষেত্রের ত্রিগুণজ ভাবের দ্বারা বদ্ধ হইয়া ক্ষর পুরুষ হন, ইহা পরে ১৫শ অধ্যায়ে উল্লিখিত হইয়াছে। এই পুরুষ যে স্বরূপতঃ দেহ হইতে ভিন্ন ও শ্রেষ্ঠ এবং তাহার স্বরূপ যে পরমাত্মা মহেশ্বর, তাহা পূর্বে (১৩।২২ শ্লোকে) বলা হইয়াছে। এই পুরুষ যে দেহে বদ্ধ হন এবং এক দেহ নাশে আর এক দেহ গ্রহণ করেন, সদসদ্ যোনিতে বার বার জন্ম গ্রহণ করেন, তাহার কারণ গুণসঙ্গ। "কারণং গুণসঙ্গোঽস্য সদসদ্‌যোনিজন্মসু"। (১৩।২১)। অতএব এই গুণসঙ্গ বা গুণে আসক্তি হেতুই ত্রিগুণের দ্বারা তাঁহার বন্ধন হয়। এই আসক্তি বেদান্তমতে অজ্ঞান বা অবিদ্যা। শঙ্করের মতে ইহাই অধ্যাস। ইহা অনাত্মবিষয়ে আত্ম-বোধ বা আত্মানত্ম বিষয়ে অবিবেক। ইহাকে দেহে আত্মাধ্যাস বলে। ইহার ফলে নিত্য অব্যয় সর্ব্বগত দেহী আপনাকে দেশ কাল ও নিমিত্তের দ্বারা পরিচ্ছিন্ন, দেহের ধর্ম্ম সুখদুঃখমোহাদিতে আপনাকে সুখী, দুঃখী বা মোহিত মনে করেন। ইহাই ত্রিগুণ দ্বারা দেহে দেহীর বন্ধন। ভগবান্ পূর্ব্বে বলিয়াছেন,—

ত্রিভির্গুণময়ৈর্ভাবৈরেভিঃ সর্ব্বমিদং জগৎ।
মোহিতং নাভিজানাতি মামেভ্যঃ পরমব্যয়ম্॥
(১৩।৭)।

এই ত্রিগুণ কিরূপে দেহীকে বদ্ধ করে, তাহা বুঝাইবার জন্য ভগবান্ এস্থলে বলিয়াছেন যে, সত্ত্বগুণ নির্ম্মল; এজন্য ইহা প্রকাশক এবং অনাময়। ইহা দেহীকে সুখসঙ্গে ও জ্ঞানসঙ্গে বদ্ধ করে অর্থাৎ সত্ত্ব-গুণজ জ্ঞানে ও সুখে তাহার আসক্তি হয়। রজঃ রাগাত্মক; তৃষ্ণা, কাম বা বাসনায় আসক্তি হেতু এই রাগাত্মক রজোগুণ সমুদ্ভূত হয়। এজন্য ইহা দেহীকে কর্ম্মসঙ্গে নিবদ্ধ করে বা কর্ম্মে তাহার আসক্তি জন্মায়। আর তমোগুণ অজ্ঞানজ; ইহা সর্ব্ব দেহীর মোহোৎপাদক; ইহা দেহিগণকে প্রমাদ আলস্য, নিদ্রাতে বদ্ধ করে।

ইহা হইতে আমরা বুঝিতে পারি যে, সত্ত্বগুণ নির্ম্মল, প্রকাশক ও সুখস্বরূপ। এই প্রকাশ ও সুখ তাহার স্বভাব। রজঃ রাগাত্মক, তৃষ্ণা কামনা প্রভৃতি ইহা হইতে উদ্ভূত হয়। আর তমোগুণের মূল অজ্ঞান, ইহা মোহ উৎপাদন করে। সত্ত্বগুণের স্বরূপ

—প্রকাশ, রজোগুণের স্বরূপ রাগ, আর তমোগুণের স্বরূপ মোহ। সত্ত্বগুণ হইতে জ্ঞান, রজঃ হইতে কর্ম্ম, আর তমঃ হইতে মোহ বা জ্ঞানের ও কর্ম্মের আবরণ উৎপন্ন হয়। আমরা আরও বলিতে পারি যে, সত্ত্ব গুণ হইতে আমরা জ্ঞাতা হই। রজঃ হইতে কর্ত্তা হই। আর তমঃ হইতে ভোক্তা হই। সত্ত্বগুণ আমাদের সুখে সংযুক্ত করে, অর্থাৎ জ্ঞান ও প্রকাশ-জনিত নির্ম্মল সুখে সংযুক্ত করে। রজো গুণ কর্ম্মে সংযুক্ত করে। আর তমোগুণের জ্ঞানকে আবৃত করিয়া আমাদের প্রমাদ ঘটায়।

যাহা হউক, এই ত্রিগুণের মধ্যে কোন্ গুণের কি স্বভাব, কি ধর্ম্ম, কিরূপ ক্রিয়া ইত্যাদির বিষয়ে জানিতে হইলে কয়েকটী কথা আরও জানিতে হইবে। এই তিন গুণ কখনও পৃথকভাবে থাকিতে পারে না; তাহারা একত্র পরস্পর মিথুনভাবে থাকে; কিন্তু তাহারা পরস্পর পরস্পরকে অভিভূত করিয়া নিজ নিজ ভাব ও কর্ম্ম প্রকাশ করিতে চেষ্টা করে। ভগবান্ বলিয়াছেন, রজোগুণ ও তমোগুণকে অভিভূত করিয়া সত্ত্বগুণ প্রকাশিত হয়। সেইরূপ, সত্ত্ব ও তমোগুণকে অভিভূত করিয়া রজোগুণ অভিব্যক্ত হয় এবং সত্ত্ব ও রজোগুণকে অভিভূত করিয়া তমোগুণ প্রকাশিত হয়। এজন্য কোন্ গুণের কি ধর্ম্ম ও ক্রিয়া স্বভাব, তাহা আমরা পৃথক্‌ভাবে জানিতে পারি। যেস্থলে সত্ত্বগুণের বিবৃদ্ধি হয়, সেস্থলে রজঃ ও তমোগুণ অভিভূত থাকে; সুতরাং তখন আমরা সত্ত্বগুণের স্বভাব ও ধর্ম্ম কিরূপ, তাহা বুঝিতে পারি। ভগবান্ বলিয়াছেন যে, এই দেহে সর্ব্বইন্দ্রিয়দ্বারে যখন জ্ঞান-প্রকাশ আরম্ভ হয়, তখন রজঃ ও তমঃ অভিভূত হইয়া সত্ত্বগুণের বিশেষ বৃদ্ধি হইয়াছে, ইহা বুঝিতে হইবে। সেইরূপ যখন আমাদের লোভ, কর্ম্মে প্রবৃত্তি, কর্ম্মে উদ্যম এবং নানাবিধ কর্ম্মে অসংযত স্পৃহা চিত্তকে বিচলিত করে, তখন সত্ত্ব ও তমঃ অভিভূত হইয়া রজোগুণের বিশেষ বৃদ্ধি হইয়াছে, ইহা বুঝিতে হইবে। আর যখন আমাদের প্রমাদ বা ভ্রম, অপ্রকাশ বা জ্ঞানের আবরিত ভাব, কর্ম্মের অপ্রবৃত্তি ও মোহ অর্থাৎ অবসাদ বা জড়ভাব উপস্থিত হয়, তখন সত্ত্ব ও রজোগুণকে অভিভূত করিয়া তমোগুণের বিশেষ বৃদ্ধি হইয়াছে, ইহা বুঝিতে হইবে। (ইহার বিশেষ বিবরণ পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত শশধর তর্কচূড়ামণি মহাশয়ের ধর্ম্ম-ব্যাখ্যায় যেরূপ উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা পূর্ব্বে ১১,১২ ও ১৩শ শ্লোকের টীকায় উদ্ধৃত হইয়াছে)।

এ সম্বন্ধে আমাদের এস্থলে আরও দুই এক কথা বুঝিতে হইবে। এই ত্রিগুণ তত্ত্ব জানিতে হইলে, আমাদের মধ্যে বিভিন্ন সময়ে যে সকল বিভিন্ন ভাবের অভিব্যক্তি হয়, তাহার প্রতি বিশেষ লক্ষ্য করিতে হইবে। আমরা আমাদের চিত্তবৃত্তির গতি ও ক্রিয়া লক্ষ্য করিলে দেখিতে পাই যে, যখন আমরা কোনও বাহ্য বিষয় প্রত্যক্ষ করিয়া, তাহার স্বরূপ জানিতে চাই, তখন আমাদের জ্ঞানেন্দ্রিয় সকল বহির্মুখ হইয়া সেই বিষয়ে নিয়োজিত হয় এবং জ্ঞান সেই ইন্দ্রিয়ের দ্বার দিয়া বাহিরে গিয়া সেই বিষয়ের আকারে আকারিত হয়, তখন প্রথমে ইন্দ্রিয়দ্বারে সেই বিষয়ের রূপ রস শব্দাদি অনুভব করি এবং সেই অনুভূতি পরম্পর লব্ধ হইয়া তাহার বাহ্য কারণ যে বিষয় তাহার সম্বন্ধে প্রথম নির্ব্বিশেষে জ্ঞান হয়। পরে মন তাহাতে আকৃষ্ট হয় এবং বুদ্ধি সেই বিষয় কি, তাহা

সবিশেষ ভাবে নিশ্চয়ই জানিতে যত্ন করে,— সেই বিষয়ের সহিত পূর্ব্বানুভূত তদনুরূপ বিষয় স্মরণ করিয়া ইহাদের মধ্যে সাধর্ম্ম্য, বৈধর্ম্ম্য, মনন বা বিচার করিয়া সেই অনুভূত বিষয়ের স্বরূপ নির্ণয় করে। এইরূপে ইন্দ্রিয় দ্বারে যে বাহ্য বিষয় প্রকাশিত হইয়া আমাদের বাহ্য বিষয়-জ্ঞান উৎপাদন হয়, তাহা সত্ত্বগুণের কার্য্য; ইহাকে চিত্তের সাত্ত্বিক বৃত্তি বলে। এই জ্ঞান ক্রিয়ার সময়ে আমাদের কোনও কর্ম্ম-প্রবৃত্তি থাকে না; কোন মোহ বা জড়তা থাকে না। সে সময়ে যদি কর্ম্মে প্রবৃত্তি হয়, তবে সেই জ্ঞান-ক্রিয়া ক্রমশঃ ক্ষীণ হইয়া যায় এবং পরিণামে তাহা বন্ধ হয়। সেইরূপ যদি মোহ বা অপ্রবৃত্তি উপস্থিত হয়, তাহা হইলেও এই জ্ঞানক্রিয়া ক্ষীণ হইয়া ক্রমে বন্ধ হয়। ইন্দ্রিয়দ্বারে কোনও বাহ্য বিষয়ের জ্ঞান অথবা কোনও আন্তর বিষয়ক জ্ঞান প্রকাশ কালে তাহাতে আমাদের তন্ময়তার প্রয়োজন; সে সময় যদি মনের চাঞ্চল্যবশতঃ আমরা অন্য বিষয় জানিবার জন্য প্রবৃত্ত হই বা কর্ম্মে প্রবৃত্ত হই, অথবা যদি আলস্য ও মোহ আসিয়া আমাদের জ্ঞান-ক্রিয়াকে বাধা দেয়, তবে আমরা সে বিষয়ের যথার্থ জ্ঞান লাভ করিতে পারি না; তজ্জন্য আমরা বুঝিতে পারি যে, আমাদের চিত্তের চাঞ্চল্য বা বিক্ষেপ কর্ম্মে প্রবৃত্তি ও মোহ বা অবসাদ আমাদের জ্ঞানের বিরোধী। আমাদের আন্তরিক ব্যাপারের প্রতি লক্ষ্য করিলে, আমরা বুঝিতে পারি যে, আমাদের জ্ঞানবৃত্তি বিকাশকালে আমাদের কর্ম্মবৃত্তি ও অবসাদ বা মোহভাব সংযত থাকে। সেইরূপ লোভাদিবশে আমাদের কর্ম্মবৃত্তির বিশেষ উদ্রেক হইলে আমাদের জ্ঞানের প্রকাশ-ভাব ও মোহভাব সংযত থাকে, এবং যখন মোহ বা অবসাদ আসিয়া আমাদিগকে অভিভূত করে, তখন আমাদের জ্ঞানের প্রকাশ ও কর্ম্মের প্রবৃত্তি সমুদয় ক্ষীণ হইয়া যায়; অতএব আমাদের অন্তরে তিনটী পরস্পর বিরোধী ভাবের ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া জানিতে পারি। ইহাদের মধ্যে জ্ঞানপ্রকাশের ভাবকে সত্ত্বগুণের ভাব, কর্ম্মে প্রবৃত্তির ভাবকে রজোগুণের ভাব, এবং এই উভয় ভাবের বিরোধী অবসাদ ও মোহ-ভাবকে আমরা তমোগুণের ভাব বলিতে পারি। আমরা আরও বুঝিতে পারি যে, যখন রজঃ ও তমোভাব অভিভূত হইয়া সত্ত্বের বিবৃদ্ধি হয় ও জ্ঞানের প্রকাশ হয়, তখন আমরা একরূপ অনাবিল সুখ অনুভব করি। সর্ব্বেন্দ্রিয় দ্বারা জ্ঞান প্রকাশকালে এই সুখের উপভোগ হয়। সেইরূপ রাজসিক লোভাদির দ্বারা পরিচালিত হইলে ও কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলে আমাদের দুঃখভোগ করিতে হয়। আর তামসিক অজ্ঞান মোহে মোহিত হইলে, আমাদের সুখ ও দুঃখের অনুভূতি বড় থাকে না; তখন অবসাদ বা জড়তা আমাদিগকে অভিভূত করিয়া রাখে।

আমাদের অন্তরে বৃত্তিজ্ঞানের প্রকাশ কালে যে ক্রিয়া হয়, তাহা সাত্ত্বিক। তাহা লোভাদি-প্রবৃত্তি-চালিত রাজসিক ক্রিয়া হইতে ভিন্ন। জ্ঞানার্জ্জনচেষ্টাজনিত ক্রিয়া যেমন সাত্ত্বিক, সেইরূপ শাস্ত্রবিহিত ধর্ম্ম বা অনুষ্ঠেয় কর্ম্ম করিবার প্রবৃত্তি-জনিত এবং শাস্ত্রনিষিদ্ধ কর্ম্মে নিবৃত্তিজনিত জ্ঞানপূর্ব্বক যে কর্ম্ম, তাহাও সাত্ত্বিক। বিশুদ্ধ জ্ঞান যেমন সত্ত্বগুণের ধর্ম্ম, সেইরূপ, সেই বিশুদ্ধ জ্ঞানের দ্বারায় চালিত হইয়া অনুষ্ঠেয় কর্ম্মাচরণও সত্ত্বগুণের ধর্ম্ম; অথবা সত্ত্বপরিচালিত রজোগুণের ধর্ম্ম। তাই ভগবান্‌ বলিয়াছেন,

সুকৃত কর্ম্মের ফল-নির্ম্মল সাত্ত্বিক, লোভাদি প্রবৃত্তি চালিত রাজসিক কর্ম্মের ফল দুঃখ। আর তমোগুণের ফল অজ্ঞান। সত্ত্বগুণ হইতে জ্ঞানের সম্যক্ প্রকাশ হয়; রজোগুণ হইতে লোভ অর্থাৎ ত্রিবিধ নরকদ্বার কাম ক্রোধ ও লোভ সমুৎপন্ন হয়, আর তমোগুণ হইতে প্রমাদ মোহ ও অজ্ঞান সম্ভূত হয়। এইরূপে আমরা গীতা হইতে ত্রিগুণের ভাব ও কর্ম্ম এবং কিরূপে তাহারা আমাদিগকে বদ্ধ করে এবং কি ফল উৎপাদন করে, তাহা সংক্ষেপে জানিতে পারি।

ভগবান্ এস্থলে ত্রিগুণ সম্বন্ধে আরও যে এক কথা বলিয়াছেন, তাহা এস্থলে আমাদের বুঝিতে হইবে। ভগবান্ বলিয়াছেন যে, যদি কাহারও সত্ত্বগুণের প্রবৃদ্ধিকালে প্রলয় বা মৃত্যু হয়, তবে সে উত্তমবিদ্‌গণের বা জ্ঞানিগণের অমললোক অর্থাৎ স্বর্গলোক হইতে ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত কোনও উপযুক্ত লোক প্রাপ্ত হয়। যদি রজঃপ্রবৃদ্ধিকালে কাহারও মৃত্যু হয়, তবে সে কর্ম্মসঙ্গিলোকে বা এই মনুষ্যলোকে জন্মগ্রহণ করে; আর যদি কাহারও তমঃপ্রবৃদ্ধিকালে মৃত্যু হয়, তবে সে পরে মূঢ়যোনিতে বা পশু বা তদপেক্ষা নিম্নযোনিতে জন্মগ্রহণ করে। ভগবান আরও বলিয়াছেন যে, যাহাদের রজঃ ও তমোগুণ অভিভূত হওয়ায় সত্ত্বগুণে স্থিতিলাভ হইয়াছে, তাহারা উর্দ্ধে গমন করে। সেইরূপ যাহারা রজোগুণে স্থিত, তাহারা মধ্যে বা এই ভূলোকে বা মনুষ্যলোকে থাকে। আর যাহারা জঘন্য তমোগুণে স্থিত, তাহারা ক্রমে অধোগতি প্রাপ্ত হয়। এই কথা আমাদের আর একটু বিশেষ করিয়া বুঝিতে হইবে। আমাদের মধ্যে অনেকের মূঢ়তা, জড়তা ও অজ্ঞান এতই প্রবল যে তাহারা কদাচিৎ কর্ম্মে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইতে পারে এবং জ্ঞানার্জ্জন চেষ্টায় রত হইতে পারে। তাহাদের মধ্যে সত্ত্ব ও রজোগুণ অত্যন্ত ক্ষীণ থাকে। ইহারা সাধারণতঃ জঘন্য তমোগুণবৃত্তিস্থ। ইহাদের মধ্যে তমোগুণ অত্যন্ত বলবান্। সত্ত্ব বা রজোগুণ কদাচিৎ তমোগুণকে অভিভূত করিয়া অভিব্যক্ত হয়; ইহারা এ জীবনে ক্রমে অধোগতি প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ ক্রমশঃ জড়ভাবাপন্ন হয়। ইহারা মূঢ়চিত্ত; মৃত্যুর পরে ইহাদের কোনও গতি হয় না। এই ভূলোকেই ইহারা ইহাদের সংস্কারানুযায়ী নিম্নযোনি প্রাপ্ত হয়। আমরা দেখিতে পাই যে, আমাদের মধ্যে অধিকাংশ মানবই রজোগুণ প্রধান। তাহারা প্রবৃত্তিবশে কাম ক্রোধ বা লোভবশে রাগ দ্বেষ দ্বারা পরিচালিত হয়। তাহারা জ্ঞানার্জ্জন করিতে পারে না বা কর্ত্তব্য সাধনে চেষ্টা করে না; তাহারা ধর্ম্ম কর্ম্ম বা কর্ত্তব্য কর্ম্ম করিতে পারে না; আবার অলস হইয়াও থাকিতে পারে না। এই সকল রাজসিক লোক প্রায়ই লোভাদি প্রবৃত্তিবশে চালিত হয় ও দুঃখ পায়। এই সকল লোকের ইহকালে কোনও প্রকার উন্নতি হয় না; মৃত্যুর পরেও ইহাদের উর্দ্ধগতি হয় না; মৃত্যুর পরে ইহারা প্রেতলোকে উপযুক্তকাল বাস করিয়া, পুনর্ব্বার মনুষ্যলোকে জন্মগ্রহণ করে। এখানে আবার সংস্কার বা প্রবৃত্তিবশে কর্ম্ম করে; আবার মৃত্যুর পরে এই মনুষ্যলোকে জন্মগ্রহণ করে এবং বার বার এই মনুষ্যলোকে গতায়াত করে। এ সংসারে অতি অল্প লোকই প্রকৃত সত্ত্বস্থ বা সত্ত্বগুণপ্রধান। বহুকালের বা বহু জন্মের সাধনায় ও পুণ্যকর্ম্মের অনুষ্ঠানে যাঁহাদের রাগ দ্বেষ, কাম, ক্রোধ লোভ প্রভৃতি ক্ষীণ হইয়া যায়,

যাঁহাদের প্রবৃত্তি সংযত, যাঁহারা অজ্ঞান-মোহজমিত অবসাদে আর অভিভূত হন না, সেই পুণ্যকামী জ্ঞানী লোকই সত্ত্বস্থ থাকেন। তাঁহারাই এ জীবনে জ্ঞান, ধর্ম্ম ও বৈরাগ্য সাধন দ্বারা ক্রমে উন্নতি লাভ করিয়া নির্ম্মল সুখ উপভোগ করেন এবং মৃত্যুর পরে পিতৃযানে বা দেবযানে গমন করিয়া স্বর্গাদি লোক প্রাপ্ত হন। (দেবযানে ও পিতৃযানে গতির তত্ত্ব পূর্ব্বে ৮ম অধ্যায়ে বিবৃত হইয়াছে)।

এস্থলে উল্লেখ করা আবশ্যক যে, আমাদের মধ্যে কাহারও সত্ত্বগুণ, কাহারও রজোগুণ এবং কাহারও তমোগুণ প্রবল থাকে; সকলের মধ্যেই এই তিন গুণ থাকে এবং সময়ে ও অবসর মত একটী গুণ অপর দুইটী গুণকে অভিভূত করিয়া প্রকাশ পাইতে চেষ্টা করে। কোনও একটী গুণ একেবারে অভিভূত হইয়া বরাবর থাকে না। আমাদের মধ্যে এই ত্রিগুণের পরস্পর পরস্পরকে অভিভূত বা পরাজিত করিবার যে চেষ্টা নিয়ত চলিতে থাকে, তাহাকেই শাস্ত্রে দেবাসুর-সংগ্রাম বলে; ইহার তত্ত্ব পরে যোড়শ অধ্যায়ের ব্যাখ্যায় বিবৃত হইবে। এই দেবাসুর সংগ্রামে বা ত্রিগুণের পরস্পর সংগ্রামে যে মনুষ্যের মধ্যে সত্ত্বগুণ রজঃ ও তমোগুণকে সম্পূর্ণ অভিভূত করিতে পারে, তিনি সত্ত্বস্থ, তিনি দৈবী সম্পদ্‌যুক্ত; আর যাহার মধ্যে রজঃ ও তমোগুণের দ্বারা এই সত্ত্বগুণ সম্পূর্ণ অভিভূত, সে রজস্থ বা তমস্থ; সে আসুরী সম্পদ্‌যুক্ত। যোড়শ অধ্যায়ে এই দৈবাসুর সম্পদ্ বিবৃত হইয়াছে; এ স্থলে তাহার উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

এ স্থলে আমরা আর এক কথা বলিব। আমাদের মধ্যে এই যে সত্ত্বগুণের সহিত রজঃ ও তমোগুণের সংগ্রাম বা দেবাসুর-সংগ্রাম, ইহা অনাদিকাল প্রবৃত্ত। *

আমাদের এ জীবনে সেজন্য কথনও সত্ত্বগুণের প্রবৃদ্ধি হয়, কথনও বা রজোগুণের কথনও বা তমোগুণের বৃদ্ধি হয়; যে সাধারণতঃ সত্ত্বস্থ, তাহারও কথনও রজোগুণের, কথনও বা তমোগুণের অভিব্যক্তি হইতে পারে। তজ্জন্য মৃত্যুকালে আমাদের কোন্ গুণ প্রবৃদ্ধ থাকিবে, তাহা স্থির করা যায় না। পূর্ব্বে ৮।৬ শ্লোকে ভগবান্ বলিয়াছেন, জীবনে যে ভাবে সতত ভাবিত হওয়া যায়, সেই ভাবই মৃত্যুকালে অভিব্যক্ত হয় বা সেই ভাবেরই স্মরণ হয়; অতএব যিনি জীবনের অধিকাংশ সময় সত্ত্বস্থ থাকিতে পারেন, অর্থাৎ যাঁহার রজঃ ও তমোগুণ অভিভূত হইয়া সাধারণতঃ সত্ত্বগুণই প্রবল থাকে, তিনিই মৃত্যুকালে সত্ত্ববৃদ্ধি অবস্থায় প্রয়াণ করিতে পারেন এবং তিনিই উর্দ্ধগতি লাভ করিয়া উত্তমবিদ্‌গণের অমল লোক প্রাপ্ত হন। মৃত্যুকালে রজো বৃদ্ধি ও তমো বৃদ্ধি সম্বন্ধেও এইরূপ বুঝিতে হইবে।

এইরূপে গীতায় এই অধ্যায়ে পঞ্চম হইতে অষ্টাদশ শ্লোক পর্য্যন্ত যে ত্রিগুণতত্ত্ব বিবৃত হইয়াছে, তাহা আমরা বুঝিতে পারি। এক্ষণে আমরা অন্য শাস্ত্রে এই ত্রিগুণতত্ত্ব কিরূপে বিবৃত হইয়াছে, তাহার উল্লেখ করিব।

---

* শঙ্করাচার্য্য এই দেবাসুর সংগ্রাম সম্বন্ধে ছান্দোগ্য উপনিষদ্-ভাষ্যে বলিয়াছেন,—দেবাঃ...... শাস্ত্রোদ্ভাসিতা ইন্দ্রিয়বৃত্তয়ঃ। অসুরাস্তদ্ বিপরীতাঃ। হ বৈ......যত্র......সংযেতিরে।......স্বাভাবিক্যস্তমোরূপা ইন্দ্রিয়বৃত্তয়ঃ অসুরাঃ। তথা তদ্বিপরীতাঃ শাস্ত্রার্থবিষয়-বিবেকজ্যোতিরাত্মানো দেবাঃ স্বাভাবিকতমোরূপাসুরাভিভবনায় প্রবৃত্তা ইতি অন্যোন্যাভিভবোদ্ভবরূপাঃ সংগ্রাম ইব সর্ব্বপ্রাণিষু প্রতিদেহং দেবাসুর-সংগ্রামঃ অনাদিকালপ্রবৃত্তইত্যভিপ্রায়ঃ।

অন্য শাস্ত্রোক্ত ত্রিগুণ-তত্ত্ব।—এই ত্রিগুণতত্ত্ব বুঝা অত্যন্ত কঠিন। কিন্তু এই তত্ত্বের উপর সমুদয় জগৎ-তত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত। এই পরিদৃশ্যমান জগৎ এই ত্রিগুণের ব্যাপার ও ক্রিয়া ব্যতীত আর কিছুই নহে। সামান্য বালুকা হইতে মনুষ্য পর্য্যন্ত যাহা কিছু আমরা দেখিতে পাই, সে সকলই এই প্রকৃতিজ ত্রিগুণের অধীন। কপিল-প্রমুখ মহর্ষিগণ এই ত্রিগুণের তত্ত্ব হইতে সংসারের যাবতীয় তত্ত্ব নির্দ্ধারিত করিয়াছেন। হিন্দুশাস্ত্র বুঝিতে হইলে, এই ত্রিগুণতত্ত্ব প্রথমে বুঝিতে হয়। বিশেষতঃ আমাদের ধর্ম্মশাস্ত্র বুঝিতে হইলে, ত্রিগুণতত্ত্ব জানা নিতান্ত প্রয়োজনীয়। এই ত্রিগুণতত্ত্বের উপরে জীবতত্ত্ব মানুষের বর্ণাশ্রম বিহিত ধর্ম্মতত্ত্ব, সাধনাতত্ত্ব, মনস্তত্ত্ব, পরকালতত্ত্ব, পুনর্জ্জন্মতত্ত্ব, মুক্তিতত্ত্ব, জীবের অভ্যুদয় বিকাশ ও পরিণতিতত্ত্ব প্রভৃতি প্রতিষ্ঠিত। জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও পরিণতি তত্ত্ব প্রভৃতিও এই ত্রিগুণতত্ত্ব হইতেই বুঝিতে হয়। ইহার উপর সমাজতত্ত্ব, সমাজের বর্ণ-বিভাগতত্ত্ব, কর্ম্ম-বিভাগতত্ত্ব স্থাপিত। দর্শনশাস্ত্রের যে মূল প্রতিপাদ্য বিষয় জীবতত্ত্ব, জগতত্ত্ব, ঈশ্বরতত্ত্ব ও আত্মতত্ত্ব, তাহাও ত্রিগুণ-তত্ত্বজ্ঞান ব্যতীত বুঝিতে পারা যায় না। এই ত্রিগুণতত্ত্ব সম্বন্ধে কয়েকটী প্রয়োজনীয় বিষয় আমরা এস্থলে আলোচনা করিব মাত্র।

ত্রিগুণ-তত্ত্বের মূল কোথায়, এবং কোন্ শাস্ত্রে কাহার দ্বারা ইহা প্রথমে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাহা আমাদের বুঝিতে হইবে। আমরা বলিতে বাধ্য যে, ঋষি কপিলের প্রচারিত সাংখ্যশাস্ত্রেই প্রথমে এই ত্রিগুণতত্ত্ব প্রকৃতি-পুরুষতত্ত্বের সহিত প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। তাহা হইতে এই তত্ত্ব পরবর্ত্তী সমুদায় শাস্ত্রে গৃহীত হইয়াছে। এই জন্যই ভগবান্, ঋষি কপিলকে সিদ্ধগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, এবং তাঁহাদের মধ্যে কপিলকে তাঁহারই বিভূতি বলিয়াছেন (১০।২৬)। শ্রীভাগবতে কপিলকে ভগবানের ষোড়শ অবতারের মধ্যে এক অবতার বলা হইয়াছে। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে আছে—

…"ঋষিং প্রসূতং কপিলং যস্তমগ্রে"…।

(৫।২)।

অর্থাৎ কপিল ঋষিকে ভগবান্ সর্ব্বপ্রথমে উৎপন্ন করিয়াছিলেন। পুরাণে ঋষি কপিলকে ব্রহ্মার মানস-পুত্র বলা হইয়াছে—

'সনকশ্চ সনন্দশ্চ তৃতীয়শ্চ সনাতনঃ।
অসুরিঃ কপিলশ্চৈব বোঢ়ুঃ পঞ্চশিখস্তথা।
ইত্যেতে ব্রহ্মণঃ পুত্রাঃ সপ্ত প্রোক্তা মহর্ষয়ঃ॥

এবং কপিলের সহিত ধর্ম্মজ্ঞান ঐশ্বর্য্য ও বৈরাগ্য উৎপন্ন হইয়াছিল, ইহাও উক্ত হইয়াছে।

শ্রুতিতে ত্রিগুণের উল্লেখ—সে যাহা হউক, শ্রুতিই যে এই ত্রিগুণের মূল প্রমাণ, তাহা বলা যায়। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে যেমন প্রকৃতি ও মায়ার কথা আছে, সেইরূপ ত্রিগুণেরও ইঙ্গিত আছে। যে একটী মাত্র মন্ত্রে (৪।৫) এই ত্রিগুণের উল্লেখ আছে, তাহা এই—

"অজামেকাং লোহিতশুক্লকৃষ্ণাং বহ্বীঃ
প্রজাঃ সৃজমানাং সরূপাম্।
অজোহ্যেকো জুষমাণোহনুশেতে জহাত্যেনাং
ভুক্তভোগ্যামজোহন্যঃ॥"

যখন শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে ঋষি কপিলের নাম পাওয়া যায় ("সাংখ্যযোগাধিগম্যম্"—৬।১৩) তখন সন্দেহ হইতে পারে যে, ঋষি কপিল শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের বক্তা ঋষির পূর্ব্ববর্ত্তী এবং ঋষি কপিলের প্রবর্ত্তিত

সাংখ্যশাস্ত্র শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের পূর্ব্বে প্রবর্ত্তিত। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে সাংখ্য ও বেদান্তশাস্ত্রের সমন্বয় হইয়া ঈশ্বরতত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কিন্তু এ সম্বন্ধে সন্দেহের বিশেষ কারণ নাই। আমরা পূর্ব্বে আরও দেখিয়াছি যে, কঠোপনিষদে সাংখ্যোক্ত পঞ্চবিংশতিতত্ত্বের ইঙ্গিত আছে। তাহাতে যাহা ইন্দ্রিয় মন বুদ্ধি ও অব্যক্ত তত্ত্বের অতীত পুরুষ এবং বুদ্ধিপ্রভৃতি তত্ত্বের মূল অব্যক্ত, তাহাও উল্লিখিত হইয়াছে। কঠোপনিষদ অপেক্ষা সাংখ্যদর্শন যে প্রাচীন, তাহা কেহ বলিতে পারেন না। অতএব মূল সাংখ্য শাস্ত্র অবশ্য শ্রুতিসম্মত এবং শ্রুতি-প্রমাণ অবলম্বনে প্রতিষ্ঠিত।

পূর্ব্বে ১৩শ অধ্যায়ের ব্যাখ্যা শেষে এই কথা উল্লিখিত হইয়াছে। এ স্থলে ইহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। যাহা হউক, উপনিষদে এই ত্রিগুণের যে ইঙ্গিত আছে, তাহা অতি সামান্য বলিতে হইবে। উপনিষদে উক্ত হইয়াছে যে, ভগবান্ গুণসকলকে বিনিযুক্ত করেন বা স্ব স্ব কর্ম্মে যোজনা করেন। "গুণাংশ্চ সর্ব্বান্ বিনিযোজয়েদ্ যঃ"। আরও উক্ত হইয়াছে যে, পুরুষ বদ্ধ হইয়া লোহিত শুক্ল কৃষ্ণ বর্ণের মিশ্রণে বিভিন্নরূপ হয়। এতদনুসারে মানুষেরও বর্ণভেদ হয়। এই ত্রিবর্ণ যে ত্রিগুণ, তাহা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে।

সে যাহা হউক, উক্ত ত্রিগুণ যে ত্রিবর্ণাত্মক, এই মাত্র জানিলে ত্রিগুণতত্ত্ব জানা যায় না। অতএব ত্রিগুণসম্বন্ধে এই শ্রুতিপ্রমাণ যথেষ্ট নহে। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্‌ব্যতীত মৈত্রায়ণী উপনিষদেও ত্রিগুণের উল্লেখ আছে। যথা—

"তম এবেদমগ্র আস, তৎপরেণেরিতং বিষমত্বং প্রয়াত্যেতদ্বৈ রজসোরূপং তদ্রজঃ খল্বীরিতং বিষমত্বং প্রয়াত্যেতদ্বৈ সত্ত্বস্য রূপম্ ইতি।"

(মৈত্রায়ণী উপঃ, ৫।২)।

এই মৈত্রায়ণী উপনিষদ অপেক্ষাকৃত আধুনিক। বিশেষতঃ ইহাতে তমঃ যে মূলতত্ত্ব, এবং তাহা হইতে বৈষম্য হেতু যে রজোগুণের উৎপত্তি, আর রজঃ হইতে যে সত্ত্বের উদ্ভব উক্ত হইয়াছে, তাহা সাংখ্য-শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত হইতে ভিন্ন। ঋগ্বেদে 'তম'ই সৃষ্টির অগ্রে বিদ্যমান ছিল, ইহা উক্ত হইয়াছে। ছান্দোগ্য ও বৃহদারণ্যক উপনিষদেও এই 'তমঃ' উক্ত হইয়াছে। "তমসো মা জ্যোতির্গময়" ইত্যাদি শ্রুতি দ্রষ্টব্য। কিন্তু এস্থলে তমঃ এক অর্থে সাংখ্যের মূলপ্রকৃতি হইলেও ইহাতে ত্রিগুণের কোন আভাস পাওয়া যায় না। অতএব সাংখ্য শাস্ত্রেই এই ত্রিগুণতত্ত্ব অনুসন্ধান করিতে হইবে।

সাংখ্যশাস্ত্রে ত্রিগুণের উল্লেখ।—কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, মূল সাংখ্যশাস্ত্র একরূপ বিলুপ্ত হইয়াছে। বিজ্ঞানভিক্ষু সাংখ্যসূত্রের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন যে, তিনি কালে নষ্ট সাংখ্যশাস্ত্র উদ্ধার করিয়াছেন। তিনি যে সমগ্র সাংখ্যশাস্ত্র উদ্ধার করিতে পারিয়াছিলেন, ইহা বলা যায় না। গীতার পরে অষ্টাদশ অধ্যায়ে যে 'সাংখ্যে কৃতান্তে' ও 'গুণসংখ্যানে প্রোক্ত' সর্ব্ব কর্ম্ম সিদ্ধির পঞ্চ কারণ ও ত্রিবিধ কর্ম্মচোদনার কথা উক্ত হইয়াছে, (১৩, ১৮, ১৯, শ্লোক দ্রষ্টব্য) তাহা বর্ত্তমান কালে প্রচলিত কোন সাংখ্যগ্রন্থে পাওয়া যায় না।

সাংখ্যতত্ত্ব সমাস—সাংখ্যশাস্ত্র সম্বন্ধে তিন খানি মূল গ্রন্থ পাওয়া যায়। ইহার মধ্যে 'তত্ত্বসমাসকে' ঋষি কপিলের মূল গ্রন্থ বলিয়া অনেকে বিশ্বাস করেন। কিন্তু সে গ্রন্থে পঁচিশটী মাত্র সূত্র আছে। তাহা এত

সংক্ষিপ্ত যে, কোন পুস্তকের 'সূচী' স্বরূপেও তাহা গ্রহণ করা যায় না। তাহার এক ভাষ্যও প্রচলিত আছে, অনেকে তাহা আসুরিপ্রণীত বলেন। কিন্তু তাহার কোন প্রমাণ নাই। এই সাংখ্যতত্ত্বসমাসে ত্রিগুণ সম্বন্ধে একটী মাত্র সূত্র আছে—

"ত্রৈগুণ্যং।" ইহার উক্ত ভাষ্য এইরূপ—

ত্রিগুণ কি? সত্ত্ব রজঃ ও তমঃ এই তিন গুণ। ত্রিগুণের ভাবকেই ত্রৈগুণ্য বলে।

"সত্ত্ব—প্রসাদ লাঘব, প্রসন্নতা, অভীষ্ট গতি, তুষ্টি, তিতিক্ষা, সন্তোষ ইত্যাদি লক্ষণ দ্বারা অনন্ত ভেদযুক্ত। এই সত্ত্বগুণকে সংক্ষেপতঃ সুখাত্মক বলা যায়।

"রজঃ—শোক, তাপ, ভেদ, উদ্বেগ, দোষ, গমনাদি লক্ষণ দ্বারা অসংখ্য ভেদযুক্ত। এই রজোগুণ সংক্ষেপে দুঃখাত্মক।

"তমঃ—আচ্ছাদক, অজ্ঞান, বীভৎস, গৌরব (পরুষত্ব), আলস্য, নিদ্রা, প্রমাদ ইত্যাদি লক্ষণের দ্বারা অসংখ্যরূপে বিভক্ত। এই তমোগুণকে সংক্ষেপতঃ মোহাত্মক বলা যায়।

এইরূপে ত্রৈগুণ্য ব্যাখ্যাত হইল।

"সত্ত্বং প্রকাশকং বিদ্যাৎ রজো বিদ্যাৎ প্রবর্ত্তকম্।
তম আবরকং বিদ্যাৎ ত্রৈগুণ্যং নাম সংজ্ঞিতম্॥"

সাংখ্য সূত্র—তৎপরে সাংখ্যশাস্ত্রের দ্বিতীয় প্রামাণিক গ্রন্থ সাংখ্যদর্শন। ইহাকে সাংখ্য প্রবচন বা সাংখ্যসূত্র বলে। অনেকে ইহাকে আধুনিক গ্রন্থ ও বিজ্ঞানভিক্ষু প্রণীত বলেন। কিন্তু একথা সঙ্গত নহে। বিজ্ঞানভিক্ষু যেরূপ সাংখ্যসূত্রের ভাষ্য করিয়াছেন, সেইরূপ অনিরুদ্ধও ইহার এক বৃত্তি করিয়াছেন। তাহা বিজ্ঞানভিক্ষুর ভাষ্য অপেক্ষা প্রাচীন বোধ হয় এবং অনিরুদ্ধ বৃত্তিতে বিজ্ঞানভিক্ষুর উল্লিখিত কয়েকটী সূত্র পাওয়া যায় না; আবার কয়েকটী নূতন সূত্রও পাওয়া যায় এবং অনেক পাঠান্তরও দেখা যায়। ইহা ব্যতীত সাংখ্যসূত্র যে প্রাচীন গ্রন্থ, তাহা অনুমান করিবার অন্য কারণ আছে। তাহা এস্থলে উল্লেখের প্রয়োজন নাই। এই সাংখ্যসূত্রে ত্রিগুণ সম্বন্ধে কি আছে, তাহা এক্ষণে দেখিতে হইবে।

সাংখ্যদর্শনে এই ত্রিগুণ সম্বন্ধে কয়েকটী মাত্র সূত্র আছে। যথা,—

(১) "সত্ত্বরজস্তমসাং সাম্যাবস্থা প্রকৃতিঃ"। (১৷৬১)।

অর্থাৎ সাংখ্যের যে মূল তত্ত্ব প্রকৃতি, তাহা এই সত্ত্ব রজঃ ও তমোগুণের সাম্যাবস্থা মাত্র। এই ত্রিগুণের স্বরূপ (অথবা ধর্ম্ম) সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে—

(২) "প্রীত্যপ্রীতিবিষাদাদ্যৈর্গুণানামন্যোন্যং বৈধর্ম্ম্যম্"। (১৷১২৭)

অর্থাৎ প্রীতি, অপ্রীতি ও বিষাদাদি এই গুণত্রয়ের দ্বারা এই ত্রিগুণের পরস্পর বৈধর্ম্ম্য। ব্যাখ্যাকারগণ বলেন, প্রীতি কেবল সত্ত্বগুণের ধর্ম্ম, অপ্রীতি কেবল রজোগুণের ধর্ম্ম, আর বিষাদ কেবল তমোগুণের ধর্ম্ম।

(৩) 'লঘ্বাদি ধর্ম্মৈরন্যোন্যং সাধর্ম্ম্যং বৈধর্ম্ম্যঞ্চ গুণানাম্।' (১৷১২৮)

অর্থাৎ লঘুত্বাদি স্বধর্ম্মের দ্বারা সাধর্ম্ম্য ও তাহার বৈপরীত্যের দ্বারা বৈধর্ম্ম্য নির্ণীত হয়। এই দুই সূত্র হইতে আমরা এই মাত্র জানিতে পারি যে, সত্ত্বগুণের ধর্ম্ম প্রীতি বা সুখ ও লঘুত্ব, রজোগুণের ধর্ম্ম অপ্রীতি বা দুঃখ ও চলনত্ব, আর তমোগুণের ধর্ম্ম বিষাদ ও গুরুত্ব।

গীতায় যে উক্ত হইয়াছে—"ঊর্দ্ধং গচ্ছন্তি সত্ত্বস্থা মধ্যে তিষ্ঠন্তি রাজসাঃ···অধোগচ্ছন্তি তামসাঃ" (১৪।১৮ শ্লোক), সে সম্বন্ধে সাংখ্য-দর্শনের সূত্র যথা—

(৪) "ঊর্দ্ধং সত্ত্ববিশালা" (৩।৪৮)।

"তমো বিশালা মূলতঃ।" (৩।৪৯)

"মধ্যে রজোবিশালা।" (৩।৫০)।

ত্রিগুণসম্বন্ধে আর একটী মাত্র সূত্র সাংখ্যদর্শনে পাওয়া যায়, তাহা এই—

(৫) "সত্ত্বাদীনামতদ্ধর্ম্মত্বং তদ্রূপত্বাৎ" (৬।৩৯)।

অর্থাৎ সত্ত্ব রজঃ ও তমঃ ইহারা প্রকৃতির গুণ বা ধর্ম্ম নহে। ইহারা প্রকৃতির রূপ বা স্বরূপ। ইহার অর্থ এই যে, যদিও সত্ত্বাদিকে গুণ বলে, কিন্তু বাস্তবিক ইহারা প্রকৃতির গুণ বা ধর্ম্ম নহে। গুণ বা রজ্জু যেমন বন্ধনের কারণ, এই সত্ত্বাদিও সেইরূপ পুরুষের বন্ধনের কারণ বলিয়া ইহাদিগকে 'গুণ' বলেন। গুণ এস্থলে এই বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত। তত্ত্বকৌমুদীকার বলিয়াছেন—'ত্রয়োগুণাঃ সুখদুঃখমোহা অস্যেতি ত্রিগুণম্' অর্থাৎ সুখ দুঃখ ও মোহরূপ তিনগুণ যাহার আছে, তাহা ত্রিগুণ। অর্থাৎ সুখাদিগুণ বিশেষের আধার বা অধিকরণ বলিয়া ইহাদিগকেও গুণ বলে। সত্ত্বাদি প্রকৃতিরই স্বরূপ। সত্ত্ব রজঃ তম মিলিয়াই প্রকৃতি। প্রকৃতি যদি 'দ্রব্য' হয়, তবে সত্ত্বাদি দ্রব্য। প্রকৃতি যদি শক্তি হয়, তবে এই সত্ত্বাদিও শক্তি বিশেষ। একথা আমরা পরে বুঝিতে চেষ্টা করিব। এই প্রকার সাংখ্যদর্শনে ত্রিগুণের যে উল্লেখ আছে, তাহাও অতি সংক্ষিপ্ত।

সাংখ্যকারিকা—সাংখ্যদর্শনের তৃতীয় প্রামাণ্য গ্রন্থ—কারিকা। ইহা ঈশ্বরকৃষ্ণ বিরচিত। শঙ্করাচার্য্যের গুরুর গুরু গৌড়পাদ ইহার ভাষ্য করিয়াছেন। এ গ্রন্থ যে প্রাচীন, ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত। এই কারিকায় ত্রিগুণ সম্বন্ধে যাহা উক্ত হইয়াছে, তাহা দেখিতে হইবে। প্রথমেই উক্ত হইয়াছে যে, যাহা কিছু ব্যক্ত (manifest) তাহা ত্রিগুণ। এই ব্যক্তের কারণ যে অব্যক্ত বা প্রধান (অর্থাৎ মূল প্রকৃতি) তাহাও ত্রিগুণ। কেন না যাহা কারণে নাই, তাহা সৎকার্য্য-বাদ অনুসারে কার্য্যে থাকিতে পারে না। ব্যক্ত ও অব্যক্ত 'ত্রিগুণ' হইলেও পুরুষ তাহার বিপরীত—পুরুষ ত্রিগুণাতীত। এই ত্রিগুণ ব্যতীত ব্যক্ত ও অব্যক্তের অন্য লক্ষণ আছে, তাহা এস্থলে উল্লেখের প্রয়োজন নাই। কারিকার শ্লোক এই—

"ত্রিগুণমবিবেকিক বিষয়ঃ সামান্যমচেতনং প্রসবধর্ম্মি।
ব্যক্তং তথা প্রধানং তদ্বিপরীত স্তথা চ পুমান্॥" (১১)

এই ত্রিগুণ সম্বন্ধে কারিকায় উক্ত হইয়াছে—

"প্রীত্যপ্রীতিবিষাদাত্মকাঃ প্রকাশপ্রবৃত্তি-নিয়মার্থাঃ।
অন্যোঽন্যাভিভবাশ্রয়-জনন-মিথুন-বৃত্তয়শ্চ গুণাঃ॥" (১২)।

অর্থাৎ সত্ত্বগুণ প্রীতি-আত্মক বা সুখাত্মক এবং প্রকাশ সমর্থ, রজোগুণ অপ্রীতি বা দুঃখাত্মক এবং প্রবৃত্তি সমর্থ, আর তমোগুণ বিষাদাত্মক ও নিয়ম বা স্থিতি সমর্থ। সত্ত্ব—সুখরূপ, রজঃ—দুঃখরূপ, ও তমঃ—বিষাদ-রূপ। সত্ত্ব—প্রকাশরূপ, রজঃ—প্রবৃত্তিরূপ বা ক্রিয়ারূপ, আর তমঃ—স্থিতিরূপ। ইহাই প্রত্যেক গুণের বিশেষ ধর্ম্ম। ইহাদের সাধারণ ধর্ম্মও আছে। এই তিন গুণ, অন্যোন্যাভিভব, অন্যোন্যাশ্রয়, অন্যোন্যজনন, অন্যোন্যমিথুন ও অন্যোন্য বৃত্তিযুক্ত।

অন্যোন্যাভিভব—অর্থাৎ পরস্পর পরস্পরকে অভিভূত করিয়া থাকে, অর্থাৎ প্রত্যেকে অপর দুইটাকে অভিভূত করিয়া অভিব্যক্ত হয়। যখন সত্ত্বগুণ প্রবল হয়, তখন রজঃ ও তমোগুণ আপনাপন বৃত্তিসহ অভিভূত হওয়া প্রীতি ও প্রকাশ স্বভাবে অবস্থিতি করে। যখন রজোগুণ প্রবল হয়, তখন সত্ত্ব ও তমোগুণ অভিভূত হওয়ায় অপ্রীতি ও প্রবৃত্তি ধর্ম্মে অবস্থিতি করে। যখন তমোগুণ উৎকট হয়, তখন সত্ত্ব ও রজোগুণ অভিভূত হওয়ায় বিষাদ ও স্থিতি ভাবে অবস্থিতি করে।

অন্যোন্যাশ্রয়,—অর্থাৎ পরস্পর পরস্পরের আশ্রিত, পরস্পর সম্বদ্ধ বা সংযুক্ত। কোন গুণই স্বতঃ কার্য্যকারী হয় না, কোন গুণই ভিন্নভাবে থাকিতে পারে না।

অন্যোন্য-জনন—অর্থাৎ একটী হইতে আর একটী উৎপন্ন হইতে পারে। মৈত্রায়ণী শ্রুতিতে আছে, অগ্রে 'তমঃ' ছিল, তাহা হইতে রজঃ উৎপন্ন হইয়াছিল, ও রজঃ হইতে সত্ত্ব উৎপন্ন হইয়াছিল। ইহা পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে। অতএব এক গুণ হইতে আর এক গুণ উৎপন্ন হইতে পারে। সত্ত্ব গুণের নিম্ন পরিণামে রজঃ ও রজোগুণের নিম্ন পরিণামে তমঃ উৎপন্ন হইতে পারে এবং তমোগুণও ক্রমে উর্দ্ধপরিণাম হেতু রজঃ এবং রজঃ হইতে সত্ত্বেরও উদ্ভব হইতে পারে। এইজন্য যাহার প্রকৃতি তমঃপ্রধান, সে ক্রমে রজঃপ্রধান হইতে পারে, এবং পরিণামে সত্ত্বপ্রধানও হইতে পারে। সেইরূপ যে সত্ত্বপ্রধান সে নিম্নপরিণাম হেতু রজঃপ্রধান, এমন কি, তমঃপ্রধানও হইতে পারে।

শ্রীদেবেন্দ্রবিজয় বসু।

নগেন্দ্রনাথ।

এক এক জাতীয় চরিত্র আছে—যাঁহাদের মনোবৃত্তি অগ্নির মত হঠাৎ দপ করিয়া জ্বলিয়া উঠে না; ক্রমে ক্রমে একটু একটু করিয়াই তুষাগ্নির মত ধিকি ধিকি জ্বলিতে থাকে। আর তাহার বেগও তেমন তীব্র ও প্রখর জ্বালাময় হয় না। অনুভূতি বলবতী কিন্তু তাদৃশ বেগবতী নহে। নগেন্দ্রনাথ এইরূপ চরিত্রের; তাঁহার মনোবৃত্তিও এইরূপ জাতীয়। যে তীব্র মনোভাব ও আকুলোচ্ছ্বাস মানুষকে বীভৎসকর্ম্মা দানব ও পুণ্যশ্রীমণ্ডিত অমর করিয়া তুলে, নগেন্দ্রনাথে তাহা ছিল না। গোবিন্দলালের মত লম্পট ও হত্যাকারী, কিম্বা প্রকৃত সন্ন্যাসী হইবার মত উপাদান তাঁহার ছিল না। ধর্ম্ম সমাজের দিকে না চাহিয়া কেবল মনোবৃত্তির টানে আপনাকে ভাসাইয়া দেওয়া তাঁহার প্রকৃতি নহে। বিধবা বিবাহের যুক্তি দ্বারা আপনাকে, কুন্দকে, পরিশেষ ধর্ম্ম ও সমাজকে সম্মত করিয়া বিবাহ করার চেষ্টা তীব্র অনুভূতি ও আকুলোচ্ছ্বাস বিশিষ্ট অধীর ব্যক্তির কার্য্য নহে। খুব বুদ্ধিমত্তা, ধৈর্য্য ও চাতুর্য্যের পরিচালনা আবশ্যক করে।

নগেন্দ্র, এই নামকরণ বড়ই সার্থক। নগেন্দ্র অর্থে পর্ব্বতরাজ। পর্ব্বতরাজ বুকের মধ্যে উত্তপ্ত পাষাণ রাজি রাখিয়া জ্বলিয়া পুড়িয়া খাক হইয়া গেলেও বড় সহজে

বিচলিত ও অস্থির হয় না। ভূমিকম্পের মত প্রবল আঘাত ব্যতীত টলে না; কিন্তু যখন টলে, তখন তদাশ্রয়জীবিত প্রাণিগণের পর্য্যন্ত সমূহ বিপদ। আবার দুই দিন পরে সে পর্ব্বত, সেই পর্ব্বত। নগেন্দ্রনাথও কত বর্ষ ধরিয়া কুন্দনন্দিনীর ভালবাসার আগুনে দগ্ধ হইতেছিলেন, উত্তপ্ত পাষাণখণ্ডের মত অস্থি পঞ্জরগুলি ধীরে ধীরে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে হৃদয়কুসুমশোষী তীব্র দাহের সৃষ্টি করিতেছিল। ভিতরকার তীব্র দাহ অনেক দিন বাহিরে প্রকাশিত ছিল না। অবশ্য সূর্য্যমুখীর মত স্ত্রী—যিনি হৃদয়ের শোণিত, জীবনের সর্ব্বস্ব, চিন্তায় বুদ্ধি—সেই পতিপ্রাণা সতী স্ত্রীর কাছে অপ্রকাশ ছিল না। নগেন্দ্রনাথ যখন যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াও কুন্দনন্দিনীর আকর্ষণ হইতে কোনমতেই আপনাকে রক্ষা করিতে পারিলেন না; তখন তিনি তিক্তস্বভাব, ক্রোধী ও সুরাপায়ী হইয়া পড়িলেন। কুন্দনন্দিনীর ভালবাসা ও রূপ মোহ ভূমিকম্পের মত নগেন্দ্রকে অসম্ভব রকমে পরিবর্ত্তিত করিল। ভূমিকম্পের পর যেমন তাহার ক্ষত চিহ্ন পর্ব্বত গাত্রে কিছু কিছু থাকিয়া যায়; নগেন্দ্রের জীবনেও কুন্দের স্মৃতিও চিরদিন ক্ষতের মত জাগরূক রহিল।

দেবনিন্দিত তনু, রাজার মত ঐশ্বর্য্য, সর্ব্বজনপূজিত চরিত্র আর সূর্য্যমুখীর মত প্রেমময়ী রূপবতী পত্নী—সংসারে যাহা কিছু আকাঙ্ক্ষিত—নগেন্দ্রনাথের সবই ছিল। এরূপ শুভাদৃষ্ট লইয়া সংসারে কয়জন জন্মগ্রহণ করে? দাম্পত্য-জীবনের স্নিগ্ধকরী ছায়ায় উপবিষ্ট থাকিয়া সূর্য্যমুখীর আদরে যত্নে ভক্তিতে সেবায় তাঁহার জীবন বড়ই সুখে কাটিতে লাগিল। কখন কুসুম-সুষমা-কুল বকুলকুঞ্জে বসিয়া, কখনও বসন্তের ছায়ালোকবিচিত্র গোধূলির বেলায় কমল-হাসিনী সরসীর অঙ্গে স্বপ্নালস সমীরণের ক্রীড়া দেখিয়া, কখনও বা পর্ব্বতশিখরে বেদির উপর তপশ্চরমাণ মহাদেবের সম্মুখে বসন্ত-পুষ্পাভরণময়ী পার্ব্বতীর বেশে সূর্য্যমুখীকে সাজাইয়া নগেন্দ্রনাথ নিত্য নূতন প্রেমলীলা অভিনয় করিতেন। দম্পতীর ভাগ্যে এত সুখ সহিল না। সুখের পর দুঃখ, দুঃখের পর সুখ না হইলে সংসারের বৈচিত্র্যময়ী খেলা যে চলে না। ত্রিংশৎ বর্ষ বয়সে নগেন্দ্র নিরাশ্রয়া কুন্দনন্দিনীকে লইয়া গৃহে ফিরিলেন। বিদ্যুল্লতা ভ্রমে বহ্নিশিখাকে সূর্য্যমুখী বরণ করিয়া লইলেন।

প্রকৃত ভালবাসা ও রূপ-মোহের সংঘর্ষে প্রায়শঃ রূপ-মোহই অগ্রে জয়ী হয়, কিন্তু দুই দিন যাইতে না যাইতে মোহ ছুটিয়া যায়, কিম্বা তেমন তীব্র থাকে না। প্রেম নিত্য নূতন ভাবে আপনাকে প্রকাশ করে, নিত্য নব নব সাজে দেখা দেয়। পরিণামে জয় প্রেমেরই হইয়া থাকে। ভালবাসা প্রেম। উহা শারদীয় চন্দ্রকিরণের মত নির্ম্মল, সুখস্পর্শ ও প্রিয়দর্শন। রূপ-মোহ কাম। উহা নৈদাঘ সূর্য্যকরের মত তীব্র, খরস্পর্শ ও রুক্ষদর্শন। রূপ-মোহ যত দিন না ভোগ হয়, ভোগের সম্ভাবনা জন্মে না, তত দিন উহার তীব্রতা অধিক। আর যখনই আয়ত্তের মধ্যে আইসে, ভোগ আরম্ভ হয়, তখনই তীব্রতা খুবই কমিয়া যায় বা একেবারেই ছুটিয়া যায়। আর প্রেম, যতই দিন যায়, ততই ঘনীভূত ও গাঢ় হইতে থাকে। প্রেম বহু দিনে নিবিড়বন্ধ এবং মোহশূন্য হইয়া ক্রমে খাদশূন্য স্বর্ণের মত নির্ম্মল ও বিশুদ্ধ হইয়া থাকে। অমর কবি আমাদিগকে

বুঝাইয়াছেন, "রূপবতীর রূপ ভোগলালসা, ভালবাসা নহে। যেমন ক্ষুধাতুরের ক্ষুধা অন্নের প্রতি প্রণয় বলিতে পারি না, তেমনই কামাতুরের চিত্তচাঞ্চল্যকে রূপবতীর প্রতি ভালবাসা বলিতে পারি না। সেই চিত্তচাঞ্চল্যকেই আর্য্য কবিরা মদনশরজ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।"

সংসারে প্রণয় বলিতে আমরা সাধারণতঃ দাম্পত্য প্রণয়ই বুঝি। যুবক যুবতীর দাম্পত্য প্রণয়ের মধ্যে যৌবনের মোহ, রূপ-ভোগলালসা ও চক্ষুর নেশার যোগ থাকেই। ঐ মোহ, লালসা ও নেশা বাদ দিলে খাঁটী প্রণয় কতটুকু অবশিষ্ট থাকে, বলা যায় না। স্বার্থপর, ভোগসর্ব্বস্ব ও ঐহিক কামনালোলুপ ব্যক্তি মাত্রেরই বিশেষতঃ যুবক যুবতীর ভালবাসা আর থাকেই না।

নীল আকাশে রমণীয় চন্দ্রকরচ্ছটা দেখিয়া সৌন্দর্য্যপ্রিয় মানব যেমন মুগ্ধ হইয়া প্রশংসা করে, নগেন্দ্রনাথও কুন্দনন্দিনীর অলোকসামান্য রূপপ্রভা দেখিয়া তদ্রূপ প্রশংসা করিয়াছিলেন। প্রেমময়ী সৌন্দর্য্যশালিনী পূর্ণযৌবনা পত্নী সূর্য্যমুখীরই বয়স তখন ষড়বিংশতি—তাই সে সময়ে ত্রয়োদশ বৎসরের বালিকা সরলপ্রাণা কুন্দনন্দিনীর উপর নগেন্দ্রনাথের স্নেহই জন্মিবার কথা। বিশুদ্ধ স্নেহের আকর্ষণ ব্যতীত অপর কোন আকর্ষণ নগেন্দ্রনাথের জন্মে নাই, ইহা আমরা নিশ্চয় বলিতে পারি। তবে কুন্দনন্দিনী যে কৈশোর বয়সে আপনার হৃদয়ের মধ্যে নগেন্দ্রনাথের মূর্ত্তি দেবমূর্ত্তির মত প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল, কোন আশা আকাঙ্ক্ষা না রাখিয়া যে তাঁহাকে একটু একটু ভালবাসিতে শিখিয়াছিল, আর সে ভালবাসা যে ভক্তি, শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা মাত্র, ইহা আমরা বলিতে পারি না। কুন্দনন্দিনী যে মনোভাব দেবকান্তি নগেন্দ্রনাথে অর্পণ করিয়াছিল, তাহাই ভবিষ্যতে বয়সের সঙ্গে উদ্দাম হইয়া দেখা দিল। আর নগেন্দ্রনাথের স্নেহ কুন্দনন্দিনীর দুঃখে গলিয়া গিয়া, রূপযৌবনের তাপে নূতন ছাঁচে প্রণয় ও রূপলালসায় পরিণত হইল। নগেন্দ্রনাথের স্নেহের আকর্ষণ এত কোমল মধুর, তাহা বস্তুতই প্রাণস্পর্শী। "কমল তাহাকে (কুন্দকে) লেখাপড়া শিখাইতেছে। কমল বলে, লেখাপড়ায় তাহার দিব্য বুদ্ধি। কিন্তু অন্য কোন কথাই বুঝে না। বলিলে বৃহৎ নীল চক্ষু আমার মুখের উপর স্থাপিত করিয়া চাহিয়া থাকে; কিছুই বলে না—আমি সে চক্ষু দেখিতে দেখিতে অন্যমনস্ক হই।"

অনাথার উপর অপরিসীম দয়া দেখিয়া কুন্দের অন্তর কৃতজ্ঞতায় ভরিয়া উঠে, দেবতুল্য রূপ দেখিয়া মুগ্ধও হয়। মায়ের স্বপ্ন মধ্যে মধ্যে মনে পড়িলেও বিশ্বাসই জন্মে না, উহা হইতে অনিষ্ট সম্ভব। কুন্দ হৃদয়পুটে রুদ্ধ ভালবাসা কখন কাহাকে জানিতে দেয় নাই, আশা আকাঙ্ক্ষার যোগ না হওয়ায় আপনার ভিতরে সে ভালবাসার কোন প্রভাব নিজেই বুঝিতে পারে নাই। সরলপ্রাণা বালিকার মত বুঝিবার মত অবস্থাও বুঝি হয় নাই, (ইহা অবশ্য বিধবা হইবার পূর্ব্বে, পরে সে অবস্থা হইয়াছিল)। কবিই শেষে একস্থানে বলিয়াছেন, "কুন্দের ক্ষুদ্র হৃদয় খানিতে নগেন্দ্রের প্রতি অপরিমিত প্রেম ছিল। বাল্যকালাবধি কুন্দ নগেন্দ্রনাথকে ভালবাসিয়া আসিয়াছিল। নগেন্দ্রকে পাইবার বাসনা করে নাই, আশাও করে নাই, আপনার নৈরাশ্য আপনি সহ্য করিত; কখন প্রকাশ করিত না। কিন্তু সে ভাল-

বাসা বিরুদ্ধ বায়ুর মত কুন্দের হৃদয়ে নিয়তই আঘাত করিত।" কুন্দ বস্তুতই কুন্দফুলের মত। (কুন্দনন্দিনী সমালোচনায় সে কথা পরে বুঝাইব)।

এক প্রকার ধরিয়া বাঁধিয়া তারাচরণের সঙ্গে কুন্দের বিবাহ দেওয়া হইল। কুন্দের সম্মতি কেহ লইল না, কুন্দ অসম্মতিও দেখাইল না। প্রস্তরময়ী মূর্ত্তির মত দিন কয়েক তারাচরণের গৃহে বসবাস করিল মাত্র। তার পর বিধবা হইল। সুখ হইল না, দুঃখও তেমন হইল বলিয়া জানি না। বিধবার সাজে কুন্দ নগেন্দ্রের অন্তঃপুরে আসিয়া রহিল।

এইবার নগেন্দ্রনাথের প্রাণ কুন্দের বৈধব্য বেশ দেখিয়া কাঁদিয়া উঠিল। স্নেহ তখন গলিতে আরম্ভ করিল। রূপ-যৌবনের আকর্ষণের তাপে স্নেহ ক্রমে ভালবাসার আকার ধরিল। আপনারই আনীত বনলতার সঙ্গে সঙ্গে যৌবনের বিকচ কুসুমগুলি ফুটিতে দেখিয়া নগেন্দ্রনাথ আত্ম-হারা হইতে লাগিলেন। বাল্যাবধি যে ভালবাসা কুন্দ নগেন্দ্রকে দিয়া আসিয়াছিল, তাহার প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হইল। কুন্দ অবশ্য নগেন্দ্রের প্রেমে প্রত্যক্ষ বা স্পষ্ট কোনরূপ আহুতি প্রদান করে নাই সত্য, কিন্তু সে অপ্রত্যক্ষ, অস্পষ্ট বা অজ্ঞাত ভাবেও কিছুই করে নাই, এমন কথা আমরা বিশ্বাস করিতে পারি না। রুদ্ধ প্রেম গোমুখীর ধারার মত নগেন্দ্রকে ভাসাইতে লাগিল। রূপলালসা বিষধরীর মত নগেন্দ্রের সর্ব্বাঙ্গ আবেষ্টন করিয়া রহিল। মদনের শর অবসর বুঝিয়া পরিপূর্ণ যৌবনে নগেন্দ্রনাথকে নূতন সম্মোহের মধ্যে আনিয়া ফেলিল। নগেন্দ্র নগেন্দ্রের মত স্থির অবিচলিত-স্বভাব হইয়াও আজ ভূমিকম্পের মত সে প্রবল বেগ দমন করিতে পারিলেন না। কুন্দ হইতে আপনার মনটীকে আকৃষ্ট করিবার জন্য অনেক চেষ্টা পাইলেন। কিন্তু উপরে কতকটা দমন করিলেন, কিন্তু ভিতরে তাহার বেগ আরও প্রবল হইতে থাকিল। নগেন্দ্রনাথ অবশ্য ধূলাবলুণ্ঠিত হইয়া ভগবানের কাছে কোনরূপ কান্না কাঁদিলেন না; কিম্বা নিজে প্রবাসে যাইয়া চক্ষুর আড়াল থাকিতেও চাহিলেন না। তিনি স্বয়ং জমীদার, আর তাঁর বয়সও পরিণত এবং বিধবাবিবাহ অসম্ভব নহে—ইত্যাদি কারণে নগেন্দ্রনাথের যত্নের শৈথিল্য জন্মে নাই। সূর্য্যমুখী কমলমণিকে যে পত্র লেখেন, তাহাতে আমাদের উপরোক্ত উক্তি সমর্থিত হইবে।

"তোমার সহোদরকে মন্দ বলিও না। আমি তাঁহার নিন্দা করিতেছি না। তিনি ধর্ম্মাত্মা, শত্রুতেও তাঁহার চরিত্রের কলঙ্ক এখনও করিতে পারে না। আমি প্রত্যহ দেখিতে পাই, তিনি প্রাণপণে আপনার চিত্তকে বশ করিতেছেন। যে দিকে কুন্দ-নন্দিনী থাকে, সাধ্যানুসারে কখন সে দিকে নয়ন ফিরান না। নিতান্ত প্রয়োজন না হইলে, তাহার নাম মুখে আনেন না। এমন কি, তাহার প্রতি কর্কশ ব্যবহারও করিয়া থাকেন। তাহাকে বিনা দোষে ভর্ৎসনা করিতেও শুনিয়াছি।"

নগেন্দ্রনাথ এক্ষণে সর্ব্বদাই অন্যমনা। কোন কথাই কাণে তুলেন না, জমিদারী তত্ত্বাবধান করেন না। অমন শীতল-স্বভাব ক্রমেই রুক্ষ, কোমল মনোবৃত্তি ক্রমেই কঠোর হইয়া আসিল। প্রজাবৎসল দয়াপ্রাণ নগেন্দ্র-নাথ একদিন বিপন্ন তিন চারি হাজার প্রজাকে তাহাদের আবেদন না শুনিয়াই

হাঁকাইয়া দিলেন। আদর্শচরিত্র পতি আজ মাতাল হইয়া সূর্য্যমুখীর কাছে দাঁড়াইতে লজ্জিত হইলেন না। সংসারে দেবতাও দানব, দানবও দেবতা হইয়া উঠে। নগেন্দ্রনাথ এমতই উন্মত্ত হইলেন যে, এত কালের সচ্চরিত্রতা, শিক্ষা, সূর্য্যমুখীর প্রতি প্রেম —সব ভুলিয়া একাকিনী কুন্দকে পাইয়া আপনার মনের অভিপ্রায় ব্যক্ত করিতে লজ্জা বোধ করিলেন না। প্রদোষে বাপীতটে চোরের মত কুন্দের পৃষ্ঠে হস্তার্পণ করিয়া নগেন্দ্রনাথ সহস্র মুখে অপরিমিত প্রেমপূর্ণ মর্ম্মভেদী কত কথা কহিতে লাগিলেন। এখন বিধবার বিবাহ চলিত হইতেছে "আমি তোমাকে বিবাহ করিব"—এইরূপ প্রলোভন দেখাইতে কুণ্ঠিত হইলেন না।

চোরের স্পর্শে বেপমানাঙ্গী, চোরের প্রেমে আপাদমস্তক অনুরঞ্জিতা কুন্দনন্দিনী সকল কথার উত্তরেই "না" বলিল। ভিতরটা জ্বলিয়া পুড়িয়া যাইতেছে, তথাপি সে নগেন্দ্রনাথের সমস্ত প্রস্তাবই "না" করিল। কমলমণির নিকট কিছুক্ষণ পূর্ব্বে কুন্দ পরের মঙ্গলমন্দিরে আপনার প্রাণের বলি দিতে, নগেন্দ্রের মঙ্গলার্থ সূর্য্যমুখীর মঙ্গলার্থ নগেন্দ্রকে ভুলিতে স্বীকার করিয়া আসিয়াছে। এত দিন ধরিয়া বাসনা পরিতৃপ্তি ও আশা পূরণের সম্ভাবনা নাই জানিয়া কুন্দ যে ভালবাসাকে হৃদয়পুটে নিবদ্ধ রাখিতে পারিয়াছিল, আজ তাহা গোমুখীর সহস্রধারায় তাহাকে ভাসাইবার উপক্রম করিল। হৃদয়কুসুমশোধিনী তৃষ্ণায় কুন্দের শুষ্ক কণ্ঠ একবিন্দু বারির আশায় উন্মুখ ছিল, নগেন্দ্র সেই শুষ্ক কণ্ঠে নবমেঘোজ্জ্বিত ধারা ঢালিয়া দিতে লাগিলেন; পিপাসু অধরের উপর বলপূর্ব্বক মোহকরী মদিরা আনিয়া উপস্থিত করিলেন। তথনও কুন্দ সেই বিশুষ্ক কণ্ঠ চাপিয়া রাখিয়া, লোলুপ অধরোষ্ঠ আবদ্ধ করিয়া প্রাণপণ শক্তিতে সে বৃষ্টিধারা ও সে মদিরা গ্রহণ করিতে চাহিল না। প্রেমিকের প্রেমলালসা বাড়াইবার জন্য কুন্দ যে রসজ্ঞানবতী চতুরা প্রণয়িনীর মত ছলনাময়ী নানা করিতেছিল, এ আমরা মানি না। "আবাধাস্থে মনসিজমপি ক্ষিপ্তকালাঃ কুমার্য্য" এতজ্জাতীয় কুমারীরা সময়ক্ষেপ করিয়া কেবল যে আপনারাই কষ্ট পায়, তাহা নহে, মদনকে পর্য্যন্ত কষ্ট দেয়; কুন্দ এই কুমারী-জন-সুলভ ঈদৃশ প্রবৃত্তির টানেই যে চলিয়াছিল, ইহাও আমরা বলি না।

তারপর সূর্য্যমুখী যখন স্বামীর মুখে শুনিলেন যে "তাঁহাতে আর তাঁহার স্বামীর সুখ নাই, তিনি এ সংসার ত্যাগ করিবেন। কুন্দনন্দিনীর সন্ধানে দেশদেশান্তরে ফিরিবেন। কুন্দনন্দিনীকে ভুলিতে পারিলে তবে ফিরিবেন। নচেৎ এই শেষ সাক্ষাৎ।" সূর্য্যমুখী তখন ইহা স্থির করিলেন যে, কুন্দকে পাওয়া যাইলে স্বামীর সহিত বিবাহ দেওয়াইবেন। নগেন্দ্র কুন্দকে বিধবা বিবাহ করিতে চান, ইহা সূর্য্যমুখীর জানা ছিল। তাই সূর্য্যমুখী আপনার বিবেকের বিরুদ্ধ বিধবা বিবাহ দিতে মনস্থ করিলেন। স্বামীর সুখের জন্য সূর্য্যমুখী ইহা অপেক্ষা অনেক কঠোর ও অন্যায় কার্য্য করিতে পশ্চাৎপদ ছিলেন না। এ বিবাহ দেওয়া সূর্য্যমুখীর আত্মবলি। কঠোর স্বার্থ ত্যাগ করিয়া এ বিবাহ দেওয়াইলেন, বিবাহে স্বামীর মুখে হাসি দেখিলেন। সূর্য্যমুখী সুখিনী হইলেন, কিন্তু সে দৃশ্য সহ্য করিতে পারিলেন না। সূর্য্যমুখীর মত সংসারিণী আদর্শ সতী রমণীও লোকচক্ষুতে হেয়, কুশিক্ষার দৃষ্টান্তস্থল সংসার

ত্যাগ করিলেন। ভগবানের বিচারে এ গৃহত্যাগ নিন্দনীয় নহে, কিন্তু সমাজের কাছে তাহা কুলত্যাগ বলিয়া বিবেচিত হইবে। নগেন্দ্রনাথ জমীদার না হইলে সূর্য্যমুখীকে চিরদিন সমাজে এজন্য খাট হইয়া থাকিতে হইত।

নগেন্দ্রনাথ কুন্দকে বিবাহ করিয়া পরম সুখী হইলেন। আরাধনার ধন আজ মিলিয়াছে। তাই তিনি বসিয়া বসিয়া মনে মনে "কুন্দ আমার, কুন্দ আমার স্ত্রী, কুন্দ কুন্দ কুন্দ" ভাবিতেছিলেন। দুষ্প্রাপ্য আজ করতলগতা হইল, দাহকর অগ্নি স্পর্শক্ষম রত্নরূপে কণ্ঠে স্থান পাইল।

সূর্য্যমুখী গৃহত্যাগ করিলেন। নানাদিকে অনুসন্ধান আরম্ভ হইল। সন্ধান আর মিলিল না। নগেন্দ্র ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। তখন তিনি মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিলেন যে, সূর্য্যমুখী তাঁহার কি ছিলেন। এখন সূর্য্যমুখীর অভাব তিনি বুঝিতে পারিলেন। "সূর্য্যমুখীর প্রতি প্রগাঢ় ভালবাসা দুই দিনের জন্য কুন্দনন্দিনীর ছায়ায় আবৃত ছিল। এখন সূর্য্যমুখীকে হারাইয়া নগেন্দ্রনাথ সে ভালবাসা বুঝিলেন। যতক্ষণ সূর্য্যদেব অনাচ্ছন্ন থাকেন, ততক্ষণ তাহার কিরণে সন্তাপিত হই, মেঘ ভাল লাগে, কিন্তু সূর্য্য অস্ত গেলে বুঝিতে পারি, সূর্য্যদেবই সংসারের চক্ষু। সূর্য্য বিনা সংসার আঁধার।

সূর্য্যমুখী গৃহত্যাগ না করিলে কুন্দনন্দিনীর প্রতি নগেন্দ্রনাথের চোখের ভালবাসা লোপ পাইত না সত্য, কিন্তু দিনকত পরে নিশ্চয় কমিতে আরম্ভ করিত। রূপ ভোগ লালসা ভোগ করিতে করিতে অনেকটা তৃপ্ত হইয়া যায়, পূর্ব্বেকার মত তীব্রতা থাকে না। সূর্য্যমুখীর গৃহত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে নগেন্দ্রনাথের অতটা রুক্ষ হওয়া ঠিক সাজে নাই। নগেন্দ্রনাথ স্বভাবতঃ এতদূর অব্যবস্থিতচিত্ত ছিলেন না। তবে এই মোহ যে তাঁহাকে কিছু দিনের জন্য অমানুষ করিয়াছিল, তাহা অস্বীকার করা যায় না। কুন্দনন্দিনীর জন্য নগেন্দ্রনাথ একরূপ মরিতে বসিয়াছিলেন, আবার সূর্য্যমুখী চলিয়া যাইবার সঙ্গে সঙ্গেই আবার সেই শোচনীয় অবস্থা। নগেন্দ্রনাথ, তোমাকে শতধিক! বিধবা কুন্দকে তুমিই যখন নরকের পথে টানিয়া আনিলে, তবে কি বলিয়া নিরপরাধাকে অতটা যন্ত্রণা দিলে! আর কুন্দ, হিন্দু গৃহের সতী লক্ষ্মীর মেয়ে তুমি, এত দিন ধরিয়া পর পুরুষকে পতিজ্ঞানে পূজা করিয়া আসিলে! কিন্তু যখন তোমার বিধবা বিবাহের আয়োজন হইতে লাগিল, তখন কৈ তোমার মনে কি সে সম্বন্ধে কোন স্পন্দনই উঠিল না? বালিকা বধূর মত নীরবে ঘোমটা দিয়া কনের আসনে গিয়া বসিলে! শতধিক তোমাকে, তোমার শিক্ষাকে! সেই আত্মহত্যা করিলে! দুই দিন আগে করিতে পারিলে না! তাহা হইলে আপনার কল্যাণই হইত।

নগেন্দ্রনাথের রূপ মোহ ছুটিয়া গেল। তিনি তখন "হা সূর্য্যমুখী, হা সূর্য্যমুখী" করিতে লাগিলেন। পরিপূর্ণ যৌবনে শিক্ষিত জমীদার দারুণ রূপ মোহে আকৃষ্ট হইয়া যে পাপ করিলেন, তাহার প্রায়শ্চিত্ত হইল, ভালই হইল। ধনী যুবক আজন্ম সুখে প্রতিপালিত, দুঃখ কাহাকে বলে জানেন না। লোভেও কখন পড়েন নাই, কাজেই লোভসংবরণের জন্য যে মানসিক অভ্যাস বা শিক্ষা আবশ্যক, তাহা তাঁহার হয় নাই। এই কারণেই নগেন্দ্রনাথ চিত্তসংযমে প্রবৃত্ত

হইয়াও সক্ষম হইলেন না। অমর কবি আমাদিগকে এই তত্ত্ব বুঝাইয়া দিয়া গিয়াছেন যে, অবিচ্ছিন্ন সুখ দুঃখের মূল। পূর্ব্বগামী দুঃখ ব্যতীত স্থায়ী সুখ জন্মে না।

তার পর কুন্দ আত্মহত্যা করিয়া সকল জ্বালা জুড়াইল। এদিকে নগেন্দ্র ও সূর্য্যমুখীরও মিলন হইল। নগেন্দ্রনাথই কুন্দর মৃত্যুর জন্য দায়ী। নগেন্দ্র, অভাগিনী কুন্দ যখন তোমাকে ভালবাসিয়া, তোমারই প্ররোচনায় তোমাকে বিবাহ করিয়া, আবার তোমারই কুব্যবহারে আহত হইয়া আপনার পারলৌকিক আত্মার অধোগতি করিল, তখন পরলোকে অবশ্যই ইহার ফল ভোগ তোমাকে করিতে হইবে! ইহলোকে যে নগেন্দ্রনাথ কোন সাজা পাইল না, অবশ্য এমত নহে। কুন্দের সেই আধিক্লিষ্ট মুখের মন্দ বিদ্যুন্নিন্দিত হাসি নগেন্দ্রের প্রাচীন বয়স পর্য্যন্ত হৃদয়ে অঙ্কিত রহিল। নগেন্দ্র ও সূর্য্যমুখীর মিলনের মধ্যে কুন্দের করুণ স্মৃতি অভিশাপের মত সর্ব্বদা জাগরূক রহিল। কুন্দের সে মৃত্যুচ্ছায়া-বিবর্ণ মূর্ত্তি নগেন্দ্র সূর্য্যমুখীর শয্যার মাঝখানে অমানুষী ছায়ার মত অবস্থিতি করিল। নগেন্দ্র সূর্য্যমুখীর অতীত জীবনের সহিত ভবিষ্যৎ জীবনের তুলনা করিলে ভবিষ্যৎ জীবনকে অভিশপ্ত জীবন বলিয়া বেশ বোধ হইবে। মানব-কবি ইহলোকে এই দণ্ড দিয়া তৃপ্ত হইলেন, কিন্তু বিশ্বের কবি পরলোকে যে কি দণ্ড দিয়া তৃপ্ত হইবেন, তাহা তিনিই জানেন। আমাদের শাস্ত্রমতে কুন্দের অনুষ্ঠিত দুইটী পাপই এক প্রকার অমার্জ্জনীয় অপরাধ। তথাপি আমরা ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি, অভাগিনীর অতৃপ্ত অসুখী আত্মা তৃপ্ত ও সুখী হউক। সরলা শিক্ষা দীক্ষাহীনা বুদ্ধিশূন্যা বালিকা বলিয়া সে ভগবানের ক্ষমা প্রাপ্ত হউক।

কুন্দের এই আত্মহত্যা ঘটাইয়া অমর কবি বঙ্কিমচন্দ্র যথার্থই দেশের উর্ব্বর ক্ষেত্রে বিষবৃক্ষের বীজ রোপণ করিয়া গিয়াছেন। কুন্দের আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া কত কুমারী, সধবা ও বিধবা আত্মহত্যাকে গৌরবের কার্য্য ভাবিয়া জীবন-নষ্ট করিয়াছে, তাহার দৃষ্টান্ত অপ্রচুর নহে।

তবে বিধবা বিবাহের ফল শুভ হইল না, ইহা দেখাইয়া কবি হিন্দুর আদর্শকে ম্লান করেন নাই, তজ্জন্য আমরা তাঁহার উপর কৃতজ্ঞ থাকিতে বাধ্য।

শ্রীরামসহায় বেদান্তশাস্ত্রী।

ঢাকার সাহিত্য সম্মিলন।

(১)

নানারূপ ব্যর্থতার মধ্যে ঢাকা-সাহিত্য-সম্মিলন শেষ হইয়া গিয়াছে। এক বছরের সংক্রান্তি এবং বর্ত্তমান নববর্ষের প্রথম দিন, এই দুই নৌকায় পা দিয়া সম্মিলন খাড়া হইয়াছিল। জলে পড়ে নাই,—তবে কতটা জলে পড়িবার মতন যে হইয়াছিল, এ কথাটী কেহই অস্বীকার করিবেন না বোধ হয়।

ঢাকাই সম্মিলনের একটু বিবরণ কাগজে পত্রে থাকা ভাল, তাই পুরাতন কথার একআধটু আলোচনা উচিত। যাহা এখানে প্রচারিত, সেই মূল কথাগুলি এই—

ঢাকায় দুইটী সাহিত্য সভা। একটীর

নাম সাহিত্য পরিষদ, আর দ্বিতীয়টীর নাম সাহিত্য-সমাজ। প্রথমটী দিনে দিনে পরিপুষ্ট এবং পক্ষপাতশূন্য হইয়া সাধারণের সম্পত্তি হইতেছে; আর দ্বিতীয়টী সর্ব্বগুণসম্পন্ন জনৈক শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির কর্ত্তৃত্বাধীনে রহিয়াও ভূতপ্রেতের বিভীষিকায় দোলায়িত। প্রথমটী সুন্দর ও শোভন হইয়া উঠিতেছে; দ্বিতীয়টী ব্যক্তিবিশেষের ইচ্ছায় যথা-ইচ্ছা চলিতেছে। আমরা কাহারও নিন্দা করিব না—আমরা ভিন্ন জিলাবাসী এবং সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ; আমরা দশ বিশ জনের নিকট যাহা শুনিয়াছি, যাহার ছায়া লক্ষ্য করিয়াছি তাহাই লিখিতেছি। (একটী সার্ব্বজনিক ও অপরটী যুগ্মজাতির সভা। এই ব্যবধান কেন?)

সাহিত্য পরিষদের পক্ষ হইতে সাহিত্য-সম্মিলনকে ঢাকায় আহ্বান করা হয়, এই অজুহাতে সাহিত্য-সমাজ এই সম্মিলন পণ্ড করিতে যত্নবান হইয়া উঠেন। মিঃ সি, আর, দাস পরিষদের সভাপতি। তিনি দূরে রহিয়াও পরিষদকে ভালবাসেন। তাঁহার অবসরের একান্ত অল্পতা থাকিলেও তিনি পরিষদের কাজ করেন। কিন্তু সাহিত্য-সম্মিলনটা কেবল পরিষদের হাতে নির্ব্বাহ হয়, এই আকাঙ্ক্ষা তাঁহার ছিল না। তিনি সকলের মিলনের ক্ষেত্রকে সঙ্কুচিত করিতে ইচ্ছুক ছিলেন না। তাই অপর পক্ষ একটু খাড়া হইয়া ভাবিলেন—সম্মিলন হইতে দিব না। একা পরিষদ—সাহিত্য সমাজের জন কয়েক লোক ছাড়া আর ঢাকার জনসাধারণকে লইয়া যে এই কাজ করিতে পারে, সমাজ তখন তাহা বুঝিলেন না। সুতরাং যখন মীমাংসার কথা উঠিল, তখন 'সমাজ' যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন। 'সমাজ'-সম্পাদক শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ভদ্র মহাশয় তাঁহার সেই আত্মপ্রাধান্য-লোলুপ পার্শ্বদগণকে থামাইয়া রাখিতে পারিলেন না। সুতরাং কয়েক দিন ধরিয়া সভায় সভায় লড়াই হইতেছিল। কেহ সাফ্ কহিলেন—"হোমরুলা'র দলের সি, আর, দাস এই সভায় আসিতেই পারিবেন না" কেহ কহিলেন, "সম্পূর্ণরূপে 'সমাজের' হাতে এই কাজ ছাড়িয়া দিতে হইবে।" এই লইয়া উভয় পক্ষে যে সকল রাসায়নিক ক্রিয়া হইয়াছে, তাহা ঢাকার জনগণ শীঘ্র ভুলিবে না।

অতঃপর সম্মিলন হওয়া ঠিক হইলে এক পক্ষ কহিলেন, অভ্যর্থনা-সমিতিতে মিঃ সি, আর, দাসকে আসিতে দিব না। তাঁহার অধীনে কোনও 'গবর্ণমেণ্ট-সার্ভেণ্ট' কাজ করিবে না। অপর পক্ষ কহিলেন, 'ভোট লও'। ভোটে মিঃ দাস,ই নির্ব্বাচিত হইলেন। তার পর বিধি ব্যবস্থার সূত্রপাত হইল। মিঃ দাস সভাপতি, মিঃ ভদ্র সম্পাদক। পরিষদের শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালী এম-এ ও সমাজের শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রনাথ বসু সহকারী সম্পাদক। কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতিতেও উভয় দলের দশ জন করিয়া লওয়া হইল। পরিষদের সম্পাদক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র গুহ এম্-এ, বি-এল সরিয়া দাঁড়াইলেন—শুধু মীমাংসার জন্য। উপেন্দ্রবাবুর এই ত্যাগস্বীকার ধন্যবাদের বহু উর্দ্ধে স্থাপিত।

এই ঝগড়াঝাটির সময় আমরা কয়েকটী লোককে লক্ষ্য করিলাম—ইহারা কোনও দলভুক্ত কি না, জানি না—কিন্তু তাঁহারা প্রাণপণে সম্মিলনকে সফল করিতে আকাঙ্ক্ষা করিতেন। যাহাতে কাজটী নির্ব্বিঘ্নে হয়, ঢাকার লজ্জার কারণ না হয়, ঈর্ষা দ্বেষ না থাকে—এই গুলি তাঁহাদের লক্ষ্য ছিল।

কিন্তু তাঁহাদের মত প্রধান ব্যক্তিরাও প্রবল ঝড়ের বিপক্ষে সহসা কিছু করিতে পারিলেন না। এই মধ্যবর্ত্তী দলে ছিলেন—রায়বাহাদুর মিঃ বি, এন, দাস এম-এ, ডাঃ নরেশচন্দ্র সেন এম-এ, বি-এল, শ্রীযুক্ত সূর্য্যকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় বি-এল, মিঃ আর, কে, দাস ব্যারিষ্টার প্রমুখ কয়েক জন মাত্র। আর নীরব ছিলেন, মহাত্মা শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ গোস্বামী মহাশয়।

কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতি বিভিন্ন বিভাগ করিয়া লইয়া কার্য্যারম্ভ করিলেন। কেহ পাণ্ডাল নির্ম্মাণে, কেহ খাদ্যাদি সংগ্রহ কার্য্যে, কেহ অর্থ সংগ্রহে, কেহ নিমন্ত্রণকরণ বিভাগে স্থান পাইলেন। পাণ্ডালের ভার পড়িল উকীল শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তীর উপর। তিনি অতি দক্ষতার সহিত তাঁহার কাজ করিয়াছেন। প্রতিনিধিগণের থাকিবার জায়গার, আহারাদি ও অভ্যর্থনার ভার লইলেন—বাবু সূর্য্যকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, বাবু অমৃতলাল চৌধুরী, বাবু রসিকচন্দ্র রায়, বাবু অনুকূলচন্দ্র শাস্ত্রী ও বাবু শশাঙ্ককুমার সেন প্রভৃতি। ইঁহারা অতিরিক্ত যোগ্যতার সহিত তাঁহাদের কাজ নির্ব্বাহ করিয়াছেন। বিশেষতঃ সূর্য্যবাবুর মত অক্লান্ত পরিশ্রমী লোক বড় দেখা যায় না। কিন্তু গোল উপস্থিত হইল মূল বিভাগে। যেখানে সম্মিলনের প্রধান সফলতা, যেখানে সম্মিলন, যাহা লইয়া সম্মিলন—প্রধান গোল রহিল সেই খানে। সাধারণ সম্পাদক সত্যেন্দ্রবাবু যে অক্লান্ত শ্রম করিয়াছেন—একটা লোকের পক্ষে এত খাটুনি বাস্তবিক বিস্ময়ের বিষয় বটে। সত্যেন্দ্রবাবু খাটিলে কি হইবে—এক দিক শৃঙ্খলা করিয়া আনিলে—আর একদিক বিশৃঙ্খল করিবার মত মানুষ তাঁহার তাঁবে ছিল। সহকারী সম্পাদক নলিনীবাবু জানাইলেন—'আমি পরীক্ষার কাগজ দেখিব, না সভার কাজ করিব?' তাঁহাকে বড় পাওয়াই গেল না। সত্যেন্দ্রবাবুর সঙ্গে ঠিক বনিবে কি না—এই মনে করিয়া পরিষদের লোকেরা কাজ করিতে বড় বেশী গা দিলেন না। সুতরাং কাজে গোল লাগিল খুব।

ঢাকায় সাহিত্যিকের এত দুর্ভিক্ষ লাগিয়াছে যে, প্রবন্ধ নির্ব্বাচনের ভার পড়িল, নবীন সাহিত্যসেবী শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ গুপ্তের উপর। যাহার নিজের হাতে দুই খানা পৃষ্ঠা লেখা কষ্টসাধ্য, যাহার বিদ্যাবত্তা ও জ্ঞান একান্তই সঙ্কীর্ণ গণ্ডীতে আবদ্ধ; সেই ব্যক্তি হইলেন প্রবন্ধ নির্ব্বাচনের সম্পাদক। যেখানে এমন দুর্ভিক্ষ, সেখানের অবস্থা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। গুপ্তকে প্রবন্ধ দেখাইয়া মঞ্জুর করাইয়া লওয়ার আকাঙ্ক্ষা দুই চারিজন অতি নূতন সাহিত্যসেবীর পক্ষে সম্ভব হইতে পারে। যাঁহাদের একটু আত্ম-মর্য্যাদা বোধ আছে, তাঁহারা প্রবন্ধ দিলেন না। আবার একটু মজা হইল—গুপ্তের সহকারী হইলেন, তিনটী দিক্‌পাল (১) ডাঃ নরেন্দ্রচন্দ্র সেন এম-এ, বি-এল, (২) 'প্রতিভা' সম্পাদক বাবু উমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম-এ, বি-এল (৩) বাবু কামিনীকুমার সেন এম-এ, বি-এল। অর্থাৎ বাঁশের চেয়ে কঞ্চি দড়। শুনিয়াছি, উমেশবাবু ঐ দিন হইতে ঘরের দরজা বন্ধ করিলেন—বাহির হইলেন না। কামিনীবাবু ও নরেশবাবু কি করিলেন, জানি না। তবে যোগেন্দ্রবাবু এক ট্রাঙ্কে প্রবন্ধ ভরিতে লাগিলেন। তাঁহার সহযোগী করিয়া লইলেন, অল্পবয়স্ক নবীন যুবক পরিমল কুমারকে। আমরা শুনিয়াছি, কোনও কোনও প্রবন্ধলেখক গুপ্তের হাতে

প্রবন্ধ না দিয়া কামিনীবাবু, উমেশবাবু ও নরেশবাবুর হাতে প্রবন্ধ দেওয়ায় গুপ্তরাজ ঐ সকল প্রবন্ধ হস্তগত করিয়া ঐগুলিকে বাতিল করিয়াছেন। বাস্তবিক যাহারা ঐ রকম অবাধ সম্রাট্—তাহাদিগকে যে অবজ্ঞা করে, তাহাদের শাসন হওয়া ত উচিত। শুনিলাম, এই দলে ময়মনসিংহবাসী সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য পড়িয়াছেন। তিনি গুপ্তের হাতে প্রবন্ধ দেওয়া অপমানজনক মনে করিয়া নাকি উমেশবাবুর নিকট একটী এবং কামিনীবাবুর নিকট একটী প্রবন্ধ প্রেরণ করেন। আমরা পূর্ণবাবুর এই আত্মবোধে বড়ই সুখী হইয়াছি। শুনিলাম, কুমিল্লা-নিবাসী সাহিত্যসেবী শ্রীযুক্ত বরদারঞ্জন চক্রবর্ত্তী, রাজসাহীর শ্রীযুক্ত কবি যতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য প্রমুখ অনেকেই এই মত অবলম্বন করিয়াছিলেন।

(২)

আমরা শনিবার বেলা দশটার সময় ইঞ্জিনিয়ারী স্কুলের হোষ্টেলে উপনীত হইলাম। স্বেচ্ছাসেবকগণ আমাদিগকে সাদরে উপরে লইয়া গেল। তার পর আদর আপ্যায়ন, জলযোগ, চা-যোগ হইল। স্নানাদি ও ষোড়শ উপচারে আহারাদি করিয়া নিদ্রার আশ্রয় গ্রহণ করিলাম। চাঁদপুর মেলে চট্টগ্রামের কবি—সাহিত্যশাখার সভাপতি বাবু শশাঙ্ক-মোহন সেন, কলিকাতা মেলে সাধারণ সভাপতি শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় সাঙ্গোপাঙ্গ লইয়া উপনীত হইলেন। মিঃ সি, আর, দাসও এই দিনই আসিলেন। সাল-তামামী ও হালখাতার সময় বলিয়া অনেকেই আসিলেন না। এজন্য ঢাকাবাসিগণ দুঃখিত হইলেন। তাঁহারা যত লোকের আহারাদির যোগাড় করিয়াছিলেন—তাহার অৰ্দ্ধেকও হইল না। প্রতিনিধির মধ্যে দেখিলাম, ময়মনসিংহের বাবু কেদারনাথ মজুমদারের দলে ৩০।৪০ জন মাত্র, আর ঐ জিলার অন্যান্য স্থান হইতে ১০।১২ জন হইতে পারে। চট্টগ্রাম বিভাগ হইতে ১০।১২ জন, উত্তর-বঙ্গের ৪।৫ জন—আর কলিকাতার ৫।৭ জন মাত্র।

আমরা বাসায় বসিয়াই নীলরঙ্গের 'প্রতিনিধি' ব্যাজ পাইলাম। অভ্যর্থনা সমিতির লাল 'ব্যাজ' ছিল। পাণ্ডালে গিয়া দেখিলাম, বৃহৎ হলটী লোকে পরিপূর্ণ। সেখানে সবুজ বর্ণের ব্যাজযুক্ত ব্যক্তিগণ মঞ্চের উপর সুখাসীন আছেন। এই ব্যক্তিগণের মধ্যে সভাপতিগণ, অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি, কলিকাতার প্রতিনিধিগণ, আর সেই সুবৃহৎ মঞ্চের উপর ঢাকার প্রধান ও অপ্রধান অনেকেই সবংশে বিরাজ করিতেছিলেন। সেই সবুজ ব্যাজে লিখিত ছিল—সভামঞ্চ। সভামঞ্চের উপর বসিবার সৌভাগ্য লাভ করিতে হইলে কিরূপ বিদ্যা, বুদ্ধি, ধন বা পদমর্য্যাদার প্রয়োজন, তাহা বুঝিলাম না। তবে যাহাদের বাড়ীর কাজ,তাহারা ইচ্ছামত চলিতে পারে বৈ কি ? তবে ভদ্র সম্পাদকের সম্পাদনে এই সম্মিলনে অমন—কাজটা বড়ই অশোভন হইয়াছে। উচ্চ আসন মাত্রেই শ্রেষ্ঠ বলিয়া যাঁহারা 'ঘাড় উঁচু' করিয়া সকলকে আপনার দৃপ্ত মুখমণ্ডল দেখাইতেছিলেন—তাঁহারা ঢাকা সহরেই হয়ত দেখেন যে, উচ্চস্থানে বসিলেই তাহার সম্মান করা হয় না। আমরা ময়মনসিংহে দেখিয়াছিলাম, মহারাজ কুমুদচন্দ্র, রাজা জগৎকিশোর প্রভৃতি ময়মনসিংহের শতাধিক শ্রেষ্ঠ লোক—মঞ্চের সম্মুখে শুধু মাটীতে বসিয়াছিলেন ; আমরা দেখিয়াছিলাম,চট্টগ্রামে যাত্রামোহন, শশাঙ্ক প্রভৃতিকে আসন ছাড়িয়া

দাঁড়াইতে, আমরা চুঁচুড়া, বর্দ্ধমান, যশোর প্রভৃতি স্থানেও ইহা দেখিয়াছি। কিন্তু দেখি নাই—ঢাকায়। যাহাদের মানের নাড়ী কিছু সজাগ, তাহারাই জয়ী হয় বটে।

সুকণ্ঠ গায়ক আচার্য্য চন্দ্রনাথ রায় একটী 'স্বাগত' সঙ্গীত গান করিলে কবিতা পাঠ আরম্ভ হইল। ঢাকার 'কবি' উপাধিধারী সকলেই কবিতা লইয়া খাড়া হইলেন। প্রথমে শ্রীমান্ পরিমলকুমার ঘোষ—তার পর শ্রীমান্ শ্রীপতিপ্রসন্ন ঘোষ, তার পর শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালী, এক কবিতা লইয়া তাঁহার শালপ্রাংশু-দেহ মঞ্চের পুরোভাগে দাঁড় করাইয়া দিলেন। আমরা শুনিয়াছিলাম, নলিনীবাবু ঐতিহাসিক এবং মিউজিয়মের কর্ত্তা। ইট, পাথরে কবিতা গজায় কি না, এই চিন্তা করিতেছিলাম—তখন নলিনীবাবু কহিলেন, কবিতাটী মহিলা কবি শ্রীমতী বিভাবতী সেনের। সকলেই কবিতা পড়িল—সুতরাং আমাদের প্রবন্ধনির্ব্বাচন-সমিতির সম্পাদক তাড়াতাড়ি এক টুকরা ছিন্ন কাগজ লইয়া পেন্সিল দিয়া কয়েকটী লাইন লিখিলেন। উহাও হইল কবিতা। উহা নির্ব্বাচন হয়ত তখনই হইল। গুপ্ত কবি উহা পাঠ করিলেন। আমরা তাঁহাকে একজন বড় ঐতিহাসিক (?), সাহিত্যিক, দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক, নাট্যকার, ঔপন্যাসিক প্রভৃতি বলিয়া জানিতাম। আজ জানিলাম, তিনি কবি। হায় রে সর্ব্বতোমুখী প্রতিভা!

কবিতা পাঠের পর অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি মিঃ সি, আর, দাস, অতিথিগণকে আবাহন করিলেন। তাহাতে বিনয়, সৌজন্য, সহৃদয়তা ছিল; কিন্তু সার্ব্বজনিকতা ছিল না। তিনি 'পদ্মা পারের' যাত্রীকেই বরণ করিলেন, আর যাহারা 'সারাপুল' হইয়া আসিয়াছেন—ময়মনসিংহ, কুমিল্লা হইতে আসিয়াছেন, তাহাদিগকে কিছু কহিলেন না।

তার পর মিঃ আর, কে, দাস, শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, শ্রীযুক্ত শশাঙ্কমোহন সেন, শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ বেদান্তসাংখ্যতীর্থ, শ্রীযুক্ত রামপ্রাণ গুপ্ত, মিঃ ডি,এন,মল্লিককে সভাপতি প্রস্তাব করিলেন। ভারতবর্ষ-সম্পাদক প্রবীণ সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত জলধর সেন উহা সমর্থন করিলেন। তবে জলধরবাবু এক ক্ষুরেই সকলের মাথা মুড়াইয়াছেন। অর্থাৎ তিনি কেবল হীরেন্দ্রবাবুকেই সভাপতি পদে সমর্থন করিলেন। শাখাবিহারীগণের কথা উল্লেখও করিলেন না। আমরা বুঝিলাম—বাহাদুর বটে! তার পর শ্রীমতী সরলাদেবী 'অয়ি ভুবন মনোমোহিনী' গানটী গাহিলে—সভাপতির অভিভাষণ হইল। আমরাও বাসায় আসিলাম।

রাত্রি ১০৷৷০ টার সময় এই খানেই এক কমিটীর অধিবেশন হইল। তন্মধ্যে দুইটী নূতন এবং হিতকর প্রস্তাব হইল। একটীর উপস্থাপক ডাঃ নরেশচন্দ্র সেন। তিনি বলিলেন—সাহিত্য-সম্মিলনে যাঁহারা উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ লিখিবেন, তাঁহাদিগকে পুরস্কার দেওয়ার ব্যবস্থা হইল—স্থায়ী সাহিত্য পাওয়া যাইবে। সেই পুরস্কার এক হাজার টাকার কম না হওয়া উচিত। দ্বিতীয় প্রস্তাব তুলিলেন, কুমিল্লার শ্রীযুক্ত বরদারঞ্জন চক্রবর্ত্তী। তিনি বলেন, ছাত্রবৃত্তি ও মাইনর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া রেভিনিউ এজেন্ট এবং মোক্তার হওয়া যাইত। পুনরায় সেই নিয়ম প্রচলনের জন্য গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করা হউক।

দ্বিতীয় দিন।

প্রাতঃকালেই ইতিহাস-শাখার অধিবেশন

হইল। এই শাখায় আমাদের কলিকাতার অন্য বন্ধুগণকে দেখিলাম না, কেবল নগেন্দ্র-বাবুই দর্শন দিয়াছিলেন। ইতিহাস শাখায় উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধের বড় অভাব ছিল। তবে যাঁহারা অভিনয় দর্শনে আমোদ পাইয়া থাকেন, তাঁহারা শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ গুপ্তের পঠিত 'চিতোর অবরোধ' শীর্ষক প্রবন্ধে বিকট চীৎকার, অঙ্গভঙ্গি এবং স্বরসাধনের প্রক্রিয়া লক্ষ্য করিয়াছেন। ছিঃ, এমন করিয়াই কি সভার সময় নষ্ট করিতে হয়! শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রনাথ বসুর পঠিত তিব্বতী প্রবন্ধ ও বাবু সতীশচন্দ্র মিত্র-লিখিত কেবল অনুস্বরে পূর্ণ,—উহাতে বড় বেশী মাল মশলা পাই নাই।

ঝাঁ ঝাঁ রৌদ্রে বিজ্ঞানের বৈঠক বসিল। বেলা তখন ১টা। দর্শক ও শ্রোতা বড় বেশী ছিল না। এই শাখায় শ্রীযুক্ত অনুকূলচন্দ্র সরকারের প্রবন্ধ অতি উপাদেয় এবং মূল্যবান ছিল। অন্যান্য প্রবন্ধে বিশেষ কিছু ছিল না।

৩টার সময় শাখা সাহিত্যের অধিবেশনের সুরু হইল। শশাঙ্কবাবুর অভিভাষণ সুদীর্ঘ হইয়াছিল। তৎপর প্রবন্ধ পাঠ আরম্ভ হয়। বহু ভাল প্রবন্ধ—ঢাকাবাসীর লেখা নয় বলিয়াই বোধ করি—পেছনের দিকে পড়িল এবং কতকগুলি অকর্ম্মা কবিতা প্রথম দিকে পড়িল। প্রবন্ধের মধ্যে বাবু গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরীর 'কবি গোবিন্দ দাস' বাবু জলধর সেনের 'ছোট গল্পের প্রকৃতি' যতীন্দ্র প্রসাদের কবিতা 'এই কি মোদের দেশ ?' উল্লেখযোগ্য। তারপর শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য নলিনীবাবুকে লিখিয়া জানাইলেন "আমি প্রবন্ধ পাঠ করিব না।" কারণ গুন্ধরাজ পূর্ণবাবুর প্রবন্ধ বাছিল করিবার জন্যই চেষ্টিত ছিলেন। পরে উহা সকলের শেষে ফেলিয়া রাখিলেন। যাঁহারা মনে করেন, সভায় প্রবন্ধ পাঠ করিলে স্বর্গলাভ হয়, তাঁহারা পূর্ণবাবুর দৃষ্টান্ত দেখিয়া সুখী হইবেন।

এদিকে ল-কলেজ গৃহে দর্শন-শাখার অধিবেশন হইল। এখানে শ্রীযুক্ত অভয়-কুমার গুহ, ও ডাঃ নরেশচন্দ্র সেনের প্রবন্ধ বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

তার পর সাধারণ সভার অধিবেশন হইল। কতিপয় প্রস্তাব গৃহীত হইল। তার পর ধন্যবাদের পালা পড়িল। সভা ভঙ্গ হইল।

এবার সম্মিলনে প্রবীণ সাহিত্যিকের অত্যন্ত অভাব ছিল। কতিপয় ছেলে ছোকরার বাহার দেখিয়া অনেকেই সুখী হন নাই। প্রবীণের হাত হইতে সকল রশ্মি উহাদের হাতে ছাড়িয়া দেওয়া কি ভাল হইয়াছে ?

আমরা এই বার ঢাকার ব্যারিষ্টার মিঃ আর, কে, দাসকে ধুতি চাদরে শোভিত দেখিয়া সুখী হইয়াছি। তিনি বোধ হয় এই বার সর্ব্ব প্রথম দেশী পোষাক পরিলেন। তাঁহাকে ধন্যবাদ দিতেছি। ডাক্তার মিঃ এন, সি, গুহও ধুতি, চাদর পরিয়া আসিয়াছিলেন। মিঃ পি, কে, বসু ব্যারিষ্টার ও আর দুই একটী লোক, তাঁহাদিগকে চিনি না—সাহেবী পোষাকে আসিয়াছিলেন।

আগামী বৎসর কোথায় সম্মিলন হইবে, জানি না।

কয়েকটী কথার কথা।

(১) শিবশূন্য যজ্ঞ আর ঢাকায় কবিবর গোবিন্দচন্দ্র দাস মহাশয়কে বাদ দিয়া সাহিত্য-সম্মিলন! কবি বলিয়াছেন—হীরার ধার সব জায়গায় ঠিক কার্য্যকরী হয় না।

গোবিন্দবাবুর মর্য্যাদা অনুভব করিবার মত লোকও যে ঢাকায় নাই, আমাদের এই এক বিরাট দুঃখ। ঢাকায় যে কয়েকটী নব্য কবীশ দাঁড়াইয়াছেন, তাঁহারা হয়ত ভাবেন, সেই বুড়াকে আবার কেন? কিন্তু আমরা অবাক্ হইয়াছি যে, ঢাকার পরিষদ এবং সমাজে কি এমন লোক ছিলেন না, যাঁহারা কবিবর গোবিন্দকে সভায় নিমন্ত্রণ করার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন? এই কি ঢাকা! আমি কোনও বিশ্বস্ত বন্ধুর নিকট শুনিয়াছি, ময়মনসিংহের কেদারবাবু সম্মিলন-সম্পাদককে পত্র দিয়াছিলেন যে— 'স্বাগত কবিতাটী যেন কবি গোবিন্দবাবুকে দিয়া লেখান হয়।' আজ যদি গোবিন্দ দাস ২।৪।৮ শত টাকা দিতে পারিতেন, তবে হয় ত তাঁহার নিমন্ত্রণ হইত। কিন্তু হায় কবি! টাকা ছাড়া ফাঁকা কথার সম্মান এখন সব জায়গায় নাই। বিশেষতঃ ঢাকায়!

(২) সর্ব্বত্র সম্মিলনেই পরিষদের সকল সভ্যকে নিমন্ত্রণ দেওয়া হয়। কলিকাতার সাহিত্য-পরিষদ তাঁহাদের সকল সভ্যকে পত্র দিয়া নিমন্ত্রণ করিয়াছেন। কিন্তু ঢাকার সাহিত্য-পরিষদ ও সমাজ—ঢাকার সভ্যগণকেও নিমন্ত্রণ করেন নাই। মফঃস্বলের সাহিত্য-সমাজ যতজন ইচ্ছা প্রতিনিধি প্রেরণ করিতে পারেন, কিন্তু সহরের সভার সেই অধিকার নাই। যদি সমাজ ও পরিষদের প্রতিনিধি পর্য্যন্ত হওয়ার আশা না থাকে, তবে টাকা দিয়া সভ্য হওয়ার কাজ কি? আমরা জানি, ঢাকা-প্রবাসী বহু পরিষদ ও সমাজ প্রতিনিধি সভায় যান নাই। ইহাতে আবার একটু মজা আছে,—কাজের বেলায় সকল সভ্যকে নিমন্ত্রণ দেওয়া হয় নাই,—কিন্তু টাকা আদায়ের জন্য 'এসো, অভ্যর্থনা-সমিতির সভ্য হও', বলা হইয়াছে। অর্থাৎ ভোট দেওয়ার বালাই আর এখন নাই।

(৩) সর্ব্বত্রই দেখিতে পাই, অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি, সাম্মলনের সম্পাদক এবং স্থানীয় প্রধান কর্ত্তৃপক্ষ প্রতিনিধিগণের বাসায় গিয়া শিষ্টাচার প্রদর্শন করিয়া থাকেন। আমরা কিন্তু একদিন মিঃ ভদ্রকে দেখিয়াছি। কিন্তু মিঃ সি, আর, দাসকে দেখিবার সৌভাগ্য আমাদের হয় নাই। অন্যান্য ঢাকাই ভদ্রলোক—যাঁহারা সভা সমিতিতে কোট বজায় রাখিতে খুব অগ্রণী ছিলেন—তাঁহাদিগকেও দেখি নাই। ইহারই নাম বুঝি ঢাকাই সভ্যতা!

(৪) চিত্র শিল্পীদিগের প্রতি ঢাকার সম্মিলনে কোনও সুযোগ্য (?) কর্ম্মকর্ত্তা যে উক্তি করিয়াছেন, তাহা অতি অদ্ভুত। কোনও সাহিত্যসেবী বলিয়াছিলেন—বিখ্যাত চিত্রকর বাবু সারদাচরণ উকীল —যিনি ভারতবর্ষ, ভারতী প্রভৃতিতে ছবি দিয়া যশস্বী হইয়াছেন, তিনি এখানে উপস্থিত হইয়াছেন। তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করা হউক। ঢাকাই তথা-কথিত কোনও নেতা (?) সাহিত্যিক বলিয়া উঠিলেন, 'সাহিত্যক্ষেত্রে চিত্র-শিল্পিকে নিমন্ত্রণ করিলে ত কামার কুমারকেও নিমন্ত্রণ করিতে হয়।'

সারদাবাবুর সম্মুখেই কথাটী বলা হইয়াছে। জানি না মিঃ সি, আর, দাস ইহার জন্য কোনও প্রতীকার করিয়াছেন কি না। চিত্রকরের সঙ্গে কর্ম্মকার, কুম্ভকারের কি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে, তাহা 'ঐতিহাসিক ও প্রত্নতাত্ত্বিক'ই বলিতে পারেন। যে দেশে U. Ray, শশি হেস, ভবানী লাহা, অবনীন্দ্র নাথ, নন্দলাল, নরেন্দ্র সরকার প্রভৃতি কীর্ত্তিমান, সেইদেশে ঢাকার মত স্থানেরও

এক নগণ্য ক্ষুদ্রাশয় ব্যক্তি দুই জনের সমক্ষে এরূপ কথা উচ্চারণ করিল! শুনিয়াছি, সারদাবাবু প্রতীকারপ্রার্থী হইবেন, হওয়াই ত উচিত। যাহারা উদ্ধত, তাহাদের প্রতি ব্যবস্থা রুক্ষ হওয়াই কর্ত্তব্য।

(৫) সাহিত্য শাখার সভাপতি বাবু শশাঙ্কমোহন সেনের অভিভাষণ একটু দীর্ঘ হওয়ায়, কোনও যুগন্ধর ব্যক্তি এক টুকরা কাগজে ঐ অভিভাষণ খর্ব্ব করিতে অনুরোধ করেন। ঐ কাগজ খণ্ড মিঃ সি, আর, দাসের হাত দিয়া সাধারণ সভাপতি বাবু হীরেন্দ্রনাথ দত্তের হাতে পৌঁছায়। হীরেন্দ্র বাবু তাহাতে লিখিয়া দেন—

"Beyond my power."

সভাপতির অভিভাষণ দীর্ঘই হউক আর হ্রস্বই হউক, তাহার উপর রেখাপাতের স্পর্দ্ধা আর কোনও দিন শুনি নাই, এখানে আসিয়া শুনিলাম বটে।

উপসংহারে আমরা ঢাকার সম্মিলন, যাঁহাদের আন্তরিক চেষ্টায় হইয়া গিয়াছে। তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।

শ্রীরোহিণীকুমার গোস্বামী।

অনুচ্চজাতি ও স্বায়ত্তশাসন। (২)

যে দেশবাসী স্বদেশীয় দ্বারা শাসিত নয়, রাজদরবারে যাহাদের উচ্চাধিকার নাই, তাহারা সজীব হইতে পারে না। তাহাদের মধ্যে কোনও প্রকার সংস্কার বা পরিবর্ত্তনকে সফল করিয়া তোলা সহজসাধ্য নহে। তাহারা অধঃপাতের দিকে দ্রুত চলিতে পারে, উন্নতির দিকে পারে না। আত্মশক্তির প্রতি তাহাদের বিশ্বাস থাকে না, কাজেই তাহাদের দ্বারা কোন মহৎ কার্য্য সম্ভবে না। স্বনামধন্য পণ্ডিত সখারামগণেশ দেউস্কর মহাশয় ডাঃ ডারুইনের মত উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন যে, পরাধীন জাতি ক্রমশই সর্ব্ব বিষয়ে হীন হইয়া যায়, কিন্তু ইহার পরিষ্কার কারণ কিছু ধরা যায় না। আশ্চর্য্য এই যে, এ দেশের অনেক সুশিক্ষিত লোকেরও বিশ্বাস এই যে, লোকেরা আগেই দেশকে দোষশূন্য করিবে, তবে স্বায়ত্তশাসন পাইবে। রোগের যেটী প্রকৃত ঔষধ, রোগ সারিলে সেইটী দেওয়া হইবে, ইতিপূর্ব্বে নয়। এই শ্রেণীর লোকের মত এই যে, সাঁতার শিখিয়া তবে জলে নামিতে হইবে। জলে নামিয়া দু' চারিবার হাবুডুবু না খাইলে যে সাঁতার শেখা যায় না, সে কথা ইঁহারা ভুলিয়া যান।

যত দিন দেশে স্বায়ত্তশাসন প্রবর্ত্তিত না হইবে, তত দিন ব্রাহ্মসমাজ, হিন্দু সমাজ, মুসলমান সমাজ, উচ্চ হিন্দু, অনুচ্চ হিন্দু, কাহারই উন্নতির আশা নাই। নিম্ন শ্রেণীকে যে তুলিয়া লইবে, সে সাহস কোথা হইতে আসিবে? সে উৎসাহ কে আনিবে? পূর্ব্বের কথা ছাড়িয়া দিলাম, মুসলমান আমলে যখন বাঙ্গালা দেশে ১২ ভুঁইয়ার রাজত্ব ছিল, তখন এ দেশে প্রতাপাদিত্য, কন্দর্পরায়, সীতারাম, চাঁদরায়, কেদার রায়, ইশা খাঁ, রাজা গণেশ—প্রভৃতি হিন্দু মুসলমান বীরগণ, রামপ্রসাদ, ভারতচন্দ্র, চণ্ডীদাস, গোবিন্দ-

দাস, কাশীরাম, কৃত্তিবাস, ঘনরাম, বসন্ত রায়, রায়শেখর প্রভৃতি অসংখ্য কবি; রঘুনাথ, গদাধর প্রভৃতি নৈয়ায়িক, রঘুনন্দন, কৃষ্ণানন্দ প্রভৃতি ধর্ম্মশাস্ত্রকার, মহাপ্রভুর ন্যায় ধর্ম্মসংস্থাপক আবির্ভূত হইয়াছিলেন। ১২ ভুঁইয়ার আধিপত্যের সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালা দেশের সমস্ত প্রতিভা নিভিয়া গিয়াছে। ইংরাজ রাজ্য-কাল শুধু অনুকরণের যুগ। জাতিটা আপন পথে ছুটিতেছে না, জাতীয় জীবন স্রোত আপন ধারায় বহিতেছে না, এ সমস্তই থিয়েটারের সাজ, পরানো পোষাক। পাদ্রীরা যেমন সাঁওতাল ও কোল জাতিকে বাঙ্গালী সাজাইয়াছে, আমরাও সেইরূপ "পাশ্চাত্য সভ্য" সাজিতেছি। কবি গাহিয়াছেন,—

"নাচের পুতুল হয় কি মানুষ
ধরলে উঁচু করে ?"

এ কথাটা আমরা ভুলিয়া যাই! যতদিন দেশে স্বায়ত্তশাসন না আসিবে, ততদিন অনুচ্চ শ্রেণীর সামাজিক সম্ভ্রম লাভের আশা নাই, কে সাহস করিয়া তাহাদিগকে ধরিয়া তুলিবে? কোথা হইতে সাহস আসিবে? ব্রাহ্মমতাবলম্বী ত ঢের লোক আছে, তারা ব্রাহ্ম হয় না কেন? সাহস কই? উৎসাহ কই? গোড়া কাটা গাছ, ফলের প্রত্যাশা করা বৃথা।

ইংরাজ আমাদিগকে হাতে ধরিয়া স্বায়ত্তশাসন দিবে কি না, ঘোর সন্দেহের কথা। ইংরাজের সমস্ত স্বার্থ বজায় রাখিয়া কিরূপ স্বায়ত্তশাসন দেওয়া যায়, এরূপ পন্থা কেহই বাহির করিতে পারেন নাই, তবে স্বায়ত্তশাসন ভারতের না হলেই নয়। এজন্য যে সকল লোক প্রকৃত দেশহিতৈষী, এবং তথাকথিত অনুচ্চ জাতির মধ্যে যাহাদের চক্ষু ফুটিয়াছে, তাহারা সমাজের সঙ্গে ঝগড়া না করিয়া স্বায়ত্তশাসন জিনিষটা কি, জনসাধারণকে তাহা বুঝাইতে চেষ্টা করুন। স্বায়ত্তশাসনের বিরোধীগণ যে ঘোড়ার চালে আমাদিগকে মাৎ করিতে চায়, সে চালটাই যে ভুল, তাহা সকলকে দেখাইয়া দিউন; তাহাদের কথার সমর্থন ক'রে তাদের কাছেই উপহাসাস্পদ হইতেছেন, তারা মুখে তাদের সমর্থকদিগকে ভাল বলে, পরস্পর বলাবলি করে যে বাঙ্গালীর কি বুদ্ধি! আগে দেশটা উন্নত হবে, তবে স্বায়ত্তশাসন পাবে, যুদ্ধ শিখে তবে সৈন্য হবে, আগে খাবে তার পর বাঁধিবে।

পঁচিশ বৎসরে জাপান একটা শ্রেষ্ঠতম শক্তি হয়েছে, যদি ৫০ বৎসর আগে পাশ্চাত্য শক্তিদিগের ভাগবাটারায় বনিত, তবে জাপানকে নিশ্চয়ই পরাধীন হইতে হইত, এই ৫০ বৎসরে সে সর্ব্ব শক্তি হারাইত। প্রাণটুকু ছিল বলিয়াই চিকিৎসা চলিয়াছে, আমরা সেই প্রাণটুকু চাই, ভগবান তাহা না দিলে পাওয়ার উপায় নাই। তথাপি যাহাতে বুঝিতে ভুল না হয় এবং বিচ্ছিন্ন হইয়া শক্তি নষ্ট না করি, সে দিকে দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য।

প্রথম যৌবনে অনেকেরই কবি হইতে ইচ্ছা করে, আমিও তখন একখানি কাব্য লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলাম। আমার কাব্যের বিষয় ছিল, প্রায় ভারত উদ্ধার। কিন্তু ভারত-উদ্ধার করিতে যাইয়া গোড়ায় গলদ দেখিলাম, জাতি গঠনের উপায় কি? সকলকে উৎসাহ দিয়া ডাকিলে কি একতা জন্মিবে? তখন বাঙ্গালী কবি শিঙ্গা বাজাইয়া সকলকে ডাকিলেন, সকলেই পড়িল, তারিপ করিল, কিন্তু দু'জন এক মন্ত্রে মিলিল না,

এমন করিয়া কি মিলন হয়? ইহার পরে বাঙ্গালার কাব্যাকাশে রবির উদয় হইল, তিনি একটা মমতার সম্পর্ক ধরিয়া ডাকিলেন! হেমচন্দ্র বলিলেন, এসো ভাই, সকলেই জাগ, না জাগিলে তোমাদের শত ধিক্, তিনি ইজ্জতের নামে ডাকিলেন। আর রবীন্দ্রনাথ মায়ের নামে সকলকে ডাকিলেন,

"একবার তোরা মা বলিয়ে ডাক্
জগত জনের শ্রবণ জুড়াক্
হিমাদ্রী পাষাণ কেঁদে গলে যাক্
মুখপানে একবার চাহরে"।

কি মর্ম্মভেদী ডাক? ভাইদিগের মধ্যে যদি শত বিরোধও থাকে, তবু মায়ের দুঃখে কি সকলে মিলিয়া "মা" "মা" বলিয়া ডাকে না? এই একবারের ডাকে কি যুগান্তরের বিচ্ছেদ মিটিয়া যায় না? কিন্তু এই অতি ক্ষুদ্র লেখকের, এই অ-কবির প্রাণের দুঃখ কিছুতেই মিটিল না। "এসো মিলিত হই" বলিলে মিলন হয় না। "এসো আমরা ভগবানকে ভক্তি করি" বলিলে ভক্তি হয় না, "এসো আমরা সবলে ভাল হই" বলিলে ভাল হওয়া যায় না। তাই রাজনীতিক ক্ষেত্রে সুরেন্দ্রনাথ প্রায় ৪০ বৎসর ভেরী বাজাইয়াছেন, সাহিত্য-ক্ষেত্রে কত মহারথী হুঙ্কার করিয়াছেন, কাব্য-মন্দিরে কতই দীপক, কতই ভঁয়রো, উদ্দীপ্ত করিয়াছে, কাঁদাইয়াছে, লোকেরা সমস্তটা শুনিয়াছে, কিন্তু তাহাদের ভাবের পরিবর্ত্তন ঘটে নাই। কেন ঘটে নাই? সেই প্রথম যৌবনের প্রশ্ন আজ মনে পড়িতেছে।

শাখাতে বাঁধিয়া রজ্জু, টানিলে বাড়ে তরু
মূল হ'তে সে যদি না উঠে
নখরে খুঁটিলে কিহে, অঙ্কুর গজায় কভু,
বীজ হ'তে সে যদি না ফুটে?

বাঙ্গালা দেশে আজিও এ প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায় নাই। কি করিলে একটী জাতীয়-মণ্ডলী ফুটিয়া উঠিবে, কোন্ বীজ হইতে উহা জন্মিবে, এ দেশে সে বীজ কিরূপে উপ্ত হইতে পারে, তার ভূমি কিরূপ হইবে, তাতে কিরূপ সার দিতে হবে, তাতে আলো বাতাস কিরূপ চাই, আমাদের যাহারা নেতা, দেশের যাহারা ইন্দ্র চন্দ্র ও নাথ, তাঁহারা কেহই এ প্রশ্নের উত্তর দিতেছেন না। কেহ সমাজকে গালি দিতেছেন, কেহ আদর দিতেছেন। অনেকেই আবার সমাজকে পাঁচ ফুলের তোড়া করিতে চাহিতেছেন, যেখানকার যা' ভাল, তাহাই কাটিয়া আনিয়া নিজের বাগানের শোভা বাড়াইতে ইচ্ছুক হইয়াছেন। কবিন্দ্র রবীন্দ্রনাথের একটী দৃষ্টান্ত মনে পড়ে। কাজল চক্ষেই শোভা পায়, উহা গালে দিলে শোভা পায় না। বস্তুতঃ গোলাপ গাছে কণ্টক আছে বলিয়া যুঁই কিম্বা রজনীগন্ধার গাছে গোলাপফুল ফোটাইবার চেষ্টা করা বৃথা। গ্রীষ্মপ্রধান দেশে যে বৃক্ষের মূলে শীতল জল সিঞ্চন করিয়া উহাকে বাঁচাইতে হয়, শীতপ্রধান দেশে উহাকে বাঁচাইবার জন্য উষ্ণ বাষ্প প্রদান করিতে হয়। সমাজ একটা জীবন্ত জিনিস, যেমন তেমন করিয়া স্বেচ্ছাচার করিয়া উহাকে বাঁচান যায় না। সুতরাং চিকিৎসা করিতে হইলেই উহার প্রাণ কোথায় তাহা জানা চাই। শুনিয়াছি, অর্শ-রোগ হঠাৎ নিবারণ করিলে কখনও কখন কুষ্ঠ রোগের উৎপত্তি হয়। সুতরাং চিকিৎসাও সাবধানে করা দরকার।

পরাধীন জাতির পরানুকরণ অনেক সময়ই মৃতের নয়নে অঞ্জন পরার মতন নিষ্ফল ও হাস্যকর হয়। অথবা তাহা হইতেও

অনিষ্টজনক জীবিতের নয়নে কদঞ্জন পরাইয়া তাহার চক্ষু নষ্ট করা হয়। আমরা যে সকল সামাজিক প্রথা পরিত্যাগ করি, সেগুলির সহিত যে সকল উপকার বাঁধা ছিল, সেগুলিকে অন্য কোন উপায়ে ধরিয়া রাখিতে পারি না, আর নূতন প্রথাও উত্তম ফলপ্রসূ হয় না, সুতরাং এইরূপ করিতে করিতে শৃঙ্খলতার মধন সমাজটী একেবারেই ভিত্তিশূন্য হইয়া পড়িতে পারে।

আমাদের সামাজিক সমস্যাই সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর! ইংরাজ এ দেশের রাজা, তাঁহার সহিত বোঝাপাড়া করিয়া আমাদের ন্যায্য পাওনা আদায় করা যেরূপ কর্ত্তব্য, জাতীয় জীবন কিরূপে গঠিত হইবে, সেই সম্বন্ধে চিন্তা করা আমাদের অধিকতর কর্ত্তব্য।

আজি ইংরাজ নিজেদের স্বার্থ ও আধিপত্য নষ্ট হইবে ভাবিয়া ভারতবাসীকে এ দেশে নিজ জাতিগণের সমান অধিকার দিতেছে না, ভবিষ্যকালে এই ক্রটীই ভারতে ইংরেজ সাম্রাজ্যকে দুর্ব্বল করিয়া ফেলিবে। হস্ত যদি একখানা অস্ত্র লইয়া চরণকে আঘাত করে, তবে চরণের রক্তপাতের সঙ্গে সঙ্গে হস্তও দুর্ব্বল হইয়া পড়ে, সেইরূপ ভারতবর্ষে ইংরাজ যদি ভারতবাসীকে দুর্ব্বল করিয়া রাখে তাহাদের দুর্ব্বলতার সঙ্গে সঙ্গে ইংরাজের রাষ্ট্রশক্তিও ভারতে দুর্ব্বল হইয়া পড়িবে, অনেকে বলেন যে, ভারতের ব্রাহ্মণগণ অন্যান্য শ্রেণীকে, বিশেষতঃ কতকগুলি শ্রেণীকে শক্তিহীন করিয়া রাখায় ভারতে হিন্দুশক্তি দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে। এ কথা সত্য কি মিথ্যা, সে বিষয় বিচারের প্রয়োজন নাই, কিন্তু দেশের শতকরা ৮০ জন লোককে মূর্খ কিম্বা ইজ্জৎ হীন করিয়া রাখিলে দেশের যে কল্যাণ নাই, সে কথা কে অস্বীকার করিবে? তবে কি প্রণালীতে তাহাদিগকে উন্নত করা হইবে, রাতারাতি মূলচ্ছেদন করিয়া পাশ্চাত্য সমাজের মতন বংশগত জাতিভেদের পরিবর্ত্তে অর্থগত জাতিভেদ প্রতিষ্ঠিত করা উচিত কি না, এ সকলই ভাবিবার বিষয়। আবার করা উচিত হইলেই যে মানুষ জোর করিয়া এই প্রণালীর সমাজ-সংস্কার করিতে পারে, তাহা ত মনে হয় না। কোনও জাতিকে কেহ উঁচু করিয়া ধরিতে পারে না, আপনি ফুটিয়া উঠা চাই।

আজি কালি ধন ও উচ্চপদ সকলেরই প্রাপ্যবস্তু। যাহারা বিদ্যা শিখিবে, তাহারা উচ্চ পদ পাইবে, সুতরাং সকল শ্রেণীরই ধনোপার্জ্জন ও বিদ্যার্জ্জন করা দরকার। সম্মান কাহাকেও দান করিতে পারে না, সম্মান উপার্জ্জন করিতে হয়। তবে এ দেশে স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠিত হইলে এ দেশের শতকরা ৮০ জন লোক অকস্মাৎ যেমন সম্মান পাইবে, তাহা চিন্তা করিয়াও তাহাদের আনন্দিত হওয়া উচিত। আবার বলি, অন্য কোনও উপায়েই তাহাদের এরূপ সম্ভ্রম লাভের সম্ভাবনা নাই।

অনেক গোঁড়া হিন্দুর ভয় হইয়াছে যে, দেশে হোমরুল প্রবর্ত্তিত হইলে নিম্ন শ্রেণীর হিন্দুরা এতই উচ্চ হইয়া যাইবে যে, সামাজিক শৃঙ্খলা রক্ষা করা কঠিন হইবে, অন্য দিকে স্বায়ত্তশাসনের বিরোধীরা বুঝাইতেছে যে, স্বায়ত্তশাসনে নিম্নশ্রেণীর সর্ব্বনাশ হইবে অতি বিচিত্র ব্যাপার!

আর এক কথা এই যে, যদি ইংরাজ এ দেশে স্বায়ত্তশাসন দেয়, তবে কি তাহারা এই পুণ্যকার্য্য করিয়া গঙ্গাস্নান করিয়া দেশে চলিয়া যাইবে? সে সম্ভাবনা আছে কি!

তাহারা ত এই স্বায়ত্তশাসনের এক প্রধান অংশ গ্রহণ করিয়া দণ্ড হাতে এখানে বসিয়া থাকিবে, যদি উচ্চ শ্রেণীর হিন্দুরা দেশের প্রতিনিধি হইয়া অন্যকে নিপীড়িত করে, তবে ইংরেজ রাজশক্তি কি তাহা দেখিবে না? চে'য়ে পাওয়া স্বায়ত্তশাসন কি সম্পূর্ণ স্বাধীন হয়? বরঞ্চ এরূপ নিযুক্ত স্বায়ত্তশাসন সর্ব্বদাই ভীত থাকিয়া সুবিচার করে, নতুবা তাহার অস্তিত্ব রক্ষার উপায় নাই।

সুতরাং যাহারা স্বায়ত্তশাসনে ব্রাহ্মণ শাসনের ভয় দেখায়, তাহারা অজ্ঞাতে কি সজ্ঞানে লোকদিগকে প্রবঞ্চনা করে, ইহাই ভাবিবার বিষয়। তাহাদের কথা যে একান্তই অসঙ্গত, সে বিষয় সংশয় করার কারণ নাই।

দেশে স্বায়ত্ত-শাসন প্রতিষ্ঠিত হইলে জনসাধারণের শক্তিসম্ভ্রমই যে বাড়িয়া যায়, এই ভয় বশতঃই আলষ্টারের ধনী ও জমিদার ইংরাজগণ আয়র্লণ্ডে স্বায়ত্তশাসনের বিরোধী হইয়াছেন। আমাদের দেশের জমিদার ও অভিজাতগণ এদেশে (যে দেশের শতকরা ৮০ জন নিম্ন শ্রেণীর লোক—সেই দেশে) স্বায়ত্তশাসন লাভের জন্য আগ্রহ ও ব্যাকুলতা দেখাইয়া যে প্রকৃত দেশহিতৈষিতা দেখাইয়াছেন, আলষ্টারের ইংরাজগণ তাহা পায়েন নাই।

এখন আমার সমস্ত কথার সংক্ষিপ্ত সার এই যে, (১) স্বায়ত্তশাসনে তথা কথিত অনুচ্চ জাতির যেরূপ সুখ সুবিধা ও মান সম্ভ্রম বৃদ্ধি পাইবে, অন্যান্য শ্রেণীর ততদূর হইবে না। (২) স্বায়ত্তশাসন ভিন্ন অন্য কোনও উপায়ই অনুচ্চশ্রেণী এরূপ উন্নতিলাভ করিতে পারিবে না। (৩) স্বায়ত্তশাসন ব্রাহ্মণ শাসন নহে। প্রজাগণ নিজ নিজ নিয়োজিত প্রতিনিধিদিগের দ্বারা শাসিত হইবে। (৪) কোন প্রতিনিধি যদি শতকরা ৮০ জন লোকের বিরুদ্ধাচরণ করে, তবে সে আর কখনও প্রতিনিধি হইতে পাইবে না। (৫) নিম্নশ্রেণীর করভার লাঘব হইতে পারিবে, এবং তাহাদের বিদ্যাশিক্ষার সুবিধা হইবে। (৬) তাহাদের স্বজাতি বিদ্বানগণকে প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত করিতে পারিবে।

এই কথাটাই আসল। আমার বক্তব্য প্রসঙ্গ ক্রমে আমি যে নিম্নশ্রেণীর হিন্দুদিগের মুসলমান ও খ্রীষ্টান হওয়ার কারণ দেখাইয়াছি, সেগুলি আনুষঙ্গিক কথা, উহাতে যদি আমার কিছু ভুল থাকে, তাহার সঙ্গে আমার মূল প্রবন্ধের কোনও সম্পর্ক নাই।

শ্রীমনোরঞ্জন গুহঠাকুরতা।

মধ্যযুগের ইউরোপীয় দর্শন।

প্রথম বিভাগ।

খ্রীষ্টীয় আদর্শবাদ।

গ্রীক-প্রতিভাই যে ইউরোপীয় দর্শনের প্রাণ, তাহা পণ্ডিত-সমাজ স্বীকার করেন। আশ্চর্য্য ধারণাবলে আইওনীয় দার্শনিকগণ সৃষ্টিতত্ত্ব সম্বন্ধে যে সকল মন্তব্যের প্রচার করিয়াছিলেন; ইলিয়াটিক, হিরাক্লিটীয়, এবং আনাক্সাগোরাসের সম্প্রদায় কর্ত্তৃক সেই সকল মন্তব্যের যে সংস্কার সাধিত হয়, এবং পিথাগোরাস, প্লেটো ও অ্যারিষ্টটল তাহাদের যেরূপ সমন্বয় ও পুষ্টিসাধন করেন, সে সকল বিষয় গ্রীকদর্শনের অন্তর্ভুক্ত এবং গ্রীকদর্শন পর্য্যায়ে * আলোচিত হইয়াছে। অ্যারিষ্ট-

* ১৩২২, ১৩২৩ ও ১৩২৪ সালের "নব্যভারতে" দ্রষ্টব্য।

টলের সময়েই গ্রীক-মনীষা সর্ব্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করে। তাহার পর হইতে সাম্প্রদায়িক মতভেদ বৃদ্ধি পায়, এবং ক্রমান্বয় ষ্টোয়িক ও এপিকিউরীয় সম্প্রদায়, সংশয়বাদী ও অবিশ্বাসীর দল আবির্ভূত হয়। নানা মুনির নানা মত হইলে কোন মতই স্থায়ী হয় না। অবনতির প্রাক্কালে গ্রীকদর্শনের এই অবস্থাই হইয়াছিল। এই সময়ে আবার যিশুর আবির্ভাব এবং রোমকজাতির অভ্যুদয় হেতু গ্রীকগণ ক্রমশঃ জাতীয় বিশেষত্ব হারাইতে লাগিলেন। বহু দিন যাবত ভক্তি-রসে বঞ্চিত ছিলেন বলিয়া দর্শনের নীরস যুক্তিতর্কও তাঁহাদের অসহ্য হইয়া উঠিয়াছিল। পরিশেষে, সম্রাট কনষ্ট্যান্টাইন্ যখন খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিলেন, তখন গ্রীকগণ দলে দলে স্বার্থ ও সমৃদ্ধির আশায় উক্ত ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। যামব্লিকাস, প্রোক্লাস প্রভৃতি কয়েকজন চিন্তাশীল ব্যক্তি গ্রীক চিন্তার স্বাতন্ত্র্য রক্ষায় যত্নবান হইলেও তাঁহাদের যত্ন সফল হয় নাই। নির্ব্বাণোন্মুখ দীপের ন্যায় সেই উদ্যম ক্ষণমাত্র প্রজ্বলিত হইয়া নিভিয়া গিয়াছিল।

গ্রীকচিন্তার স্বাতন্ত্র্য আপাততঃ নষ্ট হইলেও দীর্ঘ বারশত বৎসর যাবত গ্রীক-মনীষিগণ চিন্তাজগতে যে নূতন প্রাণের সঞ্চার করিয়াছিলেন, তাহার স্পন্দন যুগে যুগে অনুভূত হইয়াছে। যে সকল তত্ত্বকথাকে মধ্যযুগের ইউরোপীয় দর্শন বলা হয়, তাহা মোটের উপর গ্রীকদর্শনেরই রূপান্তর এবং প্রথমতঃ তাহা খ্রীষ্টধর্ম্মের কতকগুলি মূল মন্ত্রের সহিত মিশ্রিত হইয়া খ্রীষ্টোপাসকগণ কর্ত্তৃক প্রচারিত হইয়াছিল। সর্ব্বদেশের জ্ঞান ও বাণিজ্য-ভাণ্ডারের কেন্দ্রস্বরূপ আলেক্জান্দ্রিয়া নগরে প্রাচ্যের সহিত প্রতীচ্যের সংস্পর্শ ঘটে। উক্ত নগরে ৩০০ খ্রীষ্টাব্দের প্রথমাংশে খ্রীষ্টীয় সমাজ কর্ত্তৃক একটী তত্ত্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, এবং তথায় নব্য-আদর্শবাদ-সম্মত মতাবলীর আলোচনা হইত। গ্রীক ও মিশরী ধর্ম্ম-যাজকগণ অধ্যাত্ম চিন্তা হইতে কখনই বিরত হন নাই। ধর্ম্মের প্রতি যাহাতে অবজ্ঞা না আসে, তজ্জন্য এই সকল তত্ত্বজিজ্ঞাসু ধর্ম্ম-যাজক স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া দর্শনাধ্যয়নে মন দিয়াছিলেন। ধর্ম্ম ও দর্শনের মূলে যে প্রভেদ নাই, তাহাই প্রমাণ করা তাঁহাদের উদ্দেশ্য ছিল। সাধারণের ন্যায় কেবল কতক-গুলি ধর্ম্মোপদেশ অবগত হইয়াই তাঁহারা ক্ষান্ত হইতেন না, যেহেতু তখনও প্লেটোর সারগর্ভ যুক্তি সমূহ নব্য-আদর্শবাদের ভিতর দিয়া তাঁহাদের হৃদয়কন্দরে ধ্বনিত হইতেছিল। প্লেটোর তত্ত্ববাদই তাঁহাদের প্রধান চিন্তার বিষয় হয়। তাঁহারা দেখিলেন যে, যিশু তত্ত্ববিদ্যায় পণ্ডিত না হইয়াও পরম জ্ঞানীর ন্যায় যে সকল উপদেশ দিয়াছিলেন, তাহাদের সহিত প্লেটোর আদর্শবাদের অনেকাংশে মিল রহিয়াছে। বাইবেল গ্রন্থের প্রথমে 'জেনি-সিস্' অধ্যায়ে যে সৃষ্টিকাহিনী দৃষ্ট হয়, নব্য-আদর্শবাদের সৃষ্টিতত্ত্বও মূলতঃ সেইরূপ। ঈশ্বর স্বয়ম্ভু, স্বপ্রতিষ্ঠ, স্বপ্রকাশ; তাঁহার বাক্য এবং তাঁহাতে প্রভেদ কি? তাঁহার বাক্য, তাঁহার আদেশ, এরূপ না বলিয়া যদি ঈশ্বরকেই 'বাক্'রূপে কল্পনা করা যায়, তাহা হইলে আর দ্বৈত ভাব আসে না। ঈশ্বর বাঙ্ময়, এবং বাক্ বা 'লগস্'ই সৃষ্টি। ইহাই নিত্যচৈতন্যের স্বরূপ (Divine Reason)। 'আলোকের উৎপত্তি হউক', অতএব আলোকের উৎপত্তি হইল, এস্থলে কারণ ব্যতীত কার্য্যোৎপত্তিরূপ অসম্ভব কল্পনা হয়

নাই। 'আলোকের উৎপত্তি হউক', এই যে আদেশবাণী, এই বাণীই ত পরম সত্য, ইহাই ত ঈশ্বরের রূপ অথবা স্বয়ং ঈশ্বর, সুতরাং স্থান কালেরও অতীত। বস্তুতঃ তৎকালে নব্য-আদর্শবাদের সহিত খ্রীষ্টধর্ম্মের মূল তত্ত্বের সাদৃশ্য এত অধিক অনুভূত হইয়াছিল যে, খ্রীষ্টানগণ খ্রীষ্টীয় সমাজ-বহির্ভূত পণ্ডিতদিগের তত্ত্বকথায়ও অবজ্ঞা না করিয়া বরং আস্থা স্থাপনই করিতেন। জ্ঞান ও ভক্তির এবম্বিধ সামঞ্জস্য দর্শনে অনেকেই মনে করিলেন, নজরতের যিশু যে ভগবানের অংশজাত, তাত্ত্বিকগণও যুক্তিমার্গে সেই ভগবানেরই অনন্ত চিন্ময়ী সত্তার অনুভব করিতে সমর্থ হন। আবার, কাহারও কাহারও এরূপ বিশ্বাসও হইয়াছিল যে, প্লেটোর আদর্শবাদ বাইবেলের ওল্ডটেষ্টেমেণ্টের উপর প্রতিষ্ঠিত। 'আপলজি' গ্রন্থের লেখক, জাষ্টিন্ দি মার্টারের (Justin the Martyr) বিবেচনায় 'লগ-সে'র ক্রিয়া সর্ব্বভূতাত্মিকা এবং সক্রেটিস, হিরাক্লাইটাস্ প্রভৃতি মহাত্মারা যিশুর করুণা লাভে বঞ্চিত থাকিয়াও পরমার্থের সন্ধান পাইয়াছিলেন; এজন্য তাঁহারাও অনন্ত সুখের অধিকারী হইয়াছেন। 'মৃতের পুনরুত্থান' নামক গ্রন্থের (On the Resurrection of the Dead) লেখক এথেনি-গোরাস্, অ্যাপলজিষ্ট্ টেটিয়ান্, আলেক্-জান্দ্রিয়ার সেণ্ট্ক্লেমেণ্ট্ এবং তদীয় শিষ্য ওরিগেন (Origen) প্রভৃতি সকলের গ্রন্থেই নব্য-আদর্শবাদের কিছু না কিছু আভাস পাওয়া যায়। ওরিগেন বলেন যে, যিশুর শিষ্যগণ যে খ্রীষ্টধর্ম্মের মূল তত্ত্বগুলির প্রকৃত অর্থ বুঝিতেন না, এমন নহে; বুঝিয়াও তাঁহারা সেগুলি এমন ভাবে প্রকাশ করিয়াছেন, যাহাতে পণ্ডিত ও মূর্খ সকল লোকেই তাহাদের অর্থ গ্রহণ করিতে পারে। সাধারণ লোকে উপদেশগুলির সাধারণ অর্থই লইবে; আর, সুধিগণ যিশু যে কি জন্য ঐ সকল বাক্যের অবতারণা করিয়াছিলেন, তাহার কারণানুসন্ধান করিবেন। অতএব, দৃষ্ট হইতেছে যে, ওরিগেনের সময় হইতেই খ্রীষ্ট ধর্ম্মে দুইটী শাখার সূত্রপাত হয়; একটী, সাধারণের ধর্ম্ম বিশ্বাস মাত্র, অপরটী যুক্তিবদ্ধ ধর্ম্মতত্ত্ব। প্রথম বিভাগে প্রচারকগণের ধর্ম্ম কথার স্থূল অর্থ গৃহীত হইয়াছিল, দ্বিতীয় বিভাগে খ্রীষ্টান দার্শনিকগণ কথাগুলির গূঢ় বা আধ্যাত্মিক অর্থ বুঝিতে চাহিয়াছিলেন। এই দুই বিভাগের পার্থক্য হইতে সাম্প্রদায়িক যুক্তিবাদ (Scholastic Rationalism) নামে কয়েকটী নূতন মতের উৎপত্তি হয়। এতদ্ব্যতীত এথেনেসিয়াস্ (Athanasius), বেসিল দি গ্রেট্ (Basil the Great) নাইসা ও নজিয়াঞ্জাসের গ্রেগরীদ্বয় এবং লাটিন খ্রীষ্টোপাসকগণের মধ্যে প্রসিদ্ধ সেণ্ট আগষ্টাইন্ (St. Augustine) প্রাচীন গ্রীক অ্যাকাডেমি ও আলেক্জান্দ্রিয়া হইতে প্রচারিত তত্ত্বোপদেশ সমূহ প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে গ্রহণ করিয়াছিলেন।

খ্রীষ্টধর্ম্ম-সম্মত দর্শন মতের বিস্তারিত আলোচনা অনাবশ্যক; কারণ, এরূপ আলোচনার ফলে দার্শনিক বিচার হইতে ধর্ম্মশাস্ত্রের বিচার আসিয়া পড়ে। সেণ্ট্ আগষ্টাইনের দর্শন মতই গ্রীকচিন্তা এবং নবোত্থিত সাম্প্রদায়িক যুক্তিবাদ সমূহের সংযোগসূত্র, এজন্য সম্প্রতি আমরা এই মহাত্মার মতই বিশেষ ভাবে বুঝিতে চেষ্টা করিব। সাম্প্রদায়িক যুক্তিবাদ সমূহের বিষয় যথাস্থানে আলোচিত হইবে।

(ক্রমশঃ)

শ্রীদিগ্বিজয় রায়চৌধুরী।

পোলাণ্ড"।

১ম উচ্ছ্বাস।

মায়ের ডাকে কোথা হ'তে
বিরাগ গেল সরে,
নবীন বলে সিংহনাদে
প্রাণটা উঠলো ভরে।
এখনও তো হয়নি সাঙ্গ,
কাজ রয়েছে বাকি,
বুড়ো সেজে হাত গুটিয়ে
কারে দিচ্ছি ফাঁকি?
কাজের তরে হেথায় আসা,
ফিরে এসেও লাগবো কাজে,
অকাজগুলো হাতের গোড়ায়
এসে দাঁড়ায় কাজের সাজে।
নব বার্ত্তা লইয়ে উষা
ওই দিয়েছে দেখা,
স্বাস্থ্য নিজে উষার মুখে
আঁকছে কনক রেখা।
নূতন প্রাণে নূতন আশা
দবদবিয়ে জ্বলে,
তপ্ত পরাণ দড়বড়িয়ে
ছুটছে কুতূহলে।
সাপের বাঁধন উদার রাজা
আপনি দেবে খুলে,
পতিতেরে যতন ক'রে
কোলে নেবে তুলে।
রাজার যদি ভুল না হ'ত
এমন দিনে তবে
ছুটতো নাকি লক্ষ বীর
প্রচণ্ড আহবে?
আপন হ'তে আমরা তো চাই
আপন বল করে কে?

ফুলের মালা গলায় দিয়ে
দারিদ্র জনে বরে কে?
শাদা বলে গরব ক'রে,
তোমরা জ্বাল আলো,
জান না রাত্রিকালে,
সব বিড়ালই কাল।
হৃদয় পশু তোমাদের তো,
বিক্রমেতে সেরা,
আমরা যেমন দুর্ব্বল ক্ষীণ,
পশুগুলোও ভেড়া।
বাজিয়ে বাঁশি, মাতিয়ে পরাণ,
খুলিয়ে horn gate,
মণ্টেগু ওই এলেন ধীরে,
নিয়ে মিষ্ট bait.
ইচ্ছা ক'রে প্রাণ ধ'রে যা,
দেয়নি হাতে তুলে,
কেমন ক'রে উদার প্রাণে,
সাজিয়ে দেবে ফুলে?
এ গলায় ত ফুলের মালা,
শোভা নাহি পায়,
ভূঁয়ের লতা বাড়লো না হায়!
শুধু পায় পায়।
নায়েব তোমার নায়েবি ক'রে,
কোটাল কাটে মাথা,
করুণ সুরে করুণা কাঁদে,
কবির করুণ গাথা।
Cromwell'র' কঠোরতার,
ওই পড়ে যে ছায়া,
মাথায় মাথায় ঠোকাঠুকি
দূরে ফেলে হায়া।

ব্যষ্টি ভাবে স্বাতন্ত্র্যটার,
বুক উঠেছে ফুলে,
ফলে ফুলে তরুর শোভা
Cankerটা মূলে।
প্রসাদ কবে পাবেন বলে,
হেথায় নেতার দল,
মাথায় পগ্‌গ্‌ আঁটিয়ে সবে
কর্‌ছেন কোলাহল।
কেউ কর্‌ছেন হ্রেষা ধ্বনি,
কেউ কর্‌ছেন বৃংহন,
কেউ কর্‌ছেন রাসভ নাদ,
কেউ কর্‌ছেন গর্জ্জন।
ত্যাগী বড় যোগী বড়,
ভোগীর আবার বড়াই কিসে,
আপন সুখটী খুঁজে সে যে,
হৃদয় তাহার পূর্ণ বিষে।
দম্ভ তাহার হস্তীনিভ,
যশ পিপাসা ভয়ঙ্করা,
চাহেন তিনি আপন পূজা,
কৌশলেতে হৃদয় ভরা।
চাচ্ছি যাহা পাই যদি তা,
মাথায় করে ধর্ব্বে কারা,
ধর্ব্বে যারা হৃদয় তাদের,
অহঙ্কারের পূর্ণ হাঁড়া।
দেশ ডুবেছে ব্যভিচারে,
ফার্লো নিয়ে গেছেন নীতি,
আছে কি ভারত মাঝে
পুরাকালের ধর্ম্মনীতি।
ওই Politics সর্ব্বনেশে
Noxious ray বিক্ষেপিয়া,
বিষে বিষে জর্জ্জরিত
করে ফেলেছে সবার হিয়া।
ভারত তেতো সিডেনহামের,
সাগর পারের গর্জ্জনে,
চম্‌কে যেন উঠ্‌ছে হেথা,
সর্ব্ববিধ সজ্জনে।
হিম দ্বীপের বুকে বিধি,
শান্তিবারি দেও ঢেলে,
উজল ভানুর সমুখান,
দেখুক সবে চোখ মেলে।
সিন্ধুবালায় বলি দিতে,
শুকিয়ে গেল ভাঁড়ের ঘি
রুদ্র বীর্য্য তীক্ষ্ণ দন্ত,
থম্‌কে র'ল C. I. D.
কলম কাঁপে হৃদয় কাঁপে,
ধরফড়িয়ে উঠ্‌ছে প্রাণ,
আমার দ্বারা moot Pointটার,
হবে না কো সমাধান।
Autonomy পেলে পরে
রবে না তো পরবশ,
বিচার কর্ব্বো সবাই ব'সে,
কার্য্য বিধির এক শ দশ।
চিত্ত-চোরা চিত্ত আমার,
কোষ্ঠি শুদ্ধ চক্ররাজ,
Uncrowned King সুরেন চাঁদায়
দিচ্ছেন মৃদুমন্দ লাজ।
Autonomyর তালটা যখন
আস্‌বে হেথা গড়িয়ে,
গর্জ্জনশীল পালজী আমার
ধর্ব্বেন তারে জড়িয়ে;
গুপ্ত বিপিন সুপ্ত হ'য়ে,
মর্ম্মবাণীর মর্ম্মে পশি,
রবিরে চান করতে এখন,
অরবি বা ক্ষুণ্ণশশী।
(উপ)নিষদ গড়া ভানুর পরাণ,
স্বীকার কর্ত্তে নহেক রাজি
আমরা স্বীকার কল্লে পরে,
হব নিশ্চয় পাজির পাজি।

সবুজ পত্রের ভায়া আমার
নিকেতনের অজিতনাথ,
ভাস্কর পক্ষে যখন তখন,
পাষ্টী ধরে ফেলেন কাত।
কবির আঁখি lynix পাখীর,
নয়ন চুরি করা,
যে দিকে চাই বুঝতে পারি,
কলঙ্কেতে ভরা।
Dawnর সতীশ কজন আছে,
সমাজ যাদের বন্দিয়ে,
নিতে পারে শিরে তুলে
চন্দনের রং দিয়ে।
ভূপেন আছেন সুরেন আছেন
চিম্‌টী কাটা মতি,
ভজ্‌বো কি ভাই নাম শুন্‌লেই
শিউরে উঠে রতি;
Roland মতি সত্যি বল্‌ছি
সুরেন অলিভার,
বোসের চালে Bengaliতে
উঠ্‌লো হাহাকার।
রাবণের সেই চিতা বহ্নি
জ্বল্‌লো কত মাস,
Politicsএ সোজা বুদ্ধি
ঘটায় সর্ব্বনাশ।
Hydra-headed multitude
হ'য়ে গেছে ম্লান,
Dozen dozen leader ঘোরে
মুখে অভিমান।
ভিতের পত্তন বড়ই কাঁচা,
ইমারতটা জাঁকাল,
বালক ভাবে কলের রাজা,
নয়ন চোরা মাখাল;
দেশের পানে যে দিকে তাকাই
নয়ন আশে ভিজে,
পোড়া কপালি মায়ের আমার
শেষটা হবে কি যে।
C. S. দলের চরণেতে,
তাঁরাই করুন অর্ঘ্য দান,
যাঁরা ভাবেন দেশের গৌরব,
দেশের এরা সুসন্তান।
মাসীর এঁরা পুষ্যিপুত্র,
মায়ের ছেলে নন,
সদাই দৃষ্টি কেমনে দেবেন
দীবল ঝম্পন।
এঁরা এদের নন ওদের নন,
Mrs রাণীর বর,
Style দেখে মন ভুলে যায়
মরি কি সুন্দর।
আমরা ভাবি স্বর্ণ কুকি,
C. S. রাজের মায়,
মনের দুখে ভাগ্যহীনা
কাঁদেন উভরায়।
Vitality দেও গো ফিরে,
Autonomy নাহিকো চাই,
লেখনীরে স্বাধীন কর
অন্য বাঞ্ছা আর ত নাই।
পূর্ণ আজি আমার দেশটা
শত শত Pedlarএ,
লয়ে যাও তাঁদের দেব
তোমাদের পর পারে।
হট্ট হাসিনী বিলাস বধূরে
ফিরে লয়ে যাও গেহে,
বোতল বাহিনী তোমার creatureএ
বুকে রেখে দাও স্নেহে।
খেয়াল তোমার ছুছুন্দরীর
গলায় দিতে হার,
হে খেয়ালি দূরে ফেল,
Fadটী তোমার।

এখনও এদেশে হয় সামধ্বনি
অনাহত বাঁশি বাজে,
এখনও রমণী পেবলতাময়ী
জড় সড় সদা লাজে।
মেঘের ছায়ায় রেবার বক্ষে,
এখনও যে দেয় কাঁটা,
এখনও উদর শীতল করে,
আহিরিণীদের মাটা।
এখনও রমণী কোমল হৃদয়
সাবিত্রীর ছাঁচে গড়া,
এখনও মায়ের উদার হৃদয়
কমল মরন্দে ভরা।

শুক বলে আমার কৃষ্ণ
রোজগারী ছেলে,
শারী বলে আমার রাধায়,
গহনা দেবে ব'লে;
শুক বলে আমার কৃষ্ণ
রাধায় করে প্রেম,
শারী বলে হা ধিক হা ধিক,
Shame shame shame.
সকল বাঁধন ওই ছিঁড়ে যায়,
আস্‌ছে নূতন তূর্ণ,
যাচুর সঙ্গে যেতেছে যাদী,
বাসনা হ'তে না পূর্ণ।
Nude nude বড়ই মধুর
যেন বসন্তের ঘর,
রূপের সাগরে ভাসিছে পদ্ম
মরি কিবা মনোহর;
মন অলি আজ অধরে কপোলে
কভু বা বুকেতে বসি,
পদ্ম পরাগ মাখিয়া অঙ্গে
দেখে শরতের শশী।
Her pure and eloquent blood
Speaks in her cheek,
Distinctly I can pronounce
She is naturally meek.
অর্দ্ধ স্খলিত আদর কবরী
Sweet neglect প্রকাশে,
চূর্ণ কুন্তল ভ্রমর হইয়ে,
উড়ে ঢুলে পড়ে বাতাসে।
ধীবর মজুর কৃষক ও চাষা,
ভিক্ষুক যারা আছে,
সত্যের যশ অবাধে বিলাতে,
দেও হে তাদের কাছে।
আমার ঘরের ডিপুটী বঁধুয়া,
তোমার ঘরের ছেলে,
ক্ষুধার তরেতে মরীচ ভুখিলে,
বেচারীকে দেন জেলে;
Morally guilty তবু সুখে থাকে
পড়ে না law এর প্যাচে,
কোথায় হীরক কোথায় কাঞ্চন
লোক ভুলে থাকে কাঁচে;
মুখে করে চুরি কাজে করে চুরি
মনে প্রাণে যারা চোর,
সাজিয়া গুজিয়া ভদ্র হইয়া
তারাই করিছে সোর।
দুয়ারে দুয়ারে ভিখারীর বেশে
প্রচারিতে দেও সত্য,
আমার রাজা পাবেন তখন
নিরাবিল আনুগত্য।
"My relation" মহারাজের
ওটা ভিয়ান করা,
বর্দ্ধমানের রাজবস্ত্র
রক্তরজে ভরা।
রাজার হাতের ভ্রমণ আনার
বৃন্দে যখন দিতেন নিজে,
মধুর রসে হৃদয় তখন
হর্ষ রসে উঠ্‌তো ভিজে।

ললিত চন্দ্র ছদ্মবেশের
করছেন ভালই বিশ্লেষণ,
মুক্ত কচ্ছ সাহিত্যিকীর
দিচ্ছেন না ত বিবরণ।
(এঁরা) চাঁদ চুয়ান রূপ মাখান
চুম্বন প্রবণা বালায়,
নায়িকা করিয়ে কামেরই অনলে
বঙ্গভূমি জ্বালায়।
বসোরার সেই গোলাপ বক্ষে
চুমার রেখাটী টেনে,
উচ্চ হইতে অতর্কিত ভাবে
পাতালেতে যান নেমে।
শৃঙ্খলা ভেঙ্গেছে সংযম গেছে
উগ্র প্রেমেরই উচ্ছ্বাসে,
অবাধেতে প্রেমলোকে রূপরাশি
তীব্র মনেরই উল্লাসে।
সত্য যাহা নিত্য তাহা
শাশ্বৎ বনিতারে,
সত্য কখন হয় না নমিত
তিক্ত প্রেমের ভারে।
হেথায় কুন্দ হোথা বিনোদিনী
"মন্ত্রে" "প্রভাতী" প্রেমপানা,
দয়িতা শিখিছে বিনোদার হাব
করে না তাহারে কেউ মানা।
প্রেম কেন বলি ? শুধু ব্যভিচারে
জাতীয়তা গেল ধুয়ে,
সমাজের ছিল শাঁসাল কলঙ্ক
ক্রমশ পড়ছে নুয়ে।
রোগটা রে ভাই পার যদি তবে
আতুর ঘরেই কর কাৎ,
একটুখানি বাড়লে পরেই
করে বসবে বাজি মাৎ।
Oh would I were dead now
Or upto my bed now
To cover my head now
And have a good cry.
চোখের জলেরে ফেলেছি পুছিয়া
হৃদয়ে পেয়েছি শক্তি,
মায়ের পূজার তরেতে এনেছি
নিরাবিল নব ভক্তি।
যতন করিয়া গড়িব চরিত
দীপ্ত মধুর হরষে,
জগজ্জনে লভিবে শান্তি
তস্য অমৃত পরশে।
পর বেদনার দ্রাক্ষা মদির
প্রাণে প্রাণে দেব ঢেলে,
ধনীও চাহিবে দুখীর পানেতে
সজল নয়ন মেলে।
ধর্ম্ম দিয়ে মান কিনিয়ে
ওই রয়েছেন মানী,
পেশা তাহার শক্তি-পূজা
সে কথাটাও জানি।
দেবতা দলের জুতার ধূলা
ছাড়েন রুমাল দিয়ে,
যৌতুক নেন বিধিমতে
ছেলের দিয়ে বিয়ে।
বিজ্ঞতাটা সকল কাজেই
বিষের গন্ধরা'র করে,
চলেন যাদু সেজে গুজে
কার্ত্তিকের রূপ ধরে।
হারিয়ে ফেলে চরিত-নিধি
আজ কাঙ্গালী সবে,
কাঙ্গাল হ'তে তাইতে কাঙ্গাল
আমরা নিখিল ভবে।
হৃদয় মাঝে বিষ্ঠা ভরা
নিষ্ঠা গেছে দূরে,
বাজে না গো আর হৃদয়-বেণু
তেমন মধুর সুরে

রাজার খেতাব কিনিছে ধূর্ত্ত
Imp মূর্ত্তি লুকিয়ে,
তাহারই আদর কর্‌ছি আমরা
অন্তর বার জানিয়ে।

স্বদেশ-প্রেমটা ভণ্ডামীতে
হায় রে পরিণত,
স্বার্থ-বিষে প্রাণ থই থই
প্রেমটা উপরত।

শ্রীধেণোয়ারীলাল গোস্বামী।

দক্ষিণ-ভ্রমণ।

এক স্থানে অনেক দিন বাস করিলে শেষে আর ঐ স্থান ভাল লাগে না, তখন মনে হয়, একবার স্থান পরিবর্ত্তন করিয়া বেড়াইতে পারিলে আনন্দ হইবে। প্রথমে যখন অনন্ত-বিস্তারিত সমুদ্র দর্শন করিয়াছিলাম, এবং তদুপরিস্থ সুন্দর সুন্দর অট্টালিকাতে অনেক ধনী লোকের বাস দেখিয়াছিলাম—তখন মনে হইয়াছিল, এই প্রকারে চিরকাল থাকিতে পারিলে কি আনন্দই হয়। কালে মনোরথ পূর্ণ হইল, সমুদ্র তীরে বাস করিবার উত্তম সুবিধাও জুটিল, এবং একাদিক্রমে দ্বাদশ বৎসর বাসও করিলাম, কিন্তু শেষে আর ভাল লাগিল না। ঐ স্থান ত্যাগ করিয়া একবার দক্ষিণ দেশ রামেশ্বর পর্য্যন্ত ভ্রমণ করিতে ইচ্ছা হইল। পরাধীন, সুতরাং ইচ্ছা করিলেই কোন কাজ সহজে ঘটিতে পারে না। পরাধীন লোকই বল আর পরাধীন জাতিই বল, কেহই ইচ্ছামত কাজ করিতে সক্ষম নহে। পরাধীন লোকগুলিকে খোঁটায় বাঁধা গরুর অবস্থার সহিত তুলনা করিতে পারা যায়। দশ হাত কিম্বা ১৫ হাত লম্বা এক গাছি দড়ি দ্বারা গরুকে তৃণাচ্ছাদিত মাঠে এক স্থানে বদ্ধ করিয়া দেওয়া হয়; গরু ঐ দড়ির পরিধি পরিমাণ স্থানের মধ্যে তৃণ ভক্ষণ করিতে পারে, কিন্তু উহার বাহিরে যে সমস্ত তৃণ থাকে, তাহার দিকে কেবল দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতে পারে মাত্র। গরুর প্রভু যদি দয়া করিয়া, খোঁটাটি তুলিয়া অন্য স্থানে বদ্ধ করিয়া দেন, তবেই তাহার পক্ষে নব তৃণ ভক্ষণ করিবার সুবিধা হয়, নচেৎ এক স্থানেই ঘুরিয়া ঘুরিয়া শেষে ক্লান্ত হইয়া তথায় শয়ন করিয়া থাকে। কর্ম্ম দ্বারা বদ্ধ মনুষ্যের অবস্থাও ঠিক এই প্রকার। কর্ম্ম করিতে করিতে শেষে বৃদ্ধাবস্থায় ক্লান্ত হইয়া পড়িয়া কোন এক স্থানে অবস্থিতি করিয়া জীবনের অবশিষ্ট সময়টুকু কোন রকমে কাটাইয়া দেন। শরীরে শক্তি থাকে না, মনের বল থাকে না, উৎসাহ উদ্যম সকলই চলিয়া যায়—সুতরাং দেশ বিদেশ ভ্রমণ করিয়া নানাবিধ তীর্থস্থান দর্শন করিয়া বহুদর্শিতা লাভ করা তাহার পক্ষে দুঃসাধ্য হইয়া পড়ে, কেহ হয়ত বড় জোর কাশী কিম্বা বৃন্দাবনে একখানি গৃহ লইয়া স্ত্রী পুত্র পরিবার সহ বৃহৎ একটী সংসার স্থাপন করিয়া, কলহ ও নানাবিধ সাংসারিক চিন্তায় মগ্ন হইয়া, জীবনের শেষ দিনের অপেক্ষায় অবস্থিতি করিতে থাকেন, শান্তি এখানেও নাই।

যাহা হউক, আমার সময়ে ভাগ্যক্রমে ছুটী মিলিল, এবং যথাসময়ে দক্ষিণদেশ ভ্রমণে বাহির হইলাম। আশ্বিন মাস, অল্প অল্প বৃষ্টিতে ভিজিতে ভিজিতে রেলগাড়ীতে

উঠিলাম, এবং সেতুবন্ধ রামেশ্বর মাদ্রাজ প্রভৃতি স্থানের দৃশ্য সমস্ত কল্পনার সাহায্যে দেখিতে দেখিতে চলিতে লাগিলাম। গাড়ী চলিতে লাগিল, আমিও নানাবিধ স্থান দেখিতে দেখিতে কত কি চিন্তা করিতে লাগিলাম। প্রতি মিনিটে নূতন নূতন স্থানের দৃশ্যগুলি চক্ষের সম্মুখে পতিত হইতেছে, এবং প্রতি মিনিটে নূতন নূতন চিন্তার উদয় হইতেছে, এবং চলিয়া যাইতেছে। কোনটাই ধরিয়া রাখা যাইতেছে না, সুতরাং কোনটার বিষয় লিপিবদ্ধ করিব, তাহাও স্থির করিতে পারিতেছি না। কত পাহাড়, কত বড় বড় নদী এবং তাহার উপরিস্থ সুন্দর সুন্দর পুল, কত সুন্দর সুন্দর পল্লীগ্রাম, এবং তাহার মধ্যে সুন্দর সুন্দর বালক বালিকাদিগের নৃত্য, কত সুন্দর সুন্দর ধান্যক্ষেত্র, এবং তাহাতে জল বদ্ধ করিয়া রাখিবার জন্য কৃষকদিগের ব্যস্ততা; কত ধূম্র বর্ণের পাহাড় এবং তদুপরিস্থ সুন্দর সুন্দর বৃক্ষসমূহ, দৃষ্টিপথে আসিতেছে, আবার চলিয়া যাইতেছে। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, মধ্যে মধ্যে বৃষ্টি হইতেছে, আবার মধ্যে মধ্যে অল্প অল্প সূর্য্যোদয়ও হইতেছে। এই প্রকারে প্রকৃতির একই সময়ে হাসি কান্না চলিতেছে, এবং বড় বড় মেঘগুলির বড় বড় ছায়া পাহাড়গুলির উপর পতিত হইতেছে। একই সময়ে কোন পাহাড়ে ছায়া পতিত হইয়া উহা অন্ধকারের মত দেখাইতেছে, আবার উহার নিকটস্থ অন্য একটী পাহাড়ের উপর সূর্য্যকিরণ পতিত হইয়া কেমন শুভ্রবর্ণ দেখাইতেছে, যেন বোধ হইতেছে, একটী পাহাড় বিষাদ ভরে ক্রন্দন করিতেছে, এবং অন্যটী আনন্দ ভরে হাস্য করিতেছে। যেন আরও আমাদিগকে শিক্ষা দিতেছে, হে মানবগণ, আমাদের এই প্রকার বিষাদ ও আনন্দ দেখিয়া বুঝিয়া লও, সংসারে তোমাদেরও বিষাদ ও আনন্দ এই প্রকার। আমরা এই বিষাদ ও আনন্দ উপর হইতে পাইতেছি—তিনি যেমন ভাবে দিতেছেন, আমরা তাহাই অবনত মস্তকে গ্রহণ করিতেছি, সুখে দুঃখে কোনও প্রকার বিচলিত হইতেছি না; তোমাদেরও সুখ দুঃখ এই প্রকারেই উপর হইতে বর্ষিত হইতেছে, সুতরাং আমাদেরই মত অবিচলিত চিত্তে অবস্থান কর। যেন আরও বলিতেছে, আমরা কত যুগান্তর ধরিয়া এই প্রকার সহ্য করিয়া আসিতেছি, আর তোমরা জীবনের এই গোটাকতক দিন ইহা সহ্য করিতে পার না? দেখ, এক্ষণে যে পর্ব্বতটী অন্ধকারময়, একটু পরেই আবার উহা সূর্য্যকিরণ পাইয়া হাসিয়া উঠিবে, এই প্রকার হাঁসি কান্না কত ক্ষণস্থায়ী। ইহার জন্য দুঃখ কি?

গাড়ী দ্রুতবেগে চলিয়াছে, আমার মনও দ্রুতবেগে এক বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে ধাবিত হইতেছে। এক এক স্থানের পাহাড় গুলির দৃশ্য এমনই সুন্দর যে, ইচ্ছা হইতেছিল যদি গাড়ী তথায় কিয়ৎক্ষণ অপেক্ষা করিত, তাহা হইলে নামিয়া যাইয়া সেই পাহাড়ের উপর উঠিয়া তাহার সহিত একটু প্রেম করিয়া আসিতাম। চিল্কা হ্রদের মধ্যে যে সকল দ্বীপে পাহাড় রহিয়াছে, তাহার দৃশ্য আরও মনোহর। বিস্তীর্ণ হ্রদ, তাহার মধ্যে মধ্যে পাহাড় বন জঙ্গলে পরিপূর্ণ এবং হ্রদের কিনারায় অতি উচ্চ একটী পাহাড় এবং তাহার পাদদেশেই রেল লাইন এঁকে বেঁকে যাইতেছে। হ্রদের অতি দূরে ছোট ছোট নৌকাগুলি পাল তুলিয়া দিয়া যাইতেছে এবং হ্রদের কূলে বহু লোক ঘুনি পাতিয়া

বড় বড় কাঁকড়া ও নানাবিধ মৎস্য ধরিতেছে। একবার নামিয়া দেখিবার সাধ হইল বটে, কিন্তু গাড়ী সে সাধ পূর্ণ করিতে দিবে কেন? সে নির্দ্দিষ্ট সময়ের অধীন, সুতরাং কোন স্থানে বেশীক্ষণ থাকিবার স্বাধীনতা তাহার নাই।

এই প্রকার দেখিতে দেখিতে চিল্কা অতিক্রম করিলাম। B. N. রেলওয়ের রম্ভা নামক ষ্টেসনটী ঠিক চিল্কার উপর অবস্থিত। চিল্কা হ্রদ দেখিবার ইচ্ছা হইলে ভ্রমণকারিগণ এই স্থানেই অবতরণ করিয়া থাকেন। পূর্ব্বে যোগাড় করিতে পারিলে কালিকোটার রাজার ডাক-বাঙ্গালায় থাকিবার যোগাড়ও হইতে পারে। উক্ত রাজার একটী বৃহৎ বাড়ী ষ্টেসন হইতে প্রায় ১॥ মাইল দূরে আছে; তাহাও একটী দর্শনীয় স্থান। কালিকোটা ষ্টেসন হইতেই মাদ্রাজ প্রদেশ আরম্ভ হইয়াছে এবং রম্ভাই উহার পরবর্ত্তী ষ্টেসন। কালিকোটার রাজবাড়ী কয়েকটী পাহাড়ের উপত্যকা-ভূমিতে অবস্থিত। ট্রেণ হইতে রাজবাড়ী যাইবার রাস্তাটী দেখিতে পাওয়া যায় বটে, কিন্তু অট্টালিকা দেখিতে পাওয়া যায় না। রম্ভা এবং কালিকোটা হইতে আজ কাল অনেক চিল্কার মৎস্য কলিকাতাতে প্রেরিত হইয়া থাকে। শীতকালে বড় বড় সাহেবগণ এই স্থানে হ্রদের মধ্যে অনেক পক্ষী শিকার করিতে আসিয়া থাকেন। ঘটনাসূত্রে একবার কালিকোটা ষ্টেসনে কয়েক ঘণ্টা অবস্থিতি করিতে হইয়াছিল, সেই সময়ে ইহার নিকটবর্ত্তী বনে ভ্রমণ করিতে গিয়াছিলাম—তাহার মধ্যে নানাবিধ আম, জাম, বেল প্রভৃতির বৃক্ষ দেখিয়া পূর্ব্বকালের যোগী ঋষিগণ কি ভাবে জীবন কাটাইতেন, তাহার একটু ধারণা করিতে পারিয়াছিলাম।

চিল্কা হ্রদ অতিক্রম করিয়া গাড়ী সবেগে চলিতেছে, ক্রমে সূর্য্যদেব অস্তমিত হইলেন এবং যে জগৎ এতক্ষণে জনকোলাহলে ধ্বনিত হইতেছিল, তাহা ক্রমে ক্রমে নিস্তব্ধতায় পরিপূর্ণ হইতে লাগিল। বাহিরের আর কিছুই দর্শনযোগ্য থাকিল না, কেবল গাড়ী মধ্যে মধ্যে কোন একটী পুলের উপর দিয়া গমন কালে উহার ঘনঘটা ধ্বনি কর্ণে আসিতে লাগিল। সমস্ত দিন আকাশ অল্প অল্প মেঘাচ্ছন্ন ছিল, সুতরাং রাত্র অত্যন্ত অন্ধকারময় দেখাইতেছিল। এই প্রকারে ছত্রপুর, বহরমপুর, ইচ্ছাপুর প্রভৃতি বড় বড় স্থান অতিক্রম করিয়া প্রাতঃকালে বিজয়নগরে পৌঁছিলাম।

এই স্থানে একজন রাজা আছেন—স্থানটীর নাম বিজয়নগর; কিন্তু ইংরেজী ভাষায় ইহার নামকরণ হইয়াছে ভিজিয়ানাগ্রাম (Vizianagram), সহরটী দর্শনযোগ্য বটে; এখানে জলের কল, ড্রেন প্রভৃতি আধুনিক সভ্যতার লক্ষণাদি সমস্তই বর্ত্তমান আছে। রাজার ব্যয়ে একটী কলেজও বেশ চলিতেছে। বাজারে একটী স্তম্ভের চারিদিকে চারিটী বড় বড় ঘড়ি আছে এবং শাক সবজী ইত্যাদিও মন্দ পাওয়া যায় না। এদেশের লোক লঙ্কা মরিচ ও তেঁতুল একটু অধিক পরিমাণে ব্যবহার করিয়া থাকে, সুতরাং ঐ দুইটী দ্রব্যের আমদানি অপেক্ষাকৃত বেশী। রেল ষ্টেসনের নিকটেই অতি বিস্তীর্ণ একটী জলাশয়ের অবশিষ্টাংশ দেখিতে পাওয়া যায়, উহা প্রায়ই ভরাট পড়িয়াছে, এত বড় জলাশয় কুত্রাপি প্রায় দেখা যায় না। এই স্থানে আহারাদি করিয়া বেলা ২॥টার সময় ডাকগাড়ীতে উঠিয়া মাদ্রাজ রওনা হইলাম।

ক্রমশঃ

শ্রীরতিকান্ত মজুমদার।

সঙ্গণিকা।

(১)

বিগত ১২ই বৈশাখ, বৃহস্পতিবার, ৮২ বৎসর বয়সে বাঙ্গালা-সাহিত্যের পরম-সহায় শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় মহাশয় স্বর্গত হইয়াছেন। যত দিন বাঙ্গালা সাহিত্য থাকিবে, তত দিন তাঁহার নাম অক্ষয়। বাঙ্গালা-সাহিত্যের দুর্দ্দিনে, দুঃখ-দারিদ্র্য-প্রপীড়িত গ্রন্থকারদিগকে যেরূপ ভাবে তিনি সাহায্য করিতেন, তাহার তুলনা নাই। তাঁহার নিষ্কলঙ্ক চরিত্র, দয়া এবং দেশানুরাগ চিরদিন সাহিত্যসেবিগণের অন্তরে বদ্ধমূল থাকিবে। শেষ বয়সে রোগশয্যায় পড়িয়াও "ভারতবর্ষ" প্রচার সঙ্কল্পে সহায়তা করিয়াছিলেন। তাঁহার তিরোধানে বাঙ্গালার যে অভাব হইল, তাহা যে শীঘ্র পূর্ণ হইবে, সে সম্ভাবনা নাই। বিধাতা শোকসন্তপ্ত পরিবারে শান্তিধারা বর্ষণ করুন।

(২)

বিগত ১৭ই বৈশাখ, মঙ্গলবার, ৺আনন্দমোহন বসু মহাশয়ের পত্নী শ্রীমতী স্বর্ণপ্রভা বসু মহাশয়া দেহরক্ষা করিয়াছেন। তিনি মহাত্মা ৺ভগবানচন্দ্র বসু মহাশয়ের জ্যেষ্ঠা কন্যা এবং দেশবিখ্যাত শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয়ের জ্যেষ্ঠা ভগ্নী। অশেষ গুণগ্রামে এই দুই বসু-পরিবারই বঙ্গের সর্ব্ববিধ উন্নতির কারণ। অমায়িকতা, সহৃদয়তা, দেশানুরাগ, পবিত্রতা এবং ধর্ম্মানুরাগ এই দুই বসু-পরিবারের অলঙ্কার স্বরূপ। অহঙ্কার কাহাকে বলে, এই দুই পরিবারের কেহ তাহা জানে না। আনন্দমোহন-চরিত্র আমাদিগের সদা অনুধ্যানের বিষয়। স্বর্ণপ্রভার চরিত্রের ঔজ্জ্বল্যে শুধু এই দুই পরিবার নয়—ব্রাহ্মসমাজ এবং বঙ্গদেশ উজ্জ্বল ছিল। স্বদেশের সর্ব্বপ্রকার হিতসাধন এই দুই পরিবারের যে জীবনের তপস্যা, তাহা স্বর্ণপ্রভার চরিত্রে বিশেষ ভাবে পরিস্ফুট হইয়াছিল। এরূপ নিরহঙ্কার মূর্ত্তি এ সংসারে বড় বিরল। স্বর্ণপ্রভার আদর্শ জীবনের অভাবে এ দেশ বিশেষ ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইলেন। বিধাতার মঙ্গল ইচ্ছা পূর্ণ হউক।

(৩)

আর একটী আদর্শ মহিলা ছিলেন, তাঁহার নাম হরিসুন্দরী হালদার। তিনিও বিগত ১৭ই চৈত্র, রবিবার, মর্ত্ত্যলীলার অতীত হইয়াছেন। তিনি বিজনীর দেওয়ান ৺বরদানাথ হালদারের পত্নী, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ হালদার মহাশয়ের জননী এবং সুবিখ্যাত শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাস মহাশয়ের শ্বশ্রূ-ঠাকুরাণী। তদীয় ঘটনা-বহুল জীবনে শুধু অকৃত্রিমতা, সরলতা, পবিত্রতা এবং ধর্ম্মানুরাগই প্রকট হইয়াছিল। এ সংসারে তাঁহার শত্রু আছে বলিয়া শুনি নাই, পৃথিবীতে তাঁহার আদর্শানুপ্রাণিত নরনারীর সংখ্যা কম নয়। তাঁহাকে দেখিলেই পবিত্রতা প্রাণে জাগিয়া উঠিত। তাঁহার তপস্যা-নিরত নীরব পবিত্র জীবন আমাদের চির আদর্শ হইয়া থাকুক।

(৪)

হোমরুলের নেতৃগণ প্রতিহত হইলেন—কিন্তু তাহার ফল ভাল হইবে বলিয়া মনে হয় না। লাট সাহেবের উক্তিও আশাপ্রদ নয়। যাঁহার যাহা বলিবার আছে, বলিতে দেওয়াই সঙ্গত। প্রহৃত ফণীর বেগ প্রতিহত করিতে কে কবে সমর্থ হইয়াছে? ইতিহাসের

শিক্ষা দীক্ষা কি অলীক বলিয়া প্রতিপন্ন হইবে? কে বুঝে না, নিষ্পেষণ বা কি প্রকার এবং প্রসাদ বা প্রসন্নতা বা কি? এ নিপীড়িত জাতি নীরব সাধনায় ডুবিয়া যাক্ না কেন?

(৫)

২৭শে এপ্রেল, শনিবার, মহামতি বড়লাট বাহাদুরের আহ্বানে ভারতের নেতৃবৃন্দের বৈঠক বসিয়াছিল। টাকা ও লোক চাই, এই দুই কথারই বিশেষ আলোচনা হইয়াছিল। অনেকেই সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। এ দেশে বলপূর্ব্বক সৈন্য সংগ্রহ হইবে না, পরন্তু হোমরুলও প্রদত্ত হইবে না, ঘোষিত হইয়াছে। উপাধিলোলুপগণ যাহার জন্য নৃত্য করিতেছিলেন, তাহা পূর্ণ হয় নাই!

(৬)

অন্তরীণদের পরিবারের সাহায্য-কল্পে অর্থ সংগ্রহ হইতেছে, আবেদন নিবেদন-তৎপর দেশে ইহা এক শোভন চিত্র। এইরূপে নেতৃগণ যদি সেবায় তৎপর হন, মৃত জাতি জাগরিত হইবে। আমাদের গভীর কৃতজ্ঞতা তাঁহাদের চরণে অর্পণ করিতেছি।

(৭)

ধীরে ধীরে হিন্দুসমাজ হইতে বাল্য-বিবাহ উঠিয়া যাইতেছে, কিন্তু ব্রাহ্মসমাজে রূপান্তরে স্থানে স্থানে বাল্যবিবাহ প্রশ্রয় পাইতেছে। ছোট সমাজের ৩৪ জন আচার্য্য! বাঁশ হইতে কঞ্চি দড়!! শুনিতেছি, তাঁহাদের কেহ কেহ বাল্য-বিবাহ অনুমোদন করেন। নেতৃবৃন্দের সতর্ক হওয়া একান্ত কর্ত্তব্য।

(৮)

ঢাকার সাহিত্য-সম্মিলন কোনরূপে হইয়া গিয়াছে,—এবার কোনরূপে পিতৃরক্ষা হইয়াছে। শুনিলাম, ঢাকার কবি, শ্রীযুক্ত গোবিন্দচন্দ্র দাসের ও শান্তিপুরের কবি, শ্রীযুক্ত বেণোয়ারী গোস্বামী প্রভৃতির নিমন্ত্রণ হয় নাই। খেয়াল চরিতার্থের কেন্দ্রে এরূপ হওয়া বিচিত্র নয়। ইহা যে কর্ত্তাভজাদের রাজত্বের সময়!

(৯)

বিগত ১৫ই বৈশাখ, রবিবার, কাঁঠালপাড়ায় বঙ্কিম-প্রতিভার জয় ঘোষিত হইয়াছে, এ সংবাদে আমরা যারপর নাই আনন্দিত হইয়াছি। বন্দেমাতরম-মন্ত্রের ঋষির জয়-জয়কারে দেশ পূর্ণ হউক।

(১০)

সঙ্গণিকার তীব্র মন্তব্যে অনেকেই বিরক্ত। পরন্তু, যাহাকে লক্ষ্য করিয়া যে কথা বলা হয়, তাহা বুঝিতে অনেকেই ভুল করেন; এবং নিজ শিরে অন্যের দোষ গ্রহণ করিয়া হতবুদ্ধি হন। ভাষাজ্ঞান এবং ঘটনা-পারম্পর্য্যের ইতিহাস-জ্ঞান না থাকাতেই এরূপ হইয়া থাকে। পণ্ডিতের সকলই গুণ, শুধু দোষ, মূর্খতা।

(১১)

বিগত ২০শে বৈশাখ, ৩রা মে, শুক্রবার প্রাতে বঙ্গের গৌরব নসীপুরের মহারাজা শ্রীযুক্ত রণজিৎ সিংহ-বাহাদুর ৫৩ বৎসর বয়সে কলিকাতায় দেহরক্ষা করিয়াছেন। তাঁহার অকাল ও অকস্মাৎ মৃত্যুতে বঙ্গে হাহাকার উঠিয়াছে। তাঁহার তিরোধানে আমরা মর্ম্মাহত হইয়াছি। এরূপ কর্ম্মী এদেশে বড় বিরল। বিধাতা শান্তি দিন।
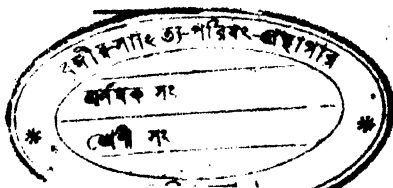
স্বায়ত্ত চিকিৎসা।*

একজন কৌতুকপ্রিয় বঙ্গকবি পরিহাস-ছলে বলিয়াছেন,

"জীবনটা কিছু না!—
একটা কিছু ইঃ,
একটা কিছু উঃ,
একটা কিছু আঃ,
জীবনটা কিছু না!"

এ শুধু কৌতুক পরিহাস নয়, কৌতুক পরিহাসের স্বচ্ছ আবরণের অন্তরালে আমরা এই উক্তিতে বিষাদের অশ্রুসিক্ত ছায়ামূর্ত্তি, একটা মর্ম্মন্তুদ দীর্ঘনিঃশ্বাস, নীরবগুণ্ঠিত দেখিতে পাই।

আবার একজন চিন্তাশীলা বঙ্গমহিলা নারীসুলভ কোমল-করুণ কণ্ঠে কবিত্বের পুষ্পচ্ছন্দে রূপকচ্ছলে বলিয়াছেন,

একদিন শরতের স্নিগ্ধমধুর আলোক-সম্পাতে "ধরা উজ্জ্বল মরকত পরিচ্ছদে ভূষিত হইয়াছে; সুনীল আকাশে শুভ্র নীরদখণ্ড সকল ইতস্ততঃ সঞ্চালিত হইতেছে; অস্তগামী সূর্য্যের সুবর্ণ কিরণ, ধরণীর শ্যামল অঙ্গে, কনক-অঞ্চল প্রসারিত করিয়াছে; পক্ষিগণ কলধ্বনিতে দিগন্ত ধ্বনিত করিয়া নীরব হইয়াছে; এমন সময়ে বনস্থলীর নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া ঘুঘু বিষাদ-ম্লান কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, "জীবন কি?"

শ্যামা তাহার মধুর স্বরলহরীতে বনভূমি পূর্ণ করিয়া বলিল, "জীবন সঙ্গীতময়।"

ছুছুন্দরী অন্ধকার ভূবিবর হইতে, মৃত্তিকারাশি সম্মুখে উৎক্ষিপ্ত করিয়া কহিল, "জীবন অন্ধকারের মধ্যে সংগ্রাম।"

কামিনী বিকাশোন্মুখ শত শত কুসুমের গন্ধভার চারিদিকে বিকীর্ণ করিয়া, ও সলজ্জ কপোলে পবিত্রতার আভা ঈষৎ বিকাশ করিয়া কহিল, "জীবন বিকাশ।"

প্রজাপতি কামিনী-বৃক্ষের চারিদিকে উড়িয়া উড়িয়া মধুপান করিতে করিতে তৃপ্ত কণ্ঠে কহিল, "জীবন ভোগসুখময়।"

মক্ষিকা সেই স্থান দিয়া উড়িয়া যাইতে যাইতে কহিল, "জীবন দুই দিনের লীলাখেলা মাত্র।"

পিপীলিকা স্বদেহ অপেক্ষা দশ গুণ খাদ্যের বোঝা বহিয়া যাইতে যাইতে কহিল, "জীবন দুরন্ত অস্থিপেশী শ্রম।"

ময়ূর নৃত্যভঙ্গীতে রূপের ছটা চারিদিকে ছড়াইয়া উচ্চ কেকারবে এই প্রশ্নে উপহাস করিয়া উঠিল।

এমন সময়ে, শারদ মেঘ সহসা ঝর ঝর শব্দে বারিধারা বর্ষণ করিয়া কহিল, "জীবন শুদ্ধ অশ্রুবিন্দুর সমষ্টি।"

বাজ অনন্ত আকাশে সুদৃঢ় বিশাল পক্ষদ্বয় বিস্তার করিয়া অগাধ প্রমুক্ত বায়ু-সমুদ্রে বিহার করিতে করিতে কহিল, "জীবন শক্তি ও স্বাধীনতা।"

ক্রমে নিশার আগমনে সেই কাননভূমি নীরব হইল, তখন সেই স্তব্ধ বিজনের গাম্ভীর্য্য ভঙ্গ করিয়া নৈশ বায়ু সর্ সর্ শব্দে কহিল, "জীবন স্বপ্ন।"

নিভৃত পাঠাগারে সমস্ত রজনী গভীর

* বিগত মাঘোৎসবে পূর্ব্ববাঙ্গালা ব্রাহ্মসমাজ-মন্দিরে প্রদত্ত বক্তৃতা।

অধ্যয়নের পর দীপ নির্ব্বাণ করিয়া পণ্ডিত কহিলেন, "জীবন শিক্ষার স্থান।"

উচ্ছৃঙ্খল যুবক প্রবৃত্তির হুতাশনে দীর্ঘ রজনী আহুতি দিয়া গৃহে ফিরিতে ফিরিতে কহিল, "জীবন অতৃপ্ত বাসনার অনন্ত শৃঙ্খল।"

প্রভাত বায়ু অস্ফুটস্বরে কহিল, "জীবন অসীম রহস্য।"

তখন সহসা পূর্ব্বদিক প্রভাতের রক্তিম আলোকে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। শুভ্রবসনা ঊষা কনক-থালে নবপ্রস্ফুটিত কুসুমভার লইয়া, বিশ্বদেবের পূজার জন্য উপস্থিত হইল। পক্ষিগণ প্রভাতী সঙ্গীত আরম্ভ করিল, প্রভাতবায়ু বিহগগীত ও কুসুমগন্ধ চারিদিকে বহন করিতে লাগিল; এমন সময়ে 'অরুণ-রাগরঞ্জিত গন্ধ-বিধুর প্রভাতে' নব দিবসের শুভ জন্ম মুহূর্ত্তে 'মুগ্ধ মধুরা' প্রকৃতির কণ্ঠে এই মহান সঙ্গীত উত্থিত হইল, "জীবন অনন্ত আত্মার আরম্ভ মাত্র।"

এইরূপ বিচিত্রমনা মানব চিন্তা ও কল্পনার রঙ্গিন কাচের ভিতর দিয়া জীবনকে বিভিন্ন ভাবে দর্শন করিয়া আবহমান কাল শোক-হর্ষের আবর্ত্তে বিঘূর্ণিত হইতেছে এবং অদম্য আকাঙ্ক্ষা ও অতৃপ্তির উষ্ণশ্বাস উন্মোচন করিতেছে।

এই জীবন-সমস্যার মধ্যে 'এক অতি দুর্ব্বোধ্য প্রহেলিকা' প্রতিনিয়ত মানব মনকে বিচলিত ও আন্দোলিত করিতেছে। সেই প্রহেলিকার গূঢ় রহস্য কিঞ্চিন্মাত্রও উদ্ভেদ করিতে অসমর্থ হইয়া মানব কত সময় ধর্ম্ম বিশ্বাস হইতে স্খলিত ও বিচ্যুত হইয়া পড়ে, এবং সংশয় ও নিরাশার গভীর কূপে নিপতিত হইয়া কতই আর্ত্তনাদ করিয়া থাকে। কিন্তু মানব আজীবন নিরবচ্ছিন্ন, অমিশ্র সুখ দুঃখ সম্ভোগ করিবে, রাজাধিরাজ বিশ্বনিয়ন্তা মঙ্গল-বিধাতার এমন আইন নয়। হর্ষের পাশে বিষাদ, বাসর-শয্যার অন্তরালে শর-শয্যা, মিলনের উৎসব-ক্ষেত্রের উপকণ্ঠে বিচ্ছেদ ও বিসর্জ্জনের ঘন নিবিড় ছায়াপাত, উল্লাস ও প্রমোদ কোলাহলের একৈকদেশে শোকসন্তাপের উচ্ছ্বলিত আর্ত্তনাদ, সূতিকা-গৃহের স্নিগ্ধ জ্যোতিঃ আনন্দ প্রদীপের পশ্চাতে শ্মশানক্ষেত্রের প্রজ্বলিত ভীষণ চিত'-বহ্নি—এইরূপ বৈষম্যপূর্ণ, বিপরীত-ভাবাত্মক এক অলঙ্ঘ্য অচ্ছেদ্য নিগড়ে মানুষ আমরণ বাঁধা। এই জন্যই মানব অনেক সময়ে মনে করে, এই পৃথিবীটা একটা গারদ, একটা কারাগার, একটা নিদারুণ শোক সন্তাপ ও দুঃখ যন্ত্রণার বিস্তীর্ণ উর্ব্বরক্ষেত্র। এই জন্যই একজন বিখ্যাত জর্ম্মন দার্শনিক এই মর্ত্ত্য-ধামকে একটা penal colony—দণ্ডিত-অপরাধী বা দুঃখি-তাপি-গণের উপনিবেশ বলিয়াছেন।' এই জন্যই একজন ইংরেজ কবি, বিক্ষিপ্ত মানবের কোন স্থিরভূমিতে দাঁড়াইবার ঠাঁই না দেখিতে পাইয়া, দুঃখার্ত্ত-চিত্তে বলিয়াছেন, "Man! thou pendulum betwixt a smile and tear."—মানব, তুমি ঘড়ির দোলদণ্ডের ন্যায় অস্থির হইয়া হাসি-কান্নার মধ্যে অহরহ দুলিতেছ।

বিচিত্র-প্রকৃতি মানব কখনও ভ্রান্ত, কখনও মোহগ্রস্ত হইয়া এমনই করিয়া জীবনকে বিচিত্ররূপে দর্শন করিতেছে; এবং শোক হর্ষের ক্রীড়ণকরূপে নিতান্তই কৃপার পাত্র হইয়া কখনও নিষ্পেষিত, কখনও উল্লসিত হইতেছে। এই বিক্ষেপের মধ্যে মানবের একটা বিপুল অজ্ঞানতা যুগে যুগে পরিলক্ষিত হইয়াছে। প্রাচীন গ্রীস দেশীয় তত্ত্বজ্ঞানী Democritus এই অজ্ঞানতা

হৃদয়ঙ্গম করিয়া কেবলই হাসিতেন, সেই জন্য লোকে তাঁহাকে Laughing philosopher বলিত; আর Ephesusবাসী মহাপণ্ডিত Heraclitus তদ্দর্শনে কেবলই ক্রন্দন করিতেন, সেই জন্য তিনি Weeping philosopher আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এই দুইয়ের হাসি ও কান্নার বাহ্য কারণ এক হইলেও ইহাঁদের আভ্যন্তরীণ অবস্থা সুমেরু ও কুমেরু কেন্দ্রের ন্যায় সম্পূর্ণ বিপরীত ভাবাপন্ন ছিল, তাই একজন ঐ একই কারণে কেবলই হাসিতেন, আর এক জন কেবলই ক্রন্দন করিতেন।

মানবের এই যে অজ্ঞানতা, ইহার একটা বিশেষত্ব এই যে, ইহার বশবর্ত্তী হইয়া সে জীবনের সুখের ভাগকে নিতান্ত ছোট করিয়া এবং দুঃখের ভাগকে সর্ব্বদাই নিরতিশয় বাড়াইয়া দেখিয়া থাকে। "Sufficient unto the day is the joy thereof"—প্রতিদিনের জীবনের যে আনন্দ, তাহাই যে সেই দিনের পক্ষে যথেষ্ট,ইহা সে ভুলিয়া যায়। প্রতি নিশ্বাসে প্রশ্বাসে, ভোজ্যবস্তুর প্রত্যেক গ্রাসের প্রতি চর্ব্বণে, প্রেমাস্পদের প্রত্যেক দৃষ্টি-সম্পাতে জীবনের এমন আরও শত সহস্র বিষয়ে মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে কত সুখ, কত আনন্দ আমাদিগকে বরণ ও অভিবাদন করিতেছে, সেদিকে তার দৃষ্টি পড়ে না; কিন্তু কোথায় কোন্ দুঃখর ছায়াটুকু আছে, তাহাতেই তাহার হৃদয় মন আহত ও বিদ্ধস্ত হইতেছে, তার মর্ম্মগ্রন্থী ছিন্নপ্রায় হইয়া যাইতেছে, নিরন্তর দাবদহনে সে জ্বলিয়া পুড়িয়া, তাহার দগ্ধহৃদয়োত্থিত হাহাকার আর্ত্তনাদে আকাশ প্রতিধ্বনিত করিতেছে, তাহার জীবনের পুষ্পাচ্ছাদিত উদ্যান-বর্ত্ম কুশবনের কণ্টকাকীর্ণ পথে পরিণত হইতেছে। 'দুঃখের নিদারুণ আঘাতে তাহার রুদ্ধ বক্ষ হইতে কত উষ্ণ নিশ্বাস উন্মোচিত হইতেছে, হৃদয়ের অভ্যন্তরে কি মহা বিপ্লব সংঘটিত হইয়া, সুখের ক্ষীণ প্রদীপ শিখাকে নির্ব্বাপিত করিয়া দিতেছে, আশার অরুণালোক নিরাশার তামসগর্ভে অস্তমিত ও বিলীন হইতেছে, সকল ধর্ম্মভাব, সকল নির্ভর, সহিষ্ণুতা ও বিশ্বাস,সমস্তই যেন বন্যাবিতাড়িত তৃণের ন্যায় কোথায় ভাসিয়া যাইতেছে, নিমেষের মধ্যে একেবারে যুগান্তর, মনে হয় যেন এই জীবন অনন্ত মরণের নিবিড় ছায়ায় সমাচ্ছন্ন হইতেছে।'

জীবনের এইরূপ চিত্র অঙ্কনে মানবের কল্পনা-প্রবণতা অত্যধিক পরিমাণে পরিলক্ষিত হয়। প্রাচীন জুডিয়া দেশের ইজ্রাইল্ বংশীয়গণের রাজা মহাত্মা দাউদ্ বহু শতাব্দী পূর্ব্বে বলিয়াছিলেন, "Man disquieteth himself in a vain shadow"—মানুষ অলীক ছায়ায় ভীত হইয়া বৃথা অশান্তি ভোগ করে। আমাদের দেশের নৈয়ায়িকগণ যে রজ্জুতে সর্পভ্রমের কথা বলিয়াছেন, মানুষের দুঃখভীতি সম্বন্ধে মহাত্মা দাউদের উক্তির মর্ম্মও তাহাই। কোথাও সর্প নাই, একটা রজ্জু মাত্র পড়িয়া রহিয়াছে, অথচ ভ্রমবশতঃ ইহাকেই সর্প মনে করিয়া যেমন লোক অনর্থক ভয়ে আড়ষ্ট হইয়া চমকিয়া উঠে, তেমনই অসুখ বা অশান্তির কোনও কারণ বিদ্যমান না থাকা সত্ত্বেও মানব অনেক সময়ে ভ্রান্ত বা কল্পনার বশবর্ত্তী হইয়া অকারণ মানসিক ক্লেশ ভোগ করিয়া থাকে।

মানবজীবনে অসুখ, অশান্তি নাই, এমন কথা বলিতেছি না। পরন্তু ইহা অতীব সত্য যে, আর সকল যেমন পর্য্যায়ক্রমে চক্রনেমির সমীপবর্ত্তী হয়, তেমনি সুখের পর দুঃখ

দুঃখের পর সুখ, চিরদিনই মানবের জীবন-ক্ষেত্রে সংঘটিত হইতেছে ; কিন্তু অতিশয় আশ্চর্য্যের বিষয় এই, সচরাচর আমরা যে সকল ঘটনাকে দুঃখ মনে করিয়া বিষাদে অবসন্ন হই, তাহার অনেকগুলিই বাস্তব অস্তিত্বহীন, আমাদের অসার উত্তপ্ত কল্পনার অতিপ্রাকৃত সৃষ্টি, নিতান্ত অলীক ছায়া মাত্র।

একটা প্রচলিত গল্পের দ্বারা এই কথাটা আরও সুস্পষ্ট হইবে। অহিফেনসেবিগণ কিছু অতিরিক্ত কল্পনা-প্রবণ বলিয়া চির-প্রসিদ্ধ। একদা একজন অহিফেনসেবী কোনও স্থানে তাহার পা দুখানি ছড়াইয়া বসিয়াছিল, এমন সময়ে একটা পিপীলিকা ঐ স্থান দিয়া যাইবার সময় উক্ত অহিফেন-সেবীর চরণদ্বয় অতিক্রম করিয়া সোজাসোজি চলিয়া যাইতে উদ্যত হইল। এই ব্যাপার দর্শন করিয়া অহিফেনসেবী তাহার সনাতন ধর্ম্মানুসারে ঝিমাইতে ঝিমাইতে বলিল, 'কেহে বাপু তুমি, শর্ম্মার পদযুগল উল্লঙ্ঘন করিয়া যাইবার উপক্রম করিয়াছ? থামো। তোমাকে যদি এখন আমার পা ডিঙ্গাইয়া যাইতে দি,তাহা হইলে তো দেখিতেছি, এখান দিয়া একটা সদর রাস্তা পড়িয়া যাইবে, খানিকক্ষণ বাদেই হয়ত আর্সলাটা, তারপর টিকটিকিটা, ক্রমে বেড়ালটা, কুকুরটা, গরুটা, হোতে হোতে ঘোড়াটা, হাতীটা, শেষে দেখ্‌ছি হাবড়ার রেলটা পর্য্যন্ত আমার পায়ের উপর দিয়া চলিয়া যাইবে ; but no, my dear, there is no thoroughfare here"—বাপু হে, এটা কিছু রাজপথ নয় যে, তুমি অবাধে এখান দিয়া চলিয়া যাইবে।" এইরূপে আহিফেনী-ন্যায়ের যথাযথ সূক্ষ্ম বিচার-বিতর্কের পর অহিফেনসেবী সিদ্ধান্ত করিল—"ভবিষ্যতে অতি ভয়ানক বিপদের আশঙ্কা দেখা যাইতেছে, অতএব সূত্রপাতেই তাহার মূলোচ্ছেদ করা কর্ত্তব্য।" আর কথা নাই, বেচারা পিপীলিকাকে শুধু তাহার গন্তব্য পথে বাধা দিয়া ক্ষান্ত না হইয়া সে তাহাকে তৎক্ষণাৎ একেবারে সংহার করিয়া তাহার কাল্পনিক বিভীষিকার হস্ত হইতে সদ্য নির্ম্মুক্তি লাভ করিল। কত মানব এই অহিফেনসেবীর ন্যায় কল্পনার রাশ ছাড়িয়া দিয়া মতিচ্ছন্ন হইয়া তিলকে তাল ভাবিয়া জীবনে কত অত্যাহিত করে ও কত কষ্ট পায়। মানবের এই অবস্থাকে লক্ষ্য করিয়াই কবি সতর্ক করিবার জন্য আশার আশ্বাস-বাণী উচ্চারণ করিয়া বলিয়াছেন,—

Beware of desperate steps ! the darkest day,
Live till tomorrow, will have passed away.

হতাশ হইও না, কল্য পর্য্যন্ত অপেক্ষা কর, মহা দুর্দ্দিনও চলিয়া যাইবে।

এই যে সচরাচর বলা হয়,এই জীবন একটা বন্ধন দশা, আর এই সংসার একটা গারদ বা কারাগার ব্যতীত আর কিছুই নহে,এ কথাটাও একটা প্রকাণ্ড কল্পনা। শাস্ত্র ও সাধকগণ চিরদিনই বলিয়াছেন, মানবাত্মা সকল বন্ধনের অতীত ; সত্য, প্রেম, পুণ্য প্রভৃতি মুক্ত বস্তু, এই সকলই আত্মার স্বধর্ম্ম, অতএব আত্মা মুক্ত, কোনরূপ বন্ধনের অধীন নহে। এই সংসার যখন মানবাত্মার বিধাতৃনির্দ্দিষ্ট স্বস্থান, তখন ইহা তাহার কারাগার নহে, তাহার সহায় এবং পরিপুষ্টির ব্যবস্থা ও উপকরণে পরিপূর্ণ, সুতরাং ইহা তাহার ধর্ম্মসাধনের পুণ্যক্ষেত্র তপোবন। বস্তুতঃ আমাদের মোহ ও অজ্ঞতাজনিত যে কল্পনা, তাহাই বন্ধন

রচনা করে, এবং এই স্বদেশে স্বগৃহে আমাদিগকে কারাগারে নিক্ষেপ করে। আমাদের একজন ভক্তিভাজন আচার্য্য একদিন বলিয়াছিলেন, তাঁহার পিতামহ ঠাকুর স্বীয় পত্নীকে সাধন-পথের অন্তরায় মনে করিয়া সর্ব্বদাই তাঁকে আপদ নামে অভিহিত করিতেন। একদিন কোথা হইতে তিনি বাড়ী আসিয়া পত্নীকে গৃহে না পাইয়া আচার্য্য মহাশয়কে বলিলেন, "ওরে, আপদ কোথায় গেলরে, ডেকে নিয়ে আয়ত্তো।" আচার্য্য মহাশয় চিরদিনই একটু কৌতুকপ্রিয়, সেই বাল্য-বয়সেও তিনি পিতামহের আদেশক্রমে ঠাকুরমাকে পাড়ায় খুঁজিতে যাইয়া রহস্য করিবার জন্য চেঁচাইয়া ডাকিলেন, "ও ঠাকুর-দাদার আপদ, তুমি শীগ্‌গীর এসো, তুমি যাঁর আপদ, তিনি তোমায় ডাকছেন।" পাড়ায় হাসাহাসির রোল পড়িয়া গেল; বৃদ্ধ ঠাকুরদাদাও হাসি সম্বরণ করিতে পারিলেন না।

কিন্তু এইরূপ ভাবা সত্ত্বেও জীবন-দৃশ্যের আর একটা দিক আছে, যেদিকে সচরাচর মানবের দৃষ্টি পড়ে না। আমাদের 'জীবনের আদি ও অন্ত যেমন গভীর রহস্যপূর্ণ এবং আমাদের নিকট সম্পূর্ণ প্রচ্ছন্ন, তেমনি ইহার মধ্যভাগস্থিত আমাদের এই পার্থিব জীবিত-কালও এক দুরধিগম্য প্রহেলিকার অনিশ্চিত-তায় সমাচ্ছাদিত। তাই এই সসীম, পরিমিত শক্তি মানবের জীবনের সহিত শোক-দুঃখের স্বাভাবিক সম্বন্ধ, তাই দুঃখ মানবের নিত্য সহচর, তাহার অস্তিত্বের অভিন্ন ও অবিচ্ছেদ্য আনুষঙ্গিক। দুঃখের ভাগ না থাকিলে মানবজীবন অপূর্ণ থাকিত, সুখের আস্বাদ ও আকর্ষণ—অন্য কথায়, সুখের সুখত্ব—তিরোহিত হইয়া যাইত। জড়ের বৃদ্ধি ও বিকাশের জন্য শীতাতপ ও আলোক-অন্ধকার যেমন অবশ্য প্রয়োজনীয়, বিধাতার সৃষ্টিরহস্যে সুখ দুঃখ, সম্পদ বিপদ, প্রভৃতির চক্রাৎ আবর্ত্তন ও মানব আত্মার অনন্ত উন্নতি এবং কল্যাণের জন্য তেমনই অপরিহার্য্য। দুঃখের ভিতর দিয়াই মানবের মনুষ্যত্বের বিবর্ত্তন ও পরিশেষে দেবত্বের উন্মেষ ও বিকাশ। দুঃখই মানবকে সসীম ছাড়াইয়া অসীমের দিকে উন্মুখ করে, দুঃখই যোজকরূপে স্বর্গের সহিত মর্ত্ত্যকে গ্রথিত করিয়া দেয়। তাই ত দুঃখের রাগিণীর আলাপে আমাদের হৃদয় এত সহজে বিগলিত ও মুখরিত হয়, বিষাদ-সঙ্গীত এত সহজে হৃদয়-তন্ত্রীকে ঝঙ্কারিত করিয়া এক অপূর্ব্ব, অনির্ব্বচনীয় চেতনায় জাগাইয়া তোলে। শোকেই ত শ্লোকের উৎপত্তি, সুপ্ত কবিত্বের ব্যক্ত উৎসারণ।'

'আর একটী ভাবিবার ও বুঝিবার কথা এই—জীবনের কোন্ ঘটনা মানবের আয়ত্তা-ধীন? মানবের জন্ম, মৃত্যু, পরিণয়, উত্থান, অবস্থান ও ভোগ, ইহাদের কোনটীর উপর তাহার কি কোনও হাত আছে? এই মৃত্যুর লীলাক্ষেত্রে আমরা যে কিসে জীবিত রহিয়াছি, তাহা কি আমরা জানি? তবে একদেশদর্শীর ন্যায় বিচার কেন? ইহা দেখিবার বিষয় নহে কি যে, উদ্ভূত ঘটনা বিশেষ যে আমাকে আসিয়া স্পর্শ করিতেছে, তাহা ত একমাত্র মালিক বিশ্বনিয়ন্তারই ইচ্ছায়? সেই মালিক কি এতই নির্ম্মম, নিষ্ঠুর? তাহার হৃদয় কি এমনই পাষাণে গঠিত? যে মানবের অন্তরে জ্ঞান, প্রেম ও পুণ্যের অদম্য অগস্ত্য-পিপাসা, যাহার তৃষিত আত্মা ব্রহ্মাণ্ড শোষণ করিতে চায়, তাহার পরিণাম কি বিষাদ-অন্ধকারের অন্ধগর্ভ বা

নিরাশা-অবিশ্বাসের নির্ব্বাণ-কোল? এই যে অমুক আমার দুঃখ যন্ত্রণার মূলীভূত কারণরূপে প্রতীয়মান, সেই কারণের কার্য্য যে আমাকে আসিয়া স্পর্শ করিল, তাহার পশ্চাতে কি প্রেমময়, মঙ্গলময় বিধাতার হস্ত প্রচ্ছন্ন ভাবে বিদ্যমান নহে? তিনি ত আমার দেহের বর্ম্ম, আত্মার অক্ষয় কবচ হইয়া আমাকে আবরিত করিয়া রহিয়াছেন, তিনি যদি অনুমতি না করেন, ইচ্ছা করিয়া পথ ছাড়িয়া না দেন, তবে তাঁহাকে, সেই সর্ব্বশক্তিমান মালিককে, অতিক্রম করিয়া মানবের পাপসম্ভূত বা অন্য-বিধ কোনও ঘটনা ত আমার কেশাগ্রও স্পর্শ করিতে পারে না। পাপিষ্ঠগণের পাপবুদ্ধি-প্রসূত কার্য্য যে মহাত্মা ঈশার মৃত্যুর নিদান হইল, ইহা কাহার ইচ্ছায়? ইহা বিশ্বনিয়ন্তার মঙ্গলবিধানে হইয়াছিল বলিয়াই ত ঈশা আজ পৃথিবীর সম্মুখে আলোকস্তম্ভ রূপে শোভমান। সেই এক প্রভু, এক মঙ্গল-বিধাতা ভিন্ন আমাদের উপর দ্বিতীয় কাহারও কোনওরূপ কর্ত্তৃত্ব নাই, এই বিশ্বাসে দৃঢ়-প্রতিষ্ঠিত হইয়া চিত্তকে স্থির, নিরুদ্বেগ ও আশ্বস্ত করাই দুঃখ সমস্যা হইতে নিষ্কৃতি লাভের প্রকৃষ্ট অনুসরণীয় পন্থা। যিনি পূর্ণ জ্ঞান ও পূর্ণ মঙ্গল, তাঁহারই ইচ্ছায় নিখিল ঘটনাস্রোত প্রবাহিত হইয়া আমাকে আসিয়া স্পর্শ করিতেছে, এই বিশ্বাসের মহা মন্ত্র সাধন করিতে পারিলে ঘটনা বিশেষের আঘাত-জনিত বেদনার তীব্রতা তিরোহিত হইয়া যায়, ব্যথিত হৃদয়ে স্নিগ্ধ সান্ত্বনার শীতচন্দন প্রলিপ্ত হয়। তাঁহারই ইচ্ছার নিকট নিজের ইচ্ছাকে সম্পূর্ণরূপে উৎসর্গ করিতে না পারিলে দুঃখের হস্ত হইতে অব্যাহতি-লাভের কোনও সম্ভাবনা নাই।' এই উৎসর্গ বা আত্মদান, এই দাসত্ব স্বীকার, বিধাতার দাসখতে স্বেচ্ছায়, সজ্ঞানে, সানন্দে স্বাক্ষরই জীবন-রাজ্যের স্বাধীনতা, এই বিদ্রোহ বিসর্জ্জনই জীবন-রাজ্যে স্বরাজ প্রতিষ্ঠা বা Complete autonomy within the Empire. 'যিনি দুঃখের মধ্যে ঈশ্বরের হস্ত সন্দর্শন করেন, তিনি যে কেবল তাহা নীরবে বহন করিতে পারেন, এমন নহে, তিনি দুঃখ আসিলে তাহাকে কোন বিশেষ মঙ্গলের অগ্রদূত মনে করিয়া আনন্দিত ও কৃতজ্ঞ হন, এবং ইহা অপেক্ষাও আশার কথা এই যে, এমন এক সময় আসে, যখন তিনি দুঃখকে দুঃখ বা নির্য্যাতন বলিয়া ঘুণাক্ষরেও মনে করিতে পারেন না, ধর্ম্মজগতের ইতিহাসে ইহার অনেক সাক্ষ্য রহিয়াছে।' 'তাপসী রাবেয়া যখন মৃত্যুশয্যায় শায়িতা, তখন মালেক ও হোসেন নামে দুইজন বিখ্যাত ঋষি তাঁহাকে দেখিতে আসেন। জ্ঞানী হোসেন রুগ্ন রাবেয়াকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন,

—"Whose prayer is pure,
Will God's chastisements endure."

—যাঁর প্রার্থনা নির্ম্মল, তিনি ঈশ্বরের শাসন সহ্য করিবেন। তখন মালেক আরো গভীরতা ভাবাপন্ন হইয়া বলিলেন;

"He who loves his master's choice,
Will in chastisement rejoice."

—যিনি প্রভুর নির্ব্বাচনকে ভালবাসেন, তিনি শাসনে আনন্দিত হইবেন।'

সাধ্বী রাবেয়া দেখিলেন, ইহাদের কথায় তখনও সূক্ষ্মভাবে স্বেচ্ছা ও সমালোচনার সংশ্রব রহিয়াছে, বিশ্বাসের পূর্ণ গাঢ়তা লক্ষিত হয় না। তখন তিনি ভাবে বিভোর হইয়া, একেবারে তন্ময় হইয়া বলিলেন,

O, men of Grace!
He who sees his master's face,

Will not in his prayers recall
That he is chastised at all.

যে ঈশ্বরানুগৃহীত ব্যক্তিগণ, যে প্রভুর মুখ দেখিতে পায়, সে কিছুমাত্রও শাসিত হইতেছে, এমন কথা কখনও প্রার্থনার সময় স্মরণ করিবে না।"

এইরূপ নির্ব্বিকার ভাবকে শাস্ত্রে নানা অবস্থায় নানা নামে অভিহিত করা হইয়াছে। কখনও যোগ, কখনও সমাধি, কখনও নিঃশ্রেয়স কৈবল্য, মোক্ষ, মুক্তি, অপবর্গ, নির্ব্বাণ, বৈকুণ্ঠপ্রাপ্তি প্রভৃতি বহুবিধ শব্দে সেই একই ভাবকে ব্যক্ত করা হইয়াছে। এই গুলির বিপরীত ভাব যাহা, তাহাই মানবের আধ্যাত্মিক ব্যাধি, মানব মাত্রেই অল্পাধিক পরিমাণে এই ব্যাধিগ্রস্ত, তাই তাহার চিকিৎসার প্রয়োজন। পূর্ব্বে এই ব্যাধির উপশমের সহায় স্বরূপ যে সকল কথা উল্লেখ করিয়াছি, সেইগুলিকে চিকিৎসা-শাস্ত্রের ভাষায় prophylactic measures বা প্রতিষেধক উপায় বলা যাইতে পারে, কিন্তু তাহা প্রকৃতপক্ষে ঔষধ নামে বাচ্য হইতে পারে না। এই যে শোক দুঃখের অধীনতারূপ ভবব্যাধি, ইহার জন্য অনেক পেটেন্ট ঔষধেরও আবিষ্কার হইয়াছে। কখনও কোনও কাল্পনিক ঔষধেরও ব্যবস্থা দেখা যায়। এক একটা দৃষ্টান্ত দেই।

অদৃষ্টবাদ একটা মস্ত পেটেন্ট ঔষধ। বিজ্ঞাপনে অব্যর্থ, কাজে কিছু না। এই মতবাদ কখনও কোনও দেশের ধর্ম্ম হয় নাই, হইতে পারে না। ইহা একটী মত মাত্র, কেহ মানে, কেহ মানে না, ইহাতে নাকি ধর্ম্মের কিছুই যায় আসে না, তবুও ইহার প্রসার পৃথিবী ব্যাপিয়া। এই মত যে জাতিতে প্রবেশ করিয়াছে, সেই জাতিরই মহা সর্ব্বনাশ হইয়াছে। প্রাচীন গ্রীশ দেশের পৌরাণিক যুগে এই মতবাদ সে দেশের স্কন্ধে চাপিয়াছিল। মানব জীবনের অধিষ্ঠাত্রীরূপে সেখানে তিনটী Parcœ বা ভাগ্যদেবীকে স্বীকার করা হইত। কেহ কেহ উহাদিগকে স্বর্গের সেক্রেটারী (বা সম্পাদিকা) ও অনন্তের দপ্তরখানার রক্ষক বলিয়া বিশ্বাস করিতেন। ইহারা সর্ব্বপ্রধান দেবতা Zeus বা Jupiter ভিন্ন আর কোনও দেবতার অধীন ছিলেন না, মতান্তরে Jupiterএর উপরেও ইঁহাদের ক্ষমতা বিস্তৃত ছিল। আমাদের দেশেও এইরূপ অদ্ভুত মত প্রচলিত থাকার কথা শুনিতে পাওয়া যায়। কিম্বদন্তী এই সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মার উপরে বর্ষকালের জন্য তাহার সৃষ্ট অদৃষ্টের অধিষ্ঠাত্রী অন্যতম দেবতা শনৈশ্চরের কোপদৃষ্টি ছিল। ব্রহ্মা ইহাতে অভিমান বশতঃ বড়ই রুষ্ট হইলেন, এবং মনে মনে সংকল্প করিলেন, যে প্রকারেই হউক, শনির ভোগ চেষ্টাকে পণ্ড করিতে হইবে। এই উদ্দেশ্য সাধনার্থ ব্রহ্মা এক অভিনব উপায় উদ্ভাবন করিলেন,—তিনি সম্বৎসরের জন্য অতি গুহ্যতম এক পর্ব্বতগুহায় যাইয়া নিজকে লুকাইয়া রাখিলেন। এইরূপ অজ্ঞাতবাসের পর বৎসরান্তে তথা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া তিনি শনিকে উপহাস করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি শনি, তোমার না সম্বৎসরের জন্য আমার উপরে ভোগ ছিল, বল দেখি, ভোগ কাল কেমন সম্ভোগ করিলে? শনি হাসিয়া উত্তর করিলেন, "বিধাতঃ, আপনার বিধানে 'নিবার্য্যতে কেন ললাট লিখন?' অদৃষ্টলিপির কখনও অন্যথা হইতে পারে না, আমার ভোগ পূর্ণমাত্রায় হইয়া গিয়াছে, তা না হইলে আপনারই সৃষ্ট এই ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র শনৈশ্চরের ভয়ে ভীত হইয়া

আপনি স্বয়ং সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা—কেন পর্ব্বত গুহায় আশ্রয় লইয়া এই সুদীর্ঘকাল দুঃখভোগ করিবেন?" অদৃষ্টবাদিগণ অদৃষ্টের অপরিবর্ত্তনীয়তা প্রতিপন্ন করিবার উদ্দেশ্যে এমনই আজগুবি গল্পের সৃষ্টি করিয়াছেন। ইহা দ্বারা আর কিছু প্রমাণিত না হইলেও এই কথার বেশ প্রমাণ হয় যে, অলক্ষ্য-অদৃষ্টে বিশ্বাস করিয়া আমরা গল্পের ব্রহ্মার ন্যায় ভীত ও চিন্তাকুল হইয়া নিজেরাই নিজেদের দুঃখভোগের সাক্ষাৎ মূলীভূত কারণ হইয়া থাকি। যাহা হউক, এই যে গ্রীশদেশের ভাগ্যদেবীদের কথা বলিতেছিলাম, সেখানকার লোকদিগের বিশ্বাস ছিল মানবের জন্ম, জীবন ও মরণের নিয়ামক, এই দেবতাত্রয় হইতেই মানব জীবনের সমস্ত সুখ দুঃখ, মঙ্গলামঙ্গল ও পাপপুণ্য প্রসূত হইয়া থাকে, মানুষের কোনওরূপ কার্য্যাকার্য্যের দ্বারা এই সকলের কিঞ্চিন্মাত্রও ব্যতিক্রম হয় না। উত্তরকালে রোমকগণও গ্রীকদিগের অনুকরণে নিজেদের দেশে এই তিন ভাগ্যদেবীর পূজা প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন। সেইরূপ আমাদের দেশেও অদৃষ্টে অটল বিশ্বাস স্মরণাতীত কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। যদিও অদৃষ্ট নামে স্বতন্ত্র কোনও দেবতা নাই, তথাপি অদৃষ্টে বিশ্বাস আমাদের অস্থি মজ্জায় অনুপ্রবিষ্ট হইয়া রহিয়াছে। সদ্যোজাত শিশুর শুভ ষষ্ঠীবাসরে রজনীযোগে কুললগ্নাচার্য্য মহাশয় সূতিকা গৃহে রক্ষার জন্য তাল পত্রে লিখিয়া থাকেন,—

যৎক্ষণাৎ পতিত, বিন্দু মাতৃগর্ভে নিয়োজিতং।
তৎক্ষণাৎ লিখিতো ব্রহ্মা জন্মমৃত্যু শুভাশুভং॥

অর্থাৎ মাতৃগর্ভে ভ্রূণ বিন্দুর প্রথম সঞ্চার মাত্রেই ব্রহ্মা তাহার জন্ম, মৃত্যু, শুভাশুভ সমুদয় ঘটনা চিরদিনের মত তাহার ললাটে লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন। আমরা কথায় কথায় কপাল, বরাত, নছিব, কিস্মৎ ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার করিয়া থাকি। এই অদৃষ্টবাদের ঘূর্ণপাকে পড়িয়া বহু মানব দুঃখ হইতে নিষ্কৃতি লাভের চেষ্টা করিতে যাইয়া অধিকতর অনর্থ ও দুঃখে নিপতিত হয়। ইহা ব্যতীত আরও কত বিভিন্ন পেটেণ্ট ঔষধের ব্যবস্থা বিভিন্ন দেশে, বিভিন্ন কালে দেখিতে পাওয়া যায়। বর্ত্তমান যুগের কোনও কথা বলিব না, প্রাচীন গ্রীশদেশে দেখা যায়, উপরি উক্ত অদৃষ্ট দেবতাত্রয় ভিন্ন আরও এত সব দেবতার পূজা প্রচলিত ছিল যে, মোট সংখ্যা ৩০ হাজার ছিল, ইহার উপরেও অনেক দেবতা অনাবিষ্কৃত রহিয়াছেন বলিয়া গ্রীকদের বিশ্বাস ছিল, তাই পাছে পূজার সময় ভ্রমক্রমে ইহাদের কেহ বাদ পড়িয়া যান, সেই জন্য গ্রীকগণ একটা সাম্বৎসরিক উৎসব করিতেন, তার নাম ছিল Feast of the unknown Gods, অজ্ঞাত দেবতাদের পর্ব্ব বা উৎসব। যাহা হউক, বহু শতাব্দী ব্যাপিয়া এইরূপ বহু পেটেণ্ট মতবাদরূপ যে উর্ণনাভের জাল সৃষ্ট হইয়াছে, তাহার তন্তুবিতানে আবদ্ধ হইয়া একটা ঐতিহাসিক মহা জাতি আজ মৃত্যুর করাল গ্রাসে পতিত হইয়া পৃথিবীর মধ্যে অতি হেয়, নগণ্য ও ঘৃণিত হইয়া রহিয়াছে। অন্ধ অদৃষ্টবাদের ফলে কত লোক উৎসাহ উদ্যম বিহীন হইয়া অলীক শান্তির অনুসরণ করিতেছে, সমুদয় কার্য্যশীলতা পক্ষাঘাতগ্রস্ত হইয়া ইহারা একেবারে পঙ্গু জড়ভরত হইয়া পড়িতেছে। ঈশ্বরের পূর্ব্বাভিজ্ঞতা (fore-knowledge) ও পূর্ব্ব নিয়ামকতা (fore-ordination বা predestination), এই দুইয়ের মধ্যে জনসাধারণ কোনও প্রভেদ দেখিতে পায় না, একটীকে

মানিলেই যেন অপরটীকে অবশ্য মানিতে হইবে, এইরূপ মনে করেন।

যাঁহারা ব্যবহারজীব, তাঁহারা জানেন, বংশের continuity বা ধারাবাহিকতা রক্ষার জন্য adoption বা পোষ্য গ্রহণের যে ব্যবস্থা আছে, তাহাকে Legal fiction বলা হয়। ইহা একটা আইনানুমোদিত কাল্পনিক কৌশল বিশেষ। যাহাকে পোষ্য গ্রহণ করা হয়, সেতো heir of the body বা ঔরসজাত উত্তরাধিকারী নয়, গতিকেই আইনসঙ্গত হইলেও প্রকৃতপক্ষে পোষ্য গ্রহণের দ্বারা বংশের continuity রক্ষা হয় না। সেইরূপ অদৃষ্টবাদও একটা ধর্ম্মরাজ্যের fiction মাত্র। চলিত বিশ্বাসে স্থান পাইয়া থাকিলেও ইহা দ্বারা প্রকৃত উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না। যাঁহারা ধর্ম্মের একটা সহজ সংস্করণ চান, Religion made Easyর অন্বেষণ করেন, তাঁহারাই সত্যধর্ম্মকে জীবন রঙ্গমঞ্চের পট যবনিকার অন্তরালে রাখিয়া ঈদৃশ কোন-না-কোন মায়া-মৃগের অনুসরণে প্রবৃত্ত হন, কল্পনার ছায়ামূর্ত্তি লইয়া ক্রীড়া করিয়াই তুষ্ট থাকেন। নিতান্ত অবাস্তব উপলক্ষেও ঈদৃশ লোকের এক প্রকার সাময়িক সুখের আস্বাদ অনুভূত হয়। এইরূপ কথিত আছে, একজন বৃদ্ধা ইংরেজ রমণীকে তাঁর পাদ্রী-পুরোহিত দুঃখ নাশ ও সুখ লাভের উপায় সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ উপদেশ প্রদানের প্রয়াস পাইলে, সেই রমণী তাঁর সমুদায় চেষ্টা উপেক্ষা করিয়া গম্ভীর ভাবে তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, "Reverend Sir, I find greater, yea, greater support in that comfortable word 'Mesopotamia' than in all that you have to tell me"—পুরোহিত ঠাকুর, আপনার আমাকে যা কিছু উপদেশ দেবার আছে, তার সকলের চেয়ে ঐ যে আরামপ্রদ Mesopotamia শব্দটী, তাহাতেই আমি অধিকতর বল পাইয়া থাকি। এই সুদীর্ঘ ভৌগোলিক Mesopotamia শব্দের উচ্চারণে উক্ত রমণী যে কেমন করিয়া এত আরাম লাভ করিতেন, তাহা মানব-বুদ্ধির অগোচর হইলেও তিনি যে সত্য সত্যই আরাম পাইতেন, তদ্বিষয়ে তাহার কবুল জবাবে সন্দেহ করিবার কোনও কারণ নাই। যাঁরা কবি Popeএর Rape of the Lock পড়িয়াছেন, তাঁদের মনে থাকিতে পারে, ঐ কবিতাতে Cave of the Spleenএর বর্ণনায় লেখা আছে, 'men prove with child' অর্থাৎ Hypochondria বা মনোবিকারগ্রস্ত পুরুষের এইরূপ ধারণা হয় যে, তাহার গর্ভ হইয়াছে। দক্ষিণ ভারতের কোন প্রদেশের একজন ইংরেজ পুরুষ ডাক্তারের সত্যসত্যই এইরূপ বিশ্বাস জন্মিয়াছিল যে, তাঁহার গর্ভ হইয়াছে, এই জন্য পাছে চলাফেরার দরুণ তাঁহার গর্ভপাত হইয়া যায়, এই আশঙ্কায় তিনি রোগী দেখিবার জন্য বাহিরে যাওয়া বন্ধ করিয়া দিয়া গর্ভবতী নারী যেমন অতি সন্তর্পণে সর্ব্বপ্রযত্নে তাহার গর্ভরক্ষা করিয়া চলে, তেমনই এই ডাক্তার সাহেবও তাঁহার গর্ভ রক্ষা করিয়া চলিতে আরম্ভ করিলেন। ইহা যেমন একটা ব্যারামের ফল, তেমনি Mesopotamia শব্দ উচ্চারণ প্রভৃতির ন্যায় দুঃখনাশের উপায় অবলম্বনকে আধ্যাত্মিক ব্যাধির পেটেণ্ট ঔষধ না বলিয়া ইহা নিজেই একটা ব্যাধি, এইরূপ বলাই সঙ্গত। বর্ত্তমানে Mesopotamiaর সহিত ইংরেজ রাজের এমন ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধের দিনে—যখন ইহার নাম ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সর্ব্বত্র অহর্নিশি উচ্চারিত হইতেছে—এই সময়ে যদি সেই ইংরেজ

রমণীটী বাঁচিয়া থাকিতেন, তাহা হইলে না জানি মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে তিনি কত বৈকুণ্ঠ সম্ভোগের সুখ আস্বাদন করিতেন!

যাহা হউক, মানবের ভব ব্যাধির চিকিৎসার জন্য যেমন নানাপ্রকার উদ্ভট উপায় পরিকল্পিত হইয়াছে, সেইরূপ নানাবিধ বহুমূল্য শাস্ত্রও প্রণীত হইয়াছে। দর্শন শাস্ত্রগুলি ইহাদের মধ্যে খুব প্রধান স্থানীয়, সন্দেহ নাই। কিন্তু ইহাদের অধিকাংশই দুঃখ নিবৃত্তির অন্বেষণে প্রস্থিত হইয়া এমন তর্কজালের গহনে প্রবেশ করিয়াছেন যে, পণ্ডিতেতর সর্ব্বসাধারণ লোকের পক্ষে পথ চিনিয়া চলা অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে। কপিলকৃত সাংখ্য দর্শন ঈশ্বরকে একেবারে বর্জ্জন করিয়াছেন। ত্রিবিধ অর্থাৎ সর্ব্ববিধ দুঃখের ঐকান্তিক ও আত্যন্তিক নিবৃত্তির জন্য তিনি ঔষধ সেবনাদি লৌকিক উপায় এবং যজ্ঞাদি অনুষ্ঠানরূপ বৈদিক উপায় নানা দোষদুষ্ট বলিয়া অসমীচীন বলিয়াছেন, এবং জ্ঞানই প্রকৃষ্ট উপায় বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু এই জ্ঞান ঈশ্বর জ্ঞান নহে, প্রকৃতি-পুরুষের বিবেক বা পার্থক্য জ্ঞান। এই জ্ঞানের উপদেশ দিতে যাইয়া তিনি সত্ত্বাদি অষ্টপ্রকৃতি, ইন্দ্রিয়াদি ষোড়শ বিকার ও পুরুষ, এই পঞ্চবিংশতি তত্ত্বের বিচার অবতারণা করিয়াছেন। ইহাতে সৃষ্টিতত্ত্বের বিশেষ আলোচনা হইয়াছে বটে, কিন্তু যে মুক্তির আশায় এই দর্শনের সূত্রপাত, এই আলোচনাত্মক জ্ঞানে সে মুক্তির সন্ধান পাওয়া যায় নাই, কারণ সে জ্ঞান তত্ত্বজ্ঞান বা ব্রহ্মজ্ঞান নহে। কিন্তু জ্ঞানের দিকে যে মানবকে অগ্রসর করা হইয়াছিল, সেই হিসাবে এই দর্শনের মূল্য অতুলনীয়। তার পর পতঞ্জলি দুঃখ নিবৃত্তির জন্য কাপিল দর্শনকে অসক্ত বুঝিয়া, তাঁর যোগ দর্শনে সাংখ্যের পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব স্বীকার করিয়া ইহার উপরে ঈশ্বরকে ষড়বিংশ তত্ত্বরূপে প্রচার করেন। কিন্তু এই সকল তত্ত্বের আলোচনা ইহার মুখ্য বিষয় নহে, যোগই ইহার মুখ্য প্রতিপাদ্য বিষয়। এই দর্শন মতে প্রকৃতি ও পুরুষের নিশ্চল ভেদজ্ঞা ই মোক্ষলাভের পন্থা এবং এই ভেদজ্ঞান লাভের একমাত্র উপায় যোগ। এই যোগ কি?—না চিত্তবৃত্তির নিরোধ। এই নিরোধের উপায় অভ্যাস ও বৈরাগ্য প্রভৃতি বহুবিধ, তন্মধ্যে ঈশ্বর প্রণিধান অর্থাৎ ঈশ্বরে কর্ম্ম অর্পণ অন্যতম মাত্র। ঈশ্বরকে বাদ দিলেও যোগের চরমাবস্থা সমাধি সিদ্ধির কোনও বাধা হয় না। বহু দার্শনিক যুক্তি-তর্কের কুটজালে এই দর্শনেও লক্ষ্যসিদ্ধ হয় নাই, কিন্তু অষ্টাঙ্গ যোগের দিকে যে মানবের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হইয়াছে, ইহাতে এই দর্শনের মূল্য অসাধারণ। জৈমিনির পূর্ব্ব মীমাংসা দর্শনের কোথাও ঈশ্বরের কোনও প্রসঙ্গ নাই। নিরীশ্বর মীমাংসকেরা বেদবিহিত যাগাদি কর্ম্মকেই ধর্ম্ম বলিয়াছেন, ঐ সকলের অনুষ্ঠানকেই দুঃখ নিবৃত্তির উপায় নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, ঈশ্বরের সহিত সে উপায়ের কোনও সম্পর্ক নাই। ইহাতেও উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল না। তবে কর্ম্মের যে বিশেষ প্রয়োজনীয়তা আছে, সেই কথা প্রতিপাদন করিয়া মীমাংসা দর্শন মানবের বিশেষ উপকার সাধন করিয়াছেন, ইহাতে সন্দেহ নাই। গৌতমের ন্যায়দর্শন এবং কণাদের বৈশেষিক দর্শন ঈশ্বর স্বীকার করিয়াছেন বটে, কিন্তু অপবর্গ বা নিঃশ্রেয়স প্রাপ্তির অর্থাৎ দুঃখনাশের জন্য যে উপায় উপদেশ করিয়াছেন, তাহার সহিত ঈশ্বরের কিছুমাত্র সম্বন্ধ নাই। ন্যায় বলেন, প্রমেই

দুঃখের কারণ, অতএব জন্ম নিবারণ করিতে হইবে, জন্মের হেতু প্রবৃত্তি, প্রবৃত্তির হেতু দোষ, অর্থাৎ রাগ, দ্বেষ ও মোহ। মোহের হেতু মিথ্যা জ্ঞান, তত্ত্বজ্ঞানে তাহার উচ্ছেদ হয়। কিসের তত্ত্বজ্ঞান? না প্রমাণ প্রমেয় প্রভৃতি ষোড়শ পদার্থের তত্ত্বজ্ঞান, এই তত্ত্বজ্ঞান লাভ হইলেই আত্যন্তিক দুঃখনাশ অর্থাৎ অপবর্গ বা নিঃশ্রেয়স, কি না মুক্তিলাভ করা যায়। কিন্তু এই ষোড়শ পদার্থের মধ্যে ঈশ্বরের কোনও উল্লেখ নাই। যদিও ন্যায় সূত্রে অন্যত্র ঈশ্বরের অতি যৎসামান্য কথা আছে, বাৎসায়ন সেই সূত্রের ভাষ্যে লিখিয়াছেন, "পুরুষের কর্ম্মফল ভোগ ঈশ্বরের অনুগ্রহ সাপেক্ষ"—এই পর্য্যন্ত, কিন্তু দুঃখনাশের উপায়ের মধ্যে তাঁহার স্থান নাই। বৈশেষিক দর্শনও দুঃখনাশের জন্য তত্ত্বজ্ঞানের উপদেশ করিয়াছেন, কিন্তু সেই তত্ত্বজ্ঞান দ্রব্য, গুণ, কর্ম্ম প্রভৃতি ছয়টী পদার্থের সাধর্ম্ম্য ও বিধর্ম্মাজনিত তত্ত্বজ্ঞান, ঈশ্বর ইহার অন্তর্ভুক্ত নহেন। ভাষ্যকার প্রশস্তপাদাচার্য্য বৈশেষিক সূত্রে ঈশ্বরের শুধু ইঙ্গিত মাত্র পাইয়া বলিয়াছেন, উক্ত তত্ত্বজ্ঞান ঈশ্বরের প্রেরণাজনিত ধর্ম্ম হইতে উৎপন্ন হয়, এই পর্য্যন্ত, কিন্তু মুক্তিলাভের জন্য তাঁহার কোন প্রয়োজন নাই। অতএব এই দুই দর্শনের মূল্য অসামান্য হইলেও ইহাতে লক্ষ্য ব্যর্থ হইয়া গেল। ইহাদের তর্কজালের কথাই এই দেশে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে, দুঃখ নির্ব্বাসনের পরিবর্ত্তে নৈয়ায়িকী লাঠালাঠিরই বহুল প্রচলন দৃষ্টিগোচর হয়।

ষড়্দর্শনের মধ্যে বাকী রহিলেন, উত্তর মীমাংসা বা বেদান্ত দর্শন। বেদের উত্তর বা অন্তভাগ জ্ঞানকাণ্ডের সামঞ্জস্য সাধনের জন্যই ইহার অবতারণা, ইহাকে ব্রহ্মসূত্রও বলে, কারণ ব্রহ্মই ইহার মুখ্য প্রতিপাদ্য বিষয়। এই দর্শনেই দুঃখনাশের প্রকৃষ্ট পথের রীতিমত অন্বেষণ ও আলোচনা করা হইয়াছে। কালক্রমে এই দর্শনের ভাষ্যকার আচার্য্যগণের মধ্যে দ্বৈত, অদ্বৈত, ও বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ প্রভৃতি মতভেদের সৃষ্টি হইল। দুঃখনাশের অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইয়া ইহাদের অনুচরগণ আসল কথা ভুলিয়া যাইয়া একে অন্যের মতের প্রতি কটাক্ষ করিয়া ঠাট্টা বিদ্রূপ আরম্ভ করিলেন। অদ্বৈতবাদীর "অয়মাত্মা ব্রহ্ম"—এই জীবাত্মাই ব্রহ্ম—এই বেদোদ্ধৃত মহা বাক্যকে লক্ষ্য করিয়া মানবশিশুর ক্রন্দন উপলক্ষে দ্বৈতবাদীরা বিদ্রূপ করিয়া বলিতেন, "ওরে পঞ্চভূতের ফাঁদে, ব্রহ্ম প'ড়ে কাঁদে", আবার "সোঽহম্" "অহং ব্রহ্মাস্মি", এই মহা বাক্যদ্বয় ও মায়াবাদকে লক্ষ্য করিয়া অন্যেরা উপহাস করিয়া বলিতেন,—

"সাপ হ'য়ে কাটি আমি রোঝা হ'য়ে ঝাড়ি,
হাকিম হ'য়ে হুকুম দেই, প্যাদা হ'য়ে মারি,
কাটা যাই, মার খাই, মায়ার ফক্কিকার
ধরি মাছ, না ছুই পাণি, আমি আত্মারাম
সরকার।"

এইরূপে দুঃখ নির্ব্বাসন করিতে যাইয়া কবির লড়াই করিয়া বিভিন্ন মতাবলম্বীরা অপ্রীতি অসদ্ভাব প্রভৃতি বিবিধ নূতন স্বকৃত দুঃখের সৃষ্টি করিলেন। যাহা হউক, এই বেদান্ত দর্শন বা ব্রহ্মসূত্র প্রস্থানত্রয়ের অন্যতম। উপনিষদ, ব্রহ্মসূত্র ও গীতা, এই তিনটীকে প্রস্থানত্রয় বলা হয়, কারণ এই তিনটীকে অবলম্বন করিয়া সুখের দিকে প্রস্থান করিতে হয়। উপনিষদে ব্রহ্মবিদ্যার চরম উপদেশ দেওয়া হইয়াছে, ব্রহ্মসূত্রে তাহার দার্শনিক আলোচনা হইয়াছে, এবং গীতাতে

উপনিষদ ও দর্শন সমূহের সমন্বয় সাধন করা হইয়াছে, ভববাধির চিকিৎসা বিধানের ষোলকলা পূর্ণ হইয়াছে, কিন্তু এই সকলই পণ্ডিতদের জন্য শাস্ত্রাকারে রহিয়া গেলেন, ধর্ম্মের আকারে সর্ব্বসাধারণের নিজস্ব হইতে পারিলেন না। যেটুকু ধর্ম্মের আকার ধারণ করিয়াছিল, তাহাও কোথাও নিরীশ্বর নির্ব্বাণে, কোথাও মধ্যবর্ত্তিবাদ প্রভৃতির কুক্ষিতে লয় প্রাপ্ত হইল। মুক্তির সাগর-বক্ষে ধারণ করিয়াও পৃথিবী পিপাসায় হাহাকার করিতে লাগিল। The sea complains that it wants water—সমুদ্র অভিযোগ করিয়া বলিতে লাগিল যে, তাহার মধ্যে জলের বড় অভাব। "ন বহুনা শ্রুতেন",—শাস্ত্র বহু হইল, কিন্তু তাহা মোক্ষ লাভের ধর্ম্ম হইল না, তাই সর্ব্বশাস্ত্রের সার নির্য্যাসকে ধর্ম্মে মানবের দৈনন্দিন জীবনের উপজীব্যের মধ্যে আনা প্রয়োজন হইল। এই অবস্থা দর্শন করিয়া প্রজাবৎসল মঙ্গল বিধাতা ভগবান নব-সুরধনীর আকারে পৃথিবীর বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ সগর বংশের উদ্ধার কল্পে সকল ঋষি, সকল শাস্ত্র ও সকল ধর্ম্মকে সমন্বিত করিয়া আপামর সকলের দুঃখরোগের চিকিৎসা ও তাহাদিগকে নিরাময় করিবার জন্য যুগধর্ম্ম-বিধানকে প্রেরণ করিয়াছেন। দেশে দেশে এই নবধর্ম্মের সূচনা হইয়াছে, চিকিৎসা এখন স্বায়ত্ত হইয়াছে যে, এই মুক্তিপ্রদ ধর্ম্মের চিকিৎসা প্রণালীর যে পরিমাণ সাধন করিবে, সে সেই পরিমাণে মোক্ষলাভ করিয়া কৃতার্থ হইবে। সেই স্বায়ত্ত চিকিৎসা-সাধনের কিঞ্চিৎ আভাস দিয়াই আমার বক্তব্য শেষ করিব।

এই স্থলে কাহারও মনে এরূপ প্রশ্ন হইতে পারে, বক্তা স্বয়ং চিকিৎসক কি না? ইহার উত্তর কি, তাহা সকলেই জানেন, আমার বলা বাহুল্য মাত্র যে, আমি চিকিৎসক নই। আমার Church এর Lords spiritual and temporalগণ আমাকে কোনও letters patent দেন নাই। আর Gay's Fable যখন মনে হয়, তখন এই গৌরব লাভের ভিখারী হইতেও ভয় হয়। Gay লিখিয়াছেন, যমরাজ তাঁহার সমুদয় সৈন্য সামন্তকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "বল দেখি আমার সর্ব্বপ্রধান চেলা কে?" তখন বসন্ত, ওলাউঠা, ক্ষয়রোগ প্রভৃতি একে একে বাহাদুরী লইবার চেষ্টা করিয়া বলিলেন, "আমিই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সংখ্যক লোককে যমপুরীতে চালান দিয়া থাকি, অতএব আমিই আপনার প্রধান চেলা।" যমরাজ ইহাদের গর্ব্বিত বাক্যে সন্তুষ্ট হইতে পারিলেন না। তিনি বলিলেন, "দেখ, তোমাদের কাহারও দাবী গ্রাহ্য নয়, আমার সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয় 'চিকিৎসকগণ' 'এঁরা যত যমের বাড়ী পাঠান, এমন আর কেহ নহে।" সুতরাং চিকিৎসক হওয়ার যোগ্যতার আকাঙ্ক্ষা আমি রাখি না। বিশেষতঃ এ শরীরের চিকিৎসক নয়, এ আত্মার বা মনের চিকিৎসক। এ দেশের একটা চলিত কথা এই, "শতমারী ভবেৎ বৈদ্যঃ, সহস্রমারী চিকিৎসকঃ" হাজারটী না মারিলে চিকিৎসক হওয়া যায় না। অতএব এই গৌরবের কোনও প্রকার দাবিই আমি করি না। তবে নিজে চির-রোগী, তা অনেকেই জানেন, অন্ততঃ আমি নিজে তা বিশেষরূপেই জানি, চিকিৎসিত হইয়া যে ঔষধে উপকার পাইয়াছি, আজ রোগী হইয়াও তাহাই বলিতে আসিয়াছি। রোগীরও সাক্ষ্যের প্রয়োজন আছে, অন্য রোগীর প্রাণে তাহাতে আশার সঞ্চার হইবে, ঔষধের

সন্ধান পাইয়া অনেকেই তাহা ব্যবহারে উপকৃত হইয়া সুখী হইবেন, এই ভরসা করি। ঔষধের সন্ধান বলিয়া দেওয়াই কর্ত্তব্য বুঝিতেছি, এইরূপেই ধর্ম্মের Materia Medica ও Pharmacopœia'র পুষ্টিসাধন হইবে, এইরূপেই ইহার Therapeutics রচিত হইবে।

এখন আমি যাহা বলিতে যাইতেছি, সত্যং জ্ঞানং প্রভৃতি ব্রহ্মের স্বরূপগুলিকে স্বতঃসিদ্ধরূপে গ্রহণ করিয়াই তাহাতে প্রবৃত্ত হইতেছি। এই গুলির সম্বন্ধে কোথাও দ্বিমত নাই, সুতরাং ইহাদের গ্রহণে সত্যের অনুসরণে কোনও ব্যাঘাত হয় না।

এখন মনকে স্থির ও একাগ্র করিয়া অবহিতচিত্তে শ্রবণ করুন। সতর্ক হউন, মন যেন নিবেশভ্রষ্ট হইয়া ইতস্ততঃ বিচরণ না করে।

নির্জ্জনে, নীরব প্রকোষ্ঠে সমাহিত হইয়া নিম্নোক্ত সাধন সূত্রগুলির অনুশীলন করিতে হইবে, ইহাতে সকল আধ্যাত্মিক ব্যাধি অচিরে নির্ম্মূল হয়। সাধনের উৎকর্ষাপকর্ষের উপরে ফলাফল নির্ভর করে। Sandow'র ব্যায়াম প্রণালীতে যেমন দিনের পর দিন ইচ্ছাশক্তির প্রয়োগের দ্বারা মাংসপেশী সকল দৃঢ় ও শক্তিশালী হইয়া সময়ে দেহে যুগান্তর উপস্থিত করে, তেমনই এই সূত্রগুলির নৈষ্ঠিক সাধন ও অনুশীলনের ফলে অধ্যাত্ম-রাজ্যেও যুগান্তর উপস্থিত হয়।

স্বায়ত্ত চিকিৎসার প্রথম ব্যবস্থা সূত্র (Recipi No. 1.)

"ত্বমেব সর্ব্বম্।"

এই সূত্রটী দৃঢ় ভাবে মনে মুদ্রিত করিতে হইবে। 'সর্ব্বম্' বলিতে যাহা আমরা সাধারণতঃ মঙ্গল বলিয়া মনে করি, শুধু তাহা নহে, যাহা অমঙ্গল বলিয়া প্রতীয়মান হয়, তাহাও 'সর্ব্বম্' এর অন্তর্ভুক্ত। কারণ অমঙ্গল বলিয়া স্বতন্ত্র সত্ত্বা বা শক্তি স্বীকার করিলে ঈশ্বরের একজন প্রতিদ্বন্দ্বী স্বীকার করা হয়। তাহাতে তাঁহার সর্ব্বশক্তিমত্ত্বাকে খর্ব্ব করা হয়, তাঁহার ঈশ্বরত্ব থাকে না। 'শিবম্' ঈশ্বরেরই পর্য্যায়শব্দ, অতএব ব্যবস্থাসূত্র হইতে এই সিদ্ধান্ত হয়, সূত্রের সার নির্য্যাস এই—'সর্ব্বমেব শিবম্', 'শিবমেব সর্ব্বম্' সকলই মঙ্গল, মঙ্গলই সকল। মঙ্গল বা ঈশ্বর ভিন্ন অন্য সত্ত্বা নাই। এখানে বেদান্তের অদ্বৈতী বিভীষিকা নাই, এখানে 'তুমি' 'আমি'র দ্বৈতাদ্বৈত মিশ্রভাব, ভেদাভেদ স্বজ্ঞানে উপলব্ধ। এই অদ্বিতীয় মঙ্গল সত্ত্বার সাক্ষাৎকারই মুক্তি, এই মুক্তি সাধ্য বস্তু নয়, ইহা স্বয়ংসিদ্ধ। শাস্ত্রের দৃষ্টান্তে বলিতে গেলে ইহা 'কণ্ঠচামীকরবৎ' শিশুর কণ্ঠ-সংলগ্ন চামীকর অর্থাৎ স্বর্ণহারের অন্বেষণের ন্যায় আমরা ভ্রম ও অজ্ঞানতার বশবর্ত্তী হইয়া করতলন্যস্ত আমলকের ন্যায় ইহাকে স্বায়ত্তের মধ্যে পাইয়াও ইহার অন্বেষণে ঘুরিয়া বেড়াই। অমঙ্গল শুধু একটা অভাবাত্মক কথা মাত্র, ইহার বাস্তব সত্ত্বা নাই, আলোর অভাব যেমন অন্ধকার, তেমনই মঙ্গলের অভাবই অমঙ্গল, মঙ্গলের সাক্ষাৎকার ও প্রতিষ্ঠা হইলেই আর অমঙ্গল বলিয়া কিছু থাকে না। তখন দেখা যায়, মঙ্গল সর্ব্বত্র, এক সর্ব্বময় সত্ত্বা, "ত্বমেব সর্ব্বম্"। মঙ্গল প্রকৃতিতে, মঙ্গল প্রকৃতির বাহিরে,—দার্শনিক ভাষায় তিনি বিশ্বানুগ (immanent) ও বিশ্বাতিগ (transcendent)। প্রকৃতি অর্থাৎ জীব ও জড় তাঁহার দৃশ্য প্রকাশ, অর্থাৎ তিনিই প্রকৃতিরূপে প্রকাশিত, তিনিই প্রকৃতি। তাঁহাকে সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমান প্রভৃতি শব্দে

অভিহিত করা হয়, কিন্তু এইরূপ অভিধান সম্পূর্ণ ঠিক নহে, কারণ জ্ঞান, শক্তি প্রভৃতি বস্তুই তিনি। মানুষ প্রেমিক কিন্তু তিনি স্বয়ং প্রেম, মানুষ সুস্থ ও শক্তিশালী, কিন্তু তিনি স্বয়ং স্বাস্থ্য ও শক্তি।

এই সূত্রের অনুশীলন এইরূপঃ—আমি যখন পূর্ণাঙ্গ প্রকৃতির অংশ, তখন অবশ্যম্ভাবী-রূপে ঈশ্বরের অংশ। সিন্ধুর সহিত জল-বিন্দুর যে সম্বন্ধ, ঈশ্বরের সহিত আমার সেই সম্বন্ধ; বস্তুতঃ একই, শুধু পরিমাণতঃ প্রভেদ। একটী রশ্মি যতটুকু সূর্য্যকে ধারণ করিতে পারে, ততটুকুই তার মধ্যে আছে, তেমনই আমি যতটুকু ঈশ্বরত্ব গ্রহণ ও ধারণ করিতে পারি, ততটুকু ঈশ্বরত্ব আমার মধ্যে আছে। ইহাই আমার প্রকৃত আমিত্ব। যে পরিমাণে এই সত্যকার আমিত্বের বিকাশ ও বর্দ্ধন হইবে, সেই পরিমাণে আমি ব্রহ্ম-প্রকৃতি বা ব্রহ্মত্ব লাভ করিব। কারণ ব্রহ্ম বৃহৎ ও বৃংহন, তিনি নিজে বড় এবং অন্যকে বড় করেন।

আমি যখন বস্তুতঃ (in essence) ব্রহ্মের সহিত এক, তখন আমি স্বতঃই—আপনা আপনি—ব্যাধি-বিরহিত। ঈশ্বর রুগ্ন নন, রুগ্ন হইতে পারেন না, অতএব আমিও রুগ্ন নই, রুগ্ন হইতে পারি না। সিন্ধুতে যাহা আছে, তার বিন্দুতে তাহা ভিন্ন আর কিছু নাই, থাকিতে পারে না। সূর্য্য ও তার রশ্মি এক প্রকৃতি। অতএব ঈশ্বরের সসীম প্রকাশ যে আমি, এই আমাতে কোনও ব্যাধি নাই, অতএব আমি শোক দুঃখের অতীত, আমি নির্ব্বিকার, শোক দুঃখ আমাকে কিছুমাত্র স্পর্শ বা বিচলিত করিতে পারে না। আমার আমি-ত্বের প্রকৃত জ্ঞানের অভাবেই আমি শোকা-দির অধীন, অনুশীলনের দ্বারা নিজকে চিনিলেই আমার এই অধীনতা হইতে মুক্তি অর্থাৎ প্রকৃত অবস্থা লাভ। শোকাদি আমারই ইচ্ছাধীন, আমি ইচ্ছা করিলেই সুখী অথবা দুঃখী। কিন্তু আমি দুঃখ ইচ্ছা করি না, অতএব আমি সুখী, আমি মুক্ত। ইহাই বিধি, ইহার কুত্রাপি ব্যত্যয় নাই। আমি তাঁতে, তিনি আমাতে, অতএব আমার রোগ নাই, শোক নাই, মৃত্যু নাই; তাঁর যা নাই, আমারও তা নাই; তাঁর যা আছে, আমারও তাই আছে। আমি আমার পৈত্রিক অধিকার অর্থাৎ স্বাধিকার প্রতিষ্ঠা করিব। সর্ব্বভূতান্তরাত্মা আরোগ্যের বাণী উচ্চারণ করিয়া বলিতেছেন, "শিবোঽসি"; আমি উত্তর করিতেছি, "শিবোঽহম্‌"; সত্যের উচ্চারণ বৃথা হয় নাই, বৃথা হ'বে না। অত-এব, এই সূত্রের সাধন মন্ত্র, "শিবোঽহম্‌।"

২য় সূত্র—"ত্বং বিধাতা।"

এই সূত্র দুঃখনাশের একটী অমোঘ ঔষধ। বৈষ্ণব ও নব বিধান ধর্ম্মের মূল সূত্র এইখানে।

ইহার অনুশীলন এইরূপঃ—তিনি বিধাতা। তাঁর পূর্ণ জ্ঞান, পূর্ণ শক্তি, পূর্ণ মঙ্গল সত্তা লইয়া তিনি নিত্য কাল ক্রিয়া করিতেছেন, তিনি পূর্ণ কর্ম্মঠ ঈশ্বর। সর্ব্বদর্শী হইয়া জীবের সকল অভাব ও প্রয়োজন দেখিতে-ছেন, সর্ব্বাশ্রয় হইয়া সকলকে রক্ষা করিতে-ছেন, রাজাধিরাজ হইয়া সকলের শাসন, প্রতিপালন করিতেছেন; সমুদয় কার্য্য ও ঘটনা—যার যার প্রকৃতির অনুযায়ী করিয়া যথাযথ নিয়মিত করিতেছেন। মুখ্যভাবে প্রত্যেকের মঙ্গলের সহিত গৌণভাবে বিশ্বের মঙ্গল সাধন করিতেছেন। প্রেমে ও আনন্দে সৃষ্টি করিয়া তিনি সৃষ্টি হইতে নির্ব্বাসিত

হন নাই। অলঙ্ঘ্য নিয়তি বা অদৃষ্টের হস্তে তাঁর রাজ্যভার অর্পণ করিয়া তিনি নিজের পূর্ণ জ্ঞানকে অন্তর্হিত করেন নাই। তিনি আমাদের সঙ্গে এক গৃহে বাস করিতেছেন—"দ্বা সুপর্ণাসযুজা সখায়া—সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে, তয়োরণ্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্য নশ্নন্নন্যোঽভিচাকশীতি।"—"দুই সুন্দর পক্ষী প্রণয়-যোগে সখাভাবে এক বৃক্ষ আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে। তন্মধ্যে একজন সুস্বাদু ফল ভক্ষণ করিতেছেন, আর একজন অনশন থাকিয়া তাহা দর্শন করিতেছেন।"—

"এক শাখী 'পরে　　দু বিহগ বরে
সুখে বসবাস করেরে।
উভে উভয়ের সখা,　　প্রেমে মাখা মাখা
দোঁহে দোঁহারে নিরখেরে।
(একজন) সুরস রসাল　　লইয়ে যতনে
দিতেছে আর সখারে।
(আর জন) লভিয়ে সে ফল　প্রেমেতে বিহ্বল
সুখেতে ভোজন করে।"

তিনি সংসার হস্তে নিজের দয়িত সন্তানকে ছাড়িয়া যান নাই। মাকড়সা কে এক রাত্রিতে জাল বুনিয়া পর্ব্বত গুহার প্রবেশ দ্বার বন্ধ করিয়া শত্রুর হস্ত হইতে তাঁর প্রিয় সন্তান মহম্মদের রক্ষার কারণ হইয়াছিল, ইহা তাঁহার কার্য্য। Sodon ও Gomorah যখন ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়, তখন Lotকে রক্ষা করিয়াছিলেন তিনি, তিনি কর্ম্মশীল ভগবান, তিনি বিধাতা। তিনি চিরজাগ্রত প্রহরীরূপে নিশিদিন জীবকে ক্রোড়ে করিয়া রহিয়াছেন, তাঁর চক্ষে পলক নাই। ক্ষুদ্র কার্য্যেও তিনি প্রেমে ও কল্যাণে বিশেষ বিধান প্রেরণ করিতেছেন। তাঁর ইচ্ছা ভিন্ন, তাঁর অজ্ঞাতসারে কোন ঘটনা সংঘটিত হয় না। সমুদয় ঘটনা তাঁরই বিধান। জলে, স্থলে, অগ্নিতে, অন্তরীক্ষে, জীবনে, মরণে, সর্ব্বত্র সর্ব্বাবস্থায় তাঁরই বিধান কার্য্য করিতেছে। তিনি সর্ব্বময় বিধাতা। জীবের নিরাশার স্থান নাই, উদ্বেগের অবকাশ নাই, চিন্তা ও দুঃখের কারণ নাই। "একচ্ছত্র হইল সংসার, রাজা নাহি আর, এক প্রভু দয়াময় লইলেন রাজ্যভার।" শান্তির রাজ্য প্রতিষ্ঠিত। "মাহং ব্রহ্ম নিরাকুর্য্যাং মা মা ব্রহ্ম নিরাকরোদনিরাকরণমস্তু।" "ব্রহ্ম আমাকে পরিত্যাগ করেন নাই, আমি যেন তাঁহাকে পরিত্যাগ না করি, তিনি আমা কর্তৃক সর্ব্বদা পরিত্যক্ত থাকুন।" আমি কর্ত্তব্যহীন হইব না, তিনিও বিধাতৃত্বে হীন হইবেন না। যিনি বনের বিহঙ্গকে অযাচিত ভাবে সুস্বরে ও সুঠাম সৌন্দর্য্যে ভূষিত করেন; যারা বপন করিতে জানে না, সংগ্রহ করিতে জানে না এবং শস্যাগারে সঞ্চয় করিতে জানে না, সেই গগনবিহারী পক্ষী-দিগকে যিনি আহার দেন; যারা শ্রম করিতে পারে না, বয়নও করিতে পারে না, সেই পুষ্পগুলিকে পৃথিবীর সম্রাটের পরিচ্ছদ অপেক্ষাও সুন্দর আভরণে যিনি সুসজ্জিত করেন; আমার দেহ ও আত্মার অন্ন পান সেই বিধাতার হস্তে। আমি তাঁহার সর্ব্বোচ্চ সৃষ্টি, আদরের ধন, উপেক্ষার বস্তু নই। মাতৃগর্ভের অন্ধকারময় প্রকোষ্ঠের ভিতর হইতে যখন সন্তান কত বেদনা পাইয়া, প্রতি মুহূর্ত্তে মৃত্যুর করাল গ্রাসের ভিতর দিয়া অসহায় অবস্থায় এই আলোকের রাজ্যে আসিয়া অবতীর্ণ হয়, তখন সে কি জানে কত প্রেমবাহু তাহাকে আলিঙ্গন করিবার জন্য প্রসারিত রহিয়াছে, কত সুখ, কত আনন্দ জীবন ভরিয়া স্তরে স্তরে পুঞ্জে পুঞ্জে

তাহার জন্ত অপেক্ষা করিতেছে? যে দিন এই দেহ প্রকোষ্ঠ হইতে অনন্তের তৃষ্ণায় তৃষিত, এই আত্মার নিষ্ক্রমণ হইবে, সেই শুভ দিনের, আনন্দের দিনের ভয়ে, হে ক্ষীণদৃষ্টি অবিশ্বাসি, তুমি মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে মরিবে কেন? মুখের সৃষ্টি আহার প্রদানের জন্ত, অভাবের সৃষ্টি পূরণের জন্য, মৃত্যুর সৃষ্টি অমর জীবনের জন্য, ইহাতে স্রষ্টার চিন্তা বেশী না সৃষ্টের চিন্তা বেশী? যাঁর চিন্তা, যাঁর কাজ, তাঁর হাতে ছাড়িয়া দেও। তোমার কর্ত্তব্য এইটুকু, তা না হ'লে তোমার প্রত্যবার হয়। সৃষ্টিতে আকস্মিক কিছু নাই, সকলই পূর্ণ জ্ঞানের কর্ম্ম। সবই incident, কোনটাই accident নয়। জন্মাবধি তোমার জীবনে তাঁহার বিধাতৃত্বে যাহা ঘটিয়াছে, তাহার হিসাব রাখিয়াছ কি? তুমি চক্ষু পাইয়াছ, কিন্তু অন্ধ হও নাই কেন, বলিতে পার কি? সেখানে কাহার বিধাতৃত্ব, কাহার দয়া? যদি সুস্থ হইয়া জন্মিয়া থাক, তাহা হইলে এক সঙ্গে শূল, কুষ্ঠ, হাঁপানি, পাথরী দ্বারা আক্রান্ত হও নাই কেন, বলিতে পার কি? তোমার অভিযোগ ও ক্রন্দনে তোমার জন্মটা উল্টাইয়া দিতে পার কি? এক রাজপুত্র শোকে অধীর হইয়া মস্তকের কেশ ছিন্ন করিতে আরম্ভ করিলে, ভৃত্য জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, মস্তক কেশশূন্য হইলে কি শোকের বিরাম হইবে? সে ভুলিয়া গিয়াছিল—তিনি বিধাতা, মানব প্রতিদিন এই ভুল করিয়া দুঃখ পাইতেছে। তুমি জীবনের সামান্য অংশ মাত্র দেখ, সমগ্র জীবন যিনি দেখেন, তাঁহাতে বিশ্বাস স্থাপন কর। তিনি কৃপণ বলিয়া আমাদিগকে অভাবগ্রস্ত করেন নাই, দয়াল বলিয়াই অভাবে রাখিয়াছেন। তিনি যাঁর আছেন তাঁর অভাব নাই। তাঁকে আশ্রয় করিলেই সকল অভাব পূর্ণ হয়। যে অভাবের জন্য তুমি প্রতিনিয়ত অভিযোগ কর, সেই অভাবও তাঁহার কৃপার দান। তুমি স্মরণশক্তির অভাবের জন্য দুঃখ কর; কিন্তু ভাবিয়া দেখ, যদি বিধাতা তোমাকে বিস্মৃতি না দিতেন, তাহা হইলে তোমার সমস্ত পাপ তাপ ও শোক দুঃখের চিত্রগুলি এক সঙ্গে তোমার স্মৃতিপথে উদিত হইয়া তোমাকে পাগল করিয়া দিত। তিনি যে তোমার নিকট হইতে এবং অন্যের নিকট হইতে অনেক বিষয় গোপন করিয়া রাখেন, তার জন্যও অভিযোগের বিরাম নাই, কিন্তু ভাব দেখি তোমার কৃত গুপ্ত পাপগুলি যদি তিনি সর্ব্বদা তোমার চক্ষের সম্মুখে ধরিয়া রাখিতেন এবং অন্যের নিকট প্রকাশ করিয়া দিতেন, তাহা হইলে তুমি কোথায় মুখ লুকাইবার ঠাঁই পাইতে? তোমার পিতৃ পুরুষ সন্তান সন্ততি প্রভৃতি বহু আত্মীয় স্বজন পরলোকে চলিয়া গিয়াছেন, যাঁহাদের সহিত বিচ্ছেদ তুমি একেবারেই ইচ্ছা কর নাই। বিচ্ছেদ ঘটাইয়াছেন বলিয়া বিধাতার নিকট তোমার বড় অভিযোগ। এখন যদি তিনি তোমার সেই ১০০, ১৫০, ২০০ শত বর্ষ বয়স্ক গলিতচর্ম্ম, স্খলিত চরণ, অন্ধ, পঙ্গু, জরাজীর্ণ, বিকলাঙ্গ, বিকটাঙ্গ জুজুর ন্যায় মাংসপিণ্ডবৎ সমুদয় পূর্ব্বপুরুষ ও পঙ্গপালের দল কাচ্চা বাচ্চাসহ আবার আনিয়া তোমাকে ফিরাইয়া দেন, তাহা হইলে তুমি তাহাদের প্রাদুর্ভাবে উৎক্ষিপ্ত হইয়া বাণপ্রস্থ অবলম্বনের জন্য 'ত্রাহিমাং মধুসূদন' বলিয়া বাড়ী ঘর ছাড়িয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে পালাইবার উপক্রম করিতে। এইরূপ সকল বিষয়েই। অতএব তোমার অভিযোগ পরিত্যাগ কর। যেমনটী আছে তেমনটীই ভাল। তিনি বিধাতা—যা দিয়াছেন তাহাই

দেয়, তাহাই তোমার প্রাপ্য, তাহাই তোমার মঙ্গল। অবিশ্বাসী আত্মন্, তুমি বিশ্বামিত্রের ন্যায় নিজের ইচ্ছামত স্বতন্ত্র ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করিয়া দুঃখ পাইও না, তুমি ব্যাস-কাশীতে সমাধি লাভ করিয়া গর্দ্দভ হইও না। তুমি সোণার মানুষ হও, "ত্বং বিধাতা" এই মন্ত্র সাধন করিয়া মাথা নুয়াইয়া দেও, অপেক্ষা কর, তোমার দুঃখের বাড়বানল প্রেম-সমুদ্রের শীতল সলীলগর্ভে লীন হইবে। তুমি প্রাণ খুলিয়া, প্রাণ ভরিয়া, প্রাণ ঢালিয়া দিয়া সাধন কর, "ত্বং বিধাতা।"

তৃতীয় সূত্র :—

"ওঁ পিতা নোঽসি।"

তুমি আমাদের পিতা, আমরা তোমার সন্তান।

এই সূত্রের অনুশীলন এইরূপঃ—পিতা পূর্ণস্বরূপ, আমিও স্বরূপতঃ পূর্ণ, আমাতে পূর্ণতা সম্ভাবিত, আমি সম্ভাবিতরূপে (potentially) পূর্ণ, অজ্ঞতা ও অবহেলা-বশতঃ আমি এই দায়াধিকার হইতে বঞ্চিত। আমি যে স্বরূপতঃ, সম্ভাবিতরূপে পূর্ণ, এই ধারণা হৃদয়ঙ্গম (realise) করিলেই ক্রমশঃ ইহা সত্য (actualised) হইয়া দাঁড়াইবে। চিন্তার সত্যে পরিণতি (Realisation of idea into fact) দর্শনশাস্ত্রের প্রমাণিত কথা। প্রকৃতির সর্ব্বত্রই পূর্ণতার দিকে গতি। প্রথম জীবাণু, যাকে বিবর্ত্তনবাদী বৈজ্ঞানিকগণ protoplasmic germ বলিয়াছেন ; সেই সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম জীবাণু হইতে পূর্ণবর্দ্ধিত মনুষ্য পর্য্যন্ত ধারাবাহিক ক্রমোন্নতি পরিলক্ষিত হয়, সেই ক্রমোন্নতি একটা গন্তব্যস্থান, একটা চরম লক্ষ্যকে ইঙ্গিত করে, যাহা লাভ না হওয়া পর্য্যন্ত লক্ষ্যাভিমুখীন গতির বিরাম নাই। সেই লক্ষ্য 'পূর্ণতা'। জীবে পূর্ণতা সম্ভাবিত বলিয়াই এই জীব-প্রবাহের অবিশ্রান্ত গতি সেই দিকে। সর্ব্বত্রই পূর্ণতার দিকে উন্মুখতা ও গতি। শিশু স্বতঃই আহার বিহার ও কথোপকথনাদিতে অজ্ঞাতসারে পূর্ণতা লাভের জন্য পিতামাতার অনুকরণ করে। ছাত্র একই কারণে প্রতিদ্বন্দ্বিতা এবং শিল্পী ও বৈজ্ঞানিক আদর্শের অনুসরণ করে। জীবনে পূর্ণতা লক্ষিত হইতেছে না বলিয়া তাহা অপ্রাপ্য মনে করার কোনও হেতু নাই। পূর্ণতার উপলব্ধি সাধন সাপেক্ষ। এখানেই চিকিৎসার প্রয়োজন, তারই জন্য এই সূত্র সাধন। এই স্থলে মনে রাখিতে হইবে, পূর্ণতার মধ্যে কম বেশীর তারতম্য (degrees of comparison) নাই। যাহা পূর্ণ তাহা পূর্ণই। যেমন প্রকৃত পক্ষে অর্দ্ধ-মৃত বা অর্দ্ধ-জীবিত কিছু নাই, যাহা মৃত তাহা মৃতই, যাহা জীবিত তাহা জীবিতই ; সেইরূপ আংশিক পূর্ণ, ষোল আনা পূর্ণ, এইরূপ পূর্ণতার পরিমাণের ইতরবিশেষ নাই,—হয় আমি পূর্ণ, না হয় আমি অপূর্ণ, এই দুইয়ের এক। পূর্ণ-স্বরূপের আত্মজ পূর্ণ ভিন্ন অপূর্ণ হইতে পারে না। তবে যে আমাদের ব্যবহারিক, বাহ্যিক বা দৃশ্য জীবনে অপূর্ণতা দেখি, সেইটা দর্পণের দোষে ; কিন্তু আমার আমি যখন পূর্ণ-স্বরূপেরই নিশ্বাস, তখন ইহার মধ্যে অপূর্ণতা থাকিতে পারে না। একটা মলিন দর্পণের ভিতর দিয়া যখন সুন্দর মুখ খানা দেখা যায়, তখন তাহা বিকটাকার দেখায়, ইহা মুখের দোষে নয়, দর্পণের দোষে। আমাদের ব্যবহারিক জীবনও বিকলাঙ্গ মুকুর সদৃশ, ইহাতে সত্য 'আমি'র যে ছায়াপাত হয়, তাহা অপূর্ণ। ছায়া অপূর্ণ হইলেও তার বস্তু অপূর্ণ নয়। বস্তুর মধ্যে পূর্ণতার দিকে

একটা অদম্য পিপাসা রহিয়াছে। ব্যবহারিক জীবনকে আত্মিক জীবনের অনুরূপ করার জন্য সংকল্প করিতে হইবে, তাহা হইলেই ... বস্তুর অনুরূপ পূর্ণতা দৃষ্ট হইবে। ... এই স্বাস্থ্য, আমিও সাধনা দ্বারা আমার ... অধিকার উপলব্ধি করিলেই সুস্থ বা স্বস্থ ... শোক, স্বস্থ বা আত্মস্থ অবস্থার 'আমি' ... অন্য কথায়, শোক দুঃখের ...। এইটী সূত্রের অন্তঃ সাধনার দিক, ইহার বহিঃসাধনাও আবশ্যক।

সমুদ্র বক্ষে তুমুল ঝড় উঠিয়াছে। জাহাজ ডুব ডুব, আরোহিগণের কিছুই করিবার নাই, তারা ভীষণ আর্ত্তনাদ করিতেছে। একটী মাত্র বালক এক কোণে নিশ্চিন্তে বসিয়া আছে, মুখে ভাবনার চিহ্নমাত্র নাই। জিজ্ঞাসা করা হইল, তুমি এই আসন্ন মৃত্যুকালে এমন নিরুদ্বেগ কেন? বালক উত্তর করিল, "জাহাজের নাবিক আমার পিতা, তিনিই আমার জন্য ভাবিতেছেন, আমি আর ভাবিয়া কি করিব? আমার ভাবনার প্রয়োজন নাই, ইহা নিরর্থক।" ঘরে যখন আগুন লাগে, তখন মানুষ সর্ব্বাগ্রে সন্তানগুলিকে বাঁচাইতে চেষ্টা করে। ব্যাঘ্র, সর্প প্রভৃতি হিংস্র জন্তুরও সন্তানের প্রতি মায়া ও তার মঙ্গলসাধনের চেষ্টা দেখা যায়, আর পূর্ণপ্রেম ঈশ্বরে ইহার অভাব হইবে? তাঁর ... জীবের নিকট তিনি প্রেমে ও মঙ্গলচেষ্টায় পরাজিত হইবেন? এমন অবিশ্বাস ... যোগ্য নয়, ইহা অপরাধ, ইহা পাপ। এই ... আমরা শোক দুঃখের অধীন হই। বিপদের মধ্যেও আমাদের কর্তব্য তাঁর প্রিয় কার্য্য করা, যে উপায় অবলম্বন করিলে বিপদ অতিক্রম করার সম্ভাবনা দেখা যায়, তাহা অবলম্বন দ্বারা তাঁকে প্রীত করাই আমাদের তখনকার কর্ত্তব্য, ফল তাঁহার হাতে। যাহা আমাদের শক্তির আয়ত্তাধীন নয়, তার জন্য উদ্বিগ্ন হওয়া অবিশ্বাসীর কার্য্য, সন্তানের কার্য্য নহে। সর্ব্বশক্তিমান পিতাকে অক্ষম মনে করা, সর্ব্বমঙ্গলালয়কে অমঙ্গলের কর্ত্তা মনে করা, তাঁহাকে অপমান করা। ইহা মহা পাপ, এই অপরাধে আমরা স্বরাজ্য হইতে ভ্রষ্ট হইয়া দুঃখ পাই। ঘোর অরণ্যের মধ্যেও যিনি পুষ্পকে সৌন্দর্য্যে ও সৌরভে মণ্ডিত করেন, এবং অন্ধ, খঞ্জ, পঙ্গু পশুপক্ষী ও কীট পতঙ্গাদির আহারের ব্যবস্থা করেন, এই বিশাল ঐশ্বর্য্যপূর্ণ বিশ্বে তাঁহার দ্বারা আমার জন্য কত অতুল সম্পত্তি সঞ্চিত রহিয়াছে, তাহা কি আমি জানি? তাঁর পরিচারকবর্গে, তাঁর যান বাহনে আমার পথ ঘাট পূর্ণ রহিয়াছে, আমি তাদের সাহায্যে সেই যানবাহনে আরোহণ করিয়া ঊর্দ্ধলোকে সেই সকলের উৎসের নিকট চলিয়া যাইব, পিতার চরণ-তীর্থে যাইয়া পৌঁছিব। রাজাধিরাজের সন্তান আমি, আমার ভয় কি? ভাবনা কি? 'ওঁ পিতা নোঽসি', আমি নির্ভর, নির্ভীক, নিরাপদ, শোকসন্তাপের ও চিন্তা ভাবনার অতীত, সকল অভাব ও অপূর্ণতার ঊর্দ্ধে অবস্থিত, আমি সুখী, আমি নিষ্পাপ, আমি পবিত্র।

এই সাধনসূত্র খ্রীষ্টধর্ম্মের মূল। ঈশ্বরের পিতৃত্ব এবং মানবের ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠাই ঈশার বিশেষত্ব। সেই জন্য 'পিতা নোঽসি' এই সাধনসূত্রের অনুশীলন ও ইহাতে সিদ্ধিলাভের অনেক সুন্দর সুন্দর দৃষ্টান্ত খ্রীষ্টধর্ম্মের ইতিহাসে পাওয়া যায়। Luther এর যখন মহানিক্রমণের সময় উপস্থিত হইল, তখন প্রভুর দিকে উন্মুখ হইয়া তিনি বলিয়াছিলেন, "প্রভো, এই রহিল তোমার সন্তানগণ, তুমি

ভালবাসার পাত্রকে দর্শন করিয়া তাহাতে মুগ্ধও হয়। রজনী যে শচীন্দ্রের চিবুক স্পর্শে আত্মহারা হইয়া প্রেমরসে আর্দ্র হইয়া উঠিবে, সেই পুষ্পময় স্পর্শে যে সে যুথি জাতি মল্লিকা ও শেফালীর আঘ্রাণ পাইবে, পদ-ধ্বনিতে এমন করিয়া কর্ণবিবর ভরিয়া অমৃতময় সুখ অনুভব করিবে—ইহাতে আশ্চর্য্যের কিছু নাই।

রজনী সত্যই বলিয়াছিল, "কানার সুখ দুঃখ তোমরা বুঝিবে না। সে নবনীত সুকুমার—পুষ্পগন্ধময় বীণাধ্বনিবং স্পর্শ তোমরা বুঝিবে না!" সে কুসুম স্পর্শের যে কি মাদকতাময় ঝঙ্কার, তাহা বিলোল-কটাক্ষ কুশলিনীরা সত্যই বুঝিবে না! চক্ষুরিন্দ্রিয় নাই, তাই ঘ্রাণ ও স্পর্শেন্দ্রিয়ের শক্তি যে কতদূর তীক্ষ্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহা চক্ষুষ্মান্ আমাদের বোঝা সম্ভবই নহে। বরং চক্ষুষ্মান্ বলিয়া আমাদের নিকট প্রতি-নিয়ত দৃশ্যমান বিশ্বের তেমন নব নব বৈচিত্র্য প্রতিভাত হয় না। আমরা রজনীর মত বহু মূর্ত্তিময়ী বসুন্ধরাকে লক্ষ্য করিয়া বলিতে পারি কি? "দেখা কি? দেখা কেমন? দেখিতে কিরূপ সুখ হয়? এক মুহূর্ত্তের জন্য এই সুখময় স্পর্শ দেখিতে পাই না? দেখা মা, বাহিরের চক্ষু নিমীলিত থাকে থাকুক মা! আমার হৃদয়ের মধ্যে চক্ষু ফুটাইয়া দে, আমি একবার অন্তরের ভিতর অন্তর লুকাইয়া মনের সাধে রূপ দেখে, নারীজন্ম সার্থক করি!"

শুনিয়াছি, শ্যামনটবররূপ শ্রীকৃষ্ণের বংশী-ধ্বনি শুনিয়াই শ্রীরাধা আপনা-হারা হইয়া-ছিলেন, হংসমুখে নলের রূপ গুণের খ্যাতি শুনিয়া দময়ন্তী নল-বিরহে কাতর হইয়া দুঃখানুভব করিয়াছিলেন, স্বপ্নে সূক্ষ্মচক্ষে প্রদ্যুম্নসুত অনিরুদ্ধকে দেখিয়া বাণনন্দিনী ঊষা প্রগাঢ় ভালবাসিয়াছিলেন। ইংরাজী সাহিত্য হইতে গ্রন্থকার রজনী চরিত্রের আদর্শ লন সত্য, কিন্তু আমরা ইহাকে বঙ্গ রমণী-রূপেই বিচার করিব।

রজনী-চরিত্র সমালোচনা করিতে যাইয়া বুঝিতে পারিতেছি যে, সমালোচনা করিবার বড় কিছু নাই। "বুক ফাটে ত মুখ ফোটে না"—সেই জাতের কুমারী যখন আপনাকে নিজেই জাহির করিবার জন্য দাঁড়াইয়াছে; ঘোমটা খুলিয়া লজ্জা ত্যাগ করিয়া আপনাকে ফুটাইয়াছে, তখন আমরা আর তাহাকে কি জাহির করিব? আমাদের ফুটাইবার আর আছে কি? ভিতরের কোন্ কথাটা আমাদের প্রকাশ করিবার রহিল? আমরা যতদূর প্রকাশ করিতাম, তাহা অপেক্ষা সে অনেক গুণ নিজেই প্রকাশ করিয়াছে। রজনীর মনের ভিতর যখন যতটুকু ভাবের উদয় হইয়াছে, তাহার সবটুকুই রজনী নিজেই উচ্ছ্বসিত ভাবেই প্রকাশ করিয়া দিয়াছে। আমরা তাহাকে কি বুঝিব; সে-ই আমাদের বুঝাইয়াছে—

"শুষ্ক ভূমিতে বৃষ্টি পড়িলে কেন না সে উৎপাদিনী হইবে? শুষ্ক কাষ্ঠে অগ্নি সংলগ্ন হইলে কেন না সে জ্বলিবে? রূপে হউক, শব্দে হউক, স্পর্শে হউক, শূন্য রমণী-হৃদয়ে সুপুরুষ-সংস্পর্শ হইলে কেন প্রেম না জন্মিবে? দেখ, অন্ধকারেও ফুল ফুটে, মেঘ ঢাকিলেও চাঁদ গগনে বিহার করে, জনশূন্য অরণ্যেও কোকিল ডাকে; যে সাগর-গর্ভে মনুষ্য কখন যাইবে না, সেখানেও রত্ন প্রভা-সিত হয়, অন্ধের হৃদয়েও প্রেম জন্মে, আমার নয়ন নিরুদ্ধ বলিয়া হৃদয় কেন প্রস্ফুটিত হইবে না?"

প্রণয়ের এমন নিগূঢ় তত্ত্ব যাহার বিদিত, তাহাকে আমরা বুঝিবই বা কি, বুঝাইবই বা কি? আমরা ভাবিয়াছিলাম, রজনী-চরিত্রের অন্ততঃ দার্শনিকত্বটুকু ভাষার পত্র-পল্লবে একরূপ সাজাইয়া একটী তোড়া করিব! ও হরি! দেখিতেছি রজনী নিজেই একজন বড় দার্শনিক। প্রাচীন কালে শুনিয়াছি, অনেক কঠোর সাধনার ফলে জনক ও যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি ব্রহ্মবিদ্‌গণের কৃপায় গার্গী মৈত্রেয়ী প্রভৃতি দুই চারিজন রমণী দার্শনিক হইতে পারিয়াছিলেন, আর আজ অভিনব আখ্যায়িকার গুণে চরিত্র সৃষ্টিকার কবির অনুগ্রহে অক্ষর-জ্ঞানবর্জ্জিতা অন্ধ ফুল-ওয়ালী বিনা সাধনায় দর্শনের সূক্ষ্ম তত্ত্ব মীমাংসা করিয়া দিতেছেন! বঙ্কিমবাবু নিজের পরিণত বয়সের বহু সাধনালভ্য জ্ঞান রত্ন দ্বারা রজনী চিত্রখানি সাজাইয়াছেন বলিয়া রজনী আজ প্রগাঢ় বিদ্যাবত্তা, গভীর সূক্ষ্ম চিন্তা, অপূর্ব্ব রসভাবজ্ঞতার অধিকারিণী হইয়াছেন! ইহা ঠিক হইয়াছে কি না, কোনরূপ অস্বাভাবিক হইয়াছে কি না, তাহার বিচার পাঠকগণ করিবেন। মহাভারতের অনেকাংশ—"ইহা অস্বাভাবিক, উহা অসম্ভব" এই কারণে যিনি প্রক্ষিপ্ত বলিয়াছেন, তাঁহার কৃত উপন্যাস মধ্যে প্রধানা নায়িকা চরিত্রে "ইহা অস্বাভাবিক, উহা অসম্ভব" বলা আমাদের সাহস হয় না। রজনী যে পাঠকগণ অপেক্ষা বড় দার্শনিক—তাহার প্রমাণ নিম্নে দিতেছি।

"আমি জানি, রূপ দ্রষ্টার মানসিক বিকার মাত্র—শব্দও মানসিক বিকার। রূপ রূপবানে নাই। রূপ দর্শকের মনে—নহিলে একজনকে সকলেই সমান রূপবান্ দেখে না কেন? একজনে সকলেই আসক্ত হয় না কেন?"

রজনী একে পূর্ণযুবতী; বর্ষণাভাবে বিশুষ্ক উৎপাদিনী ভূমির অবস্থাপন্না! তায় সুচতুরা, রসভাবজ্ঞা ও প্রগল্‌ভা রমণী! তদুপরি লেখাপড়া না শিখিয়া স্রষ্টার গুণে দার্শনিক তত্ত্ববেদিনী বিদুষী নারী। আবার শুভাদৃষ্টের জোরে অলৌকিক প্রতিভাময়ী স্বভাবকবি। শচীন্দ্র যখন রজনীর সর্ব্বশরীর কম্পিত করিয়া, অঙ্গে অঙ্গে পুলক ফুটাইয়া তার নারীজন্ম-সার্থক যুবতী-হৃদয় ধন্য করিয়া হাত ধরিলেন, তখন রজনীর মনে হইল, কে যেন একটী প্রফুল্ল দলগুলির দ্বারা তাহার প্রকোষ্ঠ বেড়িয়া ধরিল—কে যেন গোলাপের মালা গাঁথিয়া তাহার হাতে বেড়িয়া দিল। তখনই রজনীর এমনও ইচ্ছা হইতেছিল, "কেন সে জল হইয়া যায় নাই, শচীন্দ্রও সে দুইটী ফুল হইয়া এইরূপ সংসৃষ্ট হইয়া কোন বন্য বৃক্ষে গিয়া ঝুলিয়া রহিল না?" সেই পাণিস্পর্শে রজনী ভাবিল যে, সে শচীন্দ্রের স্ত্রী! ভাবিয়া প্রতিজ্ঞা করিল "ইহ জন্মে অন্ধ ফুলওয়ালীর আর কেহ স্বামী হইবে না।"

অন্ধের বাহ্য বস্তু দেখিবারই শক্তি নাই; সে কেমন করিয়া অতীন্দ্রিয় বস্তু দেখিতে পাইবে? রজনী এই দেহই দেখিল না, ইহলোকেরই পরিচয় পাইল না, সে কিরূপে সূক্ষ্ম দেহের কল্পনা করিবে, পরলোক ইয়ত্তা করিবে?

রজনী হীরালালকে বিবাহ করিতে চাহিল না। অনেক কাঁদিল, কেহ জানিল না, শুনিল না; অন্ধের মর্ম্মের ব্যথায় সহানুভূতি কেহ দিল না। চাঁপার প্ররোচনায় রাত্রি দ্বিতীয় প্রহরে একবস্ত্রে রজনী বাড়ীর বাহির হইল। কি সূর্য্যমুখী, কি কুন্দ, কি মৃণালিনী, কি এই রজনী-কাব্যে উপন্যাসে

বলিয়া রাত্রে একাকিনী বাহির হওয়া, কুলের বাহির হওয়া বলিয়া লোকে বোঝে না। যুবতী রমণী মনে যে ভাব লইয়াই হউক, গভীর রাত্রে একাকিনী কিম্বা অপর পুরুষের সহিত বাটীর বাহির হইলে লোকে ধরিয়া লয় যে, সে কুলের বাহির হইয়াছে। লোক-চরিত্র এমনই, সমাজের ব্যবস্থা এই মতই। আজ যদি একজনের মনোভাব ভাল ছিল বলিয়া বাহিরের ব্যক্ত মন্দ কার্য্যকে ভাল কার্য্য বলা যায়, তবে প্রত্যেকের মন্দ কার্য্যকে ভাল কার্য্য না বলিবার বাধা কি? ব্যক্ত কার্য্য দেখিয়া মনোভাবের বিচার করিতে হইবে। ব্যক্ত কার্য্য না দেখিয়া মনোভাবের বিচার অসম্ভব। বিচার কার্য্য দেখিয়া, মাত্র মনোভাব দেখিয়া নহে। আর যেখানে মনোভাব দেখিতে হয়, সেখানেও ব্যক্ত কার্য্যের মধ্য দিয়া দেখার আবশ্যক করে।

তার পর হীরালালের মন্দ অভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়া রজনী ধর্ম্মনষ্ট ভয়ে আকুল হইয়া পড়িল। রজনীকে চড়ার মধ্যে নামাইয়া হীরালাল জব্দ করিল। রজনী কোমর জলে দাঁড়াইয়াই শব্দের স্থানানুভব করিয়া সবলে হীরালালের মাথায় লাঠি মারিল। তার পর "প্রভাতবায়ু-তাড়িত গঙ্গাজল প্রবাহ মধ্যে নিমগ্ন হইয়া ভাসিতে ভাসিতে জলে রজনীর শ্বাস নিশ্চেষ্ট, চেতনা বিনষ্ট হইয়া আসিল।"

অমরনাথ জলমগ্না রজনীকে উদ্ধার করিয়া সেই মুমূর্ষুর জীবন দিল। দয়াপ্রাণ অমরনাথ অনেক যত্ন ও পরিশ্রম করিয়া তাহার নষ্ট সম্পত্তির উদ্ধার করিল। তখন রজনী অন্যাসক্তহৃদয়া হইয়াও জীবন দান ও নষ্ট সম্পত্তি উদ্ধারের কৃতজ্ঞতা স্বরূপ জীবন-দাতার পদতলে আপনাকে উৎসর্গ করিতে চাহিল। জীবনদাতা তাহাকে চাহেন বলিয়াই রজনীও চাহিল। এখানে রজনী নিজের লাভালাভ, সুখদুঃখ, এমন কি ব্যক্তিত্ব-টুকু বিসর্জ্জন দিয়া অমরনাথের দাসী হইবার জন্য আপনাকে প্রস্তুত করিয়া লইল।

লবঙ্গলতা যখন রজনীর নিকট শচীন্দ্রের কণ্ঠ, শচীন্দ্রের স্পর্শ, অন্ধের রূপোন্মাদ, তার পর তার পলায়ন, নিমজ্জন ও উদ্ধারের কাহিনী শুনিয়া তাহাকে কহিল "শচীন্দ্রের সঙ্গে তোমার আমি বিবাহ দিব।" রজনী কাঁদিতে কাঁদিতে তখন বলিয়াছিল, "দিতে পারিবেন না। অমরনাথ হইতে আমার সর্ব্বস্ব। অমরনাথ আমার বিষয় উদ্ধারের জন্য যাহা করিয়াছেন, পরের জন্য পরে কি তাহা করে? তাও ধরি না, তিনি আপনার প্রাণ দিয়া আমার প্রাণ রক্ষা করিয়াছেন। * * * যাহার কাছে আমি এত ঋণী, তিনি আমার যাহা করিবেন, তাহাই হইবে। তিনি যখন অনুগ্রহ করিয়া আমাকে দাসী করিতে চাহিয়াছেন, তখন আমি তাঁহারই দাসী হইব। আর কাহারও নহে।"

রজনী গ্রীকরাজ সেলুকসের কন্যা হেলেনের মত কঠোর স্বার্থত্যাগ করিতে চাহিল। হেলেন যুদ্ধমান দুইটী জাতির মধ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য আত্মবলি দিতে সঙ্কল্প করিয়াছিল, রজনীও বিপন্নের প্রতি দয়ার পুরস্কার স্বরূপ আপনাকে বলি দিতে মনস্থ করিল। এ স্বার্থত্যাগের জন্য রজনীর শত মুখে প্রশংসা করি। অগাধ বিষয়সম্পত্তির মালিক হইয়া, শচীন্দ্রের প্রতি তীব্র ভালবাসা মনোমধ্যে উপলব্ধি করিয়াও তাহার সহিত বিবাহ না হইলে এ জন্মের মত নারীজীবন ব্যর্থ হইয়া যাইবে, জানিয়াও, রজনী জীবন-দাতার কাছে আপনার দুর্ব্বলতা দোষটুকু

ঢাকিতে চাহে নাই, এজন্য রজনীকে পূজা করিতে ইচ্ছা হয়। রজনী শচীন্দ্রকে ভালবাসে, ইহা জানিলে অমরনাথ নিজে বিবাহ না করিয়া শচীন্দ্রের সহিতই তাহার বিবাহ দিবেন, এরূপ স্বার্থকরী আশা লইয়া রজনী অমরনাথের কাছে এ পরিচয় দেয় নাই। অমরনাথ দেবতা; সে দেবতার পদে অন্যাসক্তহৃদয়কে পুষ্পাঞ্জলি স্বরূপ দান করিতে রজনী কুণ্ঠিত। তবে দেবতা যদি দয়া করিয়া তাহা লয়েন, তবে রজনীর বলিবার কিছুও নাই। রজনী তাই অমরনাথকেই সকল কথা খুলিয়া বলিয়া ক্ষমা চাহিল।

অমরনাথ লবঙ্গলতার ক্রন্দনে বিচলিত হইয়া, আর রজনীকেও শচীন্দ্রানুরাগিনী জানিয়া আর তাহাকে বিবাহ করিল না। শচীন্দ্রের হস্তেই রজনীকে দান করিয়া গেলেন। ইহাতে সকলে লাভবান্ হইল বটে, কিন্তু ক্ষতি হইল লবঙ্গলতার। লবঙ্গলতার হৃদয়ে উচ্ছ্বসিত অনুতাপের সঙ্গে অমরনাথের করুণ স্মৃতি দৃঢ় নিখাত হইয়া রহিল।

যে রজনী বর্ষাজলপূর্ণ তরঙ্গিনীর ন্যায় সম্পূর্ণতা-প্রাপ্ত যৌবনশ্রীর দ্বারা মণ্ডিত হইয়াও অন্ধ বলিয়া ভাস্কর্য্যপটু শিল্পকারের যত্ন-নির্ম্মিত প্রস্তর মূর্ত্তির মত ছিলেন, আর আজ সন্ন্যাসীর মন্ত্র ও ঔষধের অলৌকিক গুণে তাহার সেই বৃহৎ সুনীল ভ্রমরকৃষ্ণ তারাবিশিষ্ট অতি সুন্দর চক্ষুতে কটাক্ষের সৃষ্টি হইল। দৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে কোথা হইতে লজ্জা আসিয়া আপনার কোমল অরুণ রাগ লইয়া চক্ষুর উপর অধিষ্ঠান করিল। অন্ধ রজনীর স্থির গম্ভীর সঙ্কোচ-জ্ঞাপক মূর্ত্তি পরিবর্ত্তিত হইয়া আর এক মহিমময়ী জ্যোতির্ম্ময়ী হাস্যদীপ্তা মূর্ত্তি দেখা দিল। কি এক অভিনব শ্রী আসিয়া রজনীর সর্ব্বাঙ্গে আশ্রয় গ্রহণ করিল।

অমরনাথ যদি রজনীকে শচীন্দ্রের হস্তে সম্প্রদান না করিয়া যাইত, তাহা হইলে রজনীর ভাগ্যে কখনই আরাধনার ধন শচীন্দ্র লাভ ঘটিত না। রজনী ও শচীন্দ্রের অন্তর সেজন্য অমরনাথের উপর কৃতজ্ঞতায় উচ্ছ্বসিত হইয়াছিল, তাহা সন্তানের নাম রাখাতেই প্রকাশ পাইয়াছে। তাহাদের বিবাহ অমরনাথের অনুগ্রহের ফল—তাই পুত্রের নাম "অমরপ্রসাদ" এই নামকরণ হইল।

শ্রীরামসহায় বেদান্তশাস্ত্রী।

স্বর্গীয় কিশোরীমোহন রায়।

চিরজীবন একনিষ্ঠভাবে বাগ্দেবীর আরাধনা করিয়া অকপট সাহিত্যসেবী কিশোরীমোহন তাঁহার পরমারাধ্য দেবতার শ্রীচরণে আপনার দেবভোগ্য জীবন-কুসুমটী অঞ্জলি দিয়া চলিয়া গিয়াছেন। কিশোরীমোহনের প্রতিভা কৈশোরেও পৌঁছিতে পারে নাই। কালের করাল করাঘাতে চিরদিনের জন্য চাপা পড়িয়া গিয়াছে। তাঁহার বয়স মাত্র বিয়াল্লিশ বৎসর হইয়াছিল। যে বয়সে পাশ্চাত্য দেশের লোক সবে কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করেন, আমাদের দেশের প্রতিভাবান ব্যক্তিরা তখন শ্মশান-চিতায়! এ দুর্ভাগ্য বঙ্গের নিজস্ব। যে দেশে ৩৬৫ দিন দুর্ভিক্ষ লাগিয়াই আছে, ম্যালেরিয়া কলেরা, প্লেগ

* কিশোরীমোহন-ইন্‌ষ্টিটিউট্ লাইব্রেরীর বার্ষিক অধিবেশনে লেখক কর্তৃক পঠিত।

বসন্ত যে দেশবাসীর নিত্য সহচর, সেই দেশের কবি অকাল মৃত্যুকে অগত্যা এই বলিয়া মানিয়া লইতেছেন;—"দুঃখ মিছে, কান্না মিছে, দুদিন আগে, দুদিন পিছে।" এজন্য আমরা আর বৃথা আক্ষেপ করিব না। এক্ষণ মহাত্মা কিশোরীমোহনের আড়ম্বরবিহীন সাহিত্যিক জীবনের দুই চারিটী কথা ও তাঁহার গ্রন্থরাজির স্থূল বিবরণ আপনাদের নিকট নিবেদন করিব।

কিশোরীমোহনের পিতৃদেব বিদ্যাবিনোদ উপাধিক স্বর্গীয় গোবিন্দমোহন রায় মহাশয় কাকিনারাজের দেওয়ান ছিলেন। কিন্তু কেবল রাজকার্য্যেই তাঁহার সময়, কর্ত্তব্য ও প্রতিভা আবদ্ধ ছিল না। তিনি সংস্কৃত ও বঙ্গসাহিত্যে সুপণ্ডিত ছিলেন। প্রাচীন সিদ্ধান্ত জ্যোতিষ তাঁহার বড় প্রিয় বস্তু ছিল এবং তিনি বহুকাল তাহার অনুশীলনে অতিবাহিত করিয়াছিলেন। তৎপ্রণীত "মৃণ্ময়ী" এই অনুশীলনের ফল। এটী জ্যোতিষ বিষয়ক মৌলিক গ্রন্থ। এই গ্রন্থ প্রকাশিত হইলে তৎকালে দেশীয় সংবাদপত্রে ইহার ভূয়সী প্রশংসা ও গভীর আলোচনা হইয়াছিল। তাঁহার জীবদ্দশায় এই গ্রন্থের দুইটী সংস্করণ হইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত 'লীলাবতী', 'হরিবাসর তত্ত্বসার' প্রভৃতি গ্রন্থও তাঁহার সাহিত্য চর্চ্চার সাক্ষ্য প্রদান করে। 'সনাতনী' প্রণেতা, স্বর্গীয় সাহিত্যাচার্য্য অক্ষয়চন্দ্র সরকার, স্বর্গীয় উমেশচন্দ্র দত্ত প্রভৃতি বহু মনস্বীর সহিত ইঁহার প্রগাঢ় সৌহৃদ্য ছিল।

গোবিন্দমোহন যেমন বিদ্বান, তেমনই চরিত্রবান্ ছিলেন। একাধারে মণিকাঞ্চন সংযোগ। এই মহাত্মার তেজস্বিতা, সত্যপ্রিয়তা ও সৎসাহসের বিষয় শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস প্রণীত 'চরিত্র-গঠন' গ্রন্থে কিয়ৎপরিমাণে উল্লেখ আছে। গোবিন্দমোহনের উল্লিখিত সদ্গুণ রাশি তদীয় পুত্র কিশোরীমোহনেও সংক্রমিত হইয়াছিল।

পাবনা জেলার অন্তর্গত উধুনিয়া গ্রাম গোবিন্দমোহনের পৈতৃক নিবাস। কার্য্যানুরোধে তাঁহাকে সপরিবারে কাকিনাতে বাস করিতে হইত। ১২৭৮ বঙ্গাব্দের মধুময় মধু মাসে শুভ দোলপূর্ণিমার দিন গোবিন্দমোহনের কাকিনার বাটীতে কিশোরীমোহন জন্মগ্রহণ করেন। কিশোরীমোহন বাল্যে অধিক দিন বিদ্যালয়ে পাঠাভ্যাস করেন নাই। কিন্তু তাঁহার বিদ্যানুশীলন আমরণ সমভাবে প্রবল ছিল। তিনি সর্ব্বদা গৃহে বাঙ্গালা, সংস্কৃত, ইংরাজী সাহিত্য অধ্যয়ন-নিরত থাকিতেন। তাঁহার অধ্যয়নে এমনই একটা মত্ততা ছিল যে, বৈষয়িক কোন ব্যাপারই তাঁহার পাঠে ব্যাঘাত জন্মাইতে পারিত না। তাঁহার পাঠতৃষ্ণা এরূপ প্রবল ছিল যে, যখনই কোন নূতন পুস্তক প্রকাশিত হইত—ইংরেজী হোক, বাঙ্গালা হোক—তিনি অবিলম্বে তাহা সংগ্রহ করিয়া সাগ্রহে পাঠ করিতেন। প্রকৃত প্রস্তাবে তিনি একজন 'কেতাবকীট' ছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী না হইয়াও যে বঙ্গসাহিত্যের অকৃত্রিম সেবক হওয়া যায় এবং বঙ্গসাহিত্য ভাণ্ডারে কিছু দান করিতে পারা যায়, তাঁহার জীবনই এ কথার জলন্ত সাক্ষী।

কাকিনাতেই তাঁহার সুখময় শৈশব অতিবাহিত হইয়াছিল। এই সময় হইতেই তিনি ছাত্র-সাহিত্য-সভায় প্রবন্ধাদি পাঠ করিতে আরম্ভ করেন। এবং তখন হইতেই তাঁহার হৃদয়াভ্যন্তরে অন্তঃসলিলা সরস্বতীর মত সাহিত্য স্রোত প্রবাহিত হইত। অষ্টাদশ বৎসর বয়স হইতেই কিশোরীমোহন

'ভারতী' 'নব্যভারত' 'অনুসন্ধান' 'প্রদীপ' প্রভৃতি সুপ্রসিদ্ধ পত্রিকায় প্রবন্ধাদি প্রকাশ করিতে থাকেন।

প্রথম গ্রন্থ প্রকাশ—১২৯২ সালে তাঁহার ভাবী প্রতিভার নিদর্শন,—"হামির" প্রকাশিত হয়। তখন তাঁহার বয়স মাত্র কুড়ি বৎসর। বঙ্গভাষায় তিনিই প্রথম হামিরের মহনীয় চরিত্র চিত্রিত করেন। এরূপ অল্প বয়সে এরূপ কার্য্যে অগ্রণী হওয়া অল্প কৃতিত্বের কথা নহে। সুপ্রসিদ্ধ স্বর্গীয় যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ মহাশয় এই গ্রন্থের ভূমিকায় ভবিষ্যদ্বাণী করেন যে "আমার দৃঢ় বিশ্বাস, কালে ইনি একজন সুলেখক হইবেন।" বিদ্যাভূষণের বাণী ব্যর্থ হয় নাই। উত্তর কালে সত্য সত্যই কিশোরীমোহন একজন সুলেখক বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিলেন। যাক্ সে কথা, এখন এই গ্রন্থের কিঞ্চিৎ পরিচয় প্রদান করা প্রয়োজন। 'হামির' ঐতিহাসিক উপন্যাস। টডের রাজস্থান হইতে ইহার আখ্যান ভাগ গৃহীত। গ্রন্থখানি অরি সিংহের পুত্র হামিরের অদ্ভুত স্বদেশপ্রেমের জলন্ত প্রতিচ্ছবি। গ্রন্থকারের নিপুণ তুলিকার গুণে গ্রন্থোক্ত সমুদয় ঘটনা পাঠকের নিকট জীবন্ত রূপে প্রতিভাত হয়। হামির-মহিষী ক্ষেত্রকুমারীর অদ্ভুত পতিভক্তি ও হামিরের দেশভক্তি—সোণায় সোহাগা। ত্রয়োদশবর্ষীয় বালক হামিরের অপূর্ব্ব বীরত্ব, কৈলশ্বারার ভীল সর্দ্দার মুঞ্জের সহিত তাহার সংগ্রাম, প্রতিশোধ-পরায়ণ, অটল প্রতিজ্ঞ হামির কর্ত্তৃক মুঞ্জের মস্তকছেদন পূর্ব্বক পিতৃব্য অজয় সিংহকে উপহার দান প্রভৃতি গ্রন্থবর্ণিত অংশগুলি পাঠকালে হৃদয় নববলে বলীয়ান্ হয়। যবনের অধিকার কালে যখন হিন্দুর জাতি ধর্ম্ম, কুল ললনার কুলধর্ম্ম সকলই রসাতলে যাইতে বসিয়াছিল, হামিরের তাৎকালিক মোগল কুল ধ্বংসের চাতুর্য্যময়ী নীতিতে গ্রন্থকারের লিপিকুশলতার পরিচয় পাওয়া যায়।

হামির যুদ্ধে প্রাণ বিসর্জ্জন দিয়াছেন। ক্ষেত্রকুমারী এক্ষণ বালবিধবা, তদুপরি মাতৃবিয়োগ-বিধুরা। ক্ষেত্রকুমারীর মাতৃবিয়োগে গ্রন্থকারের হৃদয়ে কিরূপ সমবেদনার উদ্রেক হইয়াছে, পাঠকগণ এইবার তাহার পরিচয় লউন ;—

"মালদেবের স্ত্রী বিয়োগ হইল, ক্ষেত্রকুমারীর মাতৃবিয়োগ হইল, কমলাবতীর সাক্ষাৎ ভগিনী স্থানীয়া সপত্নীর বিয়োগ হইল সত্য, কিন্তু পাঠক! ক্ষেত্রকুমারী আজ যে অমূল্য ধন হারাইল, তাহার যে ক্ষতি হইল, আর কাহারও এমনটী হইল না। কমলাবতীর এখন আর সপত্নী নাই, তিনি এখন অন্তঃপুরের একমাত্র কর্ত্রী। মালদেবের কলত্র বিয়োগ হইয়াছে, হয়ত কয়েকদিন পর আবার একজন সে স্থান অধিকার করিবে। কিন্তু হায়, ক্ষেত্রকুমারীকে আজ যিনি ছাড়িয়া গেলেন, তাঁহার অমন স্নেহময়, অমন শুভঙ্কর জন আর কেহ এ জগতে আছে কি? ক্ষেত্রকুমারীর ভাগ্যে আর অমন স্নেহমাখা ডাক আছে কি?" ইত্যাদি।

ক্ষেত্রকুমারীর মাতা মৃত্যুকালে সপত্নী কমলাদেবীর হস্তে ক্ষেত্রকুমারীকে সমর্পণ করিয়া যান। ক্ষেত্রকুমারীর প্রতি বিমাতা কমলাদেবীর তাচ্ছিল্য দেখিয়া গ্রন্থকার হাড়ে হাড়ে জ্বলিয়া উঠিয়াছেন। জ্বালাময়ী ভাষায় তিনি লিখিতেছেন ;—"অকৃতজ্ঞতার—অধর্ম্মের সমুজ্জ্বল দৃষ্টান্ত যদি দেখিতে

চাও, মালদেবের অন্তঃপুরে প্রবেশ কর— কমলাবতীর শরীরে সুস্পষ্ট সে প্রমাণ পরিদৃশ্যমান্। হায়! সত্যই কি কৃতজ্ঞতা নাই? সংসারে কিছুরই প্রতিদান নাই। স্নেহের —দয়ার—ভালবাসার—উপকারের কিছুরই প্রতিদান নাই। সংসারে কৃতজ্ঞতার যাহা কিছু আভাস দেখিতে পাই—হায়! তাহা যেন স্বার্থময়।”

সংসারের অনিত্যতা, বৈচিত্র্য ও কৃতঘ্নতা স্মরণ করিয়া গ্রন্থকার অন্যত্র লিখিতেছেন;—“সংসারে সকলই অস্থায়ী, ধন, মান, ঐশ্বর্য্য, শোক, তাপ, দুঃখ, কিছুই স্থায়ী নহে। জলস্রোতের মত সময় মানবের সকল প্রকার অবস্থাকে পরিবর্ত্তিত করিতেছে। সংসারে শোকের যদি নিবৃত্তি না থাকিত, যন্ত্রণার যদি অবসান না হইত, দুর্ব্বল মানব-প্রাণের অস্তিত্ব তবে আর বেশী দিন থাকিত না। হৃদয়-ছেঁড়া ধন পুত্র-রত্নের অমঙ্গল আশঙ্কা, যে স্নেহময়ী জননীর প্রাণকে বজ্রের ন্যায় আঘাত করিত, যে প্রেমময়ী প্রেমদার পদে কুশাঙ্কুর বিদ্ধ হইলে স্বামীর প্রাণ ক্ষতবিক্ষত হইত, যে প্রাণাধিক পতির অভাবে সাধ্বী স্ত্রী জীবিত থাকিবার কল্পনা করিতে পারিত না, যে হৃদয়-সখা হৃদয়-বন্ধুকে মুহূর্ত্ত কালের নিমিত্তও চক্ষের অন্তরাল করিতে হৃদয়ে শত বৃশ্চিক দংশন করিত, সেই, সেই প্রিয়জন কি না কালের পরিবর্ত্তনে এই সকল প্রাণাধিক সুহৃদ্ জনের অভাবে হাসিতেছে, খেলিতেছে। হায় রে সংসার!” বিংশতি বর্ষীয় যুবকের লেখনী-মুখে কি গভীর তত্ত্বকথা! ইহারই নাম প্রতিভা।

১৩১৮ সালে কিশোরীমোহন “সুরাজ্য সপ্তম এডওয়ার্ডের স্বর্ণরাণী” নামক একখানা গ্রন্থ প্রকাশ করেন। ইহাতে সম্রাটের ইংরেজী ভাষায় লিখিত রোজনামচা ও তাঁহার প্রাঞ্জল বঙ্গানুবাদ আছে। অনুবাদেও কিশোরীমোহন যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন। এই গ্রন্থ প্রকাশে তাঁহার পূর্ণ রাজভক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। ইহার আয় তিনি পাবনা এডওয়ার্ড কলেজের হিতার্থে দান করিয়াছিলেন। ইহাতে তাঁহার মহত্ত্বের পরিচয় প্রকটিত।

এক বৎসর পরে—১৩১৯ সালের ১০ই ভাদ্র, বঙ্গের ভূতপূর্ব্ব প্রথম গভর্ণর লর্ড কারমাইকেল মহোদয়ের পাবনাতে শুভাগমন উপলক্ষে কিশোরীমোহন “সুরাজ” নামক সাপ্তাহিক সংবাদ পত্রের প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁহার এই প্রতিষ্ঠানের কল্যাণে পাবনাবাসীর সাহিত্য-চর্চ্চার পথ সুগম ও অভাব অভিযোগ আলোচনার পথ উন্মুক্ত হয়। ‘সুরাজে’র জন্মদিনে কিশোরীমোহন “সুরাজের সার্থকতা” সম্বন্ধে লিখেন,—‘বিধাতার প্রেরণায় নব্য বঙ্গের এই প্রথম রাজ-প্রতিনিধি লর্ড কারমাইকেলের শুভাগমন দিবসে ‘সুরাজে’র অভ্যুদয় হইল। রাজশক্তি ও জনসাধারণ, পাবনাবাসী ও বঙ্গবাসী বিদ্বজ্জন সমাজের নিকট আমরা ইহার দীর্ঘ জীবনের শুভাশীষ কামনা করি। ‘সুরাজ’ আমাদের মনোনীত নাম। আমরা সু চাহি, কু চাহি না, সু আসিলেই জ্ঞান আসিবে, জ্ঞান আসিলেই সর্ব্বাঙ্গীন মনুষ্যত্ব লাভ হইবে।” ‘সু’র প্রতি কি প্রগাঢ় শ্রদ্ধা!

মুহূর্ত্তের জন্য তাঁহার মনে ‘সুরাজে’র স্থায়িত্ব বিষয়ে সংশয় উত্থিত হইলেও তিনি তাঁহারই মধ্যে সান্ত্বনা খুঁজিয়া লইয়াছিলেন। তাঁহার আত্ম-সান্ত্বনাটা কিরূপ, তাহা পাঠক দেখুন। তাঁহার নিজের ভাষায়ই বলি; —“...তাই আমরা আজ উৎসব করিয়াছি।

আজ মায়ের ডাকে আমরা মিলিত হইয়াছি। জানি না, এ আমাদের দুই দিনের উৎসব, কি জীবনব্যাপী উৎসব, কিন্তু দুই দিনের উৎসবেও এ আত্মপ্রসাদ, তথাপি আমাদের পূজা-বাড়ীতে অন্ততঃ একবারের জন্যও জননীর সাক্ষাৎ পাইয়াছি।" সুখের বিষয়, কিশোরীমোহনের উৎসব দুই দিনেই শেষ হয় নাই, এখনও তাহা আমাদিগকে আনন্দ বিতরণ করিতেছে।

নূতন লেখকগণকে উৎসাহ দান ক্রমে তাহাদিগকে যোগ্য করিয়া তোলা কিশোরী-মোহনের একটা প্রধান কাজ ছিল। তিনি অযোগ্যের মধ্যেও সার্থকতা দেখিতে পাইতেন। তাই তিনি বলিতেন, "মায়ের পূজায় কি শুধু যোগ্যেরই একমাত্র অধিকার? কনিষ্ঠের কি কোন কাজ নাই? অযোগ্যের প্রাণে কি সাময়িক উচ্ছ্বাসও নাই? ক্ষণিকের সেই শুভ মুহূর্ত্তকে সে কি সার্থক মুহূর্ত্তে পরিণত করিতে পারে না? নিশ্চয় বোধ হয় যেন পারে। অযোগ্যের সৌভাগ্যে যদি তাহার মনে সদনুষ্ঠানের সাময়িক বাসনাও উদিত হয়, সেও তাহার ব্যর্থ জীবনের সার্থকতা।"

নানা প্রতিকূল অবস্থায় নিপতিত ও ঋণ-দায়ে জর্জ্জরিত হইয়াও 'মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতন' ব্রতী কিশোরীমোহন আমরণ দারিদ্র্যের সহিত যুঝিয়া "সুরাজ"কে জীবিত রাখিয়া গিয়াছেন।

কিশোরীমোহন অতি কর্ত্তব্যপরায়ণ ছিলেন। তোষামোদ করা তাঁহার প্রকৃতি-বিরুদ্ধ ছিল। বাল্যকালে যে 'নব্যভারত' পত্রে তাঁহার 'হাতে খড়ি' হয়, প্রবীণ বয়সে কর্ত্তব্যের পানে তাকাইয়া, স্যায়ের প্রচারক হইয়া, আপন বিচার-বুদ্ধির বশবর্ত্তী হইয়া সেই নব্য-ভারতের লেখার প্রতিকূল সমালোচনা করিতে বিন্দুমাত্র পশ্চাৎপদ হন নাই। তিনি জানিতেন, মতান্তর হইলেই মনান্তর হয় না।

"সুরাজ" প্রতিষ্ঠার দুই বৎসর পরে—১৩২১ সালে তাঁহার উজ্জ্বল প্রতিভার কনক কিরণচ্ছটা বিকীর্ণ হইল। কিশোরী-মোহন "কর্ম্মফল" নামক একখানা সুলিখিত গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। এই গ্রন্থ প্রকাশ হইবা মাত্র তাঁহার যশঃসৌরভ চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়ে। এই গ্রন্থ প্রকাশের ৮ মাস পরে কিশোরীমোহন পরলোকগমন করিয়াছেন। *

গ্রন্থ পরিচয়। কর্ম্মফল ঐতিহাসিক বৌদ্ধ আখ্যায়িকা। 'দুঃখ-নির্ব্বাণ-ভিক্ষু নর নারীর করকমলে গ্রন্থকার এই পুস্তক অর্পণ করিয়াছেন। কর্ম্মফলের ভারতীয় বৌদ্ধ আখ্যায়িকা প্রাচীন যুগ হইতে বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত আছে। অথচ বঙ্গসাহিত্যে এত দিন পর্য্যন্ত এই আখ্যায়িকা স্থান পায় নাই দেখিয়া কিশোরীমোহন এই গ্রন্থ রচনায় প্রবৃত্ত হন। তাঁহার ধর্ম্মামৃত পানে বাঙ্গালী ধন্য হইয়াছে। 'কর্ম্মফল' দুই ভাগে বিভক্ত; প্রথম প্রবন্ধাংশ, দ্বিতীয় আখ্যায়িকা ভাগ। এই গ্রন্থ ভাষা ও ভাবে, গাম্ভীর্য্যে ও মাধুর্য্যে বঙ্গসাহিত্যে অপূর্ব্ব সামগ্রী। এই গ্রন্থ পাঠ কালে আমাদের হৃদয় কর্ম্মমাহাত্ম্যে ভরপূর হয়। বুদ্ধের ধর্ম্ম, পুরুষকার ও স্বাবলম্বন শিক্ষা দেয় এবং মানবকে কাপুরুষতা ও পর-মুখাপেক্ষিতা হইতে আত্ম-শক্তিতে উদ্বুদ্ধ করে। গ্রন্থকার কিশোরীমোহনের 'অহিংসা-তত্ত্বে'র ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ বড়ই প্রাণস্পর্শী ও হৃদয়গ্রাহী। কেবল হিংসা হইতে বিরতি,

* ১লা পৌষ, ১৩২১।

নিরামিষ ভোজন, পশু-ক্লেশ নিবারণ ও দুঃখীর দুঃখে করুণা প্রকাশই অহিংসার একমাত্র উচ্চ আদর্শ নয়, পরন্তু দুঃখীর দুঃখে দুঃখানুভূতি ও সুখীর সুখে সুখানুভূতিই যে বুদ্ধদেবের প্রচারিত অহিংসার যথার্থ আদর্শ, তাহা কিশোরীমোহন অতি সুন্দর ভাবে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। এই গ্রন্থে কর্ম্মের ব্যাখ্যা অতি উপাদেয়। কর্ম্ম প্রাণ, কর্ম্ম জীবন, কর্ম্ম পুণ্য, কর্ম্ম ধর্ম্ম, কর্ম্মই যে জীবের একমাত্র সাধনা এবং কর্ম্মফল যে অবিনশ্বর, তাহাও এই গ্রন্থে সুস্পষ্টরূপে প্রদর্শিত হইয়াছে। এই নাটক নভেল-ছোট-গল্প-চুট্‌কী-প্লাবিত বঙ্গে এই শ্রেণীর গ্রন্থ যত প্রচারিত হয়, ততই মঙ্গল।

এই গ্রন্থ প্রকাশিত হইলে তৎকালে দেশীয় সাময়িক পত্রে খুব আলোচনা হইয়াছিল। 'প্রবাসী'তে নিম্নোদ্ধৃত মন্তব্য বাহির হইয়াছিল ;—"কর্ম্মফল একটী ঐতিহাসিক বৌদ্ধ আখ্যায়িকা অবলম্বনে রচিত। পুস্তকের প্রারম্ভে গ্রন্থকার বৌদ্ধধর্ম্মের সারতত্ত্ব "অহিংসা পরমো ধর্ম্মঃ" সম্বন্ধে তাঁহার যে প্রবন্ধটী সন্নিবেশ করিয়াছেন, তাহা কি চিন্তাশীলতায়, কি স্বাধীনচিন্তায়—সকল দিক দিয়াই বিশেষ ভাবে পঠনীয় ও উপভোগ্য হইয়াছে। আমাদের দেশে যাঁহারা বুদ্ধকে নাস্তিক, জড়বাদী বলিয়া অভিহিত করেন, আমরা তাঁহাদিগকে এই প্রবন্ধটী পাঠ করিয়া দেখিতে অনুরোধ করি। লেখকের অহিংসা তত্ত্ব আমাদের এত ভাল লাগিয়াছিল যে, অন্ততঃ তাহার কিয়দংশ প্রবাসীর পাঠকদিগকে উপহার দিবার বড়ই ইচ্ছা ছিল। * * * যাহা হউক, আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, বৌদ্ধধর্ম্ম সম্বন্ধে নানা ভ্রান্ত ধারণা—যাহা বহুদিন হইতে আমাদের অনেকের মনে বদ্ধমূল হইয়া আছে—তাহা এই প্রবন্ধ পাঠে বহুল পরিমাণে অপসারিত হইবে।" * * *

এতদ্ব্যতীত "সাহিত্য সংবাদ" পত্রের 'সম্পাদকীয় মন্তব্যে' কয়েক মাস ধরিয়া এ গ্রন্থের অনুকূল আলোচনা হইয়াছিল।

'সমসাময়িক ভারতে'র শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার মহাশয় ১৩২১ সালের মাঘ মাসের 'ভারতী'তে কিশোরীমোহনের চরিত্র সম্বন্ধে যে মন্তব্যটী প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহার কিয়দংশ এস্থলে উদ্ধৃত করিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিলাম না।

"কিশোরীমোহন দেশের সুসন্তান ছিলেন। বহুবার তিনি কংগ্রেসে প্রতিনিধি স্বরূপ যোগদান করিয়াছিলেন। দেশের শিল্প বাণিজ্যের উন্নতিকল্পে তিনি বদ্ধপরিকর ছিলেন। প্রথম ৭ই আগষ্টের সভার পরে তিনি আর বিদেশী দ্রব্য ব্যবহার করেন নাই।

কিশোরীমোহনের কথায় ও কাজে প্রভেদ ছিল না। তিনি তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্ বিনয়কুমারের বিবাহে কন্যাপক্ষ হইতে এক কপর্দ্দকও গ্রহণ করেন নাই। তাঁহার অনেক আত্মীয় "দেশকাল" বিবেচনা করিয়া 'দাঁও' মারিবার জন্য অনুরোধ করিতে বিরত হন নাই। "মুখে যাহা প্রচার করিয়াছি, কার্য্যে অন্য ভাব দেখাইতে পারিব না।"—পুরুষসিংহ কিশোরীমোহন এই কথা বলিতেন। * * * আমার সাহিত্যিক জীবনে তিনি আমার প্রথম উৎসাহদাতা। অথচ তিনি এরূপ নিরভিমানী ছিলেন যে, কদাচ আমাকে এ কথা কাহারও নিকট উল্লেখ করিতে দিতেন না। সকল বিষয়েই সকলের সহিত তিনি এইরূপ ব্যবহার করিতেন।

দেশের প্রত্যেক সদনুষ্ঠানের সহিত

কিশোরীমোহনের হৃদয়ের যোগ ছিল। অনেক কাজে তিনি নিজেই অগ্রণী হইতেন। দেশের হিত-চিন্তা তাঁহার মস্তিষ্ক অধিকার করিয়া ছিল, তিনি পারিবারিক বিষয়ে অনেকটা উদাসীন ছিলেন। তাঁহার প্রবন্ধগুলিতে তাঁহার আন্তরিক স্বদেশপ্রাণতার একটা সুস্পষ্ট অভিব্যক্তি ফুটিয়া উঠিত।

সমাজ-সংস্কারে কিশোরীমোহন অত্যন্ত মনোযোগী ছিলেন। হিন্দুসমাজের নিপীড়িত জাতিগণের দুর্দ্দশা দেখিয়া তিনি স্থির থাকিতে পারিতেন না। সর্ব্বদা তাহাদিগকে অন্যায়ের অত্যাচার হইতে রক্ষা করিবার একটা প্রবল প্রয়াস তাঁহার মধ্যে দেখিতে পাওয়া যাইত। বালবিধবার মর্ম্মবেদনায় অধীর হইয়া তিনি নীরবে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতেন।

খাঁটী সাহিত্যিক বলিলে যাহা বুঝায়, কিশোরীমোহন ছিলেন তাহাই। তাঁহার মধ্যে কোন ভেজাল ছিল না। গ্রন্থ রচনা বা সংবাদপত্র পরিচালনা করিয়া বড় মানুষ হইব, এমন ভাব তাঁহার মনে কখনও স্থান পায় নাই। তাই মৃত্যুকালে আকণ্ঠ ঋণে ডুবিয়া গিয়াছিলেন।

ছাত্র সমাজের প্রতি কিশোরীমোহনের অসীম প্রীতি ও অত্যন্ত অনুরাগ ছিল। তিনি মনে প্রাণে বুঝিতেন, ইহারাই দেশের ও সমাজের ভবিষ্যৎ ভরসার স্থল। ইহাদিগকে ভিত্তি করিয়াই ভবিষ্য সমাজ গঠিত হইবে। তাই ইহাদিগকে ভাব দেওয়া প্রয়োজন। এতদুদ্দেশ্যে তিনি স্বয়ং উদ্যোগী হইয়া কয়েক বৎসর পূর্ব্বে পাবনা টাউনহলে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার শেষ দিন ছাত্রগণকে আহ্বান করিয়া সভাস্থলে তাহাদের জীবনের গতি-নির্দ্দেশ ও দায়িত্ব বোধ জন্মাইয়া দিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের পারিতোষিক বিতরণ সভায়ও তিনি ছাত্রগণকে উদ্দেশ করিয়া বহু জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতা করিয়াছিলেন। তাঁহার বক্তৃতা-প্রদান-শক্তি অনেকের আদর্শ স্থল ছিল।

কিশোরীমোহন দুইটী আরব্ধ ও সংকল্পিত কার্য্য অপূর্ণ রাখিয়া চলিয়া গিয়াছেন। (১) তিনি তদীয় পিতৃদেব স্বর্গীয় গোবিন্দমোহন রায় মহাশয়ের জীবনচরিত রচনায় ব্যাপৃত হইয়াছিলেন, এবং উহার অধিকাংশ 'পৃথিবীর ইতিহাস প্রেসে' মুদ্রণার্থ প্রেরিত হইয়াছিল। তাঁহার আকস্মিক মৃত্যুতে এবং উপযুক্ত তত্ত্বাবধায়কের অভাবে তাহা অদ্যাবধি মুদ্রাযন্ত্রের কবল হইতে বাহির হয় নাই। ঐ গ্রন্থ প্রকাশিত হইলে আমরা তাৎকালিক দেশের ও সাহিত্যের অবস্থা বহুল পরিমাণে জানিতে পারিতাম। (২) তিনি 'বিশ্ববীণা' নাম্নী একখানি আদর্শ মাসিক পত্রিকা প্রকাশের সংকল্প করিয়াছিলেন, তাহাও অঙ্কুরে বিনষ্ট হইয়াছে।

কিশোরীমোহনের চেষ্টায় পাবনায় বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদের শাখা স্থাপিত হয়, এবং তিনি আমরণ উহার সভাপতির পদে বৃত থাকিয়া, উহার অশেষ উন্নতি করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার পরলোক গমনের পর উহার অস্তিত্ব ক্ষীণ ভাবে কয়েক বৎসর বজায় ছিল, এক্ষণে উহা লোপ পাইয়াছে।

কিশোরীমোহনের স্মৃতিরক্ষাকল্পে পাবনার ছাত্রবর্গ 'কিশোরীমোহন ষ্টুডেণ্টস লাইব্রেরীর' প্রতিষ্ঠা করিয়া এক দিকে লৌকিক হিসাবে তাঁহার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিয়াছেন, অপর দিকে কার্য্যতঃ তাঁহার পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া কর্ম্মপথে অগ্রসর হইতেছেন, ইহা খুব আনন্দের কথা।

শ্রীরাধাচরণ দাস।

মায়ের প্রাণ।

প্রভাতে উঠিয়া রাজপথে গিয়া
দেখিনু কাকের ছা,
মাটীতে পড়েছে উঠিতে পারে না
কা কা করে তার মা।
মাতৃ-হৃদয়ের আকুলি বিকুলি
মায়ের কাঁদিছে প্রাণ,
যে স্নেহ দিয়াছে মায়ের পরাণে
কাঁদে সেই ভগবান।
করুণার গীতি প্লাবিল ধরায়
ব্যোমে ব্যোমে উঠে সাড়া,
কাকেদের দল সে ডাকে জাগিল
দলে দলে আসে তারা।
কা কা করে ছা কা কা করে মা
দলে দলে কা কা করে,
বিশ্বের রাগিণী করুণার গীতে
বেদনায় দিল ভ'রে।
কসায়ের ছেলে সে ব্যথার সুরে
কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠে,
তুলে দেয় ছা উড়তে পারে না
ভূমিতে পড়িয়া লুটে।
কাকেদের দল শিশু দুঃখ দেখি
করে ঘোর আর্ত্তনাদ,
কলরবে তার জ্বালাতন হয়ে
কসাই সাধিল বাদ।
সহসা তাহার মনে পড়ে গেল
দুষ্ট বুদ্ধি কূটনীতি,
কাকের শিশুরে ধরিতে বলিল
সন্তানে দেখায়ে ভীতি।
শিশুটী বাপের বুঝিল মন্ত্রণা
ব্যথিল হৃদয় তার,
কাক-শিশু কাটি বাঁধিয়া লাঠিতে
ঝুলাবে জনক তার।

শুনিল না কথা দিল সে উড়ায়ে
মাটীতে পড়িয়া লুটে,
শিশু করুণায় ব্যথিত হইয়া
পাখিয়া কাঁদিয়া উঠে।
পথের মানুষ যে যায় চলিয়া
ভরে যায় করুণাতে,
কসাই শুধুই জেদের জ্বালায়
লোটা কাক ধরে হাতে।
ঘরেতে যাইয়া তাহারে কাটিয়া
রক্ত মাখা কাকে আনি,
কাকেদের দিকে সরোষে চাহিয়া
হাসি বাঁধে দেহ খানি।
উঠাল' দণ্ড পতাকায় মত
কাক-শিশু-দেহ নড়ে,
রুদ্ধ হৃদয়ের অশ্রু রক্ত রূপে
পতাকার নীচে পড়ে।
মানবের শিশু নয় দয়ারূপে
নীচে কাঁদে কশায়ের,
ব্যোমে ব্যোমে তার উঠে প্রতিধ্বনি
ভিজে আঁখি মানবের।
প'লাবে কি কাক দূরে বসে তারা
কি হতে কি হলো বলে,
কাক-শিশু-মাতা চুপ করে থাকি
আকাশে উড়িয়া চলে,
কোথা ভগবান খুঁজিয়া ফিরিবি।
মাতৃরূপে তিনি নীচে,
কশায়ের বধূ দণ্ড নামাইল
কশাই বারিল মিছে।
মাতৃ হৃদয়ের তপ্ত অশ্রুধারি
জীয়াতে নারিল ছায়ে,
কবি কেঁদে বলে আছ ভগবান
কশাই রমণী হয়ে।

শ্রীমন্মথধন বন্দ্যোপাধ্যায়, লক্ষ্ণৌ।

ঢাকা সাহিত্য-সম্মিলন।

এবার কোনও প্রকারে বাঙ্গালার দ্বিতীয় রাজধানী ঢাকায় সাহিত্য-সম্মিলন হইয়া গেল। সুখেরই বিষয়; নচেৎ যেরূপ ব্যাপার দাঁড়াইয়াছিল, ঢাকায় সম্মিলন হইবে না বলিয়াই ধারণা জন্মিয়াছিল। তাহা হইলে ঢাকার পক্ষে লজ্জার সীমা থাকিত না।

আমরা যৌবনের প্রথমে যখন ঢাকা কলেজে পড়িতে যাই, তখন হইতেই ঢাকার প্রসিদ্ধ 'দলাদলি'র বিষয় অবগত আছি। সেই উকীলে-উকীলে দলাদলি, পণ্ডিতে-পণ্ডিতে দলাদলি, তাঁতিবাজার-নবাবপুরে দলাদলি—ইত্যাদি তখন লক্ষ্যের বিষয় ছিল। অধুনা সাহিত্য-ক্ষেত্রেও তাহার ছায়াপাত হইয়াছে—তাই যুগপৎ "ঢাকা রিভিউ ও সম্মিলন" এবং "প্রতিভা" প্রকাশিত হইল। "পূর্ব্ব-বঙ্গ সাহিত্য-সমাজ" এবং "ঢাকা সাহিত্য-পরিষদ" প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। অতএব সম্মিলন নিয়া একটা বিরোধ যদি না বাঁধিত, তবে বরং বিস্ময়ের বিষয়ই হইত। যাহা হউক, অবশেষে কাজটা যে যেন-তেন হইয়া গেল, ইহাতে আশ্বস্ত হইলাম।

বাঁকীপুরে যখন শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাস মহাশয় ঢাকায় সম্মিলন আমন্ত্রিত করেন, তখনই কৃপা করিয়া এ অধমকেও অনুরোধ করিয়াছিলেন—যাহাতে সম্মিলন 'সক্‌সেস্‌ফুল্' হয়, তজ্জন্য পরামর্শাদি যেন দেই, এবং ঢাকায় যেন উপস্থিত থাকিতে ঔদাস্য না করি। দুঃখের বিষয়, আমি তাঁহার কোনও আদেশ প্রতিপালন করিতে পারিলাম না—নিতান্ত ইচ্ছা সত্ত্বেও সম্মিলনে যোগ দিতে পারি নাই। এবং যদিও কিছু পরামর্শ দিতে চেষ্টা করিয়াছিলাম—আমার দুরদৃষ্ট বশতঃ তাহা সাধারণের গোচর হইল না।

পুস্তাবকাশের অল্প পূর্ব্বে কোনও প্রসিদ্ধ সাপ্তাহিক পত্রে ঢাকা সাহিত্য সম্মিলন বিষয়ে একখানি চিঠি লিখিয়াছিলাম। তাহাতে পূর্ব্ববঙ্গ মোসলমান-প্রধান স্থান—পূর্ব্ববঙ্গের রাজধানীতে যে সম্মিলন হইবে, তাহার সভাপতি একজন মোসলমান হওয়া উচিত, এই প্রস্তাব করি। দুইটী নামও করিয়াছিলাম। প্রথম, অনরেবল্ জষ্টিস্ স্যার নবাব সৈয়দ শামসুল হুদা এম-এ, বি-এল, কে-সি-আই-ই। অনেকেই বোধ হয় অবগত নহেন যে, সৈয়দ শামসুলহুদা সাহেব কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াই "সুধাকর" নামক একখানি বাঙ্গালা সাপ্তাহিক পত্রের সম্পাদকতা করেন। তাঁহার পূর্ব্বে অপর কোনও মোসলমান গ্রাজুয়েট্ এভাবে বঙ্গ-ভারতীর সেবা করিয়াছেন কি না, জানি না। তখন "সুধাকরে"র উজ্জ্বল কিরণে মোসলমান সমাজ উদ্ভাসিত হইয়াছিল। কনসেন্ট্-বিল ইণ্ডিয়া-কাউন্সিলের মোসলমান সভ্য নবাব খাজে আহসান্ উল্লা বাহাদুর সমর্থন করিলেও, এই সুধাকর-সম্পাদক সৈয়দ হুদা সাহেব তদ্বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করিয়া হিন্দু মোসলমান সকলের ধন্যবাদার্হ হন। এখন পদে সম্মানার্হ জষ্টিস্ নবাব স্যার হুদা মোসলমান সমাজের অগ্রণী,—এইরূপ ব্যক্তিকে এতদুপলক্ষে পুনরায় বঙ্গীয় সাহিত্য-ক্ষেত্রে আকর্ষণ করিয়া আনয়ন করা উচিত।

দ্বিতীয়, মৌলবী আব্দুল করিম বি-এ, রিটায়ার্ড স্কুলইন্‌স্পেক্টর। এই 'নব্যভারতে'

আজ প্রায় কুড়ি বৎসর হইল, ইনি ধারাবাহিকরূপে "খালিফাদের ইতিবৃত্ত" প্রকাশ করেন—তার পর ইনিই সর্ব্বপ্রথম মোসলমান নরপতিগণের চিত্রাদি সংগ্রহ পূর্ব্বক বঙ্গভাষায় ভারতবর্ষের ইতিহাস লিখেন—ঐ ইতিহাস স্কুলপাঠ্য ছিল—ইহার ইংরেজী সংস্করণ বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠ্যও হইয়াছে, উর্দ্দূ সংস্করণ ভারতবর্ষময় পাঠ্যগ্রন্থরূপে সমাদৃত হইয়াছে। বিশেষতঃ বঙ্গীয় মোসলমানগণের "ভার্ণেকুলার" কি হইবে—বাঙ্গালা না উর্দ্দূ—যখন এই বিষয়ের বিচার চলিতেছিল, তখন মৌলবী আব্দুল করিম সাহেব এই ঢাকায়ই এক কনফারেন্সে দাঁড়াইয়া অকুতোভয়ে প্রচার করেন—বাঙ্গালী মোসলমানের বাঙ্গালাই ভার্ণাকুলার—উর্দ্দূ হইতে পারে না, প্রাথমিক শিক্ষায় সুতরাং উর্দ্দূ প্রচলন অনাবশ্যক ও অহিতকর। প্রধানতঃ তাঁহারই যুক্তিতর্কে তাৎকালীন "পূর্ব্ববঙ্গ ও আসাম" গবর্ণমেণ্ট্ উর্দ্দূ চালানের প্রস্তাব পরিত্যাগ করেন। অনেকের বিশ্বাস, তাঁহার এই নির্ভীক অভিমত প্রদান হেতু তিনি কোনও কোনও উপরিতন কর্ম্মচারীর বিরাগভাজন হন—এবং তাহারই নিমিত্তে তাঁহাকে পরিশেষে লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হইয়াছিল। ইঁহারই পৃষ্ঠপোষকতায় আঞ্জুমানে ও লামায়ে বাঙ্গালা সংস্থাপিত হইয়াছে, এবং ইঁহারই অর্থ সাহায্য দ্বারা বাঙ্গালা মাসিক পত্র "আল্ এস্লাম্" প্রকাশিত হইতেছে। অপিচ বঙ্গীয় মোসলমান সমাজে শিক্ষা প্রসারের জন্য ইনি প্রভূত অর্থ দান করিয়াছেন। এইরূপ ব্যক্তির সম্মাননা সাহিত্য-সম্মিলনের পক্ষ হইতে হওয়া বাঞ্ছনীয়। অন্ততঃ মূল সভাপতি না হইলেও ইতিহাস-শাখার তাঁহাকে নির্ব্বাচিত করিতে পারা যায়।

যে পত্রিকায় ইহা প্রেরিত হইয়াছিল, তাহার সম্পাদক মহাশয়ের সঙ্গে কিছুকাল পরে সাক্ষাৎকার হয়, তিনি আমার প্রবন্ধ পান নাই বলেন, এবং পুনশ্চ লিখিয়া বাড়ীর ঠিকানায় পাঠাইতে অনুরোধ করেন। আমি তদনুসারে কাজ করিয়াছিলাম, কিন্তু ঐ পত্র প্রকাশিত হয় নাই। বিরক্ত হইয়া আমি আর এ বিষয়ে আলোচনা করি নাই—বিশেষতঃ ঐ সময়ের অল্প পরেই সংবাদ রটিল, ঢাকায় দলাদলি বাঁধিয়াছে, সম্মিলন হয় কি না সন্দেহ।

আমরা এই পর্য্যন্ত মোসলমান সাহিত্যসেবিগণকে তেমন উৎসাহিত করিবার কিছুই করি নাই। এই ঢাকায় সাহিত্য শাখার সভাপতি চট্টগ্রাম হইতে নিযুক্ত হইলেন—কিন্তু চট্টগ্রামের স্বনামখ্যাত মৌলবী আব্দুল করিম সাহিত্যবিশারদ হইলেন না—অথচ ইঁহার ন্যায় কাজ কয়জন "হিন্দু" সাহিত্যিক করিয়াছেন ?

এইরূপ ব্যবহার প্রাপ্ত হইয়াই বোধ হয় আমাদের মোসলমান ভ্রাতৃগণ স্বতন্ত্র মোসলমান সাহিত্য-সম্মিলনী করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন—মোসলমান সাহিত্য-পরিষদও হইতেছে। জানি না, ইহার পরিণাম কি হইবে।

সে যাহা হউক, যখন ঢাকায় দলাদলি চলিতেছিল, তখন কোনও ইংরেজী খবরের কাগজে জনৈক ব্যক্তি স্যর শ্রীযুক্ত আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে সভাপতি প্রস্তাব করিয়া বসিলেন। ইনি কে জানি না; তবে সম্মিলনের খোঁজ খবর যে ইনি রাখেন না, বেশ জানা গেল—কেন না, গতবারে যে স্যর আশুতোষ সভাপতি হইয়াছিলেন, ইহা জানা থাকিলে এইরূপ প্রস্তাব করিতেন না।*

* শুনিলাম, ইনি স্যর আশুতোষকে সাহিত্য পরিষদের সভাপতি করিতে প্রস্তাব করিয়াছেন। স্যর

তার পর হঠাৎ এক দিন শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ভদ্রের টেলিগ্রাম পাইলাম—সম্মিলনে প্রবন্ধ দিতে হইবে ও হাজির থাকিতে হইবে। তখন বোধ হয় বড় জোর দশ দিন আন্দাজ বাকী—পারিবারিক কোনও বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজনে ব্যাপৃত ছিলাম—দুঃখিত চিত্তে অক্ষমতা নিবেদিত হইল—ঢাকার সম্মিলনে যোগদান অদৃষ্টে ঘটিল না।

কে সভাপতি হইলেন? শুনিলাম, শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় আমন্ত্রিত হইয়াছেন—শুনিয়া আনন্দ প্রকাশ করিয়া চিঠি দিলাম। তার পর জানিলাম, শ্রীযুক্ত ত্রিবেদী মহাশয় সভাপতিত্ব গ্রহণ করেন নাই—শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহোদয় নিযুক্ত হইয়াছেন—ভাবিলাম, "ধাতোঃ স্থান ইবা দেশঃ"—ঠিক্ হইয়াছে; রামেন্দ্র-হীরেন্দ্র দুই-ই তুল্য। তবে বর্ষীয়ান ত্রিবেদী মহাশয়কে সভাপতি পদে অধিষ্ঠিত দেখিলেই অধিকতর সুখী হইতাম। বাঙ্গালার দুর্ভাগ্য যে, ত্রিবেদী মহাশয় দিন দিনই দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছেন এবং ভবিষ্যতে যে তিনি অন্যত্র কুত্রাপি সভাপতির পদ অলঙ্কৃত করিতে পারিবেন, সে ভরসাও কম। তবে জগদম্বার ইচ্ছায় তিনি একটু সবল ও নিরাময় থাকিলে অবশ্যই আমাদের মনোভিলাষ পূর্ণ হইবে।

শাখা-সভাপতি নিয়োগের সংবাদ মোটেই জানা গেল না। ভাবিলাম, বুঝি এবার শাখা বিভাগ হইবে না—আপদ্ গেল। কিন্তু সম্মিলন অধিবেশনের সপ্তাহকাল পরে শাখা-পতিগণের নাম জানা গেল। যেরূপ ক্ষিপ্রতার সহিত সম্মিলনের অধিবেশন সম্পাদিত হইয়াছে—তাহাতে বোধ হয়, অভ্যর্থনা-সমিতি এতদর্থে লোক নির্ব্বাচনে যথেষ্ট চিন্তা প্রয়োগের অবকাশ পান নাই। অথবা যোগ্যতর স্থলে চেষ্টা করিয়াও সফলকাম হইতে পারেন নাই।

পূর্ব্বেও বলিয়াছি, এখনও বলি, শাখা-বিভাগ তুলিয়া দেওয়াই উচিত। বিজ্ঞান বিষয়ে না হয় একটা থাকিতে হয় থাকুক। দর্শন ও ইতিহাস সাধারণ সাহিত্যেরই অঙ্গীভূত, তজ্জন্য শাখা-বিভাগের প্রয়োজন কি? তবে প্রবন্ধ অনেক হয়, সেগুলির পাঠ ও আলোচনার সৌকর্য্যার্থে বরং একটা ব্যবস্থা এইরূপে করা যাইতে পারে।

প্রথম দিন অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতির বক্তৃতা ও সম্মিলন সভাপতির অভিভাষণ অবসানে সময় থাকিলে দু একটা খুব উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ সর্ব্ব-বিষয়েরই পাঠ হইতে পারে। তার পর বিষয়-নির্ব্বাচন সমিতির অধিবেশনে প্রবন্ধগুলির বাছাই হইয়া অথবা কতিপয় উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ সম্মিলিত সভাস্থলে পাঠের ব্যবস্থা হইতে পারে। অবশিষ্ট গুলির মধ্যে উত্তম কল্পের প্রবন্ধ যদি অধিক থাকে, তবে সম্মিলনকে বিশেষ বিশেষ বিভাগে বিভক্ত করিয়া প্রয়োজন অনুসারে কাব্য, ভাষাতত্ত্ব, অর্থনীতি, ইতিবৃত্ত, ভূগোল, দর্শন এই সকল বিষয়ে ক্ষুদ্র শাখা গঠিত হইতে পারে এবং উপস্থিত সাহিত্যসেবিগণের মধ্য হইতে কার্য্য পরিচালনের জন্য এক একজন সভাপতি নিযুক্ত হইতে পারেন। ইঁহাদের অভিভাষণ লিখিতে হইবে না—প্রবন্ধগুলি পাঠের

আশুতোষ খুবই উপযুক্ত, সন্দেহ নাই। তবে তাঁহার বহুশাখা কাজ, অবসর কম। তাই এই পদে বৃত হইলে বাধ্য হইয়া তাঁহাকে অন্যের হস্তে ক্রীড়নক সাজিতে হইবে। দুঃখের বিষয়, সম্প্রতি কয়েক ব্যক্তি—যাঁহারা খুব বিজ্ঞই বটেন—সাহিত্য পরিষদের বিরুদ্ধে আন্দোলন সৃষ্টি করিয়াছেন। স্যর আশুতোষকে যিনি সভাপতি প্রস্তাব করিয়াছেন, তিনিও যেন ঐ দলভুক্তই বোধ হইল। অতএব একটু ভয়ের কারণও আছে।

তত্ত্বাবধান মাত্র করিতে হইবে। বলা বাহুল্য যে, সম্মিলন-সভাপতি স্বয়ং একটা শাখার তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত হইতে পারেন। বিজ্ঞান শাখা যেরূপ আছে, স্বতন্ত্রই থাকুক—উহার সভাপতিও শাখার সভ্যেরাই পর বর্ষের জন্য নিযুক্ত করিয়া থাকেন—অভ্যর্থনা-সমিতির তজ্জন্য মাথা ঘামাইতে হয় না।

যে প্রবন্ধ বাহুল্যের জন্য শাখার সৃষ্টি হইয়াছে—শাখা সৃষ্টি হওয়াতেও যে আরও বাহুল্য ঘটিতেছে, এটা প্রণিধান-যোগ্য। শাখা-সভাপতিগণও যে বাধ্য হইয়া এক একটা বক্তৃতা করেন—এবং তাহা পাঠ করিতে বহু সময় যায়। যেমন এবার শুনিলাম, সাহিত্য-শাখাপতির বক্তৃতা পাঠে নাকি দুই ঘণ্টাকাল লাগিয়াছিল। ঐ সময়ে ৪।৫ খানি উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ পঠিত হইতে পারিত।

অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতির বক্তৃতাটী অতি সুন্দর হইয়াছে; নাতিহ্রস্ব নাতিদীর্ঘ অথচ ভাবপূর্ণ ও উদ্দীপনাময়। অনুমান করিতে পারি যে, মন্ত্রমুগ্ধবৎ জনমণ্ডলী এই হৃদয়স্পর্শী "স্বাগতম্" শ্রবণ করিয়াছেন। ফলতঃ, সুকবি দেশভক্ত চিত্তরঞ্জন প্রাণ খুলিয়া ভাবের ফোয়ারা ছুটাইয়াছিলেন—সহৃদয় ব্যক্তি মাত্রেই সেই রস পানে তৃপ্ত ও মুগ্ধ না হইয়া পারেন না।

সভাপতি সুধী ও সাধু হীরেন্দ্রনাথ প্রারম্ভে বেশ একটু মিষ্ট সৌজন্য প্রদর্শন করিয়া সম্মিলন বিষয়ে দু একটী অবান্তর কথার উল্লেখ পূর্ব্বক শিক্ষা প্রদান এ দেশে কোন্ ভাষায় কি ভাবে হওয়া উচিত, তদ্বিষয়ে সম্যক্ আলোচনা করিয়াছেন। হীরেন্দ্রনাথ জাতীয় শিক্ষাপরিষদের সম্পাদক, স্বদেশ ও সমাজের অকৃত্রিম হিতৈষী, অগাধ পাণ্ডিত্যের অধিকারী এবং প্রগাঢ় চিন্তাশীল। এতদ্বিষয়ে তাঁহার এই আলোচনা খুব সময়োপযোগীই হইয়াছে। ইউনিভার্সিটি-কমিশন এখন রিপোর্ট লেখায় ব্যস্ত—আমাদের স্যর আশুতোষ প্রকৃতই কমিশনের এক জন "প্রতাপী" সভ্য। হীরেন্দ্রবাবু, এই সময়ে, স্যর আশুতোষ বিগত সম্মিলনে সভাপতিরূপে যাহা বলিয়াছেন, তাহার ভূয়োভূয়ঃ বিশেষ ভাবে উল্লেখ করিয়া খুব ভালই করিয়াছেন। স্যর আশুতোষের সেই বক্তৃতায় প্রকৃতই তাঁহার আন্তরিকতা প্রকাশ পাইয়াছিল—এবং সে কথা বিশেষ ভাবেই আমরা যথাসময়ে যথাস্থানে বলিয়াছি। * এখন আরো একটী কথা—অবান্তর হইলেও বলিব। দ্বাদশ বর্ষাধিক পূর্ব্বে স্বাবলম্বন-যুগে যাহার প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল—হীরেন্দ্রবাবু যাহার সম্পাদক, সেই জাতীয় শিক্ষাপরিষদের অভ্যুদয়ে যখন বিশ্ববিদ্যালয় কম্পিতপ্রায় হইয়াছিল, তখন স্যর আশুতোষ বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ণধার ছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের পাস্ যথাসম্ভব শস্তা করিয়া, ইহার পপুলারিটি বাড়াইয়া, পরিশেষে ঐ শিক্ষাপরিষদের নিমিত্তে যাহা কল্পিত ছিল, সেই পালিতের দান বিশ্ববিদ্যালয়ের খাতে বহাইয়া তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রভূত হিতসাধন করিয়াছেন। কিন্তু তদ্দ্বারা জাতীয় শিক্ষাপরিষদের উন্নতির অন্তরায় ঘটিয়াছে—সন্দেহ নাই, যদিও উহার অনিষ্টসাধন স্যর আশুতোষের সংকল্পের বিষয় না হইতে পারে। আজ জাতীয় শিক্ষাপরিষদের অষ্টাহের অবসানে হীরেন্দ্রনাথ সম্মিলন-সভাপতিরূপে শিক্ষাপরিষদের উদ্দেশ্যানুরূপ ব্যবস্থা বিশ্ববিদ্যালয়েও যাহাতে প্রবর্ত্তিত হয়,

* নব্যভারত ১৩২৩—ফাল্গুন। (বাকীপুর সাহিত্য-সম্মিলন প্রবন্ধ ৬০৭-৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)।

তজ্জন্য, নানারূপ যুক্তি-তর্ক নজীর দেখাইয়া, বিশেষতঃ স্যর আশুতোষেরই বক্তৃতাবিশেষের উল্লেখ পূর্ব্বক মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন। এতদবস্থায় স্যর আশুতোষের কি কর্ত্তব্য, তাহা তাঁহার ন্যায় অসাধারণ ধীশক্তি-সম্পন্ন ব্যক্তিকে বলিয়া দিতে হইবে না। ফলতঃ, এবার কমিশনের রিপোর্টের দিকে আমরা সোৎসুক নেত্রে নিরীক্ষণ করিতেছি—কেন না স্যর আশুতোষের শক্তিমত্তায় আমাদের প্রভূত বিশ্বাস আছে, এবং তিনি যে একটা কিছু করিবেন, তাহাও আমরা পূর্ব্বাবধি বুঝিতে পারিতেছি। এই ঢাকায়ই যখন তিনি জনসাধারণ কর্তৃক অভিনন্দিত হন, তখন নাকি তিনি বলিয়াছিলেন যে, এবার যদি একটা কিছু করিতে না পারেন, তবে আর মুখ দেখাইবেন না। * বাতাস এবার অনুকূল; লর্ড চেমস্‌ফোর্ড, লর্ড রোণাল্‌ড্‌সে, এমন কি, কমিশনেরও অপরাপর বিশিষ্ট সদস্যগণেরও অভিমতি জাতীয় আকাঙ্ক্ষার পক্ষেই দেখা যায়। এ অবস্থায়ও যদি বিশেষ কিছু না হয়, তবে প্রকৃতই স্যর আশুতোষের কলঙ্কের বিষয় হইবে। আমরা ভগবৎ সমীপে প্রার্থনা করি, স্যর আশুতোষের মান রাখা হউক—যেন আমরা ভবিষ্যতে বিশ্ব-বিদ্যালয়ে বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের সম্যক্ প্রবর্ত্তনের নিমিত্ত মুক্ত কণ্ঠে তাঁহাকে ধন্যবাদ প্রদান করিতে পারি।

সপ্তাহকাল মধ্যে হীরেন্দ্র বাবুকে তদীয় অভিভাষণ লিখিয়া ছাপাইয়া আনিতে হইয়াছিল—তাড়াতাড়ি যে তিনি এরূপ সুন্দর বক্তৃতা লিপিবদ্ধ করিতে পারিয়াছেন, তাহাতেই তাঁহার অসাধারণ কৃতিত্ব প্রকটিত হইয়াছে। তবে মধ্যে মধ্যে দু একটা ছিদ্রও দেখা গেল—ইহা তাড়াতাড়িরই ফল। নাট্য কবির মধ্যে 'অমৃতলালে'র অনুল্লেখ এবং ইতিহাস-রচয়িতাদের মধ্যে দীনেশচন্দ্রের উল্লেখ * অসমীচীন হইয়াছে। এইরূপে ব্যক্তিবিশেষের নাম উল্লেখ না করাই ভাল—কেন না, অনুল্লিখিত ব্যক্তিগণের পক্ষপাতীরা চটিতে পারেন। নামেও দু এক যায়গায় গোলযোগ আছে—'ভূদেব' স্থলে "ভূদেবচন্দ্র" দ্বিজেন্দ্রনাথ (ঠাকুর) স্থলে 'দ্বিজেন্দ্রলাল' লেখাও ঠিক্ হয় নাই।

এবার অভিভাষণে নজির দেখাইতে গিয়া এটর্ণি সভাপতি মহাশয় বহু 'কোটেশন' করিয়াছেন—ইহার মধ্যে ইংরেজী'ই অধিক। অবস্থা বিবেচনায় ইহা মার্জ্জনীয় হইতে পারে। কিন্তু মধ্যে মধ্যে ইংরেজী শব্দগুলি যে ইংরেজী অক্ষরে লেখা হইয়াছে, এটার প্রতিবাদ না করিয়া পারি না। আমরা ভাষায় বহু ইংরেজী শব্দ আনিয়াছি—আগে আরবী পারসীও লইয়াছি, ক্ষতি নাই। কিন্তু যখন গ্রহণ করিলাম, তখন ইহা হজম করাই উচিত; তাই 'cram' না লিখিয়া 'ক্রেম' লিখাই উচিত ছিল। নামেও Father Lafont' ও "Vincent Smith" ইংরেজী পোষাকে দেখা দিবেন কেন, চেমস্‌ফোর্ড বা রোণাল্‌ডলের মত বঙ্গীয় পরিচ্ছদেই আবির্ভূত হওয়া উচিত।

* "বাঙ্গালী" পত্রে এইরূপ দেখিয়াছিলাম বলিয়া স্মরণ হয়। যদি আমার ভ্রম হইয়া থাকে, কেহ দয়া করিয়া সংশোধন করিলে বাধিত হইব।

* "বঙ্গভাষা ও সাহিত্য" গ্রন্থ কাব্য সমালোচনা, ইহা "হিস্‌টরি অব্ লিটারেচার" হইতে পারে, কিন্তু এরূপ গ্রন্থ ইতিহাসের পর্য্যায়ভুক্ত হয় না। দীনেশ-চন্দ্রের পরিবর্ত্তে এস্থলে 'নিখিলনাথ' বা 'রাখালচন্দ্রে'র উল্লেখ শোভন হইত। সমালোচকের শ্রেণীতেই দীনেশবাবু উল্লেখযোগ্য।

এই লেখকপ্রবরকে আহ্বান করিয়াছে? এতটুকু উদারতা, এতটুকু সংযম ও শালীনতার জ্ঞান যাঁহার নাই, একটী প্রধান মাসিক পত্রে লেখনী-কণ্ডূয়ণ নিবারণ করিতে কে তাঁহাকে পরামর্শ দিল?

রোহিণী বাবু আগাগোড়া সাহিত্য-সমাজের প্রতি সঙ্গীন উঁচাইয়া আছেন, ইহাতে সাহিত্য সমাজ অবশ্য ভীত হইয়া দরজা বন্ধ করিবে না। কিন্তু লেখকের অসংযম দেখিয়া আমরা অবাক হইয়াছি। বিরাট মিথ্যাগুলিকে এমন করিয়া সাজাইয়া যে একটী মাসিক পত্রের প্রবন্ধ খাড়া হইতে পারে, ইহা আমাদের কল্পনার অতীত ছিল। রোহিণী বাবু এ সকল মিথ্যা ও অতিরঞ্জিত বিষয়গুলি কোন্ কোন্ মহাপুরুষের নিকট হইতে জানিতে পারিয়াছেন, তাহার একটু সন্ধান পাইলে, তাঁহার কথিত "দশবিশজনের" সম্বন্ধে ঢাকার সাহিত্যিকগণ একটু সতর্ক হইতে পারিতেন।

রোহিণী বাবু লিখিয়াছেন, "সাহিত্য পরিষদের পক্ষ হইতে সাহিত্য-সম্মিলনকে ঢাকায় আহ্বান করা হয়, এই অজুহাতে সাহিত্য-সমাজ এই সম্মিলন পণ্ড করিতে যত্নবান হইয়া উঠেন"। ইহা সর্ব্বৈব মিথ্যা। খবরের কাগজে এই পুরাণো কাসুন্দী অনেক ঘাঁটা হইয়া গিয়াছে, সুতরাং আবার তাহার পুনরালোচনা সম্পূর্ণ নিষ্প্রয়োজন।

রোহিণী বাবু আবার লিখিয়াছেন "সাহিত্য-সম্মিলনটা কেবল পরিষদের হাতে নির্ব্বাহ হয়, এই আকাঙ্ক্ষা তাঁহার (মিঃ সি, আর, দাসের) ছিল না। তিনি সকলের মিলনের ক্ষেত্রকে সঙ্কুচিত করিতে ইচ্ছুক ছিলেন না। তাই অপর পক্ষ একটু খাড়া হইয়া ভাবিলেন, "সম্মিলন হইতে দিব না।" ইহা সত্য নহে। এ সম্বন্ধে প্রকৃত ঘটনা এই:—মিঃ দাস বাঁকীপুরে সাহিত্য-সম্মিলন ঢাকায় আহ্বান করিলে পর খবরের কাগজে ছাপা হয় যে, তিনি সাহিত্য-পরিষদের পক্ষ হইতে উহা আহ্বান করিয়াছেন। ঢাকার জনসাধারণ এ সংবাদের জন্য কিছুমাত্র প্রস্তুত ছিল না, কারণ মিঃ দাস এ সম্বন্ধে কাহারও মতামত গ্রহণ করেন নাই। যাহা হউক, সকলেই ভাবিল, মিঃ দাস সম্মিলন আহ্বানের কথা ঢাকার সাহিত্য সভা দুইটীর কর্ত্তৃপক্ষ-গণকে এবং পত্রিকা সম্পাদকগণকে জানাইয়া সকলকে আয়োজনে তৎপর হইতে অনুরোধ করিবেন। কিন্তু, কেন জানি না, মিঃ দাস সেরূপ কিছু করিলেন না। পর পর তিনি তিনবার ঢাকায় আসিলেন, কিন্তু অনুরোধ সত্ত্বেও সম্মিলন সম্বন্ধে পরামর্শ করিতে কাহাকেও ডাকিলেন না। কেহ কেহ বলিল—টাকা দিবেন তিনি, অন্য কেহ আসুক আর নাই আসুক, তাহাতে ক্ষতিবৃদ্ধি হইবে না। কেহ বা বলিল, সাহিত্য-পরিষদ একাই সব করিবে। কিন্তু যখন ইষ্টারের ছুটির পনর দিন পূর্ব্বেও কেহ কোনও কাজে হাত দিল না, তখন কয়েকজন ভদ্রলোক বাড়ীতে বাড়ীতে ঘুরিয়া সকলকে সম্মিলনের কথা স্মরণ করাইয়া দিতে লাগিলেন। পরিষদের কর্ত্তৃপক্ষ মিঃ দাসের নিকট টেলিগ্রাম করিয়া করিয়া শ্রান্ত হইয়া পড়িলেন, কিন্তু তাঁহার কোনরূপ আদেশ বা উপদেশ পাইলেন না। সাহিত্য-সমাজ তো বুঝিতেই পারিল না, এ ব্যাপারে তাহার কোনও অধিকার আছে কি না। যাহা হউক, পরিশেষে 'সমাজের' সম্পাদক অক্লান্তকর্ম্মী, উদারচিত্ত অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ভদ্র এম-এ, এবং পরিষদ-সম্পাদক

উপেন্দ্রচন্দ্র গুহ এম্-এ, বি-এল, ব্যারিষ্টার মিঃ আর, কে, দাস, ঢাকা ল-কলেজের সহকারী অধ্যক্ষ, ডাঃ শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত, এম-এ, ডি-এল্, শ্রীযুক্ত রসিকচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, বি-এল্, শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী, বি-এল্, রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত সারদাপ্রসাদ সেন (ভূতপূর্ব্ব ডিঃ জজ), কবিরাজ শ্রীযুক্ত অনুকূলচন্দ্র শাস্ত্রী, খান বাহাদুর মৌলবী সৈয়দ আউলাদ হোসেন, রায় বাহাদুর অধ্যাপক মিঃ বি, এন্, দাস, এম্-এ, বি-এস্-সি (লণ্ডন), রায়সাহেব অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ গোস্বামী এম্-এ, 'ঢাকা-প্রকাশ'-সম্পাদক শ্রীযুক্ত মুকুন্দবিহারী চক্রবর্ত্তী বি-এ প্রভৃতি মহোদয়গণের সমবেত চেষ্টায় ও পরিশ্রমে ঢাকাতে সম্মিলনের অধিবেশন হওয়া সম্ভবপর হইয়াছিল। এ সম্বন্ধে অন্যান্য অপ্রীতিকর প্রসঙ্গের অবতারণা করা সম্পূর্ণ নিষ্প্রয়োজন বলিয়া মনে করি, নতুবা রোহিণী বাবুর অন্যান্য মন্তব্যগুলিও একটু নাড়াচাড়া করিতাম।

রোহিণীবাবুর আরো দু' একটা কথার মাত্র ভুল দেখাইয়াই নিরস্ত থাকিব। তিনি লিখিয়াছেন যে, অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি পদে "ভোটে মিঃ দাসই নির্ব্বাচিত হইলেন।" প্রকৃত প্রস্তাবে ভোট আদৌ লওয়া হয় নাই। মীমাংসার পর মিঃ দাসের বিরুদ্ধে যাঁহারা দাঁড়াইয়াছিলেন, তাঁহারা আর আপত্তি করেন নাই। পরিষদ সম্পাদক উপেন্দ্রবাবু মীমাংসার জন্ম সরিয়া দাঁড়ান নাই সভাস্থ গণ্যমান্য ভদ্রলোকগণের গৃহীত প্রস্তাব অনুসারে সমাজ-সম্পাদক সত্যেন্দ্রবাবু অভ্যর্থনা-সমিতির সম্পাদক নির্ব্বাচিত হন। উপেন্দ্রবাবু কার্য্যনির্ব্বাহক-সভার ও প্রবন্ধ-নির্ব্বাচন-সমিতির সভ্য ছিলেন।

অতঃপর রোহিণীবাবু 'বিক্রমপুরের ইতিহাস'-প্রণেতা, 'বিক্রমপুর'-সম্পাদক, সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ও সাহিত্যসেবী শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয়কে যেরূপ অসংযত ভাষায় আক্রমণ করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিলে স্তম্ভিত হইতে হয়। রোহিণীবাবু লিখিয়াছেন, "যাহার নিজ হাতে দুইখানা পৃষ্ঠা লেখা কষ্টসাধ্য, যাহার বিদ্যাবত্তা ও জ্ঞান একান্তই সঙ্কীর্ণ গণ্ডীতে আবদ্ধ; সেই ব্যক্তি হইলেন প্রবন্ধ-নির্ব্বাচনের সম্পাদক।"—যোগেন্দ্রবাবু রোহিণীবাবুর এই কথাগুলি নিশ্চয়ই সুবুদ্ধির মত হাসিয়া উড়াইয়া দিয়াছেন — কিন্তু জানিতে ইচ্ছা হয়, যোগেন্দ্রবাবুর সম্বন্ধে এমন মত যিনি অবলীলাক্রমে প্রকাশ করিলেন, "নব্যভারতে"র প্রবন্ধ ব্যতীত তাঁহার অমৃতময়ী লেখনী বিনিঃসৃত আর কোনও মহামূল্য রচনা পাঠক-সাধারণের দৃষ্টিগোচর হইয়াছে কি না।

কি কুক্ষণেই যোগেন্দ্রবাবু "বিক্রমপুরের" সম্পাদকতা আরম্ভ করিয়াছিলেন এবং সম্মিলনের প্রবন্ধ-নির্ব্বাচন-সমিতির সম্পাদক-পদ গ্রহণ করিয়াছিলেন! প্রবন্ধ বাতিল হইলে যে অনেকেই অগ্নিশর্ম্মা হইয়া উঠেন, একথা তাঁহার মনে রাখা উচিত ছিল।

যাহা হউক, একথা বোধ হয় একমাত্র রোহিণীবাবু ছাড়া আর সকলেই জানেন যে, সম্মিলনের কোনও শাখা-সমিতির সম্পাদক নিজে কিছুই কর্ত্তৃত্ব করিতে পারেন না—তিনি কর্ম্মচারী মাত্র। সমিতির সভ্যবৃন্দের মধ্যে তিনিও একজন, তাঁহার অতিরিক্ত কোনও ক্ষমতা থাকে না। সমিতির অধিবেশনে যে সকল নির্দ্ধারণ হয়, তাহাই তিনি কার্য্যে পরিণত করেন মাত্র। সুতরাং সম্পাদকের যথেষ্ট অবসর দরকার, কারণ

তাঁহাকে যথেষ্ট খাটিতে হয়। এই সকল কারণে কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতি যোগেন্দ্রবাবুকে মনোনীত করিয়াছিলেন। তাঁহার যোগ্যতা সম্বন্ধে কাহারও মতভেদ ছিল না। সমিতিতে যে সকল সভ্য ছিলেন, জ্ঞানগরিমার জন্য তাঁহারা সর্ব্বত্র সুপরিচিত। বিশেষজ্ঞের নিকট ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ের প্রবন্ধাদি সমিতির অধিবেশনে বিচারের জন্য প্রদত্ত এবং তাঁহাদের মতামত খাতায় লিপিবদ্ধ হইত। সে খাতাখানি এখনও আছে। রোহিণীবাবু যদি কৃপাপূর্ব্বক একবার ঢাকানগরীতে শুভাগমনপূর্ব্বক আমাদিগকে কৃতার্থ করেন, তবে তিনি একবার সে খাতাখানি দেখিয়া চক্ষু কর্ণের বিবাদভঞ্জন করিতে পারিবেন। প্রবন্ধ-নির্ব্বাচন-সমিতির সভ্যগণের প্রায় সকলেই নিয়মিতরূপে উপস্থিত হইয়া প্রবন্ধাদি বিচার করিতেন। সুতরাং যাঁহারা আত্মমর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ হইবার ভয়ে প্রবন্ধ প্রদান করেন নাই (এমন কেহ ছিলেন বলিয়া জানি না) তাঁহারা সহানুভূতির পাত্র।

এ অধমের উপরও রোহিণীবাবু একটু কৃপাকটাক্ষ করিয়াছেন। যোগেন্দ্রবাবু আমাকে তাঁহার সহযোগী করিয়া লন নাই। কার্য্যনির্ব্বাহক সভার অধিবেশনে আমার নাম প্রবন্ধ-নির্ব্বাচন সমিতির অন্যতম সভ্যরূপে প্রস্তাবিত হইলে আমি এই মনে করিয়া আপত্তি করি নাই যে, অন্ততঃ কেরাণীর কাজের জন্যও আমার সাহায্য দরকার হইবে। বস্তুতঃ তাহাই হইয়াছিল। কোনও প্রবন্ধ নির্ব্বাচন আমি করিব, এমন ধৃষ্টতা আমার ছিল না। রোহিণীবাবু যদি দয়া করিয়া একটু পূর্ব্বে জানাইতেন যে, কেরাণীর পক্ষে সুদীর্ঘ শ্মশ্রুগুম্ফ অপরিহার্য্য, তবে খাল কাটিয়া ঘরে কুমীর আনিতাম না।

কামিনীবাবু, নরেশবাবু বা উমেশবাবুর হাতে প্রবন্ধ দেওয়ায় যোগেন্দ্রবাবু উহা বাতিল করিয়াছেন, এমন মিথ্যা কথাটা রোহিণীবাবু কাহার নিকট শুনিলেন? রোহিণীবাবুর প্রবন্ধ পাঠে জানিলাম, শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য আত্মসম্মানের লাঘব হইবে, এই ভয়ে তাঁহার প্রবন্ধ যোগেন্দ্রবাবুকে দেন নাই। হায় যোগেন্দ্রনাথ! পূর্ণবাবুর আত্মসম্মানবোধ হঠাৎ এত তীক্ষ্ণ হইবার কোনও গূঢ় কারণ ছিল কি? কুমিল্লার শ্রীযুক্ত বরদারঞ্জন চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের প্রবন্ধের কথা আমার মনে নাই, কিন্তু কবি শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য রোহিণীবাবুর কথায় নিশ্চয়ই সায় দিবেন না।

সভামঞ্চের উপর ঢাকার লোক কেন বসিয়াছিলেন, এজন্য রোহিণীবাবু চাঞ্চল্য প্রকাশ করিয়াছেন। সভাস্থলে স্থানীয় ও বিদেশাগত যে সকল পদস্থ লোক উপস্থিত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের প্রায় সকলেই সভামঞ্চের উপর স্থান পাইয়াছিলেন। মনোনীত প্রবন্ধাদির তালিকাসহ ও অন্যান্য কার্য্যব্যপদেশে কোন কোন কর্ম্মচারীকে সভামঞ্চের উপর থাকিয়া সভাপতিগণকে সাহায্য করিতে হইয়াছিল। ইহাতে যে কি অশোভনত্ব ঘটিয়াছে, তাহা একমাত্র রোহিণীবাবুই জানেন।

যোগেন্দ্রবাবুর উপর রোহিণীবাবুর যে এত রাগ কেন, তাহা একটু পরিষ্কার করিয়া বলিলে ব্যাপারটা সহজে বুঝা যাইত। যোগেন্দ্রবাবু যে কবিতা পাঠ করিয়াছিলেন, উহা বহুপূর্ব্বে প্রবন্ধ-সমিতির নিকট যথানিয়মে উপস্থাপিত ও তৎকর্ত্তৃক মনোনীত হইয়াছিল, এ খবরটা না জানিয়া অতটা উষ্মা প্রকাশ করা কি খুব শোভন হইয়াছে?

অতঃপর রোহিণীবাবু কবি গোবিন্দচন্দ্র দাস মহাশয়কে লইয়া পড়িয়াছেন। গোবিন্দ বাবু আমাদের ঘরের লোক, রোহিণীবাবু ভিন্ন জেলাবাসী, সুতরাং গোবিন্দচন্দ্রের মান অপমান সম্বন্ধে আমাদের সতর্কতা রোহিণী বাবুর অপেক্ষা অনেক বেশী। "গোবিন্দ-চন্দ্রের মর্য্যাদা অনুভব করিবার মত লোকও ঢাকায় নাই", রোহিণীবাবুর এই "বিরাট দুঃখ" প্রকাশে একটা বিরাট অনধিকার-চর্চ্চার পরিচয় পাইয়া আমরাও "বিরাট দুঃখ" অনুভব করিতেছি। রোহিণীবাবু বোধ হয় জানেন না যে, বিশিষ্ট ভদ্রলোকদের জন্য যে কয়েকখানা পৃথক নিমন্ত্রণ-পত্র ছাপা হইয়াছিল, তদ্দ্বারাই কবি গোবিন্দ নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। তাঁহাকে আনিবার জন্য সম্মিলনের অধিবেশনের অব্যবহিত পূর্ব্বে তাঁহার গৃহে গাড়ীও প্রেরিত হইয়াছিল, কিন্তু তাঁহাকে পাওয়া যায় নাই। পারিবারিক নানারূপ দুর্ঘটনায় কবি এত বিব্রত ছিলেন যে, কবিতা-লেখা যে তাঁহার পক্ষে তখন সম্ভবপর ছিল না, একথা দু' তিন দিন পূর্ব্বে তিনি আমাকে বলিয়াছিলেন।

তৎপরে আমাদের বন্ধু চিত্রশিল্পী সারদা-চরণ উকীলের কথা। তাঁহার সম্বন্ধে কে কি বলিয়াছে, আমরা জানি না, রোহিণীবাবু এত যত্ন করিয়া যে এ সব খবর কেমন করিয়া সংগ্রহ করিলেন, তাহাও বিস্ময়জনক। সারদাচরণকে রোহিণীবাবু অপেক্ষা আমরা অনেক বেশী জানি, সুতরাং "সারদাবাবু প্রতীকারপ্রার্থী হইবেন" রোহিণীবাবুর একথা পড়িয়া সারদাবাবু তো হাসিবেনই, আমরাও হাস্যসম্বরণ করিতে পারিতেছি না।

উত্তোর গাহিয়া আর প্রবন্ধ দীর্ঘ করিব না। রোহিণীবাবুর প্রবন্ধে আর কিছু না থাকিলেও ইংরেজী তর্কশাস্ত্রের Argumentum ad hominem এর যথেষ্ট দৃষ্টান্ত আছে। এ যেন গালি দিতে হইবে বলিয়াই গালি দেওয়া। কিন্তু ইহাতে নিজেকে লোকের কাছে খাটো হইয়া পড়িতে হয় এবং পুরস্কার জোটে, নিন্দা ও উপহাস! আশা করি, একথা স্মরণ করিয়া রোহিণীবাবু অপরিচিতকে ক্ষমা করিবেন।

শ্রীপরিমলকুমার ঘোষ, এম্‌-এ।

প্রতিবাদ

গত বৈশাখ সংখ্যা নব্যভারতে প্রকাশিত "ঢাকার সাহিত্য-সম্মিলন" শীর্ষক প্রবন্ধটী সম্বন্ধে আমাদের কিঞ্চিৎ বক্তব্য আছে। নব্যভারত-সম্পাদক নিরপেক্ষ, তিনি সকল প্রকার মতের আলোচনার সুযোগ দিয়া থাকেন, এজন্য আমাদের প্রতিবাদও পত্রস্থ হইবে ভরসায়, আমাদের বক্তব্য সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

(১) অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতিরূপে শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাস মহাশয়ের নির্ব্বাচন সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ভদ্র-মহাশয়-প্রমুখ ব্যক্তিগণের আপত্তি সঙ্গত, কি অসঙ্গত হইয়াছিল, তাহা রোহিণীবাবুর কতিপয় মন্তব্য পাঠ করিলেই বুঝা যায়। "মিঃ সি, আর, দাস এই দিনই (অর্থাৎ সভার প্রথম দিন দ্বিপ্রহরান্তে কলিকাতা মেলে) আসিলেন।" তাঁহার অভিভাষণে "সার্ব্বজনিকতা ছিল না। তিনি পদ্মাপারের যাত্রীকেই বরণ করিলেন,

আর যাহারা সারা পুল হইয়া আসিয়াছেন,—ময়মনসিংহ, কুমিল্লা হইতে আসিয়াছেন, তাঁহাদিগকে কিছু কহিলেন না।" "সর্ব্বত্রই দেখিতে পাই, অভ্যর্থনার সভাপতি * * প্রতিনিধিগণের বাসায় গিয়া শিষ্টাচার প্রদর্শন করিয়া থাকেন, * * কিন্তু মিঃ সি, আর, দাসকে দেখিবার সৌভাগ্য আমাদের হয় নাই।" লেখকের তালিকা দীর্ঘ, কিন্তু অসম্পূর্ণ। সভার প্রথম দিন মিঃ দাস নির্দ্দিষ্ট সময়ের প্রায় অর্দ্ধঘণ্টা পরে সভাস্থলে উপস্থিত হইয়াছিলেন, ইহাতে সমাগত বিপুল জনমণ্ডলী ক্ষুব্ধ হইয়া উঠে। ইতিহাস ও বিজ্ঞান বিভাগের অধিবেশনের সময় মিঃ দাস উপস্থিত হইবার অবসর প্রাপ্ত হন নাই। একদিন তাঁহাকে প্রতিনিধিদের বাসগৃহে আহারার্থ নিমন্ত্রণ করা হইয়াছিল, কিন্তু তিনি উপস্থিত হন নাই। মিঃ দাস বাঙ্গালার প্রাণ খুঁজিয়া বেড়াইতেছেন, এরূপ তাঁহার অভিভাষণ পাঠে জানিতে পারা যায়। যদি তিনি আপন পদগর্ব্ব পরিহার করিয়া মফস্বল হইতে আগত দরিদ্র সাহিত্যিকদের সঙ্গে মিশিতে পারিতেন, তবে এখনও বাঙ্গালার প্রাণের ভগ্নাবশেষ দেখিতে পাইতেন।

(২) রোহিণীবাবু লিখিয়াছেন, "পরিষদের সম্পাদক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র গুহ এম-এ, বি-এল সরিয়া দাঁড়াইলেন, শুধু মীমাংসার জন্য। উপেন্দ্রবাবুর এই ত্যাগস্বীকার ধন্যবাদের বহু ঊর্দ্ধে স্থাপিত।" কিন্তু কেহ কেহ এমনও বলিয়াছেন যে, কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতিতে তিনি আপন দল প্রবল করিতে অসমর্থ হইয়াই সরিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, উপেন্দ্রবাবুই মিঃ দাসের নাম সভাপতিরূপে প্রস্তাব করিয়াই প্রথমে বিবাদের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। মিঃ দাস স্থানীয় লোক নহেন, তাঁহার পূর্ব্বপুরুষ ঢাকা জেলার অধিবাসী ছিলেন; ঢাকার সহিত তাঁহার এইমাত্র সম্পর্ক। ঢাকায় যোগ্য ব্যক্তিরও অভাব নাই। মিঃ দাস পরিষদের সভাপতি; কিন্তু কেবল পরিষদের পক্ষ হইতে নহে, সমস্ত ঢাকার পক্ষ হইতে সাহিত্য-সম্মিলন নিমন্ত্রিত হইয়াছিল। এরূপ অবস্থায় ঢাকার বিরুদ্ধবাদী দুই দলের মিলিত হইয়া কাজের জন্য কোন নিরপেক্ষ যোগ্য লোকের নির্ব্বাচনই প্রার্থনীয় ছিল।

(৩) প্রবন্ধ নির্ব্বাচন সমিতিতে ডাঃ নরেশচন্দ্র সেন, বাবু উমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এবং বাবু কামিনীকুমার সেন সদস্য এবং বাবু যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত সম্পাদক ও বাবু পরিমলকুমার ঘোষ সহকারী সম্পাদক ছিলেন। এজন্য রোহিণীবাবু তীব্র ভাষায় যোগেন্দ্রবাবু ও পরিমলবাবুকে আক্রমণ করিয়াছেন। বিক্রমপুরের ইতিহাস-প্রণেতা যোগেন্দ্রবাবু এবং ঢাকা কলেজের অধ্যাপক পরিমলবাবু কি অযোগ্য? যোগ্যতার পরিমাপ কি? প্রবন্ধ-নির্ব্বাচন-সমিতির সদস্যত্রয় তাঁহাদের নির্ব্বাচনে আপত্তি করেন নাই, তাঁহাদের সহিত একযোগে কার্য্য করিয়াছিলেন। রোহিণীবাবু প্রবন্ধ-নির্ব্বাচন সমিতির সদস্য তিন জনকে দিক্‌পালরূপে বর্ণনা করিয়াছেন। সমিতিতে তাঁহাদের majority ছিল, তাঁহারা সুধী ও কর্ত্তব্যপরায়ণ বলিয়াও খ্যাত। এরূপ অবস্থায় তাঁহারা কর্ত্তব্য কার্য্যে অবহেলা করিয়াছিলেন, এবং প্রবন্ধ নির্ব্বাচন সুষ্ঠুমত হয় নাই, এরূপ সিদ্ধান্ত করিবার কোন কারণ নাই। রোহিণীবাবু আরো দুইবার যোগেন্দ্রবাবুকে তীব্র ভাবে আক্রমণ করিয়াছেন। তাঁহার অপরাধ এই যে,

তিনি সভায় একটী স্বরচিত ক্ষুদ্র কবিতা পাঠ করিয়াছিলেন। তাঁহার দ্বিতীয় অপরাধ, ইহা অপেক্ষাও গুরুতর। ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় উপস্থিত হইতে না পারায় তদীয় রচিত "চিতোর অবরোধ" নামক সুন্দর প্রবন্ধটী যোগেন্দ্রবাবু কর্ত্তৃক পঠিত হইয়াছিল। উপর্য্যুপরি এইরূপ তীব্র আক্রমণ দেখিয়া আমাদের সন্দেহ হয় যে, রোহিণীবাবু অথবা তাঁহার কোন অন্তরঙ্গ বন্ধুর প্রবন্ধ পাঠার্থ মনোনীত হয় নাই।

(৪) রোহিণীবাবু একস্থানে শাখা সভার সভাপতিদিগকে শাখাবিহারী বিশেষণ দিয়াছেন। সম্মিলনের সম্পাদক ভদ্র ছিলেন বলিয়াই কি রোহিণীবাবু মিঃ ডি, এন, মল্লিক-প্রমুখ ব্যক্তিগণের প্রতি এইরূপ ভাষা প্রয়োগ করিয়া প্রতিশোধ লইয়াছেন ?

(৫) সম্মিলনের সভামঞ্চে সভাপতিগণ, অভ্যর্থনা সভার সভাপতি এবং কলিকাতার প্রতিনিধিগণের সহিত ঢাকার প্রধান অপ্রধানগণ আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন, সেজন্য লেখক মহোদয় তীব্র মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন। বাঙ্গালা সাহিত্য সম্মিলন প্রভৃতি যাবতীয় সভা সমিতির কার্য্য কংগ্রেসের অনুকরণে ব্যবস্থিত হইয়া থাকে। যদি লেখক মহাশয় কখনও কংগ্রেসের মণ্ডপে উপস্থিত হইয়া থাকেন, তবে তিনি অবশ্যই দেখিয়াছেন যে, অভ্যর্থনা-সমিতির সদস্যগণ এবং বিশিষ্ট প্রতিনিধিগণ সভা মঞ্চে আসন গ্রহণ করেন। ঢাকাতেও সেইরূপ ব্যবস্থা হইয়াছিল। অন্য স্থানের কথা আমরা অবগত নহি। কিন্তু ময়মনসিংহের অধিবেশনে আমরা স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিদিগকে সভামঞ্চে উপবিষ্ট দেখিয়াছি।

(৬) রোহিণীবাবু প্রাগুক্ত ঘটনা ব্যতীত ঢাকাবাসীর অসভ্যতা বা অভদ্রতার আর একটী দৃষ্টান্ত দিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন, এক সম্পাদক ব্যতীত অন্যান্য ঢাকাই ভদ্রলোক শিষ্টাচার প্রদর্শন জন্য প্রতিনিধিদের বাসায় উপস্থিত হন নাই। আমাদের বোধ হয় যে, রোহিণীবাবু ঢাকার দলাদলির তত্ত্ব সংগ্রহ জন্য বাসা হইতে অনেক সময় অনুপস্থিত ছিলেন, অথবা "গুপ্তরাজ" যোগেন্দ্রবাবুর প্রবন্ধ নির্ব্বাচন সম্বন্ধীয় স্বেচ্ছাচারের বিষয় ধ্যান করিবার জন্য চক্ষু মুদ্রিত করিয়া থাকিতেন, এজন্যই তিনি প্রতিনিধিগণের বাসায় সমাগত ডাঃ নরেশচন্দ্র সেন, অধ্যাপক বি, এন, দাস, রায়বাহাদুর অক্ষয়ভূষণ গঙ্গোপাধ্যায়, উকীল বাবু রসিকচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, উকীল বাবু শরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী, অধ্যাপক অক্ষয়কুমার দত্তগুপ্ত, কবিরাজ অর্জ্জুন শাস্ত্রী, বাবু ভূপালকুমার দত্ত এবং প্রতিভা-সম্পাদক উমেশ বাবুর সহিত তাঁহার দেখা হয় নাই।

(৭) রোহিণীবাবু লিখিয়াছেন, সাহিত্যের অধিবেশনে "বহু ভাল প্রবন্ধ—ঢাকাবাসীর লেখা নয় বলিয়াই বোধ করি—পিছনের দিকে পড়িল, এবং কতকগুলি অকর্ম্মা কবিতা প্রথম দিকে পড়িল।" রোহিণী বাবুর স্মৃতি ভ্রম প্রশংসনীয় নহে। সভাপতির অভিভাষণ পাঠ শেষ হইলে কোচবিহারের একজন প্রতিনিধি (ইনি কোচবিহারেরই অধিবাসী, ঢাকার সহিত সম্পর্কশূন্য) একটী কবিতা পাঠ করেন, তার পর শ্রীমতী সরলা দেবী প্রবন্ধ পাঠ করেন। অতঃপর একজন মোসলমান ভদ্রলোক বাঙ্গালা সাহিত্য সম্বন্ধে মোসলমানদের কর্ত্তব্য বিষয়ে একটী সারগর্ভ এবং যুক্তিপূর্ণ প্রবন্ধ পাঠ করেন। তারপর কলিকাতা হইতে

আগত গিরিজাবাবুর "গোবিন্দদাস" নামক প্রবন্ধ পাঠ আরম্ভ হয়। যোগেন্দ্রবাবুর বান্ধব, অবনী বাবুর "কালীপ্রসন্ন" সম্বন্ধীয় প্রবন্ধটী শেষের দিকে পড়িয়াছিল এবং তিনি সময়াভাবে প্রথম অংশটুকুর বেশী পাঠ করিতে পারেন নাই। অতঃপর কতকগুলি কবিতা পঠিত হয়। কবিতা পাঠের সময় যদি কোন প্রবন্ধ-লেখক তাঁহার প্রবন্ধ পাঠ করিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিয়া থাকেন, তবে সময়াভাবই তাহার কারণ ছিল, তাহাতে যোগেন্দ্রবাবুকে আক্রমণ করা যাইতে পারে, এরূপ কিছু নাই। কবিতাগুলির পাঠ শেষ হইলেই সাধারণ সভার অধিবেশন আরম্ভ হয়।

আমাদের বক্তব্য শেষ করিলাম। আমরা স্বীকার করি যে, রোহিণীবাবু অনেক সত্য কথাও লিখিয়াছেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ ঢাকার সাহিত্য-সম্মিলনে কবি গোবিন্দ দাসের নিমন্ত্রণ না হওয়াতে তিনি যে দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার উল্লেখ করিতেছি। সম্মিলনের কর্তৃপক্ষ গোবিন্দ দাসকে নিমন্ত্রণ না করিয়া নিন্দিত কার্য্য করিয়াছেন। ভরসা করি, তাঁহারা তজ্জন্য অনুতপ্ত হইয়াছেন।

শ্রীসত্যচরণ মুনশী।

ঢাকার সাহিত্য-সম্মিলনের আরও কি!

আমি ইতিমধ্যে ঢাকায় গিয়াছিলাম। 'নব্যভারতে' ঢাকার সাহিত্য-সম্মিলনের প্রকৃত তথ্য বাহির হওয়ায়, তত্রত্য একদল বড় উষ্ণ হইয়া উঠিয়াছেন। লেখক ও নব্য-ভারত-সম্পাদক উভয়েই ইঁহাদের নিকট দোষী বলিয়া তীব্র সমালোচনার পাত্র হইতেছেন। আরও শুনিয়া বিস্মিত হইলাম যে, ইঁহারা নানা জনকে ঐ প্রবন্ধের লেখক মনে করিয়া সাক্ষাতে ও পরোক্ষে আক্রমণ করিতেছেন। কেহ বলেন—লেখক 'সাহিত্য-পরিষদের পক্ষের লোক', কেহ বলেন অমুক, কেহ কেহ দুই চারিটী নামও নির্দ্দেশ করিয়া আপন উর্ব্বর মস্তিষ্কের পরিচয় দিতেছেন। অথচ আমি গোটা একটা মানুষ সশরীরে বর্ত্তমান রহিয়াও তাঁহাদের উপেক্ষা বা সহানুভূতির একান্ত ভাজন হইয়া পড়িতেছি। এই শ্রেণীর কল্পনাপ্রিয় ব্যক্তিবর্গকে ধন্যবাদ দেওয়া আমার কর্ত্তব্য।

ঢাকা সাহিত্য-সম্মিলন সম্বন্ধে আরও কিছু বলা আবশ্যক দেখিতেছি। এখানে একটা কথা উক্ত মহাত্মাগণকে আগেই বলিয়া রাখি, ঢাকায় উচ্চশিক্ষিত দুই দশ জনের সঙ্গে আলাপ করিলেই সম্মিলনের অনেক সংবাদ পাওয়া যায়। আরও একটা কথা এই যে, সম্মিলনের পূর্ব্বে কর্তৃপক্ষের বীররসসঞ্চারী যে কয়েকটী সভা হইয়াছিল—তাহার মধ্যে দুই তিনটী সভায় আমি সশরীরে উপস্থিতও ছিলাম। সুতরাং কেবল পরের মুখে ঝাল খাওয়ার অপরাধ আমাকে স্পর্শ করে নাই। আর আমার লিখিত বিষয়-গুলির মধ্যে কোনও অংশে অসত্যের চিহ্ন থাকিলে, কেহ দেখাইয়া দিবেন। বড় বাধিত হইব। আমি আমার উক্তির সত্যতার জন্য ঢাকার বহু নিরপেক্ষ উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তিগণকে সাক্ষ্যরূপে উপস্থিত করিতে পারিব।

(১) ঢাকার সম্মিলন উপলক্ষে কলিকাতা 'সাহিত্য পরিষদের' সমুদয় সভ্যকে নিমন্ত্রণ করার জন্য রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয়ের পত্র অনুসারে সকল সভ্যকে নিমন্ত্রণ করা হইয়াছে। কিন্তু ঢাকার সাহিত্য পরিষদ তাঁহাদের সকল সভ্যকে সংবাদটী পর্য্যন্ত দেন নাই। তাঁহাদের মনোনীত ২৩ জন সভ্যের মধ্যে যাঁহারা নিশ্চিতরূপে সম্মিলনে যোগদান করিবেন না, জানা আছে—তাঁহারাই বেশী। যদি ঢাকা পরিষদের এই অবস্থা—তবে সভ্যগণের গৌরব রহিল কি? সাহিত্য সমাজ সম্বন্ধে এ ক্ষেত্রে কিছু বলিতে চাহি না। কারণ ঐ সমাজ একটা গঠিত কিছু নয়—সাময়িক যা কিছু।

(২) প্রবন্ধ নির্ব্বাচন সমিতির সম্পাদক বাবু যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয়ের স্বলিখিত একখানা ছিন্ন কাগজে এক টুক্‌রা কবিতা—যাহা না পড়িলেই ভাল হইত, তাহা কে কবে নির্ব্বাচন করিল? বোধ করি স্বয়ংই করিলেন। তিনি এক সময় বোধ হয় কবি ছিলেন। সম্প্রতি ত তাঁহাকে আমরা নাট্যকার, ঐতিহাসিক, প্রাত্নতাত্ত্বিক, ঔপন্যাসিক, সাহিত্যিক এবং সম্পাদক বলিয়াই শুনিতেছিলাম, সুতরাং অত বড় একটা সম্মিলনে হঠাৎ কবি যশঃপ্রার্থী হওয়ার কি প্রয়োজন ছিল। আচ্ছা, ঢাকা প্রকাশের প্রবীণ সুবিজ্ঞ সম্পাদক বাবু মুকুন্দবিহারী চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের প্রবন্ধটী নির্ব্বাচিত হইয়াছিল কি? আর সুকবি শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য্যের 'আমার বাংলা' কবিতাটী, যাহা যোগেন্দ্রবাবুর মত বিজ্ঞ নির্ব্বাচকের মতে সর্ব্বশেষে স্থান লাভ করিয়াছিল,—যে কবিতা পাঠের সময় সমুদয় প্যাণ্ডেল—মায় সভাপতি 'করতালি' দিয়া উচ্চৈঃস্বরে ধন্যবাদ দিয়া ছিলেন, সেই কবিতাটীই যোগেন্দ্রবাবুর বিচারে শেষে ২।৩ মিনিট সময়ের জন্য নির্ব্বাচিত হইল। আর ঢাকাই তথাকথিত কবির দল বিবিধ অঙ্গ ভঙ্গীতে সর্ব্বাগ্রে তাঁহাদের কাব্যকলার বিকাশ দেখাইলেন। একটু লজ্জা, একটু সম্মান বোধ যাহাদের থাকে, তাহারা আত্মপ্রকাশের জন্য অত ব্যস্ত হয় না। সম্প্রতি কবি শ্রীযুক্ত শ্রীপতিপ্রসন্ন ঘোষ যে কবিতাটী পাঠ করিলেন, তাহা সমগ্র না হউক, অনেকটাই যেন কোনও মাসিকের পৃষ্ঠায় ছাপা দেখিয়াছি মনে হয়। সেই উচ্ছিষ্ট লইয়া অত বড় সভায় না আসিলেও চলিত। তাঁহার কবি প্রতিভার সমালোচনা ত প্রায় প্রতি মাসেই "সাহিত্য, "উপাসনা" প্রভৃতিতে দেখা যায়। এ সকল কবি-যশঃপ্রার্থীকে সুপথে ফিরাইবার জন্য কি কেহ অভিভাবক নাই?

(৩) কবিবর শ্রীযুক্ত গোবিন্দচন্দ্র দাস মহাশয়কে একদা শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রচন্দ্র গুপ্ত ও শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ভদ্র মহাশয় নাকি বিশেষ ভাবে আক্রমণ করিয়াছিলেন। অত্যন্ত তেজস্বিতার সহিত তাঁহারা গোবিন্দবাবুকে বলেন—'দেখুন, আপনি যার তার কাছে বলেন, আপনাকে সম্মিলনে নিমন্ত্রণ করা হয় নাই। এ সব কি? আমরা আপনাকে নিমন্ত্রণ পত্র ও ব্যাজ পাঠাইয়া দিয়াছি, আপনি তাহা স্বাক্ষর করিয়া রাখিলেন; আবার এখন এ সব কি করিতেছেন?"

যে গোবিন্দবাবু অসাধারণ তেজস্বিতার জন্য পরের অধীনে চাকুরী করিতে পারিলেন না,—তিনি এ ঔদ্ধত্য সহিবেন কেন? তিনি সমান তেজে উত্তর করিলেন—"কোন্ মাতাল বলে যে আমি স্বাক্ষর করিয়া পত্র রাখিয়াছি? আমার নামে কেহ কোনও পত্র দেয় নাই।

বার সাহস থাকে, আমার স্বাক্ষর উপস্থিত করুন। আর আমি সাহিত্য সম্মিলনের নিমন্ত্রণের আকাঙ্ক্ষা কখনো পোষণও করি নাই। আমি কাহারো নিকট আপনাদের সম্বন্ধে কিছু বলিও নাই। অনর্থক আপনারা গায়ে পড়িয়া ঝগড়া করিতে আসেন কেন?”

এ সকল কথার সত্যতার বিরুদ্ধেও ঢাকার ‘উন্নত দলের’ সাহিত্যিকগণ কিছু বলিতে পারেন? এ কথাগুলি দিনে দু-প্রহরে পাটুয়াটুলীর রাস্তার উপর হইয়াছিল কি না? এগুলি ত আমি অন্যের মুখে শুনি নাই,—অদূরে দাঁড়াইবার সৌভাগ্য আমার সেদিন ঘটিয়াছিল।

(৪) বাবু সত্যেন্দ্রনাথ ভদ্র আমাদের শ্রদ্ধার পাত্র। তাঁহার সম্বন্ধে যত দূর শুনি —তিনি বহু গুণের অধিকারী। একদল ছেলে ছোকরা, তথাকথিত সাহিত্যিক তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া আছে। উহাদের চালনায় কি তাঁহার মত লোকের কেন্দ্র-চ্যুত হওয়া উচিত? যোগেন্দ্র বাবু এখন অনেকটা স্বতঃসিদ্ধ হইয়া পড়িয়াছেন। সম্মিলন-ক্ষেত্রেই তাহার বেশ পরিচয় আমরা পাইয়াছি। ইতিপূর্ব্বে তাঁহার সম্বন্ধে আমাদের কিছু জানা শুনা ছিল না। এখন জানিলাম বটে। ভদ্র মহাশয়ের আর এক পার্শ্বচর যিনি, তিনিও একটী ছেলে মানুষ। তাঁহার অতীত ইতিহাস সম্প্রতি যাহা শুনিলাম —তাহাতে বিশেষভাবে তাঁহাকে সাহিত্যিক রূপে পরিচিত করিয়া দেয় না। কলেজ-জীবন যাহাকে মানায় নাই,—রামকৃষ্ণ মিশন যাহাকে ধরিয়া রাখিতে পারে নাই,—তাহার পক্ষে সাহিত্যের তৃতীয় পন্থা অবশ্যই ধর্ত্তব্য। তবে ভদ্র মহাশয়ের উচিত ছিল, প্রবীণদিগের সহিত মিলিয়া কাজ করা।

(৫) সম্প্রতি শুনা গেল—এক শ্রেণীর তথাকথিত সাহিত্যিক ব্যতীত প্রাচীন ও প্রবীণগণকে কেহ সংবাদটী পর্য্যন্ত দেন নাই। ‘চরিতাভিধান’ প্রণেতা বাবু উপেন্দ্র-চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, ‘রামধনু’ প্রণেতা বাবু সূর্য্য-নারায়ণ ঘোষ, ‘দুর্গাবতী’ প্রভৃতি প্রণেতা বাবু কালীভূষণ মুখোপাধ্যায়, ‘পুষ্পমঞ্জরী’ প্রণেতা বাবু রবীন্দ্রনাথ সেন, ‘কেদার রায়’ প্রভৃতি নাটক প্রণেতা বাবু অনাথবন্ধু বন্দ্যোপাধ্যায়, বিবিধ চিকিৎসা গ্রন্থ প্রণেতা ডাক্তার নৃপেন্দ্রনাথ রায়, বিবিধ জ্যোতিষ গ্রন্থ প্রণেতা বসন্তকুমার জ্যোতিরার্ণব, পণ্ডিত রজনীকান্ত আমীন, বাবু গঙ্গাচরণ দাশগুপ্ত প্রভৃতিকে কি কেহ সংবাদটী পর্য্যন্তও দিয়াছেন? আমি ইঁহাদিগকে চিনি না। কিন্তু ঢাকার যেখানে সেখানে—ইঁহাদের নিমন্ত্রণ হয় নাই বলিয়া অভিযোগ আলোচিত হইতেছে।

(৬) আমরা ঢাকার সম্মিলনে গিয়াছিলাম। চিতোর অবরোধ বা দিল্লীর লাড্ডু অপেক্ষা খোদ ঢাকার কথা আমাদিগকে কেহ শুনাইল না। ময়মনসিংহ সম্মিলনে কেদার বাবু প্রাণপাত করিয়া ময়মনসিংহের কত ভাঙ্গাচুরা কাহিনী তালি দিয়া উপস্থিত করিয়াছিলেন; বর্দ্ধমানে, চুঁচুঁড়ায়, যশোরে সর্ব্বত্রই নাকি স্থানীয় ইতিহাসের অনেক কাহিনী বিজ্ঞাপিত হইয়াছিল। হয় নাই শুধু ঢাকায়। অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতির বক্তৃতায় যে একটু উচ্ছ্বাস ছিল—তাহা ছাড়া ঢাকার কিছু ত শুনিলাম না। যেখানে ঐতিহাসিক (?) যোগেন্দ্র বাবু, নলিনী বাবু, বীরেন্দ্র বাবু (?) প্রভৃতি উপস্থিত ছিলেন—সেখানে কবিতার ছড়াছড়ি কেন? পুরাতন কাসুন্দী ঘাঁটিয়াও ত আমাদিগকে কিছু

শুনাইতে পারিতেন। তবে কি না—এক্ষেত্রে একটু পরিশ্রম করিতে হয়। অনেক দিন আগে "মালঞ্চে" পড়িয়াছিলাম—(চাট্‌নীতে লিখিত) ডাক্তার এক রোগীকে মস্তিষ্ক চালনা করিতে মানা করেন। রোগী বলিল "আমি যে কবিতা লিখি।" ডাক্তার বলিলেন—"তা পার।" যদি এই সভায় বাবু যতীন্দ্রমোহন রায়, বাবু আনন্দনাথ রায় থাকিতেন—তবে হয়ত আমরা ঢাকার দুই একটা কথা শুনিতাম। খাসিয়া হিল বা আজমীরের প্রস্তরখণ্ডে আমাদের কি? ঢাকার সাভারের কথা, চিলিমপুরের রামপ্রসাদের কথা, মস্‌লিনের ইতিহাস, রামপালের বিবরণ, এমন কি ভাওয়ালের গড়গজালিও যে আমাদের তৃপ্তি সাধন করিত। কিন্তু হায়—এ যে ঢাকা!

(৭) সম্প্রতি "ঢাকা প্রকাশ" সাহিত্য সম্মিলনের আয় ব্যয় সংক্রান্ত ব্যাপারে একটু খোঁচা দিয়াছেন। আমরাও বলি, বিষয়টা পরিষ্কার হইয়া যাওয়াই ভাল। এবং এই উপলক্ষে যে সকল জিনিস পত্র খরিদ করা হইয়াছে, সেই সকলগুলি প্রকাশ্য নীলামে বিক্রয় করা উচিত।

(৮) একটা কথা কাণাঘুসা চলিতেছে। সাহিত্য-সম্মিলনের রিপোর্ট—যেমন সকল স্থানেই হয়—শীঘ্রই ছাপা হইবে। বোধ হয় ঐ রিপোর্টে ঢাকাই সাহিত্যিকগণ 'সচিত্র' হইবেন। গোবিন্দ বাবুর কি উপায়? তিনি ত সম্মিলনের সাহিত্যিক হন নাই—তিনি 'সচিত্র' হইবেন না? পরিষদ কি বলেন? এক্ষেত্রেও একটা ঝগড় হওয়ার আশঙ্কা করিতেছি।

আমাদের বক্তব্য মোটামুটি শেষ করিলাম। যদি বিস্তৃত কিছু কাহারও জানিবার থাকে—সংবাদপত্রে আলোচনা করিবেন। ঘরের কথা লিখিয়া মাসিক পত্রে আলোচনা ঠিক নহে। পুনরায় নিবেদন করিতেছি—আমি কাল্পনিক ব্যক্তি নহি। আমার বাড়ী ঘর, দেহ, সকলই আছে। সৌভাগ্যক্রমে এবার কয়েক দিন 'সাহিত্য পরিষদে'র পাঠাগারের খাতায় জমাও হইয়াছি। নাম ঠিকানা যদি কেহ চাহেন—নিম্নলিখিত ঠিকানায় সন্ধান লইবেন। আমি বাস্তবিকই আজও আছি। জাল নকল নহি—হুবহু সত্য। আমাকে যে কেহ নিম্ন ঠিকানায় পত্র দিবেন—পোঃ শ্রীপুর। বরমী কাছারী, জিলা ঢাকা। *

শ্রীরোহিণীকুমার গোস্বামী।

---

* অতঃপর ঢাকা-সাহিত্য-সম্মিলন সম্বন্ধে নব্যভারতে আর বাদ-প্রতিবাদ ছাপা হইবে না। দেখিতেছি, এদেশে অপ্রিয়-সত্য প্রচার করিতে দিলে, লোকেরা ব্যক্তিগতভাবে আক্রমণ করেন। শ্রীরোহিণীকুমার নাথ মহাশয় "ব্রাহ্মসমাজের প্রচার-বিভ্রাট" লিখিলেন, আমরা তাহার প্রতিবাদ পাইলে ছাপাইব লিখিলাম, তবু কেহ প্রতিবাদ পাঠাইলেন না; বরং রোহিণীকুমারের কথার পোষকতায় শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র সান্যাল প্রভৃতি ব্যক্তি প্রবন্ধ পাঠাইলেন, কিন্তু তথাকথিত কথা সকল আপন গায়ে তুলিয়া লইয়া কোন পোষ্য ব্যক্তি আমাদের সহিত কথা বন্ধ করিলেন এবং প্রতিপালকদের সাহায্যে বিরুদ্ধে দল পাকাইতেছেন। হায় রে কাল! এই কালে আর অধিক অগ্রসর হইয়া শত্রু বাড়াইব না, যে সকল তত্ত্ব প্রকাশিত হইল, তাহা হইতে সকলে সকল কথা অবগত হইবেন। ন. স.।

শান্তিশতক।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

বিচার না করি' দেখে যেই মূঢ়জন
এ সংসার রমণীয়, নিকটে তাহার ;
কিন্তু যা'রা পরমার্থ করয়ে দর্শন
তা'দের নিকটে ইহা কেবল অসার। ৩০।

মিত্র পুত্র বন্ধুময় ছল চমৎকার
কেবা জানে কোন জন পাতিলা হেথায়!
এ সংসারে পরিজন কেবা বল কা'র ?
আপনার জন বল কোন জন হায়?
জীবলীলা নিকেতন এই যে সংসার
স্বপ্ন ইন্দ্রজাল প্রায় কেবল অসার! ৩১।

রমণী মানসে তুলে কত না সংশয়,
রমণী হইতে হায় সদা অনাদর,
রমণী সাধন করে অপকর্ম্মচয়,
রমণী কপটী সদা দোষের আকর!
নারীরে ত্যজিতে নারে সুর নরবরে,
কে পারে গণিতে নারী ধরে কত ছল,—
—হায় রে সৃজিলা কেবা ধর্ম্মনাশ তরে
দেখিতে অমৃতপ্রায় স্ত্রীরূপ গরল! ৩২।

কামুক জনের হৃদে হায় রে যখন
আপনি জ্বলিয়া উঠে অনঙ্গ-অনল,
কুকাব্য-আহুতি তাহে কেন রে তখন
প্রদান করয়ে মূঢ় পণ্ডিত সকল? ৩৩।
রমণী সেবার সুখ অত্যন্ত চঞ্চল,—
স্বপনের প্রায় তাহা মুহূর্ত্তে ফুরায়,
সে সুখের শেষে পুনঃ অসুখ কেবল,
অঙ্গনা-সঙ্গমে তবে কিবা ফল হায়?—
—হেন যদি শতবার করি আলোচনা,
তথাপি ভুলে না মন হরিণ-নয়না! ৩৪।

মূঢ়তা হৃদয় মাঝে যতক্ষণ রাজে
ততক্ষণ দেয় সুখ বিষয়-নিকর,
জ্ঞানীর বিচারপূর্ণ মানসের মাঝে
কোথায় বিষয়-সুখ, বিষয়-আদর? ৩৫।

পঞ্চভূত মিলি' এই শরীর আমার
না ছিল পূর্ব্বেতে নাহি রহিবেক পরে,
বর্ত্তমান কালে মোর সহিত ইহার
হইয়াছে পরিচয় দু'দিনের তরে।
দেহলাভ নাশ যদি প্রকৃতি-অধীন
কেন তবে করি তা'য় এতেক যতন?
শরীর যদ্যপি হয় কোন কালে ক্ষীণ
কি হেতু তাহার তরে ভাবি অনুক্ষণ? ৩৬।

অশুচি শূকর আর ইন্দ্র দেবরায়,—
উভয়ের সুখ দুখে নাহিক অন্তর,—
গ্রহণ করয়ে দেখ আপন ইচ্ছায়
অমৃতে মহেন্দ্র আর বিষ্ঠায় শূকর।
রম্ভারে অমরনাথ করেন প্রণয়,
শূকর শূকরী সনে "ভালবাসা" করে,
মৃত্যু হ'তে উভয়েরই আছে মহা ভয়,
কর্ম্মফলে সুখ দুখ দোঁহে ভোগ করে। ৩৭।

পূতিগন্ধ, কৃমিপূর্ণ, অস্থি লালাময়,
মাংস নাই তবু সুখে করয়ে লেহন,
না দেখে কুকুর,—পার্শ্বে ইন্দ্র যদি রয়,
মাঝে মাঝে ভয়ে শুধু করে নিরীক্ষণ।
সেইরূপ মূঢ় নর বিষয়ে মগন,
বিষয় যে তুচ্ছ তাহা ভাবে না কখন। ৩৮।

কয়েক নিমেষ তরে রহে প্রাণিগণ,
তাদের বিয়োগ নহে শোকের বিষয়,—
অম্বুনিধি, মহীধর কিবা সুরগণ,
সকলেরই একদিন আছয়ে বিলয়!

* কবিবর শিহ্লন-প্রণীত।

ক্ষণতরে উঠে তা'রা ক্ষণে নাশ পায়
ক্ষণস্থায়ী জগতের সত্ত্ব সমুদায়! ৩৯।

পুত্র নাই বলি' ক্ষুব্ধ পুত্রহীন নরে,
পীড়িত হইলে সুত দুঃখিত হৃদয়,
কত ক্লেশ পুত্রে বিদ্যা শিখাবার তরে,
কত দুঃখ দুর্বিনীত হইলে তনয়!
যদ্যপি তনয় হয় গুণেতে মণ্ডিত
সর্ব্বদা তাহার হয় মরণের ভয়,
অপত্য যদ্যপি মরে মানব দুঃখিত,—
শত্রুরূপী পুত্র যেন কাহারও না হয়! ৪০।

শরীর যাইবে; সুখ নহে চিরতরে,
সর্পসম হয় পদ্ম-নয়নী সকল,
রোগ সমুদয় সদা শীর্ণ করে নরে,
গৃহে শুধু দুখ, লক্ষ্মী সদাই চপল;
স্বেচ্ছাচার বৈরী ভবে সদা ফিরে যম,
—এখনও না করিলাম কর্ত্তব্য করম! ৪১।

অর্থ যাবে, প্রাণ যাবে, যাইবে উভয়,
যেই দিন আসে হেন আপদ দুস্তর,
সমীপ-আগত দেখি' ধননাশ ভয়
না চাহে বিভব তবু; প্রাণ চাহে নর!—
সে ঘোর বিপদ যদি কভু কাটি' যায়,
হায় মূঢ় নর তবে বিভবের তরে
অপর আপদ মাঝে ছুটে পুনরায়,—
কভু প্রাণ, কভু ধন, নর পণ করে! ৪২।

শান্তমনে বিশ্ব কেহ করিলা সৃজন,
ধীরভাবে কেহ ইহা ধরিছে মাথায়,
জয় করি' কেহ দেখ সমগ্র ভুবন,
তৃণজ্ঞান করি' দান করিলা ইহায়।
আরও কত আছে ধীর পুরুষ সকল
ভোগ করে যা'রা দেখ সকল সংসার,—
—তবে যা'রা কতিপয় নগরে প্রবল
কি হেতু তাহারা করে এত অহঙ্কার? ৪৩।

নহে কি বসতিযোগ্য রম্য হর্ম্ম্যতল?
সঙ্গীতে কা'র না বল জুড়ায় শ্রবণ?
কা'র না অন্তরে উঠে আনন্দ বিমল
প্রিয় পরিজন সনে হইলে মিলন?—
—নিকটে উড়িলে কিন্তু পতঙ্গ যেমন,
প্রদীপের ছায়া হয় অত্যন্ত চঞ্চল,
জানিয়া সংসার সুখ চঞ্চল তেমন,
বনান্তে যাইলা শান্ত তাপস সকল! ৪৪।

সমগ্র বসুধা হোক্ তব অধিকার!
নিষ্কণ্টকে রাজ্যভোগ কর পৃথ্বীরায়!
বিষয় ভোগের ইচ্ছা নাহিক আমার,
ত্রৈলোক্য সাম্রাজ্য আমি দেখি তৃণপ্রায়!
নিঃশঙ্কে নিদ্রায় মগ্ন যথা মৃগীগণ
আমার মানস চায় সে শৈল কানন! ৪৫।

ক্রমশঃ।

শ্রীহরিসত্য ভট্টাচার্য্য।

গীতোক্ত ত্রিগুণতত্ত্ব। (২)

অন্যোন্য মিথুন—অর্থাৎ পরস্পর সম্বন্ধ, যেমন স্ত্রী পুরুষ। এইজন্য উক্ত হইয়াছে যে,

"রজসো মিথুনং সত্ত্বং সত্ত্বস্য মিথুনং রজঃ।
উভয়োঃ সত্ত্বরজসো মিথুনং তম উচ্যতে॥"

অন্যোন্যবৃত্তিক,—অর্থাৎ সকল গুণ সকল গুণেতেই বর্ত্তমান। গৌড়পাদ ইহার দৃষ্টান্ত দিয়াছেন। যেমন এক সুরূপা সুশীলা স্ত্রী, তাহার স্বামীর পক্ষে সুখহেতু, সপত্নীর পক্ষে দুঃখহেতু, ও লম্পটের পক্ষে মোহহেতু, অর্থাৎ সত্ত্ব রজঃ ও তমঃ তিনটী গুণেরই হেতু, সেইরূপ রজোগুণ সত্ত্ব ও তমোগুণকে উৎপন্ন করে, বা জনন হেতু

হয়। তমঃ আবরণস্বভাব হইয়াও সত্ত্ব ও রজোবৃত্তিকে উৎপন্ন করে। অতএব গুণ সকল পরস্পর পরস্পরের মধ্যে বর্ত্তমান।

ইহাই ত্রিগুণের সাধারণ ধর্ম্ম। ত্রিগুণের অন্য বিশেষ ধর্ম্মও আছে। যথা—

সত্ত্বং লঘু প্রকাশকম্ ইষ্টম্, উপষ্টম্ভকং চলং
চ রজঃ।
গুরু বরণকমেব তমঃ, প্রদীপবর্চ্চার্থতো
বৃত্তিঃ॥
(কারিকা, ১৩)।

ইহার ব্যাখ্যায় গৌড়পাদ বলিয়াছেন,—

সত্ত্বগুণ লঘু ও প্রকাশক,—যখন সত্ত্বগুণ উৎকট হয়, তখন অঙ্গাদি লঘু, বুদ্ধি প্রকাশক ও ইন্দ্রিয় সকল প্রসন্ন হয়। রজোগুণ উপষ্টম্ভক ও চঞ্চল,—উপষ্টম্ভক অর্থাৎ উদ্দ্যোতক এবং চঞ্চলকারী। তমোগুণ— গুরু ও আবরণক। যখন তমোগুণ উৎকট হয়, তখন অঙ্গাদি গুরু হয় বা ভার বিশিষ্ট হয়, ও ইন্দ্রিয়সকল আচ্ছন্ন বা স্বকর্ম্মে অসমর্থ হয়।

ইহারা প্রদীপবৎ অর্থাৎ প্রদীপের তুল্য প্রয়োজন-সাধন-বৃত্তি-বিশিষ্ট। যেমন প্রদীপে তৈল, অগ্নি ও বর্ত্তি (বাতি) তিনটী বিরুদ্ধ স্বভাব, অথচ ইহাদের একত্র সংযোগে যে আলোক উৎপন্ন হয়, তাহা অন্য পদার্থকে প্রকাশ করে, সত্ত্ব রজঃ ও তমঃ সেইরূপ পরস্পর বিরুদ্ধ স্বভাব হইলেও পরস্পর মিলিত হইয়া স্বার্থ সাধনক্ষম হয়।

ইহাই ত্রিগুণের লক্ষণ ও ধর্ম্ম। পূর্ব্বে (একাদশ কারিকায়) ব্যক্ত ও অব্যক্ত বা প্রধান উভয়কেই ত্রিগুণ, অবিবেকী, বিষয়, সামান্ত অচেতন ও প্রসবধর্ম্মী বলা হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে অবিবেকী প্রভৃতি ত্রৈগুণ্য হইতেই সিদ্ধ হয়। ব্যক্তের (অর্থাৎ মহৎ হইতে স্থূলভূত পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র) এই ত্রিগুণাদি ধর্ম্ম পরিদৃষ্ট হয়। অব্যক্তে তাহা হয় না। কিন্তু কার্য্য কারণ গুণাত্মক। এজন্য ব্যক্তের যে অব্যক্ত কারণ, তাহাও ত্রিগুণ অবিবেকী প্রভৃতি 'ধর্ম্ম'-যুক্ত ইহা বলা যায়। ত্রিগুণ হইতে যেমন ব্যক্তে অবিবেকী প্রভৃতি ধর্ম্ম সিদ্ধ হয়, অব্যক্তেও সেইরূপ হয়। 'ব্যক্তে' এই গুণের বিপর্য্যয় দৃষ্ট হয়, কিন্তু অব্যক্তে তাহা দৃষ্ট হয় না, বিপর্য্যয় এক অর্থে বৈষম্য। ব্যক্তে ত্রিগুণের বৈষম্য আছে। অব্যক্তে তাহাদের বৈষম্য নাই। এই জন্য সাংখ্যদর্শনে মূল প্রকৃতিকে বা অব্যক্তকে ত্রিগুণের সাম্যাবস্থা বলা হইয়াছে। এ সম্বন্ধে কারিকার সূত্র এই,—

"অবিবেক্যাদেঃ সিদ্ধি স্ত্রৈগুণ্যাৎ
তদ্বিপর্য্যয়েঽভাবাৎ।
কারণগুণাত্মকত্বাৎ কার্য্যস্য
অব্যক্তমপি সিদ্ধম্॥" (১৪)

ব্যক্ত হইতে ত্রিগুণাত্মক অব্যক্ত মূল প্রকৃতির অনুমান করিবার ইহাই কারণ। এই অনুমানের অন্য কারণও কারিকায় উক্ত হইয়াছে। যথা,—

"ভেদানাং পরিমাণাৎ সমন্বয়াৎ শক্তিতঃ
প্রবৃত্তেশ্চ।
কারণকার্য্য বিভাগাৎ অবিভাগাৎ
বৈশ্বরূপস্য" ॥ (১৫)।

এই দুই শ্লোক হইতে জানা যায় যে, ত্রৈগুণ্যের বিপর্য্যয়ের অভাব হেতু, কার্য্যের কারণ গুণাত্মকত্ব হেতু, ভেদের পরিণাম হেতু, সমন্বয় হেতু, শক্তি অনুসারে প্রবৃত্তিহেতু কারণ কার্য্যের বিভাগ হেতু ও বিশ্বরূপের অবিভাগ হেতু—এই সব কারণে অর্থাৎ এই ভিত্তির উপর অনুমান প্রমাণ দ্বারা অব্যক্তের অর্থাৎ মূল কারণ প্রকৃতির সিদ্ধি

হয়। কিরূপ যুক্তি দ্বারা এই অনুমান সিদ্ধ হয়, তাহা বুঝা কঠিন। এস্থলে তাহা বুঝিবারও আবশ্যক নাই। তবে এই 'অব্যক্ত' বা মূল প্রকৃতি যে ত্রিগুণাত্মিকা, তাহা কিরূপে অনুমান হইতে পারে, তাহা বুঝিতে হইবে। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, মহৎ বা বুদ্ধিতত্ত্ব হইতে স্থূলভূত পর্য্যন্ত—যাহা ব্যক্ত, বা আমাদের প্রত্যক্ষগোচর, তাহার মধ্যে ত্রিগুণের বিপর্য্যয় দৃষ্ট হয়। তাহা হইতে এই ব্যক্তের যে অব্যক্ত কারণ, তাহা অবশ্য এই ত্রিগুণ—এই ত্রিগুণের সাম্যাবস্থা বা অবিশেষ অবস্থা, তাহা অনুমান করিতে হয়। কারিকায় আছে,—

"কারণমস্ত্যব্যক্তং প্রবর্ত্ততে ত্রিগুণতঃ সমুদয়াচ্চ।
পরিণামতঃ সলিলবৎ প্রতিপ্রতিগুণাশ্রয়-বিশেষাৎ॥" (১৬)।

অর্থাৎ অব্যক্ত কারণ বটে, কিন্তু ত্রিগুণ হইতেই তাহার সমবায় পরিণাম ও সলিলের ন্যায় ভিন্ন ভিন্ন গুণের আশ্রয়ের ভিন্নত্ব হইতেই সমস্ত প্রবর্ত্তিত হয়। এই ব্যক্ত মহদাদি স্থূলভূত পর্য্যন্ত সমুদায়ের মূল কারণ অব্যক্ত বা মূল প্রকৃতি এই অনুমান সিদ্ধ হয়, ইহা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। এই মূল প্রকৃতি যে সত্ত্ব রজঃ ও তমোগুণের অবিপর্য্যয় বা সাম্যাবস্থা, তাহাও উক্ত হইয়াছে। এই ত্রিগুণাত্মক অব্যক্তই সমুদায় ব্যক্তকে উৎপন্ন করে। কিরূপে এই ত্রিগুণ হইতে এই অনন্ত ভেদ যুক্ত ব্যক্তের উৎপত্তি হয়? ইহার এক উত্তর—সমবায় হইতে। ইহার অর্থ এই যে, প্রত্যেক গুণ অনন্ত, তাহাদের মধ্যে প্রত্যেকের কতকগুলি সমবেত বা সম্মিলিত হইয়া এক একটী বস্তু উৎপাদন করে। যেমন কতকগুলি সূত্র সমষ্টিতে বস্ত্র হয়, সেইরূপ অব্যক্ত গুণ সমুদায় হইতে মহত্তত্ত্বাদি উৎপন্ন হয়। এই রূপে ত্রিগুণ হইতে ও তাহাদের সমবায় হইতে ব্যক্তরূপ জগৎ প্রকাশিত হয়। এই সমুদায় ব্যক্তরূপ যে এক প্রকার হয় না, ইহার কারণ গুণের পরিণাম। পরিণাম হেতু ভিন্ন ভিন্ন গুণের আধারের বৈলক্ষণ্য হইতে এই বৈচিত্র্য হয়। আবার বৈলক্ষণ্য হেতু জল যেমন ভিন্ন ভিন্ন গুণবিশিষ্ট হয়, সেই রূপ এই বৈচিত্র্য হয়। গুণের আধার বা আশ্রয়ের বৈচিত্র্য আছে। গৌড়পাদ বলিয়াছেন,—দেবতারা প্রধানতঃ সত্ত্বগুণের আশ্রয়, মানুষ প্রধানতঃ রজোগুণের আশ্রয়, পশু প্রভৃতি প্রধানতঃ তমোগুণের আশ্রয়। এই আশ্রয় বৈচিত্র্য হেতু গুণবৈচিত্র্য হয় অর্থাৎ গুণের ভিন্ন ভিন্ন আধারে অবস্থিতি, ও তন্নিবন্ধন পরিণাম হেতু ব্যক্ত ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রবর্ত্তিত হয়। এক অর্থে গুণের আধারই 'পুরুষ'। পুরুষের মধ্যে কোন ভেদ নাই সত্য, কিন্তু বদ্ধ হওয়ায়, পুরুষের মধ্যে পার্থক্য হয়। সকলে সমান বদ্ধ নহে। দেবতারা যেরূপ বদ্ধ, মনুষ্য তাহা অপেক্ষা অধিক বদ্ধ। মানুষের মধ্যেও এই বন্ধনের তারতম্য অনুসারে পার্থক্য আছে। সে যেমন বদ্ধ, তাহার আশ্রয়ে ত্রিগুণ সেইরূপে পরিণত হয়। ইহাই সংসার-বৈচিত্র্যের কারণ।

তত্ত্বকৌমুদীকার বলেন যে, এই তিন গুণ নিয়ত পরিণামশীল। ইহারা ক্ষণকালও পরিণত না হইয়া থাকিতে পারে না। তবে প্রলয় অবস্থায় ইহাদের 'সদৃশ' পরিণাম হয়, আর সৃষ্টি অবস্থায় বিসদৃশ পরিণাম হয়। প্রলয়কালে সত্ত্ব সত্ত্বরূপে, রজঃ রজোরূপে ও তমঃ তমোরূপে পরিণত হইতে থাকে। এই শ্লোকে 'ত্রিগুণতঃ' শব্দের ইহাই অর্থ।

সৃষ্টিকালে এই তিন গুণ পরস্পর মিলিত হইয়া মহদাদি এক একটী কার্য্য জন্মায়। এইরূপ মিলিত হইয়া প্রকাশের নাম সমবায়। এই সমবায় কালে একটী গুণ প্রধান হয়, অপর দুইটী অপ্রধান হইয়া তাহার অনুবর্ত্তী হয়। ইহাই সাম্য হইতে বৈষম্যের অবস্থা। গীতায় এই তত্ত্ব সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে যে, রজঃ ও তমোগুণকে অভিভূত করিয়া সত্ত্ব প্রবল হয়, রজোগুণ সত্ত্ব ও তমোগুণকে অভিভূত করিয়া প্রবর্ত্তিত হয়, আর তমোগুণ সত্ত্ব ও রজঃকে পরাভূত করিয়া প্রকটিত হয়। এইরূপে একই কারণ হইতে কার্য্যবৈচিত্র্য উৎপন্ন হয়। একটী গুণ যখন এইরূপে কোন কার্য্য বস্তুতে প্রাধান্য লাভ করে, তাহাকে আশ্রয় করিয়া অপ্রধান গুণ সকল নানাবিধ পরিণাম উৎপাদন করে। ইহাই 'প্রতি প্রতি অণাশ্রয় বিশেষাৎ' পদের অর্থ।

যাহা হউক, এই বিভিন্ন অর্থ এস্থলে বুঝিবার আবশ্যক নাই ; একই কারণ অনুমান করিয়া, তাহা হইতে কার্য্য বৈচিত্র্য সিদ্ধান্ত করা কঠিন। এজন্য সেই এক কারণকে প্রধানতঃ তিনটী উপাদানের সাম্যাবস্থা বলা হইয়াছে। কিন্তু তাহাতেও এই বৈচিত্র্য ব্যাখ্যা করা যায় না। এজন্য প্রকৃতির মূল উপাদান সত্ত্ব রজঃ ও তমঃ প্রত্যেককে কোন কোন ব্যাখ্যাকার অসংখ্য কল্পনা করিয়াছেন। সুতরাং যদি মূলে অসংখ্য সত্ত্ব, অসংখ্য রজঃ ও অসংখ্য তমোরূপ দ্রব্য কল্পনা করা যায়, তবে তাহাদের মধ্যে কতকগুলির সম্মিলনে উৎপন্ন কার্য্যও অবশ্য অসংখ্য হয়। ইহাতে কল্পনা বাহুল্য হয়। প্রকৃতি ও তাহার উপাদান তিন গুণকে 'দ্রব্য' (Substance) বলিয়া অনুমান করিলে, এই গোলযোগ হয়, কিন্তু প্রকৃতিকে যদি শক্তি বলা যায়, সত্ত্ব রজঃ ও তমঃ এই শক্তির মূল ত্রিবিধ ভাব মাত্র বলা যায়, তবে আর এই কল্পনা বাহুল্যের প্রয়োজন হয় না। আমরা একথা পরে বুঝিতে চেষ্টা করিব।

এই ত্রিগুণ নিয়ত পরিণামী, নিয়ত পরিবর্ত্তনশীল অর্থাৎ বিপর্য্যয়যুক্ত। ইহা হইতে অপরিণামী, অপরিবর্ত্তনীয়, অবিকৃত নিত্য পুরুষের অস্তিত্বের অনুমান হয়, ইহা পুরুষের অস্তিত্ব অনুমানের এক কারণ—

…ত্রিগুণাদি-বিপর্য্যয়াৎ অধিষ্ঠানাৎ
পুরুষোঽস্তি…। (সাংখ্য কারিকা ১৭)

সেই পুরুষ সুতরাং ত্রিগুণাতীত। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, সাংখ্যদর্শনানুসারে এই পুরুষ বহু।

এই পুরুষের সন্নিধি বা অধিষ্ঠান হেতু প্রকৃতির গুণক্ষোভ হয়। তাহা হইতে মহত্তত্ত্বাদির উৎপত্তি হয় ; যথা—

"প্রকৃতের্ম্মহানস্ততোঽহঙ্কারঃ তস্মাদ্ গণশ্চ
ষোড়শকঃ।
তস্মাদপি ষোড়শকাৎ পঞ্চভ্যঃ পঞ্চভূতানি ॥"
(কারিকা ২২)

প্রকৃতি হইতে মহান্ বা বুদ্ধিতত্ত্ব, মহৎ হইতে অহঙ্কার, বৈকৃত সাত্ত্বিক অহঙ্কার হইতে মন ও দশ ইন্দ্রিয় উৎপন্ন হয় ; তামস অহঙ্কার, যাহাকে ভূত সকলের আদি বলে, তাহা হইতে পঞ্চতন্মাত্র উৎপন্ন হয় ; এবং এই পঞ্চতন্মাত্র হইতে স্থূল পঞ্চভূতের উৎপত্তি হয়। (কারিকা ২২)

প্রকৃতির সহিত পুরুষের যোগ বা অধিষ্ঠান হইলে, প্রকৃতিতে যে গুণক্ষোভ হয়, তাহাতে প্রকৃতির যে প্রথম কার্য্য উৎপন্ন হয়, তাহা মহৎ বা বুদ্ধিতত্ত্ব। ইহা সত্ত্বপ্রধান। ইহা হইতে অহঙ্কারের উৎপত্তি হয়। যখন এই অহঙ্কার সত্ত্বপ্রধান হয়, তাহাতে রজস্তম

অভিভূত থাকে, তখন তাহা হইতে জ্ঞানেন্দ্রিয় প্রবর্ত্তক মন ও পঞ্চ জ্ঞান ইন্দ্রিয়ের বিকাশ হয়। রজঃ গুণ দ্বারা এই সাত্ত্বিক অহঙ্কার প্রবর্ত্তিত হইলে বা পরিচালিত হইলে তাহা হইতে কর্ম্মেন্দ্রিয় প্রবর্ত্তক মন পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয়ের উৎপত্তি ও প্রবৃত্তি হয়। সেইরূপ তামসিক অহঙ্কার (অর্থাৎ যাহাতে সত্ত্ব ও রজঃ অভিভূত থাকে) রজঃ দ্বারা পরিচালিত হইলে তাহা হইতে পঞ্চতন্মাত্রের উৎপত্তি হয়। রাজসিক অহঙ্কারকে তৈজস্ বলে।—

"সাত্ত্বিক একাদশকঃ প্রবর্ত্ততে বৈকৃতাৎ অহঙ্কারাৎ।
ভূতাদেস্তন্মাত্রঃ স তামস তৈজসাদুভয়ম্॥"
(কারিকা ২৫)

এইরূপে সৃষ্টিকালে পুরুষের অধিষ্ঠান হেতু প্রকৃতির গুণ ক্ষোভ হইয়া বুদ্ধি অহঙ্কার মন দশ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চতন্মাত্র প্রথমে উৎপন্ন হয়। ইহারা মিলিত হইয়া লিঙ্গ হয়। প্রকৃতি পুরুষের সংসৃষ্ট এই লিঙ্গ, তাহার লিঙ্গ বা সূক্ষ্ম শরীর। পুরুষ সংযোগ হেতু এই লিঙ্গ চেতনবৎ হয়,—

"তস্মাৎ তৎসংযোগাৎ অচেতনং চেতনাবদিব লিঙ্গম্।" (কারিকা ২০)

সাংখ্যমতে পুরুষের স্বার্থসাধন জন্য বুদ্ধি অহঙ্কার মন ও ইন্দ্রিয় ইহারা যুগপৎ বা এককালে দৃষ্ট বিষয় সম্বন্ধে প্রবর্ত্তিত হয়। অদৃষ্ট বিষয় সম্বন্ধে (স্মরণকালে) বুদ্ধি অহঙ্কার ও মন প্রবর্ত্তিত হয় (কারিকা ৩০) এই বুদ্ধি অহঙ্কার ও মনকে অন্তঃকরণ বলে। বেদান্ত-দর্শন মতে ইহার নাম চিত্ত। কোন মতে চিত্ত স্বতন্ত্র। শ্রুতিতে ইহাদিগকে সমষ্টি ভাবে মন বলে। দশ ইন্দ্রিয়কে বহিঃকরণ বলে (কারিকা ৩২)।

পূর্ব্বে যে তামস অহঙ্কার হইতে পঞ্চতন্মাত্রের উৎপত্তির কথা উক্ত হইয়াছে, তাহারা অবিশেষ বিষয়। আর এই পঞ্চতন্মাত্র হইতে যে পঞ্চভূত উৎপন্ন হইয়াছে, তাহারা বিশেষ বিষয়। আমাদের প্রত্যেকের লিঙ্গ শরীর অনুযায়ী স্থূল শরীর বা সঙ্ঘাত এই পঞ্চভূত হইতে উৎপন্ন হয়। এই পঞ্চস্থূল ভূত আমাদের সম্বন্ধে শান্ত বা সুখ লক্ষণ বিশিষ্ট, ঘোর বা দুঃখ লক্ষণ বিশিষ্ট অথবা মূঢ় বা মোহজনক।

"তন্মাত্রাণ্যবিশেষা স্তেভ্যো ভূতানি পঞ্চ পঞ্চভ্যঃ।
এতে স্মৃতা বিশেষাঃ শান্তা ঘোরাশ্চ মূঢ়াশ্চ"॥
(কারিকা ৩৮)

অতএব এই স্থূল ভূত মধ্যে যাহা আমাদের নিকট প্রকাশ স্বভাব বা সুখ স্বভাব তাহা সত্ত্বপ্রধান, যাহা চঞ্চল ও দুঃখ স্বভাব তাহা রজঃপ্রধান, আর যাহা মূঢ়-স্বভাব মোহকর তাহা তমঃপ্রধান। প্রত্যেক স্থূলবিষয় বিভিন্ন ব্যক্তির নিকট বিভিন্নভাবে প্রতীত হয়। ঘর্ম্মাক্ত ব্যক্তির নিকট বায়ু শান্ত বা সুখকর; শীতার্ত্ত ব্যক্তির নিকট বায়ু ঘোর বা দুঃখকর আর পীড়াচ্ছন্ন ব্যক্তির পক্ষে বায়ু মোহকর। *

সাংখ্যকারিকায় ত্রিগুণতত্ত্ব সম্বন্ধে যাহা উক্ত হইয়াছে তাহা সংক্ষেপে বিবৃত হইল। এই তত্ত্ব গীতায় আরও বিশদভাবে উল্লিখিত হইয়াছে, তাহা আমরা দেখিয়াছি। গীতায়— আমাদের মৃত্যুকালে কোনও বিশেষ গুণের প্রবৃদ্ধি হেতু বিশেষ গতিতত্ত্ব বিবৃত হইয়াছে। দেবযানে ও পিতৃযানে যে জ্ঞানীদের ও

* এইরূপে ত্রিগুণ হইতে মহদাদি ক্রমে পঞ্চভূতের ও বিশ্বের উৎপত্তি তত্ত্ব আমরা সাংখ্যকারিকা হইতে বুঝিতে পারি। এস্থলে ইহার বিস্তারিত উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

যোগীদের গতি হয়, তাহা পূর্ব্বে অষ্টম অধ্যায়ে বিবৃত হইয়াছে। বিশেষ বিশেষ গুণের বিবৃদ্ধিসময়ে মৃত্যু হইলে যে গতি হয়, তাহা এই অধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে। সত্ত্বপ্রবৃদ্ধিকালে মৃত্যু হইলে উৎকৃষ্ট গতি হয়, অর্থাৎ দেবযানে ও পিতৃযানে গতি হয়। (১৪।১৫); রজোবিবৃদ্ধিকালে মৃত্যু হইলে কর্ম্মসঙ্গিলোকে জন্ম হয় (১৪।১৫); আর তমোবিবৃদ্ধিকালে মৃত্যু হইলে মূঢ় যোনিতে জন্ম হয় (১৪।১৮)। সত্ত্বস্থ ব্যক্তি উর্দ্ধে গমন করে, রাজস ব্যক্তি মধ্যে অবস্থান করে, ও তামস ব্যক্তি অধোগতি লাভ করে (১৪।১৮)। ইহার কারণ গীতায় উক্ত হয় নাই। কারিকায় তাহার হেতু বিবৃত হইয়াছে। কারিকায় আছে —

"উর্দ্ধং সত্ত্ববিশালস্তমোবিশালশ্চ মূলতঃ সর্গঃ।
মধ্যে রজোবিশালো ব্রহ্মাদিস্তম্বপর্য্যন্তঃ" ॥
(কারিকা ৫৪)

সাংখ্যদর্শনেও এ তত্ত্ব উল্লিখিত হইয়াছে, তাহা আমরা পূর্ব্বে দেখিয়াছি। কারিকায় আরও আছে—

"ধর্ম্মেণ গমনমূর্দ্ধং গমনমধস্তাদ্ভবত্যধর্ম্মেণ।
জ্ঞানেন চাপবর্গো বিপর্য্যয়াদিষ্যতে বন্ধঃ॥"
(কারিকা ৪৪)

এই উর্দ্ধলোক—দেবলোক বা স্বর্গাদিলোক ও ভুবর্লোক, মধ্যলোক ভূলোক বা মনুষ্যলোক এবং অধঃ—ভূতল—বা পাতাললোক (অর্থাৎ ভূলোকের নিম্নজাতীয় জীবলোক)। উর্দ্ধে বা স্বর্গে অষ্টপ্রকার দেবযোনি বাস করেন। যথা—ব্রাহ্ম, প্রাজাপত্য, সৌম্য, ঐন্দ্র, গান্ধর্ব্ব, যাক্ষ, রাক্ষস ও পৈশাচ। আর মধ্য পৃথিবীতে মনুষ্য ও অধোলোকে পঞ্চবিধ তির্য্যগ্‌ যোনি—অর্থাৎ পশু মৃগ পক্ষী সরীসৃপ ও স্থাবর ভূত—বাস করে।

"অষ্টবিকল্পো দৈব স্তৈর্য্যগ্‌যোনশ্চ পঞ্চধা ভবতি।
মানুষ্যশ্চৈকবিধঃ সমাসতো ভৌতিকঃ সর্গঃ॥" (কারিকা ৫৩)

ইহা হইতে জানা যায় যে, যাঁহাদের সত্ত্ববিবৃদ্ধিকালে সত্ত্বস্থ হইয়া মৃত্যু হয়, তাঁহারা ধর্ম্ম দ্বারা উর্দ্ধে দেবলোকে ও পিতৃলোকে বা স্বর্গে গমন করেন; যাহাদের রজোবিবৃদ্ধিকালে রজস্থ হইয়া মৃত্যু হয়, তাহারা অধর্ম্ম হেতু মধ্যে—মনুষ্যলোকে স্থিত হয়। আর যাহাদের তমোবিবৃদ্ধিকালে মৃত্যু হয়, তাহারা মোহহেতু মূঢ় যোনিতে বা তির্য্যগ্‌ যোনিতে জন্ম গ্রহণ করে।

অতএব গীতায় যে ত্রিগুণতত্ত্ব বিবৃত হইয়াছে, তাহা আমরা সমুদায় কারিকা হইতে বুঝিতে পারি। আমরা বলিতে পারি যে, গীতোক্ত ত্রিগুণ তত্ত্বই কারিকায় বিশেষ ভাবে বিবৃত হইয়াছে। কারিকা হইতেই গীতার এই ত্রিগুণ তত্ত্ব আরও স্পষ্টরূপে জানিতে পারা যায়।

পাতঞ্জল দর্শন।—আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, পাতঞ্জল দর্শনও এক অর্থে সাংখ্যগ্রন্থ। ইহাতে ত্রিগুণের উল্লেখ আছে। কিন্তু সে উল্লেখ অতি সামান্য। দুইটীমাত্র সূত্রে এই ত্রিগুণের উল্লেখ পাওয়া যায়। এই দুই সূত্র বুঝাইবার জন্য ব্যাসভাষ্যে সাংখ্য শাস্ত্রোক্ত সমুদায় ত্রিগুণতত্ত্ব অতি সংক্ষেপে উল্লিখিত হইয়াছে, তাহা দুর্ব্বোধ হইলেও আমরা এস্থলে তাহার অনুবাদ উদ্ধৃত করিব।

পাতঞ্জল দর্শনের প্রথম সূত্র এই,—

"প্রকাশক্রিয়াস্থিতিশীলং ভূতেন্দ্রিয়াত্মকং ভোগাপবর্গার্থং দৃশ্যম্।" (২।১৮)

ইহার অর্থ এই যে,—দৃশ্য (এই পরিদৃশ্যমান জগৎ) প্রকাশ, ক্রিয়া ও স্থিতিশীল, ভূতেন্দ্রিয়াত্মক ও ভোগাপবর্গার্থ।

এই সূত্রের ব্যাস ভাষ্যের অনুবাদ নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

"দৃশ্যের স্বরূপ বলা যাইতেছে, সত্ত্বগুণের স্বভাব প্রকাশ (জ্ঞান), রজোগুণের স্বভাব ক্রিয়া (প্রবৃত্তি), তমোগুণের স্বভাব স্থিতি অর্থাৎ প্রকাশ ও ক্রিয়া প্রভৃতিকে হইতে না দেওয়া, ইহাদের প্রত্যেকের অংশ এক অপরের সহিত অনুরক্ত হয় অর্থাৎ সত্ত্বগুণের কার্য্য প্রকাশ হইতে গেলে তামস ও রাজসের মিশ্রণ তাহাতে থাকিয়া যায়, তমঃ ও রজো গুণের কার্য্যও এইরূপ জানিবে; ইহারা এই ভাবেই (এক অপরের সাহায্য লইয়াই) পরিণত হয়। ইহারা পুরুষের সহিত সংযুক্ত ও বিযুক্ত হইয়া থাকে অর্থাৎ বদ্ধ পুরুষের সহিত সংযুক্ত এবং মুক্ত পুরুষের সহিত বিযুক্ত হইয়া থাকে, ইতর গুণ ইতর গুণের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া মূর্ত্তি (পৃথিব্যাদি পরিণাম) লাভ করে; ইহাদের পরস্পর অঙ্গাঙ্গি-ভাব অর্থাৎ প্রধান অপ্রধান ভাব থাকিলেও শক্তির সঙ্কর হয় না; সত্ত্বগুণের প্রাধান্য অবস্থায় রজঃ ও তমোগুণ তাহার অঙ্গভাবে সাহায্য করে বলিয়া ঐ সত্ত্বের কার্য্য প্রকাশ সুখ প্রভৃতিতে রাজস তামসের (দুঃখ-মোহের) সঙ্কর হয় না। ইহারা সমানজাতীয় রূপে অসমবায়ী কারণ হয়, অসমান জাতীয় রূপে নিমিত্ত কারণ হয়, (তুল্যজাতীয় কারণই মিলিত হইয়া কার্য্য করে, তাহাতে ভিন্ন জাতীয়ের সংস্রব থাকে না, এরূপ নিয়ম নহে; বিশেষ এই তুল্যজাতীয়ই সমবায়ী কারণ হয়, ভিন্নজাতীয় তাহার সহায়রূপে নিমিত্ত কারণ হইয়া থাকে)। একটী গুণের প্রাধান্য সময়ে (প্রধানবেলায়াং ইহার অর্থ প্রধানত্ববেলায়াং, ভাব প্রধান নির্দ্দেশ) অপর দুইটী গুণ অপ্রধান হইলেও সহকারিরূপে ঐ প্রধানে তাহাদের অস্তিতার (সত্তার) অনুমান হয়। ভোগ ও অপবর্গ স্বরূপ পুরুষার্থ করিবে বলিয়াই ইহাদের শক্তির (কার্য্যজনন) বিনিয়োগ অর্থাৎ চালনা হয়। অয়স্কান্ত মণি যেরূপ সন্নিধানে থাকিয়াই লৌহের উপকার করে, ইহারা প্রত্যয় অর্থাৎ ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ নিমিত্ত ব্যতিরেকেই একটী বৃত্তির (পরিণামের) অনুগমন অপর দুইটী করে। এই গুণত্রয়ই উক্তরূপে প্রধান অর্থাৎ যাহা হইতে সমস্ত কার্য্য উৎপন্ন হয় এবং যাহাতে লয় পায়, এই অর্থে প্রধান শব্দে অভিহিত হয়। পরিণামের সহিত এই গুণত্রয়কেই দৃশ্য বলে। এই দৃশ্য গুণত্রয় ভূত ও ইন্দ্রিয় রূপে পরিণত হয়, সূক্ষ্ম (তন্মাত্র) ও স্থূল (মহাভূত) এই দ্বিবিধ ক্ষিতি প্রভৃতি পঞ্চভূত, এবং স্থূল সূক্ষ্ম অর্থাৎ অহঙ্কার ও চক্ষুরাদি দ্বিবিধ ইন্দ্রিয় রূপে পরিণত হয়। এই পরিণাম নিরর্থক নহে, কিন্তু কোনও একটী প্রয়োজন সিদ্ধির নিমিত্ত হইয়া থাকে, এই দৃশ্য—পুরুষের ভোগ (সুখ দুঃখের সাক্ষাৎকার) ও মুক্তির নিমিত্ত পরিণত হয়। ইষ্টানিষ্ট (সুখ দুঃখ) রূপ গুণস্বরূপের অর্থাৎ ত্রিগুণাত্মক বুদ্ধিপরিণামের স্বরূপ নিশ্চয় বস্তুতঃ বুদ্ধিরই ধর্ম্ম হইলেও অবিভাগাপন্ন অর্থাৎ পুরুষে আরোপিত হইলে উহাকে ভোগ বলা যায়, এবং পুরুষের স্বরূপবোধকে অপবর্গ অর্থাৎ মুক্তির কারণ বলা যায়। এই ভোগ ও অপবর্গ রূপ উভয়ের অতিরিক্ত আর কোন দর্শন (প্রয়োজন) নাই।

পঞ্চশিখাচার্য্য বলিয়াছেন, গুণত্রয় কর্ত্তা, পুরুষ কর্ত্তা নহে; গুণত্রয়কে অপেক্ষা করিয়া চতুর্থ স্বচ্ছ ও সূক্ষ্ম বলিয়া গুণত্রয়ের তুল্যজাতীয় এবং চেতন বলিয়া জড়গুণে ত্রয়ের অতুল্যজাতীয় ঐ পুরুষ গুণত্রয়ের ক্রিয়ার

অর্থাৎ পরিণামের সাক্ষী অর্থাৎ দ্রষ্টা, গুণত্রয়ের (বুদ্ধির) ধর্ম্ম সুখ দুঃখাদি পুরুষে প্রতীয়মান হয় বলিয়া যেন বস্তুতঃই পুরুষের ধর্ম্ম এইরূপে সাধারণতঃ অজ্ঞ লোকেরা মনে করে; পুরুষের উত্তমরূপে প্রতীয়মান সুখ দুঃখাদি বিশিষ্ট রূপ হইতে পৃথক্ যে একটী কূটস্থ নির্গুণ স্বরূপ আছে, তাহার শঙ্কাও করে না। ভোগ ও অপবর্গ এই দুইটী বুদ্ধির ধর্ম্ম বলিয়া বোধ হয়, তাহা দৃষ্টান্ত দ্বারা বলা যাইতেছে; যেমন জয় ও পরাজয় উভয়ই সৈনিক পুরুষের ধর্ম্ম, তথাপি তাহা স্বামীর বলিয়া ব্যবহৃত হইয়া থাকে, ("অমুক রাজা জয়লাভ করিয়াছেন," "অমুক পরাজিত হইয়াছেন" হয়ত উভয় রাজাই সংগ্রামক্ষেত্রে পদার্পণও করেন নাই), ঐরূপ ব্যবহারের কারণ জয় ও পরাজয়ের ফলভোগ (রাজ্য-লাভ, রাজ্যনাশ) স্বামীরই হইয়া থাকে; তদ্রূপ বন্ধ ও মোক্ষ বস্তুতঃ বুদ্ধিতেই থাকে, পুরুষে ফলভোগ করে বলিয়া তাহার মিথ্যা ব্যবহার হইয়া থাকে। ভোগাপবর্গ-রূপ পুরুষার্থ সম্পাদন করা শেষ না হওয়াই বুদ্ধির বন্ধ, উহার পরিসমাপ্তিই মোক্ষ। এই-রূপে বুদ্ধিতে বর্ত্তমান গ্রহণাদি ধর্ম্মও পুরুষে আরোপিত হইয়া থাকে; কারণ পুরুষ উহার ফলভোগ করে। স্বরূপতঃ অর্থজ্ঞানকে গ্রহণ বলে, স্মৃতির নাম ধারণ, পদার্থ সকলের বিশেষ তর্কের নাম উহ, পদার্থে সমারোপিত (ভ্রান্তি কল্পিত) ধর্ম্মের নিরাস করাকে অপোহ বলে, উক্ত উহ ও অপোহ দ্বারা পদার্থের অবধারণকে তত্ত্বজ্ঞান বলে, উক্ত তত্ত্বজ্ঞান হইলে এইটী করিব কি না, ইহার স্থিরতার নাম অভিনিবেশ"। (পণ্ডিত পূর্ণচন্দ্র বেদান্ত চুঞ্চুর অনুবাদ হইতে গৃহীত)।

পাতঞ্জল দর্শনের দ্বিতীয় সূত্র এই:—

"বিশেষাবিশেষলিঙ্গমাত্রালিঙ্গানি গুণপর্ব্বাণি।" (২।১৯)।

অর্থাৎ বিশেষ, অবিশেষ, লিঙ্গমাত্র ও অলিঙ্গ এই সকল গুণপর্ব্ব। ইহার ব্যাস ভাষ্যের অনুবাদ এইরূপ:—

"আকাশ বায়ু অগ্নি জল ও ভূমি—এই পঞ্চ ভূত—বিশেষ।

"শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ—এই পঞ্চ তন্মাত্রা—অবিশেষ। পঞ্চভূত ইহাদেরই বিশেষ।

"সেইরূপ মন ও দশ ইন্দ্রিয়—ইহারা বিশেষ। আর ইহাদের কারণ অস্মিতা লক্ষণ অহঙ্কার—অবিশেষ।

"অতএব অবিশেষ ছয়টী, পঞ্চতন্মাত্র ও অস্মিতা (অহঙ্কার)। অতএব গুণ সকলের এই ছয়টী অবিশেষ পরিণাম। আর উক্ত দশ ইন্দ্রিয় মন ও পঞ্চভূত এই ষোড়শ বিশেষ পরিণাম।

"মহৎ বা বুদ্ধিতত্ত্ব হইতে উক্ত ছয় অবিশেষের পরিণাম হয়।

"এই অবিশেষ সকলের পর যে মহত্তত্ত্ব—তাহা লিঙ্গ মাত্র। উক্ত অবিশেষ এই লিঙ্গ মাত্র বুদ্ধি তত্ত্বে অবস্থান পূর্ব্বক বিবৃদ্ধির চরম-সীমা প্রাপ্ত হয়। ইহারা সত্ত্বমাত্রাত্মক মহত্তত্ত্বে লীয়মান হইলে তাহাতেই অবস্থান করে। তদাত্মকত্ব প্রাপ্ত হয়। সেই অবস্থায় তাহারা নিঃসত্ত্বাসত্ত্ব, নিঃসদসৎ, নিরসৎ হইয়া প্রধান বা অব্যক্তে প্রলীন হয়। অবিশেষ সকলের মহত্তত্ত্বে যে পরিণাম, তাহা লিঙ্গ মাত্র পরিণাম। আর নিঃসত্ত্বাসত্ত্ব যে পরিণাম—অব্যক্তে লীন অবস্থায় তাহা অলিঙ্গ পরিণাম। এই অলিঙ্গ অবস্থা নিত্য, তাহা পুরুষার্থের হেতু নহে। আর বিশেষ অবিশেষ ও লিঙ্গ অবস্থা অনিত্য, তাহাই পুরুষার্থের হেতুভূত।"

"গুণ সকল সর্ব্বধর্ম্মানুপাতী, তাহারা প্রত্যস্তমিত বা উপজাত হয় না। গুণাশ্রয়ী, আগমাপায়ী, অতীত ও অনাগত ব্যক্তির দ্বারা গুণত্রয় উৎপত্তি-বিনাশশীলের ন্যায় প্রত্যবভাসিত হয়। গুণত্রয় লিঙ্গ (মহৎ) অবস্থায় অলিঙ্গের প্রত্যাসন (কার্য্য)। অলিঙ্গাবস্থায় তাহা সংসৃষ্ট থাকিয়া ব্যক্তাবস্থার ক্রমাগতক্রম হেতু বিবিক্ত বা ভিন্ন হয়। সেইরূপ অবিশেষ লিঙ্গমাত্রে সংসৃষ্ট থাকিয়া ভিন্ন হয়। এই পরিণাম ক্রম নিয়ম হইতেই বিশেষ সকল অবিশেষ সংসৃষ্ট বলিয়া বিভক্ত বা ব্যক্ত হয়। বিশেষের পর আর কোন পরিণাম নাই।" (সাংখ্য সূত্র "অবিশেষাৎ বিশেষারম্ভঃ" এ সম্বন্ধে দ্রষ্টব্য)।

ইহার সংক্ষিপ্ত অর্থ এই যে, মূল প্রকৃতি ত্রিগুণের অলিঙ্গাবস্থা। মহত্তত্ত্ব বা বুদ্ধিতত্ত্ব তাহাদের লিঙ্গ মাত্র অবস্থা, বুদ্ধিতত্ত্ব হইতে অভিব্যক্ত অহঙ্কার ও অহঙ্কার হইতে অভিব্যক্ত পঞ্চতন্মাত্র এই ছয়টী অবিশেষ অবস্থা। আর মন দশ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চভূত এই প্রকৃতির ষোড়শ বিকার তাহাদের বিশেষাবস্থা। ইহারা এক অর্থে পরস্পর কার্য্যকারণরূপে সম্বদ্ধ। ত্রিগুণের অলিঙ্গাবস্থা—মূলকারণাবস্থা; তাহার কারণান্তর নাই। তাহা লিঙ্গের কারণ। লিঙ্গ তাহার কার্য্য। সেইরূপ ত্রিগুণের অবিশেষ অবস্থার কারণ এই লিঙ্গাবস্থা, আর তাহার কার্য্য ত্রিগুণের বিশেষ বা ব্যক্তাবস্থা। এই বিশেষ বা ব্যক্তাবস্থা কার্য্য আর কাহারও কারণ নহে।

এইরূপে মূল সাংখ্য গ্রন্থে ত্রিগুণের তত্ত্ব বিবৃত হইয়াছে। এই সাংখ্য শাস্ত্র ব্যতীত অন্যান্য শাস্ত্রে এই ত্রিগুণ তত্ত্বের উল্লেখ আছে। বাহুল্য ভয়ে আমরা কেবল মহাভারতের অনুগীতায় ও মনুসংহিতায় ত্রিগুণ সম্বন্ধে যাহা উক্ত হইয়াছে, তাহা ব্যতীত অন্য কিছু উদ্ধৃত করিব না। অনুগীতায় আছে—

"তমো রজস্তথা সত্ত্বং গুণানেতান্ প্রচক্ষতে।
অন্যোন্যমিথুনাঃ সর্ব্বে তথান্যোন্যানুজীবিনঃ॥
অন্যোন্যাপাশ্রয়াশ্চাপি তথান্যোন্যানুবর্ত্তিনাঃ।
অন্যোন্যব্যতিষক্তাশ্চ ত্রিগুণাঃ পঞ্চধাতবঃ॥
তমসো মিথুনং সত্ত্বং সত্ত্বস্য মিথুনং রজঃ।
রজসশ্চাপি সত্ত্বং স্যাৎ সত্ত্বস্য মিথুনং তমঃ॥
নিয়ম্যতে তমো যত্র রজস্তত্র প্রবর্ত্ততে।
নিয়ম্যতে রজো যত্র সত্ত্বং তত্র প্রবর্ত্ততে॥
নিশাত্মকং তমো বিদ্যাৎ ত্রিগুণং মোহসংজ্ঞিতম্।
অধর্ম্মলক্ষণঞ্চৈব নিয়তং পাপকর্ম্মসু॥
প্রকৃত্যাত্মকমেবাহ রজঃপর্য্যায়কারণম্।
প্রবৃত্তং সর্ব্বভূতেষু দৃশ্যমুৎপত্তিলক্ষণম্॥
প্রকাশং সর্ব্বভূতেষু লাঘবং শ্রদ্দধানতা।
সাত্ত্বিকং রূপমেবন্তু লাঘবং সুখসম্মিতম্॥
এতেষাং গুণতত্ত্বানি বক্ষ্যন্তে তত্ত্বহেতুভিঃ।"

মনুসংহিতায় উক্ত হইয়াছে—

"সত্ত্বং রজস্তমশ্চৈব ত্রীন্ বিদ্যাদাত্মনো গুণান্।
যৈর্ব্যাপ্যেমান স্থিতো ভাবান্ মহান্ সর্ব্বানশেষতঃ॥
যো যদৈষাং গুণো দেহে সাকল্যেনাতিরিচ্যতে।
স তদা তদ্গুণপ্রায়ং তং করোতি শরীরিণম্॥
সত্ত্বং জ্ঞানং তমোঽজ্ঞানং রাগদ্বেষৌ রজঃ স্মৃতম্।
এতদ্ব্যাপ্তিমদেতেষাং সর্ব্বভূতাশ্রিতং বপুঃ॥
তত্র যৎ প্রীতিসংযুক্তং কিঞ্চিদাত্মনি লক্ষয়েৎ।
প্রশান্তমিব শুদ্ধাভং সত্ত্বং তদুপধারয়েৎ॥
যৎ তু দুঃখসমাযুক্তমপ্রীতিকরমাত্মনঃ।
তদ্রজোঽপ্রতিঘং বিদ্যাৎ সততং হারি দেহিনাম্॥
যৎ তু স্যান্মোহসংযুক্তমব্যক্তং বিষয়াত্মকম্।
অপ্রতর্ক্যমবিজ্ঞেয়ং তমস্তদুপধারয়েৎ॥"

ত্রয়াণামপিচৈতেষাং গুণানাং যঃ ফলোদয়ঃ।
অগ্র্যো মধ্যো জঘন্যশ্চ তং প্রবক্ষ্যাম্যশেষতঃ॥
বেদাভ্যাসস্তপো জ্ঞানং শৌচমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ।
ধর্ম্মক্রিয়াত্মচিন্তা চ সাত্ত্বিকং গুণলক্ষণম॥
আরম্ভরুচিতাধৈর্য্যম অসৎকার্য্যপরিগ্রহঃ।
বিষয়োপসেবাচাজস্রং রাজসং গুণলক্ষণম্॥
লোভঃ স্বপ্নোঽধৃতিঃ ক্রৌর্য্যং নাস্তিক্যং ভিন্নবৃত্তিতা।
যাচিষ্ণুতা প্রমাদশ্চ তামসং গুণলক্ষণম্॥

* * *

তমসো লক্ষণং কামো রজসস্ত্বর্থ উচ্যতে।
সত্বস্য লক্ষণং ধর্ম্মঃ শ্রৈষ্ঠ্যমেষাং যথোত্তরম্॥
দেবত্বং সাত্ত্বিকা যান্তি মনুষ্যত্বঞ্চ রাজসাঃ।
তির্য্যক্ত্বং তামসা নিত্যমিত্যেষা ত্রিবিধা গতিঃ॥"

মনুসংহিতা দ্বাদশ অধ্যায়, ২৪—৪০ শ্লোক।

এই ত্রিগুণের কার্য্য সম্বন্ধে শঙ্করাচার্য্য তাঁহার বিবেক চূড়ামণিগ্রন্থে (১১২—১২২ শ্লোকে) যাহা বলিয়াছেন, তাহাও এস্থলে উদ্ধৃত হইল—

শুদ্ধাদ্বয় ব্রহ্মবিবোধনাশ্যা সর্পভ্রমো রজ্জুবিবেকতো যথা।
রজস্তমঃ সত্ত্বমিতি প্রসিদ্ধা গুণাস্তদীয়াঃ প্রথিতৈঃ স্বকার্য্যৈঃ॥ ১১২
বিক্ষেপশক্তী রজসঃ ক্রিয়াত্মিকা যতঃ প্রবৃত্তিঃ প্রসৃতা পুরাণী।
রাগাদয়োঽস্যাঃ প্রভবন্তি নিত্যং দুঃখাদয়ো যে মনসো বিকারাঃ॥ ১১৩
কামঃ ক্রোধো লোভদম্ভাভ্যসূয়াঽহঙ্কারের্ষ্যা-মৎসরাদ্যাস্তু ঘোরাঃ।
ধর্ম্মা এতে রাজসাঃ পুংপ্রবৃত্তি র্যস্মাদেতৎ তদ্রজো বন্ধহেতুঃ॥ ১১৪
এষাবৃতির্নাম তমোগুণস্য শক্তির্যয়া বস্ত্ববভাসতেঽন্যথা।
সৈষা নিদানং পুরুষস্য সংসৃতের্বিক্ষেপশক্তেঃ প্রসরস্য হেতুঃ॥ ১১৫

প্রজ্ঞাবানপি পণ্ডিতোঽপি চতুরোঽপ্যত্যন্ত-সূক্ষ্মাত্মদৃক্।
ব্যালীঢ়স্তমসা ন বেত্তি বহুধা সংবোধিতোঽপি স্ফুটম্।
ভ্রান্ত্যারোপিতমেব সাধু কলয়ত্যালম্বতে তদ্গুণান্
হন্তাসৌ প্রবলা দুরন্ততমসঃ শক্তির্মহত্যাবৃতিঃ॥ ১১৬
অভাবনা বা বিপরীতভাবনা সম্ভাবনা বিপ্রতিপত্তিরস্যাঃ।
সংসর্গযুক্তং ন বিমুঞ্চতি ধ্রুবং বিক্ষেপশক্তিঃ ক্ষপয়ত্যজস্রম্॥ ১১৭
অজ্ঞানমালস্যজড়ত্বনিদ্রা প্রমাদমূঢ়ত্বমুখা-স্তমোগুণাঃ।
এতৈঃ প্রযুক্তো ন হি বেত্তি কিঞ্চিন্নিদ্রালুবৎ স্তম্ভবদেব তিষ্ঠতি॥ ১১৮
সত্ত্বং বিশুদ্ধং জলবৎ তথাপি, তাভ্যাং মিলিত্বা সরণায় কল্পতে।
যত্রাত্মবিম্বঃ প্রতিবিম্বিতঃ সন্ প্রকাশয়ত্যর্ক ইবাখিলং জড়ম্॥ ১১৯
মিশ্রস্য সত্ত্বস্য ভবন্তি ধর্ম্মাস্ত্বমানিতাদ্যা নিয়মা যমাদ্যাঃ।
শ্রদ্ধা চ ভক্তিশ্চ মুমুক্ষুতা চ, দৈবী চ সম্পত্তি-রসন্নিবৃত্তিঃ॥ ১২০
বিশুদ্ধসত্ত্বস্য গুণাঃ প্রসাদঃ স্বাত্মানুভূতিঃ পরমা প্রশান্তিঃ।
তৃপ্তিঃ প্রহর্ষঃ পরমাত্মনিষ্ঠা, যয়া সদানন্দরসং সমৃচ্ছতি॥ ১২১
অব্যক্তমেতত্ত্রিগুণৈর্নিরুক্তং তৎকারণং নাম শরীরমাত্মনঃ।
সুষুপ্তিরেতস্য বিভক্ত্যবস্থা প্রলীনসর্ব্বেন্দ্রিয়-বুদ্ধিবৃত্তিঃ॥ ১২২

তত্ত্ব জ্ঞান—এইরূপে ত্রিগুণ-দ্বারা জীবের বন্ধন-তত্ত্ব আমরা এই সকল

শাস্ত্র হইতে জানিতে পারি। গীতায় কোন্ গুণ কি ভাবে জীবকে আবদ্ধ করে, কোন্ গুণ কিরূপে প্রবল হয় এবং কোন্ গুণের প্রবৃদ্ধিকালে কিরূপ গতি হয় ও পরে কিরূপ জীব যোনিতে জন্মগ্রহণ হয়, তাহা গীতায় যেরূপ উপদিষ্ট হইয়াছে, সেইরূপ সাংখ্যদর্শনে এবং পুরাণাদি অন্যান্য শাস্ত্রেও উল্লিখিত হইয়াছে, তাহা আমরা জানিতে পারি। কিন্তু এই তিন গুণের প্রকৃত স্বরূপ কি? এবং তাহাদের মূল কারণ কি? সে সমুদায় তত্ত্ব আমরা ইহা হইতে ঠিক জানিতে পারি না। ত্রিগুণ হইতে কিরূপে সৃষ্টি অভিব্যক্ত হয় ও কিরূপে নিয়মিত হয়, তাহা বুঝিতে হইলে এবং এই ত্রিগুণদ্বারা আমরা কেন বদ্ধ হই, তাহা বুঝিতে হইলে, ত্রিগুণের মূল তত্ত্ব জানিতে হয়।

বলিয়াছি ত, সাংখ্য শাস্ত্রে এই ত্রিগুণতত্ত্ব প্রথমে সূচিত হইয়াছে। সাংখ্যশাস্ত্রে এই ত্রিগুণের স্বরূপ কি, তাহা নির্ণীত হইয়াছে। সাংখ্যশাস্ত্র প্রধানতঃ অনুমানমূলক। অনুমান-প্রমাণের উপরই সাংখ্যদর্শনে ত্রিগুণ প্রভৃতির তত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। অনুমান-প্রমাণ দ্বারাই সাংখ্যশাস্ত্রে ত্রিগুণের স্বরূপ বুঝাইবার চেষ্টা করা হইয়াছে। এই জগতে বিশেষতঃ আমাদের অন্তঃকরণে সর্ব্বত্র তিন প্রকার বিভিন্নভাবের অভিব্যক্তির অনুভব হইতে তাহাদের মূল কারণ রূপে এই ত্রিগুণের স্বরূপ অনুমিত হইয়াছে। আধুনিক বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতগণ যেমন প্রত্যক্ষ ও পরীক্ষাদ্বারা নানারূপ বাহ্যঘটনা (Phenomena) আলোচনা পূর্ব্বক, তাহাদের সাধর্ম্ম্য বৈধর্ম্ম্য বিচার পূর্ব্বক তাহাদের সামান্য ও বিশেষ স্থির করিয়া শ্রেণীবিভাগ করেন এবং তাহাদের কারণ বিভিন্নরূপ শক্তির অনুমান করেন, সেইরূপ সাংখ্যশাস্ত্রও আমাদের বাহিরের ও অন্তরের বিভিন্ন ভাব সকলকে বা দৃশ্যকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করেন, কতকগুলি ভাবকে (phenomena) সাত্ত্বিক ভাব, কতকগুলিকে রাজসিকভাব ও কতকগুলিকে তামসিকভাব, এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করেন। সাংখ্যদর্শনের সৎকার্য্যবাদ অনুসারে কার্য্য কারণে বীজভাবে থাকে এবং কার্য্যের সহিত কারণ নিয়ত সংশ্লিষ্ট থাকে। যাহা কারণে নাই, তাহা কার্য্যে অভিব্যক্ত হইতে পারে না। উপযুক্ত কার্য্যের অবশ্য উপযুক্ত কারণ থাকে। এই জন্য এই ত্রিবিধ ভাবের অবশ্য তিনটী উপযুক্ত মূল কারণ আছে, আর একই মূল কারণে এই ত্রিবিধ ভাবের মূল আছে, ইহা সাংখ্যশাস্ত্র সিদ্ধান্ত করেন। আমরা এই মূল কারণকে প্রত্যক্ষ করিতে না পারিলেও এইরূপে তাহা অনুমান করিতে পারি। সাংখ্যাচার্য্যগণ জগতের মূলকারণ যে ত্রিগুণ, তাহা অনুমান দ্বারাই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। তাঁহারা কেবল আমাদের মধ্যে যে বিভিন্ন ভাবের অভিব্যক্তি অনুভূত হয়, তাহাদিগকে তিনভাগে বিভক্ত করিয়া তাহার মূলকারণ-রূপে এই ত্রিগুণ অনুমান করেন নাই। তাঁহারা এই জগতের সৃষ্টি স্থিতি লয় ব্যাপার এবং তাহার যে অসংখ্যভাব, তাহাও এইরূপে তিনভাগে বিভক্ত করিয়া তাহার মূল কারণ রূপে এই ত্রিগুণ অনুমান করিয়াছেন। কিন্তু এই অনুমান যথেষ্ট নহে এবং ইহা হইতে এই ত্রিগুণের স্বরূপ ঠিক বুঝা যায় না। সাংখ্যাচার্য্যগণও যে ত্রিগুণ সম্বন্ধে বিভিন্নরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, ইহা আমরা দেখিয়াছি।

কোন কোন সাংখ্যাচার্য্য এই অনুমান ব্যতীত যোগজ প্রত্যক্ষের উপর নির্ভর করিয়া

এই ত্রিগুণের স্বরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। বিশেষ সাংখ্য যোগশাস্ত্র পাতঞ্জল দর্শন যোগাবস্থায় চিত্তের প্রমাণাদি বৃত্তি নিরোধ করিয়া দ্রষ্টা স্বরূপে অবস্থান পূর্ব্বক এই দৃশ্য জগতের বিশেষ, অবিশেষ, লিঙ্গ ও অলিঙ্গ; এই চারি অবস্থা প্রত্যক্ষ করিবার উপদেশ দিয়াছেন। এই অলিঙ্গ অবস্থা বা মূল কারণ অবস্থা যে ত্রিগুণময়ী প্রকৃতি তাহার ও স্বরূপ যোগ দ্বারা প্রত্যক্ষ করিবার কথা বলিয়াছেন, বেদান্তদর্শনেও নিদিধ্যাসন-তত্ত্ব দর্শনের প্রধান উপায় বলিয়া উক্ত হইয়াছে। যাহা হউক, সে কথা এস্থলে বুঝিবার প্রয়োজন নাই।

শ্রীদেবেন্দ্রবিজয় বসু।

বিবাহের উপদেশ। (১)

গিরিধি, ৭ই জ্যৈষ্ঠ, মঙ্গলবার, ১৩২৫।

মা শোভা, বাবা শিবেশ, আজ তোমাদের দাম্পত্য-জীবনের মহা-চিত্রাঙ্কন দেখিয়া আমি ধন্য হইলাম। বিধাতা তোমাদের এই চিত্রে আশীর্ব্বাদ বর্ষণ করুন।

যে ভারতবর্ষে কামিনী-কাঞ্চন-ত্যাগ-মন্ত্রই ধর্ম্মের চরমোৎকর্ষ বলিয়া ঘোষিত হইয়াছে, সেই দেশেই আসক্তি-বৈরাগ্য-সাধনই মহা কৈবল্য-সাধনের মূল মন্ত্র বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে। সন্ন্যাসের আশ্রয়ই গৃহস্থাশ্রম। সংসারকে জয় করিতে পারিলেই সন্ন্যাসের অধিকার জন্মে; রাজর্ষি জনকের জীবনে আমরা ইহাই শিক্ষা করিয়াছি, মনুর মানবশাস্ত্রে ইহাই অধ্যয়ন করিয়াছি, এবং হরগৌরীর সম্মোহান্বিত যোগ-জীবনে ইহাই পাঠ করিয়াছি। শুধু সংসার নয়, স্বর্গের আস্বাদনও গ্রহণ করিতে হইবে; শুধু আসক্তি নয়, বৈরাগ্যেও আত্মনিমজ্জন কৈবল্য-সাধনের সোপান, ইহা সর্ব্বদা স্মরণ রাখিতে হইবে। দাম্পত্য-জীবন কৈবল্য-সাধনের মূল সোপান।

প্রেম-সাধন ভিন্ন কৈবল্য-সাধন কল্পনার কথা, লীলাশুকের জীবনে আমরা এই তত্ত্বই শিক্ষা করিয়াছি। ব্রাহ্মসমাজ এই জন্যই প্রেম-সাধন ভিন্ন ধর্ম্মসাধন অসম্ভব, এই কথা ঘোষণা করিয়া আসিয়াছেন। ভক্ত কেশব-জীবন আমাদের নিয়ত অনুধ্যানের বিষয় এই জন্য যে, তিনি এই পথকেই ধর্ম্মের চরমোৎকর্ষের পথ বলিয়া ঘোষণা করিয়া গার্হস্থ্য-ধর্ম্ম-শাস্ত্র রচনা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার অহেতুকী আদর্শ জীবন তোমাদের কৈবল্য-সাধনের পরম সহায় হউক।

তোমরা উভয়েই সুশিক্ষিত, আমার কথার নিগূঢ়-তত্ত্ব অবশ্যই তোমরা আয়ত্ত করিতে পারিতেছ। প্রেমের সাধন সীমায় আবদ্ধ, অসীমে পরিব্যাপ্তি। প্রথমে কূপ, পরে মহা সমুদ্র। সীমাই অসীমের ইঙ্গিত। এই গূঢ়-তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিয়া সাধনার পথে নির্ভয়ে তোমরা অগ্রসর হইবে। সাবধান, সীমাতে আবদ্ধ হইয়া থাকিও না, অসীমের অসীমত্বে আত্ম নিমজ্জনের জন্য সর্ব্বদা ব্যাকুলিত হইবে।

জানিও, দানেই প্রাপ্তির মূল-সূত্র গ্রথিত। জানিও আত্মদান না করিলে পর-প্রাপ্তি হয় না। কার্পণ্য অহঙ্কারের মূল সোপান। তাঁহাতে কখনও তোমরা সন্তুষ্ট থাকিও না।

দিতে দিতে দিতে—প্রাপ্তির মহাসিন্ধুর দিকে ছুটিবে। "তৃণাদপি সুনীচেন" মন্ত্র এই সাধনের পরম সহায় বলিয়া মনে রাখিবে। এই মর্ত্ত্যই পরম দেবতার প্রকট মূর্ত্তি, তিনি নরনারায়ণ রূপে সদা বিরাজিত, এই মূর্ত্তি সদা অনুধ্যান করিতে করিতে, ভালবাসার সূক্ষ্ম পথ ধরিয়া আত্মত্যাগরূপ মহা-বৈরাগ্যে উপনীত হওয়ার জন্য কঠোর সাধনা করিবে। দাম্পত্য-জীবন তোমাদের মহা কৈবল্য-সাধনের সহায় হউক।

বাবা শিবেশ, তুমি আদর্শ কুলের আদর্শ সন্তান, ব্রহ্ম-কৃপা-সরসীতে স্নাত হইয়া, স্ব-ইচ্ছায় এবং স্ব-মতে আজ যে মহা ব্রত গ্রহণ করিলে, এই ব্রত পালনে সদা কায়মনোবাক্যে বিধাতার নিকট প্রার্থনা করিবে। অন্যকে হৃদয়ে গ্রহণ করিতে পারিলে নর-নারায়ণ-মন্ত্রে দীক্ষা লাভ করা যায়, দাম্পত্য-জীবনের প্রথম শিক্ষা এই। দ্বিতীয় শিক্ষা, দাম্পত্য-জীবন-দর্পণে সকল নরনারীর সমবেত-শক্তি প্রতি-বিম্বিত দেখিতে পারিলে, আত্ম-ত্যাগ-মন্ত্র সহজ-সাধ্য হয়। তুমি সর্ব্বদা ইহা স্মরণ রাখিবে, বর্জ্জনের জন্য দাম্পত্য-জীবন নয়, সকলকে আত্মস্থ করিবার জন্য দাম্পত্য-জীবন। কিন্তু সকলকে গ্রহণ করিবার সময় মতের বিশুদ্ধতা রক্ষা করিয়া চলিবে। পাপ-পুণ্যের ভেদাভেদ, ধর্ম্মাধর্ম্মের বিশেষত্ব কখনও ভুলিও না। পূত-প্রেম-গঙ্গায় স্নাত হইবে, কিন্তু পঙ্কিল পঙ্কে নিমগ্ন হইবে না। পূজ্যপাদ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ বলিয়া গিয়াছেন, পবিত্রতা সাধন ভিন্ন কখনও ধর্ম্মসাধন হয় না। ভক্তিভাজন ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র বলিয়া গিয়াছেন, চরিত্র লাভই ধর্ম্মসাধনের মূল সোপান। মানুষকে ভালবাসিবে, কিন্তু পবিত্রতাকে হারাইবে না। অজেয়ত্ব লাভ করিবার জন্য কঠোর ব্রত গ্রহণ করিবে। ব্রহ্মানন্দ বলিয়াছেন, স্বাধীনতা ও স্বেচ্ছা-চারিতা এক নহে। মতের বিশুদ্ধতা রক্ষা করিবার জন্য দেহপাতেও বিমুখ হইবে না। সকল চূর্ণ হইয়া গেলেও স্বর্গকে রাজত্ব করিতে দিবে। ঈশা, মুশা, মহম্মদ, নানক, কবির, শাক্য, চৈতন্য, রামকৃষ্ণ, ব্রহ্মানন্দ—সকলেই আমাদের সহায়, কিন্তু কেহই আমাদের লক্ষ্য নন্, সর্ব্বদা স্মরণ রাখিবে, আমাদের লক্ষ্য একমাত্র মহান ঈশ্বর। কেন্দ্রের নিত্যযোগের কথাটা আজ মনে বড়ই শুনিতেছি। সাবধান, সর্ব্বঘটে মায়ের প্রকাশ দেখিবে, কিন্তু কেন্দ্রে, সীমায়, ক্ষুদ্রত্বে কখনও আবদ্ধ হইবে না। রাজর্ষি রামমোহন, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র, ঋষি গৌরগোবিন্দ, রাজনারায়ণ, রামতনু, সাধু অঘোর, বিজয়, কান্তি, সকলের সার সাধনার লক্ষ্য মহান ঈশ্বরকে কখনও সিংহাসন-চ্যুত হইতে দিবে না। তাঁহার সহিতই নিত্যযোগ সংস্থাপন করিবে, অন্য কাহারও সঙ্গে নয়। নববিধানের সর্ব্বধর্ম্ম-সমন্বয়কে কেশব-কেন্দ্রে আবদ্ধ হইতে দিবে না। মহান ঈশ্বর মহান—চিরমহান,—তুলনা-রহিত, এক অদ্বিতীয়—এই শিক্ষাতে লক্ষ্য স্থাপন করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্মের বিজয় নিশান হস্তে ধারণ করিয়া নির্ভয়ে অগ্রসর হও। বল, জয়, শুধু ব্রহ্ম কৃপারই জয়। সহজ সাধন তোমার জীবনের অক্ষয় ভূষণ হউক। এই মহা সাধনে শোভাকে অর্দ্ধাঙ্গীরূপে সহায় জানিয়া আদর করিবে। তোমার নবজীবন-লাভে নিরাভরণা শোভা তোমার অতুল সহায় হউক।

মা শোভা, তুমি কন্যারূপে পিতৃ-মাতৃ-কুলকে উজ্জ্বল করিয়াছ, তুমি মাতৃরূপে পিতা-মাতার সেবা করিয়া নারী জন্মকে

সার্থক করিয়াছ। এখন পত্নীরূপে স্বামী এবং স্বামীর বংশকে উজ্জ্বল করিতে নির্ম্মল-চিত্তে অগ্রসর হও। ছোট্‌কু বলিয়াছিল—"তুমি বল একটী একটী, আমার ত সকলই আছে।" এ কথা, বোধ করি, তোমার মনে আছে। ছোট্‌কুর কথাকে অন্তরে গাঁথিয়া লও এবং তোমার মা বিরজা এবং মামী কমল-কামিনীর সেবাপরায়ণতাকে জীবনের সম্বল করিয়া লও। আমরা সকলেই দরিদ্র—তোমাকে সংসারের বেশভূষায় আর কি সাজাইতে পারি? আমি বড় সাধে তোমার নাম "শোভা" রাখিয়াছিলাম, সে এজন্য নয় যে, সংসার-শোভায় তুমি চিরভূষিতা, কিন্তু তাহা এই জন্য যে, তুমি আন্তর-শোভায় অপরূপ সজ্জিতা। প্রেম ও দয়া তোমার হৃদয়ের ভূষণ, সেবা ও পরিচর্য্যা তোমার হস্তের ভূষণ, পবিত্রতা ও সংযম তোমার অন্তরের ভূষণ, নির্লিপ্ততা ও অনাসক্তি তোমার বাহিরের ভূষণ; বিশ্বাস, ভক্তি এবং জিতেন্দ্রিয়তা তোমার আন্তর-বাহ্য-রূপ। এই জন্যই তুমি "শোভা"। "পুণ্যপ্রভা" শুধু পুণ্যের প্রভা, তুমি সর্ব্ব-গুণের "শোভা"। তুমি পিতা মাতা, মামা মামীর অক্ষয় "শোভা"। সাবধান, তোমার "শোভা" যেন কখনও মলিন না হয়। বাহ্য-নির্ব্বাণ, আন্তর-উজ্জ্বল তোমার জীবনের বিশেষত্ব। তোমার মাতা ও মাতুলানীর অক্ষয় চরিত্র ও পুণ্যবল এবং অপরাজিত বিশ্বাস ভক্তি যেন তোমার চিরসম্বল থাকে। দেখিও, তোমার দুর্নামে যেন তোমার পিতামাতার সুনামে কলঙ্ক না স্পর্শে। সাবধান, সাবধান। আমাদের সকল দুষ্কৃতি, সকল দুর্নীতি তোমার মায়ের শ্মশানে আজ ফেলিয়া যাও, আজ শুধু তোমার সম্বল হউক, তোমার মা ও মাতু-লানীর নিষ্কলঙ্ক প্রেম ও পুণ্য। তোমার জীবন যেন আদর্শ জীবন হয়, তোমার অন্তরের ঔজ্জ্বল্যে যেন শিবেশের জীবন উজ্জ্বল হয়।

ব্রাহ্মসমাজের নানা-গণ্ডী-মাহাত্ম্য আমি অস্বীকার করি না, কিন্তু দলাতীত হইতে চিরদিন কঠোর সাধনা করিয়া আসিয়াছি। এখন এই বার্দ্ধক্যে উপনীত হইয়া ইহাই বুঝিতেছি, হিন্দু-মুসলমান-খ্রীষ্টান সকল দলই লক্ষ্য, সকল দলই পূজ্য, কিন্তু গণ্ডী-মাহাত্ম্য আমাদের লক্ষ্য নয়। গণ্ডীর অতীত হইয়া, দলাদলির উপরে উঠিয়া বিশ্ব-বিজয়-প্রেম-মন্ত্র সাধন করিতে হইবে। তোমার উপর আমার অনেক আশা ভরসা আছে বলিয়া বলিতেছি, দল ও গণ্ডীর মাহাত্ম্য স্বীকার করিয়াও দলাদলির অতীত হইতে চেষ্টা করিবে। সকল ধর্ম্ম-সমন্বয়ই কেশবচন্দ্রের লক্ষ্য ছিল, কিন্তু কেশব-কেন্দ্রের নিত্যযোগের কথা আজকাল শুনিয়া মর্ম্মে বড় আঘাত পাইয়া তোমাকে সাবধান করিয়া দিতেছি। যে অবতারবাদ তোমার পিতামাতা, মামা-মামী পরিত্যাগ করিয়াছেন, সেই অবতারবাদের পঙ্কিলতায় আবার ডুবিও না। আমার বড় ভয় হইতেছে, মা আজ তাই তোমাকে সতর্ক করিয়া দিতেছি; সাধু ভক্তদিগকে সর্ব্বপ্রযত্নে আদর করিবে, কিন্তু কোন ব্যক্তিকে অবতাররূপে গ্রহণ করিবে না। সর্ব্বঘটে যিনি, তাঁহাকে সর্ব্বঘটেই দেখিবে। ইচ্ছার সমত্ব সাধনের জন্য বহুর সহিত মিলন, আবার বহুত্বরূপীকে নিজ ইচ্ছায় মিলাইয়া পুণ্য সাধনায় জয়ী হইয়াই সাধনমার্গ। নিজ ইচ্ছাকে বিধাতার ইচ্ছায় মিলাইলেই পুণ্য সঞ্চয় হয়। কেন্দ্রে, সীমায়, ক্ষুদ্রত্বে, কোন বস্তুতে বা কোন কালে তাঁহাকে আবদ্ধ করিবে না। তিনি সকলে, আবার তিনি সকলের অতীত। তোমার পিতৃ এবং

মাতৃকুলের বিশেষত্ব এই, এক ঈশ্বরই লক্ষ্য, কোন উপদেবতা নয়। তুমি দুই কুলের মহা পুণ্যের ফলরূপে অবতীর্ণা, মা, দেখিও, নববিধান স্বীকার করিতে যাইয়া কেন্দ্র মাহাত্ম্য স্বীকার করিও না। আমি আবাল্য নববিধানের সমন্বয়ের পক্ষপাতী, কিন্তু কেন্দ্র-মাহাত্ম্য স্বীকার করিতে পারি না। যদি তুমি তা' কর, আমাদের মুখে চুণ কালী পড়িবে, শেষ জীবনে অশেষ ক্লেশ পাইব। অতএব সাবধান, সাবধান। তোমার সম্মুখে অনন্ত স্বর্গ, অনন্ত কৈবল্য—ঐ অনন্তের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া শিবেশ-শক্তিতে মাতিয়া স্বর্গ এবং কৈবল্যের পথে নির্ভয়ে যাত্রা কর। এ পথের সম্বল কেবল ব্রহ্মকৃপা। ব্রহ্মকৃপাকে অক্ষয় কবচরূপে অঞ্চলে ধারণ করিয়া নির্ভয়ে অগ্রসর হও। মা জগজ্জননী তোমাদের সহায় হউন।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

বিবাহের উপদেশ। (২)

গিরিডি, ৮ই জ্যৈষ্ঠ, বুধবার, ১৩২৫।

বাবা সত্যশরণ, মা সুপ্রভা, তোমরা পবিত্রস্বরূপ মহান ঈশ্বরকে ও বন্ধুগণকে সাক্ষী করিয়া যে পবিত্র উদ্বাহ-ব্রত গ্রহণ করিলে, তাহার গুরুত্ব এবং মাধুর্য্য আজ বিশেষ ভাবে হৃদয়ঙ্গম কর। বড়ই অনুকূল সময়, বড়ই অনুকূল মিলন। আজ বিশ্বপতির জয় জয়কার হউক।

আমি কাল শোভা ও শিবেশকে নববিধান-ব্রাহ্ম-সমাজের ভয়ের কথা বলিয়াছি। আজ তোমাদিগকে সাধারণ-ব্রাহ্মসমাজের ভয়ের কথা বলিতেছি। কন্যাকার কথায় কেহ কেহ বিরক্ত হইয়া থাকিলেও তোমরা বিরক্ত হইও না, কেন না, আমার জীবন শেষ হইয়া আসিয়াছে, যাহা যাহাকে বলিবার, তাহা এখনই বলিয়া রাখিতে হইবে, শেষে আর সময় পাইব না। আমরা যে পবিত্র ধর্ম্মের আশ্রয় লাভ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছি, এবং যাঁহার জন্য অশেষ যন্ত্রণা সহ্য করিয়াছি, তাহার পবিত্রতা ও বিশেষত্ব রক্ষা করিতেই হইবে। তোমরাই আমাদের সহায় সম্বল, তোমরা ভিন্ন কে রক্ষা করিবে? এক ঈশ্বর, এক ধর্ম্ম, এক সত্য, চিরসনাতন এবং চিরশাশ্বত। মুক্তির দ্বিতীয় পথ নাই—কৈবল্যের অন্য আশ্রয় নাই। কেবল তিনি, কেবল তাঁহার পদাশ্রিত নরনারী,—যে তাঁহাকে সরলভাবে ডাকিবে, সে-ই পাইবে, মধ্যে গুরু নাই, অবতার নাই। ডাকার ক্রমই উপাসনা, আরাধনা, প্রার্থনা। এই সনাতন কথা প্রচারের জন্যই ব্রাহ্মধর্ম্মের সৃষ্টি। তোমরা সেই ধর্ম্মের আশ্রয়ে জন্মগ্রহণ করিয়াছ—সেই আশ্রয়ে জীবনে কত সুখ শান্তি পাইয়াছ, কখনও ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রতি অকৃতজ্ঞ হইও না, সর্ব্বপ্রযত্নে ব্রাহ্মধর্ম্মের বিশেষত্ব রক্ষা করিবে, ঈশ্বর ও নরনারী—ইহার মধ্যে বাস করেন, উপাসনা, আরাধনা, পূজা, অর্চ্চনা, প্রার্থনা-মূলক কঠোর তপস্যা। যে তদ্গত-চিত্ত হইয়া তাঁহাকে ডাকিবে, সে-ই তাঁহাকে পাইবে বটে, কিন্তু সাধনার-পরিক্রমণ ভিন্ন পাইবে না। সাধনার পরিক্রমণের পথে সংযমই পরম সহায়। সংযমকে অবলম্বন করিয়া নিষ্ঠার সহিত, ঐকান্তিকতার সহিত তাঁহার

অর্চনা ও পূজা করিতে হইবে। আত্মশুদ্ধির মূলই তপস্যা। অপিচ তপস্যা ভিন্ন আত্মশুদ্ধি হয় না। আত্মশুদ্ধি না হইলে কেহ তাঁহাকে পাইবে না। পঙ্কিল জীবন ধর্ম্মের চির-পরিপন্থী।

সাধনার শত্রু কে? সাধনার শত্রু পাপ ও প্রলোভন। মার প্রশূনের অত্যাচারে জগৎ সদা সন্ত্রাসিত; এই জন্য শাক্যসিংহ নিরঞ্জন-তটে কঠোর তপস্যা করিয়াছিলেন; এই জন্য শ্রীচৈতন্য সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই জন্য খ্রীষ্ট মেরি ম্যাগডেলিনকে সতর্ক করিয়া বলিয়াছিলেন, "যাও, আর পাপ করিও না।" পাপ পরাজিত হইলে সংসার জয় হয়—শত্রু মিত্র এক হয়, সর্ব্বঘটে বিশ্বেশ্বরের প্রকাশ উপলব্ধি হয়। তিনি সর্ব্বঘটে, অথচ তিনি উপাধি-রহিত;—তিনি সকলই, অথচ তিনি কিছুই নহেন। নেতি নেতির মূল সূত্র ধরিয়া আত্মার মূলে অবগাহন করিতে হইবে। পূর্ণ যিনি, কোন অংশ তাঁহাকে প্রকাশ করিতে পারে না। তিনি মূলাধার, চিৎশক্তি,—নিত্য শরণ্য, নিত্য বরেণ্য, নিত্য ধ্যেয়। তাঁহাকে পাইতে হইলে আত্মার মূলে অবগাহন করিয়া প্রাণের মূলে প্রাণরূপীকে দেখিতে হইবে। তোমাদের দুয়ের প্রাণ মিলিত হইয়া আজ একাকার হইয়াছে—তাহার মূলে পূর্ণাঙ্গরূপে তিনি বিরাজিত—ঐ দেখ, ঐ দেখ। স্বচ্ছ হৃদয়-দর্পণে আজ ভাল করিয়া তাঁহাকে দেখ, ঐ দেখ, ঐ দেখ। সত্যশরণ দেখ, সুপ্রভার তাঁহারই শক্তি, সুপ্রভা দেখ সত্যশরণের মুখে তাঁহারই জ্যোতি, তাঁহারই মাধুর্য্য। ঐ দেখ, ঐ দেখ। বাহিরের রূপ আজ আর দেখিও না, চিদ্‌ঘন আনন্দময় মূর্ত্তি আজ শুধু উভয়ে উভয়ের মধ্যে দেখ, ঐ দেখ, ঐ দেখ।

কেহ কেহ বলেন, চক্ষু মেলিয়া তাঁহাকে দেখা যায় না। তোমরা জানিয়া রাখ, তাহা মিথ্যা কথা। সুজলা-সুফলা-শস্য-শ্যামলা প্রকৃতির ভিতরে ওতপ্রোত ভাবে তিনি প্রকাশিত, ঐ দেখ, ঐ দেখ। তোমাদের পরস্পরের মুখশ্রীতে আজ তাঁহারই জ্যোতির্ঘন মূর্ত্তি নয়ন মেলিয়া ভাল করিয়া দেখ। তোমাদের দাম্পত্য-জীবন ব্রত গ্রহণ সার্থক হইয়া যাক্। আজ উপাসনা-দর্পণে প্রতিবিম্বিত তাঁহাকে ঐ দেখ, ঐ দেখ।

কিন্তু বড় দুঃসময় উপস্থিত হইয়াছে—নববিধান ব্রাহ্মসমাজে অবতারবাদ এবং সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে নিরুপাসনাবাদ দিন দিন উঁকি মারিতেছে। কেহ কেহ বলেন, তিনি অবতীর্ণ। অবতীর্ণ ত বটেই, কিন্তু অবতীর্ণ পূর্ণ-তিনি সর্ব্বঘটে; চিদংশ বিভাজ্য নয়—পূর্ণ-প্রকৃতিতে পূর্ণ-দেবতা নিত্য প্রকাশিত। সাগরের এক বিন্দু বারি হাতে লইয়া বলিতে পার না যে, ইহাই সাগর। সেইরূপ, কোন শক্তির কণিকা মাত্র হস্তে ধারণ করিয়া বলিতে পার না, ইহাই পূর্ণব্রহ্ম। অনন্ত দেবতা পূর্ণ অনন্ত বিভূতিতে। তাহা ধারণা করা শক্ত, কিন্তু সহজসাধ্য কেবল উপাসনা, ধ্যান ও ধারণায়। উপাসনাই ব্রাহ্মের বল বুদ্ধি, জ্ঞান শক্তি, যোগ তপস্যা—সকলই। উপাসনা-নিরপেক্ষ জন কখনও যে পূর্ণকে পাইবেন, সে সম্ভাবনা নাই।

ব্রাহ্মসমাজের বৃদ্ধেরা আহার বিহার করিয়া, যুবকেরা হাসিয়া খেলিয়া বেড়াইতেছেন, চতুর্দ্দিকে দিন দিনই উপাসনা-নিরপেক্ষতা জাগিতেছে। সুতরাং পাপ-মলিনতা হৃদয়-দর্পণে জমিতেছে, নিষ্কলঙ্ক দেবতাকে আর দেখা যাইতেছে না। কল্পনার কুজ্ঝটিকায় যেন সব আবৃত হইয়া যাইতেছে। উপাসনা

ভিন্ন আত্মবিশুদ্ধির উপায় নাই, উপাসনা ভিন্ন চিদ্‌ঘনত্বের ধারণা হয় না, উপাসনা ভিন্ন সবই যেন কল্পনা বলিয়া মনে হয়। উপাসনা ভিন্ন ব্রাহ্মের আর কোন সম্বল নাই।

আমি সেদিন কোন বন্ধুকে বলিতেছিলাম, বোধ হয়, উপাসনা আর ব্রাহ্মসমাজে দীর্ঘকাল স্থায়ী হইবে না। মতবাদ, আচার-বিচার, কথা-বার্ত্তা, ভোগ-বিলাস—ব্রাহ্মের সর্ব্বস্ব গ্রাস করিয়া ফেলিবে, উপাসনা দিন দিন ব্রাহ্মসমাজ হইতে বিলুপ্ত হইবে। আমার বড় ভয় হইতেছে, তাই তোমাদিগকে সতর্ক করিয়া দিতেছি, সাবধান, সাবধান, উপাসনা-নিরপেক্ষ তোমরা কখনও হইবে না; কখনও উপাসনার সমালোচনা করিবে না, গম্ভীর ভাবে উপাসনা করিবে, এবং উপাসনা শুনিবে, এই পথ ধরিয়া সাধনার নিগূঢ় রাজ্যে অগ্রসর হইবে। যদি উপাসনাকে সম্বল করিয়া চলিতে পার, তোমাদের দাম্পত্য-জীবন সুখের হইবে—সকল বিপদ আপদ কাটিয়া যাইবে—মায়া মোহ বিদূরিত হইবে, চিদানন্দে পূর্ণ হইয়া সর্ব্বদা থাকিতে পারিবে। সাবধান, ব্রাহ্মসমাজের কুবাতাস কখন যেন তোমাদিগকে স্পর্শ না করে। ব্রাহ্মসমাজে অবতারবাদ জাগিলে ব্রাহ্মসমাজের বিশেষত্ব যাইবে, ব্রাহ্মসমাজ উপাসনা-নিরপেক্ষ হইলে ব্রাহ্মসমাজ পাপে ডুবিবে। সাবধান, সাবধান।

বাবা সত্যশরণ—তোমার পিতা আদর্শ পুরুষ ছিলেন, এই উপাসনার পথ ধরিয়া তিনি মহামহিমান্বিত সাধন-সোপানে আরোহণ করিয়া সিদ্ধিলাভ করিয়া ধন্য হইয়া গিয়াছেন। উপাসনাতে বিনয়, উপাসনাতে সংযম, উপাসনাতে আত্মশুদ্ধি, উপাসনাতে দয়া, উপাসনাতে পবিত্রতা, উপাসনাতেই ধর্ম্ম-জগতের সকল নিগূঢ় শক্তি আবির্ভূত হয়। তুমি সাধুর সন্তান, তোমাকে আর অধিক কি বলিব, তোমার জীবনে তোমার পিতৃকুলের সকল বিশেষত্ব যেন ঘনীভূত হয়। তোমার দাম্পত্য-জীবন যেন গম্ভীর উপাসনার মধুময় ফল প্রসব করে—তোমার দ্বারা যেন ব্রাহ্মসমাজের উপাসনা-নিরপেক্ষতা তিরোহিত হয়। কঠোর সাধনায় নিমগ্ন হও, তোমার জীবন ও বংশ ধন্য হইয়া যাক্।

মা সুপ্রভা, আজ বড় বেশী কথা বলিয়া ফেলিয়াছি; তোমার নিকট প্রার্থনা, প্রতি কথাকে হৃদয়-অঞ্চলে ধারণ করিয়া রাখিবে। তোমার মা কোন্ পথ ধরিয়া আদর্শ-জীবন লাভ করিয়াছিলেন, তাহা সর্ব্বদা স্মরণ রাখিবে, তোমার মামী কোন্ গুণে সাধনার অচ্যুতত্ব লাভ করিয়াছিলেন, তাহা সর্ব্বদা মনে রাখিবে। তুমি মাতৃসেবা কর নাই, সেজন্য আমি একদিন বড় দুঃখ পাইয়াছিলাম, কিন্তু এখন যদি মাতৃগুণে সমন্বিতা হও, তোমার মাতাকে সর্ব্বদা তোমার সাধন-পথে উজ্জ্বল মূর্ত্তিতে দেখিতে পাইবে। গুণে গুণীর মিলন, গুণ স্মরণ গুণীর গুণীত্ব প্রাপ্তি হয়,—এ জগতে মৃত্যুতে কখনও বিচ্ছেদ হয় না। মাতার গুণরাশি তোমার জীবনের ভূষণ হইয়া থাকুক, আমি আজ বিধাতার নিকট এই প্রার্থনা করিতেছি। এ পথের সহায় কেবল উপাসনা ও প্রার্থনা। এ জগতে মাতৃশক্তিই ধর্ম্মকে চিরকাল রক্ষা করিয়া আসিতেছে, তুমিও ধর্ম্মকে সর্ব্বদা রক্ষা করিবে। আরাধনা ব্রাহ্ম-সমাজের এক অচ্যুত সাধনা-সোপান, সর্ব্বদা স্মরণ রাখিবে, এবং আরাধনা উপাসনার পথ ধরিয়া মহা-কৈবল্যে অগ্রসর হইবে। মা দেখিও, তোমার ব্যবহারে, তোমার আচরণে সর্ব্বদা যেন নিষ্কলঙ্ক স্বভাব ফুটিয়া উঠে; তোমার দ্বারা সাধু গোপালচন্দ্রের

উজ্জ্বল বংশের মুখ যেন আরো উজ্জ্বল হয়। তোমাকে সেবার দ্বারা বিধাতা ভূষিতা করিয়াছেন, দয়াদাক্ষিণ্য দ্বারা মা জগজ্জননী তোমাকে সাজাইয়াছেন—তোমার কোন ভয় নাই। তোমাতে মাতার সর্ব্ব ঐশ্বর্য্য, পিতার সকল প্রভা প্রকটিত। পিতা-মাতার আদর্শ লইয়া, উপাসনাকে সম্বল করিয়া, পতির অনুগামিনী হও, স্ব- - পাতাল তোমার নিষ্ঠা ও সেবা দেখিয়া প্রকম্পিত হইবে, তোমার জীবন ধন্য হইবে, সার্থক হইবে। মা জগজ্জননী তোমাকে সুচরিত্র স্বামী দিলেন, তোমাকে অক্ষয় সাধন-সম্পদ দিন। মায়ের চরণে আজ কৃতজ্ঞ হৃদয়ে প্রণত হও।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

ভ্রান্তি-স্বীকার

পরম পূজনীয় শ্রীযুক্ত নব্যভারত-সম্পাদক
মহাশয় শ্রীচরণেষু—

মহাশয়,

গত ফাল্গুন ও চৈত্র সংখ্যায় আমার পরম শ্রদ্ধেয় আশীর্ব্বাদক ডাক্তার শ্রীশশিভূষণ মিত্র-মহোদয় স্পেন্সার-সম্বন্ধে আমার যে ভ্রান্তি ধরিয়াছেন, তজ্জন্য আমি তাঁহার নিকট বিশেষভাবে ঋণ-স্বীকার করিতেছি। আমিও যে একজন স্পেন্সারের ভক্ত, তাহা 'গৃহস্থ'-পত্রিকায় "স্ত্রীজাতির শিক্ষা-সমস্যা" ও অন্যান্য প্রবন্ধে বিশেষভাবে প্রমাণীকৃত হইয়াছে। "নীজ্‌শে দর্শন (২)" নামক প্রবন্ধটীকে আমি ভাল করিয়া দেখিয়া দিবার অবসর পাই নাই। ইহা আমার অসাবধানতারই ফল বলিতে হইবে। প্রবন্ধটী পাঠাইবার কালে, আমি হঠাৎ সেকেন্দ্রাবাদ হইতে পাঠানকোটে বদ্‌লী হইবার আদেশ পাই, তজ্জন্যই সৈনিক-জীবনের নানা ব্যস্ততার মধ্যে এই হঠকারিতা হইয়া গিয়াছে। কি অবস্থার মধ্য দিয়া আমার গত বৎসরের প্রবন্ধগুলি রচিত হইয়াছে, তাহা বোধ হয়, সম্পাদক মহাশয় কিছু কিছু অবগত আছেন। আশা করি, আমার গুরুস্থানীয় পূজনীয় ডাক্তার মিত্র মহাশয় এই গুরুতর অপরাধের জন্য আমাকে নিজ গুণে ক্ষমা করিবেন। ইতি বিনয়াবনত অকিঞ্চন।

শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত দেবীপ্রসন্ন রায়চৌধুরী
নব্যভারত-সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু—

মহাশয়,

শ্রীযুক্ত অকিঞ্চন দাস মহাশয় আমার নীজ্‌সে ও স্পেন্সার সম্বন্ধীয় পত্রের যে উত্তর দিয়াছেন, তাহা দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম। আশ্চর্য্যের কারণ—উত্তরের সরলতা। এরূপ সরলতা আমাদের দেশে বড়ই দুর্লভ। উত্তর অনেক সময় বুজ্‌রুকী ও ভ্রুকুটীতে পূর্ণ হয়। এ উত্তর সে রকমের নহে। দাস মহাশয়ের ভাষা দেখিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়াছিলাম, যেন তাঁহার লেখনীর উপর পুষ্প বৃষ্টি হয়। এবার আবার তাঁহার সরলতা দেখিয়া আশীর্ব্বাদ করিতেছি, তিনি যেন দীর্ঘায়ু হইয়া (Metehnikoffএর ১৪০ বৎসর পাইয়া) তাঁর ভাবোত্তেজক প্রবন্ধাদি লিখিয়া এবং অন্যান্য প্রকারে দীর্ঘকাল

করিয়া দেশের হিতসাধন করিতে পারেন। ভুল আমরা সকলেই করি,—কে আর অভ্রান্ত? কিন্তু প্রকৃত মহত্ত্ব তিনিই দেখান, যিনি ভুল দেখিয়াই প্রাণ খুলে ভুল স্বীকার করেন। এই কথাটী লিখিতে লিখিতে অনেক দিন আগের একটা কথা মনে পড়িয়া গেল। প্রায় ২৫ বৎসর পূর্ব্বে শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় "সেকালের ও একালের দর্শন" নামক একটী প্রবন্ধ University Instituteএ পাঠ করেন; আমি সে সম্বন্ধে দুই এক কথা বলি—তাহা তাঁহার মতের বিরুদ্ধে। খুব গভীর বিষয় লইয়াই মতভেদ উপস্থিত হইল। উক্ত প্রবন্ধের দ্বিতীয় অংশ দ্বিজেন্দ্রবাবু ৺রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেবের বাটীতে এক সুধীপূর্ণ সভাতে পাঠ করেন। সে দিন আমি উপস্থিত ছিলাম না। সে দিন সেখানে আমার দার্শনিক মতামত লইয়া দ্বিজেন্দ্রবাবু এমন কতকগুলি কথা বলেন, যা না বলিলেও চলিতে পারিত। শ্রদ্ধেয় গুরুদাস বাবু নাকি ঐ সভাতে সেদিন এই মর্ম্মের কথা বলিয়াছিলেন—"আজ ডাক্তার মিত্র উপস্থিত নাই, ভালই হইয়াছে। উপস্থিত থাকিলে হয় ত তুমুল কাণ্ড হইত।" তার পর দ্বিজেন্দ্র বাবু তাঁর প্রবন্ধের তৃতীয় অংশ আবার University Instituteএ পাঠ করেন। সেদিন আমি উপস্থিত ছিলাম; এবং প্রবন্ধ পাঠের পর, দ্বিজেন্দ্র বাবু আমার দার্শনিক মতামত লইয়া পূর্ব্বোক্ত যে সকল অপ্রাসঙ্গিক কথা উক্ত রাজার বাটীর সভাতে বলিয়াছিলেন, তাহার প্রতিবাদ করি। দ্বিজেন্দ্র বাবু দেখিলেন, বাস্তবিকই তাঁহার সে কথাগুলি বলা ভাল হয় নাই। পাঠক শুনিয়া আশ্চর্য্য হইবেন, দ্বিজেন্দ্র বাবু তখনি একবার নয়, দুইবার নয় কিন্তু তিনবার প্রকাশ্য ভাবে ও ব্যক্তিগত ভাবে নিজের দোষ বা ত্রুটি স্বীকার করিলেন। এরূপ শিশু-সুলভ সরলতা আমি পূর্ব্বে কখনও দেখি নাই। দ্বিজেন্দ্র বাবুর অনেক বড় বড় গুণ আছে। কিন্তু এই শিশুর মত সরলতাটী (childlike simplicity) আমাদের কাছে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে হয়। এ গুণটী প্রকৃত মহত্ত্বের একটা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মাপকাটী। দ্বিজেন্দ্র বাবুর ঐ সরলতাটী আজও আমাদের জীবনে একটী সুখকর স্মৃতি হইয়া রহিয়াছে। দ্বিজেন্দ্র বাবুর ও দাস মহাশয়ের সরলতা আমাদের সকলেরই অনুকরণীয়। বঙ্গদেশে এই জিনিসটীর বড়ই অভাব।

সম্পাদক মহাশয় আপনি এই পত্রের যদৃচ্ছা ব্যবহার করিতে পারেন।

আপনার শ্রীশশিভূষণ মিত্র।

কল্যাণ কামনা।*

কীর্ত্তি হোক দীর্ঘ আয়ু, ধর্ম্ম হোক বল,
পবিত্র চরিত্র হোক সৌন্দর্য্য উজ্জ্বল!
সত্যনিষ্ঠা দীপ্ত তেজ, ক্ষমা হোক জয়,
প্রেম হোক আধিপত্য ব্যাপ্ত বিশ্বময়!
মিলনে নির্ম্মল হোক ভগবানে মতি,
লভ সে পরমা শান্তি তোমরা দম্পতী!

১৩ই ফাল্গুন, ১৩২৪ সন।
ঢাকা।

শ্রীগোবিন্দচন্দ্র দাস।

* সুহৃদ্বর শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের কন্যা—শ্রীমতী কনকপ্রভা দেবীর বিবাহে—

সঙ্গণিকা

(১২)

মহারাজা রণজিৎ সিংহ।

জন্ম—৯ই জুন, ১৮৬৫ খ্রীঃ। মৃত্যু—৩রা মে, ১৯১৮ খ্রীঃ।

ভূতপূর্ব্ব রাজা কীর্ত্তিচন্দ্র সিংহবাহাদুরের পুত্র মহারাজা রণজিৎ সিংহ, ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দের ৯ই জুন, জন্ম গ্রহণ করেন। মহারাজা দেবীসিংহ নসীপুরের রাজ-সংসার প্রতিষ্ঠিত করেন। আদিপুত্র ১৪শ শতাব্দীর বেজা-পুরের মহারাজ বংশ হইতে উদ্ভূত। মহারাজ দেবীসিংহ লর্ড ক্লাইবের সাহায্য করে মহারাজা বাহাদুর উপাধি প্রাপ্ত হন।

কীর্ত্তিচন্দ্র রণজিতের বাল্যকালেই দেহ ত্যাগ করেন। তখন বিস্তৃত জমীদারী কোর্ট-অব-ওয়ার্ডের অধীন হয়। বহরমপুর কলেজে মহারাজা রণজিৎ শিক্ষা প্রাপ্ত হন। সেখানে ৺ক্ষীরোদচন্দ্র রায়চৌধুরীর সংস্পর্শ লাভ হয়। তিনি ১৮৮৬ খ্রীঃ বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে জমীদারী তত্ত্বাবধানের ভার প্রাপ্ত হন। তিনি এই সময়েই আদর্শ জমীদার বলিয়া প্রতিপন্ন হন। এবং তদীয় জমীদারী-সংক্রান্ত নিয়মাবলী প্রণয়ন করেন। ১৮৮৭ খ্রীঃ অনরারী ম্যাজিষ্ট্রেট নিযুক্ত হন। ১৮৮৮ খ্রীঃ মুর্শিদাবাদ মিউনি-সিপালিটীর চেয়ারম্যান হন। ১৮৮৯ খ্রীঃ মুর্শিদাবাদের জল-প্লাবনের সময় মহারাজা জীবনের মায়া পরিত্যাগ করিয়া অনেক অনাহারক্লিষ্ট পরিবারকে রক্ষা করেন। ১৮৯১ খ্রীঃ ১লা জানুয়ারী রাজা হন। তদানী-ন্তনের লেপঃ গবর্ণর স্যর চার্লস ইলিয়ট রণজিৎ বংশের ভূয়সী প্রশংসা করেন। ১৮৯৪ খ্রীঃ দ্বিতীয় শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা প্রাপ্ত হন। ১৮৯৭ খ্রীঃ প্রথম শ্রেণীর ম্যাজি-ষ্ট্রেটের ক্ষমতা প্রাপ্ত হন। লালবাগ সব-ডিবিসন উঠিয়া গেলে, তিনিই প্রকারান্তরে সবডিবিসন ম্যাজিষ্ট্রেটের কার্য্য নির্ব্বাহ করেন।

১৮৯৯ খ্রীঃ এবং তৎপর ১৯০৩ খ্রীঃ পুনঃ মুর্শিদাবাদ মিউনিসিপালিটীর চেয়ারম্যান হন। ১৮৯৭ খ্রীঃ রাজা বাহাদুর উপাধি প্রাপ্ত হন। ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারি মহারাজা উপাধি প্রাপ্ত হন। সার এডওয়ার্ড বেকার এতদুপলক্ষে তাঁহার ভূয়সী প্রশংসা করেন। ১৮৯৯ খ্রীঃ বঙ্গ লেজিসলেটিব কৌন্সিলের সদস্য মনোনীত হন। মিউনিসিপাল বিল সংশো-ধনোপলক্ষে তিনি যে বক্তৃতা করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার বিশেষ প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। বঙ্গের তদানীন্তন কালের সমস্ত সৎকার্য্যের অনুষ্ঠানে তাঁহার যোগ ছিল। এই সময়ে দানশীলতার জন্য তিনি সর্ব্বত্র প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। ১৯১১ খ্রীঃ বঙ্গ এবং ভারত লেজিসলেটিব কৌন্সিলের সদস্য পদে বরিত হন। ১৯১৬ খ্রীঃ রাজাবাহাদুর উপাধি তাঁহার পরিবারের বংশধরের স্থায়ী উপাধি হয়। মহারাজ শেষ বয়সে স্বায়ত্ত-শাসন সম্বন্ধে একখানি পুস্তিকা প্রণয়ন করেন, তাহা সর্ব্বত্র সাদরে গৃহীত হয়। তিনি বঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যার বৈশ্য আগরওয়ালা সম্প্রদায়ের নেতা ছিলেন। তিনি একজন রাজভক্ত, দেশের অকৃত্রিম সুহৃদ্ ছিলেন। তিনি এনারকিজমের বিরুদ্ধবাদী ছিলেন। তিনি সংযত-বাক্ সদা-চারী হিন্দু ছিলেন। তিনি সর্ব্ব শ্রেণীর লোকের প্রিয় পাত্র ছিলেন। তিনি জনসাধারণের

উপকারের জন্য বহু কূপ খনন, স্কুল প্রতিষ্ঠা এবং দাতব্য ঔষধালয় সংস্থাপন করিয়াছিলেন। তাঁহার চেষ্টাতেই নদীপুর রাজবংশ মহা সম্মানের উচ্চ শেখরে আরোহণ করিয়াছেন। তাঁহার ৩ পুত্র এবং ৪ কন্যা বিদ্যমান। পুত্রগণকে সুশিক্ষা প্রদান করিতে আজীবন তিনি চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন। মহারাজকুমার ভূপেন্দ্রনারায়ণ বি-এ উত্তীর্ণ, নৃপেন্দ্র নারায়ণ বি-এ পরীক্ষা দিয়াছেন। রাজেন্দ্রনারায়ণ আই-এ পড়িতেছেন এবং কনিষ্ঠ পুত্র স্কুলে অধ্যয়ন করিতেছেন। আমরা আশা করি, মহারাজা রণজিতের সদ্‌গুণাবলী ও প্রতিভা বংশ-পরম্পরায় তদীয় বংশে সংক্রামিত হইয়া দেশের মহা কল্যাণ সাধন করিবে। মহারাজার পুণ্য কীর্ত্তি এদেশে অক্ষয় হইয়া থাকুক।

(১৩)

বঙ্গের পুলিশ এবার বালিকাদিগকে দুষ্কৃতির হস্ত হইতে উদ্ধার করিতে বদ্ধপরিকর হইয়া সকলের বিশেষ ধন্যবাদের পাত্র হইতেছেন। ভদ্রঘরের মেয়ে সুরবালা ও গায়ত্রীর চরিত্রহীনতা স্মরণে আমাদের হৃদয় মন লজ্জায় ম্রিয়মাণ হইয়াছে। ৺বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিতেন, কলিকাতার অধিকাংশ বেশ্যাই ভদ্র ঘরের কুলবধূ ও কুলকন্যা। সুরবালা ও গায়ত্রীর পতন একথার জীবন্ত সাক্ষী। তাঁহাদের কার্য্যাবলী আমাদের মুখে চুণকালী দিয়াছে। সম্ভ্রান্ত বংশের কুলকামিনীদের এই অধঃপতন বড়ই মর্ম্মপীড়ক। তাহারা যেরূপ ভাবে গঙ্গাস্নানার্থিনী কুলবধূকে রাস্তায় পাইয়া মিথ্যা প্ররোচনায় প্রলুব্ধ করিয়া শেষে দুর্বৃত্ত পুরুষ দ্বারা সতীত্ব নাশ ঘটাইয়া টাকা উপার্জ্জন করিয়াছিল, তাহা স্মরণে এমন লোক নাই, যাঁহাদের হৃদয় ব্যথিত হয় নাই। কিন্তু এহেন জঘন্য কার্য্যেরও পোষক ব্যারিষ্টার মিলিল, ইহা বড়ই কলঙ্কের কথা! ভদ্রনামধারী এহেন লোকদের অসাধ্য কি কোন কাজ আছে? কলঙ্কের ভরায় বঙ্গ পূর্ণ হইয়া গিয়াছে? কাহাকে বল পরদুঃখকাতরতা? কাহাকে বল সহানুভূতি? কাহাকে বল মনুষ্যত্ব?—সবই মিথ্যা টাকার বাজারে! হায় রে হায়!

এদেশের কতিপয় মহানুভব ব্যক্তি ঐ হতভাগিনী কুলবধূকে সমাজে গ্রহণের আয়োজন করিতেছেন, এদিকে এই জ্যৈষ্ঠ মাসের "নারায়ণে" "বন্ধ দরজায়" নাম দিয়া শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্ত একটী গল্পে এই হতভাগিনীকে সাধারণের সমক্ষে ম্লানচিত্রে উপস্থিত করিয়াছেন! এই নারায়ণের সম্পাদক ঢাকা-সাহিত্য-পরিষদের সভাপতি শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাস মহাশয়। তাঁহার বহু গুণের আমরা পক্ষপাতী, কিন্তু অশ্লীলতা প্রচারের কখনও পোষকতা করিব না। দাস মহাশয় সহৃদয় ও দয়ালু ব্যক্তি, তাঁহার বিরুদ্ধে এ দেশের কোন লোক কোন কথা বলিতে চাহে না। দাস মহাশয় বিশ্বেশ্বর সাহাকে রক্ষা করার জন্য এই হতভাগিনীকে যেরূপ ভাবে জেরা করিয়াছেন, তাহাতে শীলতা, ভদ্রতা, লজ্জা, শরম লোপ পাইয়াছে। হায়, হতভাগ্য দেশ ও দেশের উন্নতি!! যে দেশে এক সময় "বিদ্যাসুন্দর" নিন্দিত হইয়াছিল, সেই দেশে বেশ্যাদের কাহিনী প্রকাশ্য পত্রিকায় প্রকাশিত হইতেছে, কিন্তু কোন উচ্চবাচ্য নাই। যে দেশে বঙ্কিমচন্দ্র কোন পুস্তকে চুম্বিত করিলেন লিখিয়া এক সময়ে নিন্দিত হইয়াছিলেন, সেই দেশে "বন্ধ দরজায়" সতীত্বনাশের কুকীর্ত্তি চিত্রিত হইল! হায়, বঙ্গভাষা কোন্ পথ ধরিয়া চলিল? শুধু

তাহাই নহে, "কোন ভগবান্ তাহাকে রক্ষা করিতে পারিল না।" বিধাতার প্রতি এইরূপ উপহাস প্রচারিত হইল!! ইহা কি হিন্দুস্থান? ইহা কি ধর্ম্মপ্রাণ সাধুদিগের পাদচারণার স্থান? হায়, এরূপ ভাবে বিধাতাকে কেহ কখনও এ জগতে উপহাস করিয়াছে কি? "নারায়ণ" এইরূপ নানা কুঘনা চিত্র অঙ্কিত করিয়া কি নামের সার্থকতা ঘোষণা করিতেছেন? কে এ কথার উত্তর দিবে? এদেশ যেন মৃতবৎ, কোন উচ্চবাচ্য নাই!

(১৪)

সম্রাটের জন্মতিথি উপলক্ষে এবারও বহু লোক উপাধি পাইয়াছেন। উপাধি-লোলুপতা দিন দিন বাড়িতেছে, ইহাতে তাহার পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। যাইতেছে, যাউক। আইন যদি অধিকার দিত, আমরা দেখাইতাম, উপাধিধারীদের মধ্যে কত চরিত্রহীন, কত এনার্কিষ্ট, কত রাজবিদ্রোহী আছেন! গবর্ণমেণ্ট দিন দিন যে অধিক মাত্রায় ভুল ভ্রান্তির দ্বারা আক্রান্ত হইতেছেন, উহাতে তাহারও পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। যাইতেছে, যাউক। কিছুতেই কিছু আসিয়া যায় না—ঢক্কা-নিনাদে ঘোষণা কর—সকল কুকার্য্যেরই পরিপোষক মিলে এবং সকল কুকীর্ত্তিই আইন-দ্বারা সুরক্ষিত!

(১৫)

বিশ্ববিদ্যালয়খানি একখানি দর্পণ, যাহা দ্বারা মানবচরিত্রের প্রকৃত ছবি সুন্দররূপে দেখা যায়! দেখা যাইতেছে না কি, এদেশের কত কৃতবিদ্য ব্যক্তি ব্যভিচারী? কত কৃতবিদ্য ব্যক্তি বহু বিবাহের পরিপোষক? কত কৃতবিদ্য ব্যক্তি বাল্যবিবাহ ও কন্যাপণের ক্রীড়নক! তোমরা কি ছবি দেখিতেছ? এদেশে সুশিক্ষা, না কুশিক্ষা প্রচারিত হইতেছে? অনুমান কর, অনুধ্যান কর, অনুবর্ত্তন কর, সবই বুঝিতে পারিবে, আমাদের বলার অপেক্ষা রাখে না।

(১৬)

ঘুমন্ত ব্যক্তিকে জাগান সহজ; কিন্তু যাঁহারা জাগিয়া জাগিয়া ঘুমায়, তাহাদিগকে কে জাগাইতে পারে? হোমরুল-দলের বিরোধী দল সৃজিত হইতেছে, কর্ত্তারা জাগিয়া জাগিয়া ঘুমের অনুসরণ করিবার উপক্রম করিতেছেন। আর কেন, কিছু করিতে না পার, গভীর নিদ্রায় ঘুমাইয়া পড়, বৃথা দলাদলির আর প্রয়োজন কি? এ দেশের সবই অন্ধকারে আচ্ছন্ন,—তুমি, আমি, সে—সবই অন্ধকারে নিমগ্ন; অথবা ভারত যে তিমিরে, সেই তিমিরে। এই ভারতে জাগিয়া জাগিয়া ঘুমাইতেছে, শুধু কর্ম্মশূন্য বক্তৃতাবাগীশদের দল ও বেদল। এদেশে দল ও বেদলের অর্থ জাগরিত ঘুম।

(১৭)

কলিকাতায় এবার যখন কংগ্রেসের অধিবেশন হইয়াছিল, তখন একদল বৈকুণ্ঠনাথের মনোনয়নকে পণ্ড করিয়া রবীন্দ্রনাথকে রিসেপসন কমিটীর সভাপতি পদে বরণ করিয়াছিলেন। সেই হইতে দলাদলির সূত্রপাত হয়। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথের কৃতিত্বে তাহা মিটিয়া যায়, এবং জাতীয় মহাসমিতির অধিবেশনের কার্য্য সুশৃঙ্খলার সহিত নির্ব্বাহ হয়। সেই হইতে আর একটা দলের সৃজনের জন্য কতিপয় ব্যক্তির কণ্ডুয়ন হইতেছিল। এত দিনে সেই দল ৪ঠা জুন "ইণ্ডিয়ান ন্যাসনেল লিগ" নামে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে; তাহাতে এই সকল মহাত্মা যোগদান করিয়াছেন,—শ্রীযুক্ত কাসীমবাজারের মহারাজা, রাজা সীতানাথ

রায়বাহাদুর, দিঘাপাতিয়ার মহারাজা, স্তর বিনোদ মিত্র, স্তর রাজেন্দ্র মুখোপাধ্যায়, স্তর দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী, স্তর নীলরতন সরকার, মিঃ প্রভাসচন্দ্র মিত্র, মিঃ অরুণচন্দ্র সিংহ, নবাবজাদা আলতাব আলী, ডাঃ এ সরাওয়ার্দি, মিঃ সত্যানন্দ বসু, ডাঃ এস, পি, সর্ব্বাধিকারী, মিঃ শচীন্দ্রপ্রসাদ বসু, মিঃ হেরম্বচন্দ্র মৈত্র, মিঃ আর, বি, মেটা, মিঃ ত্বরিতভূষণ রায়, মিঃ এন, এন, সরকার, মিঃ সি, সি, ঘোষ, মিঃ বি, এন, মিত্র, মেঃ বি, সি, নাগ, মিঃ সুরেন্দ্রনাথ মল্লিক, মিঃ কান্তিচন্দ্র রায়, মিঃ পৃথ্বীশচন্দ্র রায় প্রভৃতি ব্যক্তিগণ।

এই সকল ব্যক্তির অনেকেরই ধাতু সুবিদিত; কেহ কেহ উপাধিলোলুপ, কেহ কেহ এত নীচ যে সি-আই-ডির সহচর, কেহ কেহ গবর্ণমেণ্টের পোষ্যপুত্র, কেহ কেহ স্বার্থের ক্রীড়নক, কেহ কেহ নির্ব্বাসিতের অন্তরতর ব্যক্তি, ইত্যাদি ইত্যাদি। অনুষ্ঠানারম্ভেই কেহ কেহ নূতন উপাধি পাইয়াছেন। আরো কত উপাধি আসিতেছে। ইহার মধ্যে কে কত দেশের কাজ করিয়াছেন, সকলেই জানেন। সুতরাং জাগরিত ঘুমের নব আকর্ষণ ও নব অনুসরণ আসিতেছে। প্রথমে ঢাক ঢোল খুব বাজিবে, শেষে কিছু কিছু ইষ্ট বা স্বার্থ সাধিত হইলেই সকলে ঘুমাইয়া পড়িবেন। ভারত-সভা ও ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসন থাকিতে আবার কেন রাজনীতির সভা? এই নূতন দলে এক জন গান্ধি, একজন সুব্রহ্মণ্য, একজন রবীন্দ্রনাথ, একজন রামানন্দ, একজন পি,সি, রায়, বা একজন তিলক থাকিলেও কিছু কিছু প্রত্যাশা করা যাইত। শুনিতেছি, ঘুমন্ত ভারতসভার নেতা সুরেন্দ্রনাথও এই দলে যোগ দিয়াছেন। তিনি পূর্ব্বে ছিলেন, সর্ব্ব বিষয়ে হোম্-রুলার, এখন হইয়াছেন, সেল্‌ফ্-গবর্ণর! গবর্ণমেণ্টের ইঙ্গিতচালিত এই দলের ভবিষ্যত উজ্জ্বল হউক, প্রার্থনা করি। কিন্তু তাহা হইবে কি? বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়া হইবে না ত? সেদিন সত্যানন্দ ও প্রভাসচন্দ্রের প্রশংসা শুনিতেছিলাম। দেখা যাক্, হিংসা বিদ্বেষের স্থলে ভবিষ্যতে কিছু কিছু "সু" অভ্যুদিত হয় কি না! ইহা কি ঘুমন্ত ভারত-সভার ভাঙ্গা হাট?

(১৮)

শুনিতেছি, এই দলের প্রথম কাজ হইবে, পত্রিকার সৃজন। তাহা ত হইবেই, নচেৎ তথা-কথিত কোন কোন নেতার অভিলাষ ও স্বার্থ পূর্ণ কিরূপে হইবে? এদেশে বহু দিনের ভাল ভাল কাগজই সাহায্যের অভাবে ভাল চলিতেছে না, আবার নূতন সৃষ্টির আয়োজন! তা যদি ভাল হয়, দেশের মঙ্গল হইবে, কিন্তু যদি কেবল দলের পা-চাটাচাটি হয় ও খোসামুদি প্রশ্রয় পায়, তবে গবর্ণমেণ্ট অর্থ সাহায্য দ্বারা যে কার্য্য সুসম্পন্ন করিতে পারেন নাই, তাহাই হইবে। গবর্ণমেণ্ট চাহিতেছিলেন, ভারতের কোন দল তাহাদের বর্ত্তমান নীতির পোষকতা করেন কি না। এই দলের দ্বারা তাহা সুসাধিত হইলে, উপাধির উপর উপাধি বর্ষিত হইবে, পরন্তু আরো বহু লোক অন্তরীণে আবদ্ধ হইবে; সঙ্কোচে সঙ্কোচে আর অগ্রসর হইতে হইবে না। হোমরুলের পরিবর্ত্তে নবাকারে সেল্ফ গবর্ণমেণ্টের নব-নির্য্যাতন সকল অবতরণ করিবে। আবার, আবার? যাহা হইবে, তাহা অচিরে সকলেই জানিতে পারিবেন। যাঁহারা গবর্ণমেণ্টের ইঙ্গিতে উঠেন ও বসেন, তাঁহাদের দ্বারা দেশের কি মঙ্গলজনক কাজ সাধিত হইবে, বুঝি না।

(১৯)

এদেশে গান্ধির নাম অক্ষয় হউক, বিধাতার অযাচিত আশীর্ব্বাদ দরিদ্রদিগের রক্ষাকল্পে আজ অবতীর্ণ হইয়াছে, ঐ দেখ, ঐ দেখ। এমন নিষ্ঠা, এমন স্বার্থত্যাগ, এমন জীবনত্যাগ, এমন অদম্য সেবানুরাগ, এমন দরিদ্রের প্রতি সহানুভূতি, এমন কর্ম্মবীর, এমন চরিত্রবান, এমন নিষ্কাম সত্যানুরাগী যোগী এদেশে আর দেখা যায় নাই। এদেশে গান্ধির জয় জয়কার হউক—তাঁহার পুণ্যে ভারতবর্ষ নব শোভায় শোভিত হউক।

(২০)

ক্রমেই রাজনীতি-গগনে মেঘ যেন ঘনীভূত হইতেছে, কোথায় বজ্রপাত, বা কোথায় বর্ষণ হইবে, কেহ জানে না। ঘসি পুড়িলে গোবরের হাসির অভিনয় এদেশে যেন আর না হয়। ঘোর দুঃখের দিন ঘনাইয়া আসিতেছে, উল্লসিত বঙ্গ, সাবধান, সাবধান!

(২১)

শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথের প্রস্তাবিত বঙ্গের অন্তরীণদের বিচার-কমিটী সংস্থাপিত হইয়াছে; সভ্য হইয়াছেন, হাইকোর্টের জজ বিচক্রফট ও বঙ্গের ভূতপূর্ব্ব জজ চন্দ্রভারকার। তাঁহারা পুলিস রিপোর্টের উপর নির্ভর করিয়া এক তরফা বিচার করিবেন। অন্তরীণদের পক্ষে প্রতিনিধি থাকিতে পারিবেন না। যত বড় লোকই হউন না, প্রতিবাদীর কথা না শুনিয়া বিচার ভালরূপ করিতে পারেন না। এই জন্যই কি কোন কোন বিচারপতি এই কার্য্যভার গ্রহণ করেন নাই? এই কমিটীতে শুধু দুইজন ব্যক্তি আছেন। তাঁহাদের মধ্যে মতান্তর হইলে কে মীমাংসা করিবে? বঙ্গের যে সকল সন্তান ভারতের অন্যত্র আবদ্ধ হইয়াছেন, তাঁহাদের বিচার বোধ হয় সে স্থলের কমিটী করিবেন। এই কমিটীতে পুলিসের জয় জয়কারই প্রতিপন্ন হইবে বলিয়া আমরা আশঙ্কা করিতেছি।

(২২)

বঙ্গের লাট মহাত্মা লর্ড উইলিংডন শ্রীযুক্ত তিলক প্রভৃতিকে প্রকাশ্য সভায় আহ্বান করিয়া যেরূপ ভাবে ডিজ্-অনেষ্ট বলিয়া অপমানিত করিয়াছেন, তাহা এত দিনে সকলেই অবগত হইয়াছেন। এরূপ ব্যবহার একবার ৺নরেন্দ্রনাথ সেন মহাশয় লর্ড ডফরিনের নিকট পাইয়াছিলেন। অতঃপর কি হইবে, আমরা তাহাই ভাবিতেছি। ভারত-সেক্রেটারি মণ্টেগুর সুব্রহ্মণ্য সম্বন্ধীয় পার্লামেণ্ট ব্যক্ত অভিমত এবং বঙ্গের লাটের এই ব্যবহারে বুঝা যায়, বায়ু কোন্ দিকে বহিতেছে। বিধাতা ভারতের সহায় হউন!

(২৩)

ব্রাহ্মসমাজে কথকতার স্রোত খুব চলিয়াছে। শ্রীযুক্তা সুনীতি দেবী, শ্রীযুক্ত বরদাপ্রসন্ন রায়, শ্রীযুক্ত কুমুদনাথ বিদ্যাবিনোদ এবং শ্রীযুক্ত ভবসিন্ধু দত্ত প্রভৃতি মহাশয়গণ কথকতা করিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিতেছেন। একজন বন্ধু একদিন বলিতেছিলেন, ইহার পর ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারকগণ শুধু কথকতাই করিবেন, কেন না, ইহাতে সাধনভজন বা দর্শনবিজ্ঞান-চর্চ্চা, কিছুরই প্রয়োজন নাই! আশ্চর্য্যের বিষয় এই, যাঁহারা শ্রীযুক্ত রাজকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের কথকতার নিন্দা করেন, তাঁহারাই উঁহাদের কথকতার প্রশংসা করেন। ইহাতে ব্রাহ্মধর্ম্মের যে কি প্রচার হইবে, আমরা বুঝি না। এইরূপ কাজের জন্য সমাজের অর্থ ব্যয় করা সঙ্গত কি না, ব্রাহ্মসাধারণের বিবেচনা করার সময় আজও উপস্থিত হয় নাই কি?

(২৪)

ষ্টেট-সেক্রেটারী মহোদয়ের তীব্র মন্তব্যে মহামতি সুব্রহ্মণ্য উপাধি পরিত্যাগ করিয়াছেন এবং যে কোন কঠোর ব্যবহারের

অপেক্ষা করিতেছেন। ইনি যেন ফ্রান্সের সেকালের বৃদ্ধ ল্যামিনে। এরূপ জীবন্ত লোক এই স্বার্থময় গোলামদের দেশে আর অভ্যুদিত হয় নাই। এরূপ নির্ভীকতা এ দেশের কোন স্থলে আর দেখা যায় নাই। তাঁহা দ্বারা ভারতের মুখ উজ্জ্বল হইয়াছে। বিধাতা বার্দ্ধক্যে ইঁহার সহায় হউন।

(২৫)

১৩২৫—জ্যৈষ্ঠ-সংখ্যা-"সেবকে" "নবীন আচার্য্য ও প্রাচীন উপাসক" নামক একটী প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। "সেবক" ঢাকার পূর্ব্ব বাঙ্গালা ব্রাহ্মসমাজ হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে। এই প্রবন্ধটী কাহাকে লক্ষ্য করিয়া লেখা হইয়াছে? এই প্রবন্ধে "ব্রাহ্ম-সমাজের প্রচারক বিভ্রাট" প্রবন্ধের প্রতি-ধ্বনি রহিয়াছে। এবার বিরক্ত ব্রাহ্মেরা কি বলেন?

সূর্য্য ও চন্দ্র।*

কবি রবীন্দ্রনাথ।

পূরবে উঠিলে রবি উজলিল বিভা,
অরুণ কিরণ ছটা প্রকাশিল কিবা!
সাহিত্য-কাননে কত ফুটিল রে ফুল;
আলোর তরঙ্গ ছুটে সিন্ধু উপকূল।
বঙ্গদেশে সুমধুর উপবনে যেরা
মুখরি' উঠিল যত কবি-বিহগেরা;
চমকিল তরুলতা নবীন পল্লবে;
ভুবন ভরিল সব মধু কলরবে।
একি তুমি যেতে যেতে কোন্ দেবপথে
অবতীর্ণ হ'লে বঙ্গে আলোকের রথে!
জগতে বরেণ্য তুমি সবিতা সমান;
সঙ্গীতে বিহার কর বিমানে বিমান।
স্বর্ণ কিরীট পরি' যাবে যবে অস্তে
নোবেলের জয়মাল্য রাজে তব হস্তে।

স্বর্গীয় কবি দ্বিজেন্দ্রলাল।

('আমার জন্মভূমি' ইত্যাদি গীতগুলি শুনিয়া কবিতাটী লিখি)

কি গান গাহিলে তুমি সুকরুণ স্বরে—
জন্মভূমির বেদনা দিলে তায় পূরে।
জননীর ব্যথা বুঝি বেজেছিল বুকে
তাই বুঝি হাসি ছেড়ে বিলাপের সুখে
গেয়েছিলে ওই গান চির মনোদুখে—
যে গান ধ্বনিত আজি দূর হ'তে দূরে।
মর্ম্মতন্ত্রী বেজে উঠে এক মন্ত্র বলে
শুনি তব মর্ম্ম গীত—ভাসি অশ্রুজলে।
শত কবি নতশির যাঁর পদ চুমি',
তাঁরে বক্ষে ধরি' আজ ধন্য বঙ্গভূমি।
সরলতা মাখা ছিল ওই মুখছবি,
হাসাইতে এসেছিলে হাস্যরস কবি।
এসেছিলে মার কাছে হাসিকণা মেখে,
কেঁদে গেলে তুমি শেষে মার কান্না দেখে।

শ্রীঋতেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

* রবীন্দ্রনাথের নামের অর্থ যে সূর্য্য, তাহা সকলেই জানেন, কিন্তু দ্বিজেন্দ্রলালের নামের অর্থ যে চন্দ্র, তাহা বোধ হয় অনেকেই জানেন না। সংস্কৃতে দ্বিজরাজ শব্দের এক অর্থ চন্দ্র।

পুণ্যশ্লোক রমেশচন্দ্র রায়চৌধুরীর দান।

ফরিদপুরের চৌদ্দরসী-নিবাসী ৺নীলকণ্ঠ রায়ের বরিশাল জিলায় বিস্তৃত জমিদারী আছে। তাঁহার পৌত্র শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র রায়-চৌধুরী মহাশয় ১৩২২ সনের ১৫ই মাঘ তাঁহার মাতার মৃত্যু হওয়ার পর এষ্টেট হাতে লইয়াছেন। ঐ সময় হইতে এপর্য্যন্ত সাধারণের হিতকল্পে যে সমস্ত কার্য্য করিয়াছেন, তাহা নিম্নে লিখিলাম।

১। বরিশাল হিন্দুধর্ম্মরক্ষিণী সভার গৃহ ছিল না, রমেশবাবু ঐ সভার স্থান ২৫০৲

টাকায় খরিদ করিয়া ঐ স্থান সভাকে দান করিয়াছেন, এবং তাঁহার স্বর্গীয়া মাতা কামিনীসুন্দরী চৌধুরাণীর নামে একটী সংস্কৃত চতুষ্পাঠী গত ১৩২৩ সনের শ্রাবণ মাসে স্থাপন করিয়াছেন এবং মাসিক ৫০, টাকা সাহায্য করিতেছেন। ঐ চতুষ্পাঠী ও হিন্দু-ধর্ম্মরক্ষিণী সভার জন্য তিনি একটী ইষ্টক-নির্ম্মিত বৃহৎ হল প্রস্তুত করাইতেছেন। তাহাতে প্রায় ৩০০০০ ত্রিশ হাজার টাকা ব্যয় পড়িবে।

২। ১৩২৪ সালের চৈত্র মাসে বরিশাল জেলার অন্তর্গত পটুয়াখালী মহকুমার উপর সাধারণের জন্য একটী জলের ফিল্টার প্রস্তুত করিতে সবডিভিসন অফিসারের নিকট ৫০০০, টাকা দান করিয়াছেন।

৩। ১৩২৪ সালে ফরিদপুর জিলার অন্তর্গত সুরুল্যাগঞ্জ গ্রামে সর্ব্বসাধারণের সুবিধার জন্য একটী বৃহৎ জলাশয় খনন করিয়া ইষ্টক-নির্ম্মিত ঘাটলা বান্ধাইয়া দিয়াছেন। উহাতে তাঁহার ৫০০০, পাঁচ হাজার টাকা খরচ পড়িয়াছে। উহাতে নিকটবর্ত্তী ২০।২৫ গ্রামের পানীয় জলের বিশেষ সুবিধা হইয়াছে। কারণ ঐ সব স্থানে অন্য কোন জলাশয় ছিল না। জলাভাবে তাহাদের বড়ই কষ্ট হইতেছিল।

৪। ঐ সালের ভাদ্র মাসে তাঁহার স্বর্গীয় পিতা বাবু রাজেন্দ্রচন্দ্র রায়চৌধুরীর নামে ফরিদপুর টাউনের উপর একটী কলেজ করিবার জন্য এককালীন ৫০০০০, পঞ্চাশ হাজার টাকা দান করিয়াছেন। এই জুলাই মাসে কলেজের কার্য্য আরম্ভ হইবে। রমেশ বাবুর দ্বারা ফরিদপুরের একটী অভাব পূরণ হইবার বিশেষ সুবিধা হইয়াছে।

৫। ১৩২৩ সালের ভাদ্র মাসে কলিকাতা ফরিদপুর "সেবাসমিতিতে" এককালীন ৫০, পঞ্চাশ টাকা দিয়াছেন এবং মাসিক ১০, দশ টাকা সাহায্য করিতেছেন।

হিন্দুধর্ম্ম আর রক্ষা পায় না দেখিয়া যাহারা 'হিন্দুধর্ম্মরক্ষিণী' নাম দিয়া সভা স্থাপন করিয়াছেন, তাঁহাদের পক্ষে এতাদৃশ দান যে সবিশেষ চিত্তাকর্ষক, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। কিন্তু এই সকল বিশিষ্ট দান উপলক্ষে দাতা ও গৃহীতাদের মধ্যে কি চুক্তি হইয়াছে, তাহা বোধ হয় সাধারণ জিজ্ঞাসা করিতে পারে।

আমাদের দেশে দাতার অভাব নাই। প্রত্যেক ব্যক্তিই দাতা বলিলে দোষ হয় না। লোকে কর্জ্জ করিয়া ও ঘটিবাটী বন্ধক রাখিয়াও পিতৃমাতৃ শ্রাদ্ধ করে,—যথাসর্ব্বস্ব ব্রাহ্মণকে দান করে। কিন্তু ব্রাহ্মণ শ্রেণী তাহার যথোপযুক্ত প্রতিদান, এমন কি, তাহার কিয়দংশও প্রত্যর্পণ করে না। যে সকল লোকে এইরূপ দানে তাহাদের উদর পুষ্টির ব্যবস্থা করে, তাহারা প্রায়শঃ তাহার পরিবর্ত্তে যেরূপ ঘৃণা ও হেয়তা প্রাপ্ত হয়, সেরূপ কোন সমাজ-উন্নতিকর বা সম্মান-বৃদ্ধিকর প্রতিদান প্রাপ্ত হয় না। দীর্ঘকালের ব্যবহার দোষে বা অভ্যাস বশতঃ এতাদৃশ দাতারা কোন প্রত্যর্পণ চাহিতেও জানে না। আমরা জানি না, চৌধুরী মহাশয় কোন প্রত্যর্পণ-কামনায় পাশাপাশি জেলা দুইটীতে লক্ষ টাকা ব্যয় করিতে বসিয়াছেন, অথবা গীতার নিষ্কাম ধর্ম্মের আচরণ দেখাইতেছেন।

*   *   *   *

রায়চৌধুরী মহাশয়ের প্রশংসনীয় দানটী আপাতঃদৃষ্টিতে কায়স্থদানের ন্যায়ই বোধ হইতেছে। সর্ব্বসাধারণের উপকারই যেন তাঁহার লক্ষ্য। কিন্তু রাজেন্দ্র-কলেজ-কমিটি ও বরিশাল-হিন্দু-ধর্ম্মরক্ষিণী সভা কি তাঁহাকে বা তাঁহার সম্প্রদায়কে কায়স্থের অধিকার দিবেন? হিন্দুবিশ্ববিদ্যালয় কতকগুলি জাতীয় লোককে বেদ শিক্ষা করিতে দেয় না। সকল বিদ্যালয়েই আচরণীয় জাতির ছাত্রবৃন্দ, অনাচরণীয় জাতির ছাত্রবৃন্দকে এক ছাত্রাবাসে পান ভোজন ও বাস করিতে দেয় না। এই অবস্থাকে আরও বদ্ধমূল করার জন্যই কি রায়চৌধুরী মহাশয়ের রাজেন্দ্র-কলেজ প্রতিষ্ঠার্থ দান হইয়াছে? কলেজ-কমিটির সহ এ বিষয়ে কি চুক্তি হইয়াছে? কোন চুক্তি না হইয়া থাকিলেও এক্ষণে কোন চুক্তি করা যায় কি না, তাহা কি চৌধুরী মহাশয় ভাবিয়া দেখিবেন?

সেইরূপ বরিশাল ধর্ম্মরক্ষিণী সভার ব্যাসাসনে বসিয়া সাহাজাতীয় বর্ণ ব্রাহ্মণেরা কি সকল শ্রেণীর হিন্দুর কর্ণে শাস্ত্রোপদেশ দিতে পারিবেন? এই ধর্ম্মরক্ষিণী সভা যখন দেবদেবী পূজার অনুষ্ঠান করিবেন, তাহাতে কি কাশ্যপগোত্রী ব্রাহ্মণের ন্যায় সাহাজাতীয় ব্রাহ্মণেরা অবাধে যোগ দিতে পারিবেন? ব্রাহ্মণ ভোজনের সময় আচরণীয় ও অনাচরণীয় ব্রাহ্মণেরা কি এক পংক্তিতে ভোজন করিবেন? চৌধুরী মহাশয় ইহা জানেন কি না, বলিতে পারি না। উচ্চ বর্ণের ব্রাহ্মণ নিম্ন বর্ণের দেবমন্দিরের সম্মুখে দেব দেবীকে প্রণাম করে না। কেন না, এই সকল দেব দেবীও স্পর্শ-দোষ-প্রথা দ্বারা বারিত। উচ্চ বর্ণের ব্রাহ্মণেরা তাহাদের নিকট মস্তক নত করিলে, তাহাদের জাতিচ্যুতির ভয় আছে। এজন্য জিজ্ঞাসা করি, বরিশাল-ধর্ম্মরক্ষিণী সভায় দান করিবার পূর্ব্বে তিনি কোন চুক্তি করিয়াছেন কি না?

ফলতঃ হিন্দুধর্ম্ম রক্ষার জন্য এতাদৃশ দান প্রয়োজনীয়, কিন্তু এই দানগুলি চুক্তিশূন্য হইলে কোন ফল হইবে না। নমঃশূদ্র ও কৈবর্ত্ত জাতিগুলিও শক্তিকজাতির ন্যায় যুদ্ধপ্রিয় দাসীবিশের অন্তর্গত, তাহাদের নিকট হইতেও এরূপ দান গ্রহণ করিয়া তাহাদের দায়াদ কায়স্থজাতির সহ তাহাদের সমতুল্যতা সম্পাদন হিন্দুধর্ম্ম রক্ষার প্রধানতম উপায়। এ কথা প্রচারিত হওয়া আবশ্যক যে, ক্ষত্র বা কায়স্থজাতি আর্য্যবিশ্ ও দাসীবিশের বাণক শাখা মাত্র, এবং আর্য্যবিশ্ ও দাসীবিশ হইতেই ব্রাহ্মণের উৎপত্তি। চৌধুরী মহাশয়ের দানে এই কথার আলোচনা বৃদ্ধি হইলে, দেশের মঙ্গল আছে।

শ্রীমধুসূদন সরকার।

প্রেস-সেন্সারের পত্র

বঙ্গের প্রেস-সেন্সার শ্রীযুক্ত জে, এন, রায় মহাশয়ের নং ৫২৮৮।১৮ অনুরোধে ইহা প্রকাশিত হইল,—

"সঞ্চিত ধনরাশি কি প্রকারে শত্রুপক্ষকে সাহায্য করে।"

"কি প্রকারে আমি যুদ্ধ জয়ে সাহায্য করিতে পারি?" এই প্রশ্ন ভারতবাসিদিগের আজ চিন্তার বিষয়। শত সহস্র ভারতসৈন্য ইংরাজ সৈন্যদিগের সহিত France, Mesopotamia, Egypt, Palestine, ও অন্যান্য স্থানে অত্যন্ত বীরত্বের সহিত যুদ্ধ করিতেছে, এবং তাহাদিগের দ্বারা অনেক মহৎ কার্য্য সাধিত হইতেছে। প্রত্যেকেই যে যুদ্ধ করিতে পারিবেন, এমন সম্ভবপর নহে! কিন্তু যাঁহারা যুদ্ধ করিতে অক্ষম, তাঁহারা কোন না কোন প্রকারে সাহায্য করিতে পারেন। France, United States, England এবং ভারতবর্ষ হইতে যে সমস্ত যোদ্ধা সংগ্রহ করা হইয়াছে, তাহারা শত্রু-হস্ত হইতে ভারতকে রক্ষা করিতেছে। এই সমস্ত সৈনিকদিগকে সাহায্য করা সকলেরই কর্ত্তব্য। কারণ শত্রুপক্ষ একবার জয়ী হইলে ভারত লুণ্ঠিত, এবং বিধ্বস্ত হইবে। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, ভারতে এমন এক শ্রেণীর লোক আছেন, যাহারা সাহায্য করা দূরে থাক, জয়ের পথ কণ্টকাকীর্ণ করিয়া শত্রুদিগকে সাহায্য করিতেছেন। তাঁহারা বুঝিতে পারিতেছেন না যে, তাঁহাদের কার্য্যাদি জয়ের ও শান্তিস্থাপনের অন্তরায়। বর্ত্তমান সময়ে কেবল সৈন্যদিগকেই যে কার্য্য করিতে হইবে, তাহা নহে। যাঁহারা যোদ্ধা, তাহারা যুদ্ধ করিবেন, এবং যাঁহারা যোদ্ধা নহে, তাঁহারা যোদ্ধাদিগকে আহার, বসন, বন্দুক, রাইফেল এবং যুদ্ধোপকরণাদি সংগ্রহ করিয়া দিবেন। যাঁহারা এই সমস্ত তৈজষপত্রাদি সংগ্রহে এবং সমর ক্ষেত্রে প্রেরণে বিঘ্ন প্রদান করিতেছেন, তাঁহারা প্রকৃতই প্রকারান্তরে জার্ম্মাণদিগকে সাহায্য করিতেছেন।

ভারতের কেহই ইচ্ছাপূর্ব্বক ভারত-সৈন্যদিগের ক্ষতি করিবেন না। কিন্তু এ কথাও সত্য যে, যাঁহারা এই যুদ্ধবিগ্রহে রৌপ্য

মুদ্রাদি সিন্দুকের ভিতর সঞ্চয় করিয়া অথবা মৃত্তিকাতে প্রোথিত করিয়া রাখিতেছেন, অথবা ধাতু গলাইয়া অলঙ্কারাদি প্রস্তুত করিতেছেন, তাঁহারা দেশের অনেক ক্ষতি করিতেছেন। কারণ, ইহার ফলে বিদেশ হইতে রৌপ্য ক্রয় করিয়া সরকার বাহাদুরকে মুদ্রা প্রস্তুত করিবার জন্য এখানে রেল ষ্টিমারে আনয়ন করিতে হইতেছে। একটী দৃষ্টান্তই সঞ্চিত ধনের অপকারিতা বুঝাইয়া দিবে। যে সমস্ত টাকা প্রোথিত আছে, তাহার অভাব পূরণার্থ সরকার-পক্ষকে গত দুই বৎসরে ন্যূনপক্ষে ৫০ কোটীর অধিক টাকা প্রস্তুত করিতে উপযুক্ত পরিমাণে রৌপ্য বহু দূর হইতে ক্রয় করিয়া আনিতে হইয়াছে। অধিকন্তু আরও ৫০ কোটী টাকার দরকার। সেই জন্য আমেরিকা হইতে উক্ত ৫০ কোটী টাকা প্রস্তুত করিতে যে পরিমাণে রৌপ্যের দরকার, তাহার কতক অংশ ভারতে আসিতেছে এবং অবশিষ্ট অংশ শীঘ্রই এখানে আনিতে হইবে।

এই সব কারণে সরকার পক্ষকে অনেক ক্ষতি স্বীকার করিতে হইতেছে। সরকারের এই ক্ষতি না হইলে, সরকার কর আংশিক পরিমাণে কমাইতে পারিতেন, এবং দেশের মঙ্গলের জন্য অনেক টাকা ব্যয় করিতে পারিতেন। এই বিষয়ে আমরা শত্রুপক্ষ হইতে একটা শিক্ষা পাইতে পারি। জার্ম্মণি এত দিন যাবৎ যুদ্ধ করিতে পারিতেছে কেন? কারণ "কিছুই নষ্ট করিবে না" ইহাই হইতেছে তাহার মূল মন্ত্র। কেবল যে রৌপ্যই সঞ্চিত আছে, তাহা নহে। সোণা ও অন্যান্য ধাতুও এইরূপ অব্যবহার্য্য ভাবে প্রোথিত। Englandএর প্রধান সচিব বলিয়াছেন —"Silver bullets will win the war" —অর্থাৎ "রৌপ্যগুলি দ্বারাই আমরা জয়ী হইব।" কিন্তু দুঃখের বিষয়, ভারতে সেই রূপা ও সোণা সাধারণের গৃহে লুক্কায়িত থাকাই ইংরাজের জয়ী হইবার প্রধান প্রতিবন্ধক। ভারতে যে পরিমাণে মুদ্রা প্রচলিত আছে, অন্য কোন দেশেই সে পরিমাণে মুদ্রা প্রচলিত নাই। নোট কাগজই সেই সব দেশে অধিকতর ব্যবহৃত হয়। ইহাতে ভারতের পক্ষে সমধিক ক্ষতি এবং অন্যান্য দেশের মহৎ উপকার সাধিত হইতেছে। আমেরিকা হইতে রৌপ্য আনয়নে আরও অনেক ক্ষতি হইতেছে। যে সমস্ত লোক এই সব কার্য্যে নিয়োজিত, এবং যে সমস্ত জাহাজাদি এই প্রকারে আমেরিকা হইতে ভারতে রৌপ্য বহন করিয়া আসিতেছে, সরকার তাহাদিগকে যুদ্ধে নিযুক্ত করিতে পারিতেছেন না। শুধু ইহাই নহে, দেশের লোকেরও বেশ ক্ষতি হইতেছে। দেশের লোকের যে সমস্ত জিনিষের দরকার, সরকার তাহা দূর দেশ হইতে আনয়ন করিতে পারিতেছেন না। কারণ, এই সময়ে সরকারের জাহাজাদির সংখ্যা এত অধিক নাই যে, সেই সমস্ত জাহাজ এই সব আমদানী রপ্তানি কার্য্যে নিযুক্ত থাকিবে। তাই আমদানির অভাবে লবণের এবং কাপড়ের মূল্য বৃদ্ধি হওয়াতে দেশে হাহাকার উপস্থিত। কেহ কেহ বা মৃত্যুকে বরণ করিতেছেন। কেহ বা অন্য লোকদিগকে খুন করিয়া তাহাদিগের বসন কাড়িয়া লইতেছেন। আর কেহ বা বল্কল পরিধান করিয়া লজ্জা নিবারণ করিতেছেন। জাহাজাদির অভাবে তুলা আমাদের দেশে আনয়ন করা যাইতেছে না।

ভারত হইতে টাকা ধার পাইলে সরকারের আর বিদেশ হইতে রৌপ্য কিনিতে হইত না। এবং এই সমস্ত টাকা দ্বারা সৈনিকদিগের কাপড়, খাদ্যদ্রব্য ও রাইফেল প্রভৃতি ক্রয় করা যাইতে পারিত। আর ভারতবাসীরাও বেশ টাকা ধার দিয়া সুদের দ্বারা মূল ধন বৃদ্ধি করিতে পারিত।

টাকা সঞ্চয় করিয়া রাখার কোনই উপকারিতা নাই। কারণ, তাহাতে মূলধন বর্দ্ধিত হওয়া দূরে থাকুক, বরং চোর দস্যু দ্বারা অপহৃত হইবার অনেক সম্ভাবনা আছে। টাকা সঞ্চয় করিয়া না রাখিয়া war loan দেওয়া অথবা Post office Savings bankএ রাখা যে অনেক শ্রেয়ঃ, তাহা আর বিশেষ করিয়া কাহাকেও বুঝাইবার বোধ হয় বিশেষ প্রয়োজন নাই।

প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

১। বঙ্গদেশের বর্ত্তমান কৃষি ও বাণিজ্য। সিরাজগঞ্জ-নিবাসী শ্রীব্রজেন্দ্র-কুমার রায় বিদ্যাবিনোদ প্রণীত, মূল্য ।০। নামেই বিষয় বিবৃত। প্রভূত পরিশ্রমের ফল। এক স্থানে এত সংবাদ কোথাও পাইবার উপায় নাই। গৃহ পঞ্জিকার ন্যায় এই পুস্তক প্রচারিত হইবার যোগ্য।

২। আত্মদান। শ্রীকালীনাথ ঘোষ কর্ত্তৃক প্রণীত ও প্রকাশিত। মূল্য ।০।

এই পুস্তকে কোশল রাজের আদর্শ জীবনের কাহিনী দ্বারা প্রতিপন্ন করা হইয়াছে, সততা এবং ধর্ম্মভাবের দ্বারা জগৎকে জয় করা যায়। পুস্তকের শেষাংশ এত সুন্দর হইয়াছে যে, চক্ষের জল সম্বরণ করা যায় না। এই পুস্তক খানি ছাত্রগণের অভিনয়ের যোগ্য। সুদৃষ্টান্ত দ্বারা ছাত্রগণের মধ্যে ধর্ম্ম ভাব বদ্ধমূল করার চেষ্টা ভিন্ন এ দেশের মঙ্গল নাই। গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য সফল হউক।

৩। কথকতা। প্রথম খণ্ড। শ্রীরাজ-কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত, মূল্য ॥৵০ আনা।

জগাই মাধাই উদ্ধার, জড়ভরত ও বামন-ভিক্ষা, এই তিনটী পালা এই পুস্তকে প্রকাশিত হইয়াছে। রাজকুমার বাবু সুগায়ক। পরন্তু তিনি হাস্যরসোদ্দীপনে একজন অদ্বিতীয় ব্যক্তি। এই দুই গুণ থাকাতে এবং নবদ্বীপবাসীর আদর্শ বাঙ্গালা ভাষা তাঁহার সহায় থাকায়, তাঁহার কথকতা প্রাণস্পর্শী ও মনোজ্ঞ হয়। তাঁহার কথকতা শ্রবণে মোহিত হয় নাই, এমন লোক আমরা দেখি নাই। কিন্তু কথকতার সে সকল জীবন্ত ভাব যে পুস্তকে লিপিবদ্ধ করা যায়, আমাদের সে বিশ্বাস নাই। কথা নিবদ্ধ হইলেই কথকতা হয় না। কথকতার প্রাণ রসবোধ। রসবোধ ভিন্ন কথকতা নীরস পুস্তকের কাহিনী মাত্র। এজন্য আজকাল অনেকের কথকতা শুধু বাকাড়ম্বরে পরিণত হইয়া থাকে। এরূপ পুস্তক প্রচারের আমরা মোটেই পক্ষপাতী নই। রাজকুমার বাবুর কথকতা যাঁহারা শুনিয়াছেন, তাঁহারা এই পুস্তক পাঠে সুখী হইবেন বলিয়া আমরা মনে করি না। ইহা যেন কায়াহীন ছায়া, ভাবহীন কাহিনী, কর্কশ কল্পনার জৃম্ভন মাত্র। যাঁহাদের পরামর্শে এই পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে, তাঁহাদের পরামর্শের সমীচীনতা আমরা কিছুতেই স্বীকার করিতে পারি না। তবে তিনি বলেন, তাঁহার তিরোধান হইলে এ সব কথা লয়প্রাপ্ত হইবে। যদি তাহা রক্ষা করার সম্ভাবনা থাকে, তবে তাহা হউক, আমরা আপত্তি করি না। যাঁহারা তাঁহার কথকতা শুনেন নাই, তাঁহাদের ইহা পাঠে উপকার হইতে পারে। তাহা হউক, তাহা হউক।

৪। ব্রাহ্মণ্য সম্পদ। বাঁকীপুর ব্রাহ্মণ সভার মহাধিবেশনে সভাপতি শ্রীযুক্ত রাজা শশিশেখরেশ্বর রায়বাহাদুর প্রদত্ত বক্তৃতার বঙ্গানুবাদ। মূল্য ৵০। এই সুচিন্তিত উপদেশের শেষাংশে উল্লিখিত হইয়াছে—"বল দেব, বল, আমাদের মুক্তিবিধান কবে করিবে? আমরা ত জীবন্ত প্রেত! হাত পা লইয়া উঠিয়া হাঁটিয়া বেড়াইতেছি, সভা করিতেছি, বক্তৃতা করিতেছি, হাততালি দিতেছি; কিন্তু তুমি ত সর্ব্বজ্ঞ পরমপুরুষ, পরম দেব, তুমি তো জানিতেছ, জীবিত থাকিয়াও প্রেতত্ব দশায় আজি যে আমরা পৌঁছিয়াছি।" দল ও গণ্ডী-মাহাত্ম্যে অন্ধ ও আত্মহারা নয়, এরূপ লোক জগতে বড় বিরল; কিন্তু রাজা বাহাদুরের জীবন অন্য প্রকার। অন্ধতা কাহাকে বলে, তিনি তাহা জানেন না। এই জন্য তাঁহার লেখা আমরা বিশেষ মনোযোগসহ পাঠ করিয়া থাকি। এই পুস্তক খানিতে অনেক সুন্দর সুন্দর কথা লিপিবদ্ধ হইয়াছে। পড়িয়া সুখী হইলাম।

৫। আর্য্য পৌণ্ড্রকের বৃত্তি-বিচার। শ্রীমণীন্দ্রনাথ মণ্ডল প্রণীত, মূল্য ৵০।

১৯১১ খ্রীষ্টাব্দের বেঙ্গল সেন্সাস রিপোর্টে পোদজাতির পরম্পরাগত জীবিকা মৎস্যধারণ ও মৎস্য-বিক্রয় বলিয়া লিখিত হইয়াছে। ইহা তাহার প্রতিবাদ। সঞ্জীবনী হইতে পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত আকারে প্রকাশিত। সুলিখিত প্রবন্ধ।

লগস্ বা ব্রহ্ম-স্ফূর্ত্তি।

(১)

খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মশাস্ত্রগুলির মধ্যে যোহন-লিখিত সুসমাচার একখানি গভীর আধ্যাত্মিক গ্রন্থ। এই গ্রন্থের প্রারম্ভে একটী গূঢ় রহস্যজনক শব্দের ব্যবহার হইয়াছে। শব্দটীর নাম লগস্ (Logos) —গ্রীক্ ভাষার শব্দ। সুসমাচারের অনুবাদকেরা ইহার অর্থ করিয়াছেন "বাক্য।"

আমরা এ অর্থ সম্বন্ধে এস্থলে কিছুই বলিতে ইচ্ছা করি না। আমরা মূল গ্রীক্ হইতে লগস্ সম্বন্ধে যোহন যাহা লিখিয়াছেন, তাহাই অনুবাদ পূর্ব্বক উদ্ধৃত করিতেছি— "প্রারম্ভে লগস্ ছিলেন, আর লগস্ ঈশ্বরের সঙ্গে ছিলেন, আর লগস্ ঈশ্বর ছিলেন। তিনি প্রারম্ভে ঈশ্বরের সঙ্গে ছিলেন। সমস্ত তাঁহা দ্বারা জাত হইয়াছে ; এবং যাহা জাত হইয়াছে, তন্মধ্যে কিছুই তাঁহা ব্যতিরেকে হয় নাই। তাঁহাতে জীবন ছিল, আর জীবন মনুষ্যগণের জ্যোতিঃ ছিল। এবং জ্যোতিঃ অন্ধকারের মধ্যে বিভাসিত হইতেছে ; আর অন্ধকার তাহাকে অবলম্বন করিল না। * * * * লগস্ মাংস হইলেন ও আমাদের মধ্যে প্রবাস করিলেন, এবং আমরা তাঁহার মহিমা দেখিলাম, পিতা হইতে একজাতের মহিমার ন্যায়, কৃপা ও সত্যে পরিপূর্ণ।"

এই উক্তি গুলিতে এমন কতকগুলি কথা আছে, যাহা কেবল খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মেরই আবিষ্কৃত সত্য নহে। যোহনের বহু পূর্ব্বে গ্রীক্গণ ও গ্রীক্ ভাবাপন্ন ইহুদীগণ লগস্ তত্ত্বের আলোচনা করিয়া গিয়াছেন। আমরাও ঐ সকল মনীষীগণের চরণপ্রান্তে বসিয়া ও মহর্ষি যোহনের ধারণা অবলম্বন পূর্ব্বক লগস্ তত্ত্ব সম্বন্ধে গুটিকতক কথা বলিতে ইচ্ছা করিয়াছি। আশা করি, পাঠকগণ অনুগ্রহপূর্ব্বক সহিষ্ণুতার সঙ্গে পাঠ করিবেন।

গ্রীক্ জগতে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে যোহনের কথাগুলি একটু তলাইয়া দেখা আবশ্যক। (১) লগস্ শব্দটা গ্রীক্ ব্যাকরণানুসারে প্রথমার এক বচনে পুংলিঙ্গে ব্যবহৃত হইয়াছে। অতএব যোহনের ধারণায় লগস্ ব্যক্তিত্ব (personality) সম্পন্ন।

(২) প্রারম্ভে, অর্থাৎ যখন সৃষ্টি রচিত হয়, তখন লগস্ বিদ্যমান ছিলেন। এতদ্বারা লগসের অনাদিত্ব মানা হইয়াছে।

(৩) এই লগস্ ঈশ্বরের সঙ্গে বা ঈশ্বরাভিমুখী ছিলেন। গ্রীক্ "প্রস্" (pros) শব্দের অর্থ সঙ্গ (with) ও অভিমুখ (toward) দুইই হইতে পারে। সঙ্গ বল, আর অভিমুখ বল, এই "প্রস্" শব্দের ব্যবহারে ঈশ্বরের ব্যক্তিত্ব (personality) হইতে লগসের ব্যক্তিত্ব পৃথক্ স্বীকার করা হইয়াছে।

(৪) "লগস্ ঈশ্বর ছিলেন" বা শাব্দিক অনুবাদানুসারে "ঈশ্বর লগস্ ছিলেন।" শব্দের পর্য্যায় যাই হউক, অর্থে তারতম্য নাই। "লোকটা ধনী ছিল" আর "ধনী ছিল লোকটা" একই কথা। "লগস্ ছিলেন ঈশ্বর" আর "ঈশ্বর ছিলেন লগস্" একই

কথা। যে দিক দিয়া দেখ না কেন, যোহন এই উক্তি দ্বারা লগসের ঈশ্বরত্ব মানিয়াছেন। "সঙ্গ" বা "অভিমুখ" শব্দের প্রয়োগে ঈশ্বরের ব্যক্তিত্ব হইতে লগসের ব্যক্তিত্ব পৃথক্ মানা হইয়াছে, আবার সঙ্গে সঙ্গেই লগস্‌কে ঈশ্বর বলা হইতেছে। ইহার অর্থ কি? ধর্ম্মতত্ত্বানুসারে যদিও লগস্ ব্যক্তিত্বে (in personality) ঈশ্বর হইতে ভিন্ন, তথাপি স্বরূপে (in essence) ঈশ্বর হইতে অভিন্ন—দুইই এক। কথাটা খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের একটা paradox ; কিন্তু এরূপ paradox দার্শনিক জগতেও অনেক আছে।

(৫) "সমস্ত তাঁহা দ্বারা জাত হইয়াছে।" "দ্বারা" শব্দটা করণ কারকের দ্বারা কর্ত্তৃত্ব বোধক নহে। কর্ত্তাতো ঈশ্বর, লগস্ কেবল নিমিত্ত কারণ (instrumental cause) মাত্র।

(৬) এই লগসে জীবন ছিল। লগস্ জীবনাধার। সমগ্র সৃষ্টিতে যে জীবনের লীলা দেখিতেছ, তাহা ঐ লগসস্থ আদি জীবনের প্রকাশ।

(৭) ঐ জীবন মনুষ্যগণের জ্যোতিঃ। যোহন ঋষি সৃষ্টির সমষ্টি ভাব ছাড়িয়া ব্যষ্টির দিকে আসিতেছেন, এবং নানা ব্যষ্টির মধ্য হইতে মনুষ্যকে গ্রহণ পূর্ব্বক মানুষের সঙ্গে লগসের সম্বন্ধ দেখাইতেছেন। যিনি এই সমষ্টিরূপী বিশাল বিশ্বের জীবন, তিনিই এই ব্যষ্টিরূপী ক্ষুদ্র মানবেরও জীবন। ঐ জীবনই আবার জ্যোতিঃ স্বরূপ। জীবনরূপে যিনি জগতের প্রতি অণু পরমাণুতে প্রবিষ্ট হইয়া আছেন, তিনিই জ্যোতিঃ রূপে সমগ্র বিশ্ব আলোকিত করিতেছেন। ঐ বিশ্ব জীবন মানুষের জীবন—ঐ বিশ্ব-জ্যোতিঃ মানুষেরও জ্যোতিঃ। বিশ্বে ও মানবাত্মায় একই জীবন ও জ্যোতির খেলা। জীবন ও জ্যোতিঃ একই - একেরই দুই ভাব, দুই নাম।

(৮) ঐ জ্যোতিঃ অন্ধকারের মধ্যে বিভাসিত হইতেছে, কিন্তু অন্ধকার তাহা অবলম্বন করিল না অন্ধকার যদি জ্যোতিকে অবলম্বন করিত, তাহা হইলে সে আর অন্ধকার থাকিত না, সেও জ্যোতির্ম্ময় হইয়া যাইত। যোহন ঋষি আপনার অন্তর্দৃষ্টিতে জগতের জীবন ও জগতের জ্যোতিঃ অনাদি লগস্‌কে অবলোকন করিতেছেন। তিনি সেই জগতের জ্যোতিঃকে মানুষের জীবন ও মানুষের জ্যোতিঃরূপে অনুভব করিতেছেন। কিন্তু এই বিপুল নরসঙ্ঘ রাহুগ্রস্ত চন্দ্রমার ন্যায় পাপের তিমিরে তিমিরাবৃত; এমন কি, সেই তিমির ও মানবাত্মায় কোন প্রভেদ নাই। এই আত্মাই যেন পাপস্পর্শে তিমির হইয়া গিয়াছে। যোহন সেই তিমির মধ্যে জীবন ও জ্যোতির্ম্ময় লগস্‌কে প্রদীপ্ত হইতে দেখিতেছেন। যদি তিমির তাঁহাকে অবলম্বন করে, তবে তাহার তিমিরত্বের অবসান হয়; কিন্তু হায়! তিমির সেই তিমিরাতীতকে হাতে পাইয়াও তাঁহাকে অবলম্বন করিল না—তাঁহাকে গ্রাহ্য করিল না!

(৯) "লগস্ মাংস হইলেন" ("the Logos became flesh") মায়াবাদী জড়ের অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। তাঁহার চিন্তায় রজ্জুতে সর্প-ভ্রমের ন্যায় অজড়ে জড়ের ভ্রান্তি বা অধ্যারোপ হইতেছে। যোহনের চিন্তায় লগসের মাংস হওয়ার অর্থ অধ্যারোপ নহে—অমাংসের মাংসরূপে প্রতীয়মান হওয়া নহে। এদিকে জড়বাদী পরিণামবাদে বিশ্বাস করেন। তাঁহার মতে যেমন দুগ্ধ পরিবর্ত্তিত হইয়া দধি হয়, রৌপ্যখণ্ড পরিবর্ত্তিত হইয়া টাকা হয়, সেইরূপ এই বিশ্ব ব্যাপারটা

প্রকৃতির পরিণাম মাত্র। লগসের মাংস হওয়ার অর্থ এইরূপ লগসের মাংসরূপে পরিণত হওয়াও নহে। জড় জড়ে পরিবর্ত্তিত হইতে পারে—জড় জড়ে পরিণত হইতে পারে। কিন্তু অজড় জড়ে পরিবর্ত্তিত বা পরিণত হইতে পারেন না। তা ছাড়া যিনি অনন্ত, তিনি শান্ত হইতে পারেন না। তবে অনাদি অনন্ত লগসের সান্ত মাংস হওয়ার অর্থ কি? আমাদের বুদ্ধি যতটুকু বুঝিতে পারে, ইহার অর্থ লগসের মাংসে স্ফূর্ত্তিমান বা প্রকাশিত হওয়া। মাংস (বা sarx) শব্দটা এখানে রূপকালঙ্কারে ব্যবহৃত হইয়াছে। রূপক ভাঙ্গিলে মাংসের অর্থ দাঁড়ায় মানুষ। লগস্ মাংস হইলেন অর্থ লগস্ মনুষ্য হইলেন। যেমন অজড়ের জড় হওয়া অসম্ভব, তেমনি অমানুষের মানুষ হওয়াও অসম্ভব। অতএব লগসের মানুষ হওয়ার অর্থ মানুষে লগসের স্ফূর্ত্তি বা প্রকাশ। এ কারণ খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের অবতারবাদ বেদান্তের অধ্যারোপ ও সাঙ্খ্যের পরিণামবাদ হইতে বিভিন্ন। মানুষে লগসের স্ফূর্ত্তি বা প্রকাশের নাম লগসের মাংস বা মানুষ হওয়া। অতএব খ্রীষ্টীয় অবতার বাদকে "স্ফূর্ত্তিবাদ" বা "প্রকাশবাদ" নামে অভিহিত করা যাইতে পারে।

(১০) মনুষ্যে স্ফূর্ত্তিমান বা প্রকাশিত হইয়া লগস্ "আমাদের মধ্যে" অর্থাৎ নরলোকে প্রবাস করিলেন।

(১১) দেহধারী বা মনুষ্যে স্ফূর্ত্তিমান ঐ লগস্ মহিমাময়। ঐ মহিমা পিতা হইতে এক জাতের মহিমার ন্যায় (glory as cf the only begotten from the father), কৃপা ও সত্যে পরিপূর্ণ। এখানে লগস্‌কে "পিতা হইতে একজাত" বলা হইয়াছে। একজাত—গ্রীক্ mono-genes—only begotten. লগস্ যিনি অনন্ত ঈশ্বরের সঙ্গে নিত্য অস্তিত্ববান—যিনি স্বরূপে স্বয়ং ঈশ্বর—তিনিই আবার "একজাত"—only begotten. এ আবার কি কথা? স্বরূপতঃ ঈশ্বর, আবার "জাত"! ইহা কি সম্ভব? যোহন তাঁহাকে একজাত মাত্র বলিয়াছেন, কিন্তু মহর্ষি পল তাঁহাকে "প্রথম জাত" বা অগ্রজন্মা পর্য্যন্ত বলিয়াছেন। "ইনিই অদৃশ্য ঈশ্বরের প্রতিমূর্ত্তি ও সমুদয় সৃষ্টির প্রথমজাত।" প্রথমজাত গ্রীক্ "প্রোততকস" (prototocos). যিনি অজন্মা, তিনিই একজাত ও প্রথমজাত, এ কি রহস্য? খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মটা কি পাগলের ধর্ম্ম? খ্রীষ্টানদের মধ্যে কি মাথাওয়ালা লোক নাই যে, তাহারা এমন এমন কথা বিশ্বাস করে? তাঁহাদের মধ্যে মাথাওয়ালা লোক থাকুক আর না থাকুক, তাঁহাদের শাস্ত্রে সেই অনাদি অনন্ত লগসকে "একজাত" ও "প্রথম জাত" বলা হইয়াছে। কেন বলা হইয়াছে, পরে আমরা এ রহস্য বুঝিতে চেষ্টা করিব।

যোহন ঋষি খ্রীষ্টভক্ত ছিলেন। সুতরাং তাঁহার দেহধারী লগস্ যীশুখ্রীষ্ট।

(২)

পাঠক, যোহনকে ছাড়িয়া এখন গ্রীক জগতে চলুন। গ্রীক্-জগতে লগস্ তত্ত্বের আলোচনা প্রথম প্রথম হেরাক্লিতস্ (Heraclitus) নামক একজন প্রাচীন দার্শনিকের রচনায় দৃষ্ট হয়। হেরাক্লিতস্ (৫৩৫-৪৭৫ পূঃ খ্রীঃ) ইফিষস্ নগরে বিদ্যমান ছিলেন। তাঁহার রচনার যতটুকু অংশ র'হিয়া গিয়াছে, তাহা এত গভীর যে একালের জড় সভ্যতার কোলে প্রতিপালিত জড়ভাবপন্ন দার্শনিকগণ সহজে বুঝিতে পারেন না। মহর্ষি

হেরাক্লিতস্ একজন মহা ভাবুক ছিলেন। ভাবের ভাবুক না হইলে ভাবুকের কথা বোঝা সহজ নহে। তাঁহার দার্শনিকতার দুটো দিক্ ছিল, একটা বহিরঙ্গ, অপরটা অন্তরঙ্গ—একটা "খোসা" (husk), অপরটা "শাঁস"(kernel); লোকে যে বহির্জগৎ বলিয়া একটা জিনিসের অস্তিত্বে বিশ্বাস করে, তিনি তাহাও মানিতেন। তবে তাঁহার বহির্জগৎটা অস্তিত্বের অভিধানে খোসামাত্র—a symbolic system—একটা প্রতিরূপ মাত্র। এই প্রতিরূপ প্রকৃত তথ্যকে কতকটা প্রকাশ করে, আবার কতকটা ঢাকিয়া রাখে। ঐ আধ-ঢাকা আধ-খোলা তথ্যই প্রকৃত শাঁস—এই দৃশ্যমান জগতের জীবন। জন্ম ও মৃত্যুর অসংখ্য চক্রে উৎপত্তি, বৃদ্ধি, ক্ষয়, নাশ ও পুনরুৎপত্তির অসংখ্য আবর্ত্তে ঐ জীবনেরই স্ফূর্ত্তি। যাহার নাম প্রকৃতির লীলা বা cosmic process, তাহা ঐ জীবনেরই লীলা। অন্তর্জগৎ বল, আর বহির্জগৎ বল, সব একই নিয়মে আবদ্ধ, একই নিয়মে চালিত। সমস্ত অস্তিত্বের অন্তরালবর্ত্তী—সমস্ত অস্তিত্বের পরিচালক ঐ নিয়মের নামই লগস্। ঐ লগসই Zeus বা—উনিই প্রকৃতি বা জাগতিক ঋত * (cosmic process)—উনিই Psuche বা জীবনতত্ত্ব। অতএব হেরাক্লিতসের লগস আমাদের বৈদিক ঋষিদের আবিষ্কৃত ঋতের ন্যায়। সমগ্র বিশ্বের আড়ালে যে ঋত বা নিয়ম দেখিতেছ, তাহাই লগস। জড় বল বা জীব বল, সমস্ত ঐ ঋত দ্বারা চালিত। ঐ লগস বা ঋত এক—সর্ব্বত্র এক, একই স্বভাব, একই স্বরূপ। যদি জগৎ নিয়ন্তা লগস এক ও একই স্বভাব, তবে এই জগতে এত বৈচিত্র্য ও বৈষম্য কেন দেখিতে পাই? হেরাক্লিতসের মতে এই বৈচিত্র্য ও বৈষম্য কেবল দৃষ্টতঃ। যিনি এই ঋত বা লগসকে জানেন, তিনি নিশ্চয়ই স্বীকার করিবেন যে, এই নানা ব্যষ্টি মিলিয়া একই সমষ্টি বা একত্ব উৎপাদন করে। যেমন নানা সুর একই তানে আবদ্ধ, সেইরূপ একই লগস নানা বৈষম্যে সাম্য স্থাপন করে। অতএব এই লগস বা ঈশ্বরই দিবা, ঈশ্বরই রাত্রি, ঈশ্বরই শীত, ঈশ্বরই গ্রীষ্ম, ঈশ্বরই বিগ্রহ, ঈশ্বরই সন্ধি, ঈশ্বরই প্রাচুর্য্য, ঈশ্বরই অভাব।

এ সব ভাবুকের কথা, সহজ বুদ্ধিতে বোঝা অসম্ভব। হেরাক্লিতস্ এক তত্ত্বের অনুধ্যায়ী ছিলেন। তিনি এই বিচিত্র বিশ্বের অন্তরালে সেই একই তত্ত্ব দেখিয়াছিলেন। জড় ও জীব সেই এক তত্ত্বে বাঁধা। সেই এক তত্ত্ব ভিন্ন জগৎ হইতে দূরে আর কোন ঈশ্বর নাই। আবার ঐ এক ঈশ্বর অসংখ্য দেব দেবীতেও বিভক্ত হন নাই। তিনি অনন্ত ও বিশ্বব্যাপী, তিনি মন্দিরে বা মন্দিরের পূজা অর্চ্চনায় আবদ্ধ নহেন। তাঁহাকে যদি পাইতে চাও, তবে আপনার অন্তরে তাঁহার অন্বেষণ কর।

---

* "ঋত" শব্দটা বৈদিক। ঋগ্বেদের বহুস্থানে উহার ব্যবহার হইয়াছে। ঋগ্বেদের বঙ্গানুবাদক ৺রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় প্রায়ই ঋতের অর্থ সত্য করিয়াছেন। আজ কালকার বৈদিক আলোচনার তুলনায় রমেশবাবুর সময় একটু পুরাতন হইয়া পড়িয়াছে। এ কালের পাশ্চাত্য বৈদিক পণ্ডিতগণ ঋতের অর্থ cosmic process বা cosmic order করেন। আমাদের বৈদিক পিতৃগণের চিন্তায় এই মহা বিশ্বটা এলোমেলো নহে। ইহা ঋত বা নিয়মে আবদ্ধ। গ্রীক cosmosও নিয়মাবদ্ধ বিশ্ব। আমাদের বৈদিক্ ঋষিরা খ্রীষ্টবাদীদের ন্যায় এই নিয়মাবদ্ধ বিশ্বের ভিতর একটা ঋত-বিরুদ্ধ শক্তি॰ দেখিয়াছিলেন। তাঁহারা ঐ শক্তিকে "নির্ঋতি" নামে অভিহিত করিয়াছেন। ঋগ্বেদের ভাষ্যকার সায়নাচার্য্য ঐ নির্ঋতির অর্থ "পাপ দেবতা" করেন। বৈদিক পাপ দেবতায় ও বাইবেলের সয়তানে কি প্রভেদ?

ঋষি আপনার এই এক তত্ত্বের অনুধ্যানে এমন নিমগ্ন ছিলেন যে, দ্বৈত বোধ তাঁহা হইতে দূর হইয়া গিয়াছিল। সমগ্র বিশ্বে সেই একেরই স্ফূর্ত্তি। আবার বিশ্বটার কোন বাস্তব অস্তিত্ব নাই, এটা একটা প্রতিরূপ মাত্র। যিনি বাস্তব, তাঁহাকে জানাই জ্ঞানের চরমোদ্দেশ্য। "Of what profit to men is the knowledge of Nature? The fairest Cosmos is merely a rubbish-heap poured out at random."

তবু মানুষ এই "rubbish heap' বা আবর্জ্জনা স্তূপকেই ভালবাসে। ঋষি তাহাদের অজ্ঞতা দেখিয়া আক্ষেপ করিতেন। যে সকল দার্শনিকেরা এই "rubbish-heap', বা আবর্জ্জনা স্তূপের তত্ত্ব নির্ণয়ে জড়বাদের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মত খণ্ডন করিতেন। আমাদের দেশের বৈদান্তিকেরা এই দৃশ্যমান "rubbish heap" বা আবর্জ্জনা-স্তূপের দৃশ্যমান অস্তিত্বের রহস্য ভেদ করিবার জন্য মায়াবাদ উদ্ভাবন করিয়াছেন। মহর্ষি হেরাক্লিতসকেও বাধ্য হইয়া এই দৃশ্যমান আবর্জ্জনা-স্তূপের একটা অর্থ করিতে হইয়াছে। তাঁহাকে লগসের ক্রিয়াশক্তি বুঝাইবার জন্য এক প্রকার Hylozoistic figure বা জড় জীবনবাদী নিদর্শন ব্যবহার করিতে হইয়াছে। ঐ নিদর্শন অগ্নি। ঠিক জড় অগ্নি, তাহা নহে। যেমন ইহার প্রায় শতবৎসর পূর্ব্বে য়িহুদী ঋষি য়িরমিয় বলিয়াছিলেন, "য়িহোবা বলেন 'আমার বাক্য (বা লগস) কি অগ্নি নয়'?"—সেইরূপ ইফিষসের ঋষি হেরাক্লিতস্ বলিতেছেন "এই জগৎ (বা ঋতবদ্ধ cosmos) সকলের জন্য একই; কোন দেবতা বা মনুষ্য ইহাকে নির্ম্মাণ করেন নাই। ইহা নিত্য জীবন্ত অগ্নি স্বরূপ বিদ্যমান—(পূর্ব্বে ছিল, এখনও আছে, পরেও থাকিবে।) এই অগ্নি উপযুক্ত মাত্রায় প্রজ্বলিত, আবার উপযুক্ত মাত্রায় নির্ব্বাপিত" (kindled in due measure, and in due measure extinguished.)

ভাবুকের কথা ভাবুকই বোঝেন। আমরা কখনও জড়বিজ্ঞান পড়ি নাই। তবে শুনিয়াছি যে, নানা জাতীয় শক্তি এক অপরে গিয়া পরিণত হয়—যেমন তাপ, তাড়িত, চৌম্বক ও রাসায়নিক শক্তি। যখন তাপ তাড়িত শক্তিতে পরিণত হইল, তখন তাপের তিরোভাব ও তড়িতের আবির্ভাব হইল। একটা মরিল, অপরটা জন্মিল—একটা নিবিল, অপরটা জ্বলিল। স্ফূর্ত্তি ও নিস্ফূর্ত্তি, জ্বলা ও নেবার এই অর্থ। কিন্তু স্ফূর্ত্তি ও নিস্ফূর্ত্তি, জ্বলা ও নেবা যে ঋত বা নিয়মসূত্রে গ্রথিত, সে ঋত, নিয়ম বা লগস্ নির্ব্বিকার। আমাদের দেশের প্রাচীন ঋষিরা এক সময় সূত্রাত্মার অবধারণ করিয়াছিলেন। মণিগণ যেমন সূত্রে গ্রথিত থাকে, সেইরূপ সমস্ত ভূত ও সমস্ত লোক এই সূত্রাত্মায় গ্রথিত। সূত্রাত্মা কি ঠিক হেরাক্লিতসের Cosmic law বা লগস্ নহে? সূত্রাত্মা হইয়া লগস্ এই দৃশ্যমান জগতের নানা স্ফূর্ত্তি গাঁথিয়া রাখিয়াছেন, আবার স্বয়ং অদৃশ্য হইয়াও অগ্নিস্ফুলিঙ্গের ন্যায় জগতের এক একটা তত্ত্বকে স্ফূর্ত্তিমান করিয়া উপযুক্ত সময়ে তাহাকে অন্য এক তত্ত্বে লইয়া গিয়া নিবাইয়া দিতেছেন। এইরূপে ক্রমাগত প্রজ্বলন ও নির্ব্বাপণের প্রবাহ বহিয়া যাইতেছে—লগস্ এক হইয়াও আদি অগ্নিরূপে নানা স্ফূর্ত্তিতে স্ফূর্ত্তিমান হইতেছেন।

এ কালের একেশ্বরবাদীগণ হেরাক্লিতসের এই মতকে ভাবুকতা-মিশ্রিত অদ্বৈতবাদ বলিবেন। আমরা দার্শনিক নই—দর্শন শাস্ত্রের বাদানুবাদে প্রাণটাকে ঝালাপালা করিতে চাই না। আমরা শান্তির ভিখারী। যদি কেহ এই মাটীর পৃথিবীটা খুঁড়ে খুঁড়ে ইহার অন্তরালে একটা জীবনের স্রোত দেখাইতে পারেন, তবে আমরা সেই মহর্ষিকে সর্ব্বান্তঃকরণে ধন্যবাদ দিব, এবং যে আবর্জ্জনা-স্তূপকে দুই হাতে বুকে চাপিয়া আলিঙ্গন করিতেছি, তাহা বুক থেকে দূর করিয়া সেই জীবন-স্রোতে গা ঢালিয়া ভাসিয়া যাইব। ইফিষসের ঋষি অদ্বৈতবাদী বা অনদ্বৈতবাদী হউন, তিনি এই বিশ্ব-রহস্যের আড়ালে যে লগস্ বা জীবন-স্রোত আবিষ্কার করিয়া গিয়াছেন, তজ্জন্য তিনি আমাদের ধন্যবাদার্হ। ইফিষসের খ্রীষ্টীয়মণ্ডলীর আচার্য্য মহর্ষি যোহন বলেন,—"ঐ লগসে জীবন ছিল," ইফিষসের অখ্রীষ্টীয় জগতের প্রধান ঋষি হেরাক্লিতস্ বলেন "লগসই জগজ্জীবন," দুই ঋষি দুই প্রান্ত হইতে একই রহস্য উদ্‌ঘাটন করিতেছেন। আমরা ঐ উদ্‌ঘাটিত জীবন-তত্ত্বে কেন না প্রাণ ঢালিয়া ভাসিয়া যাই?

মহর্ষি হেরাক্লিতস্ কেবল দার্শনিক ভাবে লগস্ তত্ত্বের আলোচনা করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই। তিনি ঐ লগস্‌কে অমরত্বের পন্থা বলিয়া গিয়াছেন। তিনি বলিতেন "শবকে বিষ্ঠা অপেক্ষাও ত্বরায় দূরে ফেলিয়া দাও।" মল মূত্র কৃমিময় এ দেহটা শব নয় ত কি? এই পচা শবকে আমরা প্রতিনিয়ত ফুল-চন্দন দিয়া পূজিতেছি। হায়! কবে আমাদের তত্ত্বজ্ঞান হইবে এবং এই পচা শবকে বিষ্ঠাবৎ ঘৃণা করিতে শিখিব? তারপর পাপ প্রলোভনে প্রতিনিয়ত পরাস্ত হইয়া এই বিষ্ঠাবৎ দেহটা লইয়া বিষ্ঠাতেই পড়িয়া আছি! কোথায় পবিত্রতা?—কোথায় জয়? মহর্ষি হেরাক্লিতস্ বলিতেছেন, যে ব্যক্তি যে পরিমাণে পবিত্রতার সহিত আপনার জীবনের অন্তঃস্থ অগ্নিকে রক্ষা করিয়াছে এবং সেই অগ্নিকে যত অধিক তেজে প্রজ্জ্বলিত রাখিয়াছে, সে ব্যক্তি সেই পরিমাণে এই সংসারের আক্রমণে অটল থাকিবে এবং এই সংসারের পরপারে সেই পরিমাণে আপনার মহাপুরস্কার প্রাপ্ত হইবে। আমাদের ভারতীয় ঋষিরা সেকালে অগ্নিহোত্র করিতেন—গৃহের বেদী হইতে যজ্ঞাগ্নিকে নির্ব্বাপিত হইতে দিতেন না। মহর্ষি হেরাক্লিতসের উপদেশানুরূপ যদি অমর হইতে চাও, তবে হৃদয়ের যজ্ঞবেদী হইতে লগসরূপ অগ্নিকে নির্ব্বাপিত হইতে দিও না, বরং ঐ অগ্নিকে প্রতিনিয়ত অধিকতর প্রদীপিত রাখ।

যোহনের চিন্তায় যিনি দেহধারী লগস্, তিনি বলেন "আমিই পথ, সত্য ও জীবন।" এ পথেও যজ্ঞবেদী আছে; তাহা ক্রুশে। সে যজ্ঞে আত্মাহুতি না দিলে, না পথ পাই, না সত্য পাই, না জীবন পাই। বলিদান-রহস্য আর এক মহারহস্য, এ স্থলে তাহার আলোচনা করিবার স্থান নাই।

(৩)

মহর্ষি হেরাক্লিতসের প্রায় সম সময়ে আনাক্সাগোরস্ (Anaxagoras) নামে আর একজন দার্শনিক আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তিনিও কতকটা লগস্ তত্ত্বের আলোচনা করিয়া গিয়াছেন। ইনি লগসের পরিবর্ত্তে "নুস" (Nous) শব্দের ব্যবহার করিতে অধিক ভালবাসিতেন। গ্রীক্ অভিধানে "নুস" শব্দের সাধারণ অর্থ মন।

আনাক্সাগোরস্ আমাদের দেশের কপিল ঋষির ন্যায় জগতের উপাদান কারণে বিশ্বাস করিতেন। কপিল ঋষির ন্যায় বিনা উপাদানে জগৎ নির্ম্মাণ হইয়াছে, তাহা বিশ্বাস করিতে পারিতেন না। তিনি বলিতেন, "How could hair come from non-hair, and flesh from non-flesh?" তাঁহার মতে প্রত্যেক পদার্থের পরমাণু-সৃষ্টির প্রাক্কালে chaos-এ বিদ্যমান ছিল *। কিন্তু ঐ chaosস্থ এলোমেলো ভাবে অবস্থিত পরমাণুপুঞ্জকে শৃঙ্খলাবদ্ধ পূর্ব্বক এই বিচিত্র বিশ্ব রচনা করে কে? অতএব আনাক্সাগোরস এ কার্য্য নির্ব্বাহের জন্য নুস্ বা আদিমনের আবশ্যকতা উপলব্ধি করিলেন। গ্রীক্ ব্যাকরণানুসারে লগসের ন্যায় নুসও পুংলিঙ্গ। আনাক্সাগোরস আপনার রচনার কোন কোন স্থানে নুস্‌কে ব্যক্তিত্ববানও মনে করিয়াছেন। তাঁহার মতে নুস্ স্বরূপে একজাতীয়, পরম পবিত্র, প্রজ্ঞাশক্তি ("thought-stuff.") অতএব যিনি হেরাক্লিতসের চিন্তায় লগস্, বিশ্ব-ঋত বা বিশ্ব-নিয়ন্তা, তিনিই আনাক্সাগোরসের চিন্তায় নুস্ বা আদি প্রজ্ঞা—"thought-stuff." ঐ আদি প্রজ্ঞা বা 'thought-stuff'ই ভাবিয়া চিন্তিয়া chaos বা আদি প্রসারস্থ পরমাণুপুঞ্জকে শৃঙ্খলাবদ্ধ পূর্ব্বক এই বিচিত্র বিশ্ব রচনা করিয়াছেন। উপনিষদের ভাষায় "স তপোঽতপ্যত স তপস্তপ্‌ত্বা ইদং সর্ব্বমসৃজত যদিদং কিঞ্চ"—"তিনি চিন্তা করিলেন, চিন্তা করিয়া এই সমুদয় যাহা কিছু সৃষ্টি করিলেন।" আনাক্সাগোরসের নুস্ বা আদি প্রজ্ঞাও তো এই কাজ করিলেন। তবে লগস্, নুস্ ও উপনিষদের ব্রহ্মে প্রভেদ কোথায়?

(৪)

অতঃপর অনেক মহারথী এই বিশ্ব-ব্যূহের রহস্যভেদে প্রয়াসী হইয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে বোধ হয় প্লেটোই সর্ব্ব প্রধান ছিলেন। এ যুগে আমরা যদিও প্লেটোর সঙ্গে সর্ব্ব-বিষয়ে একমত নহি, তথাপি যতটা খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম তত্ত্বে ও পাশ্চাত্য দর্শনশাস্ত্রে প্লেটোর প্রভাব দৃষ্ট হয়, তাহাতে বোধ হয় ইউরোপীয় দার্শনিক-গগনে অদ্যাবধি প্লেটোই একমাত্র সূর্য্য, যাঁহার অস্তগমন সম্ভব বলিয়া মনে হয় না। কেবল ইউরোপ নহে, উত্তর আফ্রিকা ও এসিয়ার পশ্চিম প্রান্তও এক সময় ঐ রবি-করে উদ্ভাসিত ছিল। আজও এ রশ্মি এ সকল স্থান হইতে একেবারে অস্তমিত হয় নাই। মুসলমানেরা প্রাচীন জ্ঞান-ভাণ্ডার আলেক্‌জন্দ্রিয়ার পুস্তকাগার ধ্বংস করিয়াছে বটে এবং মুসলমানের নেত্রে অন্যান্য ধর্ম্মাবলম্বীরা কাফের, তবু কোন একটা আরবী মাদ্রাসায় প্রবেশ কর, দেখিবে, শত শত মুসলমান যুবক নতজানু হইয়া "অফলাতুনের ফল্‌সফা-মুতালা" করিতেছে *। এদিকে খ্রীষ্টবাদীগণ যদিও আপনাদের ধর্ম্ম মত গুলিকে প্রকাশিত শাস্ত্র বা revelationএর ভিত্তিতে

* Chaos এর বাঙ্গালা অনুবাদ দুষ্কর। গ্রীক্ অভিধানে ইহার সাধারণ অর্থ space লেখা হইয়াছে। আমাদের দেশের দার্শনিক ভাষায় space দেশ। আমরা space ও timeকে দেশ ও কাল বলিয়া থাকি। অতএব chaos কে সৃষ্টির প্রারম্ভস্থ মহাবিস্তার বলা যাইতে পারে, যেখানে জড়বাদীর মতে নিত্য পরমাণুপুঞ্জ এলোমেলো ভাবে অবস্থিত ছিল। আমরা এ কালের একেশ্বরবাদীগণ পরমাণুর নিত্যত্বে বিশ্বাস করি না, এবং তদ্ধেতু নিত্য পরমাণুপুঞ্জের আদি আধার chaos নামক পদার্থের আবশ্যকতাও দেখি না।

* অফলাতুন=প্লেটো; ফল্‌সফা=philosophy; মুতালা=পাঠ।

প্রতিষ্ঠিত বলিয়া বিশ্বাস করেন, তথাপি প্রাচীনকাল হইতে এ কাল পর্য্যন্ত যখনি কোন খ্রীষ্টীয় মতকে একটা দার্শনিক ভিত্তিতে দাঁড় করাইতে হইয়াছে, তখনি খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম-তত্ত্বের মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতগণ সে ভিত্তিটা প্লেটো বা তৎশিষ্য আরিষ্টটলের দার্শনিক চিন্তা মধ্যে অন্বেষণ করিয়াছেন। এ কারণ ইউরোপীয় খ্রীষ্টীয়ত্বকে গ্রীক্ পোষাক পরা বলিলে অত্যুক্তি হয় না। (ইহা দেখিয়া আমাদের বোধ হয় ভারতবর্ষে খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মকে ভারতীয় ধর্ম্ম হইতে হইলে তাহাকে একটা ভারতীয় পোষাকও পরিতে হইবে—তার প্লেটোর জামাটা একটুখানি কাটিয়া ছাঁটিয়া অঙ্গিরা, শৌনক, যাজ্ঞবল্ক্য, ব্যাসাদি ঋষি-গণের পরিচ্ছদের অনুরূপ বানাইতে হইবে, অথবা তাঁকে বিলেতী হ্যাটকোট পরিবর্জ্জন পূর্ব্বক শাক্যমুনির সন্ন্যাসীর বেশ পর্য্যন্ত ধরিতে হইবে। কথাটা অবান্তর; কিন্তু মনের দুঃখে বলিয়া ফেলিলাম, খ্রীষ্টবাদী পাঠক-গণ ক্ষমা করিবেন।)

মহর্ষি প্লেটো প্রাতঃস্মরণীয় মহর্ষি সক্রে-টিসের শিষ্য ছিলেন—উপযুক্ত গুরুর উপযুক্ত শিষ্য। তিনি নিজ গুরু সক্রেটিসের ন্যায় এক পুণ্যময় ঈশ্বরে বিশ্বাস করিতেন। এদিকে জড়ের অনাদিত্বও মানিতেন। আবার এক অনাদি ভাবজগতের (A world of ideas) অস্তিত্বে বিশ্বাস করিতেন। বর্ত্তমান জগতে যাহা কিছু দেখিতেছ, তাহা ঐ অনাদি ঈশ্বর অনাদি ভাবজগতের আদর্শে রচিত। অনাদি ঈশ্বর অনাদি পরমাণুপুঞ্জকে ভাব-জগতের বিভিন্ন ভাবের সদৃশ্যে শৃঙ্খলাবদ্ধপূর্ব্বক এই বিচিত্রতাময় বিশ্ব নির্ম্মাণ করিয়াছেন। ইহারই নাম সংক্ষেপে প্লেটোর আদর্শবাদ। আদর্শবাদী প্লেটো এ জগতের প্রত্যেক পদার্থকে পূর্ব্ব-কথিত অনাদি ভাবজগতের কোন না কোন ভাবের আদর্শে গঠিত বলিয়া মনে করিতেন। খ্রীষ্টবাদীরা এ কথাটা আর এক ভাবে ব্যক্ত করেন মাত্র। তাঁহাদের মতে সমষ্টিরূপে এই বিশ্ব জগৎ ও ব্যষ্টিরূপে ইহার প্রত্যেক পদার্থ অনাদি অনন্তিত্বে ঈশ্বরের অনাদি জ্ঞান ও অনাদি ইচ্ছায় সত্তাবান ছিল—অন্য ভাষায় ঈশ্বরের জ্ঞান ও ইচ্ছায় ভাবরূপে বিদ্যমান ছিল। প্লেটোর ভাব জগৎটা ঈশ্বরের জ্ঞান ও ইচ্ছার অভ্যন্তরে সংস্থিত বুঝিলেই গোলযোগ মিটিয়া যায়।

প্লেটো লগস্ তত্ত্ব সম্বন্ধে সুস্পষ্ট কিছুই বলেন নাই। তবু অনাদি ভাবের সাদৃশ্যে প্রত্যেক পদার্থের রচনায় তিনি আনাক্সা-গোরসের ন্যায় নুস্ বা প্রজ্ঞার আবশ্যকতা উপলব্ধি করিয়াছেন। প্লেটোর চিন্তায় এই কস্‌মস্ (Cosmos) বা ঋতবদ্ধ জগৎ একটা জীবন্ত ধীসম্পন্ন তত্ত্ব—ইহাই ঈশ্বরের এক জাত (Mono-genes) পুত্র—ইহাই পরম পুরুষের প্রতিমূর্ত্তি (The express image of the highest.)

প্লেটোর মতে ঈশ্বর পুণ্যস্বরূপ। সুতরাং তাঁহার সেই অনাদি ভাবজগৎটাও পুণ্যস্বরূপ এবং জগৎ নির্ম্মাণের অভিপ্রায়ও ঈশ্বরের পুণ্যত্বের প্রকাশ। তদ্বেতু যাহা কিছু তিনি নির্ম্মাণ করিয়াছেন, আপনারই ন্যায় পুণ্য স্বরূপ করিয়া নির্ম্মাণ করিয়াছেন।

প্লেটো সক্রেটিসের আত্মার অমরত্বে ও নৈতিকত্বেও বিশ্বাসী ছিলেন। যদিও তিনি আত্মার পূর্ব্ব অস্তিত্ব ও সেকালের অনেক দার্শনিকের ন্যায় আত্মার যোনি ভ্রমণে বিশ্বাস করিতেন, তথাপি আত্মার অমরত্ব, পাপ পুণ্যের দায়ীত্ব ও তদনুসারে দণ্ড

পুরস্কারের শিক্ষা দিয়া তিনি জগৎকে খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের আবির্ভাবের জন্য প্রস্তুত করিয়াছিলেন।

(৫)

প্লেটো ও আরিষ্টলের পর ষ্টোইক (Stoics) ও ইপিকিউরিয়ানগণ (Epicurians) গ্রীক দর্শনের রঙ্গালয়ের প্রধান অভিনেতা। ষ্টোইকেরা গ্রীসের বৈদান্তিক ও ইপিকিউরিয়ানরা গ্রীসের চার্ব্বাক ছিলেন বলিলে অত্যুক্তি হয় না। ইপিকিউরিয়ানদের সঙ্গে আমাদের এই প্রবন্ধের বিশেষ সম্পর্ক নাই। ষ্টোইকেরা লগস্‌তত্ত্ব সম্বন্ধে অনেক আলোচনা করিয়া গিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে জগতের সৌন্দর্য্য ও সৃষ্টি-কৌশল দেখিয়া মনে হয়, উহা নিশ্চয়ই কোন প্রজ্ঞাবান মন হইতে প্রসূত হইয়াছে। জগতের নানা অংশে স্ব-সম্বিদ (Self-consciousness) দৃষ্ট হয়। অতএব সমষ্টিভূত জগতও সম্বিদ্‌বিহীন নহে। বিশ্বের ঐ সম্বিৎই পরমাত্মন্—যিনি প্রাণরূপে সমগ্র বিশ্বে ব্যাপ্ত হইয়া আছেন। তাঁহাতেই সমস্ত পদার্থের বীজরূপী প্রজ্ঞা অবস্থিত। কেবল ঈশ্বরই অনাদি সত্তা। ঐ ঈশ্বর হইতে যে অংশ নির্গত হইয়া জগৎ নির্ম্মাণার্থ আগমন করে, তাহারই নাম জগতের "বীজ-প্রজ্ঞা" (Logos spermaticos) ঐ "বীজ-প্রজ্ঞা" বা বীজরূপী লগস এক, কিন্তু উনিই বহু বীজ প্রজ্ঞায় (Logoi spermaticoi) পরিণত হইয়া নানা ব্যষ্টি উৎপাদন করেন। আমাদের দেশে প্রাচীন উপনিষদের ঋষিরাও কখনও কখনও এইরূপ চিন্তা করিয়াছেন। ব্রহ্ম এক, কিন্তু নানা ব্যষ্টি সৃষ্ট্যর্থ তিনিই বহুরূপে পরিণত হইলেন। যথা,—"সোঽকাময়ত বহুস্যাঃ প্রবায়েয়েতি। স তপোঽতপ্যত স তপস্তপ্ত্বা ইদং সর্ব্বমসৃজত।" "তিনি কামনা করিলেন, আমি বহু হইব, আমি উৎপন্ন হইব। তিনি চিন্তা করিলেন, চিন্তা করিয়া এই সমুদয় যাহা কিছু সৃষ্টি করিলেন।" তৈত্তিরীয়োপনিষৎ। পুনঃ—

একোবশী সর্ব্বভূতান্তরাত্মা
একং রূপং বহুধাং যঃ করোতি।
তমাত্মস্থং যেঽনুপশ্যন্তি ধীরাস্তেষাং
সুখং শাশ্বতং নেতরেষাম ॥ কঠ, ৫।১২।

"(যিনি) এক, (সকলের) নিয়ন্তা, এবং সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মা, যিনি (স্বকীয়) একরূপকে বহু প্রকার করেন ; তাঁহাকে যে জ্ঞানীগণ আপনাতে দর্শন করেন, তাঁহাদেরই নিত্য সুখ, অন্যের নহে।

হেরাক্লিতসের ন্যায় ষ্টোইকেরাও অগ্নিকে সৃষ্টির নিদর্শন মানিয়াছেন। ঐ আদি ঐশ অগ্নি হইতে জগৎ উৎপন্ন হয়, আবার ঐ আদি ঐশ অগ্নিতে গিয়া জগৎ বিনাশ প্রাপ্ত হয়। এইরূপ বার বার জগৎ উৎপন্ন ও নাশ হইতেছে। আমাদের দেশের বৈদান্তিক শিক্ষাও এইরূপ। ষ্টোইকদিগের মতে মানবাত্মাও ঐ ব্রহ্মস্বরূপ হইতে নির্গত। মানবাত্মা অবিনাশী নহে। জগতের প্রলয়ের সঙ্গে ইহারও প্রলয় সুনিশ্চিত। পুণ্যই পরম পুরুষার্থ। যাহা প্রকৃতির ঋত, তাহারই অনুরূপ জীবন যাপন করার নাম পুণ্য বা মনুষ্য ইচ্ছাকে ঈশ্বরেচ্ছায় অনুগত করার নাম পুণ্য।

(৬)

আমরা গ্রীক্‌দের লগস্‌ চিন্তা সম্বন্ধে অনেক কথা লিখিলাম। রোমকেরা তো গ্রীক্‌দেরই শিষ্য ছিলেন ; সুতরাং এ সম্বন্ধে

তাঁহাদের মতামত উদ্ধৃত করা নিষ্প্রয়োজন। এ দিকে ইহুদীগণ আপনাদিগকে গোঁড়া একেশ্বরবাদী মনে করিতেন এবং জগতের অন্য জাতিগণকে ঘৃণা ও উপেক্ষার নেত্রে দেখিতেন। কিন্তু যখন ইহুদীদিগের জাতীয় স্বাধীনতা বিলুপ্ত হইল এবং তাঁহারা নানা জাতির মধ্যে বিক্ষিপ্ত হইয়া নানাদেশে ছড়াইয়া পড়িলেন, তখন আর তাঁহাদের ঐ গোঁড়ামি বজায় রাখিয়া চলা সম্ভব হইল না। তাঁহারা ক্রমে ক্রমে আপনাদের মাতৃভাষা ভুলিয়া গেলেন। গ্রীক্ ভাষায় তাঁহাদের ধর্ম্মশাস্ত্রের অনুবাদ হইল। ঐ অনুবাদকে "সেপ্ট্য়াজিণ্ট "(Septuagint) বা সপ্ততির অনুবাদ বলে। বিদেশে ঐ সেপ্ট্য়াজিণ্টই তাঁহাদের শাস্ত্র। অনুবাদকেরা যে সকল গ্রীক্ ভাব ঐ অনুবাদে প্রবিষ্ট করিয়াছিলেন, অজ্ঞাতভাবে বিদেশস্থ ইহুদীগণ মাতৃদুগ্ধের সঙ্গে সঙ্গে ঐ সকল ভাবে অনুপ্রাণীত হইতে লাগিলেন। তাঁহাদের বিজাতি-বিদ্বেষ ক্রমে ক্রমে বিদূরিত হইতে লাগিল এবং আপনাদের জ্ঞান-পিপাসা নিবারণার্থ ক্রমে ক্রমে তাঁহারা গ্রীক্ দার্শনিকদের পুঁথিও হাতে তুলিয়া লইতে লাগিলেন। এইরূপে বিশেষভাবে আলেক্জন্দ্রিয়া নগরে এক প্রকার গ্রীক্ ভাবাপন্ন ইহুদীদার্শনিকতার আবির্ভাব হইল। যেমন এ কালে আমাদের দেশে পাশ্চাত্য দর্শন বিজ্ঞানের সংস্পর্শে আসিয়া আমাদের পণ্ডিতেরা হিন্দুধর্ম্মের এক প্রকার অভিনব ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন, সেইরূপ, খ্রীষ্টীয়ধর্ম্মের অভ্যুদয়ের কিছু পূর্ব্বে আলেক্জন্দ্রীয় ইহুদী পণ্ডিতগণও প্লেটো ও ষ্টোইক্ প্রভৃতির দার্শনিক চিন্তার সংস্পর্শে আসিয়া আপনাদের ধর্ম্ম-শাস্ত্রের একপ্রকার অভিনব ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হইলেন। ইঁহারা শাস্ত্রের শাব্দিক ব্যাখ্যা ছাড়িয়া একপ্রকার রূপক ব্যাখ্যা আরম্ভ করিয়াছিলেন, এবং এইরূপে খ্রীষ্টীয়ধর্ম্মের উচ্চ আধ্যাত্মিক আদর্শের জন্য পথ প্রস্তুত করিতে লাগিলেন।

আলেক্জন্দ্রীয় ইহুদী-শিক্ষকদিগের মধ্যে ফিলো (Philo) * অত্যন্ত বিখ্যাত হইয়া গিয়াছেন। ইনি খ্রীষ্টের জন্মের প্রায় ২৫ বৎসর পূর্ব্বে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার মতে ঈশ্বর স্বরূপতঃ অজ্ঞেয়। আমরা কেবল এইমাত্র জানি যে, তিনি আছেন, কিন্তু তিনি যে কি, তাহা আমরা জানি না। ঈশ্বর আপনার কর্ম্মদ্বারা তো জগতে অস্তিত্ববান্। কিন্তু স্বরূপতঃ নন। লগস্ ঈশ্বর ও জগতের মধ্যবর্ত্তী। তিনি প্রজ্ঞা (sophia) রূপে ঈশ্বরের সঙ্গে বাস করেন। ভাবজগৎ (অর্থাৎ প্লেটোর ভাব জগৎ) ঐ লগসে অবস্থিত। যেমন কোন নগর-নির্ম্মাতা নগর নির্ম্মাণের পূর্ব্বে ঐ নগরের আদর্শ আপনার মনোমধ্যে রক্ষা করেন, সেইরূপ, ঈশ্বরের প্রজ্ঞারূপী লগসে এই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতের ভাব সকল (ideas) আদর্শরূপে বিদ্যমান ছিল। ফিলোর মতে ঈশ্বর তো অনাদি, কিন্তু এই লগস্ অনাদি নহেন। তবু লগসের উৎপত্তি আমাদের ও অন্যান্য সৃষ্ট পদার্থের উৎপত্তির ন্যায়ও নহে। ইনি ঈশ্বরের "প্রথমজাত পুত্র" (the first begotten son.) আমরা যারা অপূর্ণ জীব, আমাদের জন্য লগসই ঈশ্বর। ঈশ্বরের

* ইংরেজী উচ্চারণ ফাইলো। এইরূপ হেরাক্লিতস, হেরাক্লাইটস্ ইত্যাদি। ইংরেজী উচ্চারণ যে সর্ব্বত্র ঠিক, তাহা নহে। অভ্যাসবশতঃ আমরা ইংরেজী উচ্চারণ পছন্দ করি। গ্রীক্ নামগুলি বাঙ্গালার গ্রীকের অনুরূপ উচ্চারণ করাই বোধ হয় ভাল।

প্রজ্ঞা লগসের মাতা *। লগস্ ঈশ্বরের জ্যেষ্ঠপুত্র, আর জগৎ ঈশ্বরের কনিষ্ঠপুত্র। ঈশ্বর আপনার প্রেম নিবন্ধন জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন। এই সৃষ্টিকার্য্য তিনি লগস্ দ্বারা সম্পন্ন করিয়াছেন, আবার লগস্ দ্বারাই তিনি আপনাকে জগতের নিকট প্রকাশিত করিয়াছেন। এই লগস্ই ঈশ্বরের সন্নিধানে জগতের প্রতিনিধি, প্রধান যাজক (high priest), অনুরোধকারী (intercessor), এবং উকীল (paraclete). ঈশ্বরের অনুবর্ত্তী হইয়া চলা ও ঈশ্বরের অনুকরণ করাই মানুষের ধর্ম্ম। যাহাতে মানুষ ঈশ্বরের মন্দিররূপে পরিণত হইতে পারে, তদর্থে তাহার প্রয়াসী হওয়া কর্ত্তব্য। কেননা মানুষ যখন ঈশ্বরের পবিত্র মন্দিররূপে পরিণত হয়, তখনই সে দুর্ব্বলতা হইতে মুক্ত হইয়া সবল হয় ও অজ্ঞানতা হইতে মুক্ত হইয়া জ্ঞানী হয়। মানুষের পরম পুরুষার্থ ঈশ্বরে অবস্থিত জীবন।

আলেকজন্দ্রীয় শিক্ষকেরা লগস্‌কে কেবল প্রজ্ঞা মাত্রই মানিতেন না। এ ভাবটা অবশ্য তাঁহারা গ্রীকদর্শন হইতে গ্রহণ করিয়াছিলেন। ঈশ্বরের প্রজ্ঞা ছাড়া তাঁহারা লগস্‌কে ঈশ্বরের বাণী বলিয়াও বিশ্বাস করিতেন। য়িহুদীদের ধর্ম্ম শাস্ত্রানুসারে ঈশ্বর বলিলেন, আর জগৎ উৎপন্ন হইয়া গেল। অতএব এই বাক্যার্থেও লগস্ দ্বারা সৃষ্টি রচিত হইয়াছে। হিব্রু-বাইবলে "মেম্রা" নামে একটা শব্দ আছে, যাহা ঈশ্বরের বাণী বা আদেশ-বাচক। পূর্ব্বোক্ত সেপ্টুয়াজিণ্ট অনুবাদে ঐ ঐশীবাণী বা আদেশবাচক "মেম্রা" শব্দটা "লগস্" শব্দে অনূদিত হইয়াছে। বোধ হয় আমাদের সুসমাচারের অনুবাদকেরা বাক্যার্থ "মেম্রা" শব্দের "লগস্" অনুবাদ দেখিয়া, "লগস্" শব্দের "বাক্য" অনুবাদ করিয়াছেন।

প্রবন্ধ অনেক বাড়িয়া উঠিল। আমরা আর গোটাকতক কথা বলিয়া পাঠকগণের নিকট বিদায় লইতেছি।

(১) যতদূর আমরা দেখিয়াছি, এ পর্য্যন্ত লগসের আমরা তিনটা অর্থ পাইয়াছি:—ঋত, প্রজ্ঞা, বাণী।

(২) এই দৃশ্যমান জগৎ সত্য হউক বা সত্যের একটা নিদর্শন (symbol) হউক, প্রাচীন গ্রীকগণের চিন্তায় ইহা একটা ঋত শৃঙ্খলে আবদ্ধ। ইহা যে কেবল প্রাচীন গ্রীকদিগেরই চিন্তা ছিল, তাহা নহে। যখন আমাদের বৈদিক পিতৃগণ সপ্তনদীতটে * উপনিবেশ স্থাপন করিতেছিলেন, তখন তাঁহারাও আপনাদের পুণ্যতম বেদমন্ত্রে লগস্ গাথা গান করিতেন। পরবর্ত্তীকালে উপনিষদের চিন্তায়ও ঐ ঋতের পরিচয় পাই।

ঋতং পিবন্তৌ সুকৃতস্য লোকে
গুহাম্প্রবিষ্টৌ পরমে পরার্দ্ধে।
ছায়াতপৌ ব্রহ্মবিদো বদন্তি
পঞ্চাগ্নয়ো যে চ ত্রিণাচিকেতাঃ॥
কঠ, ৩।১।

* ফিলো প্রথমে লগসকে ঈশ্বরের প্রজ্ঞা বলিয়াছেন। যদি লগস্ ঈশ্বরের প্রজ্ঞা হন, তবে ঈশ্বরের সঙ্গে তাঁহার প্রজ্ঞা লগস্‌ও অনাদি হইবেন। কিন্তু ফিলো য়িহুদী ছিলেন। একই অনাদি পদার্থের অস্তিত্ব তাঁহার চিন্তায় আসিত। লগস্‌কে ঈশ্বর স্বরূপের বহিঃস্থ ভাবায় তাঁহাকে লগসের অনাদিত্বে অবিশ্বাস করিতে হইয়াছে। এদিকে লগসের উৎপত্তি জগতের উৎপত্তির ন্যায় ভাবিতেও ইতস্ততঃ করিয়াছেন। কাজেই বাধ্য হইয়া প্রজ্ঞাকে লগসের মাতা বলিতে হইয়াছে। লগস্ প্রজ্ঞারূপী, আবার প্রজ্ঞা লগসের মাতা, ফিলো কিছু গোলযোগে পড়িয়াছেন।

* শতদ্রু, বিপাশা, ইরাবতী, চন্দ্রভাগা, বিতস্তা, সিন্ধু ও কাবুল, এই সাত নদী। এই সাত নদী ঋগ্বেদের "সপ্তসিন্ধবঃ।"

"সুকৃতের লোকে পরম পরার্দ্ধে গুহায় প্রবিষ্ট হইয়া (দুজনা) ঋতকে পান করিতেছেন। তাঁহাদিগকে ব্রহ্মবিদ্‌গণ ছায়াতপের ন্যায় বলেন, ত্রিণাচিকেতা পঞ্চাগ্নিগণও (এইরূপ বলেন)।

এই ঋতপানকারী দুজনা কে? পণ্ডিত মহাশয়দের ব্যাখ্যানুসারে জীব ও ব্রহ্ম। তাঁহাদের মতে ঋত কর্ম্মফল। কিন্তু ব্রহ্ম তো কর্ম্মফল ভোগ করেন না। অতএব ভাষ্যকার ভয়ানক ফাঁপরে পড়িয়া ইহার অদ্ভুত অর্থ করিয়াছেন। "একতত্র কর্ম্মফলং পিবতি ভুঙ্‌ক্তে ন ইতরঃ। তথাপি পাতৃ-সম্বন্ধাৎ পিধন্তৌ ইতি উচ্যতে ছত্রিন্যায়েন।" "এক (অর্থাৎ জীব) সেখানে কর্ম্মফল (পিবতি) ভোগ করেন, অপর (অর্থাৎ ব্রহ্ম) নহেন। তথাপি পাতৃ সম্বন্ধ নিমিত্ত ছত্রি ন্যায়ের ন্যায় 'পিবন্তৌ' (অর্থাৎ দুজনা পান করেন) এইরূপ বলা হইয়াছে।"

যে অর্থে গ্রীকেরা ঋত শব্দটাকে বুঝিয়াছিলেন, যদি আমরা সেই অর্থে শব্দটাকে গ্রহণ করি, তবে এ মন্ত্রের অর্থ করা অতদুর কঠিন হইবে না। এখানে সুকৃতের লোকের কথা হইতেছে, দুষ্কৃতের লোকের কথা নাই। জীবকে কর্ম্মফলটা তো সুকৃত দুষ্কৃত উভয়লোকে ভোগ করিতে হয়। আবার সেই সুকৃতের লোকের পরম পরার্দ্ধে। পরম, তাতে পর-অর্দ্ধে। পরমেরও শেষ অর্দ্ধে। সুকৃতের লোকের শ্রেষ্ঠতম শেষ অর্দ্ধে—গুহায় প্রবিষ্ট হইয়া দুজনায় ঋত পান করিতেছেন। অতএব ঋত দুজনার মধ্যবর্ত্তী। একদিক হইতে একজন পান করিতেছেন, অপরদিক হইতে অপরজন পান করিতেছেন। এই পান ব্যাপারটা সুকৃতের লোকে পরম গুহ্যস্থানে হইতেছে। আমরাও ব্রহ্ম ও জীবকে ঋতপায়ী মনে করি। ব্রহ্মস্বরূপ নির্গুণ নহে, নিঋৃত নহে, এলোমেলো নহে। অতএব ব্রহ্মের ঋতপান করা অসম্ভব নহে। লগস্‌ বা ঋত ব্রহ্মের স্বরূপস্থ। ব্রহ্ম আত্ম-প্রত্যয় বা স্ব-সম্বিৎ (self-consciousness) দ্বারা আপনার স্বরূপস্থ সে ঋতকে সম্ভোগ করিতেছেন। আবার ঐ ঋত ব্রহ্মস্বরূপ হইতে নির্গত বা স্ফূর্ত্তিমান হইয়া এই মহা বিশ্ব রচনাপূর্ব্বক তাহার প্রতি অণু পরমাণুতে ওতপ্রোত হইয়া ব্যাপ্ত হইয়া আছেন। ঐ ঋতরূপ মহাব্যাপ্তিকে আস্বাদন করায় জীবেরও অধিকার আছে। কিন্তু জীব যতক্ষণ পাপ বা নিঋৃতির পাশ ছিন্ন পূর্ব্বক শুদ্ধবুদ্ধ হইয়া আপনার প্রাণের পুণ্যতম গুহায় প্রবেশ না করে, ততক্ষণ সে ঐ ঋতপানে বঞ্চিত। তাহার জীবনে ঋত নাই, কেবল নিঋৃতি—নিঋৃতি—নিঋৃতি। অতএব নৈঋৃতে বা দুষ্কৃতি হইতে মুক্ত হইয়া সুকৃত হও – সেই সুকৃতের লোকে ব্রহ্মস্বরূপে যোগযুক্ত হও, তখন ঋতের মধুরতা উপভোগ করিতে পারিবে। তখন জীবনটা ঋতময় হইবে—দেহ, মন, প্রাণ, সর্ব্বত্র ঋত-সর্ব্বত্র order—সর্ব্বত্র শৃঙ্খলা। নির্ম্মল জ্ঞান—বিশুদ্ধ নীতি, পবিত্র চরিত্র। ইহারই নাম জীবনমুক্ত হওয়া। খ্রীষ্টীয়ধর্ম্ম লগস্‌ বা ঋত-তত্ত্ব প্রচার করিয়া শান্তিহারা নরনারীকে জীবন-মুক্ত হইয়া এই ঋত পান করিতে নিমন্ত্রণ করিতেছে। কে আসিবি? আয়!

(৩) লগস্‌ ঋতরূপে বিশ্বের শৃঙ্খলা, প্রজ্ঞারূপে বিশ্বের নির্ম্মাতা। গ্রীকেরা বিশ্বের নির্ম্মাণ পর্য্যন্ত পৌঁছিয়াছেন, বিশ্বের সৃষ্টি পর্য্যন্ত পৌঁছেন নাই। ইহুদী ফিলো লগস্‌কে বিশ্বের স্রষ্টার আসনে সমুন্নীত

করিয়াছেন। খ্রীষ্টভক্ত ইহুদী যোহনও লগস্‌কে এই উচ্চপদবী দিয়াছেন। "সমস্ত যাঁহা দ্বারা জাত হইয়াছে; এবং যাহা জাত হইয়াছে, তন্মধ্যে কিছুই তাঁহা ব্যতিরেকে হয় নাই।" তবু এই মহা সৃষ্টিকার্য্যে তিনি কেবল "দ্বারা"মাত্র—Instrumental cause নিমিত্ত কারণ মাত্র। প্রকৃত কর্ত্তা—efficient cause তো ঈশ্বর। লগস্ ঈশ্বরের প্রজ্ঞা হউন, বা ঈশ্বরের বাক্য হউন, সৃষ্টি কার্য্যে তিনি কেবল "দ্বারা"। ফিলো ও যোহন উভয়েরই এই মত।

(৪) লগস্ প্রজ্ঞা। ঐ প্রজ্ঞায় প্লেটোর ভাবজগৎ অবস্থিত। সমগ্র বিশ্ব, সৃষ্টির পূর্ব্বে ঐ ভাব সকলের আকারে ব্রহ্ম প্রজ্ঞায় অস্তিত্ববান। ব্রহ্ম প্রজ্ঞা এক এক করিয়া ঐ ভাব সকলকে স্ফূর্ত্তিমান ও মূর্ত্তিমান করিতেছেন। যাহা কিছু ঐ প্রজ্ঞানাম ঝাঁপিতে প্রচ্ছন্ন ছিল, তাহাই প্রকাশিত হইয়া এই মহা বিশ্বনাম, মহা স্ফূর্ত্তি বা মহা মূর্ত্তিতে মূর্ত্তিমান হইয়াছে। ভক্ত রামানুজ প্লেটোর ন্যায় ঐ ভাব জগতের দার্শনিকতা জানিতেন না। তিনি বৈদান্তিক ছিলেন—কেবল এক তত্ত্বের শিক্ষা পাইয়াছিলেন। এই বিশ্বটা ঐ এক তত্ত্ব হইতে ভিন্ন নহে। তবু তিনি এই বিশ্বটাকে সাধারণ বৈদান্তিকদের ন্যায় একটা নিরেট ভ্রম বলিয়াও মনে করিতে পারিতেন না। অবশেষে হতভম্ব হইয়া ভক্ত রামানুজ বলিয়া উঠিলেন, এই বিশ্বটা ব্রহ্মের স্থূলরূপ। কারণ রূপ বা সূক্ষ্মরূপে ব্রহ্ম আত্মতত্ত্ব। কিন্তু কার্য্যরূপ বা স্থূলরূপে তিনিই বিশ্বরূপে স্ফূর্ত্তিমান। প্লেটোর বিশ্বটা ঈশ্বরের একজাত (monogenes) ও পরম পুরুষের মূর্ত্তি (the express image of the Highest), রামানুজের চিন্তায়ও এই বিশ্বটা স্থূলরূপে তাঁহারই রূপ। গ্রীক্ ও হিন্দুতে প্রভেদ কোথায় রইল? কিন্তু ইহুদী ও খ্রীষ্টবাদীর সঙ্গে দৃষ্টতঃ একটু প্রভেদ আছে। বিশ্ব প্লেটোর ভাব জগতের প্রকাশ। ঐ ভাব জগৎ ব্রহ্মের স্বরূপস্থ। অতএব বিশ্বব্রহ্ম স্বরূপের প্রকাশ, বা বিশ্ব ব্রহ্মের বিশ্বরূপ। ইহুদী ও খ্রীষ্টবাদী বলিতেছেন, জগতের প্রকাশের পূর্ব্বে ব্রহ্মস্বরূপ হইতে প্রজ্ঞার স্ফূর্ত্তি, ঐ প্রজ্ঞা হইতে বিশ্বের স্ফূর্ত্তি বা সৃষ্টি। প্রজ্ঞাই ব্রহ্মের express image বা স্ফূর্ত্তিমান মূর্ত্তি,—প্রজ্ঞাই ব্রহ্মের একজাত (mono genes) ও প্রথমজাত (prototocos) পুত্র। অতএব প্রজ্ঞাই ব্রহ্মের জ্যেষ্ঠপুত্র, আর এই প্রজ্ঞা-প্রসূত বা প্রজ্ঞাদ্বারা সৃষ্টজগৎ তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র।

(৫) এ শুধু দৃষ্টতঃ বা বাক্যতঃ প্রভেদ—শুধু কথার হেরফের মাত্র। প্লেটো ত স্পষ্টই প্রজ্ঞাতে জগৎ রচনার কারণ মানিয়াছেন। রামানুজও সত্যংজ্ঞানমনন্তং ব্রহ্মে বিশ্বাসী ছিলেন। ভারতীয় চিন্তায় জ্ঞান বা প্রজ্ঞা ব্রহ্মের স্বরূপ লক্ষণ—ইহুদী ফিলোর চিন্তায় প্রজ্ঞা ব্রহ্মস্বরূপ হইতে উদ্ভূত ও আপনার ব্যক্তিত্বে ব্রহ্মস্বরূপের বহিঃস্থ—খ্রীষ্টভক্ত যোহনের চিন্তায় প্রজ্ঞা (হিন্দু-চিন্তার ন্যায়) ব্রহ্মের স্বরূপস্থও বটে, আবার (ইহুদী ফিলোর চিন্তার ন্যায়) স্বরূপ হইতে উদ্ভূত (emanated)ও বটে। হিন্দু প্রজ্ঞার এই অনন্ত উদ্ভব (eternal emanation) বা অনন্ত স্ফূর্ত্তি মানিলে খ্রীষ্টান্ হইয়া যান, আবার খ্রীষ্টান এই eternal emanation বা অনন্ত স্ফূর্ত্তিবাদ ছাড়িয়া দিলে হিন্দু হইয়া পড়েন।

(৬) অনধিগম্য ব্রহ্মস্বরূপে কে প্রবেশ

করিয়াছে? তাঁহার স্বরূপ সম্বন্ধে আমরা যাহা কিছু ভাবি, সমস্তই আমাদের কল্পনা ও জল্পনা। যদি সেই স্বরূপে কোন অনন্ত-পুরুষের অবস্থিতি সম্ভব হয় এবং তিনি ঐ স্বরূপ হইতে নির্গত হইয়া আমাদিগকে ঐ স্বরূপ সম্বন্ধে কোন কথা বুঝাইয়া দেন, তবেই আমরা বুঝিতে পারি। আবার আমরা সসীম জীব, ঐ অনন্ত হইতে উদ্ভূত কোন অনন্ত পুরুষ আমাদিগকে অনন্তের তত্ত্ব বলিলেও সে তত্ত্ব ততটুকুই আমরা বুঝিব, যতটুকু আমাদের বুদ্ধি বুঝিতে সক্ষম।

ধর্ম্ম এ কারণ এ তত্ত্বকে revelation-এর উপর স্থাপন করে। অনন্ত হইতে প্রসূত লগস্ বা অনন্ত হইতে প্রসূত আত্মা প্রত্যাদেশ দ্বারা এ সকল কথা কোন কোন ভক্তকে জানাইয়াছেন। আমরা নতজানু হইয়া ঐ উক্তিগুলি গ্রহণ করি মাত্র। এটাও একটা অবান্তর কথা বলিয়া ফেলিলাম; প্রত্যাদেশ সম্বন্ধে কিছু বলা এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে।

(৭) অনধিগম্য ব্রহ্মস্বরূপ হইতে লগস বা প্রজ্ঞার অনন্ত স্ফূর্ত্তি সম্ভব কি না, তাহাই বিচার্য্য। আমাদের বিবেচনায় কথাটা বুদ্ধির অধিস্থ (above reason) হইলেও বুদ্ধির বিরোধী (against reason) নহে। আমরা জীবন্ত ঈশ্বরে বিশ্বাস করি। তিনি আত্মপ্রত্যয় সম্পন্ন ও জ্ঞান, প্রেম ও ইচ্ছাময়। তিনি নির্গুণ ও নিষ্ক্রিয় নন। তাঁহার ক্রিয়া শক্তি তাঁহার প্রজ্ঞাযোগে তাঁহার স্বরূপ হইতে নির্গত হইয়া জগৎকে সৃষ্টি করে। ঐ সৃষ্টিকারী প্রজ্ঞা স্ফূর্ত্ত। আবার সমস্ত জগৎ সেই প্রজ্ঞাতেই বিধৃত হইয়া বিদ্যমান আছে। তিনি অনন্ত, তাঁহার প্রজ্ঞাও অনন্ত। সেই অনন্ত প্রজ্ঞা হইতে কোটী কোটী বিশ্ব মুহূর্ত্তে উৎপন্ন হইতেছে, আবার সম্ভবতঃ কোটী কোটী বিশ্ব মুহূর্ত্তে বিলয় হইতেছে। কে তাহা জানে? কে তাহা বলিতে পারে? সেই প্রজ্ঞা কোন মুহূর্ত্তে অস্ফূর্ত্ত বলিয়া বোধ হন না। তাঁহার স্বরূপ-সাগরে সদা জোয়ার লাগিয়াই আছে, তাঁহার স্বরূপ-সাগরে তাঁহার প্রজ্ঞার জোয়ার সদা স্ফূর্ত্তিমান। অতএব এই নিত্য স্ফূর্ত্তিমান প্রজ্ঞাকে যোহন ঋষি যদি ব্যক্তিত্ব-সম্পন্ন মনে করিয়া থাকেন, তবে তাহাতে কি হানি আছে? আবার ঐ প্রজ্ঞা ঐ স্বরূপ হইতে অভিন্ন। এ কারণ ব্রহ্ম প্রজ্ঞাকে তিনি ব্রহ্মই বলিয়াছেন। আর ঐ প্রজ্ঞার নিত্য স্ফূর্ত্তি বশতঃ আর এক দৃষ্টিতে তাঁহাকে ঈশ্বরের একজাত বলিয়াছেন। একজাত অর্থাৎ একই Continuous বা ধারাবাহী স্ফূর্ত্তি। সেই ধারাবাহী স্ফূর্ত্তিকে ব্রহ্মস্বরূপ হইতে নির্গত হইয়া এই জগৎ নাম জিনিসটা (যাহা স্বরূপতঃ ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন) উৎপন্ন করিতে দেখিয়া সৃষ্টিবাদী পল তাঁহাকে "অদৃশ্য ঈশ্বরের প্রতিমূর্ত্তি ও সমুদয় সৃষ্টির প্রথমজাত" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন।

(৮) একদিকে ব্রহ্ম, অন্যদিকে বিশ্ব, মাঝে ব্রহ্ম হইতে নির্গত বা স্ফূর্ত্তিমান বিশ্বের নিমিত্ত কারণরূপ লগস। বিশ্বের পূর্ব্বে লগসের স্ফূর্ত্তি, এ কারণ লগস অগ্রজন্মা। এটা মানুষের ভাষা। মানুষকে ঐ স্ফূর্ত্তি বুঝাইবার জন্য অজন্মাকে অগ্রজন্মা বলা হইয়াছে। কিন্তু এই "প্রোততকস" (prototocos) "প্রথমজাত" বা "অগ্রজন্মা" শব্দটা কি কেবল খ্রীষ্টবাদী পলেরই শব্দ? আমাদের পিতৃগণের পূজ্যতম বেদেও কি এই শব্দটী দেখিতে পাওয়া যায় না?

তং যজ্ঞং বর্হিষি প্রৌক্ষন্ পুরুষং জাতমগ্রতঃ।
তেন দেবা অযজন্ত সাধ্যা ঋষয়শ্চ যে ॥

ঋগ্বেদ ১০।৯০।৭

রমেশবাবু ইহার এইরূপ অনুবাদ করিয়াছেন—"যিনি সকলের অগ্রে জন্মিয়াছিলেন, সেই পুরুষকে যজ্ঞীয় পশু স্বরূপে সেই বর্হিতে পূজা দেওয়া হইল। দেবতারাও সাধ্যবর্গ এবং ঋষিগণ উঁহা দ্বারা যজ্ঞ করিলেন।"

লগস বা ব্রহ্ম প্রজ্ঞার অবতার খ্রীষ্টের ক্রুশ-বলিদান ভিন্ন ঋগ্বেদের, এই সুপ্রসিদ্ধ পুরুষ সুক্তের অর্থকরা অসম্ভব। বলিদান তত্ত্ব আমাদের এই প্রবন্ধের বহির্ভূত, এ সম্বন্ধে এ স্থানে আমরা কিছুই লিখিব না। আমাদের বক্তব্য শুধু এই যে, আমাদের পিতৃগণের চিরপূজ্য বেদ স্রষ্টাকে "পুরুষং জাতমগ্রতঃ" বলিয়া মহর্ষি পলের উক্তির সমর্থন করিয়াছেন। পুনঃ—

"হিরণ্যগর্ভঃ সমবর্ত্ততাগ্রে ভুতস্য জাতঃ
পতিরেক আসীৎ।

ঋগ্বেদ ১০।১২১।১।

রমেশবাবু ইহার অর্থ করিয়াছেন,—"সর্ব্বপ্রথমে কেবল হিরণ্যগর্ভই বিদ্যমান ছিলেন। তিনি জাতমাত্রই সর্ব্বভূতের একমাত্র অধীশ্বর হইলেন।" জগৎকারণ হিরণ্যগর্ভ "জাতমাত্র" ইহার অর্থ কি? রমেশবাবু এই ঋকের "সমবর্ত্তত" পদের অর্থটা খোলেন নাই। নিরুক্তকার ইহার অর্থ লিখিয়াছেন "সমভবৎ (নিরুক্ত ১০।২৩) স্বামী শঙ্করাচার্য্য শারীরিক ভাষ্যে লিখিতেছেন,—"সমবর্ত্ততেত্যজায়ত ইত্যর্থ" (১। ২। ২৩।) অতএব সমবর্ত্তত" অর্থে উৎপন্ন হওয়া। হিরণ্যগর্ভের উৎপন্ন বা জাত হওয়ার অর্থ কি? অতএব জগতের স্রষ্টা বৈদিক পুরুষ ও হিরণ্যগর্ভ কি ঠিক লগসের ন্যায় ব্রহ্ম প্রজ্ঞার স্ফূর্ত্তি নহেন? ঐ স্ফূর্ত্তি ব্যক্তিরূপে অনুভব করায় বৈদিক ঋষিগণ উহাকে অগ্রজন্মা বলিয়াছেন।

(৯) স্ফূর্ত্তিমান ব্রহ্মপ্রজ্ঞা বা লগসের অর্থ বাক্যও করা হইয়াছে। ইহারও একটা তাৎপর্য্য আছে। আলেক্জন্দ্রীয় ধর্ম্মতত্ত্বে লগস একার্থে "মেম্রা" বা ঈশ্বরের বাণী। গ্রীক্ অভিধানে লগস শব্দের অর্থ বাক্যও বটে, প্রজ্ঞাও বটে। আমাদের বাক্য আমাদের প্রকাশক। মুখে বলি, হাতে লিখি বা ইঙ্গিত করিয়া দেখাই, আমাদের ঐ বাণী, লিপি বা ইঙ্গিত আমাদের বাক্য এবং ঐ বাক্য আমাদের প্রকাশক। অতএব লগসই ব্রহ্মের প্রকাশক বা ব্রহ্মের স্ফূর্ত্তি, এ কারণ লগসের অর্থ বাক্য করা হইয়াছে।

(১০) এখন আর একটা কথা হইতেছে, এই লগসের কোন মনুষ্য বিশেষে অবতার গ্রহণ সম্ভব কি না? যদি এই বিশ্বটা ব্রহ্মপ্রজ্ঞার স্ফূর্ত্তি হয়, তবে কোন মনুষ্য বিশেষে ব্রহ্মপ্রজ্ঞার স্ফূর্ত্তি কেন অসম্ভব হইবে, তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। যাহা সমষ্টিতে স্ফূর্ত্তিমান, তাহা অবশ্য ব্যষ্টিতেও স্ফূর্ত্তিমান। অতএব এ প্রকার অবতারবাদে বোধ হয় আপনাদের আপত্তি নাই। কিন্তু ঐ ব্যষ্টির যখন বিশেষত্ব দেখাইতে চেষ্টা পাওয়া যায়, তখনি গোলযোগ ঘটে। কিন্তু ব্যষ্টির বিশেষত্ব কি অসম্ভব? জগতের কোন্ দুটো পদার্থ এক?—কোন্ পদার্থটাতে তার বিশেষত্ব নাই? প্রেম একই, তবু পুত্রকে বুকে রাখিয়া তার এক স্বাদ পাই, স্ত্রীকে আলিঙ্গন করিয়া তার আর এক স্বাদ পাই। যদি ভাবিয়া দেখ, জগৎটা বিশেষত্বময়। তাই আমাদের

কণাদঋষি এই বিশেষত্বের অনুধাবনায় বৈশেষিক দর্শন নামে একটা শাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছিলেন। অতএব ব্যষ্টিমাত্রই বিশেষত্ব-সম্পন্ন। এই বিশেষ বিশেষ ব্যষ্টিতে ব্রহ্মপ্রজ্ঞার বিশেষ বিশেষ স্ফূর্ত্তি কি অসম্ভব? অতএব মরিয়মের পুত্র যীশু নামক এক ব্যক্তিতে যদি ব্রহ্মপ্রজ্ঞা বা লগসের বিশেষ স্ফূর্ত্তি হইয়া থাকে, তবে কি তাহা আমাদের ধারণায় আসিতে পারে না? আমাদের ধারণায় আসুক বা না আসুক, মহর্ষি যোহন ঐ বিশেষ ব্যক্তিতে লগসের বিশেষ স্ফূর্ত্তি দেখিয়াছিলেন। ঐ স্ফূর্ত্তি তাঁহার দৃষ্টিতে পিতা হইতে নির্গত বা স্ফূর্ত্তিমান একজাতের মহিমার ন্যায় মহিমান্বিত, কৃপা ও সত্যে পরিপূর্ণ।

শ্রীবিনোদবিহারী রায়।

মধ্যযুগের ইউরোপীয় দর্শন।

সেণ্ট্ আগষ্টাইন্।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

সেণ্ট আগষ্টাইন্ কেবল ধর্ম্মপ্রচারক বলিয়াই পরিচিত নহেন। প্রথম যুগের খ্রীষ্টান দার্শনিকদিগের মধ্যে তাঁহার তুল্য জ্ঞানী ব্যক্তি অল্পই দেখা যাইত। আফ্রিকার অন্তর্গত নিউমিডিয়া রাজ্যের টেগাষ্টি নগরে ৩৫৪ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার জন্ম হয়। তাঁহার মাতা মণিকা খ্রীষ্টান ছিলেন। সেণ্ট আগষ্টাইন্ প্রথম বয়সে উচ্ছৃঙ্খল-প্রকৃতি হইয়াও মাতার যত্নে ও উপদেশে চরিত্রবল লাভ করিয়াছিলেন। প্রথমতঃ তিনি ভাষা শিক্ষায় প্রবৃত্ত হন এবং অল্পকাল মধ্যে অলঙ্কার শাস্ত্রে সুপণ্ডিত হইয়া এসিয়া-মাইনর ও ইটালীর ভিন্ন ভিন্ন নগরে অধ্যাপনা আরম্ভ করেন। ঐ কার্য্য তাঁহার অধিক দিন মনঃপুত না হওয়ায় এবং খ্রীষ্টের প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগ বশতঃ অতঃপর তিনি ধর্ম্মশাস্ত্রের আলোচনায় মন দেন। তিনি ৩৮৭ খ্রীষ্টাব্দে মিলানের সেণ্ট আম্ব্রোস্ কর্ত্তৃক ক্যাথলিক্ মতে দীক্ষিত এবং পরে ৩৯৬ অব্দে হিপ্পোর বিশপ পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। মৃত্যুর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ৪৩০ অব্দেও ক্যাথলিক্ ধর্ম্মের উন্নতিকল্পে তিনি বিস্তর পরিশ্রম ও অনেকগুলি পুস্তক রচনা করেন। ঐ সকল গ্রন্থের মধ্যে কন্‌ফেশন্স (Confessions) এবং সিটী অব্ গড্ (City of God) সর্ব্বোৎকৃষ্ট।

সেণ্ট আগষ্টাইন্ বহু সংখ্যক প্রাচীন দর্শনমত অবগত ছিলেন এবং সেই সকল মত তৎকর্ত্তৃক লিপিবদ্ধ হওয়ায় মধ্যযুগের দর্শন মত সমূহের সহিত মিলিত হইয়াছিল। তিনি গ্রীক পণ্ডিতদিগের কোন মূল গ্রন্থ অধ্যয়ন করেন নাই? প্লোটিনাস ও পরফিরির নব-আদর্শবাদ তিনি মেরিয়াস ভিক্টোরিনাসের অনুবাদে পড়িয়াছিলেন, এবং প্লেটোর মতের ভূয়সী প্রশংসা করিলেও নব-আদর্শবাদের ভিতর দিয়াই উক্ত মতের পরিচয় পান। তাঁহার গ্রন্থ সমূহে তিনবার মাত্র অ্যারিষ্টলের নাম দৃষ্ট হয়। সেণ্ট আগষ্টাইন্ 'ডায়ালেকটিক্স' বা তর্কশাস্ত্রের বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন; এই

জন্যই বোধ হয় মধ্যযুগের দর্শনে অ্যারিষ্টটেলায় ন্যায়শাস্ত্রের প্রাধান্য এত অধিক। এই ত গেল প্লেটো এবং অ্যারিষ্টটলের কথা। পিথাগোরীয়, ষ্টোয়িক ও এপিকিউরীয় সম্প্রদায় এবং অ্যাকাডেমির অন্যান্য অধ্যাপকদিগের মতও তিনি সিসিরোর গ্রন্থাবলীতে অবগত হইয়াছিলেন। স্বয়ং মূল-গ্রন্থরাজি পাঠ না করিলেও প্রতিভাবলে স্বীয় ধর্ম্মবিশ্বাসের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া তিনি যে এক নূতন দর্শন মত প্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন, তজ্জন্য ইউরোপীয় দার্শনিকগণ তাঁহার নিকট ঋণী।

প্লেটোর ন্যায় সেণ্ট আগষ্টাইন্‌ও বিজ্ঞানকে উচ্চাসন দিয়াছিলেন। বিজ্ঞানালোচনায় চিদাকাশ প্রসন্ন হয়, চিন্তাশীলতা বৃদ্ধি পায় এবং মানব জীবন উন্নতি লাভ করে। প্রজ্ঞা ঈশ্বরেরই দান। মানবগণ যাহাতে বস্তু জাতের অস্তিত্ব, গুণ ও ক্রিয়া অবগত হইয়া পরিশেষে ঈশ্বরের মহিমা জ্ঞাত হইতে পারে, তন্নিমিত্ত তিনি মানব মনে প্রজ্ঞার সঞ্চার করিয়াছেন। দর্শনের অর্থ সত্য সন্দর্শন, সত্যকে প্রত্যক্ষ করা। আমরা যাহা কিছু দেখি, তজ্জন্য দর্শনেন্দ্রিয়ের প্রয়োজন; অধ্যাত্মদর্শনের নিমিত্ত প্রজ্ঞা আবশ্যক; প্রজ্ঞাই আত্মার চক্ষু এবং জ্ঞানই একমাত্র সার সত্য। জ্ঞানের নিমিত্ত জীবনপাত করা উচিত, কারণ জ্ঞান ও ঈশ্বরে প্রভেদ নাই, জ্ঞানলাভের অর্থই ঈশ্বরত্বলাভ। বিশুদ্ধ দর্শনমত ও বিশুদ্ধ ধর্ম্মমত, উভয়ই এক; উভয়েরই চরম উদ্দেশ্য, অনন্তের রূপ কল্পনা বা ভগবানের স্বরূপ নির্ণয়। দর্শন ও ধর্ম্মের মূলে বিবাদ থাকা অসম্ভব, যেহেতু যে ভগবানের রূপ কল্পনা হইতে ভক্তির উদয় হওয়ায় ধর্ম্মভাব উদ্দীপ্ত হয়, জ্ঞান সেই ভগবানেরই স্বরূপ। স্বয়ং জ্ঞানস্বরূপ ঈশ্বর তাঁহার প্রথমাত্মজা প্রজ্ঞাকে ঘৃণা করিতে পারেন না। কেহ কেহ ধর্ম্ম বিশ্বাসকে প্রজ্ঞার বিরোধী মনে করেন, তাঁহারা ভাবিয়া দেখেন না যে, জ্ঞানই বিশ্বাসের ভিত্তি। প্রজ্ঞা ব্যতীত ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস হয় না, অথবা হইলেও বিশ্বাস স্থায়ী হয় না। তবে, বিশ্বাসও বুদ্ধির পূর্ব্বগামী, কারণ বিশ্বাস হইতেই বুদ্ধির ক্রিয়া আরম্ভ হয়। কোন বিষয়ের উপলব্ধি করিতে হইলে প্রথমে তৎসম্বন্ধে প্রত্যয় থাকা চাই। এস্থলে বুদ্ধি আপাততঃ বিশ্বাসের অধীন হইলেও, পরে জ্ঞানের নিকট তাহার স্বাতন্ত্র্য থাকে না। বিশ্বাস জ্ঞানের সহিত মিশিয়া যায়।

ধর্ম্মতত্ত্ব সম্বন্ধে সেণ্ট আগষ্টাইনের মত ফলতঃ প্লেটোর মতেরই তুল্য, এমন কি, সময়ে সময়ে তাহা আলেক্‌জান্দ্রিয়া-প্রচারিত নব-আদর্শবাদেরও অনুরূপ বলিয়া মনে হয়। এ স্থলে ঈশ্বর অনন্ত মহাসত্তারূপে কল্পিত। এই মহাসত্তার ঊর্দ্ধে, বহির্দ্দেশে কিম্বা তদ্ব্যতিরেকে কোন বস্তুরই অস্তিত্ব নাই; পরন্তু, বস্তু মাত্রই তাহার নিম্নে, তাহাতে কিম্বা তাহার ভিতর দিয়া প্রকাশিত। ঈশ্বর বস্তু মাত্রেরই আরম্ভ, স্থিতি ও পরিণতি; আদি, মধ্য ও অন্ত। সততা, ন্যায়পরতা এবং জ্ঞান, এই তিন গুণ দৈবক্রমে ঈশ্বরের সহিত মিলিত হয় নাই, এই তিন গুণেই ঈশ্বরের ঈশ্বরত্ব। দর্শনের দিক দিয়াও দেখা যায় যে, ঈশ্বর সর্ব্বশক্তিমান, সর্ব্বত্র বিরাজিত এবং অনন্ত। এই গুণত্রয়ও সেই মহাপুরুষেরই পবিত্র নিত্যসত্তার পরিচায়ক। ঈশ্বরও যদিও সর্ব্বভূতের আশ্রয় রূপে অবস্থিত, তথাপি তিনি স্বয়ং কোন

বস্তু বা বস্তুজাতের সমষ্টি নহেন; তিনি নির্গুণ হইয়াও সর্ব্বমঙ্গলের কারণ; তিনি মহৎ অথচ তাঁহার মহত্ত্বের সীমা নাই; তিনি বুদ্ধিমাত্রেরই হেতু অথচ মানব বুদ্ধির অতীত; সর্ব্বত্র বিদ্যমান থাকিয়াও তিনি স্থানে আবদ্ধ নহেন, অর্থাৎ স্থান দ্বারা তাঁহার ব্যাপকত্বের পরিমাণ হয় না; তিনি আছেন অথচ কোথাও তাঁহার দর্শন পাওয়া যায় না; অনন্তকাল বিদ্যমান থাকিয়াও তিনি কালাতীত; পরিবর্ত্তন মাত্রের কারণ হইয়াও তিনি পরিবর্ত্তন-রহিত। এইরূপে দৃষ্ট হইবে যে, ঈশ্বর সম্বন্ধে ধারণা করিতে গেলে মানব বুদ্ধি এক দুর্ভেদ্য বিরোধজালে জড়াইয়া পড়ে। মানব জ্ঞানে ঈশ্বর যে কি নহেন, তাহারই ধারণা হয়, তিনি যে বাস্তবিক কি, তাঁহার যে স্বরূপ কি, তাহা বুঝিবার উপায় নাই? মানব জ্ঞানে মোটের উপর ঈশ্বর যে আছেন, এই টুকুই বুঝা যায় এবং এই অর্থেই বলা হইয়াছে যে, মানব ঈশ্বরের ধারণা লাভে সমর্থ। সেণ্ট আগষ্টাইন্ ঈশ্বরকে বিরাট কল্পনা করিলেও মনে রাখা আবশ্যক যে, তিনি তাঁহার এই-মতে সর্ব্বদেবত্ববাদের প্রশ্রয় দেন নাই, বরং ঈশ্বরের সহিত জগতের পার্থক্যই নির্দ্দেশ করিয়াছেন। জগৎ ঈশ্বরের সহিত একাত্ম নয়। ঈশ্বর জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা। নিখিল বিশ্ব তাঁহারই স্বাধীন ইচ্ছাপ্রসূত। জগৎ ঈশ্বরের বিকাশভাব হইলে জগতে এবং ঈশ্বরে ভেদ থাকিত না, জগতের সমস্তই সার সত্তা হইত, অসারত্ব কিম্বা নশ্বরত্বের চিহ্নমাত্র থাকিত না। যাঁহারা বিকাশবাদের (Emanation theory) পক্ষপাতী, তাঁহারা ভ্রান্ত। কেন না, এই মতে ঈশ্বরের অন্তর্লীনতারই জ্ঞান হয়, তাহার পবিত্র ও মহান্ রূপের ধারণা হয় না।

কেহ কেহ ঈশ্বরের ত্রৈগুণাময়ী মূর্ত্তির (Doctrine of the Trinity) ব্যাখ্যা করিতে গিয়া তাঁহাকে তিন বা বহু মূর্ত্তিতেই দেখিয়াছেন। সেণ্ট্ আগষ্টাইনের মতে এইরূপ ধারণা ভ্রমসঙ্কুল। ঈশ্বরের ত্রিমূর্ত্তির প্রত্যেক মূর্ত্তির পৃথক কল্পনা করা যায় না। বুদ্ধি, সংকল্প ও অনুভূতি, এই তিন মানসিক ক্রিয়ায় যেমন মানবের মানবত্ব, এই তিন ক্রিয়া হইতেই যেমন ব্যক্তিবিশেষের জ্ঞান হয়; ঈশ্বরও তেমনি অনন্ত মহাসত্তা সত্তা, বা জীবন এবং বুদ্ধি, এই তিন রূপে প্রকাশিত। সেণ্ট্ আগষ্টাইন্ এরীয় খ্রীষ্টান্ সম্প্রদায়ের ত্রিমূর্ত্তিসংক্রান্ত ধারণার প্রতিবাদে বলিয়াছিলেন, তোমরা যে বল, পিতার আদেশ

* যিশুখ্রীষ্টের প্রকৃতি ও ধর্ম্মমত লইয়া ইউরোপ খণ্ডে যে তুমুল আন্দোলন হইয়াছিল, এরীয় সম্প্রদায়ের মতও তাহার অন্যতম কারণ। এরিয়াস নামে আলেক্‌জান্দ্রিয়া-চার্চ্চের এক প্রেসবিটার বা পুরোহিত এই সম্প্রদায়ের নেতা ছিলেন। এই সময়ে (৩১১ অব্দে) কার্থেজে ডোনাটিষ্ট্ নামে আর এক সম্প্রদায় প্রবল হয়। উভয় দলেই প্রাধান্যলাভের নিমিত্ত সম্রাটের নিকট সাহায্য চাহেন। সেই হইতে ধর্ম্মসমাজে মতবিরোধ ঘটিলে সম্রাটের সাহায্য প্রার্থনার প্রথা প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। ভিন্ন ভিন্ন খ্রীষ্টান সম্প্রদায়ের বিবাদভঞ্জন হেতু ৩৮১ খ্রীষ্টাব্দে নিসীন্‌ক্রীড' (Nicene Creed) বা নিসীয়ার অধিবেশনে বিশপদিগের সিদ্ধান্ত প্রচারিত হইলে পর এরীয় সম্প্রদায়ের মতবিরোধ আরও বাড়িয়া যায়। ৪৫১ খ্রীষ্টাব্দে চাল্‌সিডনের ধর্ম্মাধিবেশনে এই বিবাদের নিষ্পত্তি হইয়াছিল। এ সম্বন্ধে এলেন সাহেব কৃত খ্রীষ্টধর্ম্মের সংক্ষিপ্ত ইতিহাসে (Outline of Christian History by J. H. Allen) এইরূপ লিখিত হইয়াছে,—A violent controversy, called the Arian Controversy; followed the announcement of this Creed (Nicene Creed) respecting its exact interpretation, which was not officially and finally defined till the Council of Chalcedon in 451.

ক্রমেই পুত্রকর্ত্তৃক জগতের সৃষ্টি হইয়াছে; তোমাদের এই উক্তি হইতে কি ইহাই মনে হয় না যে, পিতৃস্থানীয় ঈশ্বর স্বয়ং কিছুরই সৃষ্টি না করিয়া একদল দেবতাকে সৃষ্টিসাধনের নিমিত্ত আদেশ করিয়াছিলেন? আর, এই কল্পিত পুত্রটীই বা কে? ঈশ্বরের বাণী নয় কি? এবং যে আদেশ, সেই ত বাণী। অতএব, তোমরা প্রকারান্তরে বলিতেছ যে, ঈশ্বর পুত্রকে পুত্রের দ্বারা আদেশ করিয়াছিলেন। অসম্ভব কল্পনা। খ্রীষ্টীয় সম্প্রদায়ের ভ্রম এই যে, তাঁহারা মানসপটে ত্রিমূর্ত্তির চিত্র আঁকিতে চাহিয়াছেন। কল্পনানেত্রে তাঁহারা দেখিতে চাহেন, দুইটী পুরুষ যেন পাশাপাশি উপবিষ্ট হইয়া একে অপরকে আদেশ করিতেছে। এস্থলে আদেষ্টা, আদিষ্ট এবং আদেশ, এই তিন পৃথক রূপের কল্পনা হইতেছে। তাহাদের বিবেচনা করা উচিত যে, ঈশ্বর যে আদেশ দ্বারা শূন্য হইতে জগতের সৃজন করিলেন, সেই আদেশই ক্রিয়াশীল এবং স্বয়ংই সৃষ্টিসাধক, তাহাই লগস্ ক ক্রিয়েটিভ ওয়ার্ড। ঈশ্বর শক্তিমাত্র, শক্তির ধারণা হয় না এবং রূপ কল্পনাও অসম্ভব। (ক্রমশঃ)

শ্রীদিগ্বিজয় রায়চৌধুরী।

সঙ্গণিকা।

(২৬

শ্রীযুক্ত সি, আর, দাস-মহোদয় শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত হরিনারায়ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়দিগের নামে তিন লক্ষ টাকার লাইবেল মকদ্দমা আনয়ন করিয়াছেন। ইঁহারা সকলেই বঙ্গের বিশিষ্ট পদে বরিত। যদি ভিন্ন দল ভুক্ত না হইতেন, তবে বোধ হয় সুরেন্দ্র বাবুর নামে মকদ্দমা উঠিত না। টাকার গরমই, বোধ হয়, ইহার মূল। নচেৎ অতি তুচ্ছ বিষয় লইয়া কে আদালতে যায়? বিশেষতঃ যাঁহারা হোমরুল চান, তাঁহাদের পক্ষে এরূপ কাজ শোভা পায় না। চরিত্র লইয়া যখন আলোচনা করা হয় নাই, তখন মকদ্দমার কারণ কি? দাস-পরিবার, ঠাকুর পরিবারের ন্যায়, বঙ্গের গৌরব। আমরা ১৩২৪ সালের বৈশাখ-সংখ্যা নব্যভারতে শ্রীযুক্ত সি, আর, দাস মহাশয়ের কত প্রশংসা করিয়াছি। তৎপূর্ব্বে তাঁহার পিতার তিরোধান এবং তাঁহার পূর্ব্বে তাঁহার জ্যেষ্ঠতাতের তিরোধান উপলক্ষে দাস-পরিবারের কত গুণ-কীর্ত্তন করিয়াছি। গত বৎসর তাঁহার শ্বশ্রূ-ঠাকুরাণীর তিরোধানেও কত প্রশংসা করিয়াছি। এ হেন পরিবারের লোক "নারায়ণে" যাহা প্রকাশিত হইতে দেন, তাহা সহ্য হয় না। তারপর এইরূপ মকদ্দমা উপস্থিত করেন, তাহা মোটেই ভাল লাগে না। দাস-পরিবারের মুখ আজও শ্রীযুক্ত এস, আর, দাস মহাশয় উজ্জ্বল করিতেছেন। তিনি কি ইহা মিটাইয়া দিতে পারেন না? হোমরুল আন্দোলনের দিনে এইরূপ হইতে দেওয়া কখনই সঙ্গত নয়। এই দলে আরো কত কত মহাত্মা আছেন, তাঁহারা তামাসা না দেখিয়া ইহা মিটাইয়া

দিন্‌। ভারতের ইহাতে যারপর নাই অনিষ্ট হইবে।

(২৭)

টাকার গরম যে-সে ব্যক্তি সহ্য করিতে পারে না। ইহাতেই অহঙ্কারের উদ্ভব. অহঙ্কারই সকল সর্ব্বনাশের কারণ। অহঙ্কারই দর্পের মূল। দর্পই মতিভ্রম ঘটায়। এই দর্প হইতে বর্ত্তমান যুদ্ধের উদয়, এই দর্পে হত লঙ্কা, এই দর্পে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ, এই দর্পই পৃথিবীর সকল সর্ব্বনাশের কারণ। আমরা জানি, টাকার গরমে কত কত ব্যক্তি কত শত ব্যক্তিকে অপমান করে, কত শত ব্যক্তির সর্ব্বনাশ করে, শেষে আপনার সর্ব্বনাশ আপনারা করে। বিধাতা এই দর্প হইতে ভারতীয় নরনারীকে উদ্ধার করুন।

(২৮)

মহামতি বড়লাট এবং ভারত-সেক্রেটারীর ভারত-শাসনের সংস্কার-ব্যবস্থা মন্তব্য প্রকাশিত হইয়াছে। আমরা যেমন ভাবিয়াছিলাম, তেমনই হইয়াছে, কয়েকজন কৌন্সিলের সভ্য বৃদ্ধি ভিন্ন বিশেষ কিছুই হয় নাই। শ্রাবণ মাসের প্রবাসীতে উহার বিস্তৃত সমালোচনা প্রকাশিত হইয়াছে এবং হিতবাদীতেও আলোচনা হইতেছে। যাঁহারা মনে করেন, ইহাতে উপকার হইবে, তাঁহারা উপকারগুলির ব্যাখ্যা করিলে ভাল হয়। প্রবাসী ও হিতবাদীর উত্তর তাঁহারা দিন না ? আমরা তাহা পাঠ করিয়া শিক্ষালাভ করিতে চাই। বঙ্গের প্রভিন্সিয়াল কন্‌ফারেন্স তাহা অগ্রাহ্য করিয়াছেন, ভারতসভা গ্রহণ করিয়াছেন। প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টের মতামত পাওয়ার জন্য চেষ্টা হইতেছে। বোম্বে নগরে কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশনে ইহার বিচার হইবে। মধ্যপন্থী বা কংগ্রেসে যোগ দিবেন না, বলিতেছেন। অক্টোবর মাসের পূর্ব্বে পার্লেমেণ্টে ইহার বিচার হইবে না। তৎপর আইন প্রণয়ন হইবে। এখন কংগ্রেসের অধিবেশন না করিলেই ভাল হয়। আমরা বরাবর বলিয়া আসিয়াছি, এখনও বলিতেছি, আয়ারল্যাণ্ড যখন হোমরুল পায় নাই, তখন ভারতের শীঘ্র কোন আশা নাই। শত শত বৎসরের চেষ্টার পর যদি কিছু হয়। নিজের স্বার্থ মূর্খেও বুঝে। আমাদিগের মঙ্গলের জন্য তাঁহারা স্বার্থ পরিত্যাগ করিবেন কেন? যাঁহারা তাহা আশা করেন, তাঁহাদের আশার মূলে ইতিহাসের উপদেশ নাই।

(২৯)

কনষ্টিটিউসনের আমূল পরিবর্ত্তন অনেক সাধনা ও বিচার সাপেক্ষ। কৃতিত্ব, মনুষ্যত্ব, চরিত্র তাহার মূল-নিয়ামক। গান্ধির ন্যায় শত শত নেতার জীবন-ত্যাগে তাহা সাধিত হইতে পারে। যদি সহজসাধ্য হইত, টলষ্টয় ও ম্যাট্‌সিনি নির্ব্বাসিত হইতেন না। পৃথিবীর বায়ু কিছু পরিবর্ত্তিত হইয়াছে বটে, কিন্তু এখনও বুরোক্রেটিক গবর্ণমেণ্টের প্রাধান্য রহিয়াছে। এমন যে আমেরিকা, যে ফিলিপাইনের স্বাধীনতা দিল, সেও আজ যুদ্ধে মাতোয়ারা। আশা কোন্‌ পথ ধরিয়া চলিয়াছে, প্রণিধানের বিষয়। প্রেস-আইন, অস্ত্র-আইন, শুল্ক-আইন, ভারত-রক্ষা আইন, নির্ব্বাসন-আইন, পুলিস-আইন, টেক্স-আইন পুস্তক বাজেয়াপ্ত আইন, ম্যাজিষ্ট্রেট ও কমিশনর সব যেমন তেমনি রহিল, অথচ তাঁহারা বলেন, অনেক সংস্কার হইয়াছে! যেমন বুদ্ধি! লেপটেনেণ্ট গবর্ণরের স্থানে প্রাদেশিক গবর্ণর হইবেন।

সিবিলিয়ানগণও গবর্ণর হইতে পারিবেন। পূর্ব্বের অবস্থার স্থলে কি নূতন হইবে? দুই একজন আনকোরা লোক আসিতে পারেন. কিন্তু তাহাতে যে ভাল হইবে, আশা করা মহা ভুল। তাহা হইলে লর্ড পেটল্যাণ্ড, লর্ড উইলিংডনের পরিচয়ে ভারত হতবুদ্ধি হইত না। মসনদে বসিলে সবই সমান, পদের গরম টাকার গরম অপেক্ষা কম নয়। আমাদের দেশের পদস্থ ব্যক্তিদের নিকট তাকাইয়া দেখ না, সবই বুঝতে পারিবে। আর, এন, মুখার্জির অন্তরীনদের নির্ব্বাসন-মন্তব্য এত সহজে কে ভুলিতে পারে? পদস্থ ব্যক্তিরা অন্তরীনদের সম্বন্ধে কি বিশ্বাস পোষণ করেন. স্যর বিনোদচন্দ্র মিত্রের অন্তরীনদের অনুসন্ধান-মন্তব্যে তাহা প্রকাশিত হইয়াছে। রাউলাট কমিশনের রজ্জুতে-সর্পভ্রম মন্তব্যে এ দেশের যে চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে, তাহার পর আর কি লেখা বাকী আছে? সেখানে শ্রীযুক্ত প্রভাসচন্দ্র মিত্র ধরা পড়িয়াছেন। পাচাটার দল কোন্ পথ ধরিয়াছেন, তাহাতেই সব প্রকাশিত হইয়াছে। তুমিও জান,সেও জানে, পুলিসের হস্তে দেশবাসীকে কত নিগ্রহ সহ্য করিতে হয়। আমাদের মনে হয়, উপরোক্ত আইন সকল যতদিন উঠিয়া না যাইবে এবং পুলিস্ যতদিন সংযত না হইবে, ততদিন কিছুই হইল না, মনে করিতে হইবে। খোসামুদে দল যাহাই বলুন না কেন, ভারত যে তিমিরে, সেই তিমিরে।

(৩০)

তুড়ীতে যাঁহারা উঠে ও বসে, তাঁহাদের নিকট কিছু প্রত্যাশা করা মহা ভুল। শুনিয়াছি, সুরেন্দ্রনাথ পলিটিকেল-সস্পেক্টের মধ্যে একজন ছিলেন, এখন তাঁহার নাম কাটিয়া দেওয়া হইয়াছে। সুতরাং তিনি এখন গবর্ণমেণ্টের তুড়ীতে উঠিতেছেন, এবং অন্যান্য নেতা ও হিতৈষিদিগকে গালাগালি দিতেছেন। খুব সৎসাহস বটে! তাহাতে আশ্চর্য্যের কি আছে? যে শ্রেণীর নেতারা স্বদেশের হিতকল্পে শতটী মুদ্রার মায়াও ত্যাগ করিতে পারেন না, তাঁহাদের নিকট কোন আশা করা বৃথা। গান্ধিকে ডাক, সুব্রহ্মণ্যকে ডাক, আর যদি পাও, এই শ্রেণীর চরিত্রবান লোক ডাকিয়া নেতৃত্বপদে বসাও। স্বার্থপর, চরিত্রহীন ব্যক্তিদের দ্বারা কোন দেশের উন্নতি হয় নাই, আমাদেরও হইবে না। "Duties of man" প্রবন্ধে ম্যাট্‌সিনি কি বলিয়াছেন, তাহা নিয়ত পাঠ কর, সব কথা বুঝিতে পারিবে। উহা এদেশে খুব প্রচারিত হওয়া উচিত।

(৩১)

মাড়োয়ারীগণের উন্নতি দেখিলে বিস্ময় ও আনন্দে হৃদয় মন পূর্ণ হয়। আজ কাল বাঙ্গালার অধিকাংশ স্থানে, বিশেষতঃ কলিকাতায় ভাল ভাল বাড়ী নির্ম্মাণ করিয়া তাঁহারা মহা গৌরবে বাস করিতেছেন। অনেক বাড়ী তাঁহারা ক্রয় করিয়া লইতেছেন, এক হাজার টাকার বাড়ী বা স্থান বিশ হাজারে কিনিতেছেন। তাঁহারা তেমন শিক্ষিত নহেন, কিন্তু ব্যবসা-বাণিজ্যের সততাগুণে প্রভূত ধনের অধিকারী হইতেছেন। বাঙ্গালীর হীনতার কারণ, স্বাধীন-বাণিজ্যে উদাসীনতা, চাকরীর মমতা, অর্থ না খাটাইবার স্পৃহা,রিপুপরতন্ত্রতা,বিলাসিতা এবং কাপুরুষতা। বাঙ্গালীর ধন ঐশ্বর্য্য দিন দিন মাড়োয়ারীদের হস্তগত হইতেছে। বাঙ্গালার ব্যবসা বাণিজ্য, দেশী আড়ত ও ব্যাঙ্ক সকল এখন মাড়োয়ারীদের হাতে গিয়াছে। শনৈঃ শনৈঃ তাঁহারা যেরূপ উন্নতি

লাভ করিতেছেন, মনে হয়, অন্য স্থান হইতে তাড়িত বাঙ্গালীদের স্বদেশেও স্থান হইবে না। যে শোচনীয় দিন ঘনাইয়া আসিতেছে, সকলেরই তাহা চিন্তা করা উচিত।

(৩২)

লোকের যখন খুব প্রতিপত্তি হয়, তখন সে মনে করে, তাহার অভাবে আর দেশ চলিবে না। আমাদের দেশের সুরেন্দ্রবাবু-প্রমুখ ব্যক্তিগণেরও সেই দশা উপস্থিত হইয়াছে। আমাদের দেশের প্রচলিত কথা এই, "চূণ খেয়ে মুখ পোড়ে, দই দেখ্‌লে ভয় করে।" আরো প্রচলিত কথা,—"ঘরপোড়া গরু সিন্দুরে মেঘ দেখ্‌লে ভয় পায়।" নেতাদেরও সেই দশা উপস্থিত হইয়াছে। তদুপরি উপাধির মায়া, সম্মানের আকর্ষণ, তাহা ত বার্দ্ধক্যের সম্বল হইয়া আছেই। "যাহাই করি না কেন, কর্ত্তাদের সাহায্য পাইলে আর ভয় কি?"—এই মোহে পড়িয়া দেশের হিতচিন্তাকে তাঁহারা কর্ম্মনাশার জলে নিক্ষেপ করিয়া ধেই-ধেই করিয়া নৃত্য করিতেছেন, আর বলিতেছেন,—"আর সকলেই খারাপ, সকলেই এনার্কিষ্ট, আমরাই কেবল সৎ, আমরাই কেবল ভারতের হিতকাঙ্ক্ষী।" ইঁহাদের কথায় দেশ চলে কি না, দেখিবার জন্য আমরা উৎকণ্ঠিত হইয়া রহিলাম।

(৩৩)

"যে যায়, সে যাক্, শুনে চলি তোমারই ডাক"—দলাদলির বাজারে এই কথাই চতুর্দ্দিকে শোনা যাইতেছে, পরস্পরের প্রতি গালাগালিও বর্দ্ধিত হইতেছে। দেশের বড়ই দুর্দ্দিন উপস্থিত। জাতীয় মহাসমিতির যে অতিরিক্ত অধিবেশন বোম্বে নগরে হইবে, মামুদাবাদের নবাব বাহাদুর তাহার প্রেসিডেন্ট হইতে অস্বীকার করিয়াছেন। বোধ হয়, ভয় তাঁহাকেও আক্রমণ করিয়াছে। আমরা বলি, এখন অধিবেশন না হইলে ক্ষতি কি? চতুর্দ্দিকে একতার স্থলে ভিন্নতার, মিলনের স্থলে বিচ্ছেদের, গ্রহণের স্থলে পরিত্যাগের দৃষ্টান্তই দেখা যাইতেছে। ভারত-সংস্কার-নীতির মধ্যে যেন রিজলী সাহেবের জাতি-বিভাগ-নীতিই সমর্থিত হইতেছে। এ চাল মন্দ নয়। যে সন্তানের ভূমিষ্ট হওয়ার অনেক বিলম্ব, তাহার সুত্রপাতেই কত বিভীষিকা দেখা যাইতেছে। ভালরে ভাল, চতুর্দ্দিকে এ কি চিত্র দেখিতেছি?

(৩৪)

বেশ মজা হইয়াছে—একদিকে পুলিশ অবৈধ উপায়ে বালিকা-ব্যবসায়ের বিরুদ্ধে কোমর বাঁধিয়া সংগ্রাম করিয়া সকলের ধন্যবাদের পাত্র হইতেছেন, অন্য দিকে এক দল আইন-ব্যবসায়ী ও ব্যারিষ্টার দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া বেশ্যাদের পক্ষ সমর্থন করিতেছেন। অসুরকুলে ভক্ত সন্তানের উদয়ের এ দেশে দৃষ্টান্ত আছে, কিন্তু ভক্তের গৃহে অসুর সন্তানের জন্মের দৃষ্টান্ত ছিল না; আজ কাল তাহা প্রকটিত হইতেছে। তাঁহারা কিছুই করিতে পারিতেছেন না, শুধু কলঙ্ক কিনিতেছেন। হায় রে টাকা, তুই যে বেশ্যারও উকীল ব্যারিষ্টার সৃজন করিতে সমর্থ, এত দিনে তাহার পরিচয় পাইলাম। দুষ্ট দুর্ব্বৃত্তদিগের হস্ত হইতে মা ভগ্নীদিগকে রক্ষা করার উপায় কি?

(৩৫)

রোহিতাকারিষ্টক বিক্রয়ের জন্য ঢাকার কবিরাজ শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র সেন জনৈক আবগারী কর্ম্মচারী কর্ত্তৃক অভিযুক্ত হইয়াছিলেন, তাহাতে দেশে তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছিল। গবর্ণমেণ্ট মকদ্দমা তুলিয়া লইয়া আন্দোলন থামাইয়াছেন। কর্ম্মচারীর কণ্ডূয়ন দেখিয়া আমরা অবাক্ হইয়াছি। ইহারা অতি মাত্রায় দেশের অনিষ্টকারী। বড় দুঃখ, বাঙ্গালীর সর্ব্বনাশ বাঙ্গালীই করে!!

শোক-গাথা

আজি পুনঃ সেইদিন, যেদিন যেদিন তুমি,
কাঁদায়ে আকুল শোকে, তেয়াগিলে বঙ্গভূমি ॥
অতীত বিষাদময়ী স্মৃতি জাগে বার বার,
তোমারি স্মরণে আজি ঝরে নেত্রে অশ্রুধার।
আষাঢ়ে সজল মেঘে স্তম্ভিত আকাশ হেন,
তোমার বিয়োগ-ব্যথা হৃদয়ে চাপিছে যেন।
সেদিন এমনি বর্ষা রুদ্রলীলা অশনির,
বিদারি আকাশ-বক্ষ দহেছিল তরুশির।
এমনি দিবসে তুমি আত্মজন হতে দূরে,
অনাথ, আতুর মাঝে শুষ্ক মৃত্যুশয্যা'পরে
তব ভগ্ন হৃদি হতে দীর্ঘশ্বাস বাহিরিয়া
বাষ্প আর্দ্র বায়ু সনে গিয়াছিল মিশাইয়া।
বহিয়া নয়নে তব শেষ চিহ্ন মমতার,
অবিশ্রাম বৃষ্টি সনে মিলেছিল অশ্রুধার।
তোমার জন্মদা শ্যামা শুনি এ বারতা হায়!
ভগ্ন-বক্ষ, সাশ্রু-নেত্র এই প্রকৃতির প্রায়।
কিন্তু স্মরিবনা আর সে দারুণ শোক-ছবি,
মৃত্যু করে রাখি শির, তুমি মৃত্যুঞ্জয় কবি।
পরিপূর্ণ চির আশা, কর্ম্ম তব সমাধান,
গৌড়-মন-মধুকরে কি সুধা করেছ দান।
যতদিন রবে ভাষা, হে অমর কবিবর,
বাঙ্গালী করিবে তোমা ভক্তি, প্রেম, সমাদর ॥
তেজস্বিনী ভক্তিমতী বধুরূপা প্রমীলার,
আদর্শ কুমারী কৃষ্ণা স্নেহময়ী দুহিতার।
বিগলিত নেত্রবারি প্রেমময়ী শ্রীমতীর,
রৌদ্র দাশরথি, আর দুরন্ত রাবণি বীর।
তোমার উজ্জ্বল চিত্র মানসে অঙ্কিত রবে,
ছত্রে ছত্রে বঙ্গবাসী মহিমার শিক্ষা লবে।
ভাষা-জননীর মুখ করিয়াছে প্রভাময়,
নব ভাব প্রেরণায় দৃপ্ত বঙ্গবাসী চয়।
হে নির্ভীক, হে যশস্বি! বঙ্গবাণী সুসন্তান!
স্মরিয়া তোমার স্মৃতি আজি সবে ম্রিয়মাণ।
বিগত কলুষ-ক্লেশ, গত মৃত্যুচ্ছায়া-মসী;
বাণী-বর কুঞ্জে তুমি সানন্দে রয়েছ বসি।
জননী ভারতী, তোমা বসায়ে আসন পাশে,
দিতেছেন উপদেশ জ্ঞান-শুদ্ধ স্নেহ-ভাষে।
জীবনের বহু দুঃখ ভুলেছ যে পদ সেবি,
তাই আজি বরদাত্রী কবি! তব ইষ্টদেবী।
স্বস্তি হোক্, স্বস্তি হোক্ শান্তিধামে শান্তি লাভ
কল্যাণ হউক কবি! অমল আত্মার তব ॥
মধু নাম, মধু ভাষা, মধুময় মনঃ প্রাণ;
মধুর মধুর যাহা তাহাই করেছ দান ॥
তোমার পরশ তরে বায়ু মধুময় হোক্;
জলজ বর্ষুক মধু, মধুরশ্মি সূর্য্যালোক ॥
চন্দ্রমা ঢালুক মধু, মধু আত্মা মধুময়।
বাঙ্গালী হউক ধন্য গাহি মধু জয় জয় ॥

শ্রীমতী শৈলবালা বসু।

গীতোক্ত ত্রিগুণ-তত্ত্ব। (৩)

সাংখ্য ও বেদান্ত সমন্বয়।—সাংখ্যশাস্ত্র শব্দ প্রমাণ গ্রহণ করিলেও সেই শ্রুতি প্রমাণের উপর যে এই ত্রিগুণ তত্ত্ব স্থাপন করেন নাই, তাহা আমরা বলিতে পারি। শ্রুতি প্রমাণ অবলম্বন করিলে এই ত্রিগুণের স্বরূপ অন্যরূপে বুঝা যাইতে পারে। শ্রুতি প্রমাণের উপর বেদান্তদর্শন প্রতিষ্ঠিত। সাংখ্য বেদান্ত সমন্বয় করিলে এই ত্রিগুণ

তত্ত্ব যেরূপ জানা যায়, তাহা গীতা হইতে আমরা বুঝিতে পারি। আমরা পূর্ব্বে দেখিয়াছি যে, গীতায় সাংখ্যের প্রকৃতি-পুরুষ-তত্ত্ব এই সমন্বয় ও ভিত্তির উপর স্থাপিত। সাংখ্যের অনাদি প্রকৃতি-পুরুষ-তত্ত্ব যে পরম ব্রহ্ম তত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং পুরুষ সাংখ্যোক্ত বদ্ধ ও মুক্ত পুরুষ ব্যতীত যে পরম পুরুষ বা নিত্য পরমেশ্বর স্বীকার করিতে হয়, আরও প্রকৃতি-পুরুষ-তত্ত্ব যে স্বতন্ত্র নহে, প্রকৃতি পরম পুরুষেরই এবং তাঁহার দ্বারা নিয়মিত, ইহা আমরা গীতা হইতে জানিতে পারি। সেইরূপ এই ত্রিগুণ যে প্রকৃতির তিনটী বিভিন্ন উপাদান (component part) নহে, এই ত্রিগুণ যে দ্রব্য নহে, এই তিনের সমবায়ে যে প্রকৃতি নহে এবং এই ত্রিগুণ যে পরমেশ্বর হইতে মূল উদ্ভূত তিনটী বিভিন্ন ভাব তাঁহা হইতে বীজরূপে তাঁহারই প্রকৃতি গর্ভে নিষিক্ত হইয়া তাহারা সমুদ্ভূত হয়, সুতরাং এই তিনগুণ যে প্রকৃতিসম্ভব, তাহা আমরা গীতা হইতে জানিতে পারি। চণ্ডীতেও প্রকৃতিকে গুণত্রয়-বিভাবিনী বলা হইয়াছে। সাংখ্য ও বেদান্তের সমন্বয় করিলে এই সিদ্ধান্ত অপরিহার্য্য। গীতার ন্যায় অন্যান্য শাস্ত্রেও এইরূপ সমন্বয় করিয়া ত্রিগুণ তত্ত্ব গৃহীত হইয়াছে। পূর্ব্বোদ্ধৃত শাস্ত্রবচন হইতে আমরা ইহার কতক আভাষ পাই। শ্রীভাগবতে কপিল দেব-হুতি সংবাদে সাংখ্যশাস্ত্র এই ভাবেই গৃহীত হইয়াছে। মহাভারতের শান্তিপর্ব্বে শ্রীভাগবতে সাংখ্যের পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব ব্যতীত পরমেশ্বরকে ষড়্‌বিংশ তত্ত্বরূপে গৃহীত হইয়াছে। আমাদের মনে হয়, ইহাই প্রাচীন কাপিল ধু দর্শনেরও সিদ্ধান্ত। আনিক সাংখ্যশাস্ত্রে সম্ভবতঃ কোন কারণে ঈশ্বরবাদ পরিত্যক্ত হইয়াছে। আমরা এস্থলে সাংখ্য বেদান্তের সমন্বয় পূর্ব্বক এই ত্রিগুণের মূল তত্ত্ব বুঝিতে চেষ্টা করিব।

ত্রিগুণের উৎপত্তি।—মূল প্রকৃতিকে আদি শক্তিরূপে বা জগতের আদি উপাদান কারণ দ্রব্যরূপে গ্রহণ করিলেও তাহা যে এক অবিভক্ত, ইহা বেদান্ত মতে অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। সুতরাং এই মূল প্রকৃতির বিভিন্ন উপাদান থাকা স্বীকার করা যায় না। এজন্য গীতার এই ত্রিগুণকে প্রকৃতিজ গুণ বলা হইয়াছে, তাহা পূর্ব্বে বলিয়াছি। (গীতা ১৩।২১)। প্রকৃতিকে ভগবানেরই পরাশক্তি বলিয়া স্বীকার করিলে, এই ত্রিগুণকে সেই শক্তির ত্রিবিধ বিকাশ এবং ত্রিগুণ যে ত্রিবিধ শক্তি বা শক্তির পরিণাম, তাহা সিদ্ধান্ত করিতে হয়। গীতায় ভগবান্ আরও বলিয়াছেন যে, তাঁহা হইতেই এই ত্রিবিধ ভাবের উদ্ভব হয়ঃ—

(গীতা ৭।১২)—

"যে চৈব সাত্ত্বিকা ভাবা রাজসাস্তামসাশ্চ যে।
মত্ত এবেতি তান্ বিদ্ধি ন ত্বহং তেষু তে ময়ি॥"

ভগবান্ বলিয়াছেন যে, এই তিন গুণ প্রকৃতিজ। তিনি আরও বলিয়াছেন যে, তাঁহার দৈবী মায়া এই ত্রিগুণময়ী (গীতা ৭।১৪)। সুতরাং গীতা হইতে আমরা বলিতে পারি যে ভগবান্ তাঁহার মায়াশক্তি বলে সৃষ্টির আরম্ভে এই মায়া হইতে অভিব্যক্ত প্রকৃতির গর্ভে এই ত্রিগুণময়ী ভাব বীজ নিষেক করেন, (গীতা ১৪।৩) এবং তাহা হইতে প্রকৃতিতে এই তিন গুণের সম্ভব হয়। ইহা পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে।

(ক্রমশঃ)

শ্রীদেবেন্দ্রবিজয় বসু।

মাদাম ব্লাভাস্কির জীবন-কথা

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

উপসংহার।

ব্লাভাস্কি সময় সময় বড়ই ক্রোধবশীভূত হইয়া পড়িতেন। তাঁহার কার্য্যের অন্যায় সমালোচনা করিলে, বা তাঁহার প্রতি অযথা দোষারোপ করিলে তিনি বিচলিত হইতেন। যে সামান্য নিন্দার কথা অপর লোকে—এমন কি, একজন সাধারণ লোকেও—হাসিয়া উড়াইয়া দিতে পারে, সেইরূপ তুচ্ছ কথা শুনিলেও তিনি ধৈর্য্যচ্যুত হইতেন। তাঁহার ন্যায় একটা জগদ্ব্যাপী মহৎ কার্য্যের অনুষ্ঠাতা লোকোপদেশকের পক্ষে ইহা একটু বিসদৃশ নহে কি? ব্লাভাস্কি সামান্য নিন্দা সমালোচনায় এরূপ অধীর, চঞ্চল হইয়া পড়িতেন কেন? ইহার উত্তরে হয়ত প্রাচীন নীতিকারের কথায় অনেক অর্ব্বাচীন নীতিকুশল ব্যক্তি বলিবেন,—"অতীত্য হি গুণান্ সর্ব্বান্ প্রকৃতি মূর্দ্ধ্নি বর্ত্ততে",—প্রকৃতি সকল গুণ অতিক্রম করিয়া শীর্ষস্থান অধিকার করে। কিন্তু আমরা এ উত্তরে সন্তুষ্ট হইতে পারি না। তাঁহাকে যেমন অনেকে শঠ প্রবঞ্চক বলিয়া সত্যের অপলাপ করিয়াছে, সেইরূপ ইহা বলিলেও সত্যের অপলাপ করা হয়। তাঁহার জীবনে নানা দিকে ধীরতা, সহিষ্ণুতা, আত্মত্যাগের অসংখ্য প্রমাণ বর্ত্তমান। এই সকল গুণের ভিতর দিয়াই তাঁহার প্রকৃতির শুভ্র জ্যোৎস্না ফুটিয়া বাহির হইত, তদুপরি ক্ষণিক ক্রোধাবেগ সাময়িক, আকস্মিক মেঘ মাত্র।

মহাত্মাগণের চরিত্র দুরবগাহ। উহা সম্পূর্ণ বুঝিতে বোধ হয় তাঁহাদের সমতুল্য ব্যক্তিরাই সমর্থ। সাধারণ দোষ গুণ বিচারের কষ্টিপাথরে উহা পরীক্ষা করিতে গেলে ঠিক পরীক্ষা হয় না। শ্রীরামচন্দ্রের সীতাবনবাস বা নেপোলিয়নের জোসেফিন-বর্জ্জন শোকাবহ দৃশ্য। ব্যথিতের সহিত সমবেদনা প্রকাশমুখে কেহ কেহ উক্ত মহাত্মাদ্বয়ের কার্য্যের বিরুদ্ধে তীব্র সমালোচনা করিয়াছেন। এই উপলক্ষে শ্রীরামচন্দ্র অতীব দুর্ব্বলচেতা প্রভৃতি বিশেষণ প্রাপ্ত হইয়াছেন। * নেপোলিয়নের কার্য্যও গর্হিত, নৃশংস বলিয়া উক্ত হইয়াছে। অপর পক্ষে আমরা তাঁহাদের চরিত্রে দুর্ব্বলচিত্ততা, ভীরুতা, নৃশংসতার পরিবর্ত্তে মহাপুরুষোচিত গভীর আত্মত্যাগ, আদর্শ কর্ত্তব্যনিষ্ঠা এবং হৃৎপিণ্ড ছিন্ন করিয়াও দেশ ও জাতির গৌরব রক্ষায় একান্ত আকাঙ্ক্ষা দেখিতে পাই। এ বিসদৃশতার সামঞ্জস্য কে করিবে? হজরৎ মোহম্মদ কোন কোন ইংরাজলেখক কর্ত্তৃক লম্পট, ধূর্ত্তরূপে বর্ণিত হইয়াছেন, এবং তাঁহার কোরাণকে ভগবদাদেশলব্ধ গ্রন্থরূপে প্রচার প্রতারণামূলক বলিয়া উক্ত হইয়াছে। কিন্তু যিনি অন্ধতামসময় দুর্দ্দম্য বন্য মানব প্রকৃতিকে সংযত করিয়া

* "And Rama, as weak as his father had been, sent poor suffering Sita—then gone with child—to exile.' R. C. Dutt's 'A History of Civilization in Ancient India', Vol. I. page 142.

"Too weak to bear popular dissatisfaction, he submits to their desires and sends poor Sita to exile." Ibid. Vol. II. Page 276.

মনুষ্যত্বের পথে আনয়ন করিলেন, তাঁহাকে আমরা একজন শক্তিশালী মহাপুরুষ বলিতে বাধ্য। মোট কথা মহাপুরুষদের চরিত্র বুঝা কঠিন বলিয়া মানুষ স্বীয় চরিত্রের হেয়ত্ব উপাদেয়ত্ব দ্বারা উহার বিচার করিতে গিয়া ভ্রমে পতিত হয়। এইজন্য লোকচরিত্রজ্ঞ মহাকবি পার্ব্বতীর মুখ দিয়া সকলকে সাবধান করিতেছেন :—

অলোকসামান্যমচিন্ত্যহেতুকং,
দ্বিষন্তি মন্দাশ্চরিতং মহাত্মনাং।

* * *

ন কেবলং যো মহতোঽপভাষতে,
শৃণোতি তস্মাদপি যঃ সঃ পাপভাক্।*

মহাত্মাদের কথা দূরে থাকুক, তীব্র সাধকদের চরিত্র বুঝাও অনেক সময়ে কঠিন। যাহারা উদ্দেশ্য বিশেষকে জীবনের সারসর্ব্বস্ব মনে করিয়া উহারই সফলতার জন্য সমস্ত মন প্রাণ ঢালিয়া দিয়াছে, তাহারা সাধক। কার্য্যভেদে, উদ্দেশ্যভেদে অনেক প্রকারের সাধক আছে। এইরূপে যাহাদের চিন্তাস্রোত কোন একটা কেন্দ্রের চতুর্দ্দিকে ঘুরিতে থাকে, অথবা একটা বিশেষ লক্ষ্যের দিকে ছুটিতে থাকে, তাহাদের সেই চিন্তাস্রোত কোন কারণে বাধা বা ব্যাঘাত প্রাপ্ত হইলে বড়ই গোলযোগ উপস্থিত হয়। আধ্যাত্মিক বা অন্য নির্দ্দিষ্ট সংকল্পমূলক কোন লক্ষ্যের দিকে উক্ত চিন্তাস্রোত প্রবলবেগে প্রবাহিত হইলে, উহাকে সাধারণতঃ তপস্যা বলা হয়। এই সকল তপস্বীর চিত্তের অবস্থা সাধারণ মানবের চিত্ত হইতে অনেক বিভিন্ন হইবেই। সাধারণ মানবের দুর্ব্বোধ্য, দুর্নিরীক্ষ্য, এমন কি সাধারণ মানবের নিকট সম্পূর্ণ কাল্পনিক বলিয়া অদ্ভুত কোন উচ্চ আধ্যাত্মিক আদর্শ তপস্বীরা জীবনে পরিণত করিবার চেষ্টা করাতে তাহাদের মনপ্রাণের অবস্থা সদাই এক উচ্চ ভূমিতে আরূঢ় থাকে; এবং মন প্রাণের সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের শরীরের স্নায়ুমণ্ডলও যেন সদাই এক উচ্চ গ্রামে—চড়া সুরে—বাঁধা থাকে। যেমন সেতার বা তানপূরার তার কড়া সুরে বাঁধা হইলে সামান্য স্পর্শমাত্র উহা ধ্বনিত হয়, এই তপস্বীদের শরীরের অবস্থা (High strung body) তদ্রূপ। কোন ধ্যানীর চিত্ত যখন তাহার ধ্যেয় বস্তুর অন্বেষণ করিতে করিতে স্থূল জগৎ ছাড়িয়া উচ্চ ভূমিকায় আরোহণ করিয়াছে, তখন সেই ধ্যানভঙ্গকর, কোন প্রতিকূল কারণ উপস্থিত হইলে, তাহার শরীরে যেন একটা ভীষণ প্রতিঘাত (shock) অনুভূত হয়, এবং মনোরাজ্যেও সহসা একটা 'ওলট পালট' ঘটিয়া যায়। উহাই তাহাদের বাহ্যিক ক্রোধাকারে প্রকাশিত হয়। তপস্বীর তপস্যাভঙ্গ ও ধ্যানীর ধ্যানভঙ্গজনিত ক্রোধ প্রকাশের বহু দৃষ্টান্ত আমাদের পুরাণাদি শাস্ত্রে বর্ণিত আছে। এই ক্রোধ যেন সেই চিন্তাস্রোতে প্রদত্ত আঘাতের প্রতিঘাত মাত্র। নিম্ন স্তরের ধ্যানী তপস্বীদের কথা ছাড়িয়া দিউন, ধ্যানের প্রতিকূল বস্তুর আঘাতে মহাযোগীদের চিত্তও উদ্বেলিত হয়। তপস্বীবেশী মহাদেবের তপস্যায় মদন ব্যাঘাত জন্মাইলে মুহূর্ত্ত মধ্যে যে ব্যাপার ঘটিল, তাহা স্মরণ করুন। শ্রীগৌরাঙ্গদেব তাঁহার লীলা-পরিকর অদ্বৈত প্রভুকে ভক্তিধর্ম্ম প্রচারের বিরোধী জ্ঞানচর্চ্চায় নিযুক্ত দেখিয়া বিচলিত হইয়া পড়িলেন, এমন কি তিনি "শান্তিপুরের বুড়া গোঁসাই"কে প্রহার পর্য্যন্ত করিয়াছিলেন। সাধারণ মানুষের চরিত্র দ্বারাও এইরূপ ব্যাপার কতকটা কতকটা অনুমান-

* 'কুমার সম্ভব'—৫ম সর্গ।

সাধ্য হইতে পারে। যাহারা হয়ত স্বাভাবিক অবস্থায় খুবই শান্ত সহনশীল, তাহারাই কোন কার্য্যে নিবিষ্টচিত্ত, বা চিন্তাযুক্ত থাকা কালীন, অতি সামান্য বাধাতেই উত্যক্ত হইয়া উঠেন। বাধার পরিমাণানুসারে বিরক্তি ক্রোধে পরিণত হয়।

ব্লাভাস্কির চিত্ত সর্ব্বদাই এক ধ্যানে নিবিষ্ট থাকিত। তাঁহার গুরুর আদেশ পালন এবং জগতের শিক্ষার জন্য তাঁহার সমিতির জীবন রক্ষায় তিনি উৎসৃষ্টপ্রাণ ছিলেন। সমিতির সফলতার জন্য তিনি বিন্দু বিন্দু করিয়া হৃদয়ের শোণিত দান করিয়াছিলেন। ইহাই তাঁহার তপস্যা, উপাসনা। তাঁহার শরীর মন সর্ব্বদাই এক উচ্চ গ্রামে আরূঢ় থাকিত। সাধারণ মানুষে যাহা কখন কখন দেখা যায়, ব্লাভাস্কিতে তাহা সদাই বর্ত্তমান ছিল। উহাই তাঁহার স্বাভাবিক অবস্থা দাঁড়াইয়া গিয়াছিল। সমিতির প্রতি আক্রমণে বা সমিতির ক্ষতির জন্য তাঁহার প্রতি অন্যায় আক্রমণে তপস্বিনীর সেই বেগবতী সাধনাস্রোত বাধা প্রাপ্ত হইয়া উদ্বেলিত হইয়া উঠিত। এই সম্পর্কে তাহার পিতৃপিতামহলব্ধ দৈহিক সংস্কারও বিবেচ্য। তিনি যে বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা রুষিয়ার মধ্যে একটা বিশেষ প্রতিষ্ঠিত উচ্চ বংশ। এই বংশীয়দের প্রতাপ ও পরাক্রম সর্ব্বজনবিদিত। ইঁহারা একদিকে উদার প্রকৃতি ও দুর্ব্বলের রক্ষক ছিলেন, অন্য দিকে নীচতা, কপটতা ও অত্যাচারের পরম শত্রু ছিলেন। কাহারও নিকট হীনতা স্বীকার ইঁহাদের স্বভাববিরুদ্ধ এবং কলঙ্কের লেশ মাত্র ইঁহাদের অসহনীয় ছিল। এইরূপ একটা সামরিক ভাবপ্রবণ, তেজস্বী, পাশ্চাত্য প্রকৃতিপ্রিয় উত্তেজক পানাহারপুষ্ট রাজসিক বংশলব্ধ শরীর লইয়া যোগীজনোচিত জীবনযাপন তাঁহার পক্ষে একটা সংগ্রাম বিশেষ হইয়াছিল। এই সংগ্রামে তিনি কতদূর জয়ী হইয়াছিলেন, তাহা তাঁহার পরবর্ত্তী জীবন দ্বারা কতক বুঝা যায়। বাল্যের সেই স্বেচ্ছাচারিণী উদ্ধত প্রকৃতি হেলেনা আর প্রৌঢ়ের সেই জ্ঞানানুশীলনরতা, তত্ত্ববিদ্যামগ্না, মানবকল্যাণসাধিকা, তত্ত্বোপদেশিকা ব্লাভাস্কিতে কত প্রভেদ! কিন্তু তথাপি তাঁহার সমিতির প্রতি বা তাঁহার চরিত্রের প্রতি অযথা দোষারোপ দেখিলে, তাঁহার কার্য্যের একটানা খর স্রোতে প্রতিকূল বস্তুর আঘাত লাগিলে হৃদয়ের আবেগের সঙ্গে সঙ্গে, পৈতৃক শারীরিক সংস্কারও যেন বায়ুসহায়ে নির্ব্বাণোন্মুখ অগ্নির ন্যায় পুনঃ প্রজ্বলিত হইয়া উঠিত। এইরূপ ক্ষাত্র সংস্কারযুক্ত অথচ নিজ লক্ষ্যে একাগ্রীভূত দেহ মন আহত হইলে বাশিষ্ঠ অপেক্ষা বৈশ্বামিত্র লীলাপ্রকটনই অধিকতর আশা করা উচিত। প্রকৃত পক্ষে তাহাই হইত। তাঁহার উচ্চ উদ্দেশ্যের প্রতি দোষারোপ হইলে, তাঁহার চরিত্রে কলঙ্কারোপ হইলে, সেই আহত চিত্তের ভাবগুলি ক্রোধের ভাষায় বাহিরে উদ্গীরিত হইতে থাকিত। এবং বোধ হয় এইরূপে বহিরুদ্গীরণ না হওয়া পর্য্যন্ত মনেরও শান্তি হইত না। আমরা বিশ্বস্ত সূত্রে শুনিয়াছি, তাঁহার চিত্তে নানা ভাবের আলোড়ন হইলে তিনি উহার বেগ ধারণে অক্ষম হইয়া কখন কখন বাটীর ছাতের উপর উঠিয়া চাৎকার করিতেন। এইরূপ অবস্থায় এক দিন কাউণ্টেস ওয়াট্‌মষ্টার তাঁহার সঙ্গে ছিলেন। তিনি কিছু বুঝিতে না পারিয়া ভাবিলেন, ব্লাভাস্কি কি পাগল হইলেন! পরে ব্লাভাস্কি তাঁহাকে বুঝাইয়া-

ছিলেন, উহা দ্বারা বয়লার (Boiler) হইতে অতিরিক্ত বাষ্পের (Surplus steam) ন্যায় তাহার দেহ হইতে কতকটা সন্তাপকর ভাবেগ বাহির হইয়া গেল, নতুবা হয়ত তিনি পড়িয়া মরিয়া যাইতেন। চিত্ত আহত হইলে তিনি সেই জন্য উত্তেজিত ভাষায় বেগের উদ্গীরণ করিলে কতক শান্তিলাভ করিতেন।

আরও এক কথা। ব্লাভাস্কির দেহে প্রায়ই কোন না কোন মহাত্মার আবেশ হইত। অর্থাৎ, মহাত্মারা তাঁহার শরীর যন্ত্র অবলম্বন করিয়া জনসাধারণের মধ্যে কার্য্য করিতেন। * তাঁহার আবিষ্ট অবস্থায় তিনি আর H. P. Blavatsky থাকিতেন না। তাঁহার চাল-চলন, আচার-ব্যবহার, কথাবার্ত্তা সম্পূর্ণ বদলাইয়া যাইত। এই আবেশ নিবন্ধনও তাঁহার শরীরের স্নায়ুমণ্ডল উচ্চ গ্রামে আবদ্ধ থাকিত, এবং তজ্জন্য সামান্য কারণে উত্তেজিত হইয়া উঠিত। সাধারণ মাধ্যমিক (Medium)দিগের দেহের অবস্থা দ্বারা ইহা সহজেই প্রমাণিত হয়। বাহ্য জগৎ হইতে আগত আঘাতের বেগ ধারণে অক্ষমতার ইহাও একটী কারণ।

উপরে বলিয়াছি, উত্তেজিত ভাষায় এই বেগের নিষ্কাশন হইলে তিনি কতকটা শান্তিলাভ করিতেন। সেই জন্য তাঁহার এই ক্রোধ উদ্গীরণের মধ্যে ব্যক্তিগত রাগ-দ্বেষ মোটেই থাকিত না। অনেকে তাঁহার অকপট বন্ধুত্বের বিনিময়ে তাঁহাকে লোক-সমক্ষে উপহাসাস্পদ ও ঘৃণাস্পদ করিতে ত্রুটী করে নাই। এই সকল তাঁহার কর্ণগোচর হইলে ক্ষুব্ধ ও ক্রুদ্ধ হইতেন বটে, সেই ক্রোধ ক্ষোভের মুখে তাঁহার বাক্যস্রোত আগ্নেয় স্রোতের ন্যায় নির্গত হইত বটে, কিন্তু তাহাতে ঐ সকল লোকের প্রতি বিদ্বেষের চিহ্ন মাত্র থাকিত না। কেহ কখন তাঁহার ঘোরতর অনিষ্টকারীর প্রতিও কটূক্তি বর্ষণ করিতে শোনে নাই। তাঁহার একজন শিষ্য লিখিয়াছেন,—"যাহারা তাঁহার ঘোরতর নিন্দা ও গ্লানি করিয়াছে, তাহাদের প্রতি তিনি কেবল 'বোকা' (Flapdoodle) এই কথাটী প্রয়োগ করিতেন। তদতিরিক্ত কোন কঠোর ভাষা তিনি উচ্চারণ করেন নাই। যাহারা তাঁহার দেহ ও মনটীকে কাটিয়া খণ্ড খণ্ড করিয়া উহাতে লবণ প্রক্ষেপ করিবার ব্যবস্থা করিয়াছিল, সেই কুলম্ প্রভৃতিকে লক্ষ্য করিয়াও তিনি যেন এই ভাবে বলিতেন, 'পিত! ইহাদিগকে ক্ষমা কর, কারণ ইহারা জানে না যে কি করিতেছে।" তাঁহার অনিষ্টকারী পরে অনুতপ্ত হইয়াছে জানিতে পারিলে অমনি সমস্ত অপরাধ মার্জ্জনা করিয়া তাহাকে ক্রোড়ে নিতে প্রস্তুত ছিলেন। অপকারীরও কোন উপায়ে উপকার করিতে পারিলে তিনি সুখী হইতেন। এরূপ সহিষ্ণুতা ও ক্ষমা আদর্শস্থানীয়।

ব্লাভাস্কি-চরিত্র সম্বন্ধে তাঁহার অপর এক শিষ্য লিখিয়াছেন,—"তিনি কি নির্দ্দোষ ছিলেন? না। তাঁহার কি দোষ ছিল না? ছিল। তাঁহাকে কেহ অযথা প্রশংসা করিলে তিনি উহাকে যৎপরোনাস্তি ঘৃণা করিতেন। কিন্তু তিনি উত্তেজিত হইলে ঘূর্ণী বায়ুর ন্যায় প্রচণ্ড ঝটিকার ন্যায় আকার ধারণ করিতেন,

* Leadbeater সাহেব লিখিয়াছেন,—"She was herself the most striking of all the phenomena, for her changes were protean. Sometimes the Masters themselves used her body * * * At other times &c. &c." *The Inner Life*, Vol. II.

ইহা বলিলেই সব কথা বলা হয়। পরন্তু আমি অনেক সময় ভাবিয়াছি যে, সম্ভবতঃ তাঁহার এই ক্রোধলীলা কোন একটা উদ্দেশ্যের জন্যই যেন প্রকটিত হইত। পরবর্ত্তী জীবনে এই ভাব আর বড় লক্ষিত হইত না। তাঁহার শত্রুরা বলিত, তিনি বড় কর্কশ ছিলেন। আমরা তাঁহাকে ভালরূপ জানি। আমরা জানি, তিনি বাহ্যিক আইন-কানুন একেবারেই মানিয়া চলিতেন না। এই যে তাঁহার বাহ্যিক আদব কায়দার উপেক্ষা, ইহার মূলে আর কিছুই নহে, কেবল তাঁহার জাগতিক ব্যাপারে অনিত্যতা বুদ্ধি বর্ত্তমান। যখন পৃথিবীর নানা দিগ্দেশ হইতে আগত অপরিচিত লোকেরা দলে দলে আসিয়া তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া বসিত, তখন আমি আশ্চর্য্য হইয়া দেখিতাম যে, এই নারী কাহারও জন্ম, কর্ম্ম, পদ, কুল প্রভৃতি বাহ্যিক বিষয়ে কিছুমাত্র লক্ষ্য না করিয়া, সাংসারিক উচ্চ নীচ অবস্থার প্রতি সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ হইয়া, কেবল যাহা সত্য বলিয়া বুঝিয়াছিলেন, তাহাই বলিতেছেন! হয়ত কোন রাজপুত্র ইহাতে চমকিয়া উঠিত, আবার কোন দরিদ্র তাঁহার সদয় ব্যবহার ও শেষ কপর্দ্দকটী পর্য্যন্ত পাইয়া মুগ্ধ হইত!"

অলকট বলেন, "যখন তিনি কোন কারণে বিরক্ত হইতেন, অথবা অন্য সময়েও, তিনি তাঁহার অন্তরঙ্গ বন্ধুদিগের শিরেই ক্রোধ ধারা বর্ষণ করিতেন। তাঁহার উন্মত্ততার মধ্যেও একটা পদ্ধতি ছিল (There was 'method in her madness')। তিনি তাঁহার প্রিয় বন্ধুদিগকেই ক্রোধের লক্ষ্যীভূত করিতেন, অন্যকে নহে। ক্রোধে আকুল হইলে তিনি কখন কখন চীৎকার করিয়া বলিতেন,—'মহাত্মা টহাত্মা কিছুই নাই, যোগ টোগ সব মিথ্যা!!' একি শিষ্য ও শিক্ষার্থীর বিশ্বাস পরীক্ষা?"

যাঁহারা ব্লাভাস্কির আন্তর প্রকৃতির একটুও পরিচয় পাইয়াছেন, তাঁহারা এক বাক্যে তাঁহার হৃদয়ের উচ্চতার সাক্ষ্য দান করিয়াছেন। পরদুঃখকাতরতা ও উদারতায় উহা পূর্ণ ছিল। যাঁহারা শিক্ষার্থী হইয়া তাঁহার নিকট আসিতেন, তাঁহাদের মধ্যে অতি সামান্য লোককেও তিনি উপেক্ষা করিতেন না,—সকলেই তাঁহার উদার হৃদয়ে স্থান লাভ করিত। কাহারও নিকট প্রাপ্ত অতি সামান্য উপকারও তিনি জীবনে ভুলিতেন না। শত্রুর প্রতিও তাঁহার মহানুভবতার অভাব লক্ষিত হইত না। অনেক লেখক বলেন,—"She was the practical personification of charity and forgiveness." অর্থাৎ "তিনি দাক্ষিণ্য ও ক্ষমার মূর্ত্তি ছিলেন।"

নিজের সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি তিনি কিছুমাত্র মনযোগ দিতেন না। কিন্তু কাহারও সামান্য সস্নেহ ব্যবহার তিনি কৃতজ্ঞ চিত্তে স্বীকার করিতেন। বেশান্ত বলেন, "তিনি যে কেবল আমাদের শিক্ষাগুরু ছিলেন, তাহা নহে। তিনি স্নেহময় সুহৃদ্ও ছিলেন। একবার শারীরিক ও মানসিক অবসাদে আমার প্রাণ যায় যায় হইয়াছিল। এমন সময়ে তিনি আমার প্রতি যেরূপ গভীর স্নেহের পরিচয় দিয়াছিলেন, লক্ষ লক্ষ লোকের মধ্যে একজনের নিকটও সেরূপ সস্নেহ ব্যবহার দুর্লভ। নিতান্ত ব্যক্তিগত বলিয়া আমি উহা উল্লেখে বিরত হইলাম।" বিদ্যা, বুদ্ধি বা পদমর্য্যাদায় অতি নিম্নস্তরস্থ, বা স্বল্পপরিচিত লোককেও তিনি ভুলিতেন না। নিকটস্থ বা দূরস্থ সকলকে, কাহাকেও

সাক্ষাতে, কাহাকেও পত্রে সর্ব্বদাই তিনি তাঁহার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দয়ার নিদর্শনে, সান্ত্বনাময় বার্ত্তায় আপ্যায়িত করিতেন। আর তাহারা এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কার্য্যেই তাঁহার হৃদয়ের মহত্ত্ব দেখিয়া, সেই উদার হৃদয়ে সকলেরই স্থান আছে, ইহার প্রমাণ পাইয়া, মুগ্ধ হইত। অপরের দুঃখ মোচনের জন্য কেহ তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলে তিনি সানন্দে সাহায্য দান করিতেন। যাহারা সকাম ভাবে আসিত, তাহাদিগকে তিনি উৎসাহিত করিতেন না। যাহারা ভ্রমে পড়িয়া কষ্ট পাইতেছে, তাঁহার বিরুদ্ধাচারী হইলেও বা তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া গেলেও, তাহাদের জন্য তাঁহার হৃদয় করুণায় উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিত। তাঁহার অন্তঃকরণ সিংহের ন্যায় দৃঢ় ছিল, অথচ পরদুঃখে বিগলিত হইত, কিন্তু কিছুতেই ভাঙ্গিয়া পড়িত না।

লণ্ডনবাসকালে (১৮৯০ খ্রীঃ) কোন ব্যক্তি তাঁহার হস্তে এক কালীন পনর হাজার টাকা অর্পণ করিলেন এবং বলিলেন যে, ব্লাভাস্কি স্বেচ্ছানুযায়ী মানবসেবার্থ এই অর্থ ব্যয় করিতে পারেন। বন্ধুবর্গ সহ বিচার আলোচনার পর ব্লাভাস্কি স্থির করিলেন যে, লণ্ডনের পূর্ব্বাংশে (যেখানে নিম্নশ্রেণীর দরিদ্রদিগের বাস) দরিদ্র শ্রমজীবী বালিকাদিগের জন্য একটী বিশ্রামাগার (club) স্থাপিত করা হইবে। ১৫ই আগষ্ট তিনি উহা খুলিয়া স্বল্পবেতনভোগী কঠোর পরিশ্রমী বালিকাদিগের দুঃখ-লাঘবোদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত করিলেন। এই প্রসঙ্গে বেসান্ত লিখিয়াছেন—

"ব্লাভাস্কির কোমল চিত্ত মানবের দুঃখ দেখিলে গলিয়া যাইত। জীবনের শেষ দশায় তিনি অর্থাভাবে দরিদ্রতার সীমায় উপনীত হইয়াছিলেন। তথাপি মানবের দুঃখ দেখিবা মাত্র উহার মোচন অর্থসাধ্য হইলে একটী কপর্দ্দক হাতে না রাখিয়া তৎক্ষণাৎ সমস্ত দান করিয়া ফেলিতেন।"

বেসান্ত একদিন কতকগুলি ফুল কয়েকটী ছোট ছোট দরিদ্র বালক বালিকাদিগকে উপহার দিয়াছিলেন, এবং এ সম্বন্ধে তাঁহার কোন বন্ধুর নিকট এক খানা পত্র লিখিয়াছিলেন। বন্ধু পত্রখানা ব্লাভাস্কিকে দেখাইয়াছিলেন। পত্র পড়িয়া ব্লাভাস্কি বেসান্তকে লিখিলেন :—

"প্রিয়তম সুহৃৎ! তুমি—এর নিকট যে পত্র লিখিয়াছ, তাহা এই মাত্র পড়িলাম। ঐ দরিদ্র শিশুগুলির জন্য আমার প্রাণ ব্যথিত হইয়াছে। শুন! আমার কাছে ৩০ শিলিং (২২৷৷০ টাকা) মাত্র আছে, ইহাই আমি দিতে পারি (কারণ তুমি জান, আমি এক্ষণে ফকির, আর এই ফকিরি লইয়াই এখন আমার গর্ব্ব)। আমি তোমার কোন ওজর আপত্তি শুনিব না। এই কয়েকটী মুদ্রা লও। এই ত্রিশ শিলিংএ ত্রিশটী অনাথ দরিদ্র বুভুক্ষু অভাগা শিশুর ত্রিশ বেলা ভোজনের আয়োজন হইতে পারে, আর আমি ইহা ভাবিয়া ত্রিশ মিনিটের জন্যও সুখী হইতে পারি। অতএব একটীও বাক্যব্যয় না করিয়া যাহা বলিলাম, কর। যে হতভাগা শিশুগুলি তোমার ফুল পাইয়া এত আনন্দিত হইয়াছে, তাহাদিগকে আমার এই উপহার অর্পণ কর। আমি তোমার একজন অকর্ম্মা বন্ধু মাত্র। তাহা দ্বারা জগতের কোন কার্য্যই হইল না। তাহাকে ক্ষমা করিও। তোমার,—এইচ, পি, বি।"

বেসান্ত বলেন, ব্লাভাস্কির ঈদৃশ দয়ার্দ্রচিত্ততায় অনুপ্রাণিত হইয়াই তাঁহারা, তাঁহার দেহত্যাগের পর, "ব্লাভাস্কি ভবন" ("H. P. B. Home") নামে বালক বালিকাদিগের সেবার্থে একটী আশ্রম প্রতিষ্ঠায় অগ্রসর হইয়াছিলেন। *

শ্রীদুর্গানাথ ঘোষ।

* "It was this tenderness of hers that led us, after she had gone, to found the "H. P. B. Home for little children", and one day we hope to fulfil her expressed desire that a large but homelike Refuge for outcast children should be opened under the auspices of the Theosophical Society." Annie Beasant's "An autobiography" P. 361.

দক্ষিণ ভ্রমণ। (২)

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

আমি আজ রেলগাড়ীতে চড়িয়া পরম সুখে দক্ষিণ দেশ ভ্রমণে যাইতেছি, আর প্রায় ৪০০ বৎসর পূর্ব্বে নবদ্বীপের শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য মহাপ্রভু এই রাস্তায় একজন মাত্র শিষ্য সঙ্গে লইয়া পদব্রজে গমন করিয়াছিলেন। তিনি কোন্ কোন্ রাস্তায় গিয়াছিলেন, তাহা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে একটু একটু লেখা আছে বটে, কিন্তু সেই সমস্ত স্থান এক্ষণে ঠিক কোন্‌টী, তাহা জানিবার উপায় নাই। কোন সদাশয় যুবক বৈষ্ণব অধ্যবসায়ের সহিত যদি সেই স্থানগুলি আবিষ্কার করিতে পারেন, তবে মহৎ উপকার সাধিত হইতে পারে এবং দক্ষিণ দেশে শ্রীচৈতন্যের প্রবর্ত্তিত বৈষ্ণব ধর্ম্মেরও প্রচার সহজ হইতে পারে। শ্রীচৈতন্য দক্ষিণ দেশ প্রায় সমস্তই ভ্রমণ করিয়াছিলেন এবং অনেক লোককে বৈষ্ণব ধর্ম্মে দীক্ষিতও করিয়াছিলেন, অথচ এক্ষণে দেখিতে পাই, দক্ষিণ দেশের লোকে তাঁহার নাম পর্য্যন্তও জ্ঞাত নহেন। ইংরেজি শিক্ষিত কেহ কেহ Lord Gouranga নামক পুস্তকখানি পাঠ করিয়া ইহার সম্বন্ধে কিছু অবগত আছেন বটে, কিন্তু সাধারণ লোক প্রায় কেহই তাঁহার নাম জানে না। বঙ্গদেশের শিক্ষিত অশিক্ষিত সমস্ত লোক যেমন গৌরাঙ্গকে জানেন, তেমনি মান্দ্রাজ প্রদেশে রামানুজ ও শঙ্করাচার্য্যের নাম সর্ব্বসাধারণের নিকট বিদিত, অথচ রামানুজের অনেক পরে গৌরাঙ্গের আবির্ভাব হয়। তিনি যে সমস্ত স্থানে গিয়াছিলেন—চৈতন্যচরিতামৃতে তাহার অনেক নাম দেখিতে পাওয়া যায়, সেই সমস্ত নাম এখানে উল্লেখ করিয়া বৃথা প্রবন্ধ-কলেবর বৃদ্ধি করিতে ইচ্ছা করিনা। তবে প্রসঙ্গ ক্রমে কোন কোন স্থানের বিবরণ দিতে ইচ্ছা করিয়াছি।

আমি বিজয়নগর ত্যাগ করিয়া ওয়াল-টেয়ারে পৌঁছিলাম। এই সহরটী সমুদ্রের তীরে অবস্থিত এবং অত্যন্ত স্বাস্থ্যকর, এই জন্য নানা স্থান হইতে,বিশেষতঃ বাঙ্গালা দেশ হইতে অনেক পীড়িত লোক আসিয়া এখানে বাস করেন। এই স্থানের তিন দিকে বড় বড় পাহাড় এবং এক দিকে সমুদ্র। সমুদ্র মধ্যেও একটী উচ্চ পাহাড় আছে, তাহাকে Dolphins nose বলে। এই পাহাড়ে উঠিতে হইলে উহার পাদদেশে নৌকাযোগে যাইতে হয় এবং উপরে উঠিবার রাস্তাও আছে, এই সহর হইতে প্রায় ৪ মাইল দূরে সিংহাচলের পাহাড়। উহার উপরে নৃসিংহ দেবের মূর্ত্তি স্থাপিত আছেন। ওয়ালটেয়ার হইতে লোকে গরু বা ঘোড়ার গাড়ী সহযোগে ঐ নৃসিংহ দেব দর্শন করিতে যাইয়া থাকেন। পাহাড়ের উপরে আনারসের আবাদ আছে।

চৈতন্যচরিতামৃতে দেখিতে পাই, ৩টী নৃসিংহ দেবের কথা লিখিত আছে। একটী অহোবল নৃসিংহ, দ্বিতীয়টী পানা নর-সিংহ এবং তৃতীয়টী জিয়ড় নৃসিংহক্ষেত্র। চৈতন্য দেব গোমতী গঙ্গায় স্নান করিয়া মল্লিকার্জ্জুন তীর্থে গমন করিয়া মহেশ দর্শন করেন এবং তথা হইতে অহোবল নৃসিংহে গমন করেন। এই স্থান হইতে সিদ্ধবটে, তদপর স্কন্দক্ষেত্রে এবং তথা হইতে ত্রিমল্লে

যাইয়া পুনরায় সিদ্ধবটে গমন করেন। এই স্থান হইতে বৃদ্ধকাশী, তথা হইতে ত্রিপদী ত্রিমল্লে এবং তথা হইতে পানা নরসিংহে গমন করেন। সুতরাং দেখা যাইতেছে, ৩টী নৃসিংহ বা নরসিংহ স্থলে তিনি গমন করিয়াছিলেন। ঠিক কোন্‌টী প্রহ্লাদের স্থান বুঝিতে পারা যায় না, তবে ওয়ালটেয়ারের নৃসিংহ মূর্ত্তিই প্রহ্লাদের নৃসিংহ বলিয়া জানা যায়।

শ্রীচৈতন্যদেব এই নরসিংহ হইতে শিব কাঞ্চী এবং বিষ্ণু কাঞ্চীতে গমন করেন। এই স্থানের বিবরণ পরে লিখিত হইবে। সুতরাং দেখা যাইতেছে, তিনি মাদ্রাজ সহরে গমন করেন নাই—যাহা হউক, আমি ওয়ালটেয়ার ছাড়িয়া এইবার মাদ্রাজাভিমুখে রওনা হইলাম।

ওয়ালটেয়ার হইতে মাদ্রাজ লাইন আরম্ভ হইয়াছে এবং এই স্থানেই B.N.R. শেষ হইয়াছে। ডাকগাড়ীতে তৃতীয় শ্রেণীর টিকিট বিক্রয় হয় না, সুতরাং বহুসংখ্যক লোক দায়ে পড়িয়া মধ্যম শ্রেণীর টিকিট খরিদ করে। তাহারা অধিক মাসুল দিয়া মধ্যম শ্রেণীর টিকিট খরিদ করিয়াছে, সুতরাং উহার মধ্যে স্থান না থাকিলেও তাহারা জোর করিয়া প্রবেশ করিতেছে। অনেক আশা করিয়া আসিতেছিলাম যে রাত্রে একটু নিদ্রা যাইতে পারিব, কিন্তু সে আশায় ছাই পড়িল। এই প্রকারে প্রতি ষ্টেসনেই বহুবিধ লোক নামিতে লাগিল ও উঠিতে লাগিল। ক্রমে রাত্রি হইল, তৃতীয় শ্রেণীতে অনেক স্থান থাকা সত্বেও কেহ তথায় যাইতেছে না, কারণ তাহারা দেড়ে ভাড়ায় গাড়ীর টিকিট লইয়াছে। এক খানি মাত্র মধ্যম শ্রেণীর গাড়ী পরিপূর্ণ হইয়া গেল, স্থানাভাবে অনেক লগেজ ইত্যাদি রাখিয়া স্থান bunkএর উপরে আশ্রয় লইলেন এবং কেহ কেহ নিম্নে দরজার নিকটে শয়ন করিলেন। একটী ষ্টেসনে অনেক গুলি লোক তাড়াতাড়িতে গাড়ীতে উঠিবার সময় যেমন দরজায় ধাক্কা দিয়াছে, অমনি তথায় যে লোক শয়ন করিয়াছিল, তাহার মস্তকে লাগিয়া খানিকটা স্থান কাটিয়া রক্ত বহিয়া পড়িতে লাগিল। আর যাবে কোথায়? দুই দলে বিষম লড়াই লাগিয়া গেল, বেশ পটাপট চলিতে লাগিল, আবার ইতিমধ্যে গাড়ীও ছাড়িয়া দিল। আমরা কয়েকটী লোক একটু দূরে ছিলাম, কেহ কেহ প্রস্তাব করিলেন alarm signal টানিয়া গাড়ী থামান যাউক, আমি বলিলাম, কেন বাবু চুপ করিয়া থাকুন, একটু চলুক না! উভয়দলে মারামারি বেশ চলিতেছে, আর টেলেগু ভাষায় উভয় পক্ষের পিতৃ মাতৃর উদ্দেশে নানাবিধ বাক্যও প্রয়োগ হইতেছে। তদপর কয়েকটী লোকের চেষ্টায় মারামারি থামিল, তখন মস্তকে জল ঢালাঢালি আরম্ভ হইল। কিন্তু এখনও বাকযুদ্ধ চলিতেছিল। আমি ডাক্তার, সুতরাং একবার তাহার নিকটে যাইয়া দেখিতে ইচ্ছা হইল। নিকটে যাইবার রাস্তা নাই, আমি একটু তেলেগু জানিতাম, সুতরাং যখন সকলে জানিল আমি ডাক্তার, তখন রাস্তা ছাড়িয়া দিল। তদপর ভাবিলাম, ব্যাপারটী যখন রক্তারক্তিতে পরিণত হইয়াছে, তখন না দেখাই ভাল। বিদেশে আবার শেষে পুলিষের হাঙ্গামে পড়িয়া কোর্টে উপস্থিত হওয়া সুখজনক হইবে না। আমার নিকটে একজন বৌদ্ধ সন্ন্যাসী ছিলেন, তাঁহাদের একটু দয়া হইল এবং তাঁহারই অনুরোধে—যাহা থাকে কপালে স্মরণ করিয়া আহত ব্যক্তিকে দেখিলাম, পরীক্ষা করিয়া

বুঝিতে পারিলাম, ক্ষত সামান্য রকমের। এই প্রকারে ট্রেন পরবর্ত্তী ষ্টেসনে পৌছিল, এবং আহত ব্যক্তি "পুলিশ" "পুলিশ" বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল। আমার প্রাণ তখন শুকাইয়া গিয়াছে এবং বৌদ্ধ সন্ন্যাসীর প্রতি কটাক্ষ করিয়া বলিলাম—দেখুন, এখন বোধ হয় সাক্ষ্য দিবার জন্য এই স্থানে আমাকে নামিতে হইবে। পুলিশ উপস্থিত হইল এবং তখন আমার হৃৎপিণ্ডটা ধড়াস ধড়াস করিয়া যেন ফাটিয়া যাইবার উপক্রম হইল। পুলিশ ইন্‌স্পেক্টারটী একজন টেলেগু ভদ্রলোক। প্রথমেই আমার নিকট আসিয়া ব্যাপার জিজ্ঞাসা করিলেন, কারণ আমি medical expert। আমি ব্যাপারটী অতি সামান্য বলিয়া বুঝাইয়া দিলাম, তিনিও উভয় পক্ষকে একটু বুঝাইয়া সুজাইয়া আর বিশেষ কিছু করা কর্ত্তব্য মনে করিলেন না, এবং কাহারও নাম ইত্যাদিও লিখিলেন না। আমি ইহার পরেই এক ঘটী জল পান করিয়া সুস্থির হইলাম।

ট্রেণ ছাড়িয়া দিল। সন্ন্যাসীর নিকট একটী বোম্বাই সহরের মুসলমান যুবক বসিয়াছিলেন, ক্রমে ক্রমে আমাদের মধ্যে বেশ একটু বন্ধুত্বও জন্মিল। ট্রেণের মধ্যে বন্ধুত্ব সহজেই জন্মে, আর ট্রেণ হইতে নামিলেই "তুমি কার, কে তোমার, কারে বলরে আপন"। আমাদের মধ্যে এই ব্যাপারটী লইয়া বেশ একটু হাসি তামাসাও চলিতে লাগিল। আমাদের হাসি তামাসা দেখিয়া অন্যান্য টেলেগু ভায়াগণ মনে করিলেন, আমরা তাহাদিগকে ঠাট্টা করিতেছি, সুতরাং মুসলমান যুবকের সঙ্গে একটু কলহও আরম্ভ হইল, তবে উহা অধিক দূর গড়াইতে পারিল না, কারণ কেহই কাহার ভাষা বুঝিতে পারিতেছে না, মুসলমান যুবকটীর সঙ্গে অনেক মিঠাই ছিল, তাঁহারা বার বার অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া আমি এবং সন্ন্যাসী উভয়েই কিছু মিঠাই গ্রহণ করিলাম। যুবকটী বহু কষ্টে একটু স্থান করিয়া আমাকে শয়ন করিতে অনুরোধ করিল এবং নিজে সিগারেট খাইতে আরম্ভ করিল। তাহার সিগারেটের ধূমরাশী আমার মস্তকের উপর দিয়া চলিয়া যাইতেছে, এবং কিছু নাসিকাভ্যন্তরেও প্রবেশ করিতেছে। হঠাৎ যুবকটা জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি সিগারেট খাইবেন?" আমারও ঠিক ঐ সময়ে সিগারেটের মনোমুগ্ধকর ধূম নাসিকারন্ধ্রে প্রবেশ করিয়া উহার একটু আস্বাদ লইবার আকাঙ্ক্ষা জন্মাইয়া দিল। আমি উত্তর করিলাম "সিগারেট খাই না বটে, কিন্তু এক্ষণে একটু খাইতে ইচ্ছা হইতেছে।" যুবকটী অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া তাড়াতাড়ি করিয়া বাক্স খুলিয়া এক বাক্স সিগারেট ও একটী দিয়াশলাই বাক্স আমাকে দিলেন। নেশাখোর লোকদের স্বভাবই এই প্রকার, একজন সঙ্গী পাইলে বড়ই আনন্দ হয়। একজন গাঁজাখোর আর একজন গাঁজাখোর পাইলে আনন্দে তাহার সঙ্গে কোলাকুলি পর্য্যন্তও করে। মাতালদের স্বভাব একটু ভিন্ন রকমের, কারণ উহাতে একটু পয়সা খরচ হয়, পরের মাথায় কাঁটাল ভাঙ্গিয়া যতক্ষণ চলে, ততক্ষণ "দাদা" "ভাই", তারপর একটু পেটে পড়িলে চৌদ্দপুরুষ পর্য্যন্ত বাপান্ত করিয়া ছাড়ে।

যাহা হউক, আমি সিগারেট ও দিয়াশলাই হাতে করিয়া অন্যান্য সকলে যে প্রকারে দিয়াশলাই জ্বালাইয়া সিগারেট ধরায়, আমিও তদ্রূপ চেষ্টা করিতে লাগিলাম, কিন্তু দুরদৃষ্টবশতঃ একবারও ধরাইতে পারিলাম না—

তদপর গাড়ীর দরজা বন্ধ করিয়া দিয়া সিগারেট ধরাইতে চেষ্টা করিলাম, তবুও পারিলাম না। এই প্রকারে দিয়াশালাই বাক্সের প্রায় কাটি ফুরাইয়া গেল। যুবকটী হাসিতেছে, সন্ন্যাসীও নানা প্রকারে তামাসা করিতেছে, আমি আর তখন কি করিব, রাগ করিয়া সিগারেট ও দিয়াশালাই যুবকটীকে ফিরাইয়া দিয়া শয়ন করিলাম, বলিলাম, আমি কখন সিগারেট খাই না।

বৌদ্ধ সন্ন্যাসীর নাম তিব্বতীয়া বাবা। ইহার পূর্ব্বাশ্রমের নাম সাধনচন্দ্র চক্রবর্ত্তী এবং জন্মস্থান পূর্ব্ববঙ্গের কোন স্থানে। বহুকাল তিব্বতে বাস করিয়াছিলেন, সেই জন্য তাঁহার শিষ্যগণ তাঁহাকে তিব্বতীয় বাবা বলিয়া ডাকেন। কথাবার্ত্তায় বুঝিলাম, ইনি নানাবিধ কঠিন কঠিন রোগের চিকিৎসা করিতে পারেন। আমার কোন একজন বন্ধুর পুত্রকে কঠিন মৃগীরোগ হইতে আরোগ্য করিয়াছেন। তিনিও মান্দ্রাজ যাইতেছিলেন। তথায় Ice house Road নামক স্থানে বাস করেন।

রাত্রি প্রায় ১০ টার সময় রাজমহেন্দ্রি ষ্টেসনে পৌছিলাম। ইহা একটী বড় সহর এবং গোদাবরীর তীরে অবস্থিত। এইস্থানে একদিন থাকিবার বন্দোবস্ত ছিল, কিন্তু ষ্টেসনে পৌছিয়া শুনিলাম, যাঁহার বাড়ীতে যাইব, সে বাড়ী অনেক দূরে। সুতরাং অপরিচিত স্থানে রাত্রে নামিতে সাহস হইল না। না নামিবার আরও বিশেষ কারণ ছিল যে, যাঁহার বাড়ীতে যাইব, সেই ব্যক্তির নামও মনে ছিল না। অনেক চেষ্টা করিয়াও নামটী স্মরণ করিতে পারিলাম না। আরব্য উপন্যাসের আলিবাবার গল্পের ন্যায় open Barley, open wheat ইত্যাদি অনেক কথাই স্মরণ হইল, কিন্তু তাঁহার নামটী আর মনে পড়িল না ; সুতরাং আর উপায় নাই দেখিয়া মুসলমান যুবকটীর সাহায্যে যে অল্প একটুকু স্থান পাইয়াছিলাম, তথায় অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় শয়ন করিলাম। ক্রমশঃ

শ্রীরতিকান্ত মজুমদার।

পোলাও—দ্বিতীয় উচ্ছ্বাস।

আর দিও না মুড়ির মোওয়া !
রাঙ্গা চোশন কাটি,
হুকুম পেলে দলে দলে,
আমরা কোমর আঁটি।

উষার সম, আশার ভাতি,
হ'য়ে গেছে ফ্যাকাশে,
প্যাণ্ডোরারে, কোথায় আছিস,
নবীন বর্ণ দেখাসে।

গ'ড়েছিলে আইন কানুন
ন্যায়ের cream গুলে,
বিধির বিধান মনে ক'রে
নিয়েছিলাম তুলে।

Bullর মিতা, Lewis Baboon
সেও তো পাকা সোণা,
চাইনে মোরা উগ্র Michel
চাইনে তাদের দোনা।

পেরিয়ে গেছে, দেড় শ বছর
মিলে গুলে আছি,
বিপদ কালে আপন বোলে,
খুলে দেও কাছি।

উচ্চ রবে যোগাত্তা তার,
সত্ত্ব করে দেওয়া,
বাঁধন কেন মানবে সে আর
বৃথা ধমক দেওয়া।

তোমার দেশেই Ashley ছিল,
তোমার দেশেই Buxton,
তাদের place vacant আছে
কচ্ছে গুবুরে ভন্ ভন্।

প্যাচের উপর প্যাচ শিখেছ
কচ্ছো ready আমিত্তি,
কীর্ত্তিনাশার রূপ ধরিয়ে,
রাখ্ছো বিশ্বে অকীর্ত্তি।

Sleeved rhyme ইচ্ছে ক'রে
লিখ্তে ধল্লো বুড়ো,
ধল্লে পরে ঘাড় চুরমার
আস্তো মাথা গুঁড়ো।

ডোবা ডুবি নয়কো বড়,
সাতটা সাগর পিয়ে,
দত্ত হীরেন বা'র হয়েছেন
দিব্য প্রভা নিয়ে।

মতি এখন আচ্ছা মতি,
আচ্ছা বাৎ বোলে
ভাষার মাঝে জিল্ জিলিয়ে,
লক্ষ মাণিক দোলে।

দশভূজা, দাঁড়িয়েছেন ওই,
মন্ত্র পড়েন হিমগিরি
ইন্ধনেতে, জ্বল্‌ছে আগুন
অঙ্গ করে শির শিরি।

ভক্তি ভরে সাম ধ্বনি
কচ্ছে কত সামগে,
'মুক্তি' 'মুক্তি' দৈব বাণী
উচ্চারিছে বরদে।

ছোট বড় ওই বিরোধিটার
মূল গিয়েছে কেটে,
ভাইএ ভাইএ মিলে গুলে
উঠি কোমর এঁটে।

Michel কিচেল Science খুঁটে
বাহির করুক ক্ষীর,
সিংহ পার্শ্বে ব্যাঘ্র হ'য়ে
ছিঁড়বো মিচেল্ শির।

অট্ট হেসে রক্ত মেখে,
ম'ত্তে বড়ই সুখ,
শত্রু বধি দেখ্‌বো কবে
রাজার হাসি মুখ।

তরুণ জীবন মরণ বঁধু
শুধুই করেন দান,
মরণটারে বুকে টানে
উদ্যত পরাণ।

তোমার বাঁধন, তোমার হাতেই
আমরা চাই খোলা,
তোমার পাশেই দাঁড়িয়ে রব,
ছিপের সুতার সোলা।

জীবু ভায়ার কাব্যগুলি
মিষ্ট যেন শর্করা,
আম্র রসটা হারিয়ে চিনি
হয়েছেন কর্করা।

ঠাকুর ভক্ত রামানন্দ
উড়িয়ে দিলেন 'জীবেমে',
সত্য-চাক নেয়ে তাঁহার
আমরা জানি এ দিনে।

শান্তা লেখেন, কান্তা লেখেন
লেখেন ভালই ইন্দিরা,
আপন মনে পড়ছি সবই,
বাজিয়ে বাজিয়ে মন্দিরা।

হেলিজ্ comet সরযূ বালার
সঙ্গে ছুটবে সাধ্য কার,
পিছে ছুটতে হাঁপিয়ে প'ড়ে
পাঠক করেন হাহাকার।

রাধাকমল হীরেন রবি
Comet-সুধা করুন পান,
দূরে থেকে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে
আমরা মধুর লচ্ছি ঘ্রাণ।

গা থর্ থর্ বুক থর্ থর্
কলম কাঁপে ধীরে,
গোঁসাই কবির দুল্‌ছে লতা
মলয় সমীরে।

হোথায় পলাস, আবীর মেখে,
দাঁড়িয়ে আছেন অঙ্গে,
পারুল সখী, সখার সনে,
আলাপ করেন রঙ্গে।

শাখায় বসি দোয়েল রাণী,
ভাঁজছে কিবা প্রভাতী!
কাষ্ঠ হাসি হাস্‌ছে ক্রোটন,
রঙ্গ ক'রে বিলাতী,

অলি বঁধুর, চুমার রেখা
মল্লিকার মুখে ভায়,
পাতার মাঝে কুন্দ বেলা,
লাজের কেমন ভাণ দেখায়।

হেঁকে ডেকে, ভঙ্গি ক'রে
De Bellay এসে ছুটে,
কবির ময়ূর সিংহাসনটা
এক দিনেতেই ল'ন লুটে।

বল্‌ছেন—
"Sonnet লেখে Sonnet লেখে
Sonnet কি কেউ লিখ্‌তে জানে.
Real sonnet এই দেখ না
আমারই শুধু বর্ত্তমানে।"

চুপ কল্লেন সমাজপতি
Little learning ধল্লে ধূয়া
Flush Flush শুধুই bluff
পানের সঙ্গে চিকি গুয়া।

Petrarch-প্রিয় প্রিয় ভায়া
বিদ্যার ঝুলি খুলে দিয়া,
স্পষ্ট বল্লেন কুমারী নয়
(হয়েছিল)
Sonnet রাণীর ধ্রুব বিয়া।

আঁটন সাঁটন কসাকসি
তা'র মাঝে কি ভাব জুয়ায়?
Octave রে সামাল দিতে,
কোথা দিয়ে প্রাণ পলায়।

সবুজ সবুজ তরুণ সবুজ
তোমার লেখার লাবণ্য,
তোমার হাতেই "পাক" দিলাম
add ক'রে লও সে "জন্য"।

ওই বঙ্কিম ওই রবীন্দ্র
তৃতীয় তুমি চট্টোরাজ,
'দত্তা' তোমার সুধার খনি
বোল্‌তে কেন কর্ব্বো ব্যাজ।

'গৃহ দাহে' সাইকলজির
জবাই কল্লে ভায়া
ঘুণ ধ'রে যায় কাঁচা বাঁশে
রোদ কেড়ে লয় ছায়া।

শ্রীকান্তের কাহিনী নয় তো
কাঁঠাল ভাঙ্গা ভুঁতুড়ী,
সোজা কথায় এও বলা যায়
ঘের্ত্তো বিহীন খিচুড়ী।

দীনেশ তোমার মাথায় রাখুন
আমরা বুকে রাখি গো,
তোমার ভাবের সুধার ধারায়
সারা মনটা মা'খি গো।

মাঝে মাঝে ভাবের গায়ে
রেড়ির তেলটা চট্‌চটায়,
কল্পনার গোমুখীতে
তোমার ফেল্‌তে ইচ্ছা যায়।

ব্রহ্মানন্দ রামানন্দ
ওই লিখ্‌ছেন প্রবাসী,
সাবান মাখা রুচিটা তার
সবাই বোল্‌বে বিলাসী।

দশের রবি তাঁরে কেন
Sectarian কচ্চো ভাই,
প্রতিভারে ব'ধো নাক'
কোয়ো নাক' ব্রাহ্ম চাঁই।

'মঞ্জুলিকা' রবি ভায়ার
আর কিছু নয় হাঁস ভাজা,
ব্রাহ্ম জিবে লাগ্‌বে ভাল
ভাব্‌বে সব দলখাজা।

'মর্ম্মবাণীর' পিঞ্জ্‌রে আড়ি
বার হইয়ে যুগ্ম পাখি,
হিরামনে দেশ মজাবে
ময়না পড়্‌বে থাকি থাকি।

শিক্ষা যদি নীতির রসে
সিক্ত হ'ত প্রাণে,
লুব্ধ হৃদি, মাতিত না
শূন্য অভিমানে।

ওরে ছোট, ও দারিদ্র,
ওরে কাঙ্গাল জন,
তোদের প্রাণে কর্‌বে কেরে
অমৃত সিঞ্চন?

সমাজ বুকে কাল বিড়ালের
হাড় রয়েছে গোঁজা,
কাকের cawing পেচার hooting
পথে যোরে খোজা।

ক্ষুদ্রে মহৎ, কর্‌তে যে নারে
মহৎ সে বল কিসে,
মানের পন্নগে, জড়িত হৃদয়,
নয়ন পূর্ণ বিষে।

ধনীর পদ, লেহন-করা
তর্ক বাগীশ খুড়ো,
তোষামদের ময়দা ছেনে,
হয়ে গেছেন বুড়ো।

পয়সা পেলে, করেন সুখে
পরাশরের কোরবাণী,
মাকড়-মারা দুর্ব্বলেরে
ঝাড়েন সদা দুর্ব্বাণী।

ভারত মাটীর কোন গহনে
সত্য আছে পোঁতা,
তাই তুল্‌তে সাবল হাতে
ঘুরছেন কত হোতা।

কান্না আসে কাঁদিনে আর
ব্যথার ব্যথী কোন্‌ খানে,
কাঙ্গাল সম চেয়ে থাকি,
অনুগ্রহের মুখ পানে;

Civilisation Civilisation,
ওই বিলাতী রাক্ষুসী,
মুষ্টিমের চাইলে চাউল
যুগ্ম করে দেয় ভুসী।

ময়ূখ মাখা ময়ূরী পরে
সরস্বতীর বিরাজ গো,
অদিনেতে চাঁদ দেখেছি
কলঙ্কটা কি লাজ গো।

মেরুর হৃদয় দীর্ণ করি
গাগর ভরি প্রতিভার,
কে এনেছে বাংলা দেশে
বাংলা ভাষার প্রাণ জুড়ায়!

ভোঁতা অস্ত্রে গীতা খানায়
কচ্ছে সবে গাব খোড়া,
কেঁচোগুলো ভাব্‌ছে মনে
হব আমরা সব ঢোঁড়া।

যৌবনের প্রেম কলঙ্ক
এবার যাবে কেটে,
কয় ওস্তাদ, মেলে ওরা,
শাস্ত্র নেবে বেটে।

ফল্‌গু এখন, Thames নদীতে,
হয়েছেন transformed,
তারই heatএর প্রকম্পনে,
ভারত জোড়া storm.

যাচ্চে আচার, যাবে,আচার,
Publicএ খায় gingerate,
বড় দিনের পার্ব্বণেতে
পিরুর বাড়ীর আসে ভেট।

Decade আগে Fowl roastটা
Dainty ছিল ভারী,
হ্যামের কোপ্‌তা খুব recently
ভেঙ্গেছে তার জারী।

শক্ত ভিতে প্রাচীন প্রাসাদ
তুলেছিল শির,
খস্‌ছে কড়ি কাট্‌ছে মাথা,
সৌধ আছে স্থির।

প্রেমের তরে ছাগল কাঁদে,
চাট মেরেছে ছাগী,
Elope-করা বধূর লাগি,
বঁধুনী বিরাগী।

রবির কাব্যে কামের গন্ধ,
প্রাচীন কালিদাসে।
ন্যাংটা মদন রতির মাঠে
ছুট্‌ছে কি উল্লাসে।

আত্ম শক্তি, হারিয়ে ফেলে
সবাই আছি সং সেজে,
শিখ্‌ছি এখন philosophy
শিখান যাহা ইংরাজে।

যুগের পরে যুগ যেতেছে
পর ছিলাম পর আছি,
চাকের মধু ফুরিয়ে গেলে
পালিয়ে যায় মাছি।

চিনির গায়ে গাঁধি পিপী,
ঘোঁড়ার কাছে টাটু,
বাংলা ভাষার ঋত্বিক্‌ ওই
তার সকাশে চাটু!!

সখি টু টু টু টু সখি টু টু টু টু
স্পষ্ট কথা বল্‌তে গিয়ে
আমি হব কু
সখি টু টু টু টু।

চাঁদ থেকে ওই শশটারে
আন্‌তে যদি পারেম লুফে,
আজীবনটা থাক্‌তাম ডুবে,
চির শান্ত স্নিগ্ধ রূপে।

ধানের ক্ষেতটা নাচিয়ে দিয়ে,
ছুট্‌ছে শীতল বায়,
তরু পরে, দুইটী ঘুঘু
মিলন মধু খায়।

লতার বুকে উঠ্‌ছে ধীরে
অলি মধুর গুঞ্জন,
আঙিনাতে নাচছে ধীরে
খঞ্জনী আর খঞ্জন।

ঊর্ম্মি বুকে আলো মেখে
হেসে ছোটে জাহ্নবী,
কুঞ্জ মাঝে ফুটে আছে,
গরব মাখা করবী।

গোলাপ ফুলের গাউন আঁটা
প্রতি প্রাতে Miss উষা,
সেজে গুজে, পূর্ব্ব দিকে
দাঁড়ান পরি বেশ ভূষা।

"মর্ম্মবাণীর" অন্তরালে
দাঁড়িয়ে হোথা দুই কবি,
কোকিল কণ্ঠে গান ধরিয়ে
বরণ ক'রে লয় রবি।

বিলাস মাখা, রাজার ছেলের
হৃদয় জুড়ে ভাব-রাণী,
চিরস্তব্ধ ফুলের ভাষায়
সংযোজিয়ে দেন বাণী।

"শ্রুতি স্মৃতি'' বিনয় টুকু
কেমন যেন হাঘোরে,
একটা যেন gawk এর মূর্ত্তি
সদাই আছে হা ক'রে।

রাজার হাতের দেখেছিলাম
মেঘদূতের বিশ্লেষণ,
ভাষার মধ্যে শুনেছিলাম,
মল্লারের আলাপন।

"সন্ধ্যাতারার" দ্রাক্ষারসে
মত্ত পরাণ ঊর্দ্ধে ধায়,
নীল আকাশে, Fancy রাণী
মধুর গানে প্রাণ মাতায়।

মন্দার মধু ঢালিয়া দিয়াছ,
"অপরাজিতায়"
দগ্ধ পরাণ স্নিগ্ধ হয় গো
তব কবিতায়।

সুরেস ভট্টো লেখেন novel
আঙ্ক আঙ্কের অভাব নাই,
Occult রসের mysticism
উড়িয়ে দিচ্ছে সদাই ছাই।

কলা কৌশল নাহিক কোথায়
চিত্রে নাইক দীপ্তি,
ভাষায় ফোটে না ফুল মল্লি
মেটে না কোথায়ও তৃপ্তি।

Mysticism!
ও হরিবোল, mysticism!
নহেক ইহা বুজ্‌রুকী
কচ্ছোবোকা পাঠক দলে
দম্ভ ভরে বুক ঠুকি।
Mysticism? রূপ রবে সেথা,
রবে না শরীর,
অধরের রাগ, আকাশের 'পরে,
ছড়াবে আবীর।
পবন বহিয়া, আনিবে হাসি,
রূপ নাহি ধরা দিবে,
স্বর্ণমৃগের পাছু ছুটি মন,
জল ভাবি তৃষা পিবে।
তীক্ষ্ণ জ্বালায় দহিবে চিত্ত
প্রেম রবে নাহি প্রিয়া,
মানসীরে তার, খুঁজিয়া না পাবে
দহনে দহিবে হিয়া।
উষার যাবকে রঞ্জিত পদ,
অঞ্চলে তনু ঢাকি,
কোথা হ'তে এসে তিখিন চাহনে
বধে যাবে প্রাণ পাখি।
ওই Sweet Sweeting of Romeo
ফুলের গন্ধ মেখে গায়,
বাজিয়ে বাঁশী জাগিয়ে তোলে,
স্বপ্নময়ী কল্পনায়।
হৃদয় মাঝে Pansy কুসুম,
আঘাত পেয়ে রং ফেরায়,
অতীত আসে উজান বেয়ে
প্রাণ মাতাতে মদিরায়।
ব্যাকরণের নাসিকা কাটিয়া
মেখেছ ত' করে রক্ত
বাণীর তুমি হে ভাক্ত পুত্র,
কে বলে তোমাকে ভক্ত?
ওগো মৃদুভাষি মিত্র খগেন
কাব্য রসেতে রসিয়া,
দিতেছ পাঠকে সুষমা গুচ্ছ
কতই বিনয় করিয়া।
প্রভাত তারার আলোর মতন
প্রতিভা তোমার স্নিগ্ধ
আদরের খনি হৃদয় তোমার
অবিরত সুধা দিগ্ধ।
অনভূত-রসা কল্পনা তোমার
উগারে মধুর বাণী,
ভালবাসা তব বড় চিকনিয়া
সকল রাণীর রাণী।
"ষোড়ষী" প্রিয় প্রভাতকুমার
শরত শত দল,
ভাব-সাগরে করেন খেলা
মরি কি উজ্জ্বল।
প্রবাসীতে সখে "প্রাসীর" প্রকাশে
কান্তি হইল ম্লান
উপবীত-পোড়া বুঝিলে কেমন
বুঝিলে ব্রহ্মজ্ঞান।
কবি চল দলে বাঁধিয়াছ নীড়
তুষ্ট ক'রেছ 'শিবে'।
ঢেলে দেও প্রিয় মধুর প্রভাতে
যত মধু আছে জীবে।
রস রসিক ডিপুটী সুরেন
বড়ই লেখেন মিষ্টি।
রুচির লেখায় কভু মনে হয়
এ যে দেখি সুধা বৃষ্টি।
কলম-অস্ত্রী সমাজপতি,
বটেন ভালই জহুরী,
হীরার হারে গাঁথেন মালা
লইয়ে নগদ তহুরী।
কান্না কালা এক নয়নে
কাঁচ্ছে কাণি,
কলুর বলদ শিথিল ভাবে,
টান্‌ছে ঘানি;
জ্যোতি দাদার জীবন-স্মৃতি
লিখ্‌তে হল 'বসন্তর'
পাঁচু বসে শুন্‌তে পাচ্ছি
পড়াচ্ছে কে সুমন্তর।
দীপ্তি আছে শক্তি আছে
প্রাণ মাতান আছে প্রাণ
বসন্তর মাঝে জাগে
সুধা ভরা কুহুতান।

শ্রীবেণোয়ারীলাল গোস্বামী।

ভারতীয় ইতিহাস সম্বন্ধে কয়েকটী কথা

সার্দ্ধ এক শত বৎসর ইংরাজ শাসনের অবশ্যম্ভাবী ক্রমোন্নতির হাওয়াতেই হউক, বা ইউরোপ-ব্যাপী মহাসমরের সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতামূলক ঘোষণাবলীর স্বাভাবিক প্রাণস্পর্শী আকর্ষণেই হউক, আজ সমগ্র দেশময় যে একটী আন্দোলনের উৎপত্তি হইয়াছে, তাহা অস্বীকার করা যাইতে পারে না। গ্রামে কিম্বা সহরে, সৈন্য সংগ্রহের সমিতিতে কিম্বা শিক্ষাবিষয়ক সভায়, সর্ব্বত্রই আজ এক কথা, সকলের প্রাণে আজ এক ভাব। কোনও এক নূতন শক্তি আমাদিগকে অনুপ্রাণিত করিতেছে, ইহা সহজেই অনুভব করা যাইতে পারে। এই নবশক্তি আমাদিগকে সামাজিক, শিক্ষাবিষয়ক, লোক-হিতকর প্রভৃতি সকল কার্য্যেই পরিচালিত করিতেছে, এই পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিয়াই ইংলণ্ডের মন্ত্রিসভা ভারতবর্ষে নূতন পরিবর্ত্তনের বিষয় আলোচনা করিবার জন্য মণ্টেগু সাহেবকে আমাদের দেশে প্রেরণ করিয়াছিলেন, এই নবশক্তির উত্তেজনময়ী প্রভাবেই আজ বাঙ্গালী-রেজিমেণ্ট দেশের জন্য, সুদূর মেসোপটেমিয়া ক্ষেত্রে স্বজাতির সম্মান রক্ষা করিতে অগ্রসর হইয়াছে। এই সমস্ত পরিবর্ত্তন দেখিয়া এই বর্ত্তমান যুগকে "রাজনৈতিক-যুগ" নামে অভিহিত করা যাইতে পারে। এই রাজনৈতিক যুগে আমাদের ভারতবর্ষীয় ইতিহাস পাঠ করিবার প্রয়োজনীয়তা খুব বেশী মনে হয়। রাজনৈতিক ব্যাপার সম্পূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে ইতিহাস প্যাঠের যে প্রকার প্রয়োজন, ডাক্তারি বিদ্যা শিক্ষা করিতে হইলে ছাত্রের সেইরূপ শারীর বিজ্ঞানের জ্ঞান প্রয়োজন। সাময়িক উত্তেজনার বশবর্ত্তী হইয়া কাজ করা অপেক্ষা অতীত অবস্থা জ্ঞাত হইয়া বিচার শক্তির বৃদ্ধি করা ও তদনুযায়ী কাজ করা সর্ব্বতোভাবে শ্রেয়। মাদ্রাজ প্রদেশীয় লাট সাহেব, রিজলি সাহেব কিম্বা আমাদের গবর্ণর সাহেব যাহাই বলুন, আমাদের ছাত্র-মণ্ডলী এই নবশক্তির বাহিরে নিশ্চল হইয়া থাকিতে পারিবে না। নূতন প্রণালীতে, সময়ের মত করিয়া আমাদের দেশীয় ইতিহাস তাহাদিগকে পড়াইবার ব্যবস্থা বর্ত্তমান অবস্থায় অত্যন্ত প্রয়োজনীয় মনে হয়। কোন্ কুক্ষণে জানি না, কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয় এই বিষয়টীকে অপেক্ষাকৃত অল্প প্রয়োজনীয় জ্ঞান করিয়া ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় নিম্নস্থান প্রদান করিয়াছিলেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় অনুসন্ধান কমিটি, আশা করা যায়, ইহার এই ত্রুটী সংশোধন করিতে পরাঙ্মুখ হইবেন না।

ইংরাজী ভাষায় ইংলণ্ডের ইতিহাস সর্ব্বপ্রকার ভাব লইয়া (different points of view) লিখিত আছে। সামাজিক, শিক্ষাসম্বন্ধীয়, বিচারসম্বন্ধীয় কার্য্যপ্রণালীর, এমন কি, সামান্য বিষয়গুলির পর্য্যন্ত ঐতিহাসিক আলোচনা দ্বারা সিদ্ধান্তে উপনীত হইলে কার্য্যকরী হয়। প্রথম হইতেই (Constitutional History) রাষ্ট্রীয় শাসন-প্রণালীর (বা নিয়ম তন্ত্রের) সাধারণ জ্ঞাতব্য বিষয়গুলি ছাত্রদিগকে জ্ঞাত করান হইয়া থাকে। সে দেশের লোকের রাজনৈতিক ব্যাপারে লিপ্ত হইবার আকাঙ্ক্ষা প্রবল বলিয়া

এরূপ করিবার প্রয়োজনীয়তা। আমাদের দেশে এ যুগের পরিবর্ত্তনে আমাদেরও ইহা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বলিয়া মনে হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয় ভারতবর্ষীয় ইতিহাস সেই এক প্রকার ছাড়া আর কোনও প্রকার লিখিত হইয়াছে কি না, সন্দেহ। অশোক কি প্রকার রাজা ছিলেন, প্রাচীন ভারতে অগ্নের জন্ম ছিল কি না, আকবরের খ্রীষ্টিয়ান স্ত্রী ছিল কি না, মহারাষ্ট্রী যুদ্ধ কয়টী, ইহা জানিতে পারিলেই আমাদের ইতিহাসের জ্ঞান শেষ হইল। বিদ্যালয় প্রভৃতিতে পড়াইবার সময়েও এই সমস্ত ব্যাপারের উপর যেন ছাত্রের সমস্ত জীবন নির্ভর করিতেছে, এরূপ ভাব দেখান হয়। ইতিহাস যে কেবল মাত্র পুরাতন কয়েকটী ব্যাপারের সমষ্টি নহে, ব্যবহারিক ক্ষেত্রে ইহার যে একটী প্রয়োজন আছে, পরীক্ষার মন্দিরের বাহিরে ইহার যে একটী জীবন্ত প্রভাব আছে, তাহা ছাত্রদিগকে বুঝিতেই দেওয়া হয় না। ইতিহাসের প্রত্নতত্ত্ব দ্বারা প্রমাণিত বিষয়গুলি কেবল মাত্র ঐতিহাসিকগণেরই আনন্দদায়ক, ইহার সাধারণ সিদ্ধান্ত সকলেরই প্রয়োজনীয়। এই প্রবন্ধে কতকগুলি এই প্রকার সাধারণ বিষয়ের অবতারণা করিতে ইচ্ছা করিয়াছি। বিষয় অনেক, আমার উদ্দেশ্য, এই দিকে ঐতিহাসিকগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করা মাত্র।

(১) হিন্দুযুগ।

ভারতবর্ষের ইতিহাস আরম্ভ হিন্দু-রাজগণের রাজত্বকাল হইতে। রামায়ণ, মহাভারত কিম্বা তৎপূর্ব্বরচিত বেদ, উপনিষৎ প্রভৃতি হিন্দুযুগের ইতিহাসের আরম্ভ। অন্যান্য দেশের ইতিহাস পড়িতে গেলে প্রথমেই পাঠ করিতে হয়, সে দেশের লোকের আদিম অসভ্য কিম্বা অর্দ্ধসভ্য অবস্থা, তৎপর তাদের ক্রমশঃ উচ্চ ও উচ্চতর সোপানে আরোহণ; প্রথমে প্রভাতের অর্দ্ধতমসাচ্ছন্ন ব্রহ্মমুহূর্ত্তের সূর্য্য-দেবের আগমন ঘোষণা, পরে দ্বিপ্রহরের নিদারুণ তেজ, ও তৎপর অবসাদক্লিষ্ট ভাবে অদম্য আশা আকাঙ্ক্ষা প্রভৃতির নিবৃত্তি—অস্ত। আর এই দেশের ইতিহাসের প্রথম পৃষ্ঠায় পদ্মসরোবর। প্রস্ফুটিত কুসুমের সৌরভে প্রকৃতির দানশীলতার পরিচয়ে দর্শক ভাবিবেন ইহা কি সত্য, না স্বকপোলকল্পিত মনোজগতের সৃষ্ট পরীরাজ্য? যাহাতে এ রমণীয় স্থানের শোভা কেহ নষ্ট করিতে না পারে, তাহা দেখিবার জন্য প্রথমেই রক্ষকের অভাব। রক্ষক থাকিলেও বড় ও পরস্পর কোলাহলপরায়ণ। মধ্যাহ্নের প্রচণ্ড তেজ সহিবার ক্ষমতা এই সরোবরের নাই, সে অবস্থায় উপনীত হইবার পূর্ব্বেই সেই নির্ম্মল বারিরাশির অবস্থা পরিলক্ষিত হয়, অসংখ্য পুষ্পের স্থানে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত দুই একটী দৃষ্ট হয় মাত্র। অদ্ভুত এই দেশের ইতিহাস।

অন্যান্য দেশের ইতিহাস আরম্ভ হয় মানুষ লইয়া, আর আমরা আরম্ভ করি পুস্তক দ্বারা। কাজেই যাহারা সাধারণ ঐতিহাসিক, তাহাদের পক্ষে এ যুগের ইতিহাস তত প্রাণস্পর্শী হয় না। ঐতিহাসিক আবার সংস্কৃতভাষাভিজ্ঞ না হইলে এই ক্রমবিকাশ উপলব্ধি হয় না। যে পুস্তকগুলি বর্ত্তমান, তাহাতেও ধর্ম্মভাবের প্রাচুর্য্য থাকায় ঐতিহাসিকের লোকপরিচয়ের বড় বিশেষ সুবিধা হয় না। বর্ত্তমান যুগের (যাঁহাকে আমরা পূর্ব্বেই "রাজনৈতিক" বলিয়া অভিহিত করিয়াছি) সাধারণ ব্যক্তিগণের পক্ষে ইহা বিশেষ আনন্দদায়ক হয় না। ধর্ম্মার্থিগণের পাঠের নিমিত্ত এই যুগের পুস্তকগুলি রত্নসাগর। ক্রমশঃ।

শ্রীবিনয়ভূষণ মজুমদার।

মাতৃত্ব-সাধনা।

নারী-নীতি-সাগর চির দুরবগাহ,—গভীর এবং অতলস্পর্শ। নারী-চরিত্র-মাধুর্য্য চির-প্রহেলিকাময়—চিন্তা এবং ভাবের অতীত। নারী-জীবন বিধাতার এক অপূর্ব্ব সৃষ্টি,—তন্ময় না হইলে তাহা হৃদয়ঙ্গম হয় না; যত হৃদয়ঙ্গম হয়, ততই মোহিত হইতে হয়। প্রাচীন আর্য্য ঋষিগণ পদ্মিনী, চিত্রিনী, শঙ্খিনী ও হস্তিনী, এই চারি শ্রেণীতে নারী-জীবনকে বিভক্ত করিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা বলেন, সাধ্বী, ভোগ্যা ও কুলটা, নারী-জীবন এই ত্রিবিধ লক্ষণাক্রান্ত। প্রাচীন দশ মহাবিদ্যার এই নারী-জীবন এই সংজ্ঞা পাইয়াছেন—কালী, তারা, মহাবিদ্যা, ষোড়শী, ভুবনেশ্বরী, ভৈরবী, ছিন্নমস্তা, বিদ্যা, ধূমাবতী ও মাতঙ্গী। পুরাণে ভগবতী, জগদ্ধাত্রী, লক্ষ্মী, সরস্বতী, প্রভৃতি দেবীগণ নারী-জীবনের শিরোভূষণ। প্রাচীন সাহিত্যে বিভিন্ন রূপে নারী-মাহাত্ম্যানুসারে নারী-জীবন কীর্ত্তিত—যথা মৈত্রেয়ী, গায়ত্রী, খনা, লীলাবতী, সীতা, সাবিত্রী, শকুন্তলা, দময়ন্তী, দ্রৌপদী, মন্দোদরী প্রভৃতি। এই ভারতে সতীধর্ম্ম যেরূপ ভাবে কীর্ত্তিত হইয়াছে, এরূপ বুঝি বা আর কোথাও হয় নাই। পরন্তু সতী ধর্ম্মের পরিপন্থী উর্ব্বশী, মেনকা, রম্ভা প্রভৃতিও শাস্ত্রে সম্মান পাইয়া অমর হইয়াছেন। নারী-জীবন এই ভারতে চির-প্রহেলিকাময়।

স্ত্রীপুরুষের মিলনেই জীব-প্রবাহের সৃষ্টি, এবং তাহা হইতেই সমাজ উদ্ভূত। মনু এই আট প্রকার বিবাহের ব্যবস্থা করিয়াছেন, যথা—

ব্রাহ্মো দৈবস্তথৈবার্ষঃ প্রাজাপত্যস্তথাসুরঃ
গান্ধর্ব্বো রাক্ষসশ্চৈব পৈশাচশ্চাষ্টমোহধমঃ।
৩,২১

ব্রাহ্ম, দৈব, আর্ষ, প্রাজাপত্য, আসুর, গান্ধর্ব্ব, রাক্ষস ও পৈশাচ। তন্মধ্যে অষ্টম পৈশাচ নিকৃষ্ট জানিবে।

নারী-জীবন পুরুষের এত আকর্ষণের জিনিস কেন? কমনীয়তা, মৃদুতা, লাবণ্য, মাধুর্য্য ও সৌন্দর্য্যই যে কেবল তাঁহাতে প্রকট, তাহা নয়; তাঁহাতে দয়া, দাক্ষিণ্য, পবিত্রতা, সহানুভূতি ও স্বার্থত্যাগ যেন মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছে। এই নারীর পূজা যেখানে হয়, সেখানে দেবতারা রমণ করেন, আর্য্য-শাস্ত্র কীর্ত্তন করিয়াছেন। এই নারী-শিক্ষা প্রবর্ত্তন করিয়া আর্য্যশাস্ত্র প্রণম্য হইয়াছেন। এদেশে মাতৃমূর্ত্তি, ধর্ম্মের প্রকট মূর্ত্তি। ঘরে ঘরে যে ধর্ম্ম বিরাজিত, তাহা এদেশে মাতারাই আবহমান কাল রক্ষা করিয়া আসিতেছেন। মাতৃত্ব বিধাতার এক অপূর্ব্ব সৃষ্টি।

কিন্তু চিরদিনই জগতে মহিলাদিগের প্রতি অবিচার হইয়াছে। পৃথিবীর সুসভ্য দেশেও মহিলাগণ সর্ব্ববিষয়ে পুরুষের সমান অধিকার পায় নাই, ভারতবর্ষের ত কথাই নাই। বর্ত্তমান সময়ে ভারতের মহিলাগণ বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ শিক্ষার অধিকার পাইয়াছেন বটে, কিন্তু অন্যান্য বিভাগে পান নাই। না পাইবার কারণ যথেষ্ট আছে, সন্দেহ নাই, কিন্তু প্রধান কারণ বোধ হয় এই যে, পুরুষেরাই সর্ব্বেসর্ব্বা, ক্ষমতাশালী, তাহারাই প্রতিপালক, তাহারাই রক্ষক, সুতরাং মহিলাগণ তাহাদের অধীন হইয়া থাকিতেই বাধ্য

হইতেছেন। পরন্তু মাতৃত্বের তিরোধানের আশঙ্কাতেই পৃথিবীর বিজ্ঞগণ মহিলাদিগকে এককেন্দ্রে আবদ্ধ রাখিতে যত্নবান। বিজ্ঞান প্রতিপন্ন করিয়াছেন, অনুশীলন অনুসারে স্ত্রীত্ব বিলুপ্ত হয় এবং নারী-জীবনেও পুরুষত্ব প্রকটিত হয়। শারীর বিধানের তারতম্যে স্ত্রীসুলভ লজ্জা, কমনীয়তা, মৃদুতা, মাধুর্য্য বিলুপ্ত হয়, এবং মাতৃত্বের স্থল পৌরুষ ভাব অধিকার করে,—তেজ, সাহস, উদ্যম, উদ্যোগ তদীয় জীবনে আবির্ভূত হয়। বিজ্ঞানের জটিল প্রশ্নের মীমাংসা আজও সম্যকরূপে হয় নাই। সে সকল কথা আজ থাকুক।

দায়ভাগে মুসলমান ও খ্রীষ্টীয়-জগতে মহিলাদের অধিকার অনেক বেশী, কিন্তু হিন্দু-জগতে মহিলাগণ বিষয়ের অধিকারিণী নহেন। জীবন-সত্ব থাকিলেও তাঁহারা অপুত্রক অবস্থায় পিতা বা স্বামীর পরিত্যক্ত সম্পত্তির অধিকারিণী নহেন। সুতরাং মহিলাদের অধিকার হিন্দু-জগতে সঙ্কীর্ণ ও সীমাবদ্ধ। ইহারও নিগূঢ় কারণ রহিয়াছে, মাতৃত্ব রক্ষা করিতে হইলে, ত্যাগ-মন্ত্রেই তাঁহাকে দীক্ষিতা করিতে হইবে। বিষয়-নিরপেক্ষ না হইলে মাতৃত্ব সম্যক স্ফূর্ত্ত হয় না। এক বিশাল-সাম্রাজ্যের অধীশ্বরী করিয়া হিন্দু-শাস্ত্রকারগণ মহিলাদিগকে রাখিয়াছেন—সে সাম্রাজ্য-মাতৃত্ব।

যাহা হউক, আর্য্যবিধানানুসারে মাতৃত্ব সাধন এখন আর নাই, সুতরাং মহিলারা ধন সম্পদের অধিকারিণী না থাকায়, সমাজে তাঁহাদের দুর্দ্দশার শেষ নাই। বিধবাদের অবস্থা, স্বামী-পরিত্যক্তাদের অবস্থা এদেশে কত শোচনীয়, সকলেই জানেন। তাঁহাদের কোথাও যেন দাঁড়াইবার স্থান নাই। পুরুষের প্ররোচনায় প্রলুব্ধ হইয়া কত মহিলা বিপথে গমন করিতে বাধ্য হন। বিদ্যাসাগর মহাশয় গণনা করিয়াছিলেন, কলিকাতার পনর আনা বেশ্যা ভদ্রঘরের মেয়ে। কত সুরবালা ও গায়ত্রী যে পাপের পথে চলিয়াছেন, অনেকে তাহা জানিয়াও উপেক্ষা করেন। পুরুষদের শত অপরাধ মার্জ্জনীয়, কিন্তু মেয়েদের একবার পদস্খলন হইলে, সমাজে আর তাহাদের স্থান নাই। একবার পদস্খলন হইলেই তাঁহারা চিরদিনের জন্য গেলেন! কত দুর্দ্দশা-গ্রস্ত মেয়ের চক্ষের জলে যে এই বঙ্গভূমি কলুষিত, তাহার সংখ্যা হয় না। একবার একটী বিপথগামী মহিলা বলিয়াছিলেন, "প্রলুব্ধ হইয়া যাই ঘরের বাহির হইলাম, অমনি সর্ব্বনাশ ঘনাইয়া আসিল। রূপ যৌবনের দিনের আদর অভ্যর্থনা বার্দ্ধক্যের আক্রমণে তিরোহিত হইয়াছে, এখন অনাহারে সাহায্য করিতে, রোগে শুশ্রূষা করিতে, মৃত্যুর দিনে শ্মশানে নিতে কেহই নাই! আমাদের ন্যায় দুর্দ্দশাগ্রস্ত এই ধরায় আর কেহ নাই। দুষ্কার্য্য করিয়াছি, তাহা বুঝিতেছি, কিন্তু তাহার কি প্রায়শ্চিত্ত নাই? পাপই পাপের পথের যেন চিরসহায়। আমাদের দুঃখ কে বুঝিবে?" এই কথা বলিবার সময় মহিলার চক্ষের জলে বক্ষ ভাসিয়া যাইতেছিল। আমরা কি আর সান্ত্বনা দিব? দেশের অবস্থার কথা ভাবিয়া আমাদের নয়নেও জলধারা বহিয়াছিল। কঠোর হইতে কঠোর প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা করিয়াও তাহাদিগকে সমাজে স্থান দেওয়া কর্ত্তব্য নয় কি? সৃষ্টির এক মহাশক্তির কত অংশ চিরকাল এইরূপে পরিত্যক্ত হওয়ায় সমাজ দিন দিন দুর্ব্বল হইতেছে, মাতৃত্ব যেন নির্ব্বাণ-দশা প্রাপ্ত হইতেছে।

কেহ কেহ বলিতে পারেন, ধনৈশ্বর্য্যের

অধিকারিণী হইলে মহিলাদের বিপথে যাওয়ার আরো সুবিধা হয়; স্বামীর ধনে পরপুরুষের অঙ্গসৌষ্ঠব বাড়াইতে পারেন। কথাটা একেবারে উপেক্ষার যোগ্য নয়। কিন্তু এমন কত মহিলার কথা শুনা গিয়াছে, তাঁহারা ধনের যথার্থ সৎব্যবহার করিয়া গিয়াছেন। অন্যান্য দেশের কথা বলিব না। এই বঙ্গে রাণী ভবানী, রাণী শরৎসুন্দরী ও জাহ্নবী চৌধুরাণীর সৎ কাজের কথা অনেকে শুনিয়াছেন। কিন্তু সে সংখ্যা কম হইলেও একথা বলিতে পারি, যদি এদেশে মাতৃত্বের সাধনা থাকিত, পুরুষেরা প্রলুব্ধ না করিত, এবং গ্রাসাচ্ছাদনের সুবিধা থাকিত, তবে এত সংখ্যা বিপথে যাইতেন না। স্বেচ্ছা-বিহারের আমরা পক্ষপাতী নই, কিন্তু মাতৃত্ব সাধন কোথায়? পুরুষের প্ররোচনায় কত কত মহিলা বিপদে গিয়াছেন ও যাইতেছেন, কে তাহা খোঁজ রাখে? তাহার একটা সঠিক সংখ্যা সংগ্রহের সময় কি উপস্থিত হয় নাই?

এই স্থলে একটী কথা এই, রিপুর উত্তেজনা পুরুষের বেশী, না মহিলাদের বেশী? আমাদের মনে হয়, এবং বিজ্ঞানও প্রমাণ করিয়াছেন, রিপুর উত্তেজনা পুরুষেরই বেশী। ধন সম্পত্তি পুরুষের হাতে বলিয়া তাঁহারা বাজারে ঘর বাঁধে না, কিন্তু হাতে ধন না থাকিলে তাঁহারা একেবারে স্বৈরিণীর পদতলে পড়িয়া ধর্ম্ম কর্ম্ম-জাতিবিচারে জলাঞ্জলি দিয়া থাকেন। পরন্তু মহিলাদিগকে দুষ্কৃতির পথে চালিত করিবার প্রলোভন পুরুষের হাতে। প্রতি পল্লীর বিবরণ সংগ্রহ করিলে দেখা যায়, পুরুষেরাই ছলে, বলে, কৌশলে ভুলাইয়া বালবিধবাদিগকে বিপথে লইয়া যায়। এই-রূপে কত বালবিধবার যে সর্ব্বনাশ হইয়াছে, তাহা গণনা করা যায় না। কত ভ্রূণ হত্যা যে এ দেশে হইতেছে, তাহার সংখ্যা হয় না। যাহারা একবার পতিত হয়, আর তাহাদের আশ্রয় থাকে না, সমাজ বিমুখ হন। অন্য দিকে পুরুষ শত বার পতিত হইলেও কিছু আসিয়া যায় না; সমাজে প্রতিপত্তির হ্রাস হয় না।

মাতৃত্ব সাধনার অভাবে কত মহিলা চিরদিনের জন্য ডুবিয়াছেন, যাঁহারা সমাজে থাকিলে কত উপকার হইত। বিশ্বেশ্বর দাস যদি সমাজে স্থান পায়, তবে সুহাসিনী পাইবে না কেন, প্রত্যেকের নিকট জিজ্ঞাসা করি।

বিবাহের ঘর বান্ধা থাকায়, কুলীন ব্রাহ্মণ-দিগের অনেক মহিলার বিবাহ হয় না। কখনও বা এক পতির বহুপত্নী যোটে। এখন কৌলী-ন্যের স্রোত পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক কমিয়াছে বটে, কিন্তু একেবারে উঠিয়া যায় নাই। অবিবাহিতা কুমারী, বা বহুপতিক যুবতীর সংখ্যা এ দেশে এখনও কম নয়। রক্ত মাংসের শরীর লইয়া মানুষ কতদিন প্রলোভন-সংগ্রামে জয়লাভ করিতে পারে? ব্রহ্মচর্য্যের বিধান শুধু মহিলাদের জন্য কি? পুরুষ স্বেচ্ছাচারী, যাহা ইচ্ছা করিতেছেন, কোন দোষ নাই। ঘটনাচক্রে পড়িয়া পুরুষের উত্তেজনায় এইরূপ কত মহিলা ভ্রূণ-হত্যা-পাপে বিজড়িতা। পরন্তু কত ব্রাহ্মণ চিরদিন অবিবাহিত থাকিতে বাধ্য হইতেছেন। তাঁহাদের সহায় কেবল ব্যভিচার। মেয়েরা পতিতা হইলে কতক বাজারে ঘর বাঁধে এবং বাকী অংশ কাশী, বৃন্দাবন, নবদ্বীপ, কালীঘাটে যাইয়া কলুষিত জীবন যাপন করে। কিন্তু পুরুষেরা মহা-গর্ব্বে বুক ফুলাইয়া সমাজ কাঁপাইয়া চলে।

এইরূপ বৈষম্যময় পাপে বঙ্গ দিন দিন মলিন ও নিষ্প্রভ হইতেছে। আরজ সন্তানের

সংখ্যা এ দেশে কম নয়। আজীবন তাহাদিগকে নিগ্রহ সহ্য করিতে হইতেছে। অসংখ্য-জাতি-ভেদ-প্লাবিত দেশে আরো জাতিভেদ বাড়িতেছে। ইহাদের বিবাহ কঠিন-সমস্যা বলিয়া তাহারা চিরদিন কেবল দুষ্কার্য্য করিয়া ফিরিতেছে। সেন্সস রিপোর্টে ইহাদের সংখ্যা নির্দ্ধারিত হইলে বুঝা যাইত, দেশের কি শোচনীয় অবস্থা। ইহাদের মধ্যে যাহারা কিছু কিছু অর্থ উপার্জ্জনে সক্ষম, তাহারা কোনরূপে অর্থবলে কোন জাতিতে প্রবেশ করিতেছে, কিন্তু অনেকে প্রবেশ করিতে পারিতেছে না। বংশগত সদ্ভাব মূলক মর্য্যাদা এই বঙ্গে অক্ষুন্ন থাকিতে পারিতেছে না। কত ঘরে "বিদ্যা-সুন্দরের" অভিনয় হইতেছে, কত ঘরে কর্ত্তারা পাপের প্রশ্রয় দিতেছেন, কত ঘরে খাল কাটিয়া লোনা জল আনা হইতেছে। এইরূপে বঙ্গ সমাজ দিন দিনই মলিন হইয়া উঠিতেছে। মাতৃত্ব সাধনা কথার কথায় পর্য্যবসিত হইয়াছে।

পাপ ধর্ম্মের চিরপরিপন্থী। সমাজে অবাধ পাপের স্রোত প্রবাহিত হওয়ায়, ধর্ম্ম দিন দিন বিলুপ্ত হইতেছে। ভক্তি, বিশ্বাস, পুণ্য দিন দিন কমিয়া যাইতেছে। ধর্ম্মের বাহ্যানুষ্ঠান কমিলেও একেবারে লোপ পায় নাই বটে, কিন্তু প্রকৃত ধর্ম্ম এখন রূপ-কথায় যেন পরিণত হইতেছে। প্রকৃত ধর্ম্ম বিশ্বাস এখন নাই বলিলেই চলে। যদি প্রকৃত ধর্ম্ম বিশ্বাস থাকিত, তবে, এমন করিয়া সমাজ পাপের পথে অগ্রসর হইত না। প্রকৃত ধার্ম্মিক ব্যক্তি এখন প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায় না। চরিত্রহীন ব্যক্তির সংখ্যাই দিন দিন বাড়িয়া যাইতেছে। কোথায় মাতৃজ্ঞান, মাতৃধ্যান?

পূর্ব্বে প্রতি পল্লীতেই দুই একজন ধার্ম্মিক ব্যক্তি দেখা যাইত, তাঁহাদের পুণ্যের জোরেই সেই সেই পল্লী রক্ষা পাইত। পাপী, দুষ্কার্য্য করার সময় তাঁহাদের কথা ভাবিয়া সংযত হইত। কিন্তু "বিশ্বেশ্বরদের" আবির্ভাবে সমাজ দুর্দ্দশার চরম সীমায় উপনীত, নীতি ধর্ম্ম এখন সময় বুঝিয়া চিরপ্রস্থান করিতেছেন। পূর্ব্বে পল্লীতে পল্লীতে ধর্ম্মপ্রাণা দুই একজন মহিলা দেখা যাইত, তাঁহাদের নিষ্ঠার দৃষ্টান্তে, সেবার আদর্শে, চরিত্রের মাধুর্য্যে সমাজের লোকেরা সংযত থাকিত, কিন্তু প্রাচীনাদের তিরোধানে নবীনাদের মধ্যে আর সেরূপ ধর্ম্মভাব নাই। যে পাশ্চাত্য শিক্ষার স্রোত সমাজের উপর দিয়া প্রবাহিত হইয়া যাইতেছে, তাহাতে বিশ্বাস-শিথিলতা, স্বেচ্ছাচারিতা ও বিলাসিতা এ দেশে এখন বদ্ধমূল হইতেছে। এখন সংযম শিক্ষা সুদূর-পরাহত হইয়া উঠিতেছে। বালক বালিকারা বিলাসিতা ও নিরীশ্বর-শিক্ষা-স্রোতের মধ্যে লালিত পালিত হইয়া স্বেচ্ছাচারের পথে চলিতেছে। অনুসন্ধান কর, বুঝিতে পারিবে, এখনকার দিনে, মেয়েছেলেদের মধ্যে ধর্ম্মভাব নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ধর্ম্ম এখন উপহাসের জিনিসে পরিণত হইতেছে। এদেশে দিন দিন নারী-সমস্যা কঠিন হইতেছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ে নিরীশ্বর শিক্ষা, আফিস আদালতে নিরীশ্বর বিচার, রাজনীতির বাজারে নিরীশ্বর আন্দোলন, সাহিত্যে নিরীশ্বর অশ্লীল গল্প প্রচার—চতুর্দ্দিকে এমন অবস্থা উপস্থিত হইতেছে, সংযম শিক্ষার আর স্থান বা অবসর নাই। যে রক্ষক, সে ভক্ষক হইলে, উপায় কোথায়?

অধীনস্থদিগকেও যদি ভাল পথে রাখা যাইত, প্রতি পরিবারও যদি "সু" ধরিয়া চলিতে পারিত, তবে দেশের আশা ছিল;

কিন্তু কি লেখক, কি উপদেষ্টা, কি প্রচারক, কি নেতা, কি গুরু, কি পুরোহিত—সকলেই যদি চরিত্র ও ধর্ম্ম সম্বন্ধে উদাসীন হন, কিরূপে দেশ পাপ-সংগ্রামে জয়লাভ করিবে? সকলেই যদি মনে করেন, ধর্ম্ম ভিন্নও সমাজ চলিতে পারিবে, তবে আর উপায় কি? অপিচ, তাঁহারা যদি চরিত্রহীন হন, তবে কে আর কি করিবে বল? সকল আদর্শ খর্ব্ব হইয়া যাইতেছে—পাপের পথ পরিষ্কার হইতেছে।

সতীধর্ম্ম এ দেশের চিরাদর্শ সতীধর্ম্ম রক্ষার একমাত্র মন্ত্র, সংযম ও পবিত্রতা। সংযম ও পবিত্রতার আদর্শ খর্ব্ব হইলে সতীধর্ম্মও খর্ব্ব হয়। সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী প্রভৃতি নারীগণ সতীধর্ম্মের যে আদর্শ-জীবন এ দেশে দেখাইয়া গিয়াছেন, আজকাল তাহার দৃষ্টান্ত বড় একটা দেখা যায় না। না গেলেও, সতীধর্ম্মের প্রতি এখনও এ দেশের নারীগণের যে আসক্তি আছে, তাহা সুদীর্ঘকাল আর থাকিবে কি না, সন্দেহ। তাহার কারণ, উচ্ছৃঙ্খলতা। নিরীশ্বর-শিক্ষাই উচ্ছৃঙ্খলতার কারণ। এখন সাহিত্যের বাজারে চুটকি গল্পের যে প্রকোপ দেখা যাইতেছে, তাহা যুবক যুবতী-দিগকে বিভ্রান্ত করিয়া তুলিতেছে। বিলাসি-তার উপকরণ দিন দিন বেশী বিকাইতেছে, এখন নাটক নভেলের আদর্শে জীবন গঠিত হইতেছে।

কার ঘরে মা বোন নাই? সকলের ঘরেই আছে, অথচ মা বোনের প্রতিনিধি অন্য ঘরের মেয়েদের প্রতি এ দেশের পুরুষেরা ভাল চক্ষে দৃষ্টিপাত করিতে পারেন না। রাস্তায়, ঘাটে, গাড়ীতে, ষ্টিমারে, রেলে মেয়েরা যাইতেছেন, আর নির্লজ্জ লোকেরা, ভ্রমর হইয়া তাকাইয়া তাকাইয়া দেখিতেছে। ঐ দৃশ্য সর্ব্বত্র দেখা যায়। অন্য নারী কি মা বোনের প্রতিনিধি নন? মাতৃজাতি চির-পূজ্যা নন্ কি? মাতৃজাতি যেখানে পূজা পান, সেখানে কি দেবতারা বিরাজিত থাকেন না? আর্য্য শাস্ত্রের বাণী সকলেরই শিরোধার্য্য, কিন্তু অসংযম এবং উচ্ছৃঙ্খলতা এমন ভাবে চলিয়াছে যে, মহিলা দেখিলেই লোকের লোলুপ দৃষ্টি বৃদ্ধি হয়। পশু পক্ষীর মধ্যেও এরূপ কদর্য্য দৃষ্টি দেখা যায়। মানুষ কি পশু অপেক্ষাও হীন? মা বোনের প্রতিনিধি-দিগের প্রতি সম্মানের চক্ষে যতদিন এ দেশের লোকরা দেখিতে না পারিবে, তত দিন এ দেশের উদ্ধারের উপায় নাই।

মা-ই শিক্ষা-দাত্রী, রক্ষাকর্ত্রী, মূর্ত্তিমতি সেবা, মূর্ত্তিমতি পবিত্রতা, মূর্ত্তিমতি ধর্ম্ম। মায়ের আদর্শই সমাজকে রক্ষা করে। আর মাতৃমূর্ত্তি যদি মলিন হয়, তবে সমাজ রক্ষার উপায় কি? মাতাদিগকে মাতারূপে আবার যদি বঙ্গে প্রতিষ্ঠিত করিতে পার, তবেই দেশ রক্ষার উপায় হইবে। নচেৎ কিছুতেই কিছু হইবে না।

নারী-লাঞ্ছনার আর বাকী কিছুই নাই। পদে পদে অবহেলা, পদে পদে প্রহার নির্য্যা-তন, পদে পদে অবমাননা, পদে পদে তুচ্ছ-তাচ্ছল্য করা—এখনকার নিত্য কার্য্য হইয়াছে। নারী যেন রিপুর সেবারই উপ-করণ, আর যেন কিছুই নহেন। কদর্য্য বৃত্তি, কদর্য্য সম্ভোগের জন্যই যেন নারীর সৃষ্টি। দুর্ভাগ্য আর কাহাকে বলে?

পুরুষেরা যদি উর্দ্ধরেতাঃ হইতে না পারেন, তবে নারী রক্ষার আর উপায় নাই। পুরুষেরা যদি সংযমকে অবলম্বন করিয়া জিতেন্দ্রিয় হইতে না পারেন, মাতৃমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠার আর উপায় নাই। আর মাতৃমূর্ত্তি

ঘরে ঘরে প্রতিষ্ঠিত না হইলে, ঘর রক্ষারও উপায় নাই। প্রতি ঘর সংশোধিত না হইলে দেশ সংশোধিত হইবে না। যত চেষ্টা কর, যত অধিকার দাবী কর, কিছুতেই কিছু হইবে না, যদি এ দেশে মাতৃমূর্ত্তি পুনঃ সংস্থাপিত না হয়। "যাদেবী সর্ব্বভূতেষু মাতৃরূপেন সংস্থিতা"—সেই দেবীকে পূজা করিতে শিখিলে, আদর করিতে শিখিলেই দেশ উদ্ধার হইবে। কেন না, দেশ রক্ষার কারণই মাতা। বংশপরম্পরায় সুমাতাই সুজাতির উত্থানের কারণ। সুমাতা মণিকার ভিতরে কেবল আগষ্টাইনের উদ্ধারের বীজ নিহিত ছিল না, জগতের উদ্ধারের বীজ নিহিত ছিল। সুমাতা মেরির ভিতরে কেবল যীশুর উত্থানের বীজ ছিল না, পাপ সমাজের উদ্ধারের বীজ নিহিত ছিল। সুমাতা ভিক্টোরিয়ার ভিতরে কেবল এডোয়ার্ডের উদ্ধারের বীজ নিহিত ছিল না, ইংলণ্ডের এবং ইংলণ্ড হইতে জগতের উদ্ধারের বীজ নিহিত ছিল। ইতিহাস পাঠ কর, সব কথা বুঝিতে পারিবে। আর সীতার অবমাননায় রাবণ বংশ নির্ব্বংশ, দ্রৌপদীর অবমাননায় কুরুকুল ধ্বংস, জোজেফাইনের অবমাননায় নেপোলিয়নের বিনাশ। যদি দেশকে উদ্ধার করিতে চাও, মাতৃজাতির উদ্ধার কর, মাতৃজাতিকে রক্ষা কর, মাতৃজাতিকে উন্নত কর। সুমাতা হইলে সুসন্তান হইবে, সুসন্তান হইলে সুসমাজ হইবে, সুসমাজ হইলে সুদেশ হইবে। মাতৃশক্তিই সর্ব্ববিধ উন্নতির মূল। দেশাত্মিকা বুদ্ধি দেহাত্মিকা-শুদ্ধি হইতে জন্মগ্রহণ করে। দেহাত্মিকা-শুদ্ধির মূলমন্ত্র মাতৃ জ্ঞান-মাতৃ-ধ্যান, মাতৃ-রসামৃত পান। মাতৃত্ব-সাধনে আত্মশুদ্ধি না হইলে দেহাত্মিকা বুদ্ধি জন্মে না। আত্মশুদ্ধিই জগন্মাতা-দর্শনের মূল সোপান। আত্মশুদ্ধি হইলে মাতৃদর্পণে প্রতিবিম্বিত জগন্মাতাকে দেখা যায়। সীমা হইতে অসীমে ব্যাপ্তি ও বিস্তৃতির একটা কথা আমরা সর্ব্বদা বলিয়া থাকি। মাতৃ-প্রেমে দীক্ষা ভিন্ন সর্ব্বঘটে জগন্মাতার দর্শন ঘটে না। সর্ব্বঘটে জগন্মাতাকে না দেখিতে পাইলে, নরনারায়ণকে চেনা যায় না। মৃণ্ময়ীর ভিতরে চিন্ময়ী মাতার যে অসীম মূর্ত্তি বিভাসিত, তাহার সহিত পরিচয় হইলে, দেশকে ও ভ্রাতৃবৃন্দকে চেনা যায় না। মা সর্ব্বমঙ্গলাকে সর্ব্বঘটে সে দেখিতে অক্ষম, আপন মাতার মধ্যে যে বিশ্বেশ্বরকে না দেখিয়াছে। সাধনার নিগূঢ়তত্ত্ব এই—প্রকৃতির ভিতরে পূর্ণরূপে যে চিৎশক্তি জাগরিতা, তাহাকে দেখিতে হইবে। মাতৃমূর্ত্তির রূপের ভিতরে অরূপার মহারূপ চিত্রিত। যদি মহাযোগের অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়া থাক, তবে মাতার হৃদয়ের ভিতরে চিন্ময়ীর রূপ দেখিয়া ধন্য হইতে পারিবে।

আপনাকে ভালবাসিতে শিখিলে তবে পরকে ভালবাসা সহজ হয়। তেমনি আপনার মাতার সহিত সম্যক পরিচয় হইলে জগন্মাতাকে চেনা যায়, এবং জগন্মাতার প্রকট মূর্ত্তি অন্যের মাতাকেও বুঝা যায়। আমার মাতা, তোমার মাতা, তাহার মাতা, ইহার মধ্যে পার্থক্য কোথায়? আমার ভগ্নী, তোমার ভগ্নী, তাহার ভগ্নী—তাহার মধ্যে বিভিন্নতা কোথায়? সকলেই ত জগন্মাতার কন্যা। এক প্রেমই বহুধা, বহু মূর্ত্তিতে প্রকটিত। এইরূপে ধরিতে ধরিতে, সাধনার পথে অগ্রসর হইলে, শেষে, সর্ব্বঘটে সর্ব্বমঙ্গলাকে দেখা যায়। তখন চিদানন্দের উদয় হয়। তখন আর পার্থক্য-জ্ঞান থাকে না। জগন্মাতাকে চিনিলে তাঁহার সকল

সন্তানকে আপনার ভ্রাতৃরূপে যখন দেখা যায়, তখনই নিগূঢ় প্রেমের উদয় হয়, এবং জাতীয় একতা অবতরণ করে। দেশাত্মিকা বুদ্ধি কথার কথা নহে, তাহা মহা-সাধনার চরম ফল।

তোমার মাতাকে যদি আমার মাতার ন্যায় জ্ঞান করিতে না পার, দেশাত্মিকা বুদ্ধি জয়যুক্ত হইবে না, এবং জাতীয় একতা অবতরণ করিবে না। ব্যষ্টি হইতে লীলা আরম্ভ, সমষ্টিতে পরিসমাপ্তি। মায়ের ভিতর দিয়া সকল মাতাকে দেখ। সকল মাতার ভিতরে জগন্মাতাকে দেখিতে অভ্যস্ত হও, বুঝিবে, যাদেবী সর্ব্বভূতেষু মাতৃরূপেণ সংস্থিতার অর্থ কি? দেশকে মাতৃ ভাবে কে সম্বোধন করিতে পারে? যাহার ইন্দ্রিয় বিকল হইয়াছে, রিপু বিলুপ্ত হইয়াছে—সর্ব্বভূতে এক জ্ঞান এক ধ্যান হইয়াছে; যে ঊর্দ্ধরেতাঃ হইয়া জগন্ময়ীকে সর্ব্বঘটে দেখিতে সিদ্ধ হইয়াছে। যে ব্যক্তি ইন্দ্রিয় গ্রামে বসবাস করে, নারী দেখিলেই চঞ্চল হইয়া উঠে, সে দেশাত্মিকা বুদ্ধি কাহাকে বলে, কখনও বুঝিবে না। সে যত বড় লোকই হউক না কেন, সে পশুরও অধম। তাহা দ্বারা নারী-সমস্যা কখনও পরিপূরিত হইবে না। নারী-সমস্যা পরিপূরণের মূল জ্ঞান অহেতুকী মাতৃপ্রেমে দীক্ষা লাভ করা। মাতৃ-স্বরূপ-সাধন সোপান ধরিয়া এই পথে অগ্রসর হইতে হয়, সর্ব্বঘটে সর্ব্বমঙ্গলাকে দেখিতে অভ্যস্ত হইতে হয়। যদি এ ভারতের লোকেরা আবার কখনও সে দিব্য চক্ষু পায়, তবে এ সোণার ভারতে আবার দেশাত্মিকা বুদ্ধি জাগিবে।

এদেশে মাতৃত্ব সাধনে সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন, রামপ্রসাদ ও রামকৃষ্ণ পরমহংস দেব এবং পাশ্চাত্য দেশে কোমত প্রভৃতি। তাঁহাদের নামে জগৎ ধন্য হইয়াছে।

সুরথ রাজার সময় হইতে এ দেশে দশভুজার পূজার প্রথা প্রচারিত হইয়াছে। পূর্ব্বকল্পে স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে ত্রেতা যুগের প্রথমে ইনি দেবগণের উৎপাত শান্তি ও নিখিল জগতের হিতকামনায় দুর্দ্দান্ত দৈত্যগণের বিনাশার্থ দশভুজারূপে আবির্ভূতা হইয়াছিলেন। দশভুজার আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা এ দেশে অনেকবার হইয়াছে; সে সকল কথার আজ রূপক ব্যক্ত করিতে চাহি না। চাই কেবল এই, দশভুজার দশবিধ শক্তিতে এ দেশ যে পূর্ণ, তাহা সকলে ভাল করিয়া দেখিতে শিক্ষা করুন। অসুর-কুলের সমাবেশে এদেশ পূর্ণ হইয়াছে—ভিতরে বাহিরে অসুরকুল মুখ ব্যাদান করিয়া গ্রাস করিতে আসিতেছে। দশভুজার অর্থ আর কিছুই নয়—জগৎব্যাপিনী আদ্যাশক্তির প্রকট মূর্ত্তি, তিনি সর্ব্বভূতে এবং সর্ব্বঘটে আবির্ভূতা। সন্তানের উদ্ধারের জন্য তিনি আসিয়াছিলেন, তিনি আসিয়াছেন, এবং তিনি আসিবেন; বাহুতে তিনিই শক্তি, হৃদয়ে তিনিই ভক্তি, তাঁহার প্রতিমা গড়ি মন্দিরে মন্দিরে। তিনিই দেশ, তিনিই দেশাত্মিকা বুদ্ধি, তিনিই শুদ্ধি, তিনিই মুক্তি, তিনিই শক্তি, তিনিই জ্ঞান, তিনিই ধ্যান। সেই আদ্যাশক্তি মহামায়ার চরণ তলে রিপু অসুরকে বলি দেও, সুপ্তা মাকে আবার সকল মাতার মধ্যে জাগরিতা দেখিতে পাইবে। বৃথা জীবন, যদি রিপুকে বলি না দিয়া দেশ-সেবায় নিযুক্ত হইয়া থাক। মূঢ় তুমি দূর হও, তুমি দূর হও। মা সর্ব্বমঙ্গলা সাধনার পথে দশভুজা হইয়া আবার প্রকটিতা হউন, নারী-সমস্যার সুমীমাংসা হইয়া যাক, আবার দেশাত্মিকা বুদ্ধি জাগিয়া উঠুক, আকাশ কাঁপাইয়া আমরা নির্ভয়ে গাই—"যা দেবী সর্ব্বভূতেষু মাতৃরূপেণ সংস্থিতা" ইত্যাদি ইত্যাদি। কুলকুণ্ডলিনী মাতৃশক্তি আবার জাগুক, মাতৃজ্ঞানে আবার ধরা টলমল করুক, কুবাসনা, কুজ্ঞান, কুচিন্তা চিরবিদায় গ্রহণ করুক।

হায়, কবে সেদিন আসিবে?

উপাধির্ব্যাধিরেব হি।

কিছু দিন হইল, বিভাগীয় কমিশনর দ্বারা মনোনীত হইয়াও "রায়বাহাদুরী" না পাওয়াতে বিহারের কোন জমিদার কমিশনর সাহেবের নিকটে গিয়া মনের আবেগ সম্বরণ করিতে না পারিয়া অশ্রুবর্ষণ করিতে করিতে বলিয়াছিলেন, "হুজুর তো বহুত্ কোশিশ্ কিয়া, মেরাহি নসীব খারাপ হ্যায়। আয়েন্দা সাল (আগামী বৎসর) জিসমে খেতাবঠো মিলে, জেরা নিগাহ্ রাখিয়েগা (দৃষ্টি রাখিবেন)।" ঠিক শিশু যেমন খেল্না না পাইলে রোদন করিয়া থাকে, তেমনি রোদন করিয়াছিলেন। বিস্মিত হইবার বিশেষ কারণ নাই। যাহারা অশিক্ষিত, অজ্ঞান, তাহারা ত শিশুর ন্যায় আচরণ করিবেই। আবার এরূপ মোহাচ্ছন্ন জীব যদি ধনশালী হয়, তাহা হইলে সে নিশ্চয়ই টুক্‌টুকে চক্‌চকে দামী খেল্নার জন্য আব্দার ধরিবে।

কিন্তু 'শিক্ষিত' বলিয়া যাহাদের পরিচয়, তাহারাও যদি কোনও দিন শৈশবের গণ্ডী অতিক্রম করিয়া মানুষ হইয়া না উঠে, তাহা হইলে দেশের অদূর ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে খুব উচ্চ কোনরূপ আশা হৃদয়ে পোষণ করিতে বড় একটা প্রবৃত্তি হয় না। সে দিন একজন শিক্ষিত রায়বাহাদুর, "চেড়ুয়া-ফসিল-ক্লাবের" সভ্য, ৺দীনবন্ধু মিত্র মহাশয়ের স্মরণার্থ সাম্বৎসরিক উৎসবের পর দিন, উক্ত ক্লাবে বসিয়া আপশোষ করিতেছিলেন, "কাল্ একটা বড় ভুল হইয়া গিয়াছে; দীনবন্ধু মিত্র যে 'রায়বাহাদুর' ছিলেন, এবং তাঁহার পুত্র যে সেই গৌরবান্বিত খেতাবের উত্তরাধিকারী হইয়াছেন, এ কথাটার উল্লেখ করা নিতান্ত আবশ্যক ছিল।" "রায় বাহাদুরীর" চৰ্দ্দিশার কথা ভাবিলে ৺দীনবন্ধু মিত্রও যে ঐ খেতাবের সহিত সংশ্লিষ্ট, এ কথা ভাবিতে আমাদের ত কিছুমাত্র সুখানুভব হয় না। মহাপ্রাণ দীনবন্ধুকে আমরা সম্মান করি, প্রথমতঃ তাঁহার নীলকর বিরুদ্ধে বীরোচিত সংগ্রামের জন্য, এবং দ্বিতীয়তঃ সাহিত্যজগতে তাঁহার বিপুল দানের জন্য। দীনবন্ধু যে একজন বাহাদুর পুরুষ ছিলেন, সে বিষয়ে সন্দেহ কি? তাই বলিয়া তুমি যে তাঁহাকে 'রায়বাহাদুর' বলিয়া গর্ব্ব অনুভব করিবে—হউক না কেন সরকারের দেওয়া খেতাব—তাহাতে আমাদের আপত্তি আছে। তাঁহাকে আমরা "নীল বাহাদুর" উপাধি ভূষিত দেখিলে সুখী হইব।

৺বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বি-এ ছিলেন। তাই বলিয়া যদি কেহ তাঁহার মান বাড়াইবার জন্য তাঁহার নাম করিবার সময় তাঁহাকে বি-এ উপাধিযুক্ত করিয়া বলেন বা লেখেন, তাহা হইলে আমি তাঁহার সহিত বিবাদ করিতে প্রস্তুত। অবশ্য সে সময়ে বি-এ, এম-এ, তথা রায়বাহাদুর, রাজাবাহাদুরাদি তকমাবলি আজকালকার মত এত সস্তা ছিল না, সে কথা মানি; কিন্তু উহাদের বাজার-দর এখন বিস্তর নামিয়া গিয়াছে। নিতান্ত আনাড়ী খরিদ্দার না জুটিলে সাবেক দরে এ মালের কাটতি হইবার সম্ভাবনা কোথায়? যদি সহসা আর্কটিক-সাগরের মাঝে এক নূতন সুবর্ণময় দ্বীপ আবিষ্কৃত হয় এবং ফলে সোণার দর দু' টাকা সের হইয়া পড়ে,

তাহা হইলে যোত্রসম্পন্ন ব্যক্তিগণ উহার চেন্ গড়াইয়া ঘড়ীর সহিত বিলম্বিত করিতে ঘৃণা বোধ করিবেন এবং তাঁহাদের রমণীগণও সিকি মণ সুবর্ণের গহনার ভার যাহা এক্ষণে সগর্ব্বে বহন করিতেছেন, বহন করিতে কদাচ প্রস্তুত হইবেন না; তখন সোণার খেলনা প্রচুর ও সুলভ হইয়া পড়িবে ও তদ্দ্বারা শিশুদিগেরই * মনোরঞ্জন হইবে।

'আধি' অর্থে মানসিক পীড়া। এই পীড়া উপসর্গযুক্ত হইলে তাহাকে 'উপাধি' বলা যায়। উপসর্গ পাত্রভেদে বহুবিধ। তন্মধ্যে কেবল দু' একটা সাধারণ উপসর্গের কথাই উল্লেখ করিব। এই পীড়ায় আক্রান্ত হইলে রোগী প্রায়শঃ স্বজনবিরোধী ও পরানুরাগী হইয়া পড়ে। উপাধিগ্রস্ত ব্যক্তির চক্ষে আপনার জন পর বলিয়া প্রতিভাত হয়, এবং যাহারা পর, তাহারা আপন হইয়া উঠে। আপনার লোকের নিকট যাহা শ্রেয় ও প্রেয়, ইহাঁদিগের চক্ষে তাহা নিতান্ত হেয়। ইহাঁদিগের ত্বক্ গণ্ডারের চর্ম্মের ন্যায় স্থূল ও কঠিন। স্বজনগণের যুক্তিযুক্ত তীক্ষ্ণ বাক্যবাণও ইহাঁদের ত্বক্ ভেদ করিয়া হৃদয়ে পৌঁছিতে অক্ষম। যদি কদাচিৎ রোগের কিঞ্চিদুপশমকালে কোন আপনার জনের হিতকথা কোন গতিকে ইহাঁদিগের মর্ম্মস্পৃষ্ট হইয়া ক্লেশোৎপাদন করে, তাহা হইলে ইহাঁরা অচিরে পরের শরণাগত হইয়া সেই ক্লেশ বিদূরিত করিবার প্রয়াস পাইয়া থাকেন; কেহ কেহ এরূপ অবস্থায় পরের গোষ্ঠীকে নিজ ব্যয়ে পানভোজনাদি করাইবার ছলে স্বজনগণের মুণ্ডপাতের গুপ্ত পরামর্শ করিয়া থাকেন। এই উপাধি ব্যাধিগ্রস্ত মনুষ্যগণের আরও একটী স্পষ্ট উপসর্গ আমরা দেখিতে পাই। তাঁহাদের জীবনে বা মনোগত ভাবে কোনরূপ স্বাতন্ত্র্য নাই। সকল বিষয়েই যাহারা পর, তাহাদের মতেরই ইহাঁরা অনুবর্ত্তী। যদি দৈবাৎ কোন নূতন বিষয়ে তাঁহাদের মত প্রকাশের প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে তাঁহারা সহসা কোন কথা কহেন না; পরে দরবারে উপস্থিত হইয়া পরের মত কি, তাহা জানিয়া তাহারই প্রতিধ্বনি করিয়া থাকেন। একারণ ইহাঁরা পরের প্রয়োজনে আজ যে বস্তুকে শাদা বলিয়া প্রচার করেন, কাল আবার পরেরই প্রয়োজনে সেই বস্তুকেই 'কালো কালো' বলিয়া চক্কার করিতে থাকেন। ইহাঁদের পুরু চামড়ার ভিতরে লজ্জা নামক পদার্থের প্রবেশ একেবারেই নিষেধ। বরং মতের পরিবর্ত্তন কালে ইহাঁরা অশেষ প্রকার অদ্ভুত

* ভারতের যুবা বৃদ্ধ সকল বয়সের লোককেই বারম্বার 'শিশু' বলিলে ভাল শোনায় না, সেই কারণ শিশুর পরিবর্ত্তে যদি পশু বলা যায়, তাহা হইলে অসঙ্গত হইবে না। এস্থলে 'পশু' অর্থে মেষাদি নহে, তাহা বলাই বাহুল্য, তবে বোধ করি, এ বিষয়ে কাহারও কাহারও সন্দেহ ছিল, নহিলে কবি কেন এত প্রয়াস করিয়া স্পষ্ট কথায় তারস্বরে বলিতে যাইবেন, 'আমরা মেষ নহি।' যাহাই হউক, পশ ধাতু বন্ধনার্থক, তদুত্তর উ করিলে 'পশু' হয়। মায়াপাশে বদ্ধ মোহাচ্ছন্ন জীবকেই 'পশু' বলা হইয়া থাকে। একে ত দুরত্যয়া মায়ার পাশ, তাহার উপর ইংরাজের নাগপাশ; সুতরাং পশু নামের এক্ষেত্রে দ্বিগুণ সার্থকতা। এরূপ নামকরণে আমাদের দুঃখ করিবার কোন হেতু নাই। এই অর্থে ইউরোপীয় মহাপুরুষেরাও পশু। তাহারা হিংস্র পশু, আমরা নিরীহ পশু। তাহারা লোভপরবশ পরশ্রীকাতর বলিষ্ঠ পশু, আমরা ভয়বিহ্বল চাটুকার স্বল্পসন্তুষ্ট দুর্ব্বল পশু। এই উভয় জাতীয় পশুর মধ্যে কাহারা অপেক্ষাকৃত ভাল, সে কথার বিচার আমরা এখন করিব না; বর্ত্তমান শতাব্দীর শেষ নাগাদ যে ইতিহাস লেখা হইবে, এ প্রশ্ন সেই ইতিহাসের মীমাংসার বিষয় হইবে।

বাক্য ও যুক্তির জাল বিস্তার করিয়া গর্ব্ব অনুভব করিয়া থাকেন। ক্ষয়রোগীর ন্যায় ইহাঁরাও নিজের রোগকে অস্বীকার করিয়া থাকেন। পরানুগ্রহলব্ধ পদ ও সম্পদ ইহাঁদিগকে রোগ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন করিয়া রাখে।

এই রোগ বংশাবলীতেও সংক্রামিত হইবার সম্ভাবনা আছে। সকল ক্ষেত্রে পুত্র পৌত্রাদিতে এই রোগের উৎকট লক্ষণ সকল সর্ব্বাংশে প্রকট না হইতেও পারে। তবে যে ক্ষেত্রে মৃদুসংক্রমণ, সে ক্ষেত্রেও পুত্র পৌত্রাদি আর কিছু না হউক, ডেপুটী হইয়া পড়িবেই। একটা বড়ই আশ্চর্য্যের কথা, এই রোগ জামাতাতেও সংক্রামিত হইয়া থাকে। কোন কোন জামাইবাবুকে এই রোগ দ্বারা আক্রান্ত দেখিয়া আমরা বড়ই ক্ষুণ্ণ হইয়াছি।

আমার বক্তব্য স্পষ্ট করিয়া বলিতে হইলে বলা আবশ্যক যে, এই রোগের প্রচ্ছন্নাবস্থাতেও (incubation period) উপরি-লিখিত উপসর্গ সমূহ প্রকাশ পায়। অনেক লোকের বহু দীর্ঘকাল এইরূপ প্রচ্ছন্নাবস্থাতে ভিতরে ভিতরে রোগ ভোগ হইয়া থাকে। সাধারণের চক্ষে ইহাঁরা ঠিক উপাধিগ্রস্ত না হইলেও বিশেষজ্ঞ কবিরাজেরা ইহাঁদিগকে প্রচ্ছন্ন ভাবে উপাধিগ্রস্ত বলিয়াই নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন।

এই রোগের কোন সুচিকিৎসা আছে বলিয়া আমাদের জানা নাই। কোন কোন হাতুড়িয়া কিন্তু বলিয়া থাকেন যে, মুষ্টিযোগের দ্বারা এই রোগের আত্যন্তিক নিবৃত্তি হইতে পারে। হাতুড়িয়া-চিকিৎসাতে রোগ কখনও কখনও সারে বটে, কিন্তু এরূপ চিকিৎসাতে আমাদের আস্থা কম।

অন্যান্য রোগ যেমন সবল সুস্থ দেহে প্রবেশ করিয়া অধিকার বিস্তার করিতে পারে না, এই রোগও তেমনি। দেশের হাওয়ায় এই রোগের বীজাণু বহুল পরিমাণে ব্যাপ্ত থাকায়, কখনও কখনও সুস্থ বলিষ্ঠ লোকেও উপাধিবীজাণু দ্বারা আক্রান্ত হইয়া থাকেন, কিন্তু তাঁহাদের শরীরে এই রোগের কোন উপসর্গ প্রকাশ পায় না। এরূপ সম্পূর্ণ স্বাস্থ্যযুক্ত লোক উপাধিগ্রস্ত হইয়াও 'নিরুপাধিক'। এবম্বিধ লোকের সংখ্যা বিরল হইলেও একেবারে নাই, তাহা নহে। দৃষ্টান্তস্থলে আমরা শ্রীসুব্রহ্মণ্য আয়ারের নামোল্লেখ করিতে পারি।

শ্রীসুব্রহ্মণ্য যখন বৃহৎ একটী উপাধির ব্যাসিলস্ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হয়েন, তখন অনেকে উঁহাকে উপাধিগ্রস্ত মনে করিয়াছিলেন; কিন্তু উক্ত বীজাণু এই তেজস্বী ব্রাহ্মণের শরীরে প্রবেশ করিলেও যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া প্রাণত্যাগ করিল, তাহা অনেকে দেখিতে পাইল না। সুব্রহ্মণ্য স্বয়ং এই উপাধিবশে কোনরূপ চাঞ্চল্য প্রকাশ করিলেন না, বরং বরাবর এ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীনই ছিলেন।

শ্রীসুব্রহ্মণ্যকে উপাধিগ্রস্ত বিবেচনা করিয়া যাহার পর তাহারা পাছে তাঁহার নিকট হইতে রোগানুরূপ ব্যবহারের প্রত্যাশা করে, এই নিমিত্ত তিনি সম্প্রতি প্রচার করিয়াছেন যে, তিনি উপাধিগ্রস্ত নহেন। এই ব্যাপারে তিনি যে প্রত্যাহার-পত্র সকল সাধারণ্যে প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার সকল গুলিতেই বলিতেছেন যে, "আমি Knight Companionship প্রত্যাহার করিলাম।" কিন্তু আসলে তাঁহাকে "Knight Commander of the Order of the Indian Em-

pire" করা হইয়াছিল,* Knight Companion, নহে। যাঁহারা Knight Companion তাঁহারা 'সার' শব্দবাচ্য নহেন। ইহাতে স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, তিনি উপাধি সম্বন্ধীয় সনন্দখানি ভাল করিয়া উল্টাইয়া দেখেনও নাই। ভারতের ঋষিপ্রতিম ব্রাহ্মণের পক্ষে রাজদণ্ড সম্মানের প্রতি এইরূপ বৈরাগ্যই ত স্বাভাবিক। আর্য্যভূমির সেই ব্রহ্মতেজ অধুনা বড়ই বিরল বলিয়া যদি কোথাও ইহার স্ফুলিঙ্গ মাত্র আমাদের নয়নগোচর হয়, তাহা হইলে আশায় বুক দশ হাত হয় এবং হৃদয় স্বতঃই বিস্ময়ে ও ভক্তিতে আপ্লুত হইয়া যায়। আজি ভারতের আর্য্য জাতি ত্রস্ত, বিপন্ন ও ম্রিয়মাণ; লক্ষ্যভ্রষ্ট কক্ষভ্রষ্ট হইয়া নাশের পথে দ্রুত অগ্রসর হইতেছে; তাই বুঝি বিধাতার আদেশে অশীতিপর তেজঃপুঞ্জ এই ব্রাহ্মণ হস্তবিস্তারপূর্ব্বক বরাভয় প্রদান করিতেছেন। মাভৈঃ মাভৈঃ। আইস আমরা সকলে পরপদাবলেহী ভণ্ড-চতুর-স্বার্থকুটিল নেতাদের দূরে পরিহার করিয়া ঐ দৃঢ়ব্রত জিতেন্দ্রিয় সুব্রাহ্মণের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া কৃতার্থ হই। এই ঝড় তুফান ঘনঘটাবরিষণ ও অশনিসম্পাত মাথায় করিয়া তিনি প্রশান্তচিত্তে দৃঢ়প্রতিজ্ঞাস্ফুরিত স্থির-নেত্রে অঙ্গুলিসঙ্কেত দ্বারা আমাদিগকে পরমার্থ মন্দিরের দিকে অগ্রসর হইবার জন্য আহ্বান করিতেছেন, সে আহ্বান ভারতবাসী শুনিবে না কি?

শ্রীচন্দ্রশেখর সেন।

মাদাম ব্লাভাস্কির জীবন-কথা।

উপসংহার।

অদ্ভুত সহিষ্ণুতার সহিত, ভগ্নদেহে, সকল যন্ত্রণা পরাজয় করিয়া তিনি 'সিক্রেট ডকট্রিন'-এর ন্যায় বিরাট গ্রন্থ লিখিতেছিলেন। মরণের ক্রোড়ে বসিয়া নির্ভীক চিত্তে জগৎকে অমৃতের বাণী শুনাইতেছিলেন। সম্পূর্ণ গ্রন্থাকারে মুদ্রিত সেই সিক্রেট ডকট্রিনের এক কপি যে দিন তাঁহার হস্তগত হইল, সেই দিন,—

"H. P. B. was happy that day. It was the one gleam of sunshine amidst the darkness and dreariness of her life."—তাঁহার জীবনব্যাপী দুঃখ অন্ধকারের মধ্যে সেই দিন তাঁহার মুখে একটী আনন্দরশ্মি ফুটিয়া উঠিল। *

কিন্তু ব্লাভাস্কির চিত্তে জ্ঞানের গর্ব্ব মোটেই ছিল না। অসীম শক্তিমত্তা অপূর্ব্ব বিনয়ে ভূষিত হইয়া তাঁহার প্রকৃতির সৌষ্ঠব সম্পাদন করিয়াছিল। তাঁহার সেই প্রাণ-পণ-পরিশ্রমজাত যে সকল গ্রন্থ জগতের চিন্তা-ভাণ্ডারে কত কত অভিনব তত্ত্ব উপহার দান করিয়াছে, তৎপ্রণয়নে নিজের এতটুকু কৃতিত্ব স্বীকার করিতেও তিনি ইচ্ছুক নহেন। তিনি নিজেকে একেবারে মুছিয়া ফেলিতে চাহেন। তিনি বলেন, এ সবই তাঁহার গুরুর কৃপায় সম্পন্ন হইয়াছে,—গুরুই যন্ত্রী, তিনি যন্ত্র মাত্র। আবার প্রত্যেক শিষ্যের অন্তর্নিহিত কোন সামান্য গুণেরও সম্মান সম্বর্দ্ধনার্থ তিনি উহার যথেষ্ট সাধুবাদ করিতেন, এবং তিনি যে ঐরূপ গুণের অধিকারী, ইহা একে-

* "Reminiscences of H. P. B. and the Secret Doctrine" P. 86.

বারেই প্রচ্ছন্ন রাখিতেন। কেবল শিষ্যের ঐ গুণটী কত সুন্দর, তাঁহার শত মুখে প্রশংসা করিতেন। একজন লেখক সত্যই বলিয়াছেন, ব্লাভাস্কি যে মহাত্মাগণের চিহ্নিত দাসী, ইহাই তাহার একটী প্রমাণ। শ্রীচৈতন্যদেব কুলিন গ্রামের ভক্ত বসু রামানন্দের গৌরব বাড়াইবার জন্য বলিয়াছিলেন, 'কুলিন গ্রামের কুক্কুরটীও আমার নমস্য।'

ব্লাভাস্কির অসীম গুরুভক্তির কথা এই জীবনীর নানা স্থানে বর্ণিত হইয়াছে। শত নির্য্যাতন ও পীড়নের মধ্যে অটল ভাবে দণ্ডায়মান হইয়া তিনি কেবল বলিতেন, "গুরু আমাকে এই কার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছেন। আমার যাহাই হউক না কেন, আমি কখনও তাঁহার আদেশ লঙ্ঘন করিব না, এবং কর্ম্মক্ষেত্র হইতে পৃষ্ঠভঙ্গ দিব না।"

গুরুরও শিষ্যবাৎসল্য বড় কম ছিল না। একনিষ্ঠা 'উপাসিকা' গুরুর পরম কৃপাপাত্রী ছিলেন। অহোরহ তাঁহার প্রতি গুরুর কৃপাদৃষ্টি নিবদ্ধ থাকিত। সর্ব্বদাই যেন কতকগুলি অদৃশ্য 'সত্তা' তাঁহার পার্শ্বে পার্শ্বে ঘুরিত। রজনীযোগে ইহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাইত। কাউণ্টেস ওয়াটমিষ্টার ইহার দুই একটী প্রমাণ দিয়াছেন। ব্লাভাস্কির শেষ বার লণ্ডনে অবস্থান কালে কাউণ্টেস সেখানে তাঁহার সহিত কিছুদিন বাস করিয়াছিলেন। স্থানাভাব বশতঃ ব্লাভাস্কির শুইবার ঘরেই কাউণ্টেসের শয্যা নির্দ্দিষ্ট ছিল। উভয়ের শয্যা মধ্যে কেবল একটী পর্দ্দা মাত্র ব্যবধান। ইদানীং ব্লাভাস্কির নিয়ম ছিল, রাত্রি নয়টায় সকলের নিকট বিদায় লইয়া শয়ন গৃহে গমন করিতেন, এবং সেখানে রাত্রি প্রায় ১১।১২টা পর্য্যন্ত স্বদেশীয় সম্বাদ পত্র পাঠ করিতে করিতে নিদ্রাভিভূত হইয়া পড়িতেন। তাঁহার শয্যা পার্শ্বস্থ আলোকটী জ্বলিতে থাকিত। মাঝখানে পর্দ্দা থাকা সত্ত্বেও ঐ তীব্র আলোকের রশ্মি ছাদ ও প্রাচীর গাত্রে প্রতিফলিত হইয়া কাউণ্টেসের চক্ষে পড়িত বলিয়া তাঁহার নিদ্রার ব্যাঘাত হইত। এই নিমিত্ত একদিন রাত্রি ১টা পর্য্যন্ত কিছুতেই তাঁহার নিদ্রা আসিল না। তিনি দেখিলেন, ব্লাভাস্কি বেশ স্বচ্ছন্দে নিদ্রা যাইতেছেন। সুতরাং কাউণ্টেস মনে করিলেন, এক্ষণে আলোকটী নির্ব্বাপিত করিলে কোন ক্ষতি হইবে না। তিনি আলোকটী নিবাইয়া দিয়া নিজের শয্যায় আসিলেন। ক্ষণকাল পরেই আলোক পুনরায় জ্বলিয়া উঠিল। কোন কারণ বুঝিতে না পারিয়া তিনি ভাবিলেন, বোধ হয় উহার কল কব্জায় কোন দোষ হইয়াছে। তিনি উঠিয়া গিয়া আলোকটী ভালরূপে নিবাইয়া দিলেন; উহা যে একেবারে নিবিয়া গিয়াছে, তাহাতে আর তাঁহার কোন সন্দেহ রহিল না। ঘর অন্ধকারময় হইয়া গেল। কেবল অপর গৃহ হইতে একটী ক্ষুদ্র আলোকের ক্ষীণ রশ্মি মাদাম ব্লাভাস্কির শয়ন কক্ষে আসিতেছিল। কিন্তু নির্ব্বাপিত আলোক পুনরায় প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল। এইরূপে কাউণ্টেস যত বার আলোক নিবাইলেন, তত বার উহা জ্বলিয়া উঠিল। তিনি বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইলেন। শেষে আরও একবার নিবাইলেন। এবার স্পষ্ট দেখিলেন, একখানি হস্ত প্রসারিত হইয়া আলোকটীকে পুনরায় জ্বালাইয়া দিতেছে! কাহার হস্ত? তিনি কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না। তখন তিনি অবাক্ হইয়া ভাবিলেন, নিশ্চিতই কোন অদৃশ্য সত্তা নিদ্রিতা ব্লাভাস্কির গৃহে আছে, এবং তথায় আলোক জ্বালাইয়া রাখিবার কোন বিশেষ

কারণ আছে। ঐ কারণটী কি, জানিবার জন্য তাঁহার এত দূর ব্যগ্রতা হইল যে, তিনি ব্লাভাস্কিকে না জাগাইয়া থাকিতে পারিলেন না। তিনি 'ব্লাভাস্কি', 'ব্লাভাস্কি' বলিয়া দুই বার চীৎকার করিলেন। কোন সাড়া পাইলেন না। তৃতীয় বার তাঁহার চীৎকারে ব্লাভাস্কি সহসা চমকিত হইয়া, যেন তাঁহার হৃৎপিণ্ডে কোন গুরুতর আঘাত লাগিয়াছে, এই ভাবে, "Oh ! my heart, my heart !" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন। কাউন্টেস ব্লাভাস্কির নিকটে গিয়া তাঁহার হৃৎপিণ্ড পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন, উহা ভয়ানক ধড়্‌ফড়্‌ করিতেছে। ব্লাভাস্কি বলিলেন, "কাউন্টেস! তুমি আমাকে প্রায় মারিয়া ফেলিয়াছিলে! আমি গুরুদেবের সঙ্গে ছিলাম, তুমি কেন আমাকে ডাকিলে?" কাউন্টেস ভীত হইয়া ব্লাভাস্কিকে এক মাত্রা ডিজিটেলিস (Digitalis) ঔষধ দিয়া তাহার হৃৎপিণ্ডের সাম্যাবস্থা আনয়নের চেষ্টা করিলেন। ব্লাভাস্কি একটু সুস্থ হইয়া বলিলেন,—"কর্ণেল অলকটও একবার এইরূপে, আমার সূক্ষ্ম শরীর যখন স্থূল শরীর ত্যাগ করিয়া গিয়াছে, এমন সময়, আমাকে ডাকিয়া মারিয়া ফেলিবার উপক্রম করিয়াছিল।" কাউন্টেস লিখিয়াছেন, "অতঃপর আর কখনও যেন তাহাকে লইয়া কোন পরীক্ষা না করি, তিনি আমাকে এইরূপ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করাইলেন। আমি অনুতপ্ত চিত্তে আর কখনও এরূপ করিব না বলিয়া প্রতিশ্রুত হইলাম।" কাউন্টেস বুঝিতে পারিলেন, ব্লাভাস্কি যখন সূক্ষ্ম শরীরে গুরু সমীপে উপস্থিত, তখন তাঁহার পরিত্যক্ত স্থূল শরীরের রক্ষণাবেক্ষণ জন্য গুরুর আদিষ্ট অপর এক শিষ্য গৃহে উপস্থিত ছিলেন, এবং তাহারই হস্ত পুনঃ পুনঃ আলোক জ্বালাইতেছিল। রাত্রে ব্লাভাস্কির গৃহে, তিনি নিদ্রিতই থাকুন বা জাগ্রতই থাকুন, দশটার পর হইতেই সুস্পষ্ট ভাবে এবং জোরে জোরে ঠুক্-ঠুক্ শব্দ (Raps) হইতে থাকিত। কাউন্টেস অত্যন্ত মনযোগ সহকারে ঘড়ি ধরিয়া দেখিয়াছেন, ঠিক দশটার সময় হইতে আরম্ভ করিয়া সকাল ৬টা পর্য্যন্ত এইরূপ 'ঠুক্ ঠুক্' শব্দ চলিতে থাকিত। কেবল মধ্যে মধ্যে দশ মিনিটের জন্য বিরাম হইত, এবং ঠিক দশ মিনিট বিরামান্তে পুনরায় শব্দ চলিতে থাকিত। ব্লাভাস্কি বলিতেন, উহা একরূপ মানসিক তার-বার্ত্তা (Psychic telegraph)। এতদ্দ্বারা তিনি জাগ্রত অবস্থায় গুরুর সহিত সম্বাদ আদান প্রদান করিতেন। তিনি সূক্ষ্ম শরীরে অন্যত্র গমন করিলে চেলারা উক্ত কার্য্য সাধন করিতেন।

ব্লাভাস্কি কিরূপ একাগ্রতা, শ্রমনিষ্ঠা ও কর্ত্তব্যপরায়ণতার সহিত স্বীয় মহৎ উদ্দেশ্য সাধনে যত্নবতী ছিলেন, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। তাঁহার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে তিনি এক সময়ে অনেক শিষ্যকে বলিয়াছিলেন,—"১৮৭৫ সালে যখন সমিতি গঠিত হয়, তখন তত্ত্ববিদ্যার কথা কেহই শুনিত না, আজ উহা সুদূর প্রচারিত, সাদরে গৃহীত। আমাদের কার্য্যের এই উদ্দেশ্য নহে যে, কতকগুলি লোক আপনাদিগকে Theosophist বলিয়া পরিচয় দিবে, কিন্তু আমাদের প্রধান উদ্দেশ্য যাহাতে বর্ত্তমান শতাব্দীর মানব চিত্ত তত্ত্ববিদ্যার ভাবে অনুরঞ্জিত হয়। এই কার্য্যের জন্য চাই কি? চাই এমন এক দল উদ্যমশীল কর্ম্মী, যাহারা কোন পার্থিব পুরস্কার বা প্রতিদানের আশা করিবে না, কিন্তু যাহারা সার্ব্বজনীন ভ্রাতৃভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া

যুগ যুগান্তরাগত সনাতন তত্ত্বগুলি বুঝিতে ও প্রচার করিতে অগ্রসর হইবে।…"

কপটতার অন্তঃসার-শূন্য বাহ্যাড়ম্বরে তিনি যেমন ক্রুদ্ধ হইতেন, এমন আর কিছুতেই নহে। যে সরল পাপী নিজের দুর্ব্বলতাকে বাহ্যিক সভ্যতার আবরণে ঢাকিতে চেষ্টা করে না, তাহার প্রতি তিনি সহানুভূতি সম্পন্ন ছিলেন। মন অপবিত্রতার পুতিগন্ধে পূর্ণ, কিন্তু বাহ্যিক সাধুবেশ তিনি মোটেই সহ্য করিতে পারিতেন না। যে প্রকৃত অজ্ঞানী, এবং অকপট চিত্তে নিজের অজ্ঞানতা প্রকাশে কুণ্ঠিত নহে, তাহার জ্ঞানোন্মেষের জন্য তিনি সতত ব্যগ্র ছিলেন। মন অজ্ঞানান্ধকারময়, কিন্তু বাহ্যিক বাক্যাড়ম্বরে জ্ঞান-গরিমা-প্রকাশ তিনি একেবারে সহ্য করিতে পারিতেন না। বাহ্যদৃষ্টি দ্বারা, বাহ্য বেশভূষা আচার ব্যবহার দ্বারা, তিনি কাহারও চরিত্র বিচার করিতেন না। অন্তর্দৃষ্টি দ্বারা লোকের মনের প্রকৃত ছবি দেখিয়া তিনি চরিত্র বিচার করিতেন। শিষ্যদিগের ত কথাই নাই, পরিচিত, অপরিচিত বা সামাজিক হিসাবে উচ্চ নীচ যে কোন লোকের কপটতা তাঁহার অন্তর্ভেদী দৃষ্টি তলে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইত। তিনি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ পূর্ব্বক কপটীর মনের লুক্কায়িত ভাব দেখাইয়া তাহাকে সাবধান করিয়া দিতেন, আর সে স্তম্ভিত হইয়া যাইত।

অনেকে মনে করেন, ব্লাভাস্কি লোক চিনিতে পারিতেন না। তাহা না হইলে তিনি যাহাদিগকে বন্ধু বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহাদেরই অনেকে পরে তাঁহার প্রতি ভীষণ শত্রুতাচরণ করিবে কেন? ব্লাভাস্কি নিজে ইহার কি উত্তর দিয়াছেন, পাঠক তাহা অবগত আছেন। বেসান্ত বলেন,—"আমার এই কথা শুনিয়া হাসি পায়। যাহারা এইরূপ বলে, তাহারা জানে না যে, দুষ্টচিত্ত লোকও তাঁহার নিকট শিক্ষার্থী হইয়া আগমন করিলে, তিনি নিজের ঘোর অনিষ্ট সম্ভাবনা থাকিলেও, তাহাকে সাদরে গ্রহণ করিতে নিয়মানুসারে বাধ্য ছিলেন। তবে ঈদৃশ লোককে তিনি এমন কিছুই উপদেশ দিতেন না, যাহাতে তাহারা তাঁহার ব্যক্তিগত অনিষ্ট ছাড়া সমিতিকে বিপদাপন্ন করিতে পারে, অথবা অন্যের অনিষ্ট করিতে পারে। তিনি কেবল অকাতরে আপনাকেই বিলাইয়া দিতেন, ঐ সকল লোক কর্ত্তৃক তাঁহার প্রতি অনিষ্টাচরণের সম্ভাবনা জানিয়াও তিনি তাহাদিগকে বন্ধুভাবে গ্রহণ করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। একদা জনৈক যুবক শিক্ষার্থী হইয়া তাঁহার নিকট আসিল। তিনি তাহাকে বাটীতে স্থান দিলেন; তাহার কোন প্রশ্নে বা অনুসন্ধানে কিছুমাত্র বাধা দিলেন না। সে যতদিন ছিল, সহৃদয় বন্ধুর ন্যায় তাহার প্রতি ব্যবহার করিলেন। কিন্তু দুই একবার আমি বেশ লক্ষ্য করিয়াছি, তাঁহার সেই অদ্ভুত চক্ষুদ্বয় অন্তর্ভেদী অথচ সকরুণ দৃষ্টিতে যেন ঐ ব্যক্তির অন্তস্তল পর্য্যন্ত নিরীক্ষণ করিতেছে, এবং ক্ষণকাল পরে তিনি দৃষ্টি ফিরাইয়া লইয়া দুঃখব্যঞ্জক দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিতেছেন। এই ব্যক্তিই কিছুদিন পরে, সে যে গুপ্ত রহস্যের লোভে আসিয়াছিল, তাহার কোন সন্ধান না পাইয়া চলিয়া গেল, এবং ব্লাভাস্কিকে তীব্র আক্রমণ করিতেও ত্রুটী করিল না। কিন্তু যাহারা প্রকৃত পক্ষে দুর্ল্লভ আত্মজ্ঞানের জন্য তাঁহার নিকট আগমন করিত, তাহারা বুঝিতে পারিত, তাঁহার অন্তর্দৃষ্টি ও চরিত্র জ্ঞান কিরূপ তীক্ষ্ণ। তিনি তাহাদিগকে অনেক অজ্ঞাত বিপদ সম্বন্ধে

সাবধান করিয়া দিতেন, কোথায় তাঁহাদের চিত্তে কি কামনা ভুজঙ্গ লুক্কায়িত, তাহা উদ্ঘাটিত করিয়া দেখাইয়া দিতেন, এবং যাহাতে তাঁহাদের ভ্রম দূরীভূত হইয়া জ্ঞানলাভ হয়, সতত সেই চেষ্টা করিতেন। তাঁহার সমালোচন ও তিরস্কারে-ক্ষুব্ধ না হইয়া তাঁহার উপদেশ মত যে ব্যক্তি স্বীয় দোষ সংশোধনে যত্ন করিত, তাদৃশ শিক্ষার্থী মাত্রেই যে আমার মত উপকার প্রাপ্ত হইয়াছে, ইহা নিঃসন্দেহ।

তিরস্কৃত শিষ্য পরক্ষণেই কিন্তু তাঁহার সদয় সস্নেহ বন্ধুবৎ ব্যবহারে একেবারে গলিয়া যাইত। যাহারা তাঁহার সহিত কেবল সাক্ষাৎ করিতে আসিত, তাহারাও তাঁহার সরল ব্যবহারে মুগ্ধ হইত। জনৈক অপরিচিত ভদ্রলোক তাঁহাকে চিঠি পত্র লিখিতেন। এক দিন তিনি ব্লাভাস্কির দর্শনার্থী হইয়া তাঁহার গৃহে উপস্থিত হইলেন। তিনি মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, না জানি কিরূপ লোকের সহিত আমার আজ সাক্ষাৎ হয়, এবং কিরূপ ব্যবহার পাই। তাঁহার সঙ্গে একটী বন্ধুও ছিলেন। বন্ধুটী ব্লাভাস্কির সুপরিচিত। তাঁহারা নির্দ্দিষ্ট প্রকোষ্ঠে প্রবেশ মাত্র ব্লাভাস্কি আসন ত্যাগ করিয়া তাহাদের প্রত্যুদ্গমন করিলেন। ভদ্রলোকের সমস্ত দুশ্চিন্তা মুহূর্ত্ত মধ্যে দূরীভূত হইল। তিনি ব্লাভাস্কিকে 'Madame' বলিয়া সম্মানসূচক সম্বোধন করিতে উদ্যত হইলে ব্লাভাস্কি বলিলেন,—"না, আপনাকে আমায় 'Madame' বলিয়া সম্বোধন করিতে দিব না। আপনি আমার একজন খুব ভাল বন্ধু। যখন আমার নামকরণ হয়, তখন কি নামের সঙ্গে Madame ছিল আমি H.P.B. মাত্র। এই আসনে বসুন! আপনি অবশ্যই ধূমপান করেন। আপনাকে একটা সিগারেট তৈয়ারি করিয়া দিতেছি। ওহে ই—(সেই বন্ধুটী), বোকারাম! তুমি যদি ওখান হইতে আমার তামাকের বাক্সটি আনিতে পার, তবে তোমাকে একজন ভদ্রলোক বলিয়া আমার ভ্রম হইতে পারে! ক্রীড়াশীল শিশুর ন্যায় হাসিতে হাসিতে ব্লাভাস্কি বলিলেন, উক্ত ই— তাঁহার একজন পুরাতন বন্ধু। তিনি উহাকে বড় ভালবাসেন, কিন্তু তিনি বুড়া মানুষ এবং কিছু বলেন না বলিয়া প্রায়ই দুষ্টামি করে। ব্লাভাস্কি অভ্যাসানুযায়ী সিগারেট পাকাইতে পাকাইতে নানা কথার অবতারণা করিলেন। নবাগত ভদ্রলোকটী এইরূপ সরল ব্যবহারে একেবারে মোহিত হইয়া গেলেন।

আগন্তুক লোকেরা এইরূপে তাঁহার সরল সহৃদয়তা, রঙ্গপরিহাস, কৌতুকপূর্ণ কথোপকথন এবং অসাধারণ প্রতিভায় পরিতৃপ্ত হইতেন। বাহিরের লোকের প্রতি তাঁহার এই প্রকার ব্যবহার হইত; কিন্তু প্রকৃত ব্লাভাস্কির পরিচয় পাইতেন তাঁহারা, যাঁহারা তাঁহার শিষ্য শ্রেণীভুক্ত হইতেন। তাঁহাদের মঙ্গলের জন্য, তাঁহাদের উন্নতির জন্য, তাঁহাদের শিক্ষার জন্য কখনও তিনি বজ্রকঠোর, কখনও তিনি কুসুমকোমল, আর সর্ব্বদাই তিনি ব্যগ্রচিত্ত। উপদেশের সময় অলৌকিক ক্রিয়া প্রদর্শনে বা কৌতুক গল্প মাত্রে নহে, কিন্তু গভীর অধ্যাত্ম বিদ্যার আলোচনায় অতিবাহিত হইত। তাঁহার অন্যতম শিষ্য (Herbert Burrows) লিখিয়াছেন—"যখন আমি তাঁহার নিকট প্রথম যাই, তখন আমি জড়বাদী নাস্তিক, আর তিনি আমাকে রাখিয়া গেলেন, একজন দৃঢ় বিশ্বাসী অধ্যাত্মবাদী আস্তিক। এই

দুই অবস্থার মধ্যে সাগর তুল্য ব্যবধান। তিনি এই সাগরের উপর সেতুবন্ধন করিয়া দিলেন। তিনি আমার আধ্যাত্মিক মাতা (Spiritual mother)। তদপেক্ষা অধিকতর স্নেহময়ী, সহনশীলা, কোমল-হৃদয়া জননী দুর্লভ। * * * আমি প্রকৃতই শিক্ষার জন্য উৎসুক ছিলাম, কিন্তু সমালোচনা-প্রিয়ও ছিলাম। তিনি 'বোকা বুঝাইবার' (Hoodwink) চেষ্টা করিতেছেন কি না, ইহা পরীক্ষার জন্য আমি সর্ব্বদা সতর্ক থাকিতাম। কিয়ৎ কাল মধ্যে আমি ব্লাভাস্কির অসাধারণ চরিত্রবত্তার পরিচয় পাইলাম। আমি জানিতে পারিলাম, তিনি আমার মনের ভাব অভ্রান্তরূপে ঠিক ধরিয়া ফেলিয়াছেন। কিন্তু তজ্জন্য তিনি আমাকে এক মুহূর্তের নিমিত্তও নিরুৎসাহ করেন নাই। যে সকল নির্ব্বোধ ব্যক্তি বলে যে, তিনি লোকগুলাকে সম্মোহন বিদ্যায় অভিভূত করিতেন, তাহারা জানে না তিনি নিরন্তর জোর করিয়া বলিতেন যে, কেহ যেন প্রমাণ ব্যতীত কোন কথা বিশ্বাস না করে, এবং যাহা উত্তম বলিয়া প্রমাণিত, একমাত্র তাহাই যেন মানবগণ প্রাণপণে ধরিয়া থাকে। * * * আমি কোন প্রকার অলৌকিক ক্রিয়া দেখিলাম না, তথাপি আকৃষ্ট হইলাম কিসে? কেবল তাঁহার নৈতিক ও আধ্যাত্মিক জীবনের গভীরতা দেখিয়া, তাঁহার শিক্ষার মধ্যে জীবন ও জগৎ তত্ত্বের একটা যুক্তিযুক্ত কার্য্য-কারণ শৃঙ্খলার উপদেশ পাইয়া। আমার সমগ্র জীবনের মধ্যে একমাত্র তাঁহাকেই সর্ব্বপ্রথম এমন একটী উপদেশক রূপে পাইলাম, যিনি আমার চিন্তার এলোমেলো সূত্রগুলি গুছাইয়া একত্রিত করিয়া দিলেন। প্রতিমুহূর্তে আমি তাঁহার সুন্দর শিক্ষাদান-কুশলতা, বিস্তৃত জ্ঞান ও স্নেহপূর্ণ ধীরতার প্রমাণ পাইতে লাগিলাম। শীঘ্রই জানিতে পারিলাম, যাহাকে অজ্ঞ লোকেরা একজন সামান্য যাদুকর মনে করিত, তাঁহার হৃদয় কত উচ্চ, তাঁহার জীবনের প্রত্যেক দিন কিরূপ নিষ্কাম কর্ম্মে ব্যয়িত হইত। * * * যাহা বলিলাম, তাহা তাঁহার চরিত্রের প্রকৃত পরিচয় পক্ষে যে কত সামান্য, ইহা আমি ভালরূপ জানি। কারণ প্রকৃত ব্লাভাস্কির আভাস মাত্র আমরা কখনও কখনও পাইতাম। সেই জন্য তাঁহার প্রকৃত অসাধারণত্ব বুঝিতে সক্ষম হই নাই। তাঁহার গভীর জ্ঞান সম্বন্ধে বলিবার সময় এক্ষণও আসে নাই। আর সে কই বা কে উহার বর্ণনা করিবে? সেই সমুদ্রের ন্যায় বিস্তৃত জ্ঞানের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরঙ্গ গুলিই আমরা দেখিতে পাইতাম। সম্ভবতঃ তাঁহার এ জন্মের কারণ-তত্ত্ব আমরা কখনও বুঝিতে পারিব না।..."

অপর এক শিষ্য (T. D. Buck) লিখিয়াছেন:—"বর্ব্বরতার গহ্বর হইতে আমাদের বর্ত্তমান সভ্যতার অভ্যুদয় অবধি আজ পর্য্যন্ত পাশ্চাত্য জগতে এরূপ আর কোন লোকশিক্ষকের কথা আমরা কোথাও পাই নাই।" বস্তুতঃ শিষ্যেরা একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন যে, ব্লাভাস্কির উপদেশের ভিতর একটা শক্তি ছিল। তাহার কারণ এই যে, তিনি কতকগুলি দার্শনিক গ্রন্থের লেখক মাত্র নহেন, কিন্তু সেই সকল শিক্ষা জীবনে পরিণত করিয়াছিলেন। উপদিষ্ট জ্ঞানের প্রমাণ নিজে পাইয়া অপরকে উপদেশ দিতেন। যে যাহা লাভ করিয়াছে, তাহাই সে অপরকে দিতে পারে, এবং তাহার উপদেশের সহিত প্রমাণিত জ্ঞানের সত্যতা-মূলক এমন একটী শক্তি নিহিত থাকে, যাহা

সরল শিক্ষার্থীর হৃদয়-পটে একেবারে মুদ্রিত হইয়া যায়। যাহার জীবন এই সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত নহে, এ শক্তি তাহার গ্রন্থে বা বাক্যে দুর্লভ। William Kinsland নামক ব্লাভাস্কির আর একজন শিষ্য বলেন, "তিনি আমাদিগকে যে তত্ত্বজ্ঞান শিক্ষা দিতেন, তাহা ধর্ম্ম বা দর্শনের একটা মতবাদ মাত্র নহে, কিন্তু তাহা একটা জীবন্ত শক্তি। তাঁহার শিক্ষার, তথা তাঁহার জীবনের, মূলমন্ত্র ছিল আত্মত্যাগ।" ব্লাভাস্কি বলিতেন, যে সত্যের জন্য ত্যাগমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছে, সেই থিয়সফিষ্ট,—সে তাঁহার সমিতির সভ্য হউক বা না হউক, সমিতির সপক্ষ হউক বা না হউক।

ব্লাভাস্কির অসাধারণ প্রতিভায় চমৎকৃত না হইতেন, এমন লোক নাই। তাঁহার দেহত্যাগের পর তদীয় একজন অজ্ঞেয়বাদী ভক্ত লিখিয়াছেন,—"আমি Carlyle এর ন্যায় মহামনীষীর সংস্পর্শেও আসিয়াছি। আমি বলিতেছি,যাঁহারা প্রকৃত মহত্ত্ব কাহাকে বলে জানেন, তাঁহারা ব্লাভাস্কির সেই অমানুষিক প্রতিভাজ্যোতি-মণ্ডিত মূর্ত্তি দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন, পৃথিবীতে একটীর অধিক ব্লাভাস্কি হয় নাই। হে মুক্ত বিদ্রূপব্যবসায়ি! একবার তাঁহার Secret Doctrine, Isis unvieled, key to Theosophy পড়িয়া দেখ। তত্ত্ববিদ্যা বলিয়া কিছু থাকুক বা না থাকুক, মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি বর্ত্তমান শতাব্দীর,—বর্ত্তমান শতাব্দীরই বা বলি কেন, যে কোন যুগের—সর্ব্বাপেক্ষা অসাধারণ নারী চলিয়া গিয়াছেন।"

অপর একজন বলেন,—"গোড়া বৈজ্ঞানিক পেচকগণ সেই হিমাদ্রিশিখরবাসী জ্ঞানের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়া দেখিতে পাইত,তাহাদের সঙ্কীর্ণ দৃষ্টির বহির্ভূত জ্ঞানের উচ্চ চূড়ায় তাহার অনুগমন করিতে তাহারা অসমর্থ। কাজেই অনেক সময়ে কেবল চীৎকার করিয়া তাহারা গগন বিদীর্ণ করিত।"

ব্লাভাস্কির বিরুদ্ধে প্রকাশিত গ্লানিকর পুস্তক গুলির ভিতর হইতেই যেন নিন্দকগণের অজ্ঞাতসারে তাঁহার প্রতিভাজ্যোতি ফুটিয়া বাহির হয়। এ সম্বন্ধে এক ব্যক্তি লিখিয়াছেন, —"১৮৮৫ সালের বসন্তে আমি ব্লাভাস্কি ও থিওসফির নাম প্রথম শুনি। আমরা জলযোগ করিতে বসিয়াছি। আমি যাঁহার গৃহে অতিথি, তিনি তাঁহার ডাকের চিঠি পত্র খুলিতেছিলেন। তিনি এক খানা পুস্তিকা বিরক্তি সহকারে এক পাশে নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন, 'আমাকে এ সকল পাঠায় কেন? আমি ত থিয়সফিষ্ট নহি!' আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, 'থিয়সফিষ্ট কি?' তিনি উত্তর করিলেন, 'যে মাদাম ব্লাভাস্কির প্রাচ্য শিক্ষা মত চলে।' আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—'কে সে মাদাম ব্লাভাস্কি, বলিবেন কি?' আমার অজ্ঞতায় একটী বিস্ময়সূচক ধ্বনি করিয়া তিনি আমার হাতে সেই পুস্তিকা খানা দিয়া বলিলেন, 'এই খানা পড়িলেই জানিতে পারিবে।' পুস্তিকা খানা কিছুই নহে, সাইকিকেল সোসাইটির (Society for Psychical Research) সেই প্রসিদ্ধ গ্লানিকর রিপোর্ট। সত্যই আমি এই গ্লানিপূর্ণ রিপোর্ট পড়িয়াই তাঁহাকে জানিতে পারিলাম। মনোযোগের সহিত পড়িয়া দেখিলাম, প্রথমতঃ উহার সিদ্ধান্ত গুলি কি অসার! দ্বিতীয়তঃ, মদাম ব্লাভাস্কির কর্ম্মঠতা, মনীষা, প্রভাব কি অসীম,—যেন একটা প্রকাণ্ড শক্তির আধার। তাঁহার চরিত্র-প্রভাব আমার কল্পনাকে অধিকার করিয়া বসিল। জানিতে

একান্ত ইচ্ছা হইল, কোন্ বস্তুর জন্য এই রমণী দুঃখ দারিদ্র্য নির্য্যাতন—শুধু ইহাই নহে—সমগ্র পৃথিবীর ব্যঙ্গ বিদ্রূপ (ব্যঙ্গ বিদ্রূপই উনবিংশ শতাব্দীর মহাস্ত্র!) অনায়াসে শির পাতিয়া গ্রহণ করিলেন ? ইত্যাদি।"

কি পরিতাপের বিষয়, যিনি জীবনের প্রতি মুহূর্ত্ত পরহিতে উৎসর্গ করিয়াছেন, তাঁহাকেও কতকগুলি হীনমতি লেখক লজ্জাকর ভাষায় তস্কর, মিথ্যাবাদী, ইন্দ্রিয়-পরায়ণ, চরিত্রহীন, মদ্যপায়ী, প্রবঞ্চক, বলিয়া গালি দিতে কুণ্ঠিত হয় নাই। ব্লাভাস্কির জীবনী-পাঠকের নিকট এই সকল ঘৃণ্য উক্তির প্রতিবাদ অনাবশ্যক। তাঁহার আচার, ব্যবহার, চরিত্র, নীতি, সমস্তই উহার বিরুদ্ধে অকাট্য প্রমাণ। অলকট বলেন,—"আমি এত কাল তাঁহার সঙ্গে কাটাইলাম, এক দিনও তাঁহাকে কোন প্রকারের এক বিন্দু মদ্যপান করিতে দেখি নাই। রুষদিগের জাতীয় অভ্যাসানুযায়ী তিনি সর্ব্বদা সিগারেটের ধূমপান করিতেন সত্য। তাঁহার ইন্দ্রিয়পরায়ণতা সম্বন্ধে ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, কামবৃত্তির চরিতার্থতা সাধনে তিনি শারীরিক হিসাবেই একেবারে অসমর্থ ছিলেন, (She was physically incapable of indulging in such conduct, and of being a mother)।"* তাঁহার ন্যায় প্রবঞ্চক যত জন্ম গ্রহণ করে, ততই পৃথিবীর মঙ্গল। ইহা তৎকৃত গ্রন্থাদির সাধারণ পাঠক পর্য্যন্ত একবাক্যে স্বীকার করিবেন। যিনি পরদুঃখ দেখিলে নিজের শেষ কপর্দ্দক পর্য্যন্ত অকাতরে দান করিয়া দুঃখীর দুঃখ মোচনে অগ্রসর হইতেন, তাঁহার তস্কর অপবাদ বর্ব্বরদিগের মুখেই শোভা পায়। তবে জগতের অল্প মহাপুরুষই এই রূপ গালি বর্ষণ হইতে মুক্তি লাভ করিয়াছেন।

"যিনি ধর্ম্মের রক্ষক, জগতের পালক, সেই শ্রীকৃষ্ণকে তাঁহার জ্ঞাতিবর্গ মণিচোর অপবাদে কলঙ্কিত করিয়াছিল। এখনও 'নষ্ট চন্দ্রের কলঙ্ক' এ দেশের প্রবাদবাক্যের মধ্যে রহিয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ নাকি এক যত শিশুকে হত্যা করিয়া তাহার কণ্ঠ হইতে স্যমন্তক মণি চুরি করিয়াছিলেন। ধন্য জনরব। * * * যীশু খ্রীষ্টের সহযোগীরা তাঁহার প্রতি যে সকল গালি-পুষ্প বর্ষণ করিয়াছিল, তাহা সংগ্রহ করিয়া একটী বৃহৎ ফুলের সাজি ভরাইতে পারা যায় :—

'He is mad' (Mark iii 21 ; John x. 20). 'He hath a devil' (Mark iii 30 ; John vii 20, viii 48, 52, x. 20). 'A friend of publicans and. Sinners' (Mat. ix. 9-11, Mark ii, 15, 16 ; Luke, v 27-30, xv. 1, 2). 'A blasphemer'. * * * 'He deceiveth the people' (Joh. vii 12).

"ইহার অর্থ এই যে, তাঁহার সহযোগীরা

* একদা কোন প্রয়োজন বশতঃ ব্লাভাস্কির দেহ-যন্ত্রাদি পরীক্ষা করিয়া বেলজিয়মের একজন প্রসিদ্ধ ডাক্তার যে মত লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, তাহা এই :—

"The undersigned testifies, as requested, that Madame Blavatsky of Bombay—New York corresponding secretary of the Theosophical Society—is at present under the medical treatment of the undersigned. She suffers from *ante flexio uteri*, most probably from the day of her birth ; because as proven by a minute examination, she has never borne a child, nor has she had any gynæcological illness."

(*Old Diary Leaves*)

খ্রীষ্টকে উন্মাদ, মদ্যপী, প্রবঞ্চক, সয়তান-গ্রস্ত, ধর্ম্মদ্বেষী, পাপসঙ্গী ইত্যাদি বিবিধ বিশেষণে বিশেষিত করিয়াছিল। অথচ তাঁহার মত নিরীহ অজাতশত্রু লোক ভূমণ্ডলে অল্পই দৃষ্টিগোচর হইয়াছে। শুধু তাহাই নহে। তাঁহার দেশবাসীরা কেবল অসূয়া ও গ্লানি করিয়াই ক্ষান্ত ছিল না। সময়ে সময়ে তাঁহার প্রাণসঙ্কটও ঘটাইয়াছিল। লিউক-লিখিত কাহিনীতে (Luke IV. 16) আমরা এক দিনের ঘটনা লিপিবদ্ধ দেখিতে পাই। * * *

"আমাদের এই বাঙ্গালাদেশে প্রায় ৪০০ বৎসর পূর্ব্বে যখন চৈতন্যদেব আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তখনও তিনি ঐ একই রূপ অভ্যর্থনা পাইয়াছিলেন। কয়েকজন অন্তরঙ্গ ভক্ত ব্যতীত জনসাধারণ তাঁহাকে সমাদর করে নাই। অনেকে তাঁহাকে পাগল বলিত। অপরে তাঁহাকে 'ভণ্ড, ধর্ম্মদ্রোহী' ইত্যাদি আখ্যা দিত। তাঁহার সম্বন্ধে এবং তাঁহার দুই জন প্রতিভাবান সহযোগী সম্বন্ধে এখনও এই প্রবচন প্রচলিত আছে :—

'নিমে বোধো বলা,
তিনটে কলির চেলা।'

"কেন এরূপ হয়? কেন মহাপুরুষ আবির্ভূত হইলে তাঁহার সহযোগীরা তাঁহাকে দ্বেষ অসূয়া করে, তাঁহার নিন্দা-গ্লানিতে প্রবৃত্ত হয়? ইহার এক কারণ এই যে, মহাপুরুষ তেজস্বী সূর্য্যের ন্যায়—আমাদের চক্ষু তাঁহার জ্যোতিতে পীড়িত হয়। আমাদের কনীনিকা তাহার তীব্র আলোক সহিতে পারে না। তাঁহার চতুর্দ্দিকে যে পুণ্যের গন্ধ বিকীরিত হয়, সাধারণ জীবের পক্ষে তাহা অসহনীয়। তাঁহার সাহচর্য্যে মানুষের সৎপ্রবৃত্তি যেমন উদ্দীপ্ত হয়, অসাধুর অসৎপ্রবৃত্তিও সেইরূপই উত্তেজিত হয়। জগতের দুর্ভাগ্য এখনও অনেক লোকই সাধু হইতে পারে নাই। সেই জন্য মহাপুরুষের সহযোগীরা বিপক্ষ হইয়া উঠে, এবং তাঁহার দ্রোহ আচরণ করে। এই ব্যাপার বরাবর হইয়া আসিতেছে * * *"।*

শ্রীযুক্ত বরদাকান্ত লাহিড়ী (রায়বাহাদুর) লিখিয়াছেন,—"যাহারা ব্লাভাস্কিকে প্রতারক বলে, তাহারা তাঁহার সম্বন্ধে কিছুই জানে না। এইরূপ প্রতারক কিসে হওয়া যায়, যদি আমাকে কেহ শিখাইতে পারেন, আমি আমার সর্ব্বস্ব তাঁহাকে দিতে প্রস্তুত আছি। সম্পর্কে বা ধর্ম্মে যাঁহারা শ্রেষ্ঠ, তদ্ভিন্ন পৃথিবীতে আর কাহারও নিকট যে ব্রাহ্মণ মস্তক অবনত করে না, সেই ব্রাহ্মণাভিমানী আমি কেন এই শ্বেতকলেবরা পাশ্চাত্য যোগিনীর সম্মুখে বিনম্র শিশুর ন্যায় করযোড় করিয়াছি? পাশ্চাত্যগণ এইটুকু বুঝিলেই ত সব বুঝিতে পারেন। কেন আমি তাঁহার নিকট নতশির হইলাম? কারণ তিনি আর এখন ম্লেচ্ছ রমণী নহেন। তিনি সে সীমা অতিক্রম করিয়া গিয়াছেন। প্রত্যেক হিন্দু—পবিত্র হইতে পবিত্রতম হিন্দু—তাঁহাকে হিন্দু, মাতা বলিয়া সম্বোধন করিতে গর্ব্ব ও আহ্লাদ অনুভব করিবে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। ভারতবর্ষ তাঁহাকে ভুলিতে পারে না, ভুলে নাই, এবং হিন্দুগণ অবিলম্বেই তাহাদের যোগিনীকে স্বগৃহে ফিরিয়া পাইবে। তাহারা অনবহিত হইতে পারে, অজ্ঞান হইতে পারে, কিন্তু অধিকাংশ পাশ্চাত্যের ন্যায় অকৃতজ্ঞ বা বিশ্বাসঘাতক নহে।... পাশ্চাত্যগণের মধ্যে ২।১ জন ছাড়া প্রায়

* শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত প্রণীত "জগদ্গুরুর আবির্ভাব" নামক গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত।

সকলেই হিন্দুকে ঘৃণার চক্ষে দেখে। এই সকল লোকের নিকট আমাদের গূঢ়ার্থ দর্শনাদি প্রকাশিত হয়, ইহা আমি মোটেই ইচ্ছা করি না। তবে একটা সান্ত্বনার কথা এই যে, শাস্ত্রাদি প্রকাশিত হইলেও ঐ সকল সাহেব লোক উহার এক বর্ণও বুঝিতে পারিবে না, আর ব্লাভাস্কি ব্যতীত তাহাদিগকে উহা বুঝাইবার দ্বিতীয় ব্যক্তিও নাই। যাহাদের খাদ্য গোমাংস, এবং পেয় উত্তেজক সুরা, এবং শয্যা পক্ষলোম-নির্ম্মিত স্প্রিংএর গদি, তাহাদের নিকট আমাদের শাস্ত্ররহস্য প্রকাশিত করিতে আমার ঘোর আপত্তি আছে।..."

লাহিড়ী মহাশয় বলিতেছেন, হিন্দুগণ অবিলম্বেই তাহাদের যোগিনীকে আবার ফিরিয়া পাইবেন। ইহার অর্থ বোধ হয় এই যে, ব্লাভাস্কি পূর্ব্বজন্মে কোন হিন্দুযোগিনী ছিলেন, এবং দেহান্তে পুনরায় হিন্দুগৃহে জন্মগ্রহণ করিবেন। 'Pioneer' পত্রের ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক Sinnet সাহেবের এইরূপ বিশ্বাসের কথা আমরা ব্লাভাস্কির জন্মান্তরীণ সংস্কার আলোচনা প্রসঙ্গে পূর্ব্ব এক অধ্যায়ে বলিয়াছি। তিনি লিখিয়াছেন,—"তিনি (ব্লাভাস্কি) পূর্ব্বে প্রচুর যোগশক্তি-সম্পন্না হিন্দু রমণী ছিলেন। এবং হিন্দুজাতির উন্নতির জন্য তাঁহার প্রাণে সদাই প্রবল আশা ও আকাঙ্ক্ষা জাগরূক ছিল। তাঁহার অন্য জাতির মধ্যে জন্মগ্রহণের কারণ এই যে, বর্ত্তমান যুগে পাশ্চাত্য জাতীয় দেহের ভিতর দিয়া কার্য্য করিলে হিন্দুজাতির অধিকতর উন্নতির সম্ভাবনা।" *

ভারতের প্রতি ব্লাভাস্কি যে অসীম অনুরাগ পোষণ করিতেন, তাহা এই জীবনী পাঠক উত্তমরূপে জানেন। যে যুগে পাশ্চাত্য ভূমি প্রাচ্যের গর্ব্বিত শিক্ষকের আসন গ্রহণ করিতে উন্মুখ, সেই যুগে তিনি উহার সুর বদলাইয়া দিলেন। পৃথিবীর সর্ব্বত্র তাঁহার মন্ত্রধ্বনিত হইল, 'প্রাচ্যভূমিই জ্ঞানালোকের উদয়গিরি' (*Ex oriente lux*—Light comes from the East)। ভারতবর্ষ যে জ্ঞান বিজ্ঞানের জন্মভূমি, কেবল ইহাই নহে, তিনি বলিতেন, ভারতীয় শিক্ষকগণের পাদমূলেই পাশ্চাত্যদিগের অধ্যাত্ম-শিক্ষা লাভ করিতে হইবে। তাঁহার জীবনের একটী লক্ষ্য এই ছিল, কিসে আত্মবিস্মৃত ভারত উহার গৌরবময় অতীতের প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া আবার উদ্বুদ্ধ হয়, দণ্ডায়মান হয়, এবং কিসে এই ভারতীয় জ্ঞান বিজ্ঞান মাহাত্ম্য পাশ্চাত্যরা যথোচিত হৃদয়ঙ্গম করিতে সক্ষম হয়। ব্লাভাস্কি-জীবনের এই মহৎ উদ্দেশ্য অনুধাবন করিয়া সহৃদয়া শ্রীমতী এরাণ্ডেল (Francesca Arundale) ১৮৯১ সালে তাঁহার পরলোক গমন উপলক্ষে তদীয় পুণ্যস্মৃতির তর্পণ করিয়া যে প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন, আমরা তাহা হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিলাম :—

দর্শন শাস্ত্রে, ভারতের ধর্ম্মে তাঁহার বিশেষ আস্থা। অদ্বৈতবাদ যে ধর্ম্মরাজ্যের শ্রেষ্ঠতম আবিষ্ক্রিয়া, তাহা অধ্যাপক মক্ষমূলর বারংবার স্বীকার করিয়াছেন। যে সংসারবাদ দেহাত্মবাদী খ্রীষ্টানদের বিভীষিকাপ্রদ, তাহাও তিনি স্বীয় অনুভূতি-সিদ্ধ বলিয়া দৃঢ়রূপে বিশ্বাস করেন; এমন কি, বোধ হয় যে, ইতিপূর্ব্বে জন্ম তাঁহার ভারতেই ছিল, ইহাই তাঁহার ধারণা এবং পাছে ভারতে আসিলে তাঁহার বৃদ্ধ শরীর সহসা সমুপস্থিত পূর্ব্বস্মৃতিরাশীর প্রবল বেগ সহ্য করিতে না পারে, এই জন্যই অধুনা ভারতাগমনে প্রধান প্রতিবন্ধক।"

* পণ্ডিত MaxMullerএর বেদাদি শাস্ত্রানুরাগ সম্বন্ধে শ্রীবিবেকানন্দ স্বামীজী লিখিয়াছেন,—'মোক্ষমূলার যে শুধু ভারতহিতৈষী, তাহা নহেন, ভারতের

"ভারতের ভবিষ্যৎ ইংলণ্ডের ভবিষ্যতের সহিত জড়িত—কি রাজনৈতিক, কি ইহলৌকিক, কি আধ্যাত্মিক সর্ব্বপ্রকারেই। আধ্যাত্মিক তত্ত্বের মিলন সূত্রে উভয়কে গ্রথিত করা পরাবিদ্যা সমিতির জনহিতমূলক কার্য্যের একটী বিশিষ্ট চিহ্ন বলিয়া আমি মনে করি। আমরা প্রতিদিনই ভারতীয় দার্শনিক ইতিহাসের জ্ঞান লাভ করিতেছি, ইহা সকলেই দেখিতেছেন।...পরাবিদ্যা-সমিতি কর্ত্তৃক সেই লুপ্ত উদ্ধার ও প্রচার চেষ্টা ফলে রাশি রাশি সংস্কৃত গ্রন্থের অনুবাদ প্রকাশিত হইতেছে, এবং পাশ্চাত্যগণ অধিকতর আগ্রহের সহিত সেই জ্ঞানান্বেষণে অগ্রসর হইতেছেন। প্রাচ্যের এই জ্ঞান প্রকাশে এবং পাশ্চাত্যের উক্ত জ্ঞান গ্রহণে উভয়ের যে ঘনিষ্ঠ মিলনের সম্ভাবনা, প্রাচ্য জাতীয়েরা অতঃপর যখন শক্তিমান হইয়া ইহলৌকিক উন্নতির জন্য দণ্ডায়মান হইবে, তখন সেই অবশ্যম্ভাবী সংঘর্ষের অনিষ্টকর ফলগুলি দূরীকরণ পক্ষে, উক্ত আধ্যাত্মিক ঘনিষ্ঠতা দ্বারা বহুল ইষ্ট সাধিত হইবে।" এরাণ্ডেল মহোদয়ের আশা ফলবতী হউক। ভারতের উচ্চ জ্ঞান প্রচার দ্বারাই যে জাতিতে জাতিতে বর্ত্তমান কলহ বিবাদের অবসান হইয়া নূতন সভ্যতার পত্তন হইবে, আজকাল অনেক আর ইহাও অলীক স্বপ্ন বলিয়া মনে করেন না। প্রাচী গগন আবার জ্ঞান-দীপ্তিতে আলোকিত হইয়া জগতের অন্ধকার দূর করিবে—ইহার উষারাগ যেন এক্ষণই, সমস্ত জগতের মনীষীগণের নয়নগোচর হইতেছে। *

ব্লাভাস্কির ভারতবর্ষে আসিবার অগ্রেই তাঁহার যশঃ ভারতময় ব্যাপ্ত হইয়াছিল। সেই জন্য তাঁহার ভারতাগমন সংবাদ পাইবা মাত্র এদেশের কোন কোন পূজ্য ব্যক্তি তাঁহার দর্শনলাভার্থ বোম্বাই নগরে গমন করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে আমাদের বঙ্গ দেশের লোকমান্য শিশিরকুমার ঘোষ অন্যতম। শিশিরকুমার এক্ষণ পরলোকগত, কিন্তু অদ্যাপি তাঁহার "অমৃতবাজার" তাঁহারই ভাবের প্রতিধ্বনি বহন পূর্ব্বক হিন্দুসমাজের দিক হইতে হিন্দুর পরমোপকারিণী ব্লাভাস্কির কথা কৃতজ্ঞ হৃদয়ে জগতে ঘোষণা করিয়া থাকে। তাঁহার ভাগিনেয় আমার শ্রদ্ধেয় বন্ধু শ্রীযুক্ত রঞ্জনবিলাস রায়চৌধুরী ব্লাভাস্কি সম্বন্ধে আমাকে যে পত্রখানা লিখিয়াছেন, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম :—

"* * * তখন আমার বয়স ১৪।১৫, জীবনের একটী ঘোর দুর্দ্দিন। বড় ভাই গোয়ালিয়রে পলাইয়া গিয়াছেন ; পিতা মৃত্যুশয্যায় শায়িত, আর উঠিবেন না। সেই সময়ে এক দিন শিশির বাবু আমার হাতে দুইখানি পত্র দিয়া বেড়াইতে গেলেন। এক খানি আমার দাদা গোয়ালিয়রে যে পাশীর বাড়ীতে

---

* ব্লাভাস্কির একজন চরিতাখ্যায়ক (H. Pissareff) লিখিয়াছেন :—"The regeneration of the East and the awakened interest of the West for its spiritual treasures will play a big role in the near future and will help human consciousness to rise to a higher plane.

"It is difficult to imagine all the consequences which may result from the fusion of the broad synthesining ideas of the ancient East with the exact analysis of the European West, its high scientific development with the depth of the religious consciousness of antiquity. The beginning of this fusion is going on under our eyes, thanks to the esoteric teachings which H. P. B. has brought to the Western world as a gift from the ancient East."—"*The Philosophist*" *Magazine*, *May*, *1911*.

থাকিতেন, তাহার নামে, অপর খানি সেই Historic letter যাহার উল্লেখ কর্ণেলের ডাইরীর মধ্যে আছে। চিঠিখানি কর্ণেলের নামে ছিল, এবং শেষ কথা ছিল, 'You are too late, India is dead'। ইহার কিছুদিন পরে পিতার মৃত্যু হইল, তাহার অল্প দিন পরে আমাদের পরিবারের মধ্যে দেবতার ন্যায় যাহাকে এখনও পূজা করা হয়, সেই বসন্তকুমার ঘোষের একমাত্র চিহ্ন সরোজকান্ত মারা গেল। এই দুইটী গুরুতর শোকে সংসারে হাহাকার পড়িয়া গেল। * * * শিশির বাবু বম্বে (Bombay) চলিয়া গেলেন। সেখানে ম্যাডাম ও কর্ণেলের সহিত তাঁহাদের বাটীতে ২।৩ সপ্তাহ বাস করিয়াছিলেন। তিনি ফিরিয়া আসিয়া যাহা বলিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে একটী ঘটনার কথা মনে হইতেছে। একদিন তাঁহারা তিন জনে বসিয়া আছেন। ম্যাডাম এক খানা দিল্লি মিরার হাতে লইয়া নাড়া চাড়া করিতেছেন ও গল্প করিতেছেন। Delhi Mirror অর্থে এক খানি গোল আয়না, দু'দিকেই কাচ লাগান এবং নীচে একটী ডাণ্ডা। ম্যাডাম বলিতেছিলেন যে, ঐ আয়না দ্বারা (gazing) দৃষ্টি স্থির করিবার বড় সুবিধা হয়, এবং তিনি এক সাধুর নিকট ঐ খানি পাইয়াছিলেন। শিশির বাবু বলিলেন, তবে আয়না খানি আমাকে দিন। ম্যাডাম উত্তর করিলেন, তিনি একটী সাধুর নিকট পাইয়াছেন, শিশির বাবু ইচ্ছা করিলে বাজার হইতে ঐরূপ অনেক কিনিতে পাইবেন। কর্ণেল ইঙ্গিত দ্বারা শিশির বাবুকে বলিলেন, 'ছাড়িও না'। শিশির বাবু না-ছোড়বান্দা। অনেক জিদাজিদের পর ম্যাডাম বলিলেন, 'ছাড়িবে না, তবে নাও।' এই বলিয়া সেই আয়না খানি ধরিয়া চিরিয়া ফেলিলেন, এবং দুই খানি সম্পূর্ণ আয়না হইল। সে আয়না খানি এখনও আমার মাতুল গৃহে আছে। আর একদিন ঐরূপ কথা বলিতে বলিতে শিশির বাবু কিছু আশ্চর্য্য দেখিবার জন্য জিদ করিতে লাগিলেন। অনেক জেদাজেদির পর ম্যাডাম বিরক্ত হইয়া তাঁহার সেই শোনের নুড়ী চুল ধরিয়া মড়্ মড়্ করিয়া এক গোছা ছিঁড়িলেন, এবং শিশির বাবুর হাতে দিলেন। সে চুল আমরা দেখিয়াছি, ঘোর কৃষ্ণবর্ণ, কোন পাঞ্জাবী পুরুষের চুল।

"বাবু পার্ব্বতীকুমার রায়ের বাড়ীতে ম্যাডাম দার্জ্জিলিঙ্গে ছিলেন। পার্ব্বতীবাবু আমাকে বলিয়াছেন যে, দিনের মধ্যে তাঁহার (ব্লাভাস্কির) চেহারা অনেক বার বদলাইয়া যাইত। তাঁহার জন্য পৃথক Bath room দিতে না পারিয়া পার্ব্বতীবাবু কিছু লজ্জিত হন। পার্ব্বতীবাবু ঘোর সাহেব ছিলেন। যে Bath room পুরুষে ব্যবহার করিবে, সে Bath room স্ত্রীলোকে ব্যবহার করা ইংরাজি ভদ্রতা-বিরুদ্ধ। পার্ব্বতীবাবু Madame এর নিকট জানাইলে তিনি উত্তর দিয়াছিলেন যে, "আমার কি কোন sex আছে বলিয়া তোমরা মনে কর নাকি ?"

"সেব[illegible] দার্জ্জিলিঙ্গে এক বিষয়ে তিনি বড় জব্দ হইয়াছিলেন। বোধ হয় নবীনবাবুর নাম তুমি শুনিয়াছ। বাবু নবীনকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়, তাঁহার কন্যা, স্ত্রী ও পুত্র, এই কয়েক জন সেবার দার্জ্জিলিঙ্গে ছিলেন। নবীনবাবুর স্ত্রী ও কন্যা রন্ধনকার্য্য করিতেন। একদিন ম্যাডাম বলিলেন, নবীন ! তোমাদের দেশের ভাল হইবে কি ? তোমরা স্ত্রীলোকের উপর বড় অত্যাচার কর।

নবীনবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কি অত্যাচার?' ম্যাডাম উত্তর করিলেন, 'তুমি একজন Magistrate, আর তুমি তোমার স্ত্রী কন্যার দ্বারা রন্ধনকার্য্য করাও, ইহা কি অত্যাচার নহে?' এ সম্বন্ধে তোমার কি বলিবার আছে? নবীনবাবু উত্তর করিলেন, 'যাহারা রান্ধে, তাহাদের নিকট আপনি জিজ্ঞাসা করুন।' ম্যাডাম নবীনবাবুর বাটীর ভিতর যাইয়া তাঁহার স্ত্রী ও কন্যার সহিত কথোপকথন করিয়া হাসিতে হাসিতে ফিরিয়া আসিলেন। বলিলেন, 'নবীন! আজ তোমার নিকট হারিলাম, এবং কয়েকটী নূতন তথ্য শিখিলাম। দেবতার ভোগের ন্যায় আত্মীয় স্বজনে যদি পাক করে, তাহা হইলে কেবল যে দ্রব্যাদি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও সুস্বাদু হয়, তাহা নহে, ইহাতে মানসিক শক্তির দ্বারা আয়ু, বল ও বীর্য্য বৃদ্ধি হয়, তাহা আমি পূর্ব্বে ভাবি নাই।"

ব্লাভাস্কির সুপরিচিত বহুতথ্যজ্ঞ বর্ষীয়ান্ শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় মহাশয় মধ্যে মধ্যে আমাকে যে সকল পত্র লিখিয়াছেন, তাহা হইতে ধন্যবাদের সহিত কতক নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম। পত্রগুলি সমস্ত প্রকাশের স্থানাভাব বলিয়া আমরা দুঃখিত, বিশেষতঃ তাহাতে একটু পুনরুক্তিদোষ ঘটিবার সম্ভাবনা।

"আমরা যাহাকে হিন্দুধর্ম্ম বলি, তাহার প্রকৃত নাম সনাতন আর্য্য ধর্ম্ম। অন্য ধর্ম্মের সহিত তুলনায় ইহার বিশেষত্ব এই,—ইহাতে পরলোক, জন্মান্তর ও কর্ম্মফলে বিশ্বাস করিতে হয়। তদ্ভিন্ন কেবল আমাদের শাস্ত্রেই নিরয়, অভ্যুদয় ও নিঃশ্রেয়স, এই ত্রিমার্গ ভেদ বিশেষরূপে দর্শিত হইয়াছে। সুতরাং ম্যাডাম ব্লাভা[illegible] পুর্ব্ব[illegible] আমাদের নিকট পশ্চিমে সূর্য্যোদয়ের ন্যায় অসম্ভব হইতে পারে না।

"এই পৃথিবী মানবের বাসযোগ্য হইলে ইহাতে বেদার্থ সম্প্রদায় স্থাপিত হয়, ভগবান কৈলাসনাথ মহাযোগী তাহার মস্তক, নারায়ণ ঋষি তাহার হৃদয়, স্বয়ং ভগবান তাহার প্রতিষ্ঠা। ম্যাডাম ব্লাভাস্কির গুরু (কোন জন্মে ইনি মরু নামে সূর্য্যবংশীয় রাজা ছিলেন) ও মহাত্মা কোথুমী উভয়েই এই সম্প্রদায় ভুক্ত।

"বশিষ্ঠদেব ব্রহ্মার মানস পুত্র, প্রবৃত্তি মার্গের সপ্তর্ষি মধ্যে একজন; ইনি বহুকাল বশিষ্ঠ নামে সূর্য্যবংশীয় রাজাদিগের পুরোহিত ছিলেন। শক্তি ভগবান বশিষ্ঠের পুত্র, তাঁহার পুত্র ভগবান পরাশর, তাঁহার পুত্র মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস, তাঁহার পুত্র ও শিষ্য শ্রীশুকদেব, তাঁহার শিষ্য পূজ্যপাদ গৌড়পাদাচার্য্য, তাঁহার শিষ্য পূজ্যপাদ গোবিন্দপাদাচার্য্য (তাঁহার অপর খ্যাতি পতঞ্জলি), তাঁহার শিষ্য শ্রীশঙ্করাচার্য্য। ভগবান শঙ্কর বেদার্থ সম্প্রদায়ের একজন।

"ভরতপুরের যুদ্ধে একজন উচ্চ পদের চেলা স্বীয় অলৌকিক শক্তিবলে প্রস্তর নিক্ষেপাদি দ্বারা সেনাপতি লেক্ সাহেবকে হটিয়া যাইতে বাধ্য করিয়াছিলেন। সেই কর্ম্মফলে তাঁহাকে স্ত্রীলোকের শরীর গ্রহণ করিতে হয়—হিন্দু বিধবা। তিনি অনেক দিন কাশীতে ছিলেন, ম্যাডাম, দামোদর প্রভৃতিকে বেশ জানিতেন। সম্ভবতঃ এইরূপ কোন কার্য্যের জন্য H. P. B. রুসিয়া দেশের সম্ভ্রান্ত বংশীয়া স্ত্রীলোকের শরীর পরিগ্রহ করিয়াছিলেন।

"ম্যাডাম ব্লাভাস্কি লেখাপড়ায় অসাধারণ ব্যুৎপন্ন ছিলেন; যিনি Isis unvieled

পড়িয়া বুঝিবার চেষ্টা করিয়াছেন, তিনিই তাহা বলিবেন। তবে তাহার মধ্যে স্থানে স্থানে অন্যের চিন্তাফলও আছে। ভুবর্লোক-বাসী (প্রেত নয়) Sir Thomas Moore তাঁহাদের মধ্যে একজন। একথা কর্ণেল অলকট এক দিন আমাকে বলিয়াছিলেন, এবং তাঁহার Diary নামক পুস্তকেও তাহার আভাস আছে।

"তাঁহারা ভারতবর্ষে আসিয়া পদার্পণ করিবামাত্র তিনি রুসিয়দিগের গুপ্তচর, তিনি অসতী, তিনি ভবঘুরে, কর্ণেল অলকট মদের দোকানের কর্ণেল প্রভৃতি নানা কুৎসা রটে। যথা সময়ে অকাট্য প্রমাণ দ্বারা সে সমস্ত অলীক বলিয়া প্রমাণিত হয়।

"H. P. B. (H. P. B. জীব, ম্যাডাম ব্লাভাস্কি ব্যক্তি। জীবেরও পৃথক নাম আছে) সকল সময়ে ব্লাভাস্কি শরীরে থাকিতেন না, সে সময়ে অন্য কোন জীব আসিয়া তাঁহার দেহ রক্ষা করিত, বা কার্য্য করিত ; যাহারা জানিত না, তাহারা হঠাৎ পরিবর্ত্তনের কারণ বুঝিতে না পারিয়া বড় গোলমালে পড়িত।...এরূপ কায়া প্রবেশ আমাদের শাস্ত্রে কয়েক স্থানে দেখিয়াছি। * * * হিন্দু ধর্ম্মের উপর তাঁহার যথেষ্ট শ্রদ্ধা ছিল। কিন্তু ধর্ম্মমূলক কুসংস্কারের ও সামাজিক কুপ্রথা ও গোঁড়ামির একান্ত বিরোধী ছিলেন ; তাহার অনেক দৃষ্টান্ত আমি শুনিয়াছি। ভারতবাসীর হিতচিন্তা তাঁহার হৃদয়ে সর্ব্বদা জাগরুক ছিল ; তিনি বিলাত হইতে আমাকে যে সকল পত্র লিখিতেন, তাহাতেও তাহা প্রকাশ পাইত।

"বিষয় বোধ তাঁহার একেবারেই ছিল না। টাকা কোথা হইতে আসিতেছে, কোথা দিয়া কি রূপে যাইতেছে, সে দিকে একেবারে দৃক্‌পাত নাই, ঠিক যেন আমাদের দেশের রাজা রাজড়া ; সে বিষয়ে এবং অন্যান্য বৈষয়িক ব্যাপারে কর্ণেল অলকট বেশ বিচক্ষণ ছিলেন।

"ম্যাডাম যখন দার্জ্জিলিং যান, তখন বহরমপুরের প্রসিদ্ধ উকীল ৺শ্যামাচরণ ভট্ট ও কোর্ট অব্ ওয়ার্ডস্ জেনারেল ম্যানেজার ৺নবীনকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় সস্ত্রীক তাঁহার অনুগমন করেন। শ্যামবাবুর সেখানে গিয়া জ্বর হয় ; তাঁহার জ্বর হইলেই ক্রমাগত বমন হইত। কিছুতেই নিবারিত হইত না। তাঁহার সেই অবস্থা শুনিয়া ম্যাডাম তাড়াতাড়ি তাঁহাকে দেখিতে আসিলেন, আসিয়াই তিরস্কার করিতে আরম্ভ করিলেন, শ্যামবাবু বলিলেন, 'আমি কি [illegible] করিয়া বমন করিতেছি?' ম্যাডাম ধমক দিয়া বলিলেন. 'তুমি বমন করিতেছ না ত কে করিতেছে? আমি কি তোমাকে বমন করাইতেছি?' শ্যামবাবু শুনিয়া অবাক্। তাঁহার বমন বন্ধ হইয়া গেল। ম্যাডাম ফিরিয়া গেলেন। তাহার পর ম্যাডাম ডুইটী ঔষধ বলিয়া দেন। শ্যামবাবু রোগমুক্ত হন। এই ঘটনার পর শ্যামবাবু অনেক দিন জীবিত ছিলেন। সেই রূপ রোগ আর তাঁহার হয় নাই।

"* * * আশ্চর্য্য ঘটনা (Phenomena) ম্যাডাম ব্লাভাস্কি মনে করিলেই দেখাইতে পারিতেন। আর পাশ্চাত্য সভ্যতার সামাজিক নিয়মবদ্ধ উক্তি ও ব্যবহার গুলা পদদলিত করিতে পারিলেই যেন তাহার আনন্দ হইত।

"(পূর্ব্বোক্ত) বহরমপুরের Wards Estates General Manager ও Deputy Magistrate ৺নবীনকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়

বলিয়াছেন :—'ম্যাডাম বোম্বাই আসার অল্প দিন পরেই শিশির বাবু তাঁহার সহিত দেখা করিতে যান। কথা কহিতে কহিতে ম্যাডাম বলিলেন, 'আমি—বৎসর পূর্ব্বে আর একবার ভারতে আসিয়াছিলাম।' শিশির বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন,—'আপনি অত অল্প বয়সে একলা কি জন্য এখানে আসিয়াছিলেন?' ম্যাডাম তখনই উত্তর করিলেন,—'Because I was in love with a slender built black Bengalee Babu!' শিশির বাবু নীরব। (বর্ণিত 'বাঙ্গালী বাবু' শিশির বাবুকে লক্ষ্য করিয়াই বলা হইয়াছে) * * *।

'নিবারণ বাবু কিছুদিন আসিয়াছিলেন। এক দিন গ্রীষ্মের দুই প্রহরের সময় তাঁহারা কয়জনে বসিয়া বলাবলি করিতেছিলেন,—'গরমে কায করা যায় না, তাস থাকিলে খেলা যাইত।' কিন্তু তাস কাহারও ছিল না, বাজারও দূরে। এমন সময় হঠাৎ ম্যাডাম্ সেই ঘরে আসিয়া উপস্থিত,—'তোমরা কি বলিতেছিলে?' সকলেই জড় সড় ও নীরব; "আচ্ছা" বলিয়া ম্যাডাম তালি দিলেন; তখনই এক জোড়া তাস উৎপন্ন হইল; ম্যাডাম তাস দিয়া চলিয়া গেলেন। তাঁহারা তাস লইয়া দেখেন, প্রত্যেক তাসের পৃষ্ঠে ছকের পরিবর্ত্তে এক একটী যক্ষের (যক্ষ ও ভূতযোনীগণ প্রেত নয়, অন্তরীক্ষবাসী ও প্রধান সাত জাতিতে বিভক্ত; আকার প্রায়ই বিকৃত; পুরাণে ইহাদের উল্লেখ আছে। ইংরাজি নামকরণ হইয়াছে Elementals) আকৃতি, তাহাও আবার ভিন্ন ভিন্ন। সে রূপ তাস কোথাও পাওয়া যায় না।"

ব্লাভাট্স্কি ভারতকে স্বদেশ, ভারতবাসীকে আপনার জন বলিয়া মনে করিতেন। সেই জন্য তিনি য়ুরোপীয় সংশ্রব ত্যাগ করিয়া ভারতবাসীর সহিত অবাধে একত্র বাস করিতেন, এবং তাহাদের সুখ দুঃখে আপনার সুখ দুঃখ মিশাইয়া দিতেন। ভারতবাসীর সহিত, বিশেষতঃ হিন্দুর সহিত, তাঁহার এই যে সহানুভূতি, ইহা য়ুরোপীয় চক্ষে একটা সহজেতর, অস্বাভাবিক বস্তু বলিয়া ধার্য্য হইলেও, তাঁহার যেন উহা সহজাত বস্তুই ছিল।

প্রাচ্যের সহিত প্রতীচ্যের সৌভ্রাত্র স্থাপন চেষ্টা তাহার সার্ব্বভৌম প্রচারের (world mission) অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু ভারতে তাঁহার শুভ বাণী আমাদের জাতীয় উদ্বোধনে প্রবল সহায়তা করিয়াছিল। ইহা স্বর্গগত শ্রদ্ধাস্পদ নরেন্দ্রনাথ সেন-প্রমুখ আমাদের তদানীন্তন দেশনায়কগণের উক্তি হইতে সপ্রমাণ হয়। তিনি ধর্ম্মসমূহের তাত্ত্বিক একত্বমূলক তাঁহার যে শুভবাণী ঘোষণা করিতে আসিয়াছিলেন, উহা ভারতভূমিতে যে সকল ফলোৎপাদন করিয়াছে, তন্মধ্যে ভারতীয় জাতিসমূহের একতাবদ্ধ হইবার উত্তরোত্তর বর্দ্ধমান প্রবল আকাঙ্ক্ষা একটী বাঞ্ছনীয় ফল কি না, ইহা বর্ত্তমান চিন্তাশীলগণের বিবেচ্য,—যাঁহাদের সহিত থিওসফিকাল সমিতির কোন সম্বন্ধ নাই, তাঁহাদেরও বিচার্য্য। তাঁহার জনৈক চরিতাখ্যায়ক এ সম্বন্ধে কয়েকটী প্রণিধানযোগ্য সত্য কথা বলিয়াছেন বলিয়া আমাদের বোধ হয়। * যে দেশ নানা জাতিতে, নানা বর্ণে,

* "All who are interested in India can observe different systems of awakening among the primitive populations of India, and an unprecedented tendency

নানা ধর্ম্মে, নানা আচারে, নানা সম্প্রদায়ে শতধা ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছিল, সে দেশে একটা একতাবদ্ধ জাতীয়তা সংগঠন এক সময়ে অসম্ভব বলিয়াই বোধ হইয়াছিল। এবং অনেক সংস্কারক জাতীয় উন্নতি সাধনের উপায়ান্তর নাই দেখিয়া, এই নানা জাতি, বর্ণ, আচার, ধর্ম্ম, ভাঙ্গিয়া চুরিয়া একাকার করিবার বিফল প্রয়াসে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। সেই সময়ে ব্লাভাস্কির শুভবাণী প্রচারিত হইল যে, বিপ্লব পন্থার অনুসরণ না করিয়াও, ধর্ম্মগত, বর্ণগত, আচারগত, সম্প্রদায়গত বিভিন্নতায় হস্তক্ষেপ না করিয়াও,—এবং সম্বন্ধে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াও, তদুপরি এক মহা মিলনের সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে, এবং তাহাই তিনি কার্য্যে দেখাইয়া অসম্ভব বাস্তবে পরিণত করিলেন। হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খ্রীষ্টান, জৈন, পার্শী, বোধ হয় ভারতের ইতিহাসে সর্ব্বপ্রথম, পরাবিদ্যা সমিতির আহ্বানে সম্মিলিত হইয়া পরস্পরকে ভ্রাতৃ সম্বোধন করিল। বাঙ্গালী, মারাঠী, পঞ্জাবী, মান্দ্রাজী, বেহারী, উৎকলী, মধ্য ও যুক্ত দেশবাসী,—সর্ব্বপ্রথম প্রাদেশিক সংকীর্ণতা ভুলিয়া, পরাবিদ্যা সমিতির পতাকা নিম্নে একত্রিত হইয়া পরস্পরকে ভ্রাতৃভাবে আলিঙ্গন করিল। এই পুণ্য সম্মিলন হইতে এক কঠিন সমস্যার মীমাংসা হইয়া গেল, জাতীয় সম্মিলনের দুর্লঙ্ঘ্য বাধা বিঘ্ন দূরীভূত হইল; এবং অনতিপরেই দেশহিতৈষিগণ কর্ত্তৃক "ভারতবর্ষীয় জাতীয় মহা-সমিতি"র (The Indian National Congress) পরিকল্পন ও দেশমাতৃকার মহা পূজার আয়োজন সুসিদ্ধ হইল। ভারতীয় জাতীয়তা সংগঠনে, জাতি-ধর্ম্ম-বর্ণ নির্ব্বিশেষে ভারত-বাসীগণকে একতার বৈজয়ন্তীতলে আনয়নে, ব্লাভাস্কির কার্য্য যে অমোঘ সহায়তা দান করিয়াছে, আমরা তাহার মূলে এক ঐশী শক্তির হস্ত দেখিতে পাই। কেহ কেহ বলেন, থিয়সফিকাল সমিতির কার্য্য শেষ হইয়া গিয়াছে। আমরা বলি, যদি উহার কার্য্য শেষ হইয়া থাকে, তবে বিধির বিধানেই উহা উঠিয়া যাইবে, তজ্জন্য চিন্তার প্রয়োজন নাই। অঙ্কুর উদ্গত হইলে বীজ মৃত্তিকায় লীন হইয়া যায়। কিন্তু তাহাতে বীজের আত্মদানের মহিমা মৃত্তিকায় লীন হইয়া যায় না। সেই অঙ্কুর যখন সুশোভন বৃক্ষে পরিণত হইয়া ফল ফুল প্রসব করিতে থাকে, তখন সেই বীজের প্রভাবই ঘোষণা করে। কিন্তু ইহাতেই বীজের কার্য্য শেষ হইল না। সেই বৃক্ষ হইতেই নব নব বীজ উৎপন্ন হইয়া, নব নব আকারে পৃথিবীতে উহার জীবনী-শক্তির বিস্তার করিতে থাকে। সুতরাং ব্লাভাস্কি-প্রতিষ্ঠিত বর্ত্তমান সমিতি না থাকিলেও, বা ভবিষ্যতে রূপান্তরিত হইলেও,

towards unity. People not participating in Theosophy, standing on the opposite pole of thought, agree that the source of the modern Indian movement is the recently born tendency towards religious unity. Religion always played the main role in the life of India ; a multitude of sects and divisions, into which the six main *Brahmanic* systems split, and the division of Budhism into the north and south sections, maintained the spirit of separativeness amidst the Hindoos. The turning point towards unity and the impulse to inner regeneration above mentioned, were given for the first time by H. P. B. in her promulgation of one esoteric principle common to all separate religious faiths. &c. &c."—H. Pissareff's Life of H. P. Blavatsky, translated by A. L. Pogosky. '*The Theosophist* May 1911.

তাহার শক্তি লুপ্ত হইবে না,—বেদান্ত-প্রমুখ তদীয় শিষ্যগণের মধ্যে সেই জীবনীশক্তির অভিনব ক্রীড়া দেখিয়া আমাদের এইরূপই আশা হয়। সেই শক্তি আমাদের ধর্ম্মে, দর্শনে, বিজ্ঞানে, সমাজে, জাতীয়তায় যে নব জীবন দান করিল, তজ্জন্য আমরা ব্রাভাস্কির নিকট কৃতজ্ঞ থাকিব। ইহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে, ভবিষ্যতে যখন আমাদের ধর্ম্মের ইতিহাস, জাতীয়তার ইতিহাস লিখিত হইবে, তখন উহাতে নিরপেক্ষ ঐতিহাসিক কর্ত্তৃক ব্লাভাস্কির উপযুক্ত শ্রেষ্ঠ স্থান নির্দ্দিষ্ট হইবে, এবং ভবিষ্যবংশীয়েরা চিরদিন এই মহীয়সী নারীকে কৃতজ্ঞতার কুসুমাঞ্জলি অর্পণ করিবে।

শ্রীদুর্গানাথ ঘোষ।

ভারতীয় ইতিহাস সম্বন্ধে কয়েকটী কথা।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

অন্য দিক হইতে দেখিতে গেলে, খ্রীষ্টীয় ৭ম শতাব্দীর পূর্ব্বে কোনও রাজা কিম্বা সম্রাটের ইতিহাস বা কোন রাজ্যের Consti ut onal development (রাষ্ট্রীয় শাসন-প্রণালীর উন্নতি) কিছুই দেখিতে পাওয়া যায় না। ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে উত্তর ভারতে মগধরাজ্যের প্রতিষ্ঠা হইলে এই প্রকার ইতিহাসের আরম্ভ। এই সময় হইতে হর্ষবর্দ্ধনের রাজত্বকাল পর্য্যন্ত (প্রায় ১২শত বৎসর) এই প্রবন্ধে হিন্দুযুগ নামে অভিহিত করা হইয়াছে। এই সুদীর্ঘ সময়ের মধ্যে প্রথমেই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, ঘন ঘন রাজবংশের (Dynasty) পরিবর্ত্তন। শিশুনাগ-বংশীয় রাজগণের ইতিহাস শেষ হইতে না হইতেই নন্দবংশের অভ্যুদয়, নন্দবংশ ঘর বাঁধিতে না বাঁধিতেই মৌর্য্যবংশ, এই প্রকার অগ্রসর হইতে হইতে নানা অসম্পূর্ণতার মধ্য দিয়া ৯।১০টী বংশাবলীর রঙ্গমঞ্চের নটনটীর আবির্ভাবের ন্যায় পরিবর্ত্তনের অত্যাশ্চর্য্য প্রমাণ প্রদান করিয়া, এই হিন্দু বংশাবলী তাহাদের আবির্ভাবের ন্যায়ই তিরোভাব ও অন্ধকারে বিলীন হইয়া রহিয়াছে। ১২ শত বৎসর বড় কম সময় নহে। স্যাকসন্‌ প্রভৃতি জলদস্যুগণের ইংলণ্ডে উপনিবেশ স্থাপনের সময় হইতে প্রায় প্রথম চার্লসের রাজত্বকাল পর্য্যন্ত ১২ শত বৎসর অতীত হইয়াছিল। ফ্রান্সে মধ্য ইউরোপ হইতে আগত জাতিগণের আগমন হইতে এই সময়ের মধ্যে ফরাসী বিপ্লব পর্য্যন্ত অগ্রসর, রোমের প্রতিষ্ঠা হইতে তাহার স্মরণীয় প্রতিভামণ্ডিত রাজ্যের শেষ পর্য্যন্ত, আর মুসলমান রাজত্বের প্রারম্ভ হইতে আরম্ভ করিলে আমরা এখনও এই সময়ের শেষে আসিতে পারি নাই। ভারতবর্ষ ছাড়া সমস্ত দেশেই দেখিতে পাওয়া যায়, একটা স্থির উন্নতির পথ খোলা রহিয়াছে, আর আমাদের দেশে "যখন যেমন তখন তেমন।" এইরূপ হইবার কারণ কি? কোনও জাতির জাতিগত প্রবৃত্তির বিচার, তাহার উৎকর্ষ অপকর্ষ বিচারের উদ্দেশ্য এই প্রবন্ধে নাই, রাজনৈতিক দিক্‌ হইতে ভাবিলে ইহার কি কারণ নির্দ্দিষ্ট করা যাইতে পারা যায়, ইহাই আমাদের উদ্দেশ্য।

এই উদ্দেশ্য লইয়া বিচার করিলে প্রথমেই

দৃষ্টি পড়ে, আমাদের জাতীয় সমিতি বা Parliament রকমের কিছুর অভাব। রাজার পর রাজা, সম্রাটের পর সম্রাট, রাজবংশের পর রাজবংশের আগমন কিম্বা পরিবর্ত্তন হইলে, কিন্তু এই সমিতির স্বভাবসিদ্ধ বিশেষত্ব স্থায়িত্ব (Permanence) দেশে শান্তিরক্ষার নিমিত্ত যেমন স্থায়ী শাসন-প্রণালীর প্রয়োজন, বিদ্যালয়ে ছাত্রগণের উন্নতির জন্য যেমন স্থায়ী শিক্ষক প্রয়োজন, দেশের রাজনৈতিক উন্নতির জন্য, সেই প্রকার, এই জাতীয় সমিতির (Parliament) প্রয়োজন। মধ্যে মধ্যে নূতন নিয়ম কিম্বা পরিচালকের প্রয়োজনীয়তা রাজপরিবর্ত্তন দ্বারা সিদ্ধ হইয়া থাকে। মানুষ স্বভাবতঃ (ভারতবর্ষীয়গণ বিশেষতঃ) রক্ষণশীল। এই সমিতি বর্ত্তমান থাকিলে হঠাৎ কোনও পরিবর্ত্তন হইতে পারে না, সর্ব্বসাধারণ ব্যক্তিগণ ক্রমশঃ রাজকার্য্যে শিক্ষিত হইতে থাকে, জাতীয় প্রাণ গঠিত হইতে থাকে ও যথেচ্ছাচারের নিবৃত্তি হয়। পাটলিপুত্রের শাসনকার্য্যের জন্য চন্দ্রগুপ্তের সময় যে পঞ্চায়েত (বা কমিটী) ছিল, তাহারা ঐ সহরে বর্ত্তমান Corporation-এর ন্যায় কাজ করিত—গ্রামে ঐ প্রকার কার্য্য পঞ্চায়েৎগণ দ্বারা নির্ব্বাহিত হইত। এই প্রকার committee বা পঞ্চায়ৎ স্থানীয় স্বায়ত্ত-শাসনের মধ্যে অথবা Local Self-government নামে পরিগণিত করা যাইতে পারে। স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন থাকিলেই যে সর্ব্বসাধারণ বিস্তৃত রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে শিক্ষিত হয় না, ইহা দ্বারা তাহা প্রমাণিত হয়। আজ কাল Central Government-এ (ভারতবর্ষীয় মহা সভায়) আমাদিগকে ক্ষমতা দিবার পূর্ব্বে কেবল মাত্র স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন দ্বারা শিক্ষিত করিয়া লইবার কল্পনা যাঁহারা করিয়া থাকেন, তাঁহারাও এই প্রকারে আকাশ-মন্দির নির্ম্মাণ করিবার আশা করিতে পারেন। অতি পুরাতন যুগে শুনিতে পাওয়া যায়, সময় সময় রাজা নির্ব্বাচন দ্বারা নিযুক্ত করা হইত। পুরাতন প্রচলিত বংশের উত্তরাধিকারীর অভাব ঘটিলে, কিম্বা রাজা অত্যন্ত উৎপীড়ন-কারী হইলে নির্ব্বাচন (Election) দ্বারা স্থির করা অত্যন্ত সুফলজনক হয়। সাধারণতঃ, স্বভাবতঃ ইংলণ্ড প্রভৃতি রাজ্যে যাহা হইয়া আসিয়াছে, এই পার্লিয়ামেণ্টই এ কার্য্যে উপযুক্ত বলিয়া বোধ হয়। অতএব অতি পুরাতন কালে সময় সময় এই নির্ব্বাচন কথার উল্লেখ থাকায় বোধ হয় জাতীয় সমিতি প্রকারের কিছু একটা থাকিবার সম্ভাবনা। কিন্তু এই ১২ শত বৎসরের ঐতিহাসিক (যাহাকে প্রকৃত হিসাবে এরূপ ধরা যায়) ঘটনাবলীতে এরূপ কোনও কিছুর বর্ত্তমান থাকিবার প্রমাণ লক্ষিত হয় না। ইহা হইতেই মনে হয়, বহু পূর্ব্বে থাকিলেও ইহা (Council of Princes or noblemen) অভিজাত ব্যক্তিগণের মন্ত্রণা সমিতির ন্যায় কিছু একটা ছিল। লোক-সাধারণ প্রকৃত হিসাবে রাষ্ট্রীয় নীতি ব্যাপারে শিক্ষিত হয় নাই। ব্যাঘ্র মানুষের রক্তের আস্বাদন পাইলে যেমন তাহা বিস্মৃত হইতে পারে না, লোকসাধারণ (Demos, or the People) একবার এই রাজ্যসংক্রান্ত ব্যাপারে (State affairs) নিজেদের ক্ষমতা বুঝিতে পারিলে কিছুতেই তাহার ব্যবহার না করিয়া থাকিতে পারে না।

(২) মুসলমান যুগ।

কালক্রমে হিন্দুর সৌভাগ্য-সূর্য্য অস্তমিত হইল, যুদ্ধকোলাহল, বিদ্রোহ ও বিপ্লবের মধ্য

দিয়া হিন্দুস্থানে মুসলমানের সৌভাগ্য সূর্য্যোদয় হইল। হিন্দুদিগের পতনের প্রধান কারণ তাহাদের অনৈক্য। মুসলমানের তূর্য্যধ্বনি যখন গৃহদ্বারে শ্রুত হইতেছে তখনও হিন্দুগণ গৃহাভ্যন্তরে কলহপরায়ণ। সুলতান মামুদের ক্রমাগত আক্রমণে হিন্দুগণ নিস্তেজ হইয়া পড়িয়াছিল, কাহারও কাহারও মনে বোধ হয় আশা হইয়াছিল, তাহারা এই প্রকার লুণ্ঠনোদ্দেশ্যেই ভারতবর্ষের প্রতি আক্রমণ করিতেছে, কাজেই জাতীয় জীবন রক্ষার জন্য সংগ্রামের কোনও প্রয়োজন নাই। আর কে বা মনে করিবে, হিন্দুস্থানের সীমানার বাহিরে প্রতিষ্ঠিত ক্ষুদ্র ঘোর রাজ্য হইতেই বিশাল হিন্দুস্থানের পরাজয়, কে ভাবিবে ভাটিন্ডার যুদ্ধক্ষেত্র বৈদেশিক বিধর্ম্মীকে ভারতের রাজধানী ইন্দ্রপ্রস্থের পথ উন্মুক্ত করিয়া দিবে? কিন্তু সব শেষ হইল, থানেশ্বর ক্ষেত্র হিন্দুগণের আশার শ্মশান-ভূমিতে পরিণত হইল। রোমীয়েরা যখন গ্রীস অধিকার করিয়া লয়, তখনও প্রায় এই প্রকার দশাই হইয়াছিল। গ্রীস চিরকালই বিভিন্ন শাখার ভিন্ন ভিন্ন রাজগণের মধ্যে বিভক্ত এথেন্স ও স্পারটা সময় সময় প্রাধান্য স্থাপন করিলেও তাহা দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় নাই। রোমের দৃষ্টি যখন তাহার দিকে পতিত, তখন ভিন্ন ভিন্ন লিগ্‌ (League) ও জাতি পরস্পরের মধ্যে অক্ষম প্রাধান্য লাভের জন্য ব্যস্ত। কনোজরাজ জয়চাঁদের ন্যায় ইটোলিয়ান লিগ্‌ স্বার্থসিদ্ধির জন্য এই রোমীয়গণের সহিত যোগদান করে। এদিকে গ্রীসের পৃথ্বিরাজ ফিলিপ বার বার বল পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হয়, কিন্তু জয়লক্ষ্মী পরিশেষে রোমীয়দের প্রতিই প্রসন্ন হন। মুসলমানদের ভারতবর্ষ অধিকার করিবার দ্বিতীয় সুবিধা হিন্দুগণের জাতীয় সৈন্যের অভাব। জাতীয় সৈন্য, অর্থোপার্জ্জনে নিযুক্ত কোনও বিশেষ রাজা বা শাসনের অধীন সৈন্যদলকে ঠিক বলা যায় না। রাজপুতনায় এই জাতীয় সৈন্যদলের অস্তিত্বের ভাব ছিল, বৈদেশিক শত্রুর দ্বারা আক্রান্ত হইলে শিশু ও স্ত্রী ব্যতীত সকলেই যুদ্ধক্ষেত্রে অগ্রসর হইতে পারিত। আজকাল যেমন Volunteer, territorial প্রভৃতি সৈন্য আছে, স্বদেশ রক্ষার্থ সেরূপ সেনাদলের অভাবই পরিলক্ষিত হয়। 'ডেন'দের আক্রমণের সময় ইংলণ্ডে ফার্ড (Fyrd) জাতীয় সৈন্য-দল সংগঠিত হইয়াছিল, এলিজাবেথের সময় দলে দলে স্পেনীয় আক্রমণ হইতে ইংলণ্ড রক্ষা করিতে এইরূপ সৈন্য সংগ্রহ হইয়াছিল, ফ্রান্সে Revolution জাত প্রজাতন্ত্রকে রক্ষা করিতে এই প্রকার Citizen Army সংগ্রহ করা হইয়াছিল। নেপোলিয়নের আক্রমণের পর জর্ম্মাণীতে দেশশুদ্ধ লোককে রীতিমত পাকা সৈন্যদলে প্রবর্ত্তিত করিবার চেষ্টাই পরে Conscription Law বা বাধ্যতা-মূলক যুদ্ধ বিদ্যাশিক্ষার নিয়মে পরিণত হয়। অবশ্য এই সমস্ত ব্যবস্থার মূলে জাতীয় ভাব অবস্থিত ও এই জাতীয় ভাবেরই অভাব তখন সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান অভাব। পার্ব্বত্য-প্রদেশ হইতে আগত, শক্তিশালী, 'কাফেরের' বিরুদ্ধে উত্তেজিত, আল্লার "পবিত্র" ধর্ম্মের বর্ম্মের দ্বারা আচ্ছাদিত, মহম্মদ ঘোরীর ন্যায় বীর ও সহিষ্ণু নেতার দ্বারা পরিচালিত ও অনুপ্রাণিত সৈন্যদের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হিন্দুগণের পরাজয় অনিবার্য্য।

এই মুসলমানদিগের আক্রমণে ও পরিশেষে তাহাদের এই দেশ অধিকারে রাজনৈতিক হিসাবে একটী শুভ লক্ষণের সূচনা

হইয়াছিল। দেশকে বৈদেশিকের হস্ত হইতে রক্ষা করিতে হইলে যে আন্দোলন, চেষ্টা ও ঐক্যসাধনের নিমিত্ত যত্নের প্রয়োজন, উহাতে জনসাধারণের মধ্যে জাতীয়তার (Nationality) ভাব জাগিয়া উঠে। সাধারণ শত্রুর সম্মুখে এই প্রকার ভাব উত্থিত হওয়ার প্রমাণ পৃথিবীর প্রায় প্রত্যেক দেশেই পাওয়া যায়। "Peoples who have had little intercourse except by fighting with one another rarely unite heartily unless they have some common enemy to word off"—(Gardiner 56) অষ্টম শতাব্দীতে ইংলণ্ডেও এই প্রকার অনেক রাজ্য ছিল—ডেনীয়দের আক্রমণ হইতে দেশ রক্ষার নিমিত্ত এই প্রকার চেষ্টা ও যত্নের ফলে তথায় এক সাম্রাজ্য স্থাপন হইয়াছিল, ওয়েসেক্সের আধিপত্যস্থাপনের সুযোগ প্রদান করিয়াছিল। ভারতে মুসলমান আগমনেও তদ্রূপ হিন্দুগণের মধ্যে নিজেদের ধর্ম্ম ও বিশেষত্ব রক্ষার নিমিত্ত চেষ্টার আরম্ভ হয়, মনে হয় ইহারই ফলে রাজপুতগণ একত্র হইয়া স্বাধীনতা রক্ষার জন্য অতদিন টিকিয়া থাকিতে পারিয়াছিল, ইহারই ফলে শিবাজী দীন দুনিয়ার মালিক মোগল সম্রাটের বিপক্ষে দণ্ডায়মান হইয়া কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন। এই প্রকার দুইটী বিভিন্ন জাতি পরস্পরের সম্মুখীন হইয়া কিছুদিন ছিল, সময়ে উদারনৈতিক সম্রাটগণের ঐকান্তিক যত্নে দুই জাতির মধ্যে মিলন সঙ্ঘটন করিবার চেষ্টা হয়। মহানুভব আকবর ইহার প্রধান সহকারী। বিজয়ী জাতির বিশেষ অধিকারের লোপ করিয়া তিনি এক মহান ভারতীয় জাতীয়তার সৃষ্টি করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাঁহারই উদারনীতির ফলে হিন্দুগণের বাধা প্রদান প্রবল হইয়া উঠিতে পারে নাই। মুসলমান সাম্রাজ্য ভারতের একছত্র আধিপত্য লাভ করিতে পারে নাই, একবার প্রায় লাভ করিয়াও রাখিতে পারে নাই—ইহার কারণও ঐ এক। আকবর, শাহজাহান প্রভৃতি সম্রাটগণের সময় মোগল সাম্রাজ্যের অক্ষেয়ত্বের ভাব, আওরাঙ্গজীবের সময় শিবাজীর ও রাজপুতগণের কৃতকার্য্যতা দ্বারা বিনষ্ট হয়। পরে চারিদিকেই বিদ্রোহাগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া পড়ে। ইংরাজদিগের আগমনের সময় মুসলমান ও হিন্দু উভয়েই ভারতবাসী বলিয়া পরিগণিত হইলেও উভয়ের মধ্যে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সমানতা জনিত মিত্রতা জন্মে নাই। বহিঃশত্রুরূপে ইংরাজগণ ভারতবর্ষ আক্রমণ করিলে 'ভারতবর্ষের' অস্তিত্ব রক্ষা করিবার জন্য এই উভয় জাতি চিরকালের জন্য এক হইয়া যাইত, কিন্তু তাহা করিতে হয় নাই বলিয়াই এখনও সম্পূর্ণরূপে এক হইতে পারে নাই।

মোগল সম্রাটগণের বিরাট ভ্রম সমস্ত ভারতবাসীগণকে মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত করিবার নিমিত্ত প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ চেষ্টা। পৃথিবীর সভ্যতার প্রারম্ভে যে জাতি সভ্য বলিয়া পরিগণিত, ইতিহাসের প্রথম পত্রেই যাহার বেদের উল্লেখ, সেই জাতির ধর্ম্মকে পদদলিত করা বাতুলের প্রয়াস মাত্র। এই ধর্ম্মজনিত বিদ্বেষই পাঠান ও মোগল উভয় সাম্রাজ্যেরই পতনে বিশেষ উল্লেখযোগ্য কারণের মধ্যে পরিগণিত।

রাজ্যশাসন প্রণালীর মধ্যে সম্রাটের ব্যক্তিগত প্রভাবই প্রধান, তিনি কোরাণের বিধি অনুসারে দেশ শাসন করিতে বাধ্য ছিলেন, কিন্তু কোরাণের বিধি তিনি

ইচ্ছানুরূপ ব্যাখ্যা করিয়া লইলে কাহারও প্রতিবাদ করিবার ক্ষমতা ছিল না। এই প্রকার শাসনবিধিকে Absolute Monarchy বলা হইয়া থাকে। সম্রাট সমস্ত বিষয়েই হস্তক্ষেপ করিতে পারিতেন। কিন্তু রাজ্যশাসন বিষয়ে এক ব্যক্তির যতই প্রতিপত্তি বেশী হয়, ততই অন্যায় ও অত্যাচারের সুবিধা হইয়া থাকে। এই ভাগ্যবান পুরুষ অত্যন্ত কর্ম্মঠ ও কর্ম্মকুশল হইলেও এক বিরাট সাম্রাজ্যের সর্ব্ববিধ ব্যাপার রক্ষা করিতে পারেন না, নির্ব্বাচিত কিম্বা মনোনীত মণ্ডলীর প্রতি এই দায়িত্ব-ভার অর্পণ করিলেই সুশাসনের সুবিধা হয়। যাহাতে কাহারও প্রতি অবিচার হইলে সে অবাধে সম্রাটের নিকট স্বীয় অনুযোগ জ্ঞাপন করিতে পারে, এই উদ্দেশ্যে সম্রাট জাহাঙ্গীর প্রাচীর গাত্রে সঙ্কেতসূচক রজ্জুর অগ্রভাগ বিলম্বিত করিতে পারেন, কিন্তু এক সামান্য প্রহরী অনুযোগকারীর আগমনে বাধা প্রদান করিয়া সমস্ত পণ্ড করিয়া দিতে পারে। আবার ইহাতে বিপদও আছে, কেবলমাত্র কোনও সম্রাটবিশেষের নহে, সম্রাট পদেরও। যদি সকল বিষয়ে মোগলসম্রাটকে বিব্রত করা যায়, তাহা হইলে সম্রাটের সম্রাট বলিয়া যে এক অজ্ঞাত প্রতিপত্তি আছে, তাহা শীঘ্রই বিনষ্ট হইবার আশঙ্কা থাকে। সমস্ত প্রজা যদি বুঝিতে পারে, সম্রাট তাহাদেরই ন্যায় একজন, তবে তাহার বিরুদ্ধে বিদ্রোহের সময় বিশেষ পশ্চাৎপদ হয় না। মোগল-সাম্রাজ্যের পতনের সময় সমস্ত প্রজা যখন বুঝিতে পারিল যে, এক হাসান আলির ইচ্ছাক্রমে সম্রাটের উত্থান ও পতন হইতে পারে, তখন 'দীল দুনিয়ার' মালিক বলিয়া মোগলের অধীশ্বরের প্রতি একটা সম্ভ্রম ও ভয় একেবারে লোপ হইবে, তাহাতে আশ্চর্য্যের কথা কিছুই নাই। ১৭০৭ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৭৩৯ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে দিল্লীর মসনদে ৭।৮ জন আরোহণ করিয়াছিলেন—মানুষের মনে অবিলম্বে দিল্লীর সম্রাট ক্রীড়াপুত্তলিকা বলিয়া বোধ হইল, ও অবিলম্বে ভারতবর্ষের প্রাধান্যলাভের জন্য চেষ্টা আরম্ভ হইল। মাহারাট্টা, ইংরাজ ও ফরাসী-অসি ঝনাৎকার করিয়া উঠিল, দেশে অশান্তির উদয় হইল, ষড়যন্ত্রেও বিশ্বাসঘাতকতা সর্ব্বত্রই আরম্ভ হইল।

(৩) ইংরাজ যুগ।

বাণিজ্য সম্বন্ধে যাহাই হউক, ইংরাজ-দিগের প্রথম হইতেই এ দেশে সাম্রাজ্য-স্থাপনের কোনও পূর্ব্বকল্পিত আয়োজন ছিল না বলিয়াই বোধ হয়। অনেক ছাত্রদিগের নিকট শুনিতে পাই, ইংরাজগণের ভারতবর্ষে অধিষ্ঠান "সূঁচরূপে প্রবেশ ও ফালরূপে অধিষ্ঠানের" উৎকৃষ্ট উদাহরণ। কিন্তু সম্যক্‌-রূপে ইতিহাস পাঠ করিলে মনে হয়, প্রথমতঃ সাম্রাজ্যস্থাপনের চেষ্টা করিয়া ইংরাজ এ দেশে আসে নাই। দেশব্যাপী অশান্তির মধ্যে নিজেদের বাণিজ্য যাহাতে অক্ষুণ্ণ থাকে, সেই চেষ্টাতেই তাহাদিগকে দুর্গনির্ম্মাণ, সৈন্য গঠন প্রভৃতি কার্য্যে মনোযোগী হইতে হয়। পরে ফরাসীদের ভারতীয় রাজনৈতিক ব্যাপারে হস্তক্ষেপ ও মাহারাট্টাগণের আধিপত্যের অভ্যন্তরে স্থায়ীত্বের কোনও চিহ্ন না দেখিয়া আপনাদের প্রতিপত্তি রক্ষার নিমিত্ত তাহা-দিগকে যুদ্ধবিগ্রহে জড়িত হইতে হয়, তৎপর তাহাদিগের ক্রমোন্নতি সাধারণ ইতিহাসের জ্ঞাতব্য।

নিয়মতন্ত্রের হিসাবে প্রথমেই মনে হয়, ইংলণ্ডীয় গবর্ণমেণ্টের কোম্পানির ব্যাপার

ক্রমে ক্রমে অধিক পরিমাণে আয়ত্তাধীন-করণের কথা। রেগুলেটিং এক্ট, ও সনন্দ-পরিবর্ত্তনের পরে, ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে মহারাণীর ঘোষণা বণিকসম্প্রদায়ের নিকট হইতে ভারতবর্ষ ইংলণ্ডের পার্লিয়ামেণ্টের অধীনে আনয়নপূর্ব্বক যে রাজনৈতিক যুগান্তর আনয়ন করিয়াছে, বর্ত্তমান রাজনৈতিক যুগই তাহারই উপসংহার। এই ঘোষণায় সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ঘটনা ইংলণ্ডের সহিত প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ স্থাপন। ইংলণ্ড যাহাই হউক, তাহার প্রকৃতিগত স্বাধীনতার বীজ যে দেশেই হউক অল্প বিস্তর বিক্ষিপ্ত না করিয়া থাকিতে পারিবে না। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে আরম্ভ করিয়া উনবিংশ শতাব্দীর সিপাহী বিদ্রোহের শেষ পর্য্যন্ত ইতিহাস, তৎপরবর্ত্তী সময় হইতে বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত ইতিহাসের সহিত তুলনা করিলে ইহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে। এই ৬০ বৎসরে রাজনৈতিক হিসাবে আমাদের দেশের আশ্চর্য্যরূপ পরিবর্ত্তন হইয়াছে। প্রথম পরিবর্ত্তন আমাদের লোকসাধারণের। পূর্ব্ব ইতিহাস পাঠে মনে হয়, জনসাধারণ যেন নিশ্চল, প্রাণহীন। তাহারা তাহাদের গ্রামের ও সমাজের বাহিরের অন্য কোনও বিষয়ের সন্ধান রাখিবার প্রয়োজন বোধই করে নাই। এই শান্ত, ধীর, রক্ষণশীল শ্রেণীকে নূতন প্রণালীতে শিক্ষিত করিবার, ভারতবাসীর জাতীয় অধিকার শিক্ষা দিবার কেহই ছিল না। বেণ্টিঙ্কের সময় হইতেই ইহার আরম্ভ হয়, ও ডালহাউসির সময়ে রেলওয়ে, টেলিগ্রাফ ইত্যাদির দ্বারা ইহার সহায়তা হয়। ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে উড্ সাহেবের ডেস্প্যাচে আমাদের দেশে অভিনব শিক্ষাপ্রণালীর যে ভিত্তি স্থাপিত হয়, উত্তরোত্তর তাহারই উন্নতি সাধন হইতেছে। "জাতি ধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে সকলকেই গবর্ণমেণ্টের আফিসে ও স্কুলে স্থান দেওয়া হইবে"---ভারতবর্ষের পক্ষে ইহাই অসাধারণ রাষ্ট্রবিপ্লবকর ঘটনা। এই এক সামান্য বাক্যের সহিত আমাদের বর্ত্তমান চেষ্টা, যত্ন, পৃথিবীর মধ্যে জাতি বলিয়া পরিগণিত হইবার উদ্যম মিশ্রিত রহিয়াছে। কোনও জাতির (People) অংশ মাত্র উন্নত ও শিক্ষিত হইলে সে দেশের স্বাধীনতা চিরস্থায়ী হয় না, কিম্বা তাহার মহত্ত্ব প্রকাশ পায় না। অবশ্য এরূপ বলা যাইতে পারে না, দেশ স্বাধীন হইলেই তাহার লোকসাধারণ সমস্তই পণ্ডিত হইয়া বিচার করিতে আরম্ভ করিবে—জাতিগঠন ও উন্নতির জন্য প্রথম প্রয়োজন তুল্য অধিকার। (Equal rights) প্রাচীন গ্রীসে স্পার্টা-রাজ্যে প্রায় আমাদের দেশের মতই জাতি-ভেদ ও তাহার সহিত অধিকার-ভেদ ছিল, হেলট-(Helot)গণকে এত প্রকার অধিকার হইতে বঞ্চিত করা হইয়াছিল যে, বর্ত্তমানে উৎপীড়িত জাতি বা শ্রেণীকে "হেলট" বলিয়া অভিহিত করা হইয়া থাকে। এই হেলট ও স্পার্টান ভেদে সে দেশের যে কত অশান্তি ঘটাইয়াছিল, তাহা ইতিহাসজ্ঞ সকলেই জ্ঞাত। আমার মনে হয়, এই প্রভেদই Spartaর গ্রীসে প্রাধান্যলাভের প্রধান অন্তরায়। ফ্রান্সে তৃতীয় শ্রেণীকে (Tiers Etat or Third Estate) পদদলিত করিয়া রাখিয়া রাজা, ও অভিজাত ব্যক্তিগণ—(Nobility) ১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দে যে বিষম বিপ্লব আনয়ন করিয়াছিল, তাহাও ইহাই প্রমাণ করিতেছে। সময়ের প্রভাবে পৃথিবীতে দেশে এমন একটা ভাব আসে, যখন শত চেষ্টাতেও জনসাধারণকে তাহার পুরাতন

গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ করিয়া রাখা যায় না। ইংলণ্ডের ১৬৪১ খ্রীষ্টাব্দের বিদ্রোহ ও ১৬৮৮ খ্রীষ্টাব্দের বিপ্লব উভয়েই এই সিদ্ধান্তের সাক্ষ্য প্রদান করিয়া থাকে। ইংরাজ-রাজ ইংলণ্ডের সহিত ভারতবর্ষের প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ স্থাপনের প্রারম্ভেই এই সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতার মৌলিক নীতি ঘোষণা করিয়া প্রকৃত বিচক্ষণতার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। কথা-প্রসঙ্গে আর একটী বিষয়েরও অবতারণা করা যাইতে পারে। আমাদের দেশের অভ্যন্তরে আমাদের যেরূপ তুল্য অধিকার আছে, দেশের বাহিরেও সেরূপ ইংরাজ প্রজার তুল্য অধিকার পাইবার সময় আসিয়াছে। অন্যান্য দেশের সহিত আমাদের আদান প্রদানের সম্বন্ধ বৃদ্ধি হওয়াতে ইহার প্রয়োজনীয়তা বোধ হইতেছে। রোমীয় রাষ্ট্রীয় অধিকার (Rights of Citizenship) প্রথমতঃ অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ ছিল—রোমের প্রথম অবস্থায় ইহাতে কোনও ক্ষতি হয় নাই। কিন্তু ক্রমে যখন রোম তাহার ক্ষুদ্র সীমার বাহিরে আসিয়া বিস্তৃত রাজ্য স্থাপন করিল, তখন তাহার এই সঙ্কীর্ণতা পরিত্যাগ করা অনিবার্য্য হইয়া পড়িল। কার্য্যতঃ পরাধীন থাকিলেও লোক তাহা স্বীকার করিতে চায় না, কাজেই রোম অন্যান্য প্রদেশ (Provinces) জয় করার পর তাহাদিগকে সন্তুষ্ট রাখিবার জন্য ক্রমে ক্রমে ইহা প্রদান করিতে বাধ্য হইয়াছিল। ইচ্ছা করিয়া, শুভ ইচ্ছায় প্রণোদিত হইয়া একদিন সে সমস্ত লিখিয়া পড়িয়া দিল, অবশ্য এরূপ নহে, ইহার জন্য অনেক অশান্তি তাহাকে ভোগ করিতে হইয়াছিল। বিচক্ষণ রাজনৈতিকের কর্ত্তব্য সময়ের প্রয়োজন বুঝিয়া লোকসাধারণকে তদুপযোগী অধিকার প্রদান করা, ইহা না করিলেই অমঙ্গল ঘটিয়া থাকে। Imperial Conferenceএ ইহার চেষ্টা হইতেছে, ইহার সফল হইলেই শুভ।

"আইনের নিকট সব সমান", ইহা লিখিত থাকিলেও কার্য্যতঃ তাহা পালন করা হয় কি না, তাহা বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমার বক্তব্য বিষয় নহে। সাধারণ ঐতিহাসিকের নিকট ঐ নীতির প্রয়োজনীয়তা গবর্ণমেণ্ট স্বীকার করিলেই একটা প্রধান ঘটনা বলিয়া বিবেচ্য। এই মূল মন্ত্রকে ভিত্তি জ্ঞান করিয়া আমাদের অধিকার লাভের চেষ্টা করিলে দেখা যাইবে, ইহার উপর কতটা নির্ভর করিতেছে। তবে মোটামুটি বিচার করিয়া দেখিলে এ বিষয়ে গবর্ণমেণ্ট কাজে ততটা করেন নাই বলিয়াই মনে হয়। বর্ত্তমান ভারতসচিব ও রাজপ্রতিনিধির মত সম্পূর্ণ ইহার অনুকূল বলিয়া ঘোষণা করিলেও এখনও অনেক মহাপ্রভু আছেন, যাঁহারা মনে করেন, ভারতবর্ষে ইংরাজ শাসন স্থায়ী করিতে হইলে জনসাধারণকে অজ্ঞানান্ধকারে নিমজ্জিত রাখা ও ধর্ম্মবিদ্বেষ প্রভৃতির প্রশ্রয় দেওয়া উচিত *।

পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে, কোনও গবর্ণমেণ্ট স্থায়ী করিতে হইলে জনসাধারণের দেশের ব্যাপারে হাত রাখা কর্ত্তব্য। লোককে অনাসক্ত বা উদাসীন (indifferent)

---

* জনৈক ইংরাজ Historian's History of the World নামক পুস্তকে এই মত প্রকাশ করিয়াছেন—"The security of British rule in India rests on the antagonism between the various races and religious sects of the country, upon the indifferentism of the mass of the people and upon the loyalty of the chief fighting races of the North-West which is calculated to stand anything short of an extra-ordinary strain."

করিয়া রাখিলে বিপদের সময় তাহার নিকট সাহায্য প্রার্থনা বিফল হইয়া থাকে। যতদিন সাধারণ ব্যক্তিগণ না বুঝিবে, কোনও শাসন-প্রণালীর মঙ্গলে তাহাদের মঙ্গল, যতদিন না বুঝিবে, দেশের বিপদে তাহাদের বিপদ, দেশের যশে তাহাদেরই যশ, দেশের অখ্যাতি তাহাদেরই অখ্যাতি, ততদিন সে শাসন প্রণালী অকৃতকার্য্য ও অক্ষম বলিয়াই গণ্য হইবে। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সমতা, শিক্ষা প্রভৃতি প্রথমতঃ স্বেচ্ছায় প্রদান করিয়াও ইংরাজ গবর্ণমেন্ট প্রথমতঃ অত্যন্ত অবিশ্বাসের সহিত অগ্রসর হইয়াছিল, যাহা দান করা হইয়াছিল, তাহা কি ভাবে দেওয়া উচিত, সে সম্বন্ধে সাধারণের মতামত গ্রহণ করা হয় নাই। ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দের Indian Councils Act এর সময় হইতে বিগত Minto-Morley Scheme পর্য্যন্ত এই অবিশ্বাসের চিহ্ন বর্ত্তমান *। ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দের পর এই অবিশ্বাসমূলক শাসননীতি পরিবর্ত্তনের কিঞ্চিৎ পরিমাণে সূচনা হয়, ও তৎপর নানা প্রকার ভাগ্যপরিবর্ত্তনের সহিত ক্রমে অপেক্ষাকৃত উন্নত পন্থার প্রচলন কেবল মাত্র আরম্ভ হইয়াছে—ভবিষ্যৎ অজ্ঞাত।

প্রাচীন সভ্যতা প্রাচ্য রীতি নীতি আচার ব্যবহারের সম্মুখীন হইয়াছে, উভয়ের মিলনে ইচ্ছা করিলে এক অভিনব উন্নত জাতির (Nation) উৎপত্তি হইতে পারে, ইংলণ্ডের শুভ ইচ্ছা থাকিলে উপযুক্ত সময়ও উপস্থিত। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, বিষয় অনেক, Political ও Constitutional দিক হইতে ইতিহাস চর্চ্চার জন্য সুধীগণের মনোযোগ আকর্ষণ করাই আমার উদ্দেশ্য মাত্র।

সমাপ্ত।

শ্রীবিনয়ভূষণ মজুমদার।

বাচস্পতি ও মণ্ডনমিশ্র।

ষড়্দর্শনের টীকাকার বাচস্পতি মিশ্রের নাম বিদ্বৎসমাজে সকলেরই সুপরিচিত। আচার্য্য শঙ্করের পরই ইঁহার স্থান। ইনি ন্যায়, বৈশেষিক, সাংখ্য, পাতঞ্জল ও মীমাংসা দর্শনের টীকা রচনার পর শেষে বেদান্তদর্শনের টীকা রচনা করেন। বেদান্তসূত্রের শঙ্করাচার্য্য কৃত ভাষ্যের টীকার নাম ভামতী। এই ভামতী টীকাই তাঁহার সর্ব্বোত্তম কীর্ত্তি। দর্শনের টীকা প্রবন্ধ, সমালোচনা ও ব্যাখ্যা একাধারে তিনই বলা যাইতে পারে। শঙ্কর ভাষ্যের উপর পরবর্ত্তী দার্শনিকেরা যে সকল দোষ দেখাইয়াছিলেন, যে সব আপত্তি উঠাইয়াছিলেন, সেই সমস্ত দোষের উদ্ধার, সেই সব আপত্তির উত্তরও এই টীকায় দৃষ্ট হয়। ভাষা বুঝিবার পক্ষে এই টীকা উত্তম সহায়। অনেক অল্পবিদ্য ব্যক্তি মল্লিনাথাদি টীকা দেখিয়া দার্শনিক টীকাকেও সেই শ্রেণীর মধ্যে গণনা করেন। ভাষ্য, টীকা, টীকার উপর টীকা, তার উপর টিপ্পনী, এইরূপে বহু মনীষীর নানা চিন্তা এক সূত্রে গ্রথিত হইয়া, তবে এক একটী দর্শনের সৃষ্টি হয়।

* "Much was done for the people, but in concert with them little was attempted. The steps taken in this direction during the Eighth decade mark a return to the more personal and human aspects of administration which before 1857 had been perhaps exclusively prominent." (H. H. W.)

ভামতী বাচস্পতি মিশ্রের পত্নীর নাম। বেদান্ত ভাষ্যের টীকাটির পত্নীর নামেই ভামতী এই নামকরণ হয়। আগ্রার তাজ যেমন সাহানসাহ বাদশাহের পত্নী-প্রেমের নিদর্শন, এই ভামতী টীকাও তদ্রূপ দরিদ্র ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের অসামান্য পত্নী-অনুরাগের নিদর্শন। ইহা নারীজাতির প্রতি সম্মানের এবং পত্নীর প্রতি শ্রদ্ধার সূচক।

উপনীত হইবার পর বাল্যাবস্থায় বাচস্পতির বিবাহ হইয়া যায়। পত্নী তখন অতি শিশু, ইহা বলাই বাহুল্য। ব্রাহ্মণ বালক বিদ্যাশিক্ষার্থ গুরুগৃহে প্রেরিত হইলেন ব্যাকরণ, সাহিত্য, বেদ, বেদান্ত, ন্যায় ও মীমাংসা প্রভৃতি শাস্ত্র অধ্যয়নে ত্রিংশৎ বৎসর বয়ঃক্রম হইয়া গেল। বিদ্যাশিক্ষাই জীবনের মূলমন্ত্র হইল। গ্রন্থই সংসার, বাদ বিতণ্ডাই আলাপ, শাস্ত্র চিন্তাই ক্রীড়া হইল। বিদ্যানুরাগী উৎসাহী ব্রাহ্মণ-বালকের পিতা মাতা তখন জীবিত নাই। শৈশব কালে বিবাহ করিয়া গিয়াছেন, সে কথা আর স্মরণেই নাই। বাচস্পতির সংসারে ফিরিবার মন দেখা দিল না। গুরুর মৃত্যু হইল। ছাত্রেরা বাচস্পতিকে উপযুক্ত দেখিয়া অধ্যাপকের আসনে বসাইল। অধ্যয়নের সহিত অধ্যাপনা মিলিল। বাচস্পতির দিনগুলি সেই আনন্দের উন্মাদনায় কাটিয়া যাইতে লাগিল। এক একটী দর্শনের টীকা রচিত হইতে লাগিল সারা দেশের মধ্যে একটী জয় জয়কার পড়িতে লাগিল।

এদিকে পিত্রালয়ে বাচস্পতির বালিকা-বধূ যৌবনে পা দিলেন। সকলেই প্রত্যাশা করিতে লাগিলেন, বাচস্পতি আসিবেন। বধূ মনের দুঃখে পিত্রালয়ে দিন কাটাইতে লাগিল। পতির কোন সংবাদই নাই, ফিরিবার কোন লক্ষণই দেখা যাইতেছে না। আহা অভাগিনী পরিপূর্ণ যৌবন ভার লইয়া কত রাত্রি স্বামীর প্রত্যাগমনের ভরসায় বসিয়া রহিল। যুবতী যৌবনের পুণ্যার্ঘ্য স্বামী পদে দিবার ভরসায় বড় সাধে সাজাইয়া রাখিল। কিন্তু কৈ, দেবতার পদে ত তাহা স্থান পাইল না। সঙ্গে সঙ্গে উচ্ছলিত রূপ-লাবণ্যের লহরীমালার সে তরতর সঙ্গীত আর নাই, আশাকুসুমগুলি হৃদয়-তরুতে ফুটিতে না ফুটিতে ভূমিতে ঝরিয়া পড়িলেও তাহা বলিবার কেহ নাই। সতী সাধ্বী যে সময়ে বিনিদ্র নয়নে পতি চিন্তায় রাত্রি কাটাইতেন, তাঁহার স্বামী হয়ত তখন দর্শনের সূক্ষ্ম তত্ত্বের মীমাংসা করিতেছেন।

বাচস্পতির দেশে বিদেশে যশের ভেরী বাজিয়া উঠিল। তাঁহার প্রণীত টীকাই ছাত্রেরা অধ্যয়ন আরম্ভ করিয়া দিল। বিদ্বৎ সমাজে তাহার যথেষ্ট সমাদর হইতে লাগিল। যৌবনের উৎসাহ উত্তেজনা বয়সের সঙ্গে ক্রমেই কমিতে আরম্ভ করিল। তখন তাঁর ইচ্ছা হইল, এইবার জন্মভূমিতে যাইয়া বাস করিবেন, সেইখানে বাস করিয়া ছাত্রগণকে অধ্যাপনা করাইবেন। আর বেদান্তদর্শনের টীকাটী সমাপ্ত করিবেন। পঞ্চাশৎ বর্ষ পরে বাচস্পতি বৃদ্ধ বয়সে নিজে গ্রামে ফিরিলেন।

মিশ্রপত্নী স্বামীর প্রত্যাগমনাশায় পিত্রালয়ে আর থাকিতে চাহিলেন না। ভাবিলেন, শ্বশুরের ভিটায়, পতি দেবতার গৃহমন্দিরে প্রদীপ জ্বলে না; এক্ষণে সেইখানে পড়িয়া থাকাই তাঁহার কর্ত্তব্য। মিশ্রপত্নী শেষে স্বামীর জন্মভূমিতে শ্বশুরের ভিটায় আসিয়া বাস করিলেন। মন্দিরে প্রত্যহ ধূপ ধুনা দিয়া প্রদীপ জ্বালিয়া সতী দেবতার দর্শনের অপেক্ষা করিতে থাকিল। শূন্য গৃহ সতী-

লক্ষ্মীর স্পর্শে হাসিয়া উঠিল। গ্রামের লোকে মিশ্রপত্নীকে সমাদর করিল। অভাব অভিযোগ পূর্ণ করিতে লাগিল।

পতির গৃহই সতীর দেবমন্দির, এ বোধ বিংশ শতাব্দীতেও একেবারে লোপ পাইয়াছে, এমন আমরা বলিতে পারি না। তবে সে সময়ের তুলনায় যে অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে, ইহা অস্বীকার করিতে পারি না। বাচস্পতি ছাত্রগণ সমভিব্যাহারে স্বগৃহে ফিরিয়া আসিলেন। ছাত্রেরা মিশ্র-পত্নীকে গুরুপত্নী বলিয়া জানিল, মায়ের মত সকলে তাঁহার পদে প্রণত হইল।

অধ্যাপনা চলিতে লাগিল। মিশ্র পত্নীর অনুরোধে ছাত্রেরা এ বিষয়ে গুরুর নিকট কোন প্রসঙ্গ তুলিল না। বাচস্পতি এক প্রকার বাহ্যজ্ঞানশূন্য পণ্ডিত। দিবা রাত্র অধ্যয়ন অধ্যাপনা আর টীকা রচনা। ছাত্রেরাই এতদিন বাচস্পতির স্ত্রী পুত্র আত্মীয় সেবকের কার্য্য করিয়া আসিয়াছে। সাংসারিক কোন ব্যাপারে তাঁর স্বাবলম্বন আদৌ ছিল না। স্নানাহ্নিক, আহার আর নিদ্রা, এইগুলিও, ছাত্রেরা না থাকিলে সম্পাদন হইত না।

মিশ্রপত্নী প্রত্যহ রন্ধন করেন, সংসারের সকল কার্য্য সমাধা করেন, কিন্তু স্বামীর সাক্ষাতে বাহির হন না। স্বামী ত শাস্ত্র লইয়াই উন্মত্ত। ছাত্রেরা রন্ধনাদি এখনও করে, বাচস্পতি ইহাই জানিতেন।

একদিন ছাত্রেরা সকলেই অনুপস্থিত। বাচস্পতি জানিতেন, তাঁহাকেই আজ পাক করিতে হইবে। কিন্তু পড়াশুনার নিয়মিত অভ্যাসবশতঃ সে কথা বিস্মৃত হইলেন, প্রাত্যহিক অভ্যাসানুযায়ী ভোজন স্থানে উপস্থিত হইয়া অন্ন ব্যঞ্জনাদি প্রস্তুত দেখিলেন। ছাত্রেরা কেহ ত বাড়ী নাই, কে রন্ধন করিল! মিশ্রপত্নী স্বামীর আহার কালে দ্বারের অন্তরালে দাঁড়াইয়া থাকিতেন, আজও ছিলেন। "কে রন্ধন করিয়াছে? না জানিলে ত আমি খাইতে পারি না।"

দেবতা উপবাসী থাকিবেন—কাজেই পত্নী কুণ্ঠিত ভাবে পতির সম্মুখে দেখা দিলেন। গললগ্নীকৃতবাসা সতী পতিপদে প্রণতা হইল। বাচস্পতি স্তম্ভিত, সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিলেন "কে তুমি"?

"আপনারই শ্রীচরণের দাসী", কুণ্ঠিতা পত্নী ধীরে ধীরে উত্তর দিল। "বাল্যকালে এ দাসীকে বিবাহ করিয়া যান।" অভিমানিনী নারীর চক্ষু দিয়া দর দর ধারে অশ্রু গড়িয়া পড়িল। কুয়াসা ভেদ করিয়া তপনপ্রভা যেমন ধীরে ধীরে পূর্ব্বাকাশে দেখা দেয়, বাচস্পতির চিত্তে পূর্ব্বস্মৃতি তেমনই ধীরে ধীরে ফুটিয়া উঠিল। দর্শনশাস্ত্রে বলে, উদ্বোধকারণ উপস্থিত হইলে পূর্ব্বজন্মের স্মৃতি পর্য্যন্ত চিত্তে উদিত হয়। বাচস্পতির মনঃপ্রাণ গভীর সহানুভূতিতে ভরিয়া গেল। অনুতাপে বেদনায় তাঁর নয়ন অশ্রুময় হইল। তিনি বলিলেন, "দেবি, না জানিয়া মহাপাপ করিয়াছি। আমার একদিনের জন্যও বিবাহের কথা মনে পড়ে নাই। ছিঃ! একটা জীবনের সুখ শান্তি নষ্ট করিয়া আপনার উন্নতি করিয়াছি। কি স্বার্থপর আমি! অপরাধী পতিকে মার্জ্জনা কর দেবি! এখন বল তোমার কি প্রার্থনা পূর্ণ করিব।

পতি ক্ষমাপ্রার্থী। সতীর অভিমান ভাসিয়া গেল। স্ত্রী স্বামীর নিকট যাহা চাহিবার, মিশ্রপত্নী তাহাই চাহিল। নারীর দাম্পত্য সুখ ত হইল না, একণে মাতৃজীবনের সাধ পূর্ণ করিতে চাহে। বাচস্পতি তখন

স্ত্রী..কে কহিলেন, "দেবি, এ বয়সে ত আর পুত্র জন্মিবার সম্ভাবনা নাই। তবে আমি তোমার নামে এমন একটী কিছু করিয়া যাইব, যাহাতে তোমার নাম জগতে বজায় থাকিবে, কখনও বিলুপ্ত হইবে না"।

এই বাচস্পতি মিশ্রই পূর্ব্বজন্মে মণ্ডন মিশ্র বা সুরেশ্বরাচার্য্য ছিলেন, তাহা বিশ্বাস করিবার কারণ আছে। আচার্য্য শঙ্কর মণ্ডন বা সুরেশ্বরাচার্য্যকে বর দিয়া যান যে, "তুমি পরজন্মে বাচস্পতি মিশ্ররূপে জন্মগ্রহণ করিয়া আমার ভাষ্যের টীকা লিখিবে; আর তাহাই দেশ-মান্য হইবে"।

আচার্য্য শঙ্কর ব্রহ্মসূত্র বা শারীরক সূত্রের ভাষ্য রচনা করিয়া প্রথম মণ্ডন বা সুরেশ্বরাচার্য্যকে তার টীকা রচনার ভারার্পণ করেন। ইহাতে পদ্মপাদাচার্য্য প্রভৃতি আচার্য্যের সকল শিষ্যই আন্তরিক দুঃখিত হন। মণ্ডন মিশ্র প্রথমে একজন বড় মীমাংসক ও নৈয়ায়িক পণ্ডিত ছিলেন, পরে শঙ্করের নিকট পরাজিত হইয়া তাঁহার শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়া, পরিশেষে বেদান্ত শাস্ত্র সম্যক্ অধ্যয়ন করেন। পদ্মপাদাচার্য্য প্রভৃতি গোড়া হইতে কেবল বেদান্ত-শাস্ত্রই অধ্যয়ন করিয়াছেন, এ হিসাবে উঁহারা খাঁটী বৈদান্তিক। পদ্মপাদাচার্য্য প্রভৃতি আচার্য্যের প্রথমাবস্থা হইতে শিষ্য, এবং সকলেই প্রায় সমবয়স্ক। মণ্ডন মিশ্র বয়সে শঙ্কর অপেক্ষা অনেক বড়। এই সকল কারণে সুরেশ্বর এক দলে, পদ্মপাদ প্রভৃতি অন্য দলে, এইরূপ একটী পার্থক্য ছিল। শিষ্যগণ সকলেই পদ্মপাদের অনুরাগী, সুরেশ্বরের কিঞ্চিৎ বিদ্বিষ্ট। মণ্ডন মিশ্রের নাম, সুরেশ্বরাচার্য্য, ইহা গুরু শঙ্করের প্রদত্ত। পদ্মপাদের পূর্ব্ব নাম ছিল সনন্দন। গুরু আজ্ঞায় নদীর উপর দিয়া অবলীলাক্রমে হাঁটিয়া পার হইয়া যান, আর সেই পদস্পর্শে শতদল থরে থরে ফুটিয়া উঠে বলিয়া গুরুর নিকট হইতে পদ্মপাদ আখ্যা লাভ করেন। পদ্মপাদই আচার্য্যের প্রিয়তম শিষ্য। টীকা রচনার ভার ইঁহারই উপর দেওয়া হইত। কিন্তু সুরেশ্বর একাধারে মীমাংসক, নৈয়ায়িক ও বৈদান্তিক বলিয়া আচার্য্য ইঁহার উপর টীকা রচনার ভার দিবেন, স্থির করিয়াছিলেন।

শিষ্যগণ আসিয়া গুরু চরণে নিবেদন করিলেন, "প্রভু, পদ্মপাদ্ আপনার কৃপা করিয়া আছে; সেই টীকা লিখিবে। আমরাও এতদিন তাহাই স্থির করিয়া আছি। পদ্মপাদকেই এই গৌরবের ভার দেন। সুরেশ্বর নৈয়ায়িক ও মীমাংসক; এখনই না হয় বৈদান্তিক হইয়াছেন। তাহার টীকার ন্যায় ও মীমাংসা দর্শনের উপর পক্ষপাত ফুটিবার সম্ভাবনা।"

আচার্য্য টীকা রচনা করিতে সুরেশ্বরকে বারণ করিয়া পদ্মপাদকেই উক্ত ভার দিলেন; সুরেশ্বরের প্রাণে অবশ্য কষ্ট হইল। সুরেশ্বর আপনার মনোবেদনার জন্য পাছে পদ্মপাদের টীকা সুপ্রতিষ্ঠিত না হয়, এই আশঙ্কায় আচার্য্যকে বিশেষ করিয়া টীকাটির উপর আশীর্ব্বাদ করিতে অনুরোধ করিয়াছিল। ভাষ্যের টীকাটী যাহাতে প্রতিষ্ঠিত হয়, সে সাদিচ্ছা প্রত্যেক শিষ্যেরই ছিল।

পদ্মপাদের টীকা রচনা শেষ হইল। এবং উহা অতি উৎকৃষ্টও হইল। একদা সনন্দন সেতুবন্ধ রামেশ্বর যাত্রা করিবার পথে মাতুলের বাটীতে একদিন অতিথি হন। মাতুল শঙ্করের বিরুদ্ধ সম্প্রদায়ভুক্ত দ্বৈতবাদী শৈব পণ্ডিত। বৌদ্ধ জৈন কাপালিক, এমন কি দ্বৈতবাদী শৈব ও দ্বৈতবাদী বৈষ্ণব প্রভৃতি সকল সম্প্রদায়ই শঙ্করের শত্রু।

শঙ্কর বিচারে সকল সম্প্রদায়কে পরাজিত করিয়াছিলেন বলিয়া তৎসম্প্রদায়ের কেহ কেহ শঙ্কর-বিদ্বেষী। পদ্মপাদ উক্ত টীকাখানি মাতুলকে দেখিতে দিয়া গচ্ছিত স্বরূপ তাঁহার নিকট রাখিয়া সেতুবন্ধ যাত্রা করিলেন। ফিরিবার সময়ে লইয়া যাইবেন স্থির হইল।

মাতুল উক্ত টীকাখানি নষ্ট করিতে কৃত সংকল্প হইলেন। ভাবিলেন "গুরু মত রক্ষা করাই শিষ্যের কর্ত্তব্য। ভাষ্য পাইলাম না, তবু টীকাখানি নষ্ট করিলে ত উক্ত মতের যথেষ্ট ক্ষতি হইবে; আর আমারও গুরু মতের কিছু উপকার হইবে। আমার পাপ হইবে, তা হউক। আমি গুরু মত রক্ষার জন্য নরকে যাইব, তাহাতে কি? আমার নিজের কষ্টই কি বড়?"

ব্রাহ্মণ আপনার হাতে গৃহে অগ্নি প্রদান করিলেন; পুথিখানি সঙ্গে করিয়া আপনাকে পর্য্যন্ত সেই অগ্নিতে আহুতি দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিয়া গেলেন। লোকনিন্দার ভয়, সনন্দনের কাছে মুখ দেখাইবার লজ্জা ও যে না হইয়াছিল, তাহা নহে। গুরু মত রক্ষা স্বধর্ম্মপালন। তজ্জন্য শৈব পণ্ডিত বিশ্বাসঘাতকতা পাপ অর্জ্জন করিতে কুণ্ঠিত হইলেন না; আর এ পাপের অগ্নি প্রবেশ প্রায়শ্চিত্তরূপ মৃত্যুদণ্ড লইতেও দ্বিধা করিলেন না।

এই গুরু মত রক্ষার জন্য কুমারিল ভট্ট ও উদয়নাচার্য্য মহাপাতক অর্জ্জন করিতে সঙ্কুচিত হন নাই। সনাতন ধর্ম্ম রক্ষা, সম্প্রদায় মত রক্ষা; ও গুরু পরম্পরা প্রচলিত মত রক্ষা, গুরু মত রক্ষার নামান্তর। কুমারিল ভট্ট ও উদয়নাচার্য্যের নাম ইতিহাসজ্ঞ পাঠক মাত্রেই অবগত আছেন। এই কুমারিলই বৌদ্ধ মত নিরাসের প্রথম সূত্রপাত করেন। প্রথম পথ প্রস্তুত ইঁহার দ্বারা হয়। কুমারিল বৌদ্ধ সন্ন্যাসীর নিকট জাল বৌদ্ধ সাজিয়া বৌদ্ধ দর্শন রীতিমত অধ্যয়ন করেন। তার পর তাহাদিগের সহিত বিচার আরম্ভ করেন।

কুমারিল যখন শুনিলেন যে, বৌদ্ধ নিরাসের জন্য শঙ্করাচার্য্য প্রাদুর্ভূত হইয়াছেন, তখন তিনি বিচারে ক্ষান্ত হইলেন। তাঁহার কার্য্য শেষ হইয়াছে, মনে করিলেন। তাঁর মনে গ্লানি জন্মিল এই যে, তিনি একদিকে যেমন গুরুপরম্পরা মত এবং সনাতন ধর্ম্ম রক্ষা করিতে যত্ন করিলেন, তেমনই আবার জাল বৌদ্ধ সাজারূপ প্রতারণা করিয়া গুরু-রূপে স্বীকৃত বৌদ্ধ সন্ন্যাসীগণকে ধ্বংস করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত অগ্নিতে প্রবেশ।

কুমারিল সংকল্প পূর্ব্বক অগ্নি প্রবেশে উদ্যুক্ত—এই সংবাদ শুনিয়া শঙ্কর চার্য্য তাঁহার নিকট আসিয়া বিচার প্রার্থনা করিলেন। বলিলেন "দেব, আপনি এক্ষণে দেশের মধ্যে বড় পণ্ডিত। বিচারে আপনাকে পরাজিত করিতে না পারিলে দেশে আমার সম্যক প্রতিষ্ঠার আশা নাই। আর এতদ্ভিন্ন কেহই আমার কথাই শুনিবে না। অতএব আমার সহিত বিচার করুন! জীবনের ব্রত আমাকে পালন করিতেই হইবে। আপনি আমার মনোদ্দেশ্য সাধনের সহায়তা করুন।"

কুমারিল তখন হাসিতে হাসিতে উত্তর দিলেন, "বৎস, আমি এক্ষণে অগ্নিপ্রবেশ রূপ প্রায়শ্চিত্ত করিবার সংকল্প করিয়াছি। বিচার করা সম্ভব নহে। তবে আমার প্রধান শিষ্য মণ্ডন মিশ্র আমা অপেক্ষাও পাণ্ডিত্যে বড় হইয়াছে, আর আমার অবর্ত্ত-মানে সেই একচ্ছত্র পত্রী হইবে। তাহাকে পরাজিত করিতে পারিলে তোমার অভিপ্রায়

সিদ্ধ হইবে। যাও বৎস, আশীর্ব্বাদ করি, তোমার জীবনের উদ্দেশ্য সফল হউক। সনাতন ধর্ম্মের বিঘ্ন দূর হউক।"

কুমারিল ভট্টই যে প্রথম বৌদ্ধ জয়ে যত্ন করেন, তাহার বিশিষ্ট প্রমাণ আছে। শঙ্করের সেই যত্ন সম্যক্ সফল হয়। কুমারিলের প্রস্তুত পথেই শঙ্কর প্রথম গমন করিয়া পশ্চাৎ নিজের অলৌকিক বিচার-শক্তির গুণে আধ্যাত্মিক বলের মাহাত্ম্যে বৌদ্ধ মত নিরাশ করেন। শঙ্করের বহুদিন পরে আবার নির্ব্বাপিত বৌদ্ধ মত বহ্নি একটু একটু করিয়া ধূমায়িত হইতেছিল। তখন কুসুমাঞ্জলিকার উদয়নাচার্য্য উত্থিত হইলেন। তিনি অগ্নির চিহ্ন পর্য্যন্ত লোপ করিয়া দিলেন। উদয়নাচার্য্যের বৌদ্ধ মত নিরাসের জাজ্বল্যমান নিদর্শন স্বরূপ তাঁহার গ্রন্থ অদ্যাপিও বিরাজিত আছে। বিচারে উদয়ন বৌদ্ধদিগকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করিলেও শেষে এখন জনকয়েক বৌদ্ধ পণ্ডিত দেখা গেল। যাঁহারা উদয়নের সহিত বিচার করিল না, সনাতন ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা মানিল না। উদয়ন এমন উপায় অবলম্বন করিলেন, যাহাতে তাঁহাদের অস্তিত্ব চিরদিনের মত বিলুপ্ত হইয়া গেল।

স্থির হইল, সশিষ্য উদয়ন ও তথাকথিত বৌদ্ধ পণ্ডিতগণ স্ব স্ব ধর্ম্মমতের দোহাই দিয়া শিব ও বুদ্ধের নাম লইয়া পর্ব্বতশৃঙ্গ হইতে লম্ফ দিবেন। যাঁহারা জীবিত রহিবেন, বুঝিতে হইবে, তাঁহাদের মতই সত্য, তাঁহাদের দেবতাই জাগ্রত। বৌদ্ধ সন্ন্যাসীগণ প্রাণ হারাইলেন। সশিষ্য উদয়ন জীবিত রহিলেন। বৌদ্ধগণ বলেন, উদয়নাচার্য্য দুষ্টামী করিয়া নিজেরা পড়েন নাই। আমাদের মনে হয়, ইহাই সত্য।

উদয়নের মনে বড় অনুতাপ আসিল। দুষ্টামী করুন বা নাই করুন, কয়েকজন ধর্ম্ম-পরায়ণ বৌদ্ধ পণ্ডিতের জীবন নাশের ত তিনি কারণ হইলেন। উদয়ন প্রায়শ্চিত্ত করিতে মতি স্থির করিবেন। প্রায়শ্চিত্তের পূর্ব্বে শ্রীক্ষেত্রে যাইয়া জগন্নাথ দর্শনে পাপ মোচন করিয়া আসিবেন, স্থির করিলেন। শ্রীক্ষেত্রে জগন্নাথদেবের মন্দিরে উদয়ন উপস্থিত হইবা-মাত্র মন্দিরের দ্বার পড়িয়া গেল। তখন উদয়ন জগন্নাথদেবকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন, "প্রভু, অপরে আমার উপর রুষ্ট হয় হউক; আপনি রুষ্ট হইতে পারেন না। আমি যদি পাপই করিয়া থাকি, তাহাও ত নিজের জন্য করি নাই; আপনারই জন্য করিয়াছি। আপনার রক্ষার জন্য, সনাতন ধর্ম্মের স্থিতির জন্য যাহা করিয়াছি, তাহাতে আমার ত ব্যক্তিগত স্বার্থ কিছু ছিল না। আপনি আমাকে দেখা দিতে বাধ্য। উদয়নোক্ত শ্লোকের শেষ ছত্র, "মদধীনা তব স্থিতিঃ" আপনার স্থিতি আমার অধীন।

শ্রীভগবানে কর্ম্মফল সমর্পণ পূর্ব্বক আপনার কর্ত্তৃত্ব ও অহঙ্কার বিসর্জ্জন দিয়া যে কর্ম্মই অনুষ্ঠিত হইবে, তাহাই নিষ্কাম। সে কর্ম্ম বন্ধনের কারণ হয় না। সে কর্ম্মের পাপ পুণ্য নাই, সৎকার্য্য হইলে চিত্তের পরিমার্জ্জনা করে। কুমারিল ভট্ট ও উদয়নাচার্য্যের কার্য্য এক হিসাবে অন্যায় কার্য্য বলা যাইলেও অন্য হিসাবে উহাকে নিষ্কাম কর্ম্ম বলা যাইতে পারে।

এই সেদিনও পূজ্যপাদ অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রাখালদাস ন্যায়রত্ন মহাশয়ের জীবনে শুরু মত রক্ষার তীব্র উন্মাদনা দেখিয়াছি। কাশীতে অদ্বৈতবাদ খণ্ডন লইয়া তখন মহা গণ্ডগোল উপস্থিত হইয়াছে। সুব্রহ্মণ্য শাস্ত্রী,

পরমানন্দ স্বামী (ভট্টপল্লী-নিবাসী কেশবচন্দ্র ভট্টাচার্য্য দণ্ড গ্রহণ করিয়া পরমানন্দ নাম গ্রহণ করেন) প্রভৃতি পণ্ডিতবর্গ ও দণ্ডী-সম্প্রদায় অদ্বৈতবাদ খণ্ডনের প্রতিবাদের জন্য দাঁড়াইয়াছেন।

একদিন কাশীবাসী হেরম্বঠাকুর মহাশয়ের ওখানে বসিয়া আছি। এমন সময়ে তিনি অদ্বৈতবাদ খণ্ডনের কথা পাড়িলেন। কথায় কথায় তিনি বলিলেন, "সুব্রহ্মণ্য শাস্ত্রী, পরমানন্দ স্বামী প্রভৃতি পণ্ডিত ও পরমহংস-গণ ন্যায়রত্নের নিকট একদিন একটী প্রস্তাব করিয়া পাঠান। ন্যায়রত্ন কিন্তু সেই ন্যায়-সঙ্গত প্রস্তাব কর্ণেই করিলেন না।

প্রস্তাবটী এই যে, ন্যায়রত্ন মহাশয় নৈয়ায়িক, ইহা ভুলিয়া, বেদান্তবিদ্বেষ ত্যাগ করিয়া এক বৎসর বেদান্ত দর্শন ও শঙ্করের ভাষ্য আলোচনা করুন। তার পর যদি সরল প্রাণে বিশ্বেশ্বর মন্দিরে আসিয়া সর্ব্ব-সমক্ষে প্রকাশ করেন, বেদান্ত মত যুক্তি-সিদ্ধ নহে, ভ্রান্ত, তাহা হইলে তাঁহার মতই সত্য বলিয়া স্বীকৃত হইবে।

হেরম্বঠাকুর মহাশয় ভট্টপল্লী-নিবাসী আমাদের পরমাত্মীয়। তিনি হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "দেখ, তুমি ত ন্যায়রত্ন মহাশয়ের কাছে প্রত্যহ পড়িতে যাও। আমাদের প্রস্তাবটী একবার করিয়া দেখিও।

আমি তখন ন্যায়রত্ন মহাশয়ের পদমূলে ন্যায়শাস্ত্র পাঠ আরম্ভ করিয়াছিলাম। একদিন হেরম্বঠাকুর মহাশয়ের প্রস্তাবটী অধ্যাপক মহোদয়ের নিকট ধীরে ধীরে ব্যক্ত করিলাম। তাহাতে ন্যায়রত্ন মহাশয় যে উত্তর দেন, তাহা বড়ই মিষ্ট, বড় সুন্দর!

"দেখ আমি নৈয়ায়িক। ৮২ বৎসর বয়স হইতে চলিল, আমি ন্যায়শাস্ত্র আলোচনা করিয়াছি। আমার যা কিছু সবই ঐ ন্যায়-শাস্ত্র প্রসাদাৎ। গুরুপরম্পরাগত ন্যায় মতই আমাদের উপজীব্য। বাঙ্গালী হইয়া বাঙ্গালার বিশিষ্ট গৌরব রক্ষা করা, নৈয়ায়িক হইয়া ন্যায় মত সমর্থন করা, নিজের ধর্ম্ম-বিশ্বাস অনুসারে চলা, আমি ধর্ম্ম ও কর্ত্তব্য বলিয়া জানি। গুরু মত রক্ষার জন্য শঙ্কর মত খণ্ডন করায় আমার উৎসাহ। অদ্বৈত-বাদ খণ্ডন যদি আমার অন্যায় কার্য্য হয়, তাহাও আমি করিতে বাধ্য। আজীবন যাহার সেবা করিয়া আসিলাম, যাহার স্তন্য-রসে এত বড় হইলাম, যাহার জন্য আমি এত বড় গৌরবের পাত্র দেশবিশ্রুত পণ্ডিত পদবী লাভ করিলাম, আর আজ এই জীবনের শেষ সময়ে উহা ত্যাগ করিব। এ ত্যাগ করার কল্পনাও আমার অসহ্য। আমি নৈয়ায়িক, ইহা ভুলিব না, বেদান্তবিদ্বেষও ত্যাগ করিব না। শঙ্কর ভাষ্য আলোচনা করিতে চাহি না। শুনিয়াছি, শঙ্করভাষ্যের কি মোহিনী শক্তি আছে, যে-ই পড়ে, তাহাকেই ভাসাইয়া লইয়া যায়, মুগ্ধ করিয়া ফেলে। আমি এ পরীক্ষা সঙ্কটে সাধ করিয়া কেন উপস্থিত হইব। আর যাহা সত্য, তাহাই ত বলিতে হইবে। কোন্ মত সত্য, তাহা শ্রীভগবান্ ব্যতীত কেন বলিবেন?"

কথায় কথায় অন্য কথায় আসিয়া পড়িয়াছি। তার পর সনন্দন সেতুবন্ধ রামেশ্বর হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া পুঁথি নষ্ট হওয়ার কথা শুনিলেন। সংসার-বিরাগী মহাত্মার হৃদয় পঞ্জর ভেদ করিয়া তীব্র দীর্ঘ নিঃশ্বাস বহির্গত হইল। সনন্দন ম্লানমুখে গুরুর নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলে, আচার্য্য তাহাকে প্রবোধ দিয়া কহিলেন, "বৎস, তুমি আমাকে কিয়দংশ একবার পড়াইয়া শুনাইয়া-

ছিলে। সে অংশটুকু আমার স্মরণ আছে, তুমি লিখিয়া লও।"

ব্রহ্মসূত্রের পাঁচটী পাদের টীকার উদ্ধার হইল। আমরা এতদিন বাঙ্গালী পরমহংস মধুসূদন সরস্বতী প্রণীত "অদ্বৈত সিদ্ধি" গ্রন্থে পঞ্চপাদিকা গ্রন্থের নামই শুনিয়া আসিয়াছি। গ্রন্থখানি পাওয়া যায় না, ইহাই জানিতাম। কিন্তু সম্প্রতি পঞ্চপাদিকা গ্রন্থখানি অসমাপ্ত আকারেই মুদ্রিত হইয়াছে।

আচার্য্য শঙ্কর সুরেশ্বরাচার্য্য বা মণ্ডন মিশ্রকে একান্তে ডাকিয়া কহিলেন, "বৎস, যাহা হইয়াছে, সবই শুনিলে। আমার বড় ক্ষোভ রহিয়া গেল, তুমি আমার টীকা লিখিতে পারিলে না। তোমারও জীবনের সাধ মিটিল না। আমি তোমাকে আশীর্ব্বাদ করিতেছি যে, পরজন্মে বাচস্পতি মিশ্ররূপে জন্মগ্রহণ করিয়া তুমি আমার ভাষ্যের টীকা লিখিবে। আর সেই টীকাই সর্ব্বজন-মান্য হইবে। সকল টীকার মধ্যে ঐ টীকারই অধিকতর প্রতিষ্ঠা হইবে।"

মণ্ডন ও বাচস্পতি উভয়ই মিশ্র। মণ্ডন প্রথম সংসারী, পশ্চাৎ সন্ন্যাসী। বাচস্পতিও প্রথম সংসারী, পরে এক প্রকার সন্ন্যাসী—ত্যাগী। মণ্ডনও প্রথম নৈয়ায়িক মীমাংসক ছিলেন, পরে বৈদান্তিক হন। বাচস্পতিও অপরাপর দর্শনের টীকা রচনা করিয়া শেষে বেদান্ত দর্শনের টীকা রচনা করেন। দুই-ই মহা পণ্ডিত, যশস্বী, দুইই দার্শনিক টীকাকার। (সুরেশ্বরাচার্য্যের প্রণীত বেদান্ত গ্রন্থ আছে)। মণ্ডন ও বাচস্পতির স্ত্রীভাগ্য সমানই। দুই জনের পত্নী শাপভ্রষ্টা দেবী, আদর্শ সতী-সাধ্বী। তুল্যরূপ যশস্বিনী। মণ্ডন পত্নীকে অভিশাপ দিয়া এক প্রকার পত্নীর মৃত্যুর কারণ হইয়াছিলেন। বাচস্পতিও ভামতীর সারাজীবন ব্যর্থ করিয়া দিয়া তাহার দুঃখের হেতু হইলেন।

শ্রীরামসহায় বেদান্তশাস্ত্রী

মানবদেহে ক্রমবিকাশের নিদর্শন

পাশ্চাত্য ক্রমবিকাশ-বিজ্ঞান মনুষ্যেই বিকাশের পূর্ণতা দেখিতে পাইয়াছে। মনুষ্য কিরূপে ক্রমবিকাশের ভিন্ন ভিন্ন অবস্থার মধ্য দিয়া বর্ত্তমান পূর্ণবিকাশে উপনীত হইয়াছে, তাহা পাশ্চাত্য বিজ্ঞান মনুষ্যাঙ্গের ক্রমপরিণতি পর্য্যবেক্ষণের দ্বারা আবিষ্কার করিয়াছে। আমাদের হিন্দু-দর্শন কিন্তু পূর্ণগঠিত মানবদেহেই ক্রমবিকাশের নিদর্শন আবিষ্কার করিতে পারিয়াছে। হিন্দুদর্শন মানবদেহের মধ্যেই ব্রহ্মাণ্ডের প্রতিবিম্ব দেখিতে পাইয়াছে। তাহাতেই এই কথাটী প্রচলিত হইয়াছে—"যাহা নাই ভাণ্ডে, তাহা নাই ব্রহ্মাণ্ডে।" কোন গ্রীক দার্শনিকও এক সময়ে বলিয়াছিলেন, "মনুষ্যই বিশ্বের মান" ("Man is the measure of the Universe".)।

হিন্দুদর্শন কেবল বাহ্য পরিণাম পর্য্যবেক্ষণ দ্বারা দেহতত্ত্ব নির্দ্ধারণ না করিয়া, সমগ্র জীবিত দেহের পূর্ণ বিশ্লেষণ দ্বারাই দেহতত্ত্ব নির্দ্ধারণ করিয়াছে। ইহাতে পূর্ণ জীবন বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠার প্রকৃত প্রণালীই আমরা অনুসৃত দেখিতে পাই।

উপনিষদেই আমরা এই বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের সন্ধান প্রাপ্ত হই। তৈত্তিরীয় উপনিষদে প্রথম দেহের বিশ্লেষণে ইহার পঞ্চাবরণের কথা পাওয়া যায়। ইহাদের সর্ব্ববাহ্যটী "অন্নময়" আবরণ; তৎপরেরটী "প্রাণময়" আবরণ; তৎপরেরটী "মনোময়" আবরণ; চতুর্থটী "বিজ্ঞানময়" আবরণ; সর্ব্ব শেষটী "আনন্দময়" আবরণ। ইহারা "পঞ্চকোষ" নামে দর্শনে প্রসিদ্ধ। ইহারা বহির্দ্দেশ হইতে ক্রমে স্তরের পর স্তর দেহে অবস্থিত রহিয়াছে। ইহাদিগকে আমরা দেহের বিভিন্ন উপাদান বলিয়া মনে করিতে পারি। ক্রমে স্থূল হইতে ইহারা সূক্ষ্ম হইয়া চলিয়াছে। কেবল তাহাই নহে, ক্রমে ইহাদের উৎকর্ষ হইয়াও চলিয়াছে। "অন্নময়" কোষ দেহের জড়োপাদান ব্যতীত আর কিছুই নহে। "প্রাণময়" কোষ প্রথম চেতনোপাদন। কারণ প্রাণের সহিতই প্রথম চেতনার সঞ্চার হইয়া থাকে। প্রাণের আবির্ভাবের সহিত ইন্দ্রিয়াদির অভিব্যক্তি হয়; "মনোময়" কোষ ইন্দ্রিয়াদিরই পরিণাম। কারণ মনই ইন্দ্রিয়াদির অধিষ্ঠাতা। মনের পর বুদ্ধির স্ফুরণ হয়। বুদ্ধি জ্ঞানাত্মক। "বিজ্ঞানময়" কোষ সুতরাং বুদ্ধিরই পরিণাম। বুদ্ধির পর আত্মার প্রকাশ হয়। এই আত্মা আনন্দ স্বরূপ, সুতরাং "আনন্দময়" কোষ আত্মারই বিপরিণাম।

জীব-বিকাশের সর্ব্ব নিম্ন স্তরে আমরা জড়ভাবের অবস্থাই দেখিতে পাই। প্রাণ-সঞ্চারের সঙ্গেই চৈতন্যের লক্ষণ প্রকটিত হয়। এই চৈতন্যের দ্বারাই জীব-ভাব প্রথম আরম্ভ হয়। "জীব" শব্দের অর্থই জীব বা প্রাণশীল। প্রাণের বিকাশ হইয়াই ইন্দ্রিয় সকলের বিকাশের সূচনা করে। মনের বিকাশ, ইন্দ্রিয় বিকাশেরই ফল। এইরূপে ইন্দ্রিয় বিকাশ ও মনের বিকাশেই চৈতন্য বিশেষরূপে পরিস্ফুট হয়। সুতরাং "মনোময়" কোষ, জীববিকাশের মধ্য স্তরই নির্দ্দেশ করে। মনের অপেক্ষা বুদ্ধি উন্নত বৃত্তি। ইহার আবির্ভাব উন্নত জীবেই পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। এই বুদ্ধিই জ্ঞানের অবস্থা। সুতরাং "বিজ্ঞানময়" কোষে আমরা বুদ্ধি বিকাশের স্তরই প্রাপ্ত হই। জ্ঞানের পূর্ণতার সঙ্গে একটী তৃপ্তির ভাব উপস্থিত হয়, ইহাই আনন্দের ভাব। এই আনন্দের ভাবই আত্মার স্বরূপ। পরমাত্মাকে যে "সচ্চিদানন্দ স্বরূপ" বলিয়া বেদান্তে নির্দ্দেশিত দেখা যায়, তাহাতে এই আনন্দকেই আত্মার বিশেষ লক্ষণ বলিয়া বুঝিতে পারা যায়। বৃহদারণ্য-কোপনিষদের "বিজ্ঞানং আনন্দং ব্রহ্ম" এই বাক্যেও বিজ্ঞান ও আনন্দের সহিত পরমাত্মার ঘনিষ্ঠ যোগেরই প্রমাণ পাওয়া যায়। এইরূপে "আনন্দময়" কোষ কেবল জীবাত্মার বিকাশই প্রকাশ করে না, ইহা পরমাত্মা বা বিশ্বাত্মার বিকাশও প্রকাশ করে। সুতরাং "আনন্দময় কোষ" যে সর্ব্বোচ্চ বিকাশেরই নির্দ্দেশক হইয়াছে, তাহাই আমরা বুঝিতে পারিতেছি।

মনুষ্য দেহে পূর্ব্বোক্ত পঞ্চকোষের সংস্থানের প্রকৃত তাৎপর্য্য আমরা ইহাই বুঝিতে পারি যে, প্রথম, জড়োদ্ভাব হইতেই মনুষ্য দেহের গঠন আরম্ভ হয়। গর্ভে ইহার পরিপুষ্টি হইয়াই প্রাণ সঞ্চার হয়। ক্রমে ইন্দ্রিয়াদির উদ্ভব হইয়া মনের বিকাশ বহু পরে সপ্তম মাসে হয়। * বয়স বৃদ্ধি হইলে তবে বুদ্ধির বিকাশ হইতে আরম্ভ করে।

* "তচ্চ গর্ভস্থস্য সপ্তমেমাসি জায়তে" ইতি শব্দ-কল্পদ্রুমধৃত "সুখবোধঃ।"

শিক্ষা দ্বারা এই বুদ্ধি ক্রমে পরিমার্জ্জিত হইয়া তবেই বিবেক জ্ঞানের উদ্বোধন হয়। এই বিবেক জ্ঞানকেই আমরা বিশেষ জ্ঞান বা বিজ্ঞান বলিতে পারি। এই বিজ্ঞানের পূর্ণ পরিণতি হইতেই চিরানন্দ ভাবের উদ্ভব হয়, ইহাই প্রকৃত আত্ম ভাব। এই প্রকারে ক্রমোন্নতির প্রক্রিয়ায় মনুষ্য দেহে যে ভিন্ন ভিন্ন বিকাশের অবস্থা পরিব্যক্ত হয়, সেই সকলই পঞ্চকোষ সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়াছে।

মনুষ্য দেহের পঞ্চকোষে কেবল মানবজাতির বিকাশই প্রতিফলিত হইয়াছে, তাহা নহে, কিন্তু ইহাদের মধ্যে যে সমস্ত জীব জগতের বিকাশও প্রতিফলিত হইয়াছে, তাহা আমরা উপরে প্রদর্শন করিয়াছি। সুপ্রসিদ্ধ পাশ্চাত্য পণ্ডিত ডাক্তার ডিউসেন, এই পঞ্চকোষের ব্যাখ্যায় ইহাদের মধ্যে যে সমস্ত প্রকৃতি রাজ্যের বিকাশেরই প্রতিবিম্ব প্রতিফলিত হইয়াছে, তাহা পর্য্যন্তও প্রদর্শন করিয়াছেন। "অন্নময় কোষ" সম্বন্ধে তিনি লিখিয়াছেন :—

"The annamaya atman, "the self dependent on food", is the incarnation of the atman in the human body and in material nature." *

"অন্নময় আত্মা (কোষ), যে আত্মার অন্ন অবলম্বন, ইহা মনুষ্য দেহ এবং জড়প্রকৃতি আত্মার অবতার।"

আনন্দময় কোষ সম্বন্ধে তিনি মন্তব্য করিতেছেন—

"* * the anandamaya atman the "self dependent on bliss" as the innermost kernal of man and nature as a whole." †

"আনন্দময় আত্মা, মনুষ্য ও সমগ্র প্রকৃতির অন্তরতম সাররূপ, যে আত্মার আনন্দই অবলম্বন।"

এইরূপে অন্নময় কোষ হইতে আরম্ভ করিয়া আনন্দময় কোষ পর্য্যন্ত, তিনি মনুষ্য বিকাশের সহিত নিখিল প্রকৃতির বিকাশই বিজড়িত দেখিতে পাইয়াছেন। উপনিষদ প্রথম কোষ যে "অন্নময় আত্মা" বলিয়া কথিত হইয়াছে, তাহাতে আত্মাই যে বীজরূপে অন্ন বা জড়োপাদানে নিহিত থাকিয়া শাখা পল্লব ফুল ফলরূপে প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময় ও আনন্দময় কোষে বিকাশ প্রাপ্ত হয়, তাহারই রহস্য আমরা জানিতে পারিতেছি। সাংখ্যের প্রকৃতি পুরুষের যোগে সৃষ্টি প্রবর্ত্তনের তত্ত্বেও এই বিকাশরহস্যই নিহিত রহিয়াছে। এইরূপে মানব দেহের পঞ্চকোষের মধ্যে ক্রমবিকাশ বিজ্ঞানের অভিব্যক্তির ধারা যে কি আশ্চর্য্যরূপে আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাই আমরা দেখিতে পাইলাম।

শ্রীশীতলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

* Philosophy of the Upanishads pp. 97-8.

† Ibid pp. 97-8.

৺মধুপ্রসন্ন রায়।

জন্ম ১২৯৫—২৮শে শ্রাবণ।

মৃত্যু ১৩২৫—২৫শে শ্রাবণ, শনিবার।

(২২শে ভাদ্র, রবিবার, আদ্য-শ্রাদ্ধোপলক্ষে পঠিত।)

মানুষ মৃত্যুর পর কোথায় যায়, কেহ তাহা জানে না। জানিলে, বোধ হয়, মানুষ এত শোকে অস্থির হইত না। কত দার্শনিকের কত মত, কত ধার্ম্মিকের কত পুঞ্জীকৃত বিশ্বাস, সব এস্থলে নিরুত্তর। জন্ম ও মৃত্যু, বিধাতার এক অপূর্ব্ব সৃষ্টি। কোথা হইতে মানুষের আগমন, তাহা কেহ জানে না; কোথায় তাহার গমন, তাহাও জানে না। জন্ম ও মৃত্যু চির প্রহেলিকাময়। বিধাতার দুরবগাহ্য বিধানের তত্ত্ব ভেদ করিতে কে কবে পারিয়াছে?

জন্ম মৃত্যুর মধ্যে মানব-জীবন। আগমনের পর কত স্নেহ, কত মায়া, কতরূপে তাহাকে বরণ করিল। অধিষ্ঠানের সময় কত স্নেহ, কত মায়া তাহাকে আকর্ষণ করিল—সংসারটাকে কত মধুময় বলিয়া ধারণা জন্মাইল; যাওয়ার সময় সব স্নেহ, সব মায়া যেন বিদ্যুৎবৎ বিদূরিত হইল, যাওয়ার সময় সব পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল। কত আকর্ষণ, কত মোহ, কত ভালবাসা সংসারের প্রতি, কিন্তু সব পড়িয়া কাঁদিতে লাগিল, যাওয়ার সময় কিছুই সঙ্গে গেল না। একাকী আগমন, একাকীই গমন। এ সংসারে কে কাহার? জন্ম ও মৃত্যু, ধনী দরিদ্র, জ্ঞানী মূর্খ, ধার্ম্মিক অধার্ম্মিক, সকলের ঘরেই বিচরণ করেন। জল ও বায়ু যেমন সকলের জন্য, জন্ম ও মৃত্যুও তেমনি সকলেরই জন্য। যে মানুষের অহঙ্কার জন্মদিনে ফুটিয়া উঠে, সেই মানুষের অহঙ্কার মৃত্যু দিনে ধরায় লুটাইয়া পড়ে। কাহার জন্য কি বিধান আসিতেছে, কেহ জানে না। তবু মানুষ কেন যে অহঙ্কারী হইয়া ধরাকে শরার ন্যায় মনে করে, তাহা বুঝা যায় না। সকলের ঘরেই যদি জন্ম মৃত্যু বিচরণ করে, তবে আর কেন অহঙ্কার, কেন আস্ফালন, কেন নৃত্য, কেন প্রমত্ততা? মায়ার বন্ধন বই এ সকলের আর কিছু মীমাংসা হইতে পারে না। সকল জীবকেই শিবধামে যাত্রা করিতে হইবে। কেবল দুদিনের জন্য সংসার-বন্ধন, দেহে অধিবাস, কায়ার মায়া, মাটীর খেলা। সকলকেই মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিতে হইবে। যশ বল, মান বল, ঐশ্বর্য্য বল, সম্পদ বল, বুদ্ধি বল, শক্তি বল, কিছুই মানুষকে মৃত্যুর হস্ত হইতে রক্ষা করিতে পারে না। এই চরম বিধান সকলের পরিণাম লিখিবার জন্যই অপেক্ষা করিতেছে। শ্মশান সংসারের সকল অহঙ্কার চূর্ণ করিবার স্থান। শ্মশান শান্তির আলয়, শিবধামের সোপান।

ফরিদপুরের অধীন মাণিকদহ নামক একটী ক্ষুদ্র গ্রামের কথা আজ প্রাণে জাগিতেছে। মাণিকদহ নামের সার্থকতা সাধনের জন্যই যেন এই গ্রামের নামকরণ হইয়াছিল। প্রাচীন ইতিহাসের উল্লেখের কোন প্রয়োজন দেখি না, মহিমচন্দ্র রায়ের তিরোধান, ধনমণি চৌধুরাণীর প্রয়াণ হইতেই এই গ্রামের নামের সার্থকতা যেন জাগিয়া উঠিয়াছে। কে

এমন সর্ব্বনাশা সর্ব্বগ্রাসী নামকরণ করিয়াছিল? ভাবিলে শরীর রোমাঞ্চিত হয়, নয়ন হইতে জলধারা পড়ে। এই গ্রামের সংস্পর্শে কত মাণিক আসিয়াছিলেন, অল্প সময়ের মধ্যে কত জনের তিরোধান হইয়াছে, ভাবিলে বিস্ময়ে আক্রান্ত হইতে হয়। আমরা জানি, বিপিনবিহারী রায়, সুরাজমোহিনী রায়, প্যারীমোহন রায়, গগনসুন্দরী রায়, কালীপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য, শশীমুখী ভট্টাচার্য্য, স্বপপ্রকাশ রায়, রামগোপাল বিশ্বাস, অবিনাশচন্দ্র সরকার, হরিদাস রায়, নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, অম্বিকাচরণ মুখোপাধ্যায়, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, শ্যামাকান্ত চট্টোপাধ্যায়, গিরীশচন্দ্র মজুমদার, ইন্দুভূষণ রায়, তারকগোপাল ঘোষ, রজনীনাথ ঘোষ, দ্বারকানাথ ঘোষ, কাঙ্গাল হরিনাথ মজুমদার প্রভৃতি সাধু সাধ্বীগণ এই সংসারের মাণিক বিশেষ ছিলেন। তাঁহারা এই গ্রামের সংস্পর্শে আসিয়াছিলেন। তাঁহাদের চরিত্র মাধুর্য্যে এই গ্রাম গৌরবান্বিত হইয়াছিল। তাঁহাদের অসাময়িক তিরোধান এই গ্রামের দহত্বের পরিচয় দিয়াছে। বহু মাণিকের সংস্পর্শে এই গ্রাম গৌরবান্বিত হইয়াছিল— তাঁহাদের তিরোধানে এই গ্রামের দহত্ব প্রতিপন্ন হইয়া রহিয়াছে। মাণিকদহ মহা শ্মশানের মহা-লীলাক্ষেত্র, যেন বিশ্বধামের মহা উষা। আজ আমরা নিভৃতে এই গ্রামের কত কথাই ভাবিতেছি। মাণিকদহের উত্থান পতনের ইতিহাস এই বঙ্গের, বিশেষত ব্রাহ্মসমাজের, কে না জানে? একদিন মাণিকদহ দানধ্যানের গৌরবের সোণার মুকুট পরিয়া যশের মন্দিরে উচ্চস্থান লাভ করিয়াছিলেন। সেখানকার উৎসবে যাওয়ার জন্য কে না আকর্ষিত হইতেন? সেখানকার দানের অধীন হইতে কে না ইচ্ছুক হইতেন? বিপিনবিহারী বলিতেন, "আমি দরিদ্রের ছেলে, সব ধন দরিদ্রদিগকে বিলাইয়া দিব, কিছুই রাখিব না।" এমন কথা এই বঙ্গে কে কবে বলিতে পারিয়াছেন? করিয়াছিলেনও তাহাই, দান-যজ্ঞে সব বিলাইয়া দিয়া সম্বৎসর আপনার বসন ভূষণের জন্য বজেটে কেবল ২০৲ বরাদ্দ করিতেন। তিনি ঐশ্বর্য্যশালী বড় জমাদার, তাঁহাকে দেখিয়া কেহই তাহা বুঝিতে পারিতেন না। একখানি গাড়ীও তিনি কখনও করেন নাই। সামান্য বেশে সামান্য ভাবেই জীবনাতিবাহিত করিয়া কাঙ্গাল গরীবের মা বাপ সাজিয়াছিলেন। পুণ্যবানদিগের পুণ্যের সরসীতে অবগাহন করিয়া তিনি অজেয় পুণ্যময় চরিত্র লাভ করিয়াছিলেন। তদীয় প্রথম জীবনের ইতিহাস এবং পর জীবনের ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে ধারণা হয়, কিরূপে এ দেশে জগাই মাধাইর উদ্ধার হইয়াছিল। ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাসে বিপিনবিহারীর জীবনেতিহাস অলৌকিক ঘটনার-সমাবেশে পূর্ণ। এরূপ নিষ্কাম জীবন ব্রাহ্মসমাজে অধিক হইয়াছে বলিয়া জানি না।

বিপিনবিহারীর ঔরসে, সুরাজমোহিনীর গর্ভে সুপ্রসন্ন জন্মগ্রহণ করে। মহা গৌরবের দিনেও কুচক্রী লোক বিপিনবিহারীর চতুর্দ্দিকে ঘুরিয়া বেড়াইত। বিপিনবিহারীর পুণ্যময় জীবন লাভের পরও চক্রান্তের হস্ত হইতে তিনি রক্ষা পান নাই। তাঁহার বাল্যে বিষয় হইতে বঞ্চিত করার জন্য যেরূপ চক্রান্ত হইয়াছিল, যৌবনে, গৌরবের দিনে পবিত্রতা হইতে পরিবারকে চ্যুত করিবার জন্য, সেইরূপ, চক্রান্ত হইয়াছিল। সে তিন দস্যুর কথা আজ বলিব না, যাহারা ছদ্মবেশে ক্রমে ক্রমে

এই সোণার পরিবারে অনল নিক্ষেপ করিয়াছিল। এই চক্রান্তে সুপ্রসন্ন চারি মাসের সময়ই মাতৃস্নেহ হইতে বঞ্চিত হইল। মাতা সুরাজমোহিনী আত্মত্যাগ করিলেন। শিশুকে রক্ষা করার ভার বিমাতা মোক্ষদায়িনী গ্রহণ করিলেন। মোক্ষদায়িনীর যত্নের সীমা ছিল না, তিনি জীবন পণ করিয়া শিশুকে পালন করিতে লাগিলেন। কিন্তু হইলে কি হয়, দুঃখ যাহার জীবনের সম্বল, কে তাহাকে রক্ষা করিতে পারে? বাল্যেই সুপ্রসন্ন পিতৃস্নেহ হইতে বঞ্চিত হইল। ব্রাহ্মসমাজের কোন ব্যক্তি বিপিনবিহারীকে উইল করিতে দিলেন না। কলিকাতায়ও না, দার্জ্জিলিংয়েও না। যদি বিপিনবিহারী উইল করিয়া যাইতে পারিতেন, সোণার পরিবার ভাসিয়া যাইত না। সে সকল নির্ম্মম কাহিনী বিবৃতির ইহা স্থান নয়। উইল না হওয়ায়, পিতার তিরোধানে, বিমাতার সহিত সুপ্রসন্ন অগাধ জলে নিক্ষিপ্ত হইল। পিতার মৃত্যুর পর বিমাতার স্নেহ হইতে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা গার্জ্জিয়ান হইয়া সুপ্রসন্নকে ছিনাইয়া লইল, এবং কতরূপে, কত ভাবে যে চালাইতে লাগিল, সে সকল ইতিহাস বর্ণনা করিতে আমরা অক্ষম। সুপ্রপ্রকাশ চক্রান্তে পড়িয়া জীবন বলি দিলেন। সুপ্রসন্ন নানা কুশিক্ষার ভিতর দিয়া চালিত হইতে লাগিল। ইহার পর বিলাতে প্রেরিত হইয়াছিল, সেখানে ২½ বৎসর ছিল, বিলাতে ষ্টি... সাহেবের অধীনে ছিল। বিলাত হইতে আসার সময় গার্জ্জিয়ান বাদী হইলেন, বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া শেষে কি করিবে, এই ভয়ে তিনি বিমুখ হইলেন। বিমাতা এবং অন্যান্য আত্মীয়ের সাহায্যে ঘরের ছেলে ঘরে ফিরিল।

সাহেবের দেনাও সুপ্রসন্নের নিকট হইতে বেঙ্গল-গবর্ণমেণ্ট আদায় করিয়াছিলেন। বয়ঃপ্রাপ্ত হওয়ার পর বিপদ আরো ঘনীভূত হইয়া আসিল। বিমাতাও তখন সহায়, কিন্তু গার্জ্জিয়ান কিছুতেই বিষয় দিতে ইচ্ছুক হইলেন না। কত কষ্টে যে সুপ্রসন্ন দিন কাটাইতে লাগিল, সে ইতিহাস কেহই জানে না। এই সময়ে সুপ্রসন্নের বিবাহ হইল। যে সান্ত্বনা সাধ্বী কমলকামিনীর জীবনের একমাত্র সান্ত্বনা, মোক্ষদায়িনী ও সুপ্রসন্নের মামা যোগেন্দ্রনাথের একান্ত অনুরোধে সেই সান্ত্বনার সহিত সুপ্রসন্নের বিবাহ হইল। বিবাহের পরই আবার অনেক চক্রান্ত আরম্ভ হইল, সুপ্রসন্নকে বিনাশের পথে চালাইবার জন্য অনেকে বদ্ধপরিকর হইলেন। তাঁহাদের নাম করিতে চাহি না। তাঁহারা আত্মীয় হইয়াও এইরূপ কথা তাহার কর্ণে ঢালিয়া দিলেন, "তোমার টাকার ভয় কি, লক্ষ লক্ষ টাকা ঋণ করিলেও ভয় নাই।" ইহার পরই উচ্ছৃঙ্খলতার রাজ্যে সুপ্রসন্ন পদনিক্ষেপ করিল। বিমাতাও রক্ষা করিতে পারিলেন না। সুপ্রসন্ন এই সময়ে কুচক্রীদের চক্রান্তে পড়িয়া স্রোতের শৈবালের ন্যায় সংসার-স্রোতে ভাসিয়া চলিল। এক পক্ষে মামা যোগেন্দ্রনাথ, অন্য পক্ষে আরো কত কত আত্মীয়—ছেলেকে অকূলের দিকে ভাসাইয়া দিল। শ্বশুর শাশুড়ীর ভালবাসায় যাহাতে আবদ্ধ হইতে না পারে, এবং সান্ত্বনারও যাহাতে হাত না থাকে, তাহারও বিধিপূর্ব্বক চেষ্টা হইতে লাগিল। সে সকল অপ্রিয় সত্য ব্যক্ত না করাই ভাল। এই সময়ে ব্রাহ্মসমাজেও সুপ্রসন্নকে যেন পরিত্যাগ করিলেন। কোন ব্রাহ্মভ্রাতার বাড়ী ভাড়া করিয়াছিল, সেখান হইতে তাড়িত হইল।

ভবানীপুরে কোন বিশিষ্ট ব্যক্তির বাড়ী ভাড়া করিল, সেখান হইতেও অপমানিত হইয়া তাড়িত হইল। কত লোকে যে এই সময়ে স্বার্থ সাধন করিয়া লইল, সে সব অপ্রিয় কথা ব্যক্ত করিতে চাহি না। কিন্তু কিছু কিছু ব্যক্ত না করিলেও এই বালকের মহত্ব প্রকাশ হইবে না। কত লোক সুপ্রসন্নের টাকায় বাড়ী প্রস্তুত করিয়া বা অন্য কত রূপে বড় লোক হইয়াছেন, তাহার সংখ্যা হয় না। এই সময়ে সালিসীতে বিষয় বণ্টনের আয়োজন হইয়াছিল, বিপ্লট সে মনোনয়ন করিয়াছিল, কিন্তু কুলোকের চক্রান্তে তাহা পাইল না। এই সময়ে তাহার ভগ্নীপতি তাহাকে লইয়া ঢাকা যাইয়া মকদ্দমার রুজু করাইলেন। বিবাদীর চক্রান্তে মকদ্দমা ফরিদপুরে স্থানান্তরিত হইল। শেষে আর এক দলের চক্রান্তে পড়িয়া এই সময়ে ট্রষ্ট নিযুক্ত করিয়া দেনা পরিশোধের ব্যবস্থা করিল। কোন এক ব্যক্তির শরণাপন্ন হইলে তিনি আপনার দুইজন আত্মীয়কে ট্রষ্টি করিয়া এমন ট্রষ্ট ডিড করিয়া দিলেন যে, আজীবন অর্থাভাবে চক্ষের জল ফেলিতে ফেলিতে তাহাকে দেহপাত করিতে হইল। ঐ দুজনের একজন দেশান্তরে গমন উপলক্ষে পদ পরিত্যাগ করিলে অন্য একজনকে ট্রষ্টি নিযুক্ত করা হয়। কিন্তু তিনিও হিসাবাদি দেওয়া সম্বন্ধে কিছু করিতে পারেন নাই। গত বৎসর ট্রষ্টির হস্ত হইতে বিষয় উদ্ধার করার আয়োজন করিয়াছিল। কিন্তু আবার চক্রান্তে পড়িয়া সৈনিক-দলে প্রবেশ করিয়া করাচিতে গেল। সুপ্রসন্ন নানা দুঃখে কষ্টে বহুমূত্র রোগে, হাঁপানিতে এবং অর্শে আক্রান্ত হইয়াছিল, এমনই চক্রান্ত, এই অবস্থাতেও তাহাকে সৈনিক শ্রেণীতে ভর্ত্তি করা হইয়াছিল। শেষে মেডিকেল-বোর্ডের দ্বারা পরীক্ষা করাইয়া তাহাকে উদ্ধার করা হয়। তৎপর বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য দেওঘরে যাইয়া কিছু দিন পত্নী ও শ্রীযুক্ত রাজকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সঙ্গে ছিল। কিন্তু ট্রষ্টির হস্ত হইতে হিসাব উদ্ধার না করিতে পারিলে আর রক্ষা নাই, ইহা ভাবিয়া কলিকাতায় আসিয়া ট্রষ্টিদিগকে এটর্ণীর পত্র দিয়াছিল। তাঁহারা ৫৷৷০ লক্ষ টাকায় তাহার জমিদার নিকট বিষয় বিক্রয় করিয়াছিলেন। তাঁহারা ইচ্ছা করিলে কিছু বিষয় রাখিলেও রাখিতে পারিতেন, কিন্তু রাখেন নাই। তাঁহারা দুইজনে মাসে ২০০৲ পাইতেন, কিন্তু তবু এতদিন তাহার হিসাব দেন নাই। ক্রমাগত সময় নিতেছিলেন। সেপ্টেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহে হিসাব দেওয়ার শেষ সপ্তাহ গিয়াছে। মনোকষ্টে সুপ্রসন্ন দারুণ সমর-জ্বরে তৃতীয়বার আক্রান্ত হইয়া ২৫শে শ্রাবণ, শনিবার, দেহত্যাগ করিল। * তাহার জীবনের ধারাবাহিক ইতিহাসে লিখিত রহিল কেবল দুঃখ, কেবল অনুশাসনা, কেবল মনোকষ্ট।

কিসে কি হয়, কেহ জানে না। সমর-জ্বরের প্রথম আক্রমণের পর কিছু অত্যাচার করায় ১৭ই শ্রাবণ শুক্রবার দ্বিতীয় আক্রমণ হয়; তাহা একটু ভাল হইতে না হইতে ২০শে শ্রাবণ সোমবার স্নান করে ও দুইবার শরীর প্রক্ষালন করে এবং পূর্ব্ব দিনের প্রস্তুত দ্রব্যাদি আহার করে। তৎসহ কটী আমও খায়। তৎপরে

* এই প্রবন্ধ পঠিত হওয়ার সময় ট্রষ্টিরা বিরক্ত হইয়া উঠিয়া গিয়াছিলেন। রাগারাগির কারণ কি? হিসাব ও টাকা কড়ি বুঝাইয়া দিলেই সব গোল মিটিয়া যায়। শেষে আদালতে গড়াইলে ভাল হইবে কি? তাঁহাদের ইচ্ছা যেন তাহাই।

সন্ধ্যার পূর্ব্বে দারুণ জ্বরে আক্রান্ত হয়। সেই আক্রমণের সময়ে জীবনের সমস্ত কথা ব্যক্ত করে। ৩০ বৎসর বয়সে তাহার ফাঁড়া আছে, মঙ্গলবার ত্রিশ বৎসর পূর্ণ হইবে, এই কথা বিশেষ করিয়া বলে। তাহার পিতা, শাশুড়ী ও শ্বশুরের অশেষ গুণ ব্যাখ্যা করে এবং তাঁহাদিগকে কেহ চিনিল না বলিয়া আক্ষেপ করে এবং নিজ জীবনের কর্ত্তব্য প্রতিপালিত হইল না বলিয়া দুঃখ ও অনুশোচনা প্রকাশ করে। জীবনে যে সব অন্যায় কার্য্য করিয়াছে, তাহাও সরল ভাবে ব্যক্ত করে। এরূপ যাহারা করে, তাহারা প্রায়ই বাঁচে না, এ কথা আমরা বন্ধুদিগকে সেই দিনই বলিয়াছিলাম। বৈদ্য-রত্ন শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ সেনের প্রতি তাহার প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ছিল, দ্বিতীয় দিন হইতেই তাঁহাকে আহ্বান করা হয়। তিনি প্রতি দিনই আসিতেন। দ্বিতীয় দিনে ডাক্তার প্রাণকৃষ্ণ আচার্য্য, সুন্দরীমোহন দাস, এবং তৎপর ইন্দুভূষণ বসু ও ক্যালবার্ট সাহেব চিকিৎসা করেন, কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। বৃহস্পতিবার যখন ভাইনাম গ্যালিসাই দেওয়া হইল, তখন আমাদিগকে বলিল, "আমার মদ মুখে দিলেন?" তৎ-পরই বলিল—"আমার শ্রাদ্ধ ভাল করিয়া করিবেন ত? ত্রিশ বৎসরে আমার ফাঁড়া আছে। আমার দুঃখ রহিল, ট্রষ্টিরা হিসাব দিলেন না, ট্রষ্টিরা টাকা থাকিতেও বাড়ী করিয়া দিলেন না, * পিতার মূর্ত্তি বসাইতে পারিলাম না ও সকলকে আশ্রয় দিয়া রাখিয়া যাইতে পারিলাম না, * * * আমাকে বিনা অপরাধে অপমান করিল।" প্রসূনকে বিলাতে না পাঠাইতে বারম্বার নিষেধ করিয়াছিল, বলিয়াছিল, "সেখানে যাইয়া লোক ভাল থাকে না, কখনও পাঠাইবেন না।" এরূপ বিজ্ঞতাপূর্ণ কথা বড় অধিক শোনা যায় না। শেষে কথা বলার শক্তি লোপ পাইলেও কথা বলিতে চেষ্টা করিত। যাওয়ার সময় সব কথা যেন বলিয়া গেল। গুরুজনদিগের পদধূলি কি আগ্রহ সহকারে মস্তকে লইয়া-ছিল। এরূপ তন্ময়তা বড় অধিক দেখা যায় না। ক্রমে ক্রমে যেন উদাসীনতা তাহাকে গ্রাস করিল। দুই দিন পূর্ব্বেও রুমালখানিকে ঠিক করিয়া রাখিতে অনু-রোধ করিয়াছিল, শেষে তাহার অতি প্রিয় দ্রব্যাদি, অতি প্রিয় পত্নী, অতি প্রিয় পুত্র কন্যাদিগকে রাখিয়া অকূলে ঝাঁপ দিল। আহা, শেষ দৃশ্য বর্ণনা করিতে পারে, এরূপ লেখক এ সংসারে দুর্লভ।

সুপ্রসন্ন কি গুণে সর্ব্ব শ্রেণীর লোককে মুগ্ধ করিয়াছিল? আজ তাহা স্মরণের জিনিস। তাহার পিতৃভক্তি আদর্শ ছিল, পিতার প্রতি যে ভালবাসা ছিল, তাহার জন্য পিতার ভাল ভাল ছবি ঘরে রাখিয়া-ছিল, শেষে শত সহস্র টাকা ব্যয়ে পিতার মার্ব্বেল মূর্ত্তি প্রস্তুত করাইয়াছিল। তাহা নিজ বাড়ীতে বসাইতে পারে নাই, এজন্য কত দুঃখ করিত! এই মূর্ত্তির টাকা দিতে বিলম্ব হওয়ায় কোন ইটালীয় ভাস্কর তাহার নামে ওয়ারেণ্ট বাহির করে। পিয়ন যখন ওয়ারেণ্ট জারি করিতে আসে, তখন শ্রীযুক্ত বরদাপ্রসন্ন রায় মহাশয় একটু সন্দেহমতো প্রকাশ করিয়াছিলেন বলিয়া, তিনি জনৈক প্রচারক কর্তৃক তিরস্কৃত হইয়াছিলেন! তিনি কি জানিতেন না যে, সুপ্রসন্ন কাহারও দেনা রাখিতে ইচ্ছুক ছিল না। দেনা পরিশোধের জন্যই ট্রষ্টি নিযুক্ত করিয়াছিল এবং বিষয় বিক্রয় করিয়া দেনা পরিশোধ করিয়াছিল।

* ৪ মাস বয়সে মাতৃবিয়োগ হয়, ১১ বৎসর বয়সে ১৩০৮ সালে পিতৃবিয়োগ হয়। এই প্রবন্ধে কাহারও নাম করা হয় নাই, তবু যাঁহারা বিরক্ত হইয়াছেন, তাঁহারা বিরক্তিতে বাড়িতে থাকুন।

পত্নী-প্রেম তাহার জীবনের দ্বিতীয় বিশেষত্ব। পত্নীর প্রতি কখনও খারাপ ব্যবহার করে নাই, তাহা বলিতেছি না, কিন্তু উত্তেজনা বা চক্রান্তে খারাপ ব্যবহার করিলেও, পর মুহূর্ত্তে ক্ষমা চাহিত এবং আদর করিত। মুহূর্ত্ত মাত্র স্ত্রীকে না দেখিয়া থাকিতে পারিত না। স্ত্রীর নামে গিফট্‌ করিয়া দিবার জন্য পীড়ার মধ্যেও এটর্ণিকে কত অনুরোধ করিয়াছিল। এই পত্নী-প্রেমের জন্য কত আত্মীয় তাহাকে তিরস্কার করিয়াছিল, কিন্তু তবুও নিবৃত্ত হয় নাই। ট্রাইডিডে পত্নীকে সমস্ত সম্পত্তি দিবার কথা যে লিখিয়া গিয়াছে, ইহাতেই তাহার বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়।

তাহার পুত্র-কন্যা-বাৎসল্য অসাধারণ ছিল। তাহার কন্যা সুচেতাকে এত ভালবাসিত যে, তাহার বিবাহের সময় ১০০০০৲ টাকা ব্যয়ের কথা ট্রাইডিডে লিখিয়া গিয়াছে। সুচেতা পিতার সহিতই শয়ন করিত। সান্ত্বনা একবার দেওঘর হইতে কলিকাতা আসিলে সুচেতা পিতার সহিত দেওঘরে ছিল। পুত্র কন্যাকে কেহ যদি তিরস্কার বা প্রহার করিত, সুপ্রসন্ন কাঁদিয়া আকুল হইত।

বন্ধু-বাৎসল্যের কথা আর কি বলিব, তাহার বন্ধুরাই তাহার সাক্ষ্য দিতে পারেন, কিন্তু আমি জানি, বন্ধুদের জন্য সে যেন পাগল হইত। মানুষকে এমন ভালবাসিত যে, সেই ভালবাসার যে যাহা বলিত, তাহাই শুনিত। তাহাতে তাহার যে কি সর্ব্বনাশ হইয়া যাইত, সেদিকে দৃষ্টি থাকিত না। লক্ষ লক্ষ টাকা এইরূপে উড়াইয়া দিয়াছে। বাবু রজনীকান্ত সরকার, বাবু অনন্তনারায়ণ সেন, কবিরাজ যোগীন্দ্রনাথ সেন, সাধু ব্রজকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, সাধু কালীনাথ ঘোষ, সাধু মথুরামোহন গঙ্গোপাধ্যায়, বাবু মণিলাল সিংহ বাহাদুর, বাবু অটলচন্দ্র সেন, বাবু চণ্ডীপ্রসাদ সিংহ রায় প্রভৃতি ব্যক্তিগণ তাহার ভালবাসা, ভক্তি ও শ্রদ্ধার পরিচয় দিতে আজও বিদ্যমান আছেন। বৈদ্যরত্ন শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ সেন এবং তাঁহার ভ্রাতা ম নীন্দ্রনাথ সুচেতাকে লিখিয়াছেন—"তোমাদের পিতা আমাদের নিকট কনিষ্ঠ ভ্রাতার ন্যায় ছিলেন। * * তিনি যেরূপ ধর্ম্মানুরক্ত ছিলেন, তাহাতে ভগবান নিশ্চয়ই তাঁহার আত্মার কল্যাণ সাধন করিবেন।" সুপ্রসন্ন সরল-হৃদয় ছিল, বন্ধুদিগের নিকট অকপট সরল হৃদয়খানি ঢালিয়া দিত। করাচির সৈনিক বন্ধুরা, ব্রাহ্মসমাজের বন্ধুরা যাঁহারা তাহাকে জানেন, তাঁহারা বলেন, এরূপ হৃদয় সংসারে বড় অধিক দেখা যায় না। তাহার হৃদয়খানি যেন তাহার পিতার হৃদয়ের প্রতিবিম্ব ছিল। যাহাকে পাইত, প্রাণ মন ঢালিয়া দিয়া ভালবাসিত। ভালবাসাই তাহার স্বভাব ছিল। যে তাহার সংস্পর্শে একবার আসিত, সে-ই মুগ্ধ হইয়া যাইত। তাহার ভৃত্যেরা এক চাকরাণীর প্রতি খারাপ ব্যবহার করিয়াছিল বলিয়া কোন ব্রাহ্ম তাহাকে পাড়া হইতে উঠিয়া যাইতে বারম্বার বলিয়াছিলেন এবং সে জন্য সুপ্রসন্ন সর্ব্বদাই দুঃখ প্রকাশ করিত। হায়, এই পাড়াখানি যেন সেই ব্রাহ্মের নিজস্ব! অনেকেই জানেন না যে, চাকরদের প্রতি তাহার কেমন সদয় ব্যবহার ছিল। হঠাৎ রাগিয়া কখনও কোন খারাপ ব্যবহার করিলে পর-মুহূর্ত্তেই ক্ষমা চাহিত ও পুরস্কৃত করিত। একবার এক ভৃত্যকে ঠেলিয়া দেওয়ায় সে পড়িয়া যায় ও একখানি হাড় স্থানচ্যুত হয়। বহু লোকে

ভৃত্যকে নালিশ করিতে বলিলেও ভৃত্য নালিস করে নাই, বলিয়াছিল, হঠাৎ ঐ ঘটনা হইয়াছে। সকলের প্রতিই তাহার ভালবাসা সমভাবে প্রবাহিত হইত। বন্ধুপ্রেমের আকর্ষণে, কথা রাখার জন্য, সুপ্রসন্ন শ্রীযুক্ত অনন্তনারায়ণ সেন মহাশয়কে দশ সহস্র টাকা দিয়া প্রত্যুপকার করিয়াছিল। প্রেমের আকর্ষণে কত লোককে যে কত টাকা দিয়াছে, তাহার সংখ্যা হয় না। পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার দিকে তাহার বিশেষ দৃষ্টি ছিল। অনেক দ্রব্যাদি কিনিত এবং অতি যত্নে রাখিত। এরূপ পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা বড় অধিক স্থানে দেখা যায় না।

রাজভক্তি তাহার অন্যতর গুণ ছিল। রাজার সেবা করিবার জন্য ঐকান্তিক ইচ্ছা ছিল। এই জন্যই সকলের অমতেও অপটু শরীর লইয়া সৈনিক শ্রেণী ভুক্ত হইয়াছিল; আবারও সৈনিক হইবার জন্য বিশেষরূপ চেষ্টা করিতেছিল। ট্রষ্টিদিগের গোল মিটাইয়াই সৈনিক হইয়া চলিয়া যাইবে ও কমিসণ্ড্ পদ গ্রহণ করিবে, এই ইচ্ছা ছিল। করাচিতে একটী উচ্চ পদ লাভ করিয়াছিল। বীরত্ব তাহার যেন বংশগত অধিকার ছিল। বন্দুক রাখিতে এজন্য বড়ই ভালবাসিত।

দেশানুরাগ তাহার জীবনের সম্বল ছিল। পরোপকার তাহার পিতৃ-শোণিত-প্রাপ্ত জিনিস। কিসে পরের উপকার করা যায়, সর্ব্বদাই ভাবিত। এই জন্য ট্রষ্টডিডে মাসিক ৬০০৲ তাহার জমীদারীর মধ্যে তাহার অনুমোদন অনুসারে ব্যয় করার কথা উল্লিখিত হইয়াছিল। ট্রষ্টিরা বিষয় বিক্রয়ের পূর্ব্বেও তাহা করেন নাই বলিয়া সর্ব্বদাই দুঃখ প্রকাশ করিত। বৎসর ৭২০০৲ টাকা নিয়মিত দানের ব্যবস্থা অতি অল্প লোকেই করিয়া থাকে। সুপ্রসন্নের হৃদয় পরদুঃখকাতর ছিল। একমাত্র ভগ্নীর প্রতিও তাহার গভীর ভালবাসা ছিল।

তাহার ধর্ম্মানুরাগের পরিচয় বিশেষভাবে শ্রীযুক্ত কালীনাথ ঘোষ মহাশয় দিতে পারেন, তাঁহার উপাসনার জন্য সদাই ব্যস্ত থাকিত, তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইলে তাঁহাকে আর ছাড়িতে চাহিত না। উপাসনার তন্ময়তাতে তাহার হৃদয় পূর্ণ ছিল।

সঙ্গীতের প্রতি তাহার আবাল্য অধিকার। খোল ইত্যাদি বেশ বাজাইতে জানিত। শ্রীযুক্ত সুধাংশুমোহন গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত কালীনাথ ঘোষ, শ্রীযুক্ত রাজকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত সুন্দরীমোহন দাস প্রভৃতির গান শুনিতে বড়ই ভালবাসিত। গান শুনিতে শুনিতে তন্ময় হইয়া [illegible], উন্মাদনায় ভরপুর হইয়া যাইত। খোল বাজাইতে বাজাইতে কখনও কখনও হাত ফাটিয়া রক্ত পড়িত, তবুও বিরত হইত না।

এহেন হৃদয়খানিও ব্রাহ্মসমাজের প্রতি তাদৃশ অনুরাগ দেখাইয়া যাইতে পারে নাই, ইহা বড়ই দুঃখের বিষয়। তাহার কারণ ব্রাহ্মগণের বিরক্তি। বাল্যকাল হইতে ব্রাহ্মগণের নিন্দা শুনিয়া শুনিয়া হৃদয়টা যেন কেমন হইয়া গিয়াছিল, তৎপর ব্রাহ্মদিগের দুর্ব্যবহার। অনেককে টাকা দিয়া উপকার করিয়াছে, যখন টাকা দিতে পারে নাই, তখনই তাহারা বিরোধী হইয়া নিন্দা করিয়াছে, ইহার দৃষ্টান্ত অনেক আছে। বাড়ী ভাড়া লইয়া অপমান, অন্যতর ট্রষ্টির নিকট অপমান, পাড়া হইতে উঠাইবার জন্য অপমান, ওয়ারেণ্ট জারির সময়ে ব্রাহ্মের ব্যবহার, বিবিধ প্রকার অপমান সহ্য করিতে করিতে ব্রাহ্মদিগের প্রতি তাহার চিত্তটা বড়ই বিমুখ হইয়া গিয়াছিল; জীবনের শেষ পর্য্যন্ত

তাহা আর সংশোধন করা যায় নাই। ভাল হইব, ভাল থাকিব, এরূপ একটা প্রবল ইচ্ছা মনের উপর দিয়া চলিয়াছিল, কিন্তু তবুও ব্রাহ্মদের প্রতি ভাল ভাব হয় নাই। এজন্য ব্রাহ্মসমাজ দায়ী কিনা, ব্রাহ্মগণ সে বিচার করিবেন। টাকার জোরে কত ব্যভিচারী ব্রাহ্ম-সমাজে প্রশ্রয় পাইতেছে, কত কুকর্ম্ম আশ্রয় পাইতেছে, কত কত অনাচার চলিয়া যাইতেছে, কিন্তু সুপ্রসন্ন তেমন আহ্বান, তেমন ভালবাসা, তেমন আদর ব্রাহ্মসমাজে পায় নাই। তাহার পিতার স্বর্গারোহণের পর হইতেই এই পরিবারকে ব্রাহ্মসমাজ যেন পরিত্যাগ করেন। ব্রাহ্মই [illegible] করিতে দিলেন না, ব্রাহ্ম ট্রষ্টিরাই হিসাব দিল না, এই সকল কারণে এবং আরো অনেক অনেক কারণে ব্রাহ্মসমাজের প্রতি তাহার প্রগাঢ় অনুরাগ জন্মে নাই। প্রেমের অভাবে ব্রাহ্মসমাজ কোন্ পথে চলিয়াছে, তাহা প্রণিধানের বিষয় নহে কি? ব্রাহ্মসমাজে বাহিরের লোককে ডাকার বন্দোবস্ত কিছু আছে, কিন্তু ভিতরের লোক রাখার বন্দোবস্ত নাই। প্রেমহীন ব্রাহ্মসমাজ ব্রহ্মডাঙ্গায় পড়িয়া যেন চুরমার হইয়া যাইতেছে।

শিক্ষার প্রতি অনুরাগ তাহার খুব ছিল। ভাল পুস্তক পাইলেই পড়িত। বীরত্বপূর্ণ পুস্তক পাইলে তাহার বড়ই আনন্দ হইত। মৃত্যুর কয়েক দিন পূর্ব্বেও গুরুগোবিন্দ সিংহের জীবনীখানি বিশেষ করিয়া পড়িয়াছিল। দৈনিক সংবাদপত্রের প্রতি বিশেষ অনুরাগ ছিল।

১৮ বৎসর বয়সের বালক সিরাজ দেশের অশেষ কার্য্য সমাধা করিয়াও উচ্ছৃঙ্খল বলিয়া নিন্দিত হইয়াছিল। ৩০ বৎসর পূর্ণ না হইতে হইতেই পিতৃমাতৃহীন সুপ্রসন্ন দেহত্যাগ করিয়াছে, সে যে অশেষ গুণের অধিকারী থাকিয়াও চাঞ্চল্যের জন্য নিন্দাভাজন হইবে, বিচিত্রতা কি? তাহার দোষও ছিল। সে হঠাৎ রাগিয়া যাইয়া অন্যায় কার্য্য করিয়া ফেলিত, কিন্তু পর মুহূর্ত্তেই অনুতপ্ত হইত। শ্রীযুক্ত অনন্তনারায়ণ সেন বলেন, "সে পাপ করিলেও সে পাপ তাহাতে বদ্ধমূল হইত না, তাহার আকৃতি পবিত্রতা-মাখাই থাকিত। কপটতা আদবেই ছিল না।" সে কিছু চঞ্চল ছিল, পিতার চাঞ্চল্য তাহাতে সংক্রামিত হইয়াছিল, এই জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞতা ছিল না। যদি থাকিত, কুচক্রীরা তাহাকে ঠকাইতে পারিত না। তাহার সরলতাই তাহার জীবনের মহা অনিষ্ট সাধন করিয়াছে। সদা প্রফুল্ল, সদা অকপট, সদা নির্ভীক, সদা সরল, সদা গদগদ, সদা নিরহঙ্কার, সদা প্রেম-বিহ্বল, সদা নিষ্কাম। তদীয় ভাব দেখিয়া সকলে সর্ব্বদাই মুগ্ধ হইত। বারম্বার বুঝাইয়া দিলেও কোন প্রস্তাবের শেষ রক্ষা করিতে পারিত না। সুপ্রসন্নের জীবন এক আশ্চর্য্য জীবন। জ্ঞানে সে প্রবীণ ছিল না, বুদ্ধিতে সে প্রখর ছিল না, প্রতিভায় সে অদ্বিতীয় ছিল না, সে কেবল ঠকিতে আসিয়াছিল, ঠকিয়াই জীবন-লীলা শেষ করিয়াছে। অন্যকে ঠকাইয়া যাঁহারা চলেন, তাঁহাদের সহিত তাহার তুলনা হয় না। ধার্ম্মিকতার ভাণ তাহাতে ছিল না, নিরহঙ্কার মূর্ত্তিতে সদা বালকের স্বভাব ফুটিয়া বাহির হইত। কিন্তু উপাসনার সময় সে মূর্ত্তি অন্য প্রকার হইয়া যাইত। যাঁহারা অনাচার কদাচারে ডুবিয়াও নেতৃত্ব করেন, তাঁহাদের সহিত তাহার তুলনা হয় না, সে যাহা, তাহাই ব্যক্ত করিত, ধামা চাপা দিয়া বাহাদুরী লওয়ার ইচ্ছা তাহার মোটেই ছিল না। সে যেন ভগবানের এক অত্যাশ্চর্য্য সৃষ্টি। সহচর-

দিগকে জিজ্ঞাসা কর, এ কথার প্রতিধ্বনি পাইবে। আজ আর অধিক কিছু বলিব না।

আজ কেবল মাণিকদহের কথাই প্রাণে জাগিতেছে। সোণার মাণিকদহ আজ শ্মশানে পরিণত; অচিরকাল মধ্যেই বিপিন বিহারীর বিষয় বিভব বিক্রয় হইয়া যাইবে। একজনের অভাবে সোণার দেশ ছারখারে যাইতে বসিয়াছে। একখানি উইল থাকিলে এ দেশ এমন ভাবে বিনাশের পথে যাইত না এবং পরোপকারের দ্বার রুদ্ধ হইত না। একখানি উইলের অভাবে প্যারীমোহন, গগনসুন্দরী ও কুসুমকলিকা পথে দাঁড়াইলেন, মোক্ষদায়িনী অকূলে ভাসিলেন, সুপথ অসময়ে দেহত্যাগ করিল, সুপ্রসন্ন পথের ভিখারী হইয়া মনোকষ্টে প্রাণ বিসর্জ্জন দিল, মাণিকদহ ব্রাহ্মসমাজ উঠিয়া গেল, এবং মাণিকদহ মহা শ্মশানে পরিণত হইল। এই নির্ম্মম ইতিহাস লিখিতে কেবল আমিই বর্ত্তমান রহিলাম। যিনি উইল করিতে দেন নাই, তিনি ত্রিকালজ্ঞ দেবতার নিকট কি কৈফিয়ৎ দিবেন, জানি না, কিন্তু এ সংসারে তাঁহার কোন কৈফিয়ৎ নাই। ব্রাহ্মই ব্রাহ্মসমাজ ধ্বংসের কারণ, একথা গভীর মনোকষ্টে আজ জগতের দ্বারে নির্ভয়ে ঘোষণা করিলাম। সকলে অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন।

তবে যাও, সুপ্রসন্ন, যাও সেই অনন্তধামে, যেখানে পিতৃমাতৃ স্নেহ পাইবে, শ্বশ্রূ ঠাকুরাণীর ভালবাসা পাইবে, ভ্রাতাদের স্নেহ পাইবে এবং সাধু সাধ্বীদিগের অকৈতব প্রেমের পরিচয় পাইবে। তুমি স্বর্গের শিশু, এই মর্ত্ত্য তোমার বাসের যোগ্য স্থান নয়। পিতার বিষয় অচিরকাল মধ্যে বিক্রয় হইয়া অন্যের হাতে যাইবে, তাহা তোমাকে দেখিতে হইল না, ইহাই তোমার প্রাণের শান্তি। তুমি অনেক দুঃখ কষ্ট পাইয়া গিয়াছ, অবিচারে ও চক্রান্তে তোমার হৃদয় ক্ষত-বিক্ষত হইয়াছে, এখন পিতার ক্রোড়ে পরম শান্তিতে বাস কর। আশীর্ব্বাদ করিও, তোমার পরিত্যক্ত পুত্র কন্যা ও পত্নী যেন শান্তিতে থাকে, এবং তোমার পিতার কীর্ত্তি যেন বজায় রাখিতে পারে। আমি এক দিনও তোমাকে তিক্ত কথা বলি নাই, আশীর্ব্বাদ করিও, তোমার ভক্তি ও আমার ভালবাসা সংযুক্ত হইয়া যেন অহৈতুকী প্রেম-সেতু রচনা করে; এবং আমি, এই বার্দ্ধক্যে, তোমার গুণ ও তোমার পিতার গুণ স্মরণ করিতে করিতে যেন স্বর্গের উপযুক্ত হইতে পারি। আশীর্ব্বাদ করিও, আমি যেন আদর্শ ব্রাহ্মজীবন যাপন করিয়া সেই অনন্তলোকে তোমার প্রেমের উপযুক্ত হইতে পারি। এই ধরা মধুময় হউক, ঐ স্বর্গ মধুময় হউক। দ্যুলোক, ভূলোক, অন্তরীক্ষ মধুময় হউক। যোগী ঋষি, সাধু মহাত্মারা ধন্য হউন, পিতৃলোক, মাতৃলোক ধন্য হউন, তোমার নামের সৌরভে পুষ্পচন্দন বর্ষিত হউক; তোমার পরিত্যক্ত পরিবার ধন্য হউক। তোমার পুত্র কন্যার দ্বারা যেন আবার এই ধরায় তোমার পিতৃকুল ও মাতৃকুলের মুখ উজ্জ্বল হয়। আজ চতুর্দ্দিকে শুধু মধু বর্ষিত হউক। ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

সুপ্রসন্নের মৃত্যুর পর সান্ত্বনা প্রদানের জন্য শত শত সাধু সাধ্বী, বন্ধু ও আত্মীয় আত্মীয়ার পত্র পাওয়া গিয়াছে, স্থানাভাবে সব ছাপা হইল না, কেবল এই একখানি পত্র মাত্র ছাপান হইল— (শ্রাদ্ধের পর-দিন)

৩৩নং গ্রে ষ্ট্রীট্, কলিকাতা,
২৩শে ভাদ্র, ১৩২৫।

প্রিয় দেবীবাবু,

বড় দাগা—বড় শোক পেয়েছি। সান্ত্বনা আমার চির স্নেহের বস্তু। সহানুভূতিতে

প্রাণ ভরিয়া আছে। কি করিয়া প্রকাশ করিব, বুঝিতেছি না। মা আমার শোকে বিহ্বলা—গণ্ডে অশ্রুধারা। কয়েক ফোঁটা চোখের জল কাছে দাঁড়াইয়া ফেলিতে ইচ্ছা হইতেছিল। সুবিধা হয় নাই।

মরণের দুয়ারে দাঁড়াইয়াছি। কি আছে? কি দিব? সন্তপ্ত প্রাণের অশ্রুজলে ভিজাইয়া কয়েকটী কথা গাঁথিয়া পাঠাইলাম। পিসা মহাশয়ের এই শেষ দান—শেষ আশীর্ব্বাদ মায়ের প্রাণে এক বিন্দু সান্ত্বনা দিতে পারিলে কৃতার্থ হইব।

পিসিমা এখানে নাই। সান্ত্বনা তাঁ'র হাত-কুড়ানে ধন। আর নাই এখানে স্নেহের ভগিনী কমলকামিনী দেবী। তাঁরই সান্ত্বনার জন্য সান্ত্বনার প্রেরণ। দয়াল প্রেরক আগে পিছে দু'জনকেই লইয়া গিয়ে চির শান্তিময় পদে স্থান দিয়াছেন। কমলকামিনী অক্ষুণ্ণ সান্ত্বনা লইয়া কাম্য ধামে চলিয়া গিয়াছেন। এই নিবিড় গভীর শোকের আঁধারে—বিচ্ছেদের তপ্ত ঝটিকার ভিতরে মঙ্গলময়ী জননীর মঙ্গল-প্রদীপের দীপ্তি দেখিতেছি।

জন্মমুহূর্ত্তে দেখিয়াছি। শৈশবে, বাল্যে, কৈশরে, যৌবনে দেখিয়াছি। বিবাহিত ও পুত্রকন্যার জননী গৃহিণী দেখিয়াছি। আজ আমার মা সান্ত্বনাকে কি দেখিতেছি? বলিতে মুখে কথা সরে না। বুক ফাটিয়া দু' ফাঁক হইয়াছে। কয়েকটী কথা ভাবিয়া কয়েক ফোঁটা তপ্ত জল পাঠাইলাম। "নব্যভারতে" ছাপিয়া মুমূর্ষের শেষ দাগ—শেষ আশীর্ব্বাদ চির বজায় রাখুন, এই কামনা।

আর আপনাকে যাহা লিখিলাম, আপত্তি না থাকিলে তাহাও ছাপুন। এও শেষ কালের কথা। অভাগার দলিত মলিন শুষ্ক স্মৃতির জন্য দরকার হইলে কাজে লাগিবে।

চলেছি ভাই। মায়ের আহ্বান সানন্দে শুনিতেছি। যেমনই হই, আমিও তাঁহার পূজার নির্ম্মাল্যের একটী মলিন শুষ্ক ফুল। দয়াময়ী অধম ব'লে, এ সংসারের লোকের মত পায়ে ঠেলিবেন কি? মায়ের যে দয়া ও প্রেম অপরাজিত। আমিও সংসারকে চিনেছি। মানুষকে মানুষের ছবির আড়ালে, সাত পরল চামড়া মাংস অস্থির নীচে বুকে যাহা আছে, তাহা জেনেছি। তবু "গাঁয় মানে না—আপনি মোড়ল" সাজিয়া মানুষের পাশে পাশে ঘুরি। কেন না, প্রেমময়ীর যাহা কিছু আমারও প্রেমের জিনিষ।

প্রীতি পাই, দেখি তাই,
কেহ দেখিবে আশা করি না।
প্রাণ চায় ডাকি তায়,
কেহ ডাকিবে কভু ভাবি না।

স্নেহের বিষ্ণু।

আদ্যশ্রাদ্ধে সুচেতার প্রার্থনা।

হে পরম পিতা পরমেশ্বর, আমরা অবোধ শিশু তোমার বিধান বুঝি না, তুমি কেন যে আমাদিগের পরম পূজনীয় পিতাকে তোমার কোলে তুলিয়া লইয়া আমাদিগকে নিরাশ্রয় করিলে, তাহা আমরা কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। আমাদের ঘর তাঁহার অভাবে আজ শ্মশানের ন্যায় হয়েছে, ছোট ভাই বোন যখন বাবাকে অন্বেষণ করে, তখন মায়ের চক্ষু ছল ছল করে, কোন উত্তর দিতে পারেন না। তাঁহার অভাবে ঘর বাড়ী একেবারে শূন্য হইয়াছে। আমাদের দশা আজ তুমি ভাল করিয়া বুঝিতেছ, অবোধ ভাই বোনের প্রাণে শান্তি দেও, মাকে সান্ত্বনা দেও এবং পিতাকে তোমার চরণে আশ্রয় দেও। তিনি যেন আমাদের

অন্য দুঃখ না করেন, তুমি তাঁহার চিরসহায় হইয়া থাক এবং আমাদিগকে তোমার চরণে আশ্রয় দিয়া রাখ। পিতা, সকল অবস্থাতেই তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক। তুমি পিতার পিতা হইয়া চিরদিন আমাদিগকে প্রতিপালন কর।

আদ্যশ্রাদ্ধে প্রসূনের প্রার্থনা।

হে দয়াময়, তুমি যেদিন আমাদিগের পরম পূজনীয় একমাত্র-পিসে-মহাশয়কে আমাদিগের নিকট হইতে লইয়া গিয়াছ, সেই দিন হইতে আমরা যে কি ভাবে আছি, তাহা তুমি বুঝিতেছ। তাঁহার অভাবে আমাদের হৃদয় প্রাণ ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে, সব যেন শূন্য বলিয়া বোধ হইতেছে। সবই রহিয়াছে, কিন্তু তাঁহার সৌম্য মূর্ত্তি, তাঁহার অকৃত্রিম ভালবাসার অভাবে আমাদের কি দশা হইয়াছে, তাহা ব্যক্ত করার সাধ্য নাই। তাঁহার অভাবে আমরা নিরাশ্রয় হইয়া পড়িয়াছি। এই দুর্দ্দিনে তুমি আমাদিগের সহায় হও এবং পিসে মহাশয়কে সকল মনস্তাপ হইতে রক্ষা করিয়া পরম শান্তিতে তোমার আশ্রয়ে রাখ। তুমিই সহায় এবং আশ্রয় হইয়া তাঁহাকে ও আমাদিগকে চিরদিন কল্যাণের পথে চালিত কর। তোমার প্রেমময় মূর্ত্তি আমরা ভাই বোন কয়টী যেন কখনও না ভুলি। তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হউক।

শ্রাদ্ধোপলক্ষে রচিত।

রাগিণী—ললিত-বিভাস। তাল—ঠেকা।

ওগো আর কেন র'লে আড়ালে, আমায়
দেও গো পরিচয়।
তোমার সনে খোলাখুলি হ'লে ভাল হয়।
কখন দেখি তারা দলে
আছ গো নভোমণ্ডলে;
চন্দ্র সূর্য্য রূপে আবার হও গো উদয়।
অসীম সাগর-তরঙ্গে
নাচ তুমি রঙ্গে রঙ্গে;
দেখি তোমার সঙ্গে সঙ্গে পবন সদা রয়।
ঐ যে দেখি ঘন-ঘটা,
চমকে বিদ্যুৎ ছটা;
আঁখির পলকে তুমি ঘটাও গো প্রলয়।
হাসির মাঝে তুমি হাসি,
দেখি তোমায় দুঃখে ভাসি;
অনলে সলিলে থাকি দেখাও অভিনয়।
সুধা-ভাণ্ড লয়ে হাতে
বিলাও তুমি পাতে পাতে;
তোমার প্রেম-সুধা পান করিলে সবই মধুময়।

শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র দে।

সান্ত্বনা।

(১)

লোকে বলে "চলে যায়"।
কোথা যায়? বলা দায়।
বহু চিহ্ন রেখে যায়
সে যে গো জড়িয়ে থাকে তায়।
আর ছায়া মত হেরি,
আতঙ্কে উঠি শিহরি,
মন বলে "ধরি ধরি।"
ধরা কি এমন করে যায়?

(২)

প্রীতির চিহ্ন মরমে।
স্মৃতি জাগে গো করমে।
সে যে জাগে গো ধরমে।
অরূপে সে দেয় দরশন।
বদনে সে আলাপন।
হৃদয়ে সে পরশন।
আঁকে ছবি প্রাণ মন।
ধেয়ানে সে দেয় দরশন।

(৩)

দেহ তার যায় চ'লে।
সে কি যায় তাই বলে'?
থাকে সে কাছে আড়ালে।
যে জানে ধরিতে দেয় ধরা।
বাঁধি প্রাণ প্রেম-ডোরে,
বাঁধেনি কি আপনারে?
সে কি তা ভুলিতে পারে?
সে যে চেতন, নহে গো মড়া।

(৪)

প্রেমময়, দয়াময়,—
তাঁ'র রাজ্য মধুময় ?
কিবা শোক ? কিবা ভয় ?
আঁকড়িয়ে, ধর পা, সান্ত্বনা।
সে পদে, তাহারে পাবে।
সব দুঃখ ভুলে যাবে।
পরাণ শীতল হবে।
তাহে পাবে মা, চির-সান্ত্বনা।

চিরশুভাকাঙ্ক্ষী
শ্রীবিষ্ণুচরণ চট্টোপাধ্যায়

(আদ্যশ্রাদ্ধে গীত।)

কানাড়া—একতালা।

সেই ত ধরণী রয়েছে তেমনি,
সেই কত ফুল ফুটেছে ;
কি যেন গৌরব, কি যেন সৌরভ,
কে যেন হরিয়া লয়েছে।
উৎসবের যাত্রী চলিয়াছে সব,
পথের দুধারে সেই কলরব ;
থাকিয়া থাকিয়া, কাঁদিয়া কাঁদিয়া,
কার সুর প্রাণে উঠেছে।
একখানি প্রাণ হলে অন্তর্দ্ধান
সব কেন যায় ফিরিয়া ?
এত ছিল হাসি, এত বাজে বাঁশী,
সব কেন যায় থামিয়া ?
হৃদয়-মাঝারে ডেকে ডেকে কারে
প্রেম কেন মরে কাঁদিয়া ?
আজ প্রাণ-ধনে ধরিব কেমনে,
(বড়ই) পথচেয়ে প্রাণ রয়েছে।

ভৈরবী—জলদ একতালা।

মায়ের ছেলে মায়ের কোলে
কেমন হাসে খেলে !
প্রেমানন্দে বেড়ায় ভেসে
জলের মাছ জলে।
দিয়েছিলে মা নাম,
সে নামে কত আরাম ;
কি আনন্দে ভাস্‌ত সে প্রাণ
তোমার দেখা পেলে।
তোমার প্রেম ধরায় এল,
তোমার প্রমাণ রেখে গেল,
তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হ'ল
তাই কি ডেকে নিলে ?
তোমার ঘর হ'ল পূর্ণ ;
এ ঘর যে মা বড় শূন্য !
থাক তুমি ল'য়ে কোলে
সোণার শিশু ছেলে।

টোড়ি ভৈরবী—একতালা।

শূন্য ক'রে প্রাণ স্নেহের সন্তান
কোথা চ'লে যায় সুপ্রসন্ন রায় !
মা-হারা ছেলে মা ফিরে পেলে ;
কতই বিপদে বাঁচাইলে তায় !
উদার হৃদয় জানে না'ক পর ;
কত ঘরে মাগো তাহার যে ঘর ;
তাল লয় মান তার যে মা প্রাণ,
মধুর মৃদঙ্গে মাতিয়ে মাতায়।
বীর পিতামহ তার যে মা প্রাণে,
দাতা ভক্ত পিতা তার যে মা দানে ;
লক্ষ্য-ভেদী বীর, সৈনিক অস্থির ;
রাজ-হিতে প্রাণ দিতে ছুটে যায় ;
এত ক'রে দান তুষ্ট নয় প্রাণ,
আরো দিবে ব'লে করেছে প্রয়াণ ;
মাগো তারে ধর, আশীর্ব্বাদ কর ;
রাখ দয়া ক'রে ওপদ ছায়ায়।

শ্রীকালীনাথ ঘোষ।

REFORM SCHEME

সম্বন্ধে Indian Daily News বলেন—(Friday, Sep. 23rd, 1918. Random Notes, 4)

"The reform scheme, it will be discovered some day, is merely an attempt to make the Government of India more autocratic than before. It is camouflaged with such beautiful sentiments that it has deceived many."

নানা কবিতা

অনাথার কথা।*

(ওই) বড় বাড়ী কাছে মোর ছোট কুঁড়ে ঘর
বিশ্বে মম কেহ নাহি আপনার পর।
দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করি, যাহা আমি পাই
ভাঙ্গা ঘরে আনি রাখি—অন্য কিছু নাই।
ঘর-খুঁটি পাই কোথা খেতে নাহি পারি,
জীর্ণ ঘর নুয়ে আহা, তুলিবারে নারি।
বড় বাড়ী সাজে মরি উল্লাস-উৎসবে;
ভাঙ্গা দুঃখী ঘর পাশে বীভৎস এ ভবে।
কর্ত্তা আসি ভাঙ্গি যায় অসহায় ঘর;
রৌদ্র বৃষ্টি রহি কোথা—কহি যুক্ত কর।
বড়লোকে শুনেনাক ছোট লোক কথা—
দীনবন্ধু কৃপাসিন্ধু কারে বলি ব্যথা!
হাঁড়ি হুকা কাড়ি নেয়, আঁকড়িয়া ধরি;
জোরে দা'র কোপ দেয়—আছাড়িয়া পড়ি।
দর দর রক্তধারা, ধরা'পরে আমি;
অবলার অত্যাচার হেরে অন্তর্যামী।
ঘর মোর আস্‌বাব্ সব ছার্‌খার্;
ধূলায় লুটাই, তবু করে 'ধর' 'মার'।
স্বামী-ভিটে গেল মোর সরবস্ব ধন—
কোথা হায় অনাথার আশ্রয়-শরণ!
বুক ফাটি যায় আর চোখ ভাসি যায়—
ধূলার কাঙ্গালী আজি সব ছাড়ি যায়।
ভিক্ষা বেচে ক'টি টাকা ছিল মোর হাতে,
কেবা জানে কত যত্নে কুড়ান তা—ইথে!
কত দিন কত বেলা কায়ক্লেশে উপবাস
সহিয়াছি, রাখিয়াছি (ওই) টাকা বারমাস
গাঁটে ওই প্রিয় টাকা—নেত্রে ছল ছল
উকীলের বাড়ী আসি, বিপদে বিকল।
মোকদ্দমা রুজু হল হাকিম-সকাশে;
যত সব মনোদুঃখ বলি তাঁর কাছে।
কাটা হাত দেখাইনু সযতনে তুলি;
আসামী তলপ্ হয়—দুঃখ যাই ভুলি।
ভাবি আমি—পাব পুনঃ হারায়েছি যাহা;
রাজা আছে, রাজ্য আছে,যাবে মোর তাহা?
হুজুর কহিলা, "হাত দেখাও ডাক্তারে—
অভিমত-পত্র তাঁর লাগিবে বিচারে।"
আঁখি জলে কহি—বাবা, কিছু মোর নাই;
ডাক্তারে দর্শনী দিব টাকা কোথা পাই?
সাক্ষী সবে একে একে প্রতিপক্ষে যায়—
অভাগী শুনানী-কালে একজনে পায়।
আমারে বিশ্বাস করি দিলা তারে দণ্ড;
বড় বড় সাক্ষী তার হল সব ভণ্ড।
দুই কুড়ি জরিমানা হইল তাহার—
মুচলকা ছয় মাস সাধু-ব্যবহার।
'জরিমানা লয়ে দিন্', উকীলেরে বলি;
তুমি নাহি পাবে তাহা—কহি যান্ চলি।
মোর বাড়ী মোর ঘর মোর সব গেল;
আমি কিছু নাহি পাব! এ কেমন হল?
গাঁটে যাহা ছিল বাকী তাও করি ব্যয়
ন্যায়ের বিচারে শেষ এই হলো জয়!
(আজি) কারে বলি কেবা শুনে দুঃখিনীর কথা
কে বুঝিবে কে ঘুচাবে দরদ এ ব্যথা!

শ্রীযোগেশচন্দ্র লালা, এম-এ, বি-এল্।

* তাহার নাম "শ্রীমতী"—প্রকাশ নাম—"সহচরী" —নিবাস 'কাটলী'। সে প্রৌঢ়া।

স্বদেশপ্রাণ সুব্রহ্মণ্য আয়ার।

নমঃ নমঃ সুব্রহ্মণ্য! নমঃ নমঃ পুরুষ সত্তম!
প্রদীপ্ত তেজের মূর্ত্তি! অভীর বিগ্রহ নিরুপম!
ত্যাগের আদর্শ দ্রষ্টা! স্বদেশের সুকৃতি সন্তান!
ভারতের হিতব্রতে নমঃ নমঃ উৎসর্গিত প্রাণ!

তমসার রুদ্ধ গৃহে জ্বালি'একি আলোকবর্ত্তিকা
দাঁড়াইলে অকস্মাৎ, উদ্ভাসিল শত হোমশিখা
দুস্তর নিরয়ে যেন! হে মহান্! ব্রহ্মণ্য দেবতা!
তুমি কি শুনিয়াছিলে জননীর মর্ম্ম ব্যাকুলতা
"ময় ভুখা হ"—ধ্বনি? আজি তাই "স্বরাজ"-যজ্ঞের
হবিঃ রূপে বলি রূপে মোহমুগ্ধ স্বার্থান্ধ বিশ্বের
অনন্ত বিস্ময় রূপে আপনারে আসিলে লইয়া
হে সৌম্য ঋত্বিকশ্রেষ্ঠ! পূর্ণাহুতি আনন্দে অর্পিয়া
মুমুক্ষু ভারত-চিত্তে তুমি আজি দিবে কিগো দান,
ত্রিলোকবাঞ্ছিত চরু—শুদ্ধ শান্ত অক্ষয় অম্লান
দেব-আশীর্ব্বাদ সম! মহাসিন্ধু করিয়া মন্থন
হে অজেয় শক্তিধর! হইয়াছে আজি আয়োজন
যে গরল উঠিবার, তুমি তাহা নীলকণ্ঠ মত
আপনি করিয়া পান ধন্য ধন্য হে স্বদেশব্রত!
শুষ্ক-কণ্ঠ স্বদেশের সুধা শুধু করিবে অর্পণ
জুড়াতে হৃদয় জ্বালা! একি শুধু ত্যাগ অতুলন?
মহর্ষি দধিচী এবে আপনার পূত অস্থি দিয়া
ভুবন-কল্যাণ তরে বজ্র পুনঃ তুলেন গড়িয়া
জীবন্মৃত বসুধায়!
হে সম্যকদর্শী কর্ম্মবীর!
তব পাশে তুচ্ছ সেই ঐশ্বর্য্য সম্ভ্রম ধরণীর
দেশধর্ম্মে বাধে যাহা, তুমি পার তৃণের মতন
চরণে দলিতে তায়! যে দেখেছে অসীম গগন,
যে শুনেছে সাগরের চিত্তোন্মাদ মহাআবাহন,
যে পেয়েছে আত্মা মাঝে মাতৃপদ-পরশ রতন,
সে কেমনে রবে বদ্ধ অন্ধকার গুহা-কারাগারে
অনিত্য সুখের আশে? শৃঙ্খলিত করিবারে পারে
কোন্ প্রলোভন তারে? আত্মজয়ী কেশরী-সন্তান!
"স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ" ঈশবাক্য হ'ল মূর্ত্তিমান
তোমাতেই সত্য আজ! মনুষ্যত্ব দেবত্বের সনে
করে বুঝি কোলাকুলি! প্রতাপ বেঁধেছে আলিঙ্গনে
প্রতাপী হৃদয় তব অগ্নি-মন্ত্রে করিয়া দীক্ষিত
না জানি কি শুভক্ষণে! তাঁ'রি মত রহি' অকম্পিত
আঘাত-সংঘাতে শত মাতৃভূমি-গৌরব-কেতন
করি' উত্তোলিত ঊর্দ্ধে বনে বনে করিবে ভ্রমণ
যতীবেশে নরোত্তম! তাই তবে হে রাজসন্ন্যাসি
হোক্ আজি!

ত্যজি' দ্বিধা এস মোর এস দেশবাসি!
প্রবুদ্ধ সোদরবৃন্দ! ওই দৃপ্ত পতাকার মূলে
বলি দিয়ে স্বার্থ-দ্বেষ, সব শঙ্কা-অভিমান ভুলে
দাঁড়াব উন্নত শিরে! এল আজি মহাসন্ধিক্ষণ
বিশাল ধরিত্রী-বুকে, মৃত্যু সাথে অমৃতের রণ
বাঁধিয়াছে দিকে দিকে! বিশ্ব হতে হবে অবসান
সকল অশুভ-গ্লানি, পাব মোরা বিধিদত্ত স্থান
আবার এ ভূমণ্ডলে! এ বিশ্বাস রাখিয়া গভীর
লক্ষ্য রাখি বিভুপদে, ব্রহ্মতেজঃদীপ্ত সেনানীর
পদচিহ্ন অনুসরি' এস সবে হই অগ্রসর
জন্মভূমি জননীর জয়গীতে কাঁপায়ে অম্বর!

শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত।

স্বাধীনতা।

স্বাধীনতা, ওগো স্বাধীনতা,
কহ শুনি তোমার বারতা।
দুর্লভ দরশ লাগিয়া,
সবে মরে কাঁদিয়া যুঝিয়া।
স্বাধীন হইতে ওরা চায়,
কেমনে—তা' ভেবে নাহি পায়।
ভ্রান্তির কুহেলিকা দিয়া
রাখিয়াছ বিশ্ব ধাঁধিয়া।

স্বাধীনতা, ওগো স্বাধীনতা,
গগনের মত উদারতা।
নির্ভয়ে ঘিরি ত্রিভুবন,
বুকে কত তারকা-তপন।
কভু হাস অরুণ-কিরণে,
কভু কাঁদ মেঘ বরিষণে।
দাও সদা যাহা প্রয়োজন,
নিতি কত নব আয়োজন!

স্বাধীনতা, ওগো স্বাধীনতা,
সমীরণে তোমার বারতা।
কভু বহ ধীরে—অতি ধীরে,
হাসাইয়া ফুল-কলিটিরে;
কভু নাচ মাতালের প্রায়,
বোধ যেন নাই—কে কোথায়!
বন্ধু কি শত্রুর দ্বন্দ্ব,
কিছুতে তো হারাও না ছন্দ।

স্বাধীনতা, ওগো স্বাধীনতা,
দীপ্তির প্রথম বারতা।
তুমি নব প্রভাতের আলো,
হিয়ার আঁধারে জ্যোতি ঢালো।
হাসায়ে নাচায়ে দশদিক্
উল্লাসে মাতিছ নির্ভীক।
মানোনা তো কোনা ভয়-বাধা,
তরাসে লুকায় যত আঁধা।

স্বাধীনতা, ওগো স্বাধীনতা,
সিন্ধুর তুমি গভীরতা।
অকারণে যত গরজন,
সে শুধু বিফল জাগরণ;
ঊর্ম্মির তরঙ্গ-ছটা,
সব তার বাহিরের ঘটা।
সমাহিত শান্ত হৃদয়,
কিছু তার কিছু নাহি হয়।

স্বাধীনতা, ওগো স্বাধীনতা,
পৃথ্বীর মত তুমি নতা।
সহিয়া সবার অতিচার,
নীরবে বহন কর তার।
তোমার নীরব প্রতিশোধ,
কেহনা করিতে পারে রোধ।
নীরবে নীরবে তুমি থাক,
নীরবে আপন মান রাখ।

স্বাধীনতা, ওগো স্বাধীনতা,
কহ কহ তোমার বারতা।
কেড়ে লয়ে অপরের প্রাণ,
নির্ম্মম করে বলিদান;
সেই অতি হেয় দীনহীন,
হতে কভু পারে কি স্বাধীন?
স্বাধীনতা শুধু কি গো জয়?
যাহে এত দুর্ম্মদ ভয়?

স্বাধীনতা, ওগো স্বাধীনতা,
তুমি কার কহ সে বারতা!
প্রজা লাগি ভাবিয়া যে ক্ষীণ,
সেই রাজা কভু কি স্বাধীন?
সমাজের ভয়ে যে মলিন,
সে মানব কভু কি স্বাধীন?
ত্রিতাপের তাপে তনু ক্ষয়,
নহে নহে কভু ওরা নয়!

স্বাধীনতা, ওগো স্বাধীনতা,
ভূমার সাধনে তুমি নেতা!
নম্র যে জন ফল-ভারে,
বজ্র যে রিপুর সমরে,
নগ্ন যে সব বিলাইয়া,
মুক্ত যে অনাবিল হিয়া,
স্বাধীনতা-মরম যে জানে,
মুগ্ধ সে ভূমার গানে।

স্বাধীনতা, ওগো স্বাধীনতা,
স্বতন্ত্র তুমি হে দেবতা!
যার হয় শুভ পরিচয়,
প্রিয় সনে যার পরিণয়,
বন্ধুর যে জানে খবর,
দরদীর যে হয় নফর,
তারে তুমি কর গো বরণ,
একাকার জীবন-মরণ।

দরবেশ।

কাব্যকুসুমাঞ্জলী-রচয়িত্রীর প্রতি।

কোন অমরার দেবী শাপভ্রষ্টা তুমি,
এলে এই বঙ্গভূমে জ্যোতির্ম্ময়ীরূপে?
একাধারে জ্ঞান, ভক্তি, প্রেম, সরলতা,
পবিত্র আননে মাখা। শান্তি-প্রবাহিণি!
(বঙ্গের খনির গর্ভে তুমি কোহিনুর)
কি উজ্জ্বল শান্ত আঁখি—বাণী সুমধুর,
হৃদয়ে করুণা উৎস স্নেহ সুধামাখা,
করেছে মাতৃস্নেহে পূর্ণ; মহিমা গৌরবে
চির গরীয়সী তুমি—নারীকুল নিধি।
পূত প্রসূনাঞ্জলি সে সু-কোবিদকুল,
ঢালে তব পাদপদ্মে, যথা ভারতীর।
রচেছ' মধুচক্র স্মরি "মধুসূদনে"
"গৌড় জন" প্রাণ ভরে পিয়ে দিবানিশি
ভুঞ্জিছে ত্রিদিবসুধা—তোমার কল্যাণে।

শ্রীনীলরতন মুখোপাধ্যায়।

সাগরের দর্প।

(১)

আকাশে হেলান দিয়ে নারিকেল গাছ
সারাক্ষণ দেখে চেয়ে সাগরের নাচ।
গরবের ভরে তারে জিজ্ঞাসে সাগর—
"কেমন উঠিলে তুমি বেলার উপর?
আমি যে বিশাল সিন্ধু প্রবল প্রতাপ
যুগ যুগ যুদ্ধ করি, দিই বেগে লাপ,
উঠিতে পারিনি তবু, কেমনে গো তুমি
রবিকরে শোভিতেছ উঠে বেলাভূমি?
ব্যর্থ মোর সেনাদল তরঙ্গেরা শত
জাগিছে তাদের প্রাণে ধিক্কার সতত।"
তখন পাদপরাজ কহিল সাগরে—
"রেখে দাও তুচ্ছ খেলা, অসীমে জাগরে।
যতই হোক না বল হিংসা জরজর
পারেনা করিতে জয় বিশ্বচরাচর!"

(২)

আবার আরেক দিন লভি অবসরে
জিজ্ঞাসিল সিন্ধুরাজ সেই তরুবরে—
"নিদাঘে যন্ত্রণা কিবা দেখ হে পাদপ
দিবারাত সহ্য করি' প্রখর আতপ
তবু ত সুফল ধর; কিবা রসময়
থাক তুমি অনুক্ষণ সকল সময়!
বল দেখি কি কারণ তবে মোর প্রাণে
সদা কেন মনস্তাপ হাহুতাশ হানে?
মোর কোষাগার দেখ সিন্ধুর সিন্ধুক
কত রত্নরাজীপূর্ণ, তবু নাহি সুখ।
"বিপদে সম্পদে সদা ধৈর্য্য ধরে' থেকো
হে বিশাল সিন্ধুরাজ! মনে ভেবে দেখো
ব্যর্থ চেষ্টা বৃথা নয়—তব আঁখিজল
ভাসাইছে মেঘ হয়ে শুষ্ক ধরাতল।"

শ্রীঋতেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

কল্যাণী।

মম পিয়াসার খাণ্ডববন শীতল করিতে আজি,
এসেছ কি ওগো বাদলের ধারা কল্যাণীরূপে সাজি?

প্রীতির সাগর মন্থন করি
আনিলে কি সুধা ওগো সুন্দরী,—

পুণ্য পীযূষ নির্ঝরধারা উছলে ঝরে আজি ?
লহ হৃদয়ের প্রীতি-বন্ধন ওগো নন্দন রাণী,
বিশ্বে এনেছ লক্ষ্মীপুরীর পুণ্য প্রদীপখানি।

বেদনাবিধুর নিশার মতন,
এ হৃদয় চির ঘুমে অচেতন ;
আজিকে এসেছ শুনাতে তাহার কোন সে
আশার বাণী ?
দুঃখ-বেদন গরল-সিক্ত অন্ধ হিয়ার তলে,
আশার আলোক ক্ষণে ক্ষণে আজ বিদ্যুৎ সম
জ্বলে।

তব মঙ্গল স্নিগ্ধ পরশ—
নিখিল ধরণী করিছে সরস,
শান্তিতলাসী পিয়াসী হৃদয়ে হরষের ধারা
উছলে।

শ্রীশ্রীপতিপ্রসন্ন ঘোষ।

বৃথা অনুশোচনা।

অবশ্য ত্যেজিব গৃহ তাহা কি তুমি জান না ?
তবে তারে ভালবাসি কেন সহ গঞ্জনা ?
কেন তবে এত আশা   কেন এত বিড়ম্বনা ?
ধনের লালসা সদা কেন দেয় গো যাতনা?
সাজায়েছ গৃহখানি   অনুপম অনুমানি
তাহা পুরীষে পোরা দুর্গন্ধেরি আবর্জ্জনা !
চড়িয়া কামের রথে   ধাও রোজ নব পথে,
লয়ে যায় যে বিপথে,সুপথ সে যে জানেনা।
ষড়রিপু মিত্র মানি   তার কথা হিত গণি,
খুইয়ে সকল শেষে দারিদ্র্য দেয় বেদনা।
সায়াহ্নে শুইয়া এবে   ভাবিলে ফল কি হবে ?
সময় সরিয়া গেছে, বৃথা এ অনুশোচনা॥

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র লাহিড়ী, বি-এল।

নব্যভারত।

সমাধির উচ্চ শৃঙ্গে বসি পিতৃগণ
হৃদয়ের অভ্যন্তরে হোমাগ্নি জ্বালিয়া ;
কত রত্নরাজি তাঁরা করি সংহরণ
তোমাদের তরে ভাই গিয়াছে রাখিয়া।
দেখেছ কি দিব্য দৃষ্টে সেই পুণ্যভূমি,
ভেবেছ কি তাঁহাদের অনন্ত অক্ষয়,
পুণ্য রাজিগুলি, স্নিগ্ধ করোজ্জ্বলময়ী,
বিনিময় করিলেন কি রত্ন সঞ্চয়।
কপিলের সাঙ্খ্য, আর গৌতমের ন্যায়,
কনাদের বৈশেষিক ব্যাসের বেদান্ত,
দীনতার অন্তরালে বসি তাঁরা সবে,
রচিয়াছে কত শাস্ত্র অক্ষয় অনন্ত,
ভাব কিহে হে ভারত ? পড় কি হে তুমি
কর কি হে কোন কাজ সেই শাস্ত্র মত,
না, জড়ত্বের পুঞ্জীকৃত ভস্মরাশি মাঝে
লুকায়ে রহিবে তুমি জনমের মত।
আপনাকে করি পর পরে করি মত্।
দৈন্য-দুঃখ-ক্লিষ্ট তুমি হে নব্যভারত্।

শ্রীরামচন্দ্র গুপ্ত।

"সংসার"।

এ ধরণী চির লীলার আগার,
হেথা জ্বলে আলো, হোথায় আঁধার ;
কি বিচিত্র কাহারো আশার
শেষ নাহি হ'লো জীবন ভরে।
কেহবা বাড়াতে নিজ ধন মান
হরে অকাতরে আত্মীয়প্রাণ,
কেহ বা আবার করে সব দান
তপ্ত তৃষিত দুখীর তরে।
ভেক ধরি হেথা সাধু সাজে কেহ,
মোক্ষ লভিতে কেহ ছাড়ে গেহ,
না লভিয়া কভু আত্মীয় স্নেহ
বনে ঘুরে কেহ সুখের খোঁজে।

লোভের মদিরা নেশায় মজিয়া
আছে কেহ চির আঁধারে ডুবিয়া,
নিয়তির লীলা চক্রে পড়িয়া
অকালে কেহবা চক্ষু বোজে।
চৌদিকরূপে আলোকিত করি
ফুল উঠে ফুটি সংসারোপরি,
অকালে কেহবা পড়িতেছে ঝরি
ক্ষণিক সুরভি বিতরি ভাব।
হেরিতেছ যাহা সদা বসুধায়
সবি চঞ্চল স্বপনেরি প্রায়—
ক্ষণিকে ফুটিয়া ক্ষণে মিশে যায়,
চিরদিন সথা কেহ না রবে।

শ্রীহেমাঙ্গিনী ঘোষ।

প্রার্থনা।

যেদিন এত সাধের জগৎখানি
দাঁড়ায়ে রবে এক পাশে
সেই দিন যেন প্রভু তোমার—
নাম আমার মুখে আসে।
চন্দ্র সূর্য্য থাকতে নভে
চিদাকাশ মোর আঁধার হবে,
সেই আঁধারে যাত্রা যেদিন
করব আমি প্রবাসে,
সেই দিন যেন প্রভু তোমার—
নাম আমার মুখে আসে।
চেনাকেও চিন্‌তে পারা
যাবে না তখন,
জানাকেও জানব না আর
সেই জানার মতন,
অন্ধ নয়ন, রুদ্ধ কর্ণ
শুষ্ক দেহ, মুখ বিবর্ণ
অনুভূতির সূত্র ছিন্ন
হবে যেদিন একশ্বাসে,
সেই দিন যেন প্রভু তোমার—
নাম আমার মুখে আসে।

শ্রীমহেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, কবিভূষণ।

আয়ুর্ব্বেদের অস্ত্রচিকিৎসা।

(চাঁদসীর মত।)

অথ, ব্রহ্মা প্রজাপতি, অশ্বিনীকুমারদ্বয়, দেবরাজ, ধন্বন্তরী ও সুশ্রুত প্রভৃতিকে নমস্কার।

অনন্তর ৺শ্রীশ্রীমনসামাতার বরপুত্র ভিষকশ্রেষ্ঠ মহাত্মা বিষ্ণুহরির অধঃস্তন দ্বিতীয় পুরুষসম্ভব, ধন্বন্তরি কল্প, ষড়ৈশ্বর্য্যসম্পন্ন সিদ্ধ মহাপুরুষ "দয়ারাম" ভগবান সুশ্রুতের সূত্র সকল ভিত্তি করিয়া যে প্রকারে চাঁদসীর চিকিৎসা-প্রণালী বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন, তাহা প্রকাশিত করিব।

কর্ম্মময় পুরুষ ও ভূতগ্রাম।

স্বয়ং কারণহীন সত্ত্বঃ, রজঃ, তমঃ, এই গুণত্রয়ের লক্ষণবিশিষ্ট অব্যক্ত প্রকৃতিই, অষ্টরূপবিশিষ্ট অখিল জগতের হেতু। এই প্রকৃতি, মহৎতত্ত্ব, অহঙ্কারতত্ত্ব, পঞ্চতন্মাত্র, এই আটটী প্রকৃতির রূপ বা অপরা প্রকৃতি এবং একাদশ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চ মহাভূত এই ষোলটী বিকৃতি। অপরা প্রকৃতি ৮টী ও বিকৃতি ১৬টী, এই ২৪টী শাস্ত্রে চতুর্বিংশতি

তত্ত্ব নামে বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু এই চব্বিশটী তত্ত্বের অতীত আর একটী তত্ত্ব আছে। অনাদি অনন্ত, নির্গুণ নির্ব্বিশেষ মহান্ পুরুষই সেই তত্ত্বনামে উক্ত হইয়াছে। মূল প্রকৃতি তাহারই বিকার। এই বিকার-রূপা প্রকৃতির সহিত চেতন পুরুষ মিলিত হইয়া, নিখিল পদার্থের চৈতন্য সম্পাদন করিতেছে। যেমন কমনীয় কামিনীর সুরত মহোৎসবে, তৎসংক্রান্ত সুখের আতিশয্য উৎপাদানার্থ রেত প্রবর্ত্তিত হয় ; সেই প্রকার প্রাণী অচেতন হইলেও, পুরুষ চৈতন্যই তাবৎ প্রাণীর চৈতন্য সম্পাদক জীবাত্মা বা প্রাণ রূপে পরিণত হইয়া থাকেন।

জীব স্বভাবতঃই চেতন, কিন্তু অচেতন জগৎ পদার্থের অনবরত চিন্তা প্রযুক্ত জড় পদার্থের প্রকৃতির সহিত মিলিত হইয়া আপন স্বরূপ বিস্মৃত হইয়া জড়ভাবাপন্ন হইয়া পড়ে। নচেৎ দেহস্থ চেতনশক্তি জড়ধর্ম্ম-বিশিষ্ট দেহের প্রকৃতির সহিত মিলিত না হইয়া, পৃথকভাবে অবস্থান করিতে পারিলেই মুক্তি। কাজেই স্থূল ও বৈষয়িক চিন্তা-পরায়ণ দেহাত্মবুদ্ধি মানবদেহই রোগ, শোক দুঃখ দৈন্যের আশ্রয় স্থান। অপর পক্ষে যাহার দেহাত্মবুদ্ধি দুর হইয়া গিয়াছে, তাহার বাটী বৈদ্যের অন্ন নাই। জীব বাহ্য জগতের প্রকৃতিবিশিষ্ট, অতএব প্রকৃতি পদার্থেই নির্ম্মিত। কেন না, জনকের গুণ পদার্থেই বর্ত্তে, এই নিয়ম যদি সত্য হয়, তবে স্বীকার করিতেই হইবে যে, দেহ যখন বিরাট জগতের প্রকৃতি বিশিষ্ট, তখন দেহও জাগতিক পদার্থেই নির্ম্মিত। স্বভাব, কাল, নিয়তি, যদৃচ্ছা ও পরিণাম, এই সকলই প্রকৃতি। পঞ্চ তন্মাত্র ও তাহার লক্ষণ ও গুণবিশিষ্ট অসংখ্য ভূতগ্রামই এই প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন। অতএব প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন যাহা কিছু, তাহাই ভূতগ্রাম এবং ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় মাত্রই ভৌতিক। এই ভূতগ্রামই চিকিৎসা শাস্ত্রের চিন্তনীয় বিষয়। অসর্ব্বগত ক্ষেত্রজ্ঞ পুরুষ, ধর্ম্মাধর্ম্ম নিমিত্ত তীর্য্যক, মানব, ও দেব যোনিতে সঞ্চরণ করে। এই সকল ক্ষেত্রজ্ঞ পুরুষ শাশ্বত চেতনাবিশিষ্ট সূক্ষ্ম ও অনুমান-গ্রাহ্য। এবং শুক্র ও শোণিত সহযোগে প্রকাশিত হইয়া জীব শব্দ বাচ্য হয়। সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ যত্ন, মান অপমান, নিমেষ উন্মেষ, বুদ্ধি ও বিচার, সঙ্কল্প, বিকল্প, স্মৃতি, বিজ্ঞান, অধ্যবসায় ও বিষয়ের উপলব্ধি এইগুলি জীবের গুণ। এই কর্ম্মময় জীবই চিকিৎসা-শাস্ত্রের বিষয়।

শারীর স্থান।

আর্য্যঋষিগণ দেহকে ক্ষুদ্রব্রহ্মাণ্ড বলিয়া আসিয়াছেন। কেন না, যে শক্তি বা কৌশল দ্বারা জগতের কার্য্য সকল সম্পন্ন হইয়া আসিতেছে, সেই প্রকার শক্তি ও কৌশল দ্বারাই দেহের কার্য্যও নিষ্পন্ন হইয়া থাকে। এই পরিদৃশ্যমান জগতের সর্ব্বত্রই এই সূক্ষ্ম হইতে ক্রমে স্থূলরূপে সাতটী স্তর আছে। অতএব দেহেও সূক্ষ্ম হইতে ক্রমে স্থূলতররূপে সাতটী স্তর বিদ্যমান আছে। সৃষ্টি অবস্থায় নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মরূপ মহাসাগরে প্রথম যে তরঙ্গ উত্থিত হয়, তাহাই মহৎ বা বুদ্ধিতত্ত্ব নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

বিরাট বিশ্বে ও জীবদেহে প্রথম স্তর গঠিত হয়। জলে তরঙ্গ উঠিলে প্রথম তাহা ক্ষুদ্র ও সূক্ষ্ম থাকে, ক্রমে যতই দূরবর্ত্তী হইতে থাকে, তরঙ্গও ততই বৃহৎ ও স্থূল হয়। মহৎ তত্ত্বরূপ তরঙ্গ ব্রহ্ম হইতে কিছু দূরে সরিয়া গেলে অপেক্ষাকৃত স্থূল হইয়া

পড়ে। তখন তাহা অহঙ্কারতত্ত্ব নামে অভিহিত হয়। এবং দেহের দ্বিতীয় স্তর গঠিত হয়। জলের তরঙ্গটী আরও কিছু দূর গমন করিলে তরঙ্গটী গমন ভাঙ্গিয়া ২।৩টী তরঙ্গে পরিণত হয়, সেই প্রকার অহঙ্কারতত্ত্বও ভাঙ্গিয়া দুইটী ভাগে বিভক্ত হইয়া থাকে। একটীর নাম বৈকারিক অহঙ্কার, অপরটীর নাম তামস অহঙ্কার। ক্ষেত্রজ্ঞ পুরুষ চেতন যখন বিকৃতি ভাবে সমস্ত শরীর ও ইন্দ্রিয় সমূহে প্রবৃত্তি ও চিন্তাপরায়ণ হইয়া অধিষ্ঠান করে, তখন তাহাকে বৈকারিক অহঙ্কার বা কারণ অংশ বলে। এবং যখন ইচ্ছাশক্তি প্রবল হইয়া ক্রিয়া প্রবৃত্তি জন্মায়, তখন তাহাকে ভূতাদি অহঙ্কার বা তামস অহঙ্কার বলিয়া থাকে। এই ভূতাদি অহঙ্কার স্থূল হইলে আকাশতত্ত্ব নাম ধারণপূর্ব্বক দেহের তৃতীয় স্তর গঠন করে। এখান হইতেই সৃষ্টি জীবের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হইতে আরম্ভ হয়। আকাশতত্ত্ব স্থূল হইয়া বায়ুতত্ত্ব রূপ চতুর্থ স্তর, বায়ুতত্ত্ব স্থূল হইয়া অগ্নিতত্ত্বরূপে ৫ম স্তর, অগ্নিতত্ত্ব স্থূল হইয়া জলতত্ত্ব নামে ৬ষ্ঠ স্তর এবং জল তত্ত্ব স্থূল হইয়া মাটী তত্ত্ব নামে সপ্তম স্তরে পরিণত হইয়া সৃষ্টি জীবের পঞ্চ-ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হইয়া প্রকাশিত হয়। এই মৃত্তিকা-নির্ম্মিত স্তরই সাধারণতঃ শরীর নামে অভিহিত হইয়া থাকে। মধু মক্ষিকার বাসা যে প্রকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কোষ সমূহ দ্বারা নির্ম্মিত, সেই প্রকার সেই দেহও অসংখ্য কোষের সমষ্টিমাত্র। এবং প্রত্যেক কোষমধ্যেই স্বতন্ত্র ভাবে প্রাণের গতি আছে, তাহারই আহ্বান দ্বারা কোষ সকল সঞ্জীবিত থাকে এবং পুষ্ট ও বর্দ্ধিত হয়। ইহাই শাস্ত্রোক্ত বিষ্ণুশক্তি। কোষ সমূহের সম্মিলিত প্রাণ লইয়াই জীবের প্রাণ। প্রত্যেক কোষ মধ্যেই শ্লেষ্মা সদৃশ এক প্রকার তরল পদার্থ বিদ্যমান আছে, যাহাকে কোষ-অঙ্কুর বলে। মৃত্যুর পর এই তরল পদার্থ জমিয়া যায়। বাতির সলিতা অবলম্বন করিয়া যে প্রকার বাতি প্রজ্বলিত হয়; সেই প্রকার এই কোষাঙ্কুর আশ্রয় করিয়া প্রাণশক্তি আপন কার্য্য করিয়া থাকে। এই সকল কোষ-প্রাচীর, রস, মেদ মজ্জা, শুক্র, বায়ু, পিত্ত,কফ ও প্রাণবাহী নয়-প্রকার শিরা-সমন্বিত। এই সকল শিরা দ্বারাই কোষ পুষ্টির উপাদান সকল সংগ্রহ করিয়া থাকে। কোষের প্রকোপ বশতঃ এই সকল শিরা রুদ্ধ হইয়া গেলেই মানব পীড়িত হইয়া পড়ে। তখন সেই পোষণরূপী বিষ্ণুশক্তিই রুদ্র নাম ধারণপূর্ব্বক ধ্বংসের ভীষণ ক্রিয়া আরম্ভ করিয়া দিয়া থাকেন। এই প্রকারে সার্ব্বাঙ্গীন কোষ সমূহ পীড়িত হইয়া পড়িলেই মানব মৃত্যুমুখে পতিত হয়। দেহের মৃত্তিকাময় স্তরেরও সাতটী বিভাগ আছে। কাজেই কোষ সকলও রস, রক্ত, মাংস, মেদ, অস্থি ও মজ্জা এবং শুক্র এই সাত প্রকারে বিভক্ত। কোষ সমূহ একটী সাধারণ উদ্দেশ্য সাধন জন্য পরস্পর সম্বন্ধ আছে। তবে প্রত্যেক শ্রেণী কোষের একটী সাধারণ ক্রিয়া আছে। যেমন পেশী-কোষ সকল গতি উৎপাদন করে, সেইরূপ স্নায়বীয় কোষ সকল পেশী গ্রন্থি ও অন্যান্য বিধান সকলের ক্রিয়া শাসনে রাখে।

ব্যাধির কারণ। উপযুক্ত খাদ্যের যথেষ্ট সরবরাহ এবং মধ্যগত ও চারিদিকের প্রাণ-বায়ুর স্বাভাবিক উত্তাপ কোষ সকলের জীবনধারণ জন্য আবশ্যক। রক্তই কোষ সকলের সাধারণ খাদ্য, কাজেই তাহার উপাদানের বৈলক্ষণ্যই রোগের প্রধান কারণ। রক্তের উপাদানের ব্যতিক্রম

হইলেই পোষণ ক্রিয়ার ব্যাঘাত করে, কাজেই ব্যাধি উৎপন্ন হয়। কোন বাহ্য আগন্তুক পদার্থের প্রবেশ জন্যও পোষণ ক্রিয়ার ব্যাঘাত ঘটিয়া ব্যাধি উৎপন্ন হয়। এই প্রকার ব্যাধিকে আগন্তুক ব্যাধি বলে। যদি বংশগত ব্যাধির বিষ দ্বারা কোষ সকলের জীবনী শক্তির স্বাভাবিকতা নষ্ট হইয়া থাকে, তাহা হইলে তাহাকে বংশগত ব্যাধি বলে। এই কারণে শরীরের স্তর ও কোষ দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। কিন্তু কোষ সকলের ভিন্ন ভিন্ন কার্য্য থাকায় কোন অস্বাভাবিক অবস্থা প্রথমতঃ কতকগুলি কোষ শ্রেণীকেই আক্রমণ করে। পরে তাহা সর্ব্ব শরীরে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িতেও পারে। স্ত্রীপুরুষ ভেদ, ধাতুর বিকৃতি, বংশ দোষ, বিবাহ দোষ, জাতি স্থানদোষ, দুষ্ট খাদ্য, অন্নবস্ত্রের অভাব, অভ্যাস, ব্যায়াম, যান্ত্রিক উত্তেজনা, দূষিত জল বায়ু, উত্তাপ মৈথুন, রক্তের অনিয়মিত সরবরাহ, স্বাভাবিক ও ভৌতিক অবস্থা প্রভৃতি কারণে ব্যাধির উৎপত্তি ও প্রকোপ ঘটিয়া থাকে।

বিস্তৃতি।—কোন অংশের কোষ বা তন্তুর পীড়া উপস্থিত হইলে অপর অংশের কোষ সকলও গৌণ ভাবে আক্রান্ত হইয়া থাকে। এবং দোষের (বায়ুপিত্ত কফ) প্রকোপের তারতম্য অনুসারে বিস্তৃতি প্রসারতা লাভ করিয়া থাকে।

পোষণক্রিয়ার ব্যাঘাত-জনিত অবস্থাভেদ।—কোষ সকলের পোষণ ক্রিয়ার ব্যতিক্রম ঘটিলে, তিনপ্রকার অবস্থান্তর ঘটিয়া থাকে। প্রথমতঃ পোষণ ক্রিয়ার ব্যাঘাত সর্ব্বাঙ্গীন হইলে মৃত্যু ঘটে। দ্বিতীয়তঃ কোন অংশ বিশেষের হইলে, সেই অংশের কোষ সকলের জীবনী শক্তি নষ্ট হইয়া যায়। কিন্তু মৃত কোষ সকলের আকৃতি অথবা গঠন অনেক অংশে বিদ্যমান থাকে। তৃতীয়তঃ কোন অংশের পোষণ ক্রিয়া কিছুকাল হইতে ক্রমে ক্রমে হ্রাস হইয়া শেষে একদম বন্ধ হইয়া যায় এবং মৃত কোষ সকল পিণ্ড আকারে পরিণত হইয়া শেষে একেবারে ধ্বংস হইয়া যায়। রক্তাশয়ের দুর্ব্বলতা অথবা রক্তবাহী শিরার অবরোধ ঘটিলে পূর্ব্বোক্ত প্রকার কোষ সকল মৃত হইয়া গলিয়া পড়িয়া যায়। তন্মধ্যে রক্তাশয়ের দুর্ব্বলতা বশতঃ বিগলন হইলে সেই বিগলন পচনে পরিণত হয়। ধমনীর অবরোধ বশতঃ বিগলন হইলে গলন কার্য্য অতি সত্বর আরম্ভ হয়। কোষের সান্নিপাতিক আক্রমণ হইলে, এই অবস্থায়ও পচন ক্রিয়া আরম্ভ হইতে পারে। শৈরিক অবরোধ ঘটিলে মাংস মধ্যে স্ফোটক উৎপন্ন হয়। কৈশিক অবরোধ ঘটিলে গলন ক্রিয়া সামান্য ভাবে আরম্ভ হয়, কিন্তু যদি হাড়-আবরক ঝিল্লির সূক্ষ্ম নাড়ী সকলের অবরোধ ঘটে, তবে হাড় নষ্ট হইয়া থাকে।

বিগলন বিভাগ। বিগলন দুই প্রকার, শুষ্ক ও আর্দ্র। শুষ্ক বিগলন পুঁজ ক্লেদ কিছু থাকে না। আর্দ্র বিগলন পুঁজ ক্লেদ ও গন্ধযুক্ত থাকে।

শুষ্ক বিগলন। শুষ্ক বিগলনে বায়ু ও পিত্তের অত্যধিক প্রকোপ বশতঃ প্রদাহিত স্থানের জলীয় অংশ টানিয়া যায়। কাজেই পীড়িত স্থল শুষ্ক কাঠ পাথর সদৃশ হইয়া পড়ে। এই শুষ্ক বিগলন ভয়ানক যন্ত্রণাদায়ক, দীর্ঘকাল ভোগশীল ব্যাধি। তবে ইহাতে প্রাণহানির আশঙ্কা বড় থাকে না। অস্থি উপাস্থি কণ্ডরা প্রভৃতি যে স্থানের তন্তুতে রস রক্ত অতি অল্প মাত্রায় বিদ্যমান থাকে,

সেই স্থানেই সচরাচর শুষ্ক বিগলন আরম্ভ হয়। এবং মাংস মেদ অস্থি মজ্জা প্রভৃতি তাবত ঘটনাবলি দগ্ধ কাষ্ঠ খণ্ডের ন্যায় পুড়িয়া অঙ্গার সদৃশ করিয়া ফেলে. এবং দিন দিন বিস্তৃত হইতে থাকে। রোগী ২৪ ঘণ্টা অগ্নিদগ্ধ বৎ যন্ত্রণা ভোগ করে। দিন অপেক্ষা রাতে, শুক্ল পক্ষ অপেক্ষা কৃষ্ণপক্ষে এই যন্ত্রণা বৃদ্ধি হয়। হস্ত অথবা পদের অঙ্গুলিতে এইপ্রকার শুষ্ক গলন আরম্ভ হইয়া থাকে। আর পিত্তের প্রকোপবশতঃ শুধু চর্ম্মের উপর একপ্রকার শুষ্ক বিগলন হইয়া থাকে। আয়ুর্ব্বেদোক্তগণ তাহাকে পিত্ত বিকার বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ইহা নানাপ্রকার। (ডাক্তারগণ এই বিগলনকেই প্যালাগ্রা বলিয়া ব্যাখ্যা করিবেন কিন্তু তাহার নিদান-তত্ত্ব ও চিকিৎসা আজ পর্য্যন্তও আবিষ্কৃত হয় নাই।)

আর্দ্রবিগলন—মেদ মাংসময় কোমল গঠনাবলিতে, পিত্ত ও কফের প্রকোপ বশতঃ প্রদাহ হইলে আর্দ্র বিগলন আরম্ভ হয়। তন্মধ্যে কফ যদি প্রবল থাকে, তবে সহজে সীমাবদ্ধ হইয়া পুঁজ উৎপন্ন হয়। পিত্তের প্রকোপ সমধিক হইলে, প্রদাহিত অংশের উপর কোন কোন স্থান আগুনে পোড়া ফোস্কা সদৃশ ফোস্কা উৎপন্ন হয়। এই ফোস্কা মধ্যে রক্তের জলীয় সাদা অংশ জমা হয়। কিন্তু ফোস্কার নীচে মাংস অথবা হাড়ময় গঠনাবলিতে প্রবল প্রদাহ ও দারুণ যন্ত্রণা বিদ্যমান থাকে। যাহাদের শারীরিক কোষাবলীর সংশোধনী শক্তি ক্ষীণ, তাহাদের পিত্ত প্রকোপিত, প্রদাহ রসময় বা মেদময় তন্তু মধ্য দিয়া বিসর্পিত ভাবে অতিক্রুত বিস্তৃত হইয়া পড়ে। সেই অবস্থায় রোগী হঠাৎ মারাও যাইতে পারে। আর এই প্রদাহে যদি সান্নিপাতিক আক্রমণ হয়, তবে প্রদাহিত স্থান পচিতে আরম্ভ করে। এবং শনৈঃ শনৈঃ তাহা প্রসারিত হইতে থাকে। এই অবস্থায় প্রায়ই হাড় নষ্ট অথবা পচিয়া যায়। বহুমূত্র আদি রোগে যদি রক্ত দুষ্টি ঘটে, তার পর এই পচন ক্রিয়া প্রাণসংশয়কর হইয়া দাঁড়ায়।

গতি—বিগলনের গতি, উৎপত্তির কারণ অনুসারে নানা ভাবে হইয়া থাকে। কিন্তু শরীরের সংশোধনী শক্তির উপর ইহার গতি অনেক পরিমাণে নির্ভর করে। সে কারণে সুস্থ শরীরে কিছুই করিতে পারে না, সেই কারণে বালক বৃদ্ধ অথবা বহুমূত্রগ্রস্ত রোগীর প্রাণ নষ্ট হইতে পারে। কেননা, তাহাদের এই শক্তি অতিশয় দুর্ব্বল।

সীমা।—বিগলন কফ প্রধান হইলে সহজেই সীমাবদ্ধ হইয়া থাকে। পিত্ত প্রধান হইলে যেমন অতি দ্রুত বিস্তার লাভ করে, তেমনি সহজে সীমাবদ্ধ হয়। সান্নিপাতিক হইলে তাহা দ্বারা শরীরের গভীরতম কোষ সকল আক্রান্ত হয় এবং ক্রমে ক্রমে বিস্তার লাভ করে ও সহজে সীমাবদ্ধ হইতে চাহেনা। ক্রমশঃ

শ্রীকেশবচন্দ্র দাস।

অসুরপূজা ।*

১

তুমি, সাবাস বাহাদুর !

তুমি, সাবাস বাহাদুর !

তোমার,—মহাশক্তির চেয়ে ভক্তি

করিছে অসুর !

হওনা তুমি অত্যাচারী,

হওনা পরের পীড়নকারী,

হওনা তুমি মহাপাপী—হওনা তুমি ক্রূর,

বিশ্ববাসীর আধিপত্য,

লুঠ্‌ছ বটে স্বর্গমর্ত্ত্য,

কার থাকিলে সে সামর্থ্য নেয়না কহিসুর ?

ময়ুর সিংহাসনটী ফেলে,

নাদিরসা কি অমনি গেলে ?

সোমনাথের মন্দিরটী ভেঙ্গে কল্লে

না কি চুর ?

দিগ্বিজয়ে দেখ্‌ছি নিত্য

কেউ কোথায় করেনি তীর্থ,

সবাই লুঠ্‌ছে পরের বিত্ত,—

তোমার কি কসুর ?

সাবাস বাহাদুর তুমি হে,

সাবাস বাহাদুর !

২

সাবাস বাহাদুর তুমি হে,সাবাস বাহাদুর,

প্রতিশোধের প্রতিমূর্ত্তি শক্রজয়ী শূর।

তোমার জাতি—তোমার জাতি,

অমরগণের খেয়ে লাথি,

পলাইয়া থাক্‌ত গিয়া গুপ্ত পাতালপুর।

তুমি জিনে তাদের স্বর্গ,

পেলে বিশ্বের পূজা অর্ঘ্য,

স্বর্গ হতে অমরবর্গ কর্লে তুমি দূর !

প্রতিশোধের প্রতিমূর্ত্তি শক্রজয়ী শূর !

৩

দেবাসুরে সাগর মথি,

গজাশ্ব নেয় সুরপতি

লক্ষ্মী নিলেন লক্ষ্মীপতি—চালাক সুচতুর,

অসুর সবে ফাকি দিয়ে,

দেবতারা সব সুধাপিয়ে

মরণ হতে উঠ্‌ল জীয়ে—এম্‌নি ধূর্ত্তক্রূর !

এম্‌নি প্রবঞ্চনাকারী,

রাজ্যধন সব নিল কাড়ি,

দৈত্যেরা শেষ স্বর্গ ছাড়ি সকল হল দূর !

দেব্‌তারা হায় এমনি শঠ—

আর এম্‌নি ধূর্ত্ত ক্রূর !

৪

স্বজাতির সে অপমানে ক্ষিপ্ত তোমার প্রাণ

জলন্ত আগ্নেয়গিরি গর্জ্জে অভিমান !

স্বজাতির সে লজ্জা ঘৃণা,

চায় কি বুকের রক্ত বিনা ?

বীরের বুকে শিরায় মুখে

বিষের বিঁধে বাণ !

প্রতিহিংসা প্রতিশোধে

বিশ্বদগ্ধ তোমার ক্রোধে,

সাধ্য কি যে অমর রোধে

তোমার অভিযান ?

দাসত্বে বাঁধিলে দেবে,

ইন্দ্র চন্দ্র চরণ সেবে,

---

* "অগ্রে অসুর শব্দ বিদ্যমান ছিল, পরে সুর শব্দের সৃষ্টি হয়। অসুর শব্দের অর্থ বুদ্ধিদাতা। অসু শব্দের অর্থ প্রজ্ঞা। সায়নাচার্য্যের ব্যাখ্যানুসারে বেদ-সংহিতার প্রাচীনতর ভাগে বহু স্থানে অসুর শব্দ সর্ব্ব জীবের প্রাণদাতা বলিয়া উক্ত হইয়াছে। বেদ সংহিতায় সুর শব্দ বিদ্যমান নাই। পরবর্ত্তীগণ স্বীয় দেবতাদিগকে অসুরবিরোধী সুর আখ্যা প্রদান করিয়া প্রতিপক্ষতা প্রদর্শন করিয়াছে। বাস্তবিক অসুর শব্দের মান্য ও পূজ্য অর্থই দেখা যায়। অসুর বিদ্বেষীরাই অসুর শব্দের কদর্থ করিয়াছে।" ভারত-বর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়।

বজ্র হ'তে বীর্য্য তোমার হাজার গরীয়ান্!
তোমার গর্ব্ব—তোমার দম্ভ,
বিশ্বদৃপ্ত জয়স্তম্ভ,
স্বর্গরাজ্যের দুর্গে উড়ে তোমার জয় নিশান
অতীতে হয়নি পতিত-পরিম্লান!
অসুরের কলঙ্ক-কালী,
সে ত্রিভুবনের গালাগালি,
শত্রুরক্তে করে' তুমি ধৌত—অবসান,
দেখিনি আর তোমার মত,
স্বদেশ-প্রেমিক বীরব্রত,
জাতির হিতে এমন ব্রত—
জীবন দিতে দান!
জাতি তোমার হৃদয় মর্ম্ম
জাতি তোমার ধর্ম্ম কর্ম্ম,
জাতি তোমার যোগতপস্যা—
জাতি তোমার ধ্যান,
জাতি তোমার পিতামাতা,
জাতি তোমার ভগ্নীভ্রাতা,
জাতি তোমার পুত্রকন্যা
জাতি তোমার প্রাণ,
একলা তুমি অসুর জাতির সকল মূর্ত্তিমান!
কেউ পূজেনা দশভুজা,
সবাই করে তোমার পূজা,
সবাই করে তোমার পরে প্রেমাঞ্জলি দান,
জাতির তুমি মুকুটমণি গৌরব গরীয়ান্।

৫

হে বীরেন্দ্র! দিগ্বিজয়ী অসুর দুর্ব্বিজয়!
তোমার বিনাশ কর্ত্তে আজ—
কেমন কাপুরুষের কাজ—
মিল্‌ছে জগতের যত সব শক্তি সমুদয়—
ধনশক্তি লক্ষ্মীরাণী
জ্ঞানশক্তি বীণাপাণি,
যুদ্ধশক্তি ষড়ানন সেসভায় জনা ছয়!
গণশক্তি গণপতি
কর্ণ বৃহৎ চক্ষু রতি।
দূর হইতে শুঁড় বাড়ায়ে সাগর শুষে লয়!
সংহার শক্তি মহেশ্বর, আর
পশুশক্তি সিংহ ও ষাঁড়,
ময়ূর ইন্দুর সাপ জানোয়ার
কেউত বাকী নয়!
উদ্ভিদ্ শক্তি নবপত্রী!
সর্ব্বশক্তি একচ্ছত্রী—
মহাশক্তির দশভুজেতে সকল সমন্বয়!
সর্ব্বশক্তি মিলে মিশে,
মারবে তোমায় পদে পিষে
বঞ্চনার সে নাগপাশে বাঁধ্‌ছে—বিষময়
ছিক্ দেবতা তাহার কথা
ভাব্‌তে লজ্জা হয়!

ধন্য তুমি হে বীরেন্দ্র অসুর দুর্ব্বিজয়!
শৌর্য্য তোমার বীর্য্য তোমার অনন্ত অক্ষয়!
ধন্য তোমার স্বদেশ-প্রীতি,
ধন্য তোমার অসুরনীতি,
ধন্য তোমার পুণ্যস্মৃতি বিনাশ করে ভয়!
তোমার ভীষণ রুদ্রমূর্ত্তি,
স্বাধীনতার অগ্নি স্ফূর্ত্তি!
মরণ-কাঁপা দিগ্বিজয় কি চরণ চাপা রয়?
তোমার আঁখির সতেজভাষা,
বিশ্বজয়ের বিপুল আশা,
এক নিমেষে করে যে
সে জগৎ জ্যোতির্ম্ময়!
তোমার প্রবল স্বদেশ-ভক্তি,
ঠেলে উঠ্‌ছে সকল শক্তি,
ধবলগিরির চেয়ে সে যে প্রবল অতিশয়!
রক্ষিতে স্বজাতির স্বত্ব
দেখি নাই আর এমন মত্ত,
বীরত্বের মহত্বের আর ত এমন অভ্যুদয়!
গুলির মত পণ প্রতিজ্ঞা ধূলির মত নয়!

মহৎ হতে মহৎ তুমি—মহান্—মহীয়ান্!
তোমার যারা রাজ্যহারী,
জাতির যারা ধ্বংসকারী,
অবিচারী ব্যভিচারী নারীর লুঠে মান,
যারা প্রবঞ্চকের জাতি,
অবিশ্বাসী গুপ্তঘাতী,
বকের বেশে দেশেদেশে বিলায় পরিত্রাণ,
আততায়ী দস্যু যারা—
অসুরদ্বেষী দেবতারা—
পশুর মত করে যারা বলির রক্ত পান,
তাদের স্পর্দ্ধা তাদের গর্ব্ব
প্রতাপ ও প্রভুত্ব সর্ব্ব
পদাঘাতে কর্লে তাদের চূর্ণ অভিমান!
যদিও নাগপাশে বন্দী,
তবু—নাই তোমার কেও প্রতিদ্বন্দ্বী,
বিরাট তুমি বিশাল তুমি বিপুল
তোমার প্রাণ!

অনন্ত আকাশের মত,
বক্ষে সে বাঁধ ছায়াপথ,
বিধাতা করেছেন যেন বিজয় মাল্য দান!
শরৎ স্বচ্ছ নীলাম্বরে
তোমার বিজয় শোভা করে
রথ ধরে ছিন্ন-ছিলা ইন্দ্রধনু খান্!
শরদের জলদের মাঝে,
তোমার জয় দুন্দুভি বাজে,
মরালকণ্ঠে দিগঙ্গনা বিজয় করে গান!
শরৎ গড়ায় কমল হার—
বিজয় শতদল তোমার!
আদরে তাই গলায় পরেন স্বয়ং ভগবান্!
তুমি অভিনন্দনীয়,
তুমি বিশ্ববন্দনীয়,
তুমি সর্ব্ব জাতির প্রিয় আনন্দ কল্যাণ,
তাই তোমারে জগৎ করে প্রেমাঞ্জলি দান।

শ্রীগোবিন্দচন্দ্র দাস।

সমাজে স্ত্রীজাতির স্থান।

বংশবৃদ্ধি।

স্ত্রীজাতি সকল জীবের মধ্যে নাই। কি উদ্ভিদ, কি জন্তু, উভয়ের মধ্যেই এমন অনেক জীব আছে, যাহাদিগের লিঙ্গভেদ নাই, সুতরাং স্ত্রীপুরুষও নাই। ইহারা অলিঙ্গ। উদ্ভিদের মধ্যে প্রাচীরের গায়ে যে সবুজ বর্ণের শ্যাওলা জন্মে, উহাদিগের মধ্যে কতিপয় শ্রেণী; এবং ব্যাঙের ছাতা * ইত্যাদির লিঙ্গভেদ নাই। যাহাদিগের লিঙ্গভেদ আছে, তাহাদিগের পরাগরেণু ও গর্ভকেশর একত্রিত হইলে বীজ জন্মে; তাহা হইতেই ঐ সকল উদ্ভিদের বংশ বৃদ্ধি হয়। কিন্তু যে সকল উদ্ভিদের স্ত্রী পুং ভেদ নাই, তাহাদিগের এক একটী spore অর্থাৎ জীববস্তু পূর্ণ দানা হইতেই তজ্জাতীয় অপর উদ্ভিদ জাত হয়; এইরূপে উহাদিগের বংশ রক্ষা হয়। এক্ষণে অনেকেই ফার্ণ শ্রেণীর পুষ্পহীন উদ্ভিদ বাড়ীতে রাখেন, কারণ সাহেবরা উহা ভালবাসেন। ইহাদিগেরও স্ত্রী পুং ভেদ নাই।

তবেই দেখা যাইতেছে যে, কোন কোন উদ্ভিদের স্ত্রী পুং ভেদ নাই, কাহারও ঐ ভেদ আছে। আম কাঁঠাল ইত্যাদির স্ত্রীপুং ভেদ আছে। কিন্তু যাহাদিগের স্ত্রী পুং ভেদ আছে, তাহাদিগের পরাগ রেণু এবং

* কোন কোন জেলায় কুকুর ছাতা বলে।

গর্ভকেশরের সংমিশ্রণ ব্যতীতও কখন কখন বংশবৃদ্ধি হইতে দেখা যায়। আমের আঁঠি হইতেও গাছ হয়; এবং ডাল কাটিয়া কলম করিলে তাহা হইতেও গাছ হয়। আঁঠি পরাগরেণু ও গর্ভকেশরের সংমিশ্রণের ফল, কিন্তু ডাল হইতে যখন কলম করিয়া গাছ প্রস্তুত করা হয়, তখন সাক্ষাৎস্বরূপে পরাগরেণুর ও গর্ভকেশরের সংমিশ্রণ আবশ্যক হয় না।

জন্তুগণের মধ্যেও এই রূপই দেখা যায়। ইহারাও অনেকে লিঙ্গহীন, যথা পীড়াজনক কীটাণু। ম্যালেরিয়ার কীট একটী হইতে বহু উৎপন্ন হয়। একটী দ্বিখণ্ডিত হইয়া দুইটী জাত হয়; ঐরূপে দুইটী হইতে চারিটী, এইরূপে খণ্ডিত হইতে হইতে বংশবৃদ্ধি হইয়া যায়। আবার, জন্তুগণের মধ্যে যাহাদিগের স্ত্রী পুং ভেদ জাত হইয়াছে, তাহাদিগের শুক্রকীট স্ত্রী ডিম্ব (Spermatozoon and ovum) একত্রিত হইয়া বংশবৃদ্ধি করে। কিন্তু তাহাদিগের মধ্যেও কোন কোন জীবের (আম্রের ন্যায়) অলিঙ্গ জীবোৎপত্তিও * দেখা গিয়া থাকে। পিপীলিকার লিঙ্গভেদ হইয়াছে; সুতরাং স্ত্রী পুং সম্মিলনে সাধারণতঃ ইহাদিগের বংশ রক্ষা হয়। কিন্তু অনেক সময় দেখা যায় যে, একবার ঐরূপে স্ত্রী পিপীলিকা ডিম্ব প্রসব করিলে পর আর পুংস্পর্শ ব্যতীতও দুই তিনবার চারিবার ডিম্ব প্রসব করে। এই সকল পরবর্তী বারে পুংকীটের সংসর্গ প্রয়োজন হয় না। পুরুভুজ † অতি নিম্ন শ্রেণীর জীব, ইহাদিগের মধ্যে অনেকের লিঙ্গ ভেদও আছে। তথাপি ইহাদিগের এক একটী দেহখণ্ড হইতে গোটা একটী পুরুভুজ জন্মিয়া থাকে। আমের ডালের একাংশ হইতে যেমন গোটা গাছটী জাত হইতে পারে, পুরুভুজের একাংশ হইতেও গোটা জন্তুটাই জীব হইতে পারে। দেখা যাইতেছে যে, জন্তুগণের মধ্যেও লিঙ্গহীনতা এবং লিঙ্গভেদ আছে।

লিঙ্গভেদযুক্ত উদ্ভিদ ও জন্তু, উভয়ের মধ্যেই এরূপ দেখা যায় যে, স্ত্রী-চিহ্ন ও পুং চিহ্ন পৃথক ব্যক্তিতে পৃথকরূপে না থাকিয়া এক ব্যক্তিতেই থাকে। তদ্রূপস্থলে ঐ ব্যক্তিকে স্ত্রী অথবা পুংজাতীয় না বলিয়া উভলিঙ্গ বলা যায়। অনেক উদ্ভিদের পরাগরেণুধারী পুংচিহ্ন এবং গর্ভকেশরধারী স্ত্রীচিহ্ন (Pistil ও stamen) একটী ফুলেই বিদ্যমান থাকিতে দেখা যায়। জন্তুর মধ্যেও জোঁক এবং কোন কোন শ্রেণীর ভেকের প্রত্যেকেরও দেহেই স্ত্রীচিহ্ন ও পুংচিহ্ন আছে। এরূপ উভলিঙ্গ জীব যেন ইন্দ্রের ন্যায় স্বীয় দেহে উভয় চিহ্নই ধারণ করে।

মানুষের মধ্যেও কোন কোন হিজড়ে মোটের উপর পুংভাবাপন্ন; কেহ বা স্ত্রীভাব, কেহ উভলিঙ্গের মত, অথচ কোন চিহ্নই পূর্ণ বিকাশ প্রাপ্ত হয় না। অপূর্ণাঙ্গ পুংচিহ্ন ও স্ত্রীচিহ্ন একত্রে সংযুক্ত একটী হিজড়ে ভদ্রলোক আমার সুপরিচিত। হিজড়ের মধ্যেও অপূর্ণ স্ত্রীভাব এবং অপূর্ণ পুংভাব আছে।

এ সকল হইতে বুঝা যাইতেছে যে, প্রকট স্ত্রীত্ব অথবা পুংত্ব মৌলিক নহে। অতি নিম্নশ্রেণীর জীবগণ মধ্যে অলিঙ্গতা দেখা যাইতেছে; ক্রমে জীব বিবর্ত্তনের সহিত উচ্চশ্রেণীর জীবে লিঙ্গভেদ উৎপন্ন হইয়াছে। কিন্তু ইহাদিগের মধ্যেও অপুংজনন অর্থাৎ

* অপুংজনন।

† Celenterata.

পুংসাহায্য ব্যতীতও বংশরক্ষা হইতে অনেক স্থলে দেখা যায়।

যে সকল জন্তুর লিঙ্গভেদ হইয়াছে, তাহাদিগের স্ত্রীজাতি ও পুংজাতি চিনিবার উপায় কি? স্ত্রীচিহ্ন ও পুংচিহ্ন প্রকটভাবে দৃষ্টিগোচর না হইলেও স্ত্রী অথবা পুং বলা যাইতে পারে। কারণ যে জন্তুর দেহে পুংকীট (sperm) প্রস্তুত হয়, তাহাকেই পুংজাতীয় এবং যে জন্তুর দেহে স্ত্রীডিম্ব প্রস্তুত হয়, তাহাকে স্ত্রীজাতীয় বলিতে হয়। বাহ্যিক লক্ষণের কোন মূল্য নাই। দৃষ্টান্ত স্থলে মৎস্যের কথা বিবেচনা করা যাইতে পারে। ইহাদিগের বাহ্যিক চিহ্ন দ্বারা স্ত্রীজাতীয় কি পুংজাতীয়, তাহা বুঝা যায় না। কিন্তু যাহাদিগের দেহস্থ রন্ধ্র হইতে যথা সময়ে পুংকীট নির্গত হয়, তাহাদিগকে পুংজাতীয় এবং যাহাদিগের স্ত্রীডিম্ব নির্গত হয়, তাহাদিগকে স্ত্রীজাতীয় বলা হইয়া থাকে। কোন জীবের দেহে পুংকীট কিম্বা স্ত্রীডিম্ব প্রস্তুত হয়, এই লক্ষণ দ্বারাই স্ত্রীপুং সংজ্ঞা দেওয়া হইয়া থাকে।

এক্ষণে বংশ রক্ষার প্রণালী আলোচনা করা আবশ্যক। জীবশ্রেণীকে দুইভাগে বিভাগ করিয়াছি:—অলিঙ্গ ও সলিঙ্গ। অলিঙ্গ উদ্ভিদগণের (spore) অর্থাৎ জীব বস্তুপূর্ণ দানা হইতে বংশবৃদ্ধি হয়, তাহা পূর্ব্বে বলিয়াছি। সলিঙ্গ উদ্ভিদের একফুলের পরাগরেণু অন্য ফুলের গর্ভকেশর সংযুক্ত হইলে বীজ উৎপন্ন হয়, তদ্দারাই তাহাদিগের বংশবৃদ্ধি হয়। বায়ু অথবা পতঙ্গ এক ফুলে হইতে পরাগরেণু লইয়া অন্যফুলের গর্ভকেশরে * মিশাইয়া দেয়। তখন গর্ভকেশর-স্থিত গর্ভসূত্রযোগে উহা গর্ভাশয়ে বীজ অথবা বিচী উৎপন্ন করে। তাহা হইতেই বংশ রক্ষা হয়। পরাগরেণু পুংভাবাপন্ন; সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, পুংবীজ আসিয়া গর্ভকেশরের উপরে পতিত হইয়া গর্ভসূত্রযোগে অতিসূক্ষ্মরন্ধ্র পথে গর্ভাশয়ে প্রবিষ্ট হইয়া স্ত্রীভাবাপন্ন দানার সহিত মিশ্রিত হইয়া বীজ উৎপন্ন করতঃ বংশরক্ষা করে। কিন্তু ঐ স্ত্রীভাবাপন্ন দানা অথবা ডিম্ব কোথাও যায় না; যেখানে উৎপন্ন হইয়াছিল, সেইখানেই থাকে। গর্ভসূত্র যোগে গর্ভাশয়ে নামিল পুংভাবাপন্ন পরাগরেণু।

জন্তুগণেরও তাহাই। অলিঙ্গ জন্তুগণের একটী কোষ দ্বিখণ্ডিত হইয়া দুইটী কোষ, উহারা প্রত্যেকে দ্বিখণ্ডিত হইয়া চারিটী কোষ, এইরূপে খণ্ডন-বিধি * অনুসারে বহু কীটজাত হইয়া বংশবৃদ্ধি করে, তাহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। কিন্তু এইরূপে খণ্ডিত হইতে হইতে (অলিঙ্গ) এক কোষ জীবের এতদূর বলক্ষয় হয় যে, উহারা আর খণ্ডিত হয় না। তখন যদ্যপি খণ্ডিত দুইটী কোষাংশকে একত্রিত করিয়া দেওয়া যায়, অথবা স্বভাবতঃ কোন উপায়ে একত্রিত হয়, তবে পুনরায় বল সঞ্চার হয়, এবং খণ্ডন ক্রিয়া পুনরায় আরম্ভ হইয়া বহু প্রাণীজাত হয়; তাহাতেই বংশবৃদ্ধি হয়. কিন্তু সলিঙ্গ জন্তুগণের পুংকীট ও স্ত্রীডিম্ব একত্রিত না হইলে বংশ রক্ষা হয় না। যাহাদিগের মেরুদণ্ড † নাই, তদ্রূপ সলিঙ্গ জন্তুগণের মধ্যে যাহারা নিতান্ত নিম্নশ্রেণীর, তাহাদিগের পুংকীট ও স্ত্রীডিম্ব একত্রিত হওয়া দৈবাধীন। কিন্তু উহাদিগের মধ্যে যাহারা উন্নত, তাহাদিগের স্ত্রীগণ ও পুংগণ একত্রিত হয় এবং তাহাতেই পুংগণের

* stigma.

* Fissure.

† মেরু।

পুংকীট স্ত্রীদেহে প্রবিষ্ট হইয়া স্ত্রীডিম্বের সহিত মিলিত হইয়া তাহাকে অনুপ্রাণিত করে। তাহাতেই বংশরক্ষা হয়। আর যেসকল জন্তুর মেরুদণ্ড আছে,* তাহাদিগের মধ্যে নিতান্ত নিম্নশ্রেণীর জন্তু মৎস্য। মৎস্যের পুংকীট ও স্ত্রীডিম্ব জলের উপর ভাসিতে ভাসিতে দৈবাৎ একত্রিত হয়, তখন ঐ মিশ্রিত পদার্থ সকল মৎস্যই মুখে লইয়া বক্ষঃস্থলে তাপ দেয়†। তাহাতে মৎস্যের ডিম বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। ঐ ডিম ফুটিয়া বহু মৎস্য জাত হয়, এবং বংশরক্ষা করে। কিন্তু এই সমেরুশ্রেণীর জন্তুর মধ্যেও যাহারা উন্নত, তাহাদিগের পুংগণ ও স্ত্রীগণ একত্রিত হইলে পুংকীট যথাস্থানে প্রবিষ্ট হইয়া স্ত্রীডিম্বের সহিত মিলিত হয়; স্ত্রীডিম্ব এইরূপে অনুপ্রাণিত হইলে অপত্য জাত হইয়া বংশ রক্ষা করে।

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, সলিঙ্গ জন্তু-শ্রেণীতে অত্যন্ত অধিক ক্ষেত্রে পুংকীট গিয়া স্ত্রীডিম্বকে অনুপ্রাণিত করতঃ বংশবৃদ্ধি করে। কিন্তু স্ত্রীডিম্ব কোথাও যায় না।

উপরে উদ্ভিদশ্রেণী মধ্যে যাহা দেখিয়াছি, এক্ষণে জন্তুগণ মধ্যেও তাহাই দেখা গেল। অর্থাৎ উভয় শ্রেণী মধ্যেই সলিঙ্গ জীবের পুংকীট গিয়া স্ত্রীডিম্বকে অনুপ্রাণিত করে; তাহাতেই বংশ রক্ষা হয়। কিন্তু স্ত্রীডিম্ব (ovum) কোথাও যায় না, যেখানে জাত হয়, প্রায় সেইখানেই থাকে।

পুং স্বভাব ও স্ত্রী স্বভাব।

ইহা হইতে বুঝিলাম যে, প্রায় সমস্ত জীব মধ্যেই পুং কীট গতিশীল স্ত্রী ডিম্ব গতিহীন। সুতরাং প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষগণ গতিশীল ও চঞ্চল হওয়া এবং প্রাপ্ত-বয়স্কা স্ত্রীগণ অপেক্ষাকৃত অচঞ্চল ও স্থির প্রকৃতি হওয়া কিছুই আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। প্রকৃত পক্ষেও প্রায় সকল সমাজেই পুরুষগণ চঞ্চল এবং স্ত্রীগণ অপেক্ষাকৃত স্থির-স্বভাব হইয়া থাকে।

এই একটী মৌলিক প্রভেদ হইতে স্ত্রী স্বভাব ও পুং স্বভাব কত বিভিন্ন হইতে পারে, তাহা বিবেচনা করা কঠিন নহে। তৎপর আরও যে সকল মৌলিক এবং পরিপার্শ্বিক ভেদ-উৎপাদক কারণ সকল সমাজেই স্ত্রীগণ ও পুরুষগণ মধ্যে সর্ব্বদাই ক্রিয়া করিতেছে, সে সকল বিচার করিতে গেলে স্ত্রী স্বভাব ও পুরুষ স্বভাব বস্তুতঃই অত্যন্ত বিভিন্ন বলিয়া উপলব্ধি হইবে, সন্দেহ নাই। মানুষের সাধারণ ধর্ম্মছাড়া দৈহিক, মানসিক অন্য বিষয়ে উভয় মধ্যে একতা থাকা সম্ভব নহে; এবং একতা বোধ হয় নাই। যেমন চঞ্চলতা ও স্থিরতা বিপরীত গুণ, তেমনই অন্যান্য মানসিক বৃত্তিতেও বোধ হয় বৈপরীত্য আছে। ইহা সত্য হইলে, পুরুষ ও স্ত্রী উভয়ের মানসিক মিলনে সাম্য, নচেৎ কেবল পুরুষের মানসিক ধর্ম্মে উচ্ছৃঙ্খলতা ও বিনাশ এবং স্ত্রীগণের মানসিক ধর্ম্মে গতিহীনতা, জড়তা ও নাশ। ইহারা একে সমাজের রক্ষণ শক্তি নহে; উভয়ের সামঞ্জস্যে স্থিতি ও উন্নতির মহাশক্তি নিহিত রহিয়াছে।

কিন্তু বাস্তবিক কি ইহা সত্য? সম্পূর্ণ সত্য বলিয়া এক্ষণে প্রতিপন্ন করা না যাউক, কিন্তু অনেকাংশে সত্য বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে। (ক্রমশঃ)

শ্রীশশধর রায়।

* সমেরু।
† ইহাকে তা' দেওয়া বলে

ভক্তি-পুষ্পাঞ্জলি।

৺কবিবর মাইকেল মধুসূদন দত্ত মহাশয়ের শ্রীচরণে—

(পঞ্চচত্বারিংশ বার্ষিক স্মৃতি-সভায় পঠিত।)

(১)

আঁধারি এ ধরাতল চলি গেছ কতদিন,
কবি-শিরোমণি!
থামিয়াছে মর্ম্মস্পর্শী কবিতা-অমৃতবর্ষী
অমর লেখনী!
আর মেঘনাদ-নাদে নাহি হয় চমকিত
ভারতের মন,
আর বীরাঙ্গণা-তানে অপূর্ব্ব ঝঙ্কার কেহ
করে না শ্রবণ;
আর নাহি কাঁদে বসি মথুরার পানে চেয়ে
ব্রজের সুন্দরী,
আত্ম বিসর্জ্জিতে আর এদেশে আসেনা দেবী
সে কৃষ্ণকুমারী;
শর্ম্মিষ্ঠা ও পদ্মাবতী সে ললিত প্রেমলীলা
করে না প্রকাশ,
হয় না প্রাণের পত্র লিখি চতুর্দ্দশ ছত্র
যাপিতে প্রবাস;
তুমি গেছ গেছে চলি উদাত্ত ভৈরব সনে
মধুর উচ্ছ্বাস,
নিদাঘের শৌর্য্যসহ বরষার স্নিগ্ধ ছায়া,
বসন্ত-বাতাস!

(২)

তুমি কি দেখিছ দেব! তব সেই তপোবন
যেথানে তখন,
ঢালিয়া প্রাণের রক্ত পূজিলে হে মহাভক্ত,
ভারতী-চরণ?
বীরবেশে বর্ম্ম পরি নিশিত আয়ুধ ধরি
দুন্দুভি বাজিয়ে,
করিলে প্রতিষ্ঠা মা'র মুগ্ধ চক্ষে ত্রিসংসার
রহিল চাহিয়ে;
তুমি কি দেখিছ দেব সে মাতৃমন্দির তব
আজি "রঙ্গভূমি"
কার শাপে নাহি জানি বঙ্গে আজি বীণাপাণি
পড়িছেন ঘুমি!
নাচিছে কল্পনা বালা গলে দিয়া ফুলমালা
হাতে নিয়া বাঁশি,
অশ্রান্ত অবোধ্য সুরে দিতেছে পরাণ পুরে
উছলিত হাসি!
নীরব নিবৃত্ত সব দামামা দুন্দুভি রব
আয়ুধ শিঞ্জন,
কেবলি মলয়ানিলে বেলা যূঁই গন্ধ মিলে,
ভ্রমর গুঞ্জন!
সেই দৃপ্ত বীর রসে আর নাহি মন বসে
সে যে "পুরাতন"
তোমার সে তপস্যায় একি "অপবর্গ" হায়!
এ কি বিপ্লাবন!
তুমি যাহা দিয়াছিলে সে কাঞ্চন কাচ মূলে
করেছি বিক্রয়,
আমরা চিনি না রত্ন জানি না আদর যত্ন
নীচ ক্ষুদ্রাশয়!

(৩)

যশোদা জননী যথা লভিলেন, তপোবনে
"বাছা নীলমণি"
তেমতি আজন্ম পুণ্যে তোমারে পাইলা কোলে
জাহ্নবী জননী
ধন্য সে সাগরদাঁড়ি ধন্য রাজনারায়ণ
তোমা ধনে লভি
আজো কপোতক্ষ প্রাণ, মুখরিত তব গানে
মধুময় সবি!
রবে যথা শশী সূর্য্য তুমি রবে বিশ্বপূজ্য
অমর অক্ষয়,
আমরাই অপদার্থ চিনিনি অমূল্য রত্ন,
হীন নীচাশয়!
কি কব যাতনা মম প্রবাসী বিদেশী সম,
করিনু বিদায়,
নাহি প্রাণ নাহি শক্তি নাহি শ্রদ্ধা নাহি ভক্তি
বলিব কি হায়!—
সে সব ক্ষমিয়া আজি লইবে কি পুষ্পাঞ্জলি
অনুতপ্ত-করে,
ঝরিছে যাদের নেত্রে হেরি এ সমাধিক্ষেত্রে
বরষের পরে!
তোমার অমর পুর হোক্ না সে যতদূর,
ধর এ মিনতি—
ভুলি মর্ত্ত্য-অত্যাচার লহ তব দুহিতার
সহস্র প্রণতি।

প্রণতা—শ্রীবীরকুমার-বধ-রচয়িত্রী।

গীতোক্ত ত্রিগুণ-তত্ত্ব। (৪)

ভগবানের পরাশক্তি,—বৈষ্ণবাচার্য্যগণের মতে তাঁহার স্বরূপ শক্তি—ত্রিবিধ। তাহা সন্ধিনী, সম্বিৎ ও হ্লাদিনী শক্তি। তাঁহাদের মতে এই ত্রিবিধ শক্তি হইতেই তাঁহার প্রকৃতিতে এই সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ, এই ত্রিগুণের অভিব্যক্তি হয়। ভগবানের যাহা শুদ্ধা প্রকৃতি, তাহাতে অলৌকিক সত্ত্ব রজঃ তমঃ গুণের অভিব্যক্তি হয়। আর যাহা আমাদের মলিন প্রকৃতি, তাহাতে লৌকিক সত্ত্ব রজঃ তমঃ গুণের বিকাশ হয়, তাহা মলিন, অশুদ্ধ, তাহাই জীবকে বদ্ধ করে। (বল্লভাচার্য্য-কৃত গীতা ১৪।৫ শ্লোক-॥)

বেদান্ত মতে ত্রিগুণের স্বরূপ।—আমরা পূর্ব্বে দেখিয়াছি যে, সাংখ্যের মূল প্রকৃতি-পুরুষ বাদও এইরূপ বেদান্তের সহিত সমন্বয় করিয়া গীতায় এবং অন্যান্য শাস্ত্রে গৃহীত হইয়াছে। সেইরূপ ত্রিগুণতত্ত্ব এবং সাংখ্য ও বেদান্তের সমন্বয় পূর্ব্বক গীতায় ও অন্যান্য শাস্ত্রে গৃহীত হইয়াছে। ইহা আমরা ক্রমে ক্রমে বুঝিতে চেষ্টা করিব ও এই ত্রিগুণের স্বরূপ কি, এক্ষণে তাহা দেখিব। সাংখ্য মতে মূল প্রকৃতি দ্রব্য বা বস্তু। সুতরাং প্রকৃতির মূল উপাদান এই তিন গুণ ও বস্তু। আমরা যাহাকে সাধারণতঃ গুণ (attribute বা quality) বলি, এ ত্রিগুণ যে সেরূপ গুণ নহে, ইহা পূর্ব্বে দেখিয়াছি। বেদান্ত মতে প্রকৃতিই মায়া, তাহা ব্রহ্মের পরাশক্তি—সেই পরম দেবের স্বগুণে নিগূঢ় পরম আত্মশক্তি। (শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ ১।৩, ৪।১০ ও ৬।৮ দ্রষ্টব্য)। ব্রহ্মের এই মায়ার পরাশক্তির বা প্রকৃতির স্বতন্ত্র সত্তা নাই। তাহা বস্তু বা দ্রব্য নহে। অতএব বেদান্ত অনুসারে সাংখ্যের মূল প্রকৃতিকে জগৎকারণ-রূপে স্বীকার করিতে হইবে, তাহাকে ব্রহ্মের মায়াখ্য পরাশক্তি বলিতে হয়। গীতায়ও সাংখ্যের এই অব্যক্ত বা মূল প্রকৃতিকে ভগবানের প্রকৃতি বলা হইয়াছে। (গীতা ৭।৪—৫)। প্রকৃতি ভগবানেরই শক্তি। তাহা ব্রহ্মেরই এক ভাব—তাহা মহদ্‌ব্রহ্ম। অতএব এই তিন গুণ প্রকৃতির উপাদান হইলেও বেদান্ত বা গীতা অনুসারে তাহারা দ্রব্য বা বস্তু হইতে পারে না। তাহাদিগকে একই মূল শক্তির ত্রিবিধ ভাব বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। যাহারা শক্তি স্বীকার করেন না, তাঁহারা এই ত্রিগুণকে দ্রব্যগুণ বা ক্রিয়া, এই ত্রিবিধ পদার্থের মধ্যে কোন একরূপ পদার্থ বলিতে পারেন। আমরা এস্থলে সে মতের আলোচনা করিব না। যাহা হউক, এ সকল কথা আর এস্থলে বিস্তারিত ভাবে বুঝিবার প্রয়োজন নাই। গীতা অনুসারে ত্রিগুণের অর্থ কি, তাহা আমরা ইহা হইতে সংক্ষেপে বুঝিতে পারি। এক্ষণে এই ত্রিগুণের স্বরূপ কি, তাহা আমরা সাংখ্য ও বেদান্ত শাস্ত্র সমন্বয় করিয়া যথাসম্ভব আলোচনা করিব।

ত্রিগুণ—শ্রুত্যুক্ত ত্রিবর্ণ।—আমরা প্রধানতঃ শ্রুতি হইতে ত্রিগুণের স্বরূপ বুঝিতে চেষ্টা করিব। আমরা পূর্ব্বে দেখিয়াছি যে, সাংখ্যের যাহা অনাদি ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি, শ্বেতাশ্বতর শ্রুতি অনু-

সারে তাহা ত্রিবর্ণাত্মিকা অজা। তাহাই বহু প্রজা উৎপাদন করে। এই ত্রিবর্ণ—লোহিত, শুক্ল, কৃষ্ণ। যাহা সাংখ্যের সত্ত্ব রজঃ তমঃ এই ত্রিগুণ, তাহাই শ্বেতাশ্বতর শ্রুতিতে উক্ত শুক্ল লোহিত কৃষ্ণ এই ত্রিবর্ণ। এই ত্রিবর্ণ হইতে ত্রিগুণের স্বরূপের যেরূপ আভাস পাওয়া যায়, তাহা আমরা এক্ষণে শ্রুতি হইতে দেখিব। আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, ব্রহ্ম সৃষ্টির প্রথমে "বহু হইব" এই কল্পনা বা কামনা করিয়া নাম ও রূপ দ্বারা তাহা ব্যাকৃত করেন। ব্রহ্মই প্রথমে মূল শব্দ বা শব্দব্রহ্ম রূপে এই নামের প্রকাশ করেন,—তাঁহার বহু কল্পনাকে বহু নামে অভিব্যক্ত করেন। ব্রহ্মের এই মূল নাম প্রণব—ওঙ্কার। তাহা অ—উ—ম এই তিন মূল অক্ষরাত্মক বা বর্ণাত্মক। আমরা পূর্ব্বে অষ্টম অধ্যায়ের শেষে প্রণবের ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে, এই ওঙ্কারের অ-কারের সহিত শুক্ল বর্ণের ও সত্ত্ব গুণের, উ-কারের সহিত লোহিত বর্ণের ও রজোগুণের এবং ম কারের সহিত কৃষ্ণবর্ণের ও তমোগুণের যে গূঢ় সম্বন্ধ আছে, তাহার আভাস দিয়াছি। এ স্থলে তাহার উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। যাহা হউক, সৃষ্টিসম্বন্ধে অগ্রে ব্রহ্ম যেমন প্রণবরূপ হন, তেমনি জ্যোতি রূপ হন। ইহা হইতে বহু রূপের অভিব্যক্তি হয়। ইহাদের মধ্যে তিনটী মূলরূপ—শুক্ল, লোহিত ও কৃষ্ণ। শুক্ল জ্যোতিঃ নির্ম্মল-শুভ্র-শুদ্ধ-স্বচ্ছ। তাহাতে কোন মলিনতা নাই, কোন বর্ণবৈচিত্র্য নাই, কোন ছায়া বা আবরণ নাই। যাহা কৃষ্ণরূপ, তাহা আলোকহীন অতি মলিন তমোময়। এই শুভ্র শুক্লবর্ণ ও মসীমলিন কৃষ্ণবর্ণ মধ্যে নীল পীত লোহিতাদি রামধনুর সপ্ত বর্ণের সমাবেশ থাকে।* ইহাদের মধ্যে লোহিতই প্রধান। লোহিত বর্ণই এই সকল বর্ণকে এক অর্থে নির্দ্দেশ করে—ইহা এই সকল বর্ণের পরিচায়ক। অতএব এই আদি শুক্ল-লোহিত কৃষ্ণ বিশ্বের সমুদয় বর্ণের মূল উপাদান। ইহাদের বিভিন্নরূপ সংমিশ্রণবৈচিত্র্যে বিশ্বের প্রত্যেক বস্তুর বর্ণবৈচিত্র্য হয়। বলিয়াছি ত ব্রহ্ম সৃষ্টিসঙ্কল্প করিয়া যখন ব্যক্ত বা মূর্ত্ত হন, তখন প্রণব ও জ্যোতিরূপে অভিব্যক্ত হন। তখন তিনি এক ভাবে অ উ ও মকরাত্মক ওঙ্কার রূপ হন। এই বর্ণাত্মক জ্যোতিই তাঁহার ভর্গ। ইহার মধ্যে শুক্ল সর্ব্বপ্রকাশক, লোহিত সর্ব্বরঞ্জক আর কৃষ্ণ সর্ব্বাবরক। অন্য দিকে ইহাই ব্রহ্মের তিন মূর্ত্ত মহাভূত অপ্ তেজঃ ও অন্ন—এই তিন দেবতা রূপ, ইহা ছান্দোগ্য উপনিষদ হইতে জানা যায়। অপ্ শুক্লরূপ—তেজঃ বা অগ্নি লোহিতরূপ, আর অন্ন বা পৃথিবী কৃষ্ণ রূপ। ইহাদের মিশ্রণে বা ত্রিবৃৎ-করণ দ্বারা সর্ব্ব মূর্ত্ত সত্তার উৎপত্তি হয়, এবং ব্রহ্ম আত্মা রূপে তাহাদিগের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট থাকিয়া সমুদয়কে ধারণ করেন। এস্থলে এ সম্বন্ধে আর অধিক কিছু বলিবার প্রয়োজন নাই। সাংখ্যের ত্রিগুণতত্ত্বের সহিত শ্রুতির এই ত্রিবর্ণ-তত্ত্ব ও প্রণব-তত্ত্ব ঠিক তুলনা করিয়া কিরূপে এই ত্রিগুণের স্বরূপ জানা যাইতে পারে, তাহার আভাসমাত্র এস্থলে দেওয়া হইল।

ত্রিগুণের সত্ত্ব রজঃ তমো নামের ধাতুগত অর্থ।—আমরা এক্ষণে সত্ত্ব রজঃ তমঃ ত্রিগুণের এই নাম হইতে ইহাদের স্বরূপের

* এই জন্য সপ্ত সুরের সহিত সপ্ত বর্ণের বিশেষ সম্বন্ধ আছে, তাহা এস্থলে বুঝিবার আবশ্যক নাই।

যে আভাস পাওয়া যায়, তাহা বুঝিতে চেষ্টা করিব। সৎ হইতে সত্ত্ব ও সত্তা শব্দের উৎপত্তি। 'অস্' ধাতু হইতে—'সৎ'। অতএব স্থাবরজঙ্গমাত্মক যাহা কিছু সত্তা আছে, তাহাদের মধ্যে সদ্ ভাব (Essence) যাহা দ্বারা তাহাদের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব বিধৃত হয়, তাহাই এক অর্থে সত্ত্ব। 'রন্‌জ' ধাতু হইতে 'রজঃ'। যাহা দ্বারা সত্তার সত্ত্ব রঞ্জিত হয়, পরিবর্ত্তিত হয় ও পরিচালিত হয়; সুতরাং ক্রিয়াযুক্ত হয়—তাহা রজঃ (Energy activity) তমঃ অর্থে অন্ধকার; যাহা আবরণ করে, তাহাই তমঃ। যাহা দ্বারা কোন সত্তার সত্ত্বভাব (এবং ক্রিয়া শক্তি) আবরিত হয়—বাধা প্রাপ্ত হয়, তাহা তমঃ (inertia)। প্রকাশ ও উভয় আবরিত হইয়া যে স্থিতি ভাব বা জড়ভাব হয়, তাহার কারণ তমঃ। এইরূপে এই ত্রিগুণের এই সত্ত্ব রজঃ তমো নাম হইতে আমরা ইহাদের স্বরূপের কতকটা আভাস পাই।

সত্ত্বগুণের স্বরূপ—তাহা প্রকাশ ও সুখাত্মক কেন?—আমরা আরও দেখিয়াছি যে, গীতায় সত্ত্বগুণকে প্রকাশাত্মক ও সুখাত্মক এবং সত্ত্বগুণের প্রকাশে যে জ্ঞানের প্রকাশ হয়, ইহা বলা হইয়াছে। এই কথার অর্থ আমরা একণে বুঝিতে চেষ্টা করিব। সতের ভাবকে সত্ত্ব বলে। 'অস' ধাতু হইতে সৎ, যাহা আছে, তাহাই সৎ; 'ভূ' ধাতু হইতে ভাব, 'ভূ' ধাতুর অর্থ হওয়া। 'সৎ' যাহা হয় বা হইয়া থাকে বা যাহা হইয়া তাহার অস্তিত্ব প্রকাশ করে, তাহাই তাহার ভাব। গীতায় উক্ত হইয়াছে যে, অসতের ভাব থাকে না এবং সতেরও অভাব হয় না—"না সতো বিদ্যতে ভাবঃ, না ভাবো বিদ্যতে সতঃ"। ইহা হইতে জানা যায় যে, যাহা সৎ বা যাহা আছে, তাহা কিছু হইয়াই থাকে, কিছু না হইয়া থাকিতে পারে না। সৎ যাহা হইয়া অভিব্যক্ত হয় বা প্রকাশিত হয়, তাহাই তাহার ভাব বা সত্ত্ব। সতের এই যে আপনাকে প্রকাশ করা, তাহাই তাহার সত্ত্বশক্তি। আমরা বেদান্ত হইতে আরও জানিতে পারি যে, যাহা সৎ তাহাই চিদানন্দস্বরূপ। যাহা আছে, তাহার মধ্যে থাকার জ্ঞান নিত্য অভিব্যক্ত থাকে, এবং সেই জ্ঞানের সহিত নির্ব্বিশেষ আনন্দভাব থাকায় নিরবচ্ছিন্ন সুখ বা আনন্দেরও অনুভূতি থাকে। এজন্য শুদ্ধ সত্ত্বে অর্থাৎ সৎএর অবাধিত ভাবে আত্মজ্ঞান ও আনন্দ নিত্য অভিব্যক্ত থাকে। বেদান্তের এই সিদ্ধান্ত অপরোক্ষ অনুভবসিদ্ধ। ইহা হইতে আমরা বলিতে পারি যে, যখন আমাদের সৎ ভাবের বা সত্ত্বের অভিব্যক্তি হয়, তখন সেই প্রকাশের সহিত জ্ঞান এবং সুখেরও অভিব্যক্তি হয়। এই জ্ঞানের ধর্ম্ম এই যে, তাহা আপনাকে প্রকাশ করিয়া অপরকেও প্রকাশ করে। এজন্য তখন সর্ব্বেন্দ্রিয় দ্বারে জ্ঞান প্রকাশিত হয়, এবং সেই প্রকাশে সুখ অনুভব হয়।

শুদ্ধসত্ত্ব ও মলিনসত্ত্ব।—বেদান্ত শাস্ত্র হইতে এই সৎ-সম্বন্ধে আর এক কথা বুঝিতে হইবে। সাংখ্য মতে পুরুষ প্রকৃতি উভয়ই সৎ, পুরুষও বহু। সুতরাং সৎ বস্তু অসংখ্য। আরও, পুরুষের কোন ভাব নাই, প্রকৃতিরই ভাব আছে। জ্ঞান ধর্ম্ম প্রভৃতি প্রকৃতিজ সাত্ত্বিক বুদ্ধির ভাব। প্রকৃতি-সংযোগ হেতু পুরুষ আপনাতে এই সকল ভাব আরোপ করে। সুতরাং সতের ভাব যে সত্ত্ব, তাহা পুরুষের নাই। কিন্তু বেদান্ত শাস্ত্র হইতে

আমরা জানিতে পারি যে,সৎ এক—অদ্বিতীয়, তাহা অবিভক্ত, তাহা ব্রহ্ম, তাহা পরমাত্মা। ব্রহ্মই সচ্চিদানন্দ স্বরূপ। বেদান্ত মতে জীবও ব্রহ্ম, সুতরাং সচ্চিদানন্দ স্বরূপ। মায়া উপাধিযুক্ত হইয়া বা প্রকৃতিযুক্ত হইয়া জীবে ব্রহ্মভাব পরিচ্ছিন্ন হয়। তাহার সচ্চিদানন্দ স্বরূপ পরিচ্ছিন্ন, মলিন ও আবরিত হয়। তাই জীবভাবে তাহার সত্ত্ব মলিন হয়, তাহার জ্ঞান পরিচ্ছিন্ন হয়, তাহার সুখ, দুঃখমিশ্রিত ও অপূর্ণ হয়, তাহার প্রকাশও আবরিত হয়। বেদান্তমতে অবিদ্যা বা মলিন মায়ার শক্তি দুইরূপ,—বিক্ষেপ-শক্তি ও আবরণ-শক্তি। এক অর্থে বিক্ষেপ-শক্তি রজঃ আর আবরণ শক্তি তমঃ। এই উভয়রূপ শক্তি দ্বারায় সত্বের প্রকাশ ও সুখভাব বাধা পায়—পরিচ্ছিন্ন হয়—মলিন হয়, সত্ত্বও মলিন হয়। নির্ম্মল সত্ত্ব অবিদ্যা দ্বারা এরূপ পরিচ্ছিন্ন নহে। নির্ম্মল সত্ত্ব পর্ব্বপরিচ্ছেদ-রহিত, একরস, অখণ্ড ও অভিভক্ত। জীব-ভেদে তাহার ভেদ হয় না। সত্ত্বা বহু হইলেও সত্ত্ব একই।

সৎএর বহুভাব।—গীতা হইতে জানা যায় যে, সতের যে ভাব হয়, বা সৎ যে বহু-প্রকারে হইয়া থাকে, সেই ভাব দুই প্রকার। এক নিত্য, অবিনাশী, অপরিচ্ছিন্ন ভাব আর এক ক্ষর বা বিনাশী পরিচ্ছিন্ন ভাব। সৎ-স্বরূপ ব্রহ্মের নিত্যভাব দুইরূপ; এক পরম অক্ষর অব্যক্তভাব; তাহা নির্গুণ ব্রহ্ম আর এক পরম পুরুষভাব তাহা সগুণ ব্রহ্ম (গীতা ৮।২০)। আর বিনাশীভাব অসংখ্য। এই ক্ষরপরিচ্ছিন্নভাব—জীবভাব বা ভূতভাব। নিত্য ভাবই বিশুদ্ধ সত্ত্বভাব, আর বিনাশী ক্ষর জীবভাবই মলিন সত্ত্বভাব। ব্রহ্ম সৃষ্টির অগ্রে, "আমি বহু হইব" এইরূপ কল্পনা বা ঈক্ষণ পূর্ব্বক নাম ও রূপ দ্বারাই সেই বহু ভাবের প্রকাশ করেন এবং স্বীয় প্রকৃতিগর্ভে স্বয়ং সেই ভাব-বীজরূপে অনুপ্রবিষ্ট হন এবং সেই সকল ভাবকে বিকাশ করেন,—বিধৃত করেন, ইহা বলিয়াছি। এই জন্য এই সকল বিভিন্ন ভূতভাবে ব্রহ্মেরই সচ্চিদানন্দভাব পরিচ্ছিন্ন হইয়া অভিব্যক্ত হয়। অতএব বেদান্ত হইতে আমরা বলিতে পারি যে, ব্রহ্মেরই সচ্চিদানন্দ স্বরূপ প্রতি জীবে প্রকৃতি সহায়ে এই সতের যে ভাব, সত্ত্ব বা প্রকাশ ও তাহার সহিত নিত্য অনুস্যূত যে জ্ঞান ও সুখ, তাহা অভিব্যক্ত হয়। আর সেই প্রকৃতির যে মলিনতা বা আবরণ ও বিক্ষেপাত্মক অবিদ্যা বা তমঃ ও রজঃ, তাহা দ্বারা এই সত্বের প্রকাশ আবরিত, পরিচ্ছিন্ন ও বাধাপ্রাপ্ত হয়।

সদ্ব্রহ্ম হইতে সত্ত্ব ও মায়া হইতে রজস্তমঃ।—আমরা বেদান্ত হইতে এই অর্থে বলিতে পারি যে ব্রহ্মের সচ্চিদানন্দ স্বরূপ হইতে আমাদের প্রকৃতিতে সত্বের অভিব্যক্তি হয়, আর মায়ার বিক্ষেপ ও আবরণ শক্তি হইতে আমাদের প্রকৃতিতে রজঃ ও তমোগুণের অভিব্যক্তি হয়। অদ্বৈতবাদ অনুসারে মায়া স্বতন্ত্র তত্ত্ব নহে। কিন্তু দ্বৈতবাদ অনুসারে তত্ত্ব দুই; ব্রহ্ম ও তমঃ। ঋগ্বেদে প্রসিদ্ধ "নাসদাদীয়" [illegible] উক্ত হইয়াছে যে, সৃষ্টির অগ্রে তমঃ বিদ্যমান ছিল এবং তাহার মধ্যে স্বধার সহিত অভিন্নভাবে সেই 'এক' বিদ্যমান ছিলেন। ভাষ্যকার মতে এই স্বধাই মায়া, আর সেই 'একই'-ব্রহ্ম (ইহা পূর্ব্বে নবম অধ্যায়ে ব্যাখ্যাশেষে ঋগ্বেদীয় সৃষ্টি বিবরণ প্রসঙ্গে উক্ত হইয়াছে।) কোন কোন শ্রুতি মতে তমঃই প্রকৃতির মূল রূপ। এই তমঃ হইতে রজঃ ও রজঃ হইতে সত্বের উদ্ভব হয়। মৈত্রায়ণী শ্রুতিতে আছে—

"তম এবেদমগ্রআস...তৎপরেণেরিতং বিষমত্বং প্রয়াত্যেতত্বৈ রজসো রূপং, তৎখল্বীরিতং বিষমত্বং প্রয়াত্যেতত্বৈ...সত্ত্বস্য রূপমিতি" (মৈত্রায়ণীউপনিষদ ৪।৫)।

ইহা পূর্ব্বে উদ্ধৃত হইয়াছে। এতদনুসারে এই সত্ব রজঃ তমঃ মূল তমঃ হইতে অভিব্যক্ত। সাংখ্যদর্শনে এই তত্ত্বই গৃহীত হইয়াছে বলা যায়। তবে সাংখ্যদর্শনের যে মূল প্রকৃতি, তাহা আদি তমঃ হইতে অভিব্যক্ত এই তিন গুণের সাম্যাবস্থা বা সমপরিণামাবস্থা, এই মাত্র প্রভেদ।

সে যাহা হউক, এই সাংখ্যোক্ত দ্বৈতবাদ উপনিষদে গৃহীত হয় নাই। শ্রুতি অনুসারে তত্ত্ব একই। তাহা ব্রহ্ম। ব্রহ্ম ব্যতীত আর দ্বিতীয় তত্ত্ব নাই। বৃহদারণ্যক উপনিষদে আছে, "যস্তমসি তিষ্ঠংস্তমসোঽন্তরো যং তমো ন বেদ যস্য তমঃ শরীরং যস্তমোঽন্তরো যময়ত্যেষ ত আত্মান্তর্য্যাম্যমৃতঃ।" (৩।৭।১৩) অর্থাৎ যিনি তমঃতে অধিষ্ঠিত, তমোঽন্তবর্ত্তী, তমঃ যাঁহাকে জানে না, তমঃ যাহার শরীর, যিনি তমঃ'র অন্তরে থাকিয়া তাহাকে পরিচালিত বা নিয়মিত করেন, তিনিই তোমার অন্তর্য্যামী অমৃত আত্মা। অতএব যে তমঃ স্বধা মায়া অবিদ্যা বা প্রকৃতির কথা শ্রুতিতে পাওয়া যায়, তাহা ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন বা স্বতন্ত্র [illegible] নহে। বেদান্তাচার্য্যগণের মতে তাহা ব্রহ্মেরই আত্মশক্তি। শক্তি ও শক্তিমানে কোন ভেদ নাই। আরও এক কথা, শ্রুতিতে যে তমঃ উক্ত হইয়াছে, তাহা সৎ নহে। এক অর্থে তাহা অসৎ। তাহার কোন ভাব হয় না। তাহা অবস্তু, তাহা শূন্য। এই অসৎ বা অভাব যে জগতে নিমিত্ত বা উপাদান কোনরূপ কারণ হইতে পারে, তাহা উপনিষদে স্বীকৃত হয় নাই। অসৎ হইতে যে সৎ-এর উৎপত্তি হয়, এই মত ছান্দোগ্য উপনিষদে নিরাকৃত হইয়াছে, তাহা আমরা পূর্ব্বে দেখিয়াছি। অতএব সিদ্ধান্ত এই যে, মূল তমঃ ব্রহ্ম শক্তির অপ্রকট বা বিরাম অবস্থা মাত্র। ব্রহ্ম শক্তির বিকাশ বা কার্য্যোন্মুখ অবস্থায় এ জগৎ প্রকাশিত হয়। আর বিরাম বা কার্য্যনিবৃত্তির অবস্থায় এজগৎ সেই শক্তিতে বীজভাবে লীন থাকে। সৎএর যে ভাব হয়, তাহা এই শক্তিরই কার্য্য। কার্য্যের পূর্ণ বিরাম অবস্থায় সর্ব্বভাবের নিবৃত্তি হয়, এক অর্থে তাহার অভাব হয়। তমঃ সেই অভাবের পরিচায়ক। সৎ (essence) নিয়ত নির্ব্বিকার, নিরঞ্জন নিত্যভাব-যুক্ত থাকে। (গীতা ২।২০।২২)। তাহার পরিবর্ত্তন কি বিনাশ হয় না, তাহার 'অভাব' হয় না। সর্ব্বাবিকারি-ভাব বিনাশে যে তমঃ থাকে, তাহার মধ্যে সেই নিত্য ভাব—সেই 'এক' স্বধা যুক্ত হইয়া অধিষ্ঠিত থাকেন। সৃষ্টির অবস্থায় সমুদয় বিকারিভাব (all becoming), এই নিত্য ভাব (being)ও উক্ত তমো রূপ অভাব (Naught) ইহাদের মধ্যে—ইহাদের একরূপ সম্বন্ধ হইতে অভিব্যক্ত হয়, পরিচালিত হয়, পরিবর্ত্তিত হয়, ভাবান্তর বা অবস্থান্তর প্রাপ্ত হয়। (জর্ম্মান দার্শনিক-শ্রেষ্ঠ হেগেলের কথায়,—*becoming* is the synthesis between the thesis *being* and the antethesis *naught* বা *non being.*) এক অর্থে এই যে সৎএর নিত্য ভাব (being)—তাহাই শুদ্ধ সত্ত্ব, আর এই ভাবের যে নিয়ত পরিবর্ত্তন বা বিকার (becoming) ইহাই রজঃ, আর এই যে তৎস্বরূপ ভাবের নিবৃত্তি (naught), ইহাই তমঃ।

অথবা সৎ চিৎ ও আনন্দ হইতে সত্ত্ব রজঃ তমঃ।—বেদান্ত হইতে অন্য ভাবেও এই ত্রিগুণের স্বরূপ জানা যাইতে পারে। বেদান্ত মতে মূল তত্ত্ব যে একই, তাহা বার বার উক্ত হইয়াছে। সেই তত্ত্ব ব্রহ্ম; তাঁহারই পরাশক্তি মায়া। ব্রহ্ম সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ। তাঁহার পরাশক্তিও সুতরাং সচ্চিদানন্দময়ী। শাক্ত পণ্ডিতগণের ইহাই সিদ্ধান্ত। সৃষ্টি প্রসঙ্গে মায়াই প্রকৃতিরূপা হন। এজন্য প্রকৃতিতে যে ত্রিগুণের অভিব্যক্তি হয়, তাহার কারণ সচ্চিদানন্দরূপিণী মায়া। এ জন্য আমরা বলিতে পারি যে, সচ্চিদানন্দ স্বরূপ ব্রহ্মের পরাশক্তি সচ্চিদানন্দময়ী মায়ার প্রতিবিম্ব মূল প্রকৃতিতে পতিত হইয়া তাহাতে এই সত্ত্ব রজঃ ও তমোগুণের অভিব্যক্তি হয়। 'সৎ" হইতে সত্ত্ব, 'চিৎ' হইতে রজঃ ও আনন্দ হইতে তমঃ। বৈষ্ণবাচার্য্যগণের কথায় বলা যায় যে, পরম ব্রহ্ম পরমেশ্বরের সন্ধিনী শক্তি হইতে সত্ত্ব, সম্বিৎ শক্তি হইতে রজঃ ও হ্লাদিনী শক্তি হইতে তমঃ। আমরা আরও বলিতে পারি যে, পরম ব্রহ্ম নিগুর্ণ নির্ব্বিশেষ নিরুপাধি অনির্দ্দেশ্য। মায়াযুক্ত হইয়াই তিনি সগুণ সোপাধিক সবিশেষ হন। মায়াশক্তি-যোগে ব্রহ্ম যেমন সচ্চিদানন্দময় হন, সেইরূপ তাঁহার প্রকৃতিও সত্ত্ব, রজঃ, তমোময়ী হয়। এজন্য বলিতে পারা যায় যে, ব্রহ্মের এই সচ্চিদানন্দ ভাবই প্রকৃতির ত্রিগুণ ভাবের মূল কারণ প্রকৃতিতে তাহার অভিব্যক্ত ভাব মাত্র। 'সৎ হইতে সত্ত্ব। একথা পূর্ব্বে বিস্তারিতভাবে বিবৃত হইয়াছে। এস্থলে তাহার পুনরুল্লেখের প্রয়োজন নাই। সৎএর ভাব যে সত্ত্ব, তাহা সকলেই স্বীকার করেন। একই সৎ স্বরূপ ব্রহ্ম বহু হইবার কল্পনা করিয়া যে স্থাবর জঙ্গমাত্মক বহু সত্তার অভিব্যক্তি করেন, তাহা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। এই সকল সত্তার মধ্যে যে সৎএর ভাব বা সত্ত্ব প্রকৃতি সংযোগে অভিব্যক্ত হয়, তাহাই তাহাদের সত্ত্ব গুণ। ইহা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। আমরা সে স্থলে বলিয়াছি যে সৎ চিৎ ও আনন্দ পরস্পর-সম্বন্ধ বলিয়া সৎ ভাবের সহিত চিৎ ভাব ও আনন্দ ভাব একত্র অভিব্যক্ত হয়, এজন্য সত্ত্ব জ্ঞানাত্মক ও সুখাত্মক। ইহা হইতে অবশ্য বলিতে হয় যে, চিৎ রজোগুণের কারণ নহে এবং আনন্দও তমোগুণের কারণ নহে। অর্থাৎ চিৎ-এর প্রতিবিম্ব প্রকৃতির রজোগুণ নহে, আনন্দেরও প্রতিবিম্ব প্রকৃতির তমোগুণ নহে; সুতরাং রজঃ ও তমোগুণের মূল অন্যত্র সন্ধান করিতে হয়। কিন্তু এস্থলে যে সিদ্ধান্ত উল্লিখিত হইল, তদনুসারে রজোগুণের কারণ চিৎ ও সত্ত্বগুণের কারণ আনন্দ ইহা সিদ্ধান্ত করিতে হয়। কিন্তু এই আপাত-বিরোধের মীমাংসা করা যায়। ব্রহ্ম ও মায়া যে ভিন্ন তত্ত্ব নহে, ইহা স্বীকার করিলে এ বিরোধ থাকে না। মায়া ব্রহ্মেরই শক্তি, সুতরাং মায়ার আবরণ ও বিক্ষেপ ভাব ব্রহ্ম হইতে স্বতন্ত্র তত্ত্ব নহে। অতএব তাহাদের মূলও, ব্রহ্মের বা তাঁহার সচ্চিদানন্দ স্বরূপের মধ্যেই অনুসন্ধান করিতে হয়। তাহা হইলে এই আবরণ ও বিক্ষেপ ভাবের মূল যে ব্রহ্মের চিদানন্দ স্বরূপের মধ্যে নিহিত, তাহারও সন্ধান পাওয়া যায়। অতএব আমরা বলিতে পারি যে, যেমন সৎ হইতে সত্ত্ব, সেইরূপ চিৎ হইতে রজঃ ও আনন্দ হইতে তমঃ অভিব্যক্ত হয়।

চিৎ হইতে রজঃ। চিৎ-এর সহিত চৈতন্যের ও চিত্তের সম্বন্ধ মনে রাখিয়া এই কথা বুঝিতে হইবে। চিৎ হইতে জ্ঞানের অভিব্যক্তি হয়। ব্রহ্ম চিৎস্বরূপ, এজন্য তিনি সৃষ্টির প্রারম্ভে কল্পনা করেন, ঈক্ষণ করেন, কামনা করেন

'আমি বহু হইব।' এই কল্পনা বা কামনার ফলে স্থির অচল ব্রহ্ম-সাগরে চাঞ্চল্য 'এজৎ' বা অনুকম্পন উপস্থিত হয় এবং শাস্ত্রমতে তাহা হইতেই কালের এবং প্রাণের অভিব্যক্তি হয়। তাহাই সৃষ্টির মূল। এই সৃষ্টির মূল 'কাম'; তাই শ্রুতি বলিয়াছেন—

"কামং এবেদং সমবর্ত্ততাগ্রে
অধিমনসো রেতঃ যদাসীৎ।"
(ঋগ্বেদ, নাসদাদীয় সূক্ত)।

অতএব চিৎ কেবল জ্ঞানের হেতু নহে; ইহার সহিত কাম ও চাঞ্চল্য নিত্য অনুস্যূত থাকে। সুতরাং 'চিৎ'ই রজোগুণের মূল। আমরা শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ হইতে জানিতে পারি যে, ভগবানের বিবিধ পরাশক্তি—"স্বাভাবিকী জ্ঞান-বল-ক্রিয়াত্মিকা"। (শ্বেতঃ উপঃ ৬।৮)। এই জ্ঞান বল-ক্রিয়া মূল পরাশক্তির চিৎ-ভাব বলা যায়। আমরা দেখিয়াছি যে, রজোগুণ রাগাত্মক; ইহা হইতে আমরা তৃষ্ণা, রাগ, দ্বেষ, কাম, ক্রোধ, লোভাদির বশে কর্ম্মে প্রবৃত্ত হই এবং দুঃখ ভোগ করি। সুতরাং আমরা বলিতে পারি যে, ব্রহ্মের এই চিৎ ভাবের প্রতিবিম্ব গ্রহণ করিয়া, প্রকৃতি এই রজোগুণ যুক্ত হয় এবং তাহার দ্বারা আমরা রঞ্জিত হই। সৃষ্টির প্রারম্ভে যখন পূর্ব্ব সৃষ্টি অনুসারে ব্রহ্ম কল্পনা করেন—আমি বহু হইয়া উদ্ভূত হইব, এবং যখন তিনি বহুর কল্পনাবীজ স্বপ্রকৃতিতে নিষেক করেন, তখন সেই কল্পনাবীজের অভিব্যক্তির জন্য সেই বহু ভাবের বিকাশ জন্য প্রকৃতির যে ক্রিয়া ভাব, যে চাঞ্চল্য, তাহাই এক অর্থে রজঃ। অতএব চিৎ হইতে রজঃ, ইহা সিদ্ধান্ত করা যায়। আমরা আরও বলিতে পারি যে, যেমন সমষ্টি ভাবে ব্রহ্মের চিৎ-স্বরূপ হইতে মূল প্রকৃতিতে রজোগুণের প্রকাশ হয়; সেইরূপ, ব্যষ্টিভাবে আমাদের প্রকৃতিতেও এই রজোগুণের প্রকাশ হয়। আমাদের মধ্যে যে বিশিষ্ট সৎভাব—যে সত্তা প্রকৃতি সংযোগে অভিব্যক্ত হয়—যাহা আমাদের বিশেষ সত্তা, যাহা প্রকৃতির সত্ত্ব গুণ দ্বারা বিধৃত হয়,—আমাদের সেই প্রকৃতিজ রজোগুণ তাহাকে যে রঞ্জিত করে, পরিচালিত করে, পরিবর্ত্তিত করে, বিক্ষিপ্ত করে, এক ভাব হইতে ভাবান্তরে লইয়া যায়, তাহার মূলে আমাদের জ্ঞান ও কাম বা বাসনা নিত্য নিহিত থাকে। কাম এই রজোগুণের পরিচালক, প্রবর্ত্তক ও মূল কারণ, সেই জ্ঞান (বৃত্তিজ্ঞান) ও কাম যে চিৎ-রূপের বিকাশ, তাহা পূর্ব্বে বলিয়াছি। অতএব চিৎ হইতে রজঃ।

সেইরূপ আনন্দ হইতে তমঃ। আনন্দ—ব্রহ্ম, আনন্দ ব্রহ্মের হ্লাদিনী শক্তি। এই আনন্দ বা হ্লাদিনী শক্তির স্বরূপ বুঝিলে, তাহা হইতে কিরূপে তমোগুণের উদ্ভব হইতে পারে, তাহা কতকটা বুঝিতে পারা যাইবে। আমরা এস্থলে সংক্ষেপে এই মাত্র বলিব যে, আনন্দ সুখ—দুঃখ এই দ্বন্দ্বাতীত পরম ভাব; ইহা আত্মার নির্ব্বিশেষ রসানুভূতি,—ইহা অনির্ব্বচনীয়। এই আনন্দ জ্ঞানের অপেক্ষা রাখে না, কর্ম্মের অপেক্ষা রাখে না,—কোন বাহ্য বিষয়েরই অপেক্ষা রাখে না। আমরা আনন্দের স্বরূপ ঠিক অনুভব করিতে পারি না। আমরা যে পরিচ্ছিন্ন আনন্দের রসাস্বাদন করি, তাহা উদ্দীপনাদির জন্য বাহ্য বিষয়ের ও জ্ঞানের অপেক্ষা রাখে। কদাচিৎ আমরা এই অনপেক্ষ আনন্দ-রসাস্বাদের সামান্য অবসর পাই। তখন আমরা বুঝিতে পারি যে,

এই আনন্দের অভিব্যক্তিতে আমাদের ভোক্তৃ ভাব হয়, তাহাতে আমাদের জ্ঞাতৃ ভাব বা কর্ত্তৃ-ভাব ডুবিয়া যায়। তখন আমাদের সাত্ত্বিক প্রকাশ জ্ঞান ও সুখের ভাব যেন আবরিত হয়। তখন, আমাদের রাজসিক দুঃখ-ভাব ও কর্ম্মে প্রবৃত্তি-ভাব ও রাগদ্বেষাদি সমুদয় রজোগুণজ ভাব অন্তর্হিত হয়। আমরা পূর্ব্বে দেখিয়াছি যে, তমোগুণ হইতেও জ্ঞান আবরিত হয়।—অপ্রকাশ, মোহ হয়, নিদ্রা আলস্য প্রভৃতি অবসাদ উপস্থিত হয়। নিদ্রাই তমোগুণের বিশেষ বিকাশের অবস্থা। নিদ্রায় আমাদের সমুদয় জ্ঞানবৃত্তির ও কর্ম্মবৃত্তির বিরাম হয়, বেদান্ত মতে তখন আত্মা আনন্দময় কোষে অবস্থান করেন। সাংখ্যসূত্রে আছে যে, সমাধি ও মোক্ষাবস্থার ন্যায় নিদ্রাবস্থায় ব্রহ্মরূপত্ব প্রাপ্তি হয়। ইহা হইতে আমরা এই আনন্দের সহিত তমোগুণের যে অতি নিকট সম্বন্ধ আছে, তাহা বুঝিতে পারি। *

ব্রহ্মের এই আনন্দ মূলপ্রকৃতিতে প্রতিবিম্বিত হইয়া পরিচ্ছিন্ন হইয়া তমোরূপে অভিব্যক্ত হয়। প্রকৃতিতে তামসিক ভাব সকল মলিন হইয়া প্রকাশিত হয়। আমরা আরও বলিতে পারি যে, এই আনন্দেরই অবিদ্যাযুক্ত ভাব তমঃ। অবিদ্যা হেতু আনন্দ তাহার বিপরীত নিরানন্দ ভাব যুক্ত হইয়া প্রকৃতিতে অভিব্যক্ত হয়। তাহাই এক অর্থে তমঃ। সত্ত্ব ও রজোগুণ যেমন আমাদিগকে বাহ্য বিষয়ে প্রেরণ করিয়া তাহা প্রকাশ ও গ্রহণ করায় এবং কর্ম্মে প্রবর্ত্তিত করে, সেইরূপ তমোগুণ আমাদিগকে বাহ্য বিষয় হইতে আকর্ষণ করিয়া ভিতরে লইয়া আইসে এবং অন্তরে আত্মানন্দের ছায়া উপভোগ করিবার অবসর দেয়। এইরূপে আনন্দের সহিত তমোগুণের সম্বন্ধ আমরা বুঝিতে পারি।

* এই নিদ্রাবস্থার স্বরূপ বুঝিতে পারিলে, আনন্দের সহিত তমোগুণের সম্বন্ধ আমরা কতকটা বুঝিতে পারিব। নিদ্রাবস্থায় আমাদের স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীর ঘোরতমোভাবের দ্বারা অভিভূত হয়। কিন্তু তখন আমাদের আত্মা আনন্দময় কোষে থাকিয়া পরমানন্দ উপভোগ করেন—ব্রহ্মরূপ হন, তাহা বলিয়াছি। জাগ্রদবস্থায় আমাদের ক্ষেত্রে বা প্রকৃতিজ শরীরে ব্যাপ্ত থাকিয়া, তাহার অধিষ্ঠাতা হন। তখন আত্মার চিৎস্বরূপ আমাদের চিত্তে প্রতিবিম্বিত হয় এবং চিত্ত চেতনবৎ হয়। সে চৈতন্য সর্ব্বশরীরে ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে, সর্ব্বেন্দ্রিয়ের দ্বার দিয়া বাহ্য বিষয়ে ব্যাপ্ত হইয়া তাহা প্রকাশ করে। বেদান্তের ভাষায় তখন প্রমাতৃচৈতন্য বহির্ম্মুখ হইয়া প্রমাণ-চৈতন্য ও প্রমেয়-চৈতন্যরূপ মন। কিন্তু নিদ্রাবস্থায় চৈতন্য বাহ্য বিষয় হইতে ক্রমে অন্তর্ম্মুখ হয় ও শেষে সর্ব্বশরীর হইতে আপনাকে আকর্ষণ করিয়া লইয়া আত্মস্থ হয়। আমাদের যখন নিদ্রাকর্ষণ হয়, যখন আমরা জাগ্রদবস্থা হইতে সুষুপ্তি অবস্থা প্রাপ্ত হই, তখন সেই অবস্থার প্রতি যদি আমরা লক্ষ্য করি, সেই অবস্থায় হস্ত পদাদি শরীর ও মন কিরূপে ক্রমে ক্রমে অবশ ও নিষ্ক্রিয় হইয়া আইসে, তাহা জানিতে চেষ্টা করি, তাহা হইলে আত্মার আনন্দের সহিত প্রকৃতিজ তমোগুণের যে কি সম্বন্ধ, তাহা কতকটা অনুভব করিতে পারি। আত্মা বা পুরুষকে আনন্দানুভব করাইবার জন্য যেন প্রকৃতি তাহার তমোগুণের দ্বারা তাহার রজোগুণজ ক্রিয়া-শক্তি ও সত্ত্বগুণজ জ্ঞান-শক্তি অভিভূত করিয়া দেন। তখন যেন প্রকৃতি আপনাকে তম-আবরণে আবৃত করিয়া পুরুষের দৃষ্টির অন্তরালে লুক্কায়িত হন। নিদ্রার ন্যায় আলস্য, অবসাদ, মোহ প্রভৃতি তামসিক ভাবের কথা চিন্তা করিলেও আমরা এই তত্ত্ব বুঝিতে পারি। আমাদের সাত্ত্বিক জ্ঞানক্রিয়া ও রাজসিক বল

প্রকৃতি পুরুষ বা ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ-সংযোগে আমাদের যে জীব ভাব হয়. সেই পুরুষ বা ক্ষেত্রজ্ঞ স্বরূপতঃ সচ্চিদানন্দময় পরম ব্রহ্ম বা পরম পুরুষ, আর সেই প্রকৃতি ও প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন ক্ষেত্র স্বরূপতঃ ব্রহ্মের পরা-শক্তি সচ্চিদানন্দময়ী মায়া, তাহা পূর্ব্বে বলিয়াছি—অতএব জীব—আমাদের এক দিকে সচ্চিদানন্দ পুরুষ, আর অন্য দিকে সত্ত্ব রজঃ তমোময়ী প্রকৃতি হইতে অভিব্যক্ত এই ত্রিগুণজ ভাবযুক্ত দেহ বা ক্ষেত্র। আমাদের সৎ' ভাবের যখন বিকাশ হয়, তখন প্রকৃতিজ ক্ষেত্রে সত্ত্বগুণ অন্য দুই গুণকে অভিভূত করিয়া প্রকাশিত হয়, যখন 'চিৎ' ভাবের বিকাশ হয়, তখন ক্ষেত্রেও তাহার আকর্ষণে বা তাহার প্রতিবিম্ব গ্রহণে রজোগুণের প্রকাশ হয়। আর আমাদের যখন 'আনন্দ'ভাবের বিকাশ হয়, তখন আমাদের ক্ষেত্রেও তমোগুণের অভিব্যক্তি হয়। আমাদের ক্ষেত্রে যখন সে গুণের এইরূপে বিকাশ হয়, তখন জীব—আমরা সেই গুণজভাবে ভাবিত হই—তাহা দ্বারা বদ্ধ হই। এইরূপে সচ্চিদানন্দের সহিত সত্ত্ব রজঃ তমোগুণের সম্বন্ধ স্বীকার করিলে, আমরা আমাদের ত্রিগুণজভাবের কারণ কতকটা ধারণা করিতে পারি।

তন্ত্রোক্ত ত্রিগুণতত্ত্ব।—এইরূপে ব্রহ্মের সৎ চিৎ ও আনন্দের সহিত সত্ত্ব রজঃ ও তমোগুণের সম্বন্ধ বেদান্ত হইতে আমরা জানিতে পারি। তন্ত্র হইতে শাক্ত পণ্ডিত-গণ যেরূপে ব্রহ্মের সচ্চিদানন্দময়ী পরম মায়া-শক্তি ধারণা করিয়াছেন, তাহা হইতেও প্রকৃতিজ ত্রিগুণের মূলকে মায়ার 'সৎ' 'চিৎ' 'আনন্দ' ভাব তাহা সিদ্ধান্ত করিতে পারি। এস্থলে আরও বলা যাইতে পারে যে, অধি-কাংশ তান্ত্রিক আচার্য্যগণ ব্রহ্মের বা পরমা মায়ার সচ্চিদানন্দ স্বরূপের সহিত প্রকৃতিতে ত্রিগুণের অভিব্যক্তি ও সম্বন্ধ নানা যন্ত্রে ইঙ্গিত করিয়াছেন। তবে যে সকল যন্ত্র আছে তাহাতে জগতের অভিব্যক্তি-তত্ত্ব সঙ্কেতে ইঙ্গিত করা হইয়াছে। প্রায় সমুদয় যন্ত্রের মূল অংশ বিপরীত ভাবে স্থাপিত দুই সমকোণ ত্রিভুজ, তাহাদের মধ্য বা কেন্দ্র স্থলে শূন্য এবং এই দুই ত্রিভুজের বাহিরে

ক্রিয়া হইতে যখন আমাদের শ্রান্তি বা ক্লান্তি অনুভূত হয়. যখন আমাদের বিশ্রামের প্রয়োজন হয়, তখন সেই ক্রিয়ার প্রতি-রোধক তামসিক আলস্য ও অবসাদাদি উপস্থিত হয় এবং একেবারে বিরামের প্রয়োজন হইলে আমরা নিদ্রিত হই। আমাদিগকে এই বিরামের আনন্দ উপভোগ করাইবার জন্য আমাদের বিশ্রামেচ্ছার (Longing for rest) চরিতার্থ করিবার জন্য যেন প্রকৃতি তখন আপনার সাত্ত্বিক ও রাজসিক ভাব তামসিক ভাবের দ্বারা আচ্ছন্ন করেন। ইহা হইতে আমাদের আনন্দের সহিত তমোগুণের সম্বন্ধ অনুমিত হইতে পারে।

ব্যষ্টিভাবে আমাদের প্রত্যেকের সম্বন্ধে যে নিয়ম, এই বিশ্ব সম্বন্ধেও সেই নিয়ম, ইহা সিদ্ধান্ত করিলে আনন্দ স্বরূপ পুরুষের সন্নিধি হেতু কিরূপে প্রকৃতিতে তমোগুণের অভিব্যক্তি হয়, তাহাও বুঝিতে পারা যায়। শাস্ত্রে আছে যে, ভগবানের জাগ্রদবস্থায় এই সৃষ্টি-বিধৃত হয়, "সচ্চিদানন্দস্বরূপ ভগবানের পরা প্রকৃতি সত্ত্ব, রজঃ তমোময়ী হইয়া এই জগৎ অভিব্যক্ত করেন ও ধারণ করেন। আর ভগবানের নিদ্রাবস্থায় এ জগতের লয় হয়। তখন তিনি আনন্দ স্বরূপে তমোভূত প্রকৃতিতে স্থিত হইয়া নিদ্রিত থাকেন। অতএব এই তমোগুণ প্রকৃতিতে অভিব্যক্ত ভগবানের এই আনন্দ-ভাব ইহা বলা যাইতে পারে।

গোল বেষ্টন। এই সঙ্কেতের অর্থ,—মধ্যস্থ বিশ্বরূপ নির্ব্বিশেষ পরব্রহ্ম হইতে সচ্চিদানন্দ রূপ সগুণ ব্রহ্ম ও ত্রিগুণাত্মিকা পরমাপ্রকৃতি অভিব্যক্ত হইয়া সমুদয় ব্রহ্মাণ্ডকে প্রকাশ ও ধারণ করিয়া আছেন।

শ্রীদেবেন্দ্রবিজয় বসু।

দক্ষিণ-ভ্রমণ। (৩)

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

রাজমহেন্দ্রির নিকটেই ঠিক গোদাবরী নদীর উপর গোদাবরী-ষ্টেসন, এখানে ট্রেণ সামান্য সময়ের জন্য অপেক্ষা করে। নদীর বিস্তৃতি অনেকটা এবং পুলটীও অতি সুন্দর। এই নদীতে স্নান করিবার বিশেষ সাধ ছিল, কিন্তু ঘটনাক্রমে তাহা হইল না। বৈষ্ণব-দিগের নিকট এই গোদাবরী নদী অতি পবিত্র, কারণ এই নদীর তীরে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য রামানন্দের সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং বৈষ্ণবধর্ম্মের নিগূঢ় তত্ত্বগুলি রামানন্দকে উপলক্ষ করিয়া জগতের নিকট প্রকাশিত করেন। গৌরাঙ্গলীলা যাঁহারা পাঠ করিয়া ছেন, তাঁহারা সকলেই এই সমস্ত বিবরণ জ্ঞাত আছেন, কিন্তু তবুও একটু বিবরণ এই স্থানে না দিয়া থাকিতে পারিলাম না, কারণ গৌরাঙ্গের ভক্তি কথা কখনও পুরাতন হয় না, বরং ভক্ত যতই এবিষয়ে আলোচনা করিতে থাকেন, ততই আনন্দ অনুভব করেন।

গোদাবরী-ষ্টেসনের অপর পারে বিদ্যা-নগরে রামানন্দ রায় দেশ শাসন করিতেন। তিনি পুরীর রাজার অধীন কর্ম্ম করিতেন, সেই সময়ে পুরীর রাজা ছিলেন প্রতাপ রুদ্র। প্রায় ৪০০ বৎসর পূর্ব্বে রাজমহেন্দ্রি জেলা পুরীর রাজার শাসনাধীন ছিল—এদিকে মুসলমানের অধিকার বড় বেশী প্রসারিত হইতে পারে নাই। মহাপ্রভু নদী পার হইয়া একটী জঙ্গলের নিকট বসিয়া-ছিলেন, সেই সময় রামানন্দ স্নান করিতে আইসেন এবং মহাপ্রভুর সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। প্রথম দর্শনেই উভয়ে উভয়কে চিনিতে পারিলেন এবং রামানন্দ তাঁহার পদতলে পতিত হইয়া পড়িলে মহাপ্রভু তাঁহাকে উঠাইয়া গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন। তৎপর অন্যান্য কথার পর তিনি স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন এবং রাত্রে পুনরায় কোন এক ব্রাহ্মণের বাড়ীতে মহাপ্রভুর সহিত সাক্ষাৎ করিলেন।

অন্যান্য কথার পর প্রভু রামানন্দকে জিজ্ঞাসা করিলেন, সাধকগণ সাধন দ্বারা যাহা প্রাপ্ত হন, সেই সম্বন্ধে আমাকে কিছু বল। তোমার মুখে হরি-গুণানুকীর্ত্তন শ্রবণ করিবার জন্য বাসুদেব সার্ব্বভৌম আমাকে উপদেশ করিয়াছেন।

রামানন্দ অনেক প্রকার বিনয় বচনের পর উত্তর করিলেন, "স্বধর্ম্মাচরণ অর্থাৎ ধর্ম্মপালন করিলেই ভগবানের প্রতি ভক্তি হয়।" প্রভু বলিলেন, "ইহা অতি বাহ্য কথা—আরও আগে যদি কিছু থাকে, তাহাই আমাকে বল।"

রামানন্দ। বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম যদি বাহ্য হয়, তবে আমরা যাহা কিছু করি, যাহা কিছু দান

করি ও যাহা কিছু তপস্যা করি, তাহার সমস্ত কর্ম্মফল শ্রীকৃষ্ণে অর্পণ করাই সার সাধনা।

প্রভু মনে মনে বিচার করিলেন, এই প্রকারে যে ভগবানে কর্ম্মার্পণ, উহাও কেবল ভক্তি নহে, সুতরাং উত্তর করিলেন, ইহাও বাহ্য, আরও আগে যদি কিছু থাকে, তাহা প্রকাশ কর।

রামানন্দ বলিলেন, স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া সার ভক্তি সাধন করাই শ্রেষ্ঠ। ধর্ম্মেও দোষ ও গুণ আছে; অধর্ম্মেও দোষ ও গুণ আছে, সুতরাং বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া ভক্তি সাধন করাই সাধকের পক্ষে মঙ্গলজনক। ইহাতে ভগবানের শরণাগত হওয়া যায়।

প্রভু মনে মনে বিচার করিলেন "এই প্রকার শরণাগতিতে সাধকের কামনা দূর হয় না, তখনও নিজের দুঃখ বিনাশরূপ কামনা হৃদয়ে বলবান থাকে, সুতরাং উহাও বাহ্য বলিয়া আরও আগে কিছু থাকিলে তাহা বলিবার জন্য রায়কে অনুরোধ করিলেন।

রামানন্দ তখন বলিলেন, তবে জ্ঞানমিশ্র ভক্তিই সারধর্ম্ম।

প্রভু দেখিলেন, রামানন্দ এখনও জ্ঞানের রাজ্য ভ্রমণ করিতেছে। জ্ঞানেতে ঈশ্বরে ও জীবে অভেদ শিক্ষা দেয়, সুতরাং তিনি ইহা কিছুতেই অনুমোদন করিতে পারেন না। জীবে ভগবদ্ভক্তি তিনি কখনও সহ্য করিতে পারিতেন না। নবদ্বীপে একটী স্ত্রীলোক তাঁহাকে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া অভিবাদন করাতে তিনি গঙ্গায় ডুবিয়া দেহ ত্যাগ করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন, নিত্যানন্দ প্রভৃতি ভক্তগণ রক্ষা না করিলে সেইদিনই তাঁহার দেহত্যাগ হইয়া যাইত। সুতরাং যতক্ষণ পর্য্যন্ত রামানন্দ জ্ঞানের রাজ্যে ভ্রমণ করিতেছিলেন, ততক্ষণ তিনি ইহাও বাহ্য বলিয়া আরও আগে যাইতে অনুরোধ করিতেছিলেন। এইবার রামানন্দ জ্ঞান রাজ্য ছাড়িয়া দিয়া উত্তর করিলেন "জ্ঞানশূন্য ভক্তিই" সাধ্য সাধনা।

এক্ষণে প্রভু মনে মনে সন্তুষ্ট হইয়া উত্তর করিলেন, রামানন্দ, তুমি সত্যই বলিয়াছ, জ্ঞানশূন্য ভক্তিই সার কিন্তু ইহারও অধিক যদি কিছু থাকে, তবে আমাকে তাহা প্রকাশ করিয়া কৃতার্থ কর।

রামানন্দ উত্তর করিলেন "ভক্তি" অপেক্ষা "প্রেমভক্তি" আরও উত্তম এবং ইহাই সর্ব্ব সাধ্য সাধন বলিয়া বিবেচনা করি।

প্রভু দেখিলেন, ইহা মন্দ নহে, কিন্তু ইহাতেও সেবা নাই, শুধু শ্রীকৃষ্ণের চিদৈশ্বর্য্যে অনুভূতি দ্বারা নিষ্ঠা আছে, সুতরাং আরও কিছু বলিতে বলিলেন।

রামানন্দ। প্রভু, তুমি আমাকে যে প্রকারে বলাইতেছ, আমি তাহাই বলিতেছি, আমি যন্ত্র মাত্র, তুমি যন্ত্রী হইয়া যাহা করিতেছ, তাহাই হইতেছে। প্রেমভক্তি অপেক্ষা আমি "দাস্যপ্রেমকেই" সর্ব্বসাধ্য সার সাধনা মনে করি। দাস্যভাবে ভগবানকে সাধনা করা অতি উত্তম, তাহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু ইহাতে সাধকের মনে একটু ধারণা থাকে, তিনি প্রভু আর আমি তাঁহার দাস, সুতরাং তাঁহাকে একটু ভয় করিয়া চলিতে হইবে। যাঁহাকে প্রাণের প্রাণ বলিয়াও সুখানুভব হয় না, তাঁহার প্রতি ভয় থাকিলে সাধন ভজনের সুবিধা হয় না। এই সমস্ত বিবেচনা করিয়া প্রভু উত্তর করিলেন, এই প্রকার দাস্যপ্রেমে সাধন মন্দ নহে। কিন্তু ইহা অপেক্ষা আরও যদি কিছু উচ্চতর থাকে, তবে তাহা প্রকাশ কর।

রামানন্দ। প্রভু আরও উত্তম সাধনা আছে, আমি তাহাকে "সখ্য প্রেম" বলি।

প্রভু। রামানন্দ, তুমি উত্তম বলিয়াছ, সখ্যপ্রেম দাস্যপ্রেম অপেক্ষা অতি উত্তম। এই প্রেমে ভগবানের ঐশ্বর্য্যে, ভয় বা সম্ভ্রম কিছু থাকে না। কিন্তু ইহা অপেক্ষা আরও যদি কিছু থাকে, তবে তাহাও প্রকাশ কর।

রামানন্দ। প্রভু, সখ্য প্রেম অপেক্ষা বাৎসল্য প্রেম আরও অধিক উত্তম।

প্রভু। রামানন্দ, তুমি অতি উত্তম কথা বলিয়াছ, এই বাৎসল্য প্রেমে ত ড়ন ভৎর্সনা পর্য্যন্ত রহিয়াছে, আর পূর্ব্ব পূর্ব্ব প্রেমের দাস্য, সখ্য প্রেমস্তভাবও বর্ত্তমান আছে, সুতরাং বাৎস্য প্রেম অতি উত্তম, তাহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু ইহা অপেক্ষা আরও যদি কিছু সার সাধন থাকে, তবে তাহা প্রকাশ কর।

রামানন্দ। প্রভু বাৎসল্য প্রেম অপেক্ষা "কান্তাপ্রেম" সর্ব্বসাধ্য সার। ভগবানের প্রাপ্তি সম্বন্ধে নানাবিধ উপায় আছে। যিনি তাঁহাকে যে ভাবে ভজনা করেন, তিনি তাঁহাকে সেই ভাবেই কৃপা করিয়া থাকেন, কিন্তু নিরপেক্ষভাবে বিচার করিলে সাধন ভজনের তারতম্য আছে। কান্তাপ্রেমে শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, এই সমস্ত ভাবই বর্ত্তমান আছে, সুতরাং ইহার উপর আর সাধনা নাই।

প্রভু। রামানন্দ, তোমার কথা শুনিয়া আমি পরম প্রীত হইলাম। কান্তা প্রেম সর্ব্বসাধ্য, তাহাতে একটুও সন্দেহ নাই। তোমার নিকট সাধনতত্ত্ব জ্ঞাত হইয়া আমি পরম প্রীত হইলাম, কিন্তু উহা অপেক্ষাও যদি আরও কিছু উত্তম থাকে, তাহা কৃপা করিয়া আমার নিকট প্রকাশ কর।

রামানন্দ এস্থলে অতি আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। ভাবিলেন এ কি প্রকার হইল। কান্তা প্রেমেরও উচ্চে কোন সাধন তত্ত্ব আছে, তাহা জানিবার জন্য এ ভুবনে এমন কোন্ ব্যক্তি আছে? রামানন্দ একটু চিন্তার পর বলিলেন, প্রভু! কান্তা প্রেম অপেক্ষাও উত্তম প্রেম আছে, যাহাকে রাধার প্রেম বলে অর্থাৎ পরকীয় প্রেম। ইহার উপর আরও কিছু আছে কি না, জানি না। তবে তুমি আমার হৃদয়ে বসিয়া যাহা বলাইবে, তাহাই বলিব।

এইবার প্রভু পরম সন্তোষ লাভ করিলেন এবং রামানন্দকে শত শত ধন্যবাদ দিয়া বলিলেন, হাঁ! এতক্ষণে তুমি সারকথা বলিয়াছ, আমাকে মায়াবাদী সন্ন্যাসী মনে করিয়া কৃষ্ণভক্তিতত্ত্ব আমার নিকটে গোপন করিতেছিলে—তুমি শূদ্র হইলেও আমার গুরু।

"কিবা বিপ্র কিবা ন্যাসী শূদ্র কেন নয়।
যেই কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা সেই গুরু হয়"

কেহ কেহ বলেন, ঈশ্বরপুরী যিনি চৈতন্য দেবকে মন্ত্রদান করিয়াছিলেন, তিনিও শূদ্র ছিলেন; কিন্তু এ বিষয়ে মতভেদও আছে। যাঁহারা বর্ণাশ্রম ধর্ম্মকে আবার ভারতে প্রবল করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা এ সম্বন্ধে আপত্তি করিয়া থাকেন।

ইহার পর আরও কৃষ্ণতত্ত্ব, রাধাতত্ত্ব ব্যাখ্যার পর মহাপ্রভু জিজ্ঞাসা করিলেন।

বিদ্যামধ্যে কোন্ বিদ্যা শ্রেষ্ঠ?

রায়। কৃষ্ণভক্তি প্রতিপাদক বিদ্যা শ্রেষ্ঠ।

প্রভু। জীবের কোন্ কীর্ত্তি শ্রেষ্ঠ?

রায়। যাঁহার কৃষ্ণপ্রেমভক্ত বলিয়া কীর্ত্তি হয়, তিনিই শ্রেষ্ঠ।

প্রভু। কোন্ সম্পত্তি শ্রেষ্ঠ ?

রায়। রাধাকৃষ্ণ-প্রেম-সম্পত্তি শ্রেষ্ঠ।

প্রভু। কোন্ দুঃখ গুরুতর ?

রায়। কৃষ্ণভক্ত-বিরহ দুঃখই গুরুতর।

প্রভু। কোন্ জীব মুক্ত বলিয়া মানিব ?

রায়। যাঁহার কৃষ্ণপ্রেম আছে, সেই মুক্ত।

প্রভু। গীত মধ্যে কোন্ গীত শ্রেষ্ঠ ?

রায়। যে গীতে রাধাকৃষ্ণের প্রেম লীলা আছে, তাহাই শ্রেষ্ঠ।

প্রভু। জীবের শ্রেয়ঃ কি ?

রায়। কৃষ্ণভক্ত সঙ্গই শ্রেয়ঃ।

প্রভু। কোন্ বিষয় সদাই স্মরণ যোগ্য ?

রায়। কৃষ্ণনাম-গুণলীলা সদাই স্মরণ-যোগ্য।

প্রভু। কোন্ বস্তু সদাই ধ্যান করা কর্ত্তব্য ?

রায়। রাধাকৃষ্ণ-পদাম্বুজ সদাই ধ্যান করা কর্ত্তব্য।

প্রভু। যাঁহারা মুক্তি বাঞ্ছা করেন, তাঁহাদের গতি কোথায় ?

রায়। মুক্তিবাঞ্ছাকারিগণ স্থাবর দেহ পাইবে।

প্রভু। যাঁহারা ভক্তি বাঞ্ছা করে, তাঁহা দের গতি কোথায় ?

রায়। ভক্তিবাঞ্ছাকারিগণ দেবদেহ পাইবে।

রায়ানন্দ ও চৈতন্য প্রসঙ্গে অনেকটা লিখিলাম। ভরসা করি, কথা কয়েকটীতে পাঠকের বিরক্তি জন্মিবে না।

দুঃখে কষ্টে ও অনিদ্রায় রাত্রি প্রভাত হইল। গাড়ী হুহু শব্দে চলিতেছে। আকাশে আর মেঘ নাই—সূর্য্যদেব যথাসময়ে নিজ কার্য্য সম্পাদন জন্য পূর্ব্বদিকে লোহিত বর্ণে উদিত হইলেন। পূর্ব্বদিকে উদয় হইলেন, বলিলাম বটে, কিন্তু আমার দিকভ্রম হওয়াতে ঠিক মনে হইতেছে, পশ্চিমদিকে উদয় হইতেছেন, তৎপর ভ্রম গেল, বুঝিলাম, সূর্য্যদেবের ভুল হয় নাই। গাড়ীর মধ্যে শৌচ ক্রিয়াদি সমাপন করিলাম। আমার দাঁতের বেদনা ছিল, সুতরাং মুখ ধুইবার জন্য একটু গরম জলের প্রয়োজন। অনুসন্ধানে জানিলাম, গাড়ীতে চা, কফি বিক্রয় জন্য একটী দোকান আছে, ইহাকে ইংরাজীতে Indian refreshment স্থান বলে। এক ষ্টেসনে গাড়ী থামিলে তাড়াতাড়ি তথায় যাইয়া খানিক গরম জল চাহিলাম, তথাকার কর্ত্তাব্যক্তি জল দেওয়া দূরে থাকুক, বেশ দুই কথা শুনাইয়া দিল—গরমজল না হইলে দাঁতের বেদনায় লোক মুখ ধুইতে যে কত কষ্ট অনুভব করে, তাহা সে বুঝিতে না পারায়, আমিও তাহাকে মনে মনে শত অভিশাপ দিলাম। তারপর বলিলাম, ভাই! গরমজল না দেও, এক কাপ কাফি ত দিতে পার ? তুমি আমাকে কফির পরিবর্ত্তে জল দাও এবং কফির মূল্য গ্রহণ কর। ইহাতে তিনি রাজি হইলেন এবং এক আনা পয়সা লইয়া এক কাপ গরম জল দিলেন। আমি উহা লইয়া ঘটিতে আরও শীতল জল মিশ্রিত করিয়া মুখ ধুইলাম। ভরসা করি, আমার এই দুর্দ্দশা স্মরণ করিয়া কেহ যেন দাঁতের বেদনা লইয়া দেশ ভ্রমণে বাহির না হন। তারপর কিছু আহার করিলাম। এ সম্বন্ধে সন্ন্যাসী মহাশয় বিশেষ আনুকূল্য করিয়াছিলেন, তাঁহার নিকট ছিলও অনেক রকম।

বেলা প্রায় ১০॥ টার সময় মান্দ্রাজ পৌঁছিলাম। সন্ন্যাসী মহাশয়ের সঙ্গে এক গাড়ীতে রওনা হইলাম—তিনি মধ্যবর্ত্তী এক

স্থানে নামিয়া গাড়োয়ানকে আমার নির্দ্দিষ্ট স্থানে যাইতে যে যে রাস্তায় যাইতে হইবে, তাহা কতক তামিল ভাষায়, কতক হিন্দি ভাষায় এবং কতক বাঙ্গালা ভাষায় বুঝাইয়া দিলেন। গাড়োয়ান কতক বুঝিল,কতক ঘাড় নাড়িয়াছিল বটে, কিন্তু বুঝিল না। সুতরাং সে খানিকটা যাইয়াই আমাকে তামিল ভাষায় কি জিজ্ঞাসা করিল, বুঝিতে পারিলাম না—তবে আন্দাজে বুঝিলাম, রাস্তার কথা জিজ্ঞাসা করিতেছে। মহাবিপদ, গাড়োয়ান হিন্দি, ইংরেজী, বাঙ্গালা কিছুই বুঝে না। সে কি বলিতেছে,তাহা না বুঝিয়াই "সন্ন্যাসী সন্ন্যাসী" বলিয়া হাত নাড়িতে লাগিলাম; আমার মনের ভাব অর্থাৎ সন্ন্যাসী যে রাস্তা বলিয়াছে, সেই রাস্তায় চল। গাড়োয়ান কিছুই বুঝিতে না পারিয়া গাড়ী থামাইল। ষ্টেসনে ইংরেজী বা হিন্দি বলিতে পারে, এমন অনেক গাড়োয়ান ছিল, কিন্তু সন্ন্যাসীর উপর নির্ভর করিয়া আমি সে প্রকার গাড়োয়ানের চেষ্টাই করি নাই। যাহা হউক, সৌভাগ্যক্রমে একজন ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা হইল, তাঁহাকে ইংরেজীতে আমার গন্তব্য স্থানের কথা জিজ্ঞাসা করিলাম, তিনি তখন তামিল ভাষায় গাড়োয়ানকে সমস্ত বুঝাইয়া দিলেন। গাড়োয়ান হৃষ্টচিত্তে গাড়ী হাকাইল এবং অচিরে আমাকে আমার গন্তব্য স্থানে পৌঁছাইয়া দিল।

মান্দ্রাজের সহরে ময়লাপুর নামক স্থানে রামকৃষ্ণ মিশনের একটী মঠ আছে, শ্রীযুক্ত রামকৃষ্ণানন্দ স্বামীই এই মঠের প্রথম সংস্থাপক। তিনি এই স্থান হইতে মান্দ্রাজের নানা সহরে গমন করিয়া পরমহংসদেবের ধর্ম্মতত্ত্ব সকলের নিকট প্রচার করিতে আরম্ভ করেন। দরিদ্র বালকদিগের সুশিক্ষার জন্য এই স্থানে একটী বাড়ী ভাড়া করিয়া তাহাদের শিক্ষার বন্দোবস্ত করেন। একণে এই বাড়ীতে প্রায় ৩০ জন ছাত্র আহারাদি সমস্ত পাইয়া উচ্চশিক্ষা প্রাপ্ত হইতেছে। এই বাড়ীতে ব্রাহ্মণ এবং শূদ্র উভয় শ্রেণীর বালকই একসঙ্গে অবস্থিতি করিয়া বিদ্যালাভ করিতেছে। ছেলেদের সমস্ত কার্য্য তাহারা নিজেরাই সম্পাদন করে। কেবল রান্না করিবার জন্য ব্রাহ্মণ আছে। মান্দ্রাজ প্রদেশে ব্রাহ্মণ শূদ্রে যে কি প্রকার সামাজিক প্রথা প্রচলিত আছে, তাহা বোধ হয়, সকলেই জ্ঞাত আছেন, কিন্তু এই রামকৃষ্ণাশ্রমের বালকগণ এই সম্বন্ধে অনেকটা উদারতা লাভ করিয়াছে দেখিয়া বড়ই আনন্দ হইল। উক্ত গৃহের মধ্যে একটী প্রশস্ত কামরা আছে, তথায় সপ্তাহে সপ্তাহে নীতি উপদেশ দেওয়া হয় এবং সমস্ত লোক একসঙ্গে উপবেশন করিয়া উপদেশ শ্রবণ করে। আহারের সময় সকলে এক পংক্তিতে উপবেশন করে না বটে, তবে একই সময়ে পৃথক স্থানে সামান্য একটী পরদার আড়ালে ব্রাহ্মণ শূদ্র উপবেশন করিয়া আহার করে। মান্দ্রাজের মত স্থানে এতটুকু যে হইয়াছে, তাহাই পরম সৌভাগ্যের কথা বলিতে হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। যে দেশে শূদ্রের বাজারে প্রবেশ করিতে ব্রাহ্মণ ঘৃণা বোধ করেন, আহারের সময় শূদ্রের মুখ দর্শন করিলে আহার ত্যাগ করেন, সেই দেশে ব্রাহ্মণের ছেলে ও শূদ্রের ছেলে একই সময়ে আহার করে, ইহাই জাতিভেদ উচ্ছেদের পক্ষে আপাততঃ যথেষ্ট মনে করিতে পারি। এই সমস্ত ছাত্র শিক্ষালাভ করিয়া যখন সংসারে প্রবেশ করিবে, তখন ইহাদের দ্বারা প্রচুর কর্ম্মসাধন

হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। ছাত্রগণ এক্ষণে ভাড়াটিয়া বাড়ীতে বাস করেন। শীঘ্রই ইহাদের জন্য প্রকাণ্ড একটী অট্টালিকা প্রস্তুত হইবে, তাহার যোগাড় হইতেছে এবং অচিরেই হইবে, তাহারও আশা পাওয়া গিয়াছে। রামকৃষ্ণানন্দ স্বামীর দেহত্যাগের পর শ্রীযুক্ত সর্ব্বানন্দ স্বামী এই মঠের কর্ত্তৃত্ব ভার গ্রহণ করিয়াছেন। ইনি অক্লান্ত পরিশ্রমে প্রচার কার্য্য সম্পাদন করিতেছেন। ইঁহারই উদ্যোগে সম্প্রতি মঠের জন্য একটী দ্বিতল গৃহ নির্ম্মিত হইয়াছে। ছেলেদের আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য ইনি বিশেষ পরিশ্রম করিয়া থাকেন। অত্রস্থ কোন কলেজে সাপ্তাহিক একদিন অবৈতনিক ভাবে উপদেশও দিয়া থাকেন এবং বেদান্তকেশরী কাগজের সম্পাদকতা করেন। মঠে আরও কয়েকটী ব্রহ্মচারী ও সন্ন্যাসী আছেন, তাঁহারা অতি সুশৃঙ্খলার সহিত নিজ নিজ নির্দ্দিষ্ট কর্ম্ম করিয়া থাকেন। রামকৃষ্ণ মিশনের যাবদীয় পুস্তকাদি এখানে বিক্রয় হয়। প্রয়োজন হইলে সর্ব্বানন্দ স্বামী মফঃস্বলের নানাস্থানে গমন করিয়া ধর্ম্মপ্রচার করিয়া থাকেন।

আমি এই মঠে উপস্থিত হইয়া আহারাদির পর সহর দেখিতে বাহির হইলাম। সহরের রাস্তাগুলি বেশ, কিন্তু ফুটপাথ নাই, এজন্য রাস্তায় একটু ভীড় হয়, তবে সৌভাগ্যের বিষয়, কলিকাতার মত অসংখ্য গাড়ীর চলাচল নাই। ট্রামগাড়ী আছে। ট্রামে সময়ে সময়ে এত ভীড় হয় যে, তাহাতে স্থান পাওয়া যায় না। ট্রামের ভাড়া মাইল হিসাবে লইয়া থাকে। কলিকাতায় যেমন ১০ হাত চলিলেই নির্দ্দিষ্ট পাঁচ পয়সা দিতে হয়, এখানে তাহা নাই, প্রতি মাইলে এক পয়সা হিসাবে লইয়া থাকে। কলিকাতার ট্রামগুলি নির্দ্দিষ্ট ষ্টেসনে এত অল্প সময় অবস্থিতি করে যে, যাত্রীগণ স্বচ্ছন্দ ভাবে উঠিতে পারে না, পরন্তু অনেকে সময়ে জীবন পর্য্যন্ত হারায়, কিন্তু মান্দ্রাজে এ প্রকার নহে। উঠিতে ও নামিতে বেশ সময় পাওয়া যায়। এখানকার ট্রাম গাড়ীতে অনেক স্ত্রীলোক যাতায়াত করে, কারণ কলিকাতার মত এ দেশে স্ত্রীলোকদিগের অবরোধ প্রথা নাই।

আমি ময়লাপুর হইতে সাত পয়সা দিয়া মায়াপুরের টিকিট লইলাম। এই স্থানেই মান্দ্রাজের প্রসিদ্ধ Harbour (বন্দর) অবস্থিত। যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পর হইতে আর এই বন্দরের ভিতর প্রবেশাধিকার নাই। সুতরাং সমুদ্রতীরে দণ্ডায়মান হইয়া চক্ষের দৃষ্টি যতদূর যায়, তাহাই দেখিলাম। এই স্থানে সমুদ্রকে যে ভাবে বাঁধিয়া বন্দর প্রস্তুত করিয়াছে, তাহা দেখিলে ইংরেজের বুদ্ধি ও অধ্যবসায়কে শত প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না। দুই ধারে পাথর দিয়া বেড়া দেওয়ার মত বাঁধ আছে এবং তন্মধ্যে জাহাজগুলি প্রবেশের জন্য বহুদূরে একটী নালা আছে। রাত্রেতে ইহার উপর আলো দেওয়া হয়। সমুদ্রের তরঙ্গগুলি এই প্রাচীরের উপর আসিয়া আঘাত করিতেছে এবং তাহাতে ধাক্কা খাইয়া ফিরিয়া যাইতেছে, আর যেন বলিতেছে "মানুষ, তোমার নিকট আমি পরাজিত হইলাম। সত্যযুগে রামচন্দ্র আমাকে একবার বাঁধিয়া তাঁহার স্বকার্য্য উদ্ধার করিয়াছিলেন, আর বহুকাল পরে কলিযুগে আমাকে বাঁধিয়া তোমরা স্বকার্য্য উদ্ধার করিতেছ"।

এই স্থানেই Emden নামক জারম্যান জাহাজ বোমা নিক্ষেপ করিয়া একটী তেলের গুদাম নষ্ট করিয়াছিল। এ সম্বন্ধে নানা-

প্রকার কথা শুনিতে পাওয়া যায়, তাহা এ স্থানে বিস্তারিত ভাবে লেখা যুক্তিসঙ্গত মনে করি না।

সন্ধ্যা পর্য্যন্ত সমুদ্রের এই মনোরম দৃশ্য উপভোগ করিয়া পুনরায় ট্রামযোগে মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম এবং পথিমধ্যে হাই-কোর্ট, George-town, বাজার, রেল ষ্টেসন প্রভৃতি স্থানগুলি দর্শন করিলাম। চকের বাজারে আসিলে ট্রাম লোকে পরিপূর্ণ হইয়া গেল। স্থানাভাবে অনেকে, বাদুড় যেমন বৃক্ষের ডালে ঝুলিতে থাকে, সেই প্রকার ট্রামের ফুটবোর্ডের উপর ঝুলিতে লাগিল।

রাত্রে আহারাদির পর আশ্রমের লোকের নিকট শুনিলাম, মান্দ্রাজের Aquarium অতি সুন্দর এবং দর্শনযোগ্য। সুতরাং পরদিন বৈকালে উহা দর্শন করিবার জন্য এক জন ব্রহ্মচারীকে সঙ্গে লইয়া গমন করিলাম। মঠ হইতে Aquarium প্রায় ৩ মাইল দূরে। Beach Road রাস্তাটী অতি সুন্দর, উহারই একপার্শ্বে সমুদ্রতীরে Aquarium গৃহটী অবস্থিত। গৃহের মধ্যে বড় বড় কাচের বাক্সে সমুদ্রের নানাবিধ মৎস্য জীবিতাবস্থায় রক্ষিত হইয়াছে। বাক্সগুলির মধ্যে সমুদ্রের জল এবং তাহার মধ্যে সদাসর্ব্বদা Oxygen Gas প্রবাহিত হইতেছে। মৎস্যগুলি দেখিতে অতি সুন্দর। কতকগুলি হরিদ্রাবর্ণ, কতকগুলি লালবর্ণ, কতকগুলি সবুজ, আবার কতকগুলি লাল ও হরিদ্রাবর্ণ মিশ্রিত, যেন কেহ স্বহস্তে তুলিকা-দ্বারা চিত্রিত করিয়া রাখিয়াছে। তাহারা কাচের বাক্সের মধ্যে স্বচ্ছন্দভাবে উর্দ্ধে ও নিম্নে গমনাগমন করিয়া ক্রীড়া করিতেছে। এই গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিতে হইলে নগদ দুই পয়সা দিতে হয়। কিন্তু উহা দর্শন করিয়া যে প্রকার আনন্দ অনুভব করা যায়, তাহার মূল্য নাই। জলচর সমুদ্রগর্ভস্থিত মৎস্যগুলি মৃত্তিকার উপর বাক্সের মধ্যে অবস্থিতি করিয়া ক্রীড়া করিতেছে, ইহা দেখিলে কাহার না আনন্দ হয়। একটী বাক্সের মধ্যে ২টা সর্প দেখিলাম—শুনিলাম, তাহার বিষ নাকি আমাদের Cobra-বিষ অপেক্ষাও তেজস্কর। ইহাদের লেজ চেপ্টা, আমাদের সর্পের লেজের মত সরু নহে। মৎস্যগুলির আকৃতিই বা কত প্রকারের। কেহ আমাদের চাঁদা মাছের মত, কেহ লেটা মাছের মত, কেহ কৈ মাছের মত, কেহ কেহ কুম্ভীরের মত। বাক্সের মধ্যে কৃত্রিম পাহাড় প্রস্তুত করিয়া তাহাদের বাসস্থান নির্ম্মিত হইয়াছে, সময়ে সময়ে তাহারা সেই বাসস্থানের মধ্যে প্রবেশ করিয়া উঁকি মারিতে থাকে। প্রত্যেক বাক্সের উপরে মৎস্যগুলির নাম লেখা আছে, প্রত্যেক বর্ণের মৎস্যের একটী চিত্র আছে এবং তন্নিম্নে তাহার নাম লেখা আছে। চিত্রের সহিত মিলাইয়া জীবিত মৎস্যের নাম জানিতে পারা যায়, নামগুলি সমস্তই ইংরাজী বা Latin। অনেকগুলি বড় বড় কচ্ছপও দেখিলাম, তাহাদের বর্ণনা অনাবশ্যক।

Aquarium দেখিয়া Beach Road দিয়া মঠে ফিরিলাম। মান্দ্রাজ সহরের মধ্যে যত রাস্তা আছে, তন্মধ্যে এই Beach Roadই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। ইহার দুইধারে নানাবিধ ফুলের বাগান এবং স্থানে স্থানে উপবেশন করিবার জন্য বেঞ্চ আছে। রাস্তা এতই পরিষ্কার যে কোন স্থানে একটু ময়লা দেখিতে পাওয়া যায় না! রাত্রে Electric Light দ্বারা আলোকিত হয়

সন্ধ্যার পূর্ব্বে অসংখ্য স্ত্রীলোক ও পুরুষ এই রাস্তার ধারে উপবেশন করিয়া সমুদ্রের পবিত্র বায়ু সেবন করিতেছে। এখানকার স্ত্রীলোকগণ অবরোধ প্রথার পাপে লিপ্ত নহেন, সুতরাং তাঁহারা স্বচ্ছন্দ চিত্তে গমনাগমন করিতেছেন। তাঁহারা বঙ্গদেশের নারীগণের ন্যায় ঘোমটারূপী আবরণেও আচ্ছাদিতা নহেন, সুতরাং স্বচ্ছন্দ গমনাগমনে পায়ে ঠোক্কর লাগিয়া মৃত্তিকায় পতিত হইবারও কোন সম্ভাবনা রাখেন না। স্ত্রীলোকদিগের পরিধানগুলিই বা কেমন সুন্দর। বঙ্গদেশের স্ত্রীলোকদিগের লজ্জাস্কর পরিধানের এই দেশের পরিধানের সহিত তুলনাই হইতে পারে না!

Aquarium দেখিয়া পরদিন পার্থসারথি দেখিতে গিয়াছিলাম। এই প্রকার নামের কোন বিগ্রহ ভারতবর্ষে আর কোন স্থানে আছে কি না, জানি না। কুরুপাণ্ডব যুদ্ধে শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনের সারথ্য করিয়াছিলেন, সেই জন্য তাঁহাকে পার্থসারথি বলে। এই বিগ্রহ মান্দ্রাজ সহরের মধ্যে প্রধান এবং ভারতের লোকের বর্ত্তমান জড়ভাব পর্য্যালোচনা করিলে এই বিগ্রহের পূজাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এবং সময়োপযোগী বলিয়া মনে হয়। বিগ্রহের বক্ষস্থলে লক্ষ্মী বিরাজিতা এবং কটীদেশে তরবারি। মূর্ত্তিটী প্রস্তরে খোদিত এবং অচল। অন্য একটী সচল বিগ্রহ আছে, রথোপলক্ষে তাঁহাকেই তদুপরি উত্তোলন করা হইয়া থাকে। মূর্ত্তিটী যেন জলদগম্ভীর স্বরে ভক্তগণকে বলিতেছেন "যদি বক্ষস্থলে লক্ষ্মীকে রক্ষা করিতে বাসনা হয়, তবে তরবারি ধর এবং যুদ্ধকার্য্য শিক্ষা কর। জড় ও অলসভাব ত্যাগ কর। যেখানে ধর্ম্ম, সেইখানেই জয়"। এই মূর্ত্তিটী দর্শন করিয়া আমার বড়ই আনন্দ হইয়াছিল এবং অর্জ্জুনের সারথির প্রতিমূর্ত্তি সম্মুখে দেখিয়া তাঁহার গীতার সমস্ত কথা স্মরণ হইতেছিল। ক্ষত্রিয় বীর অর্জ্জুন, যুদ্ধই যাঁহার স্বধর্ম্ম, তিনি মায়ায় অভিভূত হইয়া যুদ্ধ করিতে অসম্মত। ভগবান তাঁহাকে নিজ কর্ত্তব্য সাধন জন্য যাহা যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা এখানে উদ্ধৃত করিতে বাসনা হইতেছে। ভারতের ক্ষত্রিয়বর্গ কি তাঁহার উপদেশ অবহেলা করিবে? বঙ্গের বিশাল কায়স্থ জাতি আজ ক্ষত্রিয় নামে অভিহিত হইতে বাসনা করিতেছেন। শুধু কি নাম লইতেই বাসনা? ক্ষত্রিয়ের স্বধর্ম্ম পালনে বাসনা হয় না কেন? ভগবানের কথাগুলি একবার স্মরণ কর।

"শৌর্য্যং তেজোধৃতির্দাক্ষ্যং যুদ্ধেচাপপলায়নম্ দানমীশ্বরভাবশ্চ ক্ষাত্রং কর্ম্ম স্বভাবজম্"। ক্ষত্রিয়ের সে তেজ কৈ, সে ধৃতি কৈ, সে দক্ষতা কৈ? বাঙ্গালার কায়স্থবর্গ যাঁহারা আজ ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচয় দিয়া স্বনামধন্য রাজা প্রতাপ সিংহ, পৃথ্বীরাজ প্রভৃতি ক্ষত্রিয়ের বংশ বলিয়া পরিচয় দিতে বাসনা করিতেছেন, তাঁহাদের এ প্রকার দুর্গতি দেখিলে মনে কষ্ট হয় না কি? শুধু একগাছি উপবীত গ্রহণে ক্ষত্রিয়ত্ব লাভ হয় না। ক্ষত্রিয়ের গুণগুলিও গ্রহণ কর। আজ শুভদিন আসিয়াছে, এখন আর মসীজীবী হইলে চলিবে না, এখন তরবারি গ্রহণ কর, এখন অসিজীবী হও এবং সদা সর্ব্বদা কণ্ঠে গাহিতে থাক—

"অন্তবন্ত ইমেদেহা নিত্যস্যোক্তাঃ শরীরিণঃ।
অনাশিনোঽপ্রমেয়স্য তস্মাদ যুদ্ধ্যস্ব ভারত॥
অকীর্ত্তিঞ্চাপি ভূতানি কথয়িষ্যন্তি তেঽব্যয়াম্।
সম্ভাবিতস্য চাকীর্ত্তির্মরণাদতিরিচ্যতে॥

ভয়াদ্রণদুপরতঃ মংস্যন্তে ত্বাং মহারথাঃ।
যেষাঞ্চ ত্বং বহুমতো ভূত্বা যাস্যসি লাঘবম্॥
নিন্দন্তস্তব সামর্থ্যং ততো দুঃখতরং নু কিম্॥
অবাচ্যবাদাংশ্চ বহূন বদিষ্যন্তি তবাহিতাঃ।
হতো বা প্রাপ্স্যসি স্বর্গং জিত্বা বা ভোক্ষ্যসে মহীম।
তস্মাদুত্তিষ্ঠ কৌন্তেয় যুদ্ধায় কৃতনিশ্চয়ঃ॥

এখন শুভ সময় আসিয়াছে, ইংরেজ আমাদিগকে যুদ্ধকার্য্য শিক্ষা দিবার জন্য দুই হাতে ডাকিতেছেন। এই শুভ সুযোগ আমরা কি অবহেলায় ত্যাগ করিব? তাই আজ পার্থসারথির সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া প্রার্থনা করিতেছি "হে ঠাকুর, তোমার অমৃতময় উপদেশ শ্রবণ করিয়া অর্জ্জুনের মোহ বিদূরিত হইয়াছিল। এক্ষণে তুমি দয়া করিয়া আমাদের মোহ দূর কর। আমরা আমাদের পূর্ব্বগৌরব স্মরণ করিয়া যেন নিজ নিজ কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পাদন করিতে পারি। জগতে যাহারা শ্রেষ্ঠ জাতি বলিয়া গৌরব করে, তাহারা আমাদের সামর্থ্যকে নিন্দা করিয়া নানা প্রকার অবাচ্য কথা বলিয়া থাকেন। তোমার দয়া হইলে আমরা আমাদের নষ্ট গৌরব উদ্ধারে সমর্থ হইব"।

এই দেশের বিগ্রহগুলির নিকট ভোগ ও পূজা দেওয়া বিশেষ ব্যয়সাধ্য নহে। একটী নারিকেল, খানিকটা কর্পূর, কিছু ফুল এবং একটু ধুনা হইলেই হইল। আর পূজারি ব্রাহ্মণকে দুইটী পয়সা দক্ষিণা। তিনি নারিকেলটী ভাঙ্গিয়া ঠাকুরের নিকট রাখেন এবং কর্পূর জ্বালাইয়া আরতি করিয়া নারিকেলটী ভক্তকে ফিরাইয়া দেন! ইহাই হইল ঠাকুরের প্রসাদ।

এই স্থানের বিগ্রহগুলির আর একটী প্রথা আছে, তাহা দেখিতে মন্দ নহে। মধ্যে মধ্যে বিগ্রহের সচল মূর্ত্তিটীকে সহরের মধ্যে হাওয়া খাওয়ান হয়। মূর্ত্তিটী মন্দির হইতে বাহির করিবার পূর্ব্বে একজন লোক অগ্রবারা যে যে রাস্তায় ঠাকুরের গমন হইবে, সেই রাস্তাগুলিকে শোধন করে, তৎপরে নানাবিধ বাদ্যভাণ্ডের সহিত ঠাকুরকে সুসজ্জিত দোলায় তুলিয়া ভ্রমণ করান হয়। এই কার্য্যটী সচরাচর রাত্রেই সম্পাদিত হইয়া থাকে।

মান্দ্রাজ প্রদেশের পুরুষ প্রায়ই বাঙ্গালীর মত কাছা দিয়া কাপড় পরিধান করে না। ছয় হাত লম্বা কাপড়েই চলে। তদুপরি কোট, নেকটাই, চাদর এবং মস্তকে উষ্ণীষ বা টুপি। অনেকে সাহেবদের মত পোষাক পরিধান করে বটে, কিন্তু হ্যাট ব্যবহার করে না। এদেশের লোকে প্রায়ই বেশ একটু ইংরাজী বলিতে পারে, তাহা কলিকাতার চাঁদনীর ইংরাজী অপেক্ষা অনেক ভাল। সামাজিক আচার ব্যবহারে ইঁহারা স্বধর্ম্ম পালন করিয়া থাকেন। বক্তৃতায় এক প্রকার এবং কার্য্যকালে আর এক প্রকার ব্যবহার ইহাদের মধ্যে প্রায়ই দেখা যায় না। ব্রাহ্মণ ব্যতীত অন্যান্য জাতি মৎস্য মাংস আহার করে না এবং গৃহে কুক্কুট পোষণ করিয়া তাহার মাংসও আহার করিয়া থাকে।

এদেশের সকল প্রকার সামাজিক প্রথা আমি জ্ঞাত হইতে পারি নাই। ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্যান্য জাতির মধ্যে বালিকা বিবাহ-প্রথা আদৌ দেখা যায় না। ব্রাহ্মণের অল্পবয়স্কা কন্যার বিবাহ হইলেও যৌবন প্রাপ্তা না হওয়া পর্য্যন্ত স্বামীর গৃহে গমন করিতে পারে না। ঘটনাক্রমে ব্রাহ্মণের মেয়ের বালিকা বয়সে যদি বিবাহ না হইয়া

যৌবনকাল প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলেও বঙ্গদেশের মত জাতিচ্যুতির কারণ হয় না এবং এই ব্যাপার লইয়া পাড়ায় পাড়ায় কমিটীও বসে না। নিজের মাতুলের সঙ্গে বিবাহ এদেশে নিন্দনীয় নহে, বরং অনেক স্থানে ইহা সুসঙ্গত বলিয়া বিবেচিত হয়। নিজের ভগিনী এই প্রকারে শাশুড়ী হইয়া পড়েন। যে দেশের যে প্রকার আচার ব্যবহার বহুকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে, তাহা অবশ্য পালনীয় মনে করিয়া ইহাঁরা উহাতে দোষ দেখিতে পান না। ভাদ্রবধূ ভাসুরকে দেখিয়া দুই হাত ঘোমটা টানিয়া পলায়ন করে না। এদেশে ঘোমটার ব্যবহারই নাই—কেবল বঙ্গদেশেই উহার অস্তিত্ব দেখা যায়। ভাদ্রবধূর Hysteric ফিট হইয়াছে, ভাসুর তাঁহাকে শুশ্রূষা করিতেছেন এবং চক্ষে মুখে জল ছিটাইতেছেন, ইহা স্বচক্ষে দেখিয়াছি। আহারের সময় শ্বশুর শাশুড়ী, স্বামী, ভাসুর প্রভৃতি সকলে একত্রে উপবেশন করিয়া আহার করিতেও কোন প্রকার দ্বিধা বোধ করিতে দেখা যায় না। নব বিবাহিতা স্ত্রীকে শ্বশুর বাড়ী গমন করিয়া নিতান্ত সঙ্কুচিত ভাবে পিঞ্জরাবদ্ধ পক্ষীর ন্যায় বাস করিতে হয় না। স্থানে স্থানে ইহাও স্বচক্ষে দেখিয়াছি, স্বামী স্নান করিতে বসিয়াছেন এবং স্ত্রী সকলের সাক্ষাতে তাঁহার গাত্র মার্জ্জন করিয়া দিতেছেন। এ সমস্ত প্রথা বাঙ্গালা দেশের মেয়েরা একবার চক্ষে না দেখিলে বিশ্বাসই করিতে পারিবেন না। গৃহস্থালির সমস্ত কার্য্যই মেয়েরা সম্পাদন করিয়া থাকে। চাকর ব্রাহ্মণ অতি অল্প লোকেরই আছে। প্রাতে উঠিয়া প্রত্যেক গৃহস্থের মেয়েরা বাড়ীর দরজায় গোবর-জল ছিটাইয়া আলপনা দিয়া থাকে। এই আলপনাগুলি দেখিতে অতি সুন্দর।

মান্দ্রাজে অনেক নারিকেল বৃক্ষ দেখিলাম। কিন্তু ইহার অধিকাংশ হইতে তাড়ি প্রস্তুত হইয়া থাকে! (ক্রমশঃ)

শ্রীরতিকান্ত মজুমদার—কাশী।

একখানি পত্র

ভারতবর্ষ-সম্পাদক শ্রীযুক্ত জলধর সেন মহাশয়

সম্মানাস্পদেষু—

সবিনয় নিবেদন:—

ভাদ্র সংখ্যার "ভারতবর্ষে" আমার রচিত "পৃথ্বীরাজ" মহাকাব্যের সমালোচনা পাঠ করিলাম। এই সমালোচনার জন্য আমার ধন্যবাদ অবগত হইবেন। আপনার অভিমত সম্বন্ধে আমার কোনও বক্তব্য নাই; কিন্তু গ্রন্থের উপপাদ্য বিষয় সম্বন্ধে আপনি যে ঐতিহাসিক তত্ত্ব প্রকাশিত করিয়াছেন, তৎসম্বন্ধে আমার কিছু বক্তব্য আছে। আপনার পত্রে যাহা প্রকাশিত করিলে বাধিত হইব।*

আমি আমার কাব্যের ভূমিকায় লিখিয়াছি, "পৃথ্বীরাজ স্বয়ং বীর ও নির্ম্মলচরিত্র হইলেও যে সমাজে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন,

---

* সবিনয় নিবেদন,—

'পৃথ্বীরাজের' ঐতিহাসিকতা লইয়া আলোচনা আমরা করি নাই, কাব্য হিসাবেই বলিয়াছি। প্রাসঙ্গিক যাহা বলা হইয়াছে, তাহা লইয়া আলোচনা করিতে এক্ষেত্রে আমরা অগ্রসর হইতে পারিলাম না। নিবেদন ইতি—

ভবদীয়
শ্রীজলধর সেন।

তাহারই পাপের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ বলি অর্পিত হইয়াছিলেন"। আপনি এই মতের উল্লেখ করিয়া লিখিয়াছেন যে, "বাস্তবিক পৃথ্বীরাজকে অন্যের কৃতাপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইয়াছিল বা তাঁহার নিজের চরিত্রগত কোন দোষের জন্য তাঁহার অধঃপতন ঘটিয়াছিল, সে কথা এ স্থলে বিচার্য্য নহে"।

কিন্তু ইহার পরই আপনি কর্ণেল টড্ প্রণীত রাজস্থানের ইতিহাস হইতে দুইটী অংশ উদ্ধৃত করিয়াছেন। তাহা হইতে পৃথ্বীরাজের অধঃপতন যে তাঁহারই ব্যবহারের বা অনুষ্ঠিত কার্য্যের ফল, পাঠকের মনে এরূপ সংস্কার হওয়া অসম্ভব নয়, এইজন্য এই উদ্ধৃত অংশ দুইটীর ঐতিহাসিক মূল্য নির্দ্ধারণ আবশ্যক। রাজস্থান হইতে আপনার উদ্ধৃত অংশ দুইটী এই :—

(১) The prince of Chitore (Samarsi) was again constrained to use his buckler in defence of Delhi and its prince whose arrogance and successful ambition, followed by disgraceful inactivity invited invasion with every presage of success.

(২) Samarsi reads his brother-in-law an indignant lecture on his unprincely inactivity.

ইহাতে পৃথ্বীরাজের দুইটী দোষের উল্লেখ আছে। প্রথম arrogance অর্থাৎ ঔদ্ধত্য, দ্বিতীয় inactivity অর্থাৎ নিরুদ্যোগিতা বা ঔদাস্য। পৃথ্বীরাজ কিরূপস্থলে বা কাহার সহিত ব্যবহারে ঔদ্ধত্য (arrogance) দেখাইয়াছিলেন, টড্ এখানে তাহার উল্লেখ করেন নাই। কিন্তু পৃথ্বীরাজের কথা প্রসঙ্গে অন্যত্র ঠিক এই arrogance শব্দটী ব্যবহার করিয়াছেন। সে স্থলে এই :—

"Six invasions by Shahabuddin occurred ere he succeeded. He had been often defeated and twice taken prisoner by the Hindu sovereign of Delhi who with a lofty and blind arrogance of the Rajput character set him at liberty (Transactions of the Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland Vol I Pages 147-8 quoted at page 155 of Ajmer Historical and Descriptive by Har Bilas Sarda B. A.).

ইহার ভাবার্থ এই যে 'সাহাবুদ্দিন ঘোরী ছয়বার নিষ্ফল আক্রমণের পর কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন। তিনি পুনঃ পুনঃ যুদ্ধে পরাজিত এবং দুইবার বন্দী হইয়াছিলেন কিন্তু রাজপুতদিগের প্রকৃতিগত lofty and blind arrogance বশতঃ দিল্লীশ্বর (পৃথ্বীরাজ) তাঁহাকে মুক্তি দিয়াছিলেন"।

ভীত, পলায়িত এবং আহত শত্রুকে অভয়দান ভারতীয় বীরপুরুষদিগের চিরাভ্যস্ত। সুতরাং পৃথ্বীরাজ যদি সাহাবুদ্দীন ঘোরীকে মুক্তি দিয়া থাকেন, তবে তাহা তাঁহার arrogance বা ঔদ্ধত্যের ফল না (chivalrous spiritএর) বীরোচীত উদারতার ফল? ইহার পরিণাম যাহাই হউক না কেন, ইহাকে উদারতা, না ঔদ্ধত্য বলিব?

পৃথ্বীরাজের দ্বিতীয় দোষ inactivity বা ঔদাস্য। যিনি সাহাবুদ্দীন ঘোরীর ন্যায় মহাবীরকে (সমকালবর্ত্তী মুসলমান ঐতিহাসিক যাঁহাকে Haider of the time সিংহবিক্রান্ত and second Rustom বলিয়াছেন) ছয়বার পরাজিত করিয়াছিলেন, তাঁহার অন্তিম পরাজয় তাঁহার inactivity বা ঔদাস্যের ফল, না পুনঃ পুনঃ আক্রমণজনিত বলক্ষয়ের ফল?

প্রামাণিক ইতিহাস লেখকগণ পৃথ্বী-রাজের এই পরাজয়ের কারণ যাহা নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইতেছে :—

আকবর-নামায় আবুলফজল লিখিয়াছেন, "Prithwiraj hurriedly collected together only a small number of troops and with these he marched out to attack the Sultan. But the heroes of Hindustan had all perished in the manner described above, besides Jaichand, who had been his ally, was now in league with his enemy". Another of his vassals the Haoli Rao Hamir, turned traitor and joined the Sultan. Prithwiraj was defeated and taken prisoner and was killed" (Ajmer Historical and Descriptive pp 155 6).

ঐতিহাসিক Mr. W. M. Hunter এই মতের সমর্থন করিয়া এইরূপ লিখিয়াছেন ;

"These Rajput states formed the natural breakwaters against invaders from the northwest. But their feuds are said to left the King of Delhi and Ajmeer, then under one caowham overlord, only sixty four out of his one hundred and eight warrior chiefs" (Indian Empire p. 209)

স্বয়ং কর্ণেল টড্‌ও এ সম্বন্ধে এইরূপ এইরূপ লিখিয়াছেন ; Jealousy and revenge rendered the princes of Putnu, Kanauj, Dhur and the other minor courts in different spectations of a contest destined to overthrow them all. (Rajstan vol I p. 276)

ইহার পরও কি বলা সঙ্গত হইবে যে, পৃথ্বীরাজের পতন অংশতঃ ও তাঁহার arrogance এবং inactivity র ফল ? প্রকৃত কথা এই যে, ধর্ম্মপ্রচার ও লুণ্ঠনপ্রয়াসী মুসলমান স্বতঃই ভারতবর্ষ আক্রমণ করিয়াছিলেন, কাহারও arroganceএর জন্য করেন নাই। পৃথ্বীরাজ স্বজাতীয়গণের সাহায্যপ্রাপ্ত না হইয়াই পরাজিত হইয়াছিলেন, নিজের inactivityর জন্য পরাজিত হন নাই।

এখানে বলা আবশ্যক যে পৃথ্বীরাজ কর্ত্তৃক ছয়বার সাহাবুদ্দিনকে পরাজয় কোন মুসলমান ইতিহাসে দেখিতে পাওয়া যায় না। পৃথ্বীরাজ-রাসোতে ইহার উল্লেখ আছে। কিন্তু এই ছয়বার পরাজয় এরূপ ভাবে এবং এরূপ অবস্থায় ঘটিয়াছিল বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে যে, তাহা বিশ্বাসযোগ্য মনে হয় না। এইজন্য আমার কাব্যে আমি তাহা উল্লেখ করি নাই। যাহা হিন্দু মুসলমান উভয়েরই স্বীকৃত, তাহাই উল্লেখ করিয়াছি। কিজন্য টড্‌ পৃথ্বীরাজ সম্বন্ধে arrogance ও inactivity, এই দুইটী দোষ আরোপ করিতে প্রণোদিত হইয়াছিলেন, পৃথ্বীরাজরাসো পাঠকের পক্ষে তাহা নির্দ্ধারণ করা কঠিন নয়। কিন্তু সে অবান্তর প্রসঙ্গ এস্থলে নিষ্প্রয়োজন।

উপসংহারে নিবেদন এই যে, কাহারও অধঃপতন যদি তাঁহার arrogance, inactivityর জন্য হয়, তবে স্বভাবতঃ তাঁহার প্রতি সহানুভূতির ও শ্রদ্ধার হ্রাস হয়। স্বদেশ ও ধর্ম্মরক্ষার জন্য প্রাণদান করিয়া পৃথ্বীরাজ হিন্দুমাত্রেরই নমস্য হইয়াছেন। প্রকৃত ইতিহাসের দিকে লক্ষ্য না করিয়া যদি তাঁহার প্রতি সহানুভূতির ও শ্রদ্ধার হ্রাস হইতে পারে, এরূপ মত প্রচারিত হয়, তবে তাহা দোষাবহ হইবে। এই জন্যই আমার যাহা বক্তব্য, তাহা আপনাকে জানাইলাম ইতি। বশংবদ

শ্রীযোগীন্দ্রনাথ বসু—পৃথ্বীরাজ প্রণেতা।

বাঙ্গালার নূতন ব্যবস্থাপক সভা গঠন

বাঙ্গালাদেশে ৪ কোটি ৪০ লক্ষ লোকের বাস। ইহার মধ্যে ৪ কোটি ১০ লক্ষ লোক পল্লী গ্রামে, অবশিষ্ট ৩০ লক্ষ সহরে বাস করে। ইহাদের শতকরা ৭০জন চাষী ও গোয়ালা, ১২ জন তাঁতি, ছুতার, কামার, কুমার ও কাঁশারি, ৫জন মুদী, ২ জন গৃহ-পরিচারক বা চাকর, ১॥ জন বিদ্যাসাধ্য বৃত্তিধারী, এবং ১॥ জন গবর্ণমেণ্টের বৃত্তি-ভোগী. যদি নির্ব্বাচন-প্রথা দ্বারা ব্যবস্থাপক সভা গঠিত করিতে হয়, তাহা হইলে চাষী, মুদী, গোয়ালা, তাঁতি এবং কামারকে বাদ দিলে চলিবে না। অথবা ইহাদিগকে কোন নির্ব্বাচন প্রণালীভুক্ত করা সহজ নয়। বিশেষতঃ ইহারা নির্ব্বাচন প্রথা ভাল করিয়া বোঝে না; গ্রাম্য পঞ্চায়েত এবং গ্রাম্য সমিতি (union) যে সকল জিলায় সংস্থাপিত হইয়াছে, তথায় পল্লীবাসীদের নির্ব্বাচন প্রথা-জ্ঞান কতকটা জন্মিয়াছে। সম্প্রতি Village Self government Bill বা গ্রাম্য স্বায়ত্তশাসন পাণ্ডুলিপি বাঙ্গালাদেশের ব্যবস্থাপক সভায় পেশ হইয়াছে। তাহা পাশ হইয়া তদনুসারে village committee বা গ্রাম্য সমবায় এবং সার্কেল বোর্ডের কার্য্য চলিলে এই সকল গ্রাম্য সমবায়ের সভ্য-দিগকে ব্যবস্থাপক সভার সভ্য নির্ব্বাচন ভার দেওয়া যাইতে পারে।

পল্লীবাসী দশলক্ষ লোকে ২ লক্ষ পরি-বার হইবে। এই দুইলক্ষের মধ্যে সম্ভবতঃ ১ লক্ষ করদাতা হইবে এবং এই ১ লক্ষ করদাতা লইয়া ২০০ গ্রাম্য সমবায় গঠিত হইতে পারে। এই সকল সমবায়ে ১০জন করিয়া সভ্য থাকা সম্ভব। তাহা হইলে ২০০ সভাপতি এবং ২০০০ সভ্য পাওয়া যাইবে। যাহারা সভ্য হইবে, তাহাদের প্রত্যেককে সম্ভবতঃ ৫০০ পল্লীবাসী করদাতা মনোনীত করিবেন, সুতরাং গ্রামবাসী লোকের মধ্যে যাহারা শ্রেষ্ঠ এবং সকলের শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসের পাত্র, তাহারাই মনোনীত হইবে। গ্রাম্যভাষায় যাহাদিগকে "মণ্ডল" বা মোড়ল বলা হয়, তাহারাই এই সকল গ্রাম্য সমবায়ের সভ্য হইবে। এই সকল মোড়লেরা তাহাদের নিজের ভালমন্দ বেশ বুঝিতে পারে, এবং তাহাদের স্বার্থ, থানার বা উপবিভাগের তাহাদের পরিচিত লোকের মধ্যে কে ব্যবস্থাপক সভায় রক্ষা করিতে পারিবে, তাহাও তাহারা বাহির করিতে পারিবে। বিদেশী ইংরেজেরা যাহাই বলুন না, গ্রামের মোড়লেরা এখনও লোপ পায় নাই। জমিদারেরা পুণ্যাহ দিনে তাহা দিগকে ডাকিয়া পরিধেয় ও শিরোপা প্রদান করেন, এবং তাহারা খাজানা দিলে অন্যান্য প্রজারা খাজানা দিতে পারে। যে লোক গ্রাম্য সমবায়ের (village committee) সভ্য হইবে, তাহারা এই মোড়ল শ্রেণীর লোক।

দশলক্ষ লোকের বা ২ লক্ষ পরিবারের মধ্যে গ্রাম্য স্বায়ত্তশাসন আইন অনুসারে ২০০ গ্রাম্য সমবায় এবং ২০০ মোড়ল বা সভ্য স্থির করিয়া তাহাদিগকে ব্যবস্থাপক সভার দুইজন সভ্য নির্ব্বাচন করিতে ক্ষমতা দিলে দেশের সকল সম্প্রদায়ের লোককেই নির্ব্বাচন ক্ষমতা দেওয়া হইবে। চাষী কৈবর্ত্ত, নমঃশূদ্র, রাজবংশী, পোদ, বাগদী কেহই বাদ পড়িবে না।

বাঙ্গালা দেশে ৪ কোটি ১০ দশ লক্ষ লোক পল্লীবাসী। ইহারা ৮২ জন সভ্য মনোনীত করিবেন। গ্রাম্য সমবায়ের সভ্য বা মোড়লেরা গ্রাম্য চৌকীদার এবং সব-ডিপুটি সার্কেল অফিসর বাবুর পরিচিত; সুতরাং প্রতারণা করিয়া তাহাদের নামে নির্ব্বাচন সময়ে কাহারও পরিচয় দেওয়া কঠিন হইবে।

বাঙ্গালাদেশে ৩০ লক্ষ লোক সহরে বাস করে। এই সকল সহরের করদাতাদিগকে যদি ব্যবস্থাপক সভার ১৫জন সভ্যকে মনোনীত করিতে দেওয়া হয়, তাহা হইলেই যথেষ্ট। গ্রাম্যবাসী ৫ লক্ষ লোকে ১জন সভ্য এবং সহরবাসী ২ লক্ষ লোক একজন সভ্য মনোনীত করিলে অন্যায় হইবে না। কারণ গ্রামবাসী অপেক্ষা সহরবাসীরা বিদ্যাবুদ্ধি ও অর্থে শ্রেষ্ঠ। এই ১৫জনের মধ্যে কলিকাতার করদাতারাই সম্ভবতঃ ১০জন সভ্য মনোনয়নের ক্ষমতা পাইবেন। কলিকাতা ও হাওড়াবাসী ইংরেজ সওদাগর এবং দোকানীদিগকে ১০ জন সভ্য এবং তাহার বাহিরের ইংরেজদিগকে ৫ জন সভ্য মনোনয়ন করিবার ক্ষমতা না দিলে, বোধ হয়, তাঁহারা সন্তুষ্ট হইবেন না। তাঁহাদের আবদার রক্ষা করিতে হইবে।

বিদ্যাসাধ্যবৃত্তিধারী এবং গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারী লোকেরা দেশের একশত মধ্যে ৩ জন মাত্র। ইঁহারা বিশেষভাবে ৬ জন সভ্য মনোনয়ন করিবেন। জমিদারে ৫ জন মনোনীত করিয়া আসিয়াছেন, তাহা এখনও থাকিবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট ১ জন, কলেজ সমূহের অধ্যাপক এবং মেট্রিকুলেশন স্কুল সমূহের হেডমাষ্টারগণ ১ জন, ব্যারিষ্টার উকীল মোক্তার ও এটর্ণীরা ১জন চিকিৎসা-ব্যবসায়ী ডাক্তার ও কবিরাজেরা ১ জন, পাঠশালার গুরুমহাশয়েরা এবং মোক্তাবের মোল্লারা একজন এবং সংস্কৃত টোলের পণ্ডিতেরা ১জন, একুন ৬ জন মনোনীত হইবেন। মুসলমান সম্প্রদায়ের ৫ বিভাগ হইতে ৫ জন সভ্য বিশেষভাবে মনোনীত করিবার অধিকার পাইয়াছেন। তাঁহারা পূর্ব্ব প্রথারূপ ৫ জন সভ্য মনোনীত করিবেন। সংক্ষেপতঃ—

গ্রামের মোড়লেরা	৮২
সহরবাসী করদাতারা	১৫
ইংরাজেরা	১৫
জমিদারেরা	৫
মুসলমানেরা	৫
নানা বিদ্বান্ সমাজ	৬
একুন	১২৮

এই ১২৮ জন সভ্য যদি জনসাধারণ কর্ত্তৃক মনোনীত হয়েন, তবে গবর্ণমেণ্ট সরকারী কর্ম্মচারী এবং বেসরকারী লোক ৩২ জন মনোনীত করিতে পারিবেন। তাহা হইলে ১৬০ জন সভ্য হইয়া প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভা গঠিত হইবে। যখন ইণ্ডিয়া গবর্ণমেণ্টের ব্যবস্থাপক সভায় ১০০ জন সভ্য থাকিবেন, তখন বাঙ্গালার প্রাদেশিক সভায় ১৬০ সভ্য সংখ্যা না থাকিলে চলিবে না। ইতি—

শ্রীশ্রীনাথ দত্ত।

শান্তি শতক ।*

উপান্তে যথায় মৃগপদাঙ্ক অঙ্কিত,
সুকোমল তৃণ কত নির্ঝর যথায়,
মুহুর্মুহুঃ যেই ভূমি হয় মুখরিত,
বিবিধ বিহগ যবে সুমধুরে গায় ;—
যথায় কুসুমবাস লইয়া মলয়
তরুগণে তরঙ্গিত করে অনুক্ষণ,—
—এমন পবিত্র বন মঙ্গলনিলয়
কা'র না মানসে প্রীতি করে
উৎপাদন ? ৪৬ ।

ভুজলতা দিয়ে বাঁধে সীমন্তিনীগণ
ছিঁড়িয়া যাহারা সেই বন্ধন সকল,
শমময় বনে করে আশ্রয় গ্রহণ,
সুবিমল সুখ ভুঞ্জে তাহারা কেবল !
দুর্জ্জনগণের তীক্ষ্ণ অপমান-শর
না করে জর্জ্জর কভু তা'দের অন্তর ! ৪৭।

কল্যাণ হউক, ওহে কুরঙ্গ সকল !
প্রতিশাখা, বল, তব হোক্ রোগহীন,
ভদ্র হোক্ তোমাদের যতেক স্বপন।
শুভ হোক্ নদি, তব,—কুশল, পুলিন !—
এ ঘোর সংসার মাঝে প্রাণ মোর যায়,—
কোনরূপে পরিহরি এ ছার আবাস,
আমার মানস আজি সেই হেতু চায়
চিরতরে তোমাদের সনে সহবাস ! ৪৮ !

তৃষাশান্তিতরে আছে গিরিনদীজল,
বৃক্ষমূল ভোজি হ'বে ক্ষুধার বিনাশ,
কিশলয় শয্যা হ'বে গৃহ তরুতল,
পাদপ-বল্কল হ'বে পরিধেয় বাস !
ক্রীড়া হ'তে পারে মুগ্ধ মৃগগণ সনে
শশাঙ্ক প্রদীপ হবে, বন্ধু পক্ষিগণ —
—স্বাধীন বিভব সব মিলিবেক বনে
তবে কেন ভিক্ষাতরে ভ্রমে মূঢ়জন ? ৪৯

নবীন-তৃণের পরে করিব শয়ন,
প্রস্তর আসন মম, গৃহ তরুতল,
মৃগদল মিত্র, কন্দ হইবে অশন,
পানীয় হইবে স্নিগ্ধ নির্ঝরের জল !
সকলি মিলয়ে বনে চাহিতে না হয়,
কিন্তু এক মহাদোষ আছয় কাননে,—
বনমাঝে ধনবান নাহিক মিলয়,
চাটুবৃত্তি বনে তবে হইবে কেমনে ? ৫০

যাচক জনের আশা করিয়া পূরণ,
অরাতিরও প্রিয় কর্ম্ম করি সম্পাদন,
জ্ঞান-পয়োধির পারে করিয়া গমন,
বনে আসি বাস করে ধন্য জনগণ ! ৫১

ফল মূল যথারুচি মিলিবে আহার,
বনেতে হইবে মোর শয্যা মহীতল,
কুসুম শমিৎকুশ ভূষণ আমার,
মৃগগণ পুত্র হবে, সঙ্গীত বল্কল
বস্ত্র-অন্ন-গৃহ ভোগ-ভূষণ-বিভব,
ক্লেশ বিনা মিলিবেক কানন মাঝারে
মিত্রকর্ম্ম করে তথা মহীরুহ সব—
দুখ বিনা কিন্তু কিবা মিলয়ে সংসারে ?৫২

মায়াময় সংসারের মজিলে চিন্তায়,
রাজেন্দ্র ভবনে বাস বনবাস প্রায় ॥
বিষয়-ইন্দ্রিয়াসক্ত যত মূঢ়জন,
স্বগৃহে ভুঞ্জয়ে ক্লেশ বনেতে যেমন ! ৫৩

অতীতের কথা কহি' কাটায় সময়,*
স্থলবস্ত্রে অঙ্গ ঢাকি' কাশলালাসনে,
দন্ত-কটি পৃষ্ঠ-জানু ভেঙেছে হৃদয়—
এখনো নিবারে কিন্তু ভিক্ষাকাঙ্ক্ষিগণে ;
কর্কশবচনে ভর্ৎসে ধৃষ্ট বধূগণ—

* কবিবর শিহ্লন প্রণীত ।

*কবিবর এইস্থলে সংসার-মগ্ন বৃদ্ধের দুর্দ্দশার কথা বর্ণনা করিতেছেন। সংসারে তাহার কোন সুখ না থাকিলেও, বৃদ্ধ সংসারের মায়া ছাড়িতে পারিতেছে না !— অনুবাদকর্ত্তা।

তথাপি দেখায়ে ধনু কাকেরে তাড়ায,
আশাপাশে বদ্ধ তা'র এখনো জীবন,—
দেখ না কেমনে বৃদ্ধ সুখ ভুঞ্জে হায়! ৫৪
বিষয়ে আসক্ত যেই মানবের মন,
বনেও তাহার দোষ হয় অগণন,
ইন্দ্রিয় নিগ্রহ কিন্তু করে যেইজন
গৃহে থাকি হয় তার তপঃ আচরণ।
অকুৎসিৎ হয় যেই করমনিচয়
সেই সব কর্ম্ম যেবা করে সম্পাদন,
ভোগলিপ্সা ত্যজিয়াছে যাহার হৃদয়,
সে জনার গৃহ হয় পুণ্য তপোবন। ৫৫
কৃপায় হৃদয় যদি না হল সরস,
বল কিবা ফল হেন বিবেক লভিয়া?
বহিল না মনে যদি করুণার রস
কিবা ফল হেন মার্গ আশ্রয় করিয়া!
না করে যে ধর্ম্ম হিংসাবৃত্তি নিবারণ
সেই ধর্ম্ম ধর্ম্ম নহে জানিও নিশ্চয়;—
কি ফল সে জ্ঞান বল করিয়া অর্জ্জন
যদি সেই জ্ঞানে মনে শান্তি নাহি হয়? ৫৬

ভবিষ্যতে কালে শিশু ভুঞ্জিবে বিষয়,
অতীতে ভুঞ্জিলা সুখ বৃদ্ধ যেইজন,
ভুঞ্জিলা,—ভুঞ্জিবে পুনঃ কালেতে উভয়
আরম্ভ হয়েছে যার নবীন যৌবন!
অসুলভ ভাবি শিশু চাহুক বিষয়ে,
পাইয়া করুক্ যুবা বিষয় সেবন
—বিষয় হইতে কিন্তু বহিষ্কৃত হয়ে,
কেন বৃদ্ধ ফিরি তা'য় করয়ে দর্শন? ৫৭
অপত্য কলত্রগণে যত মূঢ়জন,
'আমার সংসার' বলি করয়ে গণন!
এ সংসার-সঙ্গ হয় যাহাতে খণ্ডিত
শাস্ত্রের সংসারে হেন মগন পণ্ডিত! ৫৮
অনেক পুণ্যের ফলে জানিও তোমার
শরীর তরণী এই করিয়াছ ক্রয়;
দুঃখ-পয়োনিধি তাই হইবারে পার
—ত্বরা কর—যেন তরী ভিন্ন নাহি হয়। ৫৯

ইতি দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

শ্রীহরিসত্য ভট্টাচার্য্য।

ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাস

কোন ধর্ম্মসমাজের ইতিহাস লিখিতে গেলে ইতিহাস-লেখককে এমন একটী পথ ধরিতে হয়, যাহাতে কেবল সেই ধর্ম্মসমাজের নহে, অপর অপর ধর্ম্মসমাজেরও কল্যাণ সাধন হয়। শ্রীযুক্ত পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাস লিখিতে গিয়া সে পথ ভুলিয়া গিয়াছেন। ধর্ম্ম-সমাজের ইতিহাস লিখিতে হইলে ইতিহাস-লেখককে বিদ্বেষ ও অসূয়া-পরিশূন্য হইতে হয় এবং কিরূপে সেই ধর্ম্মসমাজ স্তরে স্তরে উন্নতির পথে অগ্রসর হইয়াছে, তাহার ইতিহাসে সেই চিত্রই দেখান উচিৎ। অসূয়া-পরতন্ত্র হইয়া কোন ব্যক্তিগত কার্য্য বা চরিত্রের চিত্র আঁকিয়া ধর্ম্মসমাজের প্রকৃত ইতিহাস-লেখক আপনার লেখনীকে কলঙ্কিত করিতে পারেন না। বিধাতার আদিষ্ট কার্য্য বলিয়া যিনি কোন জন-হিতকর অনুষ্ঠানে আপনাকে উৎসর্গ করেন, তিনিই সত্য সত্য আপনাকে এসব দোষ হইতে দূরে রাখিতে পারেন। প্রকৃত সাধকের পথ আপনাকে দেখা। "আমি কি" এই তত্ত্ব যিনি শিখিয়াছেন, তিনি অন্যের বিচার

করিতে পারেন না। ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাস লেখক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় সাধক-জীবনের সে তত্ত্ব ভুলিয়া গিয়া, তাঁহার প্রচার ও ইতিহাসকে কলঙ্কিত করিয়া ফেলিয়াছেন। কোথায় ভাবিতেছিলাম যে, ব্রাহ্মসমাজের বিভক্ত-দলের মধ্যে ক্রমশঃ একটা মিলন সংস্থাপিত হইবে, তাহা না হইয়া সে ব্যবধান আরও বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে। মিলনের সুর ধরিয়া যদি শাস্ত্রী মহাশয় তাঁহার ইতিহাস লিখিতে পারিতেন, উদার নৈতিক ধর্ম্মসমাজে সে ইতিহাসের স্থান হইত। শাস্ত্রী মহাশয় মহর্ষি ঈশার উচ্চনীতি "Judge uot others lest you be judged by them" (অন্যকে বিচার করিও না, পাছে তুমি তাহাদের কর্ত্তৃক বিচারিত হও) ভুলিয়া গিয়া আপনার সাধনার পথে আপনিই অন্তরায় হইয়াছেন। তাঁহার অসূয়াপূর্ণ লেখনী হইতে ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সম্বন্ধে যে সকল কথা বাহির হইয়াছে, আজ আমি ন্যায় ও সত্যের অনুরোধে বলিতেছি যে, সেই অসূয়া সংশ্লিষ্ট কথা সমূহ কোথাও অতিরঞ্জন ও কোথাও অমূলকত্ব দোষে দূষিত। তিনি যে যে স্থানে এইরূপ অসূয়াপূর্ণ চিত্র আঁকিয়াছেন, সে সকল কি কেবল তাঁহার চক্ষে পড়িয়াছিল, ব্রহ্মানন্দের অত্যন্ত অন্তরঙ্গ অনুচর ভক্ত প্রতাপচন্দ্র, উপাধ্যায় গৌরগোবিন্দ ও মণ্ডলীর চির-সেবাব্রত-পরায়ণ কান্তিচন্দ্র প্রভৃতির চক্ষে তাহা পড়ে নাই? আমরা বিস্মিত হইয়াছি যে, ভক্ত প্রতাপচন্দ্রের স্বর্গারোহণের অব্যবহিত পরেই শাস্ত্রী মহাশয় তাঁহার ইতিহাস বাহির করিলেন। প্রতাপচন্দ্র যদি আরও কিছুদিন বাঁচিয়া যাইতেন, পণ্ডিত শাস্ত্রীর ইতিহাস বাহির হইত না। যখন তাঁহার ইতিহাস মুদ্রিত হয় নাই, সম্ভবতঃ যখন কতকাংশ লিখিত হইয়াছে, শাস্ত্রী মহাশয় তাঁহার অত্যন্ত চির-সুহৃদ্ সহপাঠী বাল্য-বন্ধু স্বর্গগত ভক্ত প্রকাশচন্দ্র (গয়ার ভূতপূর্ব্ব ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট) মহাশয়কে (উভয়ের দার্জিলিঙ্গে প্রবাসকালে) দেখিতে দিয়াছিলেন। প্রকাশচন্দ্র দেখিয়া বলিয়াছিলেন, "শিবনাথ! তুমি যদি পক্ষপাত-শূন্য হইয়া না লেখ, ভবিষ্যত তোমাকে গ্রহণ করিবে না"। এই ত গেল শাস্ত্রী মহাশয়ের একজন ঘনিষ্ট বন্ধু ও প্রাচীন সাধকের উক্তি। "The ways of a great man are not my ways" (একজন মহাপুরুষের পথ আমার পথ নহে) এসব ভুলিয়া গেলে মানুষ মহাপুরুষকে বুঝিতে পারে না। আমার যে পথ, অপর সাধকেরও সেই পথ হইবে, ইহা যিনি মনে করেন, তিনি প্রেম ও সাধনার পথ হইতে অনেক দূরে পড়িয়া যান। প্রকৃত সাধক আপনার সাধনার পথে আপনি চলিয়া যান। লোকে তাঁহাকে গ্রহণ করিবে কি, না করিবে, তিনি তাহা ভাবিতে পারেন না। ভগবান তাঁহাকে যাহা বলান, তিনি তাহাই বলেন; ভগবান তাঁহাকে যাহা করান, তিনি তাহাই করেন। আমি তুমি তাঁহার পথ ও সত্য গ্রহণ করিব কি না করিব, তিনি তাহা ভাবিতে পারেন না। কেশবচন্দ্র এই পথে চলিয়াছিলেন। কেশবচন্দ্র যখন যে নূতন সত্য পাইয়াছেন, তাহাই বলিয়া গিয়াছেন। আমি তুমি গ্রহণ করিব কি না করিব, তাহা তাঁহার ভাবিবার বিষয় ছিলনা। পিটর্ অস্বীকার করিবেন বলিয়া ঈশা তাঁহার সত্যপথ হইতে বিচ্যুত হয়েন নাই। শিশুপাল বিরুদ্ধে দাঁড়াইবেন বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ আপনার প্রচার ও মিসন্ হইতে

দূরে থাকিতে পারেন নাই। বিরোধী বিরুদ্ধে দাঁড়াইবে বলিয়া শ্রীবুদ্ধ আপনার নির্ব্বাণ-সাধন হইতে বিরত হয়েন নাই। শত্রুদল-বেষ্টিত হইয়া প্রাণের আশঙ্কা উপস্থিত হইবে বলিয়া শ্রীমহম্মদ একেশ্বরবাদ ঘোষণা হইতে পশ্চাদ্‌পদ হয়েন নাই। তাঁহাদের সত্য লোকে গ্রহণ করুক আর না করুক, তাঁহারা আপনার পথে আপনি চলিয়া যান। কেশবচন্দ্র এই পথেই চলিয়াছিলেন, সুতরাং আমার তোমার নিকট অস্বীকৃত হইবেন। মহাজনের বিরুদ্ধে লোক দাঁড়ায়, কিন্তু মহাজন কাহারও বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে পারেন না। সাধক Charles Spurgeon বলিয়াছেন :—"Let me advise you to wear no armour for your books when you have determined to follow the track of Truth. Receive upon your breast-plate of righteousness the sword cuts of your adversaries; the stern metal shall turn the edge of your foeman's weapon. Let the right be your lord paramount. Follow the Truth for her sake; follow her in evil report; let not many waters quench your love to her" (যদি সত্য অনুসরণে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া থাক, তবে পৃষ্ঠে বর্ম্ম ধারণ করিও না, সাধুতার বর্ম্মোপরি বিরোধীর অস্ত্রাঘাত গ্রহণ কর, শত্রুর শাণিতাস্ত্র প্রত্যাবৃত্ত হইবে। ন্যায় তোমার শ্রেষ্ঠ প্রভু হউক। সত্যের অনুরোধে সত্যকে অনুসরণ কর। লোকে অপযশ ঘোষণা করিলেও সত্যকেই অনুসরণ কর। প্রভূত জলরাশি আসিয়া যেন প্রজ্জ্বলিত সত্যকে নির্ব্বাণ করিয়া না দেয়। ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র এই মন্ত্র ধরিয়া চলিয়াছিলেন। সাধু Spurgeon আরও বলিয়াছেন "Leave consequences to God but do right" (সত্য ও ন্যায়ানুষ্ঠান করিয়া ঈশ্বরেতে ফলাফল ছাড়িয়া দাও) কেশবচন্দ্রও তাঁহার প্রচার ও কার্য্যের ফলাফল ঈশ্বরেতে ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। আমি তুমি লইব কিনা, তিনি তাহা জানিতেন না। কেশবকে অস্বীকার করিতে গিয়া আমরা কি ঈশ্বরের ইচ্ছা ভুলিয়া যাই নাই? আর একজন সাধু বলিয়াছেন "If thou wouldst hear him speak first, be silent. If thou wouldst have him move thee, be still" (ঈশ্বর যাহা বলিতেছেন, তাহা যদি শুনিতে চাও, তবে নীরব হও। ঈশ্বর তোমাকে চালাইবেন, যদি তাহা চাও, তবে স্থির হও ভাই! আমরা কি এরূপ করিয়াছি? ভক্তের ভিতর দিয়া ভগবান কার্য্য করেন ও কথা কন। সাধুরাই বলিয়াছেন—"Through His devotee he speaks and through him He acts" ভাই! এসব কথা কি আমরা ভুলিয়া যাইতেছি না? প্রকৃত বিশ্বাসী অপেক্ষা করেন এবং বহু সাধনার পর প্রচারিত সত্য বুঝিতে পারেন। এরূপ করা বিবেকের অপরাধ নহে। জনৈক সাধু বলিয়াছেন—"It is no vice of intellect if our attitude towards a new thing be one of readiness and attentive response instead of rushing into the fires of controversy" সত্য সত্য আমরা কি সেরূপ করিয়াছি? তোমরা কি জান না, ঈশার কত পরে ঈশাপ্রচারিত সত্য গৃহীত হইয়াছে? তোমরা কি জাননা, বিধাতার বিধানে কতদিন পরে সাধু পল আসিয়া ঈশার সত্য পৃথিবীর সমক্ষে ধরিলেন? তোমরা কি জাননা, বুদ্ধের কতদিন পরে অশোক* আসিয়া

মহানির্ব্বাণ ধর্ম্মের জয়-পতাকা উড়াইলেন? এইরূপে যুগে যুগে সকল সাধু মহাজনের সম্বন্ধে ঈশ্বরের বিধান চলিয়াছে। ভারতের ঋষিকে ভারত গ্রহণ করিতে পারিল না, চীন, জাপান, তিব্বত গ্রহণ করিলেন। তোমরা কেশবচন্দ্রের প্রচারিত সত্য গ্রহণ করিতে পারিলে না, ইংলণ্ড ও আমেরিকা গ্রহণ করিবে। তোমরা তাঁহাকে স্থান দিতে পারিলে না, ভাবী বংশ তাঁহাকে স্থানদান করিবে।

পূর্ব্বে বলিয়া আসিয়াছি যে, বিদ্বেষ ও অসূয়া শূন্য হইয়া ধর্ম্মসমাজের ইতিহাস লেখাই ইতিহাস-লেখকের প্রকৃতি। লিপি-কুশল ও বাগ্মীবর নববিধান-প্রচারক স্বর্গগত ভক্ত প্রতাপচন্দ্র "Faith and Progress of the Brahmo Somaj" নামে ব্রাহ্ম-সমাজের যে ইতিহাস লিখিয়া গিয়াছেন, সেই ইতিহাসই ব্রাহ্মসমাজের আদর্শ ইতিহাসরূপে গ্রহণীয়। কেশবচন্দ্রের চির সহচর চক্ষুষ্মান প্রতাপচন্দ্র কি তাৎকালীন মণ্ডলীর ভিতরে ব্যক্তিবিশেষের কোন দোষ অপরাধ কিছুই দেখিতে পান নাই? উন্নত-মনা বিশ্বাসী প্রতাপ সে লাইন্ পরিহার করিয়া সমাজের ক্রমোন্নতিরই একটা চিত্র দিয়া গিয়াছেন। দুঃখের বিষয়, এ আদর্শ ইতিহাসের stock ফুরাইয়া গিয়াছে।

বলিতে গেলে কেশবচন্দ্র আপনার চিত্র আপনিই আঁকিয়া গিয়াছেন। তোমরা তাঁহার বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া এত কথা বলিলে, তোমাদের সংবাদপত্র বিদ্রূপাত্মক ও কুৎসা-পূর্ণ ভাষায় দেশকে প্লাবিত করিল, কিন্তু তাঁহার মুখ অথবা লেখনী হইতে তোমাদের বিরুদ্ধে একটী কথাও বাহির হইল না। তোমরা বলিতেছ, তাঁহার বিরুদ্ধে অভি-যোগের কোন Explanationই তিনি দিয়া যান নাই। আজ আমি বলিতেছি যে, তোমরা যে স্থানে দাঁড়াইয়া আছ, তিনি যদি ঐ স্থানে দাঁড়াইয়া থাকিতেন, তবে তাঁহার মুখ ও লেখনী নীরব থাকিত না। বিরুদ্ধ-বাদীর বিরুদ্ধে কোন মহাপুরুষ কখন কথা বলেন নাই, বরং তাঁহাদিগকে ভালবাসিয়া-ছেন। দুঃখের বিষয়, কেশবচন্দ্রের জীবনের এ সৌন্দর্য্যটুকু আমরা বুঝিতে পারিলাম না।

উপসংহারে বক্তব্য যে শাস্ত্রী মহাশয় যদি ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাস দ্বারা ব্রাহ্ম-সমাজের কল্যাণ বর্দ্ধন করিতে চাহেন, তাহা হইলে তাঁহার পুরাতন ইতিহাসের পঙ্কোদ্ধার করিয়া তাহাকে নূতন ঐতিহাসিক জীবনে পুনর্গঠিত করিয়া যাউন। ভক্তকে স্বীকার করিলে তিনিও স্বীকৃত হইবেন।

শ্রীগৌরীপ্রসাদ মজুমদার।

সঙ্গণিকা

(৩৬)

২৯শে, ৩০শে ও ৩১শে আগষ্ট বোম্বে নগরে প্রস্তাবিত হোমরুল-শাসন-সংস্কার-মন্তব্য-বিচারের জন্য কংগ্রেসের একটী বিশেষ অধিবেশন হইয়াছিল। বঙ্গের মধ্যপন্থীদল উপস্থিত না হইলেও সভার কার্য্য ভাল ভাবেই নির্ব্বাহিত হইয়াছে। প্রায় দশ সহস্র লোক উপস্থিত ছিল। শ্রীযুক্ত মদনমোহন মালব্য মহোদয় মধ্যপন্থী দলভুক্ত হইলেও সভায় উপস্থিত ছিলেন এবং শাসন সংস্কারের

অনেক পরিবর্ত্তন প্রয়োজন, এরূপ প্রস্তাব উপস্থিত করিয়াছিলেন এবং তাহা গৃহীত হইয়াছে। আমরা গত বারে বলিয়াছিলাম যে, অস্ত্র আইন, প্রেস আইন প্রভৃতি থাকিতে এদেশের কোন সংস্কারই হইবে না। কংগ্রেসেও এ সম্বন্ধে প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। কর্ত্তৃপক্ষ আমাদের কথা শুনুন বা না শুনুন, মধ্য হইতে আমরা দলাদলিতে প্রমত্ত হই, এ রহস্য মন্দ নয়। শুনিতেছি, দুই পক্ষকেই পরামর্শ দিয়া কর্ত্তৃপক্ষের কোন কোন লোক এই দলাদলি বাধাইয়া রগড় দেখিতেছেন। ব্যাপার মন্দ নয়। আমরা এতই অপদার্থ হইয়া যাইতেছি যে, ইঙ্গিতমাত্রই দেশের কথা ভুলিয়া একদল অন্য দলের অনিষ্ট সাধনে তৎপর হই। ব্যাপার স্মরণ করিলে চক্ষের জল সম্বরণ করা যায় না।

(৩৭)

৮ই, ৯ই, ১০ই সেপটেম্বর হ্যালিডে ষ্ট্রীটে মুসলমানদিগের একটী সভার আয়োজন হইয়াছিল। গবর্ণমেণ্ট তাহা বন্ধ করিয়া দেওয়ায় কলিকাতায় খুব দাঙ্গা হাঙ্গামায় অনেক রক্তপাত হইয়া গিয়াছে। সভা বন্ধ না করিলে যে কি অনিষ্ট হইত, আমরা তাহা বুঝিতেছি না। শুনিতেছি, আমাদের দেশের কোন কোন ব্যক্তি নাকি সভা বন্ধ করিয়া দিতে গবর্ণমেন্টকে পরামর্শ দিয়াছিলেন। তাহা না করিলেই হইত। নচেৎ এমনি করিয়া দেশ ডুবিবে কেন? জাতীয় সাহিত্য ত এক প্রকার গিয়াছেই, এখন বক্তৃতা থামাইতে পারিলেই তাঁহাদের ইষ্ট সিদ্ধ হয়। এই দলের লোকেরাই নাকি মধ্যপন্থী। মধ্যপন্থীর দল আর কিছুই নয়, তাহা পাচাটার দল। ইঁহারা না পারেন, এমন কাজ নাই। এই দলের লোকই রৌলাট কমিসনে স্বাক্ষর করিয়াছেন, এই দলের লোকই কুতুবদিয়ার অন্তরীণকার কমিসনের মন্তব্যে নাম স্বাক্ষর করিয়াছেন। ইঁহারা কখনও কপর্দ্দক কোন দুঃখীকে বা কোন হিতকর কার্য্যে দিবেন না, শুধু কেবল গোয়েন্দাগিরি করিবেন। এ দেশ কি এই দলকে চিনিতে পারিবেন না? দেশের দুর্ভাগ্য, সুরেন্দ্রনাথও বার্দ্ধক্যে আজ খয়ের-খা হইয়া উঠিয়াছেন। এখন মনে হয়, তাঁহার চাকরী না গেলেই ভাল হইত। সিবিলিয়ানদিগকে সকলেই চিনেন, কেহ ভ্রমে পতিত হইত না। বড় দুঃখ হয়, আজও সুরেন্দ্রনাথ বক্তৃতা দিতে বাহির হন। তিনি এখন রাজচরের মুকুট মাথায় পরিয়া উচ্চপদে আসীন হউন। সেই ভাল, সেই ভাল।

(৩৮)

সাধারণ-ব্রাহ্মসমাজের লোকেরা, দেখিতেছি, আজ কাল রাজনীতি আন্দোলনে খুব যোগ দিতেছেন। মধ্যপন্থীদলে লোকসংখ্যা বেশী ছিল না, ব্রাহ্মসমাজের লোকের দ্বারা দলপুষ্ট করিতেছেন। রাজনীতি-দলে ধর্ম্মনীতি-দলের লোকের প্রবেশ ভাল কি না, তাহা বিচারের বিষয়। মহারাজা রামমোহন,* মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, ভক্ত কেশবচন্দ্র, সাধু প্রতাপচন্দ্র রাজনীতিতে যোগ দেন নাই। বারম্বার অনুরুদ্ধ হইয়াও প্রতাপচন্দ্র কংগ্রেসে যোগ দিয়াছিলেন না। এখনকার দিনে সব উল্টাইয়া যাইতেছে। এই ভুঁইফোড় রাজনীতিকদের পরিণাম কি? তাঁহারা আজকাল বড় অসহিষ্ণু হইয়াছেন. কোন তিক্ত মন্তব্য তাঁহারা আর সহ্য করিতে পারেন না। যাহা-তাহা করিবেন, তত্রাচ তাহা কেহ ব্যক্ত করিলেই চটিয়া লাল হন, নানা অনিষ্টের

* The world and the new dispensation, Sep 12, 1918.

উপায় উদ্ভাবনে বদ্ধপরিকর হন। তাঁহাদের প্রকৃতি আজ কাল যে কিরূপ হইতেছে, ব্যক্ত করার সাধ্য নাই! যদি তাঁহাদের ক্ষমতা থাকিত, না জানি কি করিয়া বসিতেন। এখন নিজেদের আঙ্গুল নিজেরা ভক্ষণ করুন।

(৩৯)

গবর্ণমেণ্ট স্যর নারায়ণচন্দ্র চন্দ্রভরকর ও মিঃ বিচক্রফটকে অন্তরীণদের বিরুদ্ধে অভিযোগ বিচারের জন্য নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তাঁহারা ৮০৬ আসামী সম্বন্ধে একতরফা তদন্ত করিয়া মাত্র ৬ জনকে নির্দ্দোষী সাব্যস্ত করিয়াছেন। এইরূপ যে হইবে, কিছুই বিচিত্র নয়। আসামীদের পক্ষে জেরা না হইলে, উকীল না থাকিলে, কখনও সুবিচার হইতে পারে না। জেরা ও কৈফিয়ৎ-শূন্য বিচার, বিচারের বিভ্রাট মাত্র। স্যর চন্দ্রভরকর বেশ নাম কিনিতেছেন।

(৪০)

যুদ্ধের আনুষঙ্গিক কষ্ট এদেশে সম্যকরূপে প্রকটিত হইতেছে। সমর-জ্বর কত লোকের সর্ব্বনাশ করিয়াছে, সংখ্যা হয় না। বস্ত্রসঙ্কটে এদেশে হাহাকার উঠিয়াছে, অনেক স্থলে আত্মহত্যা হইতেছে। চাউলের মূল্য অতিশয় বৃদ্ধি হইতেছে, দুর্ভিক্ষের দরে বিক্রয় হইতেছে। অনাহারে মৃত্যুর কথা আজও শুনা যায় নাই বটে, কিন্তু সকল ঘরেই দারুণ কষ্ট উপস্থিত হইয়াছে। ডাইল, আলু, লবণ, কেরোসিন অগ্নি মূল্যে বিক্রীত হইতেছে। এই সকল কষ্টের উপর আবার প্লাবনে অনেক স্থান ভাসিয়া গিয়াছে। বস্ত্রসঙ্কট গবর্ণমেণ্ট ভিন্ন কেহই দূর করিতে পারেন না, কেননা, প্রতিজনকে ১৲ করিয়া দিতে হইলেও ২০।৩০ কোটী টাকার প্রয়োজন। টাকা কোথায়? সমর-ঋণে দেশের ভাণ্ডার নিঃশেষ হইয়া যাইতেছে। সকলের মুখে বিষাদের চিহ্ন ফুটিয়া বাহির হইতেছে। আমরা জানি, এদেশে, অনেক রাজা জমিদার ঋণ করিয়া সমর-ঋণে টাকা দিয়াছেন। দেশের অতি শোচনীয় দশা উপস্থিত হইয়াছে। শান্তি স্থাপিত না হইলে দেশ রক্ষার আর উপায় নাই।

(৪১)

এই সঙ্কটে অবস্থা ভাল জানা যাইতেছে কেবল মাড়োয়ারীদিগের। বাঙ্গালী ত গিয়াছে, প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তি-সংগ্রামে বাঙ্গালী আবার যে মাথা তুলিতে পারিবে, সে আশা বড় নাই। বাঙ্গালী-ঘৃণা ভারত ব্যাপিয়া প্রকাশিত হইতেছে। রাজনীতির আন্দোলনে বাঙ্গালীর একটু আদর ছিল, এবার সুরেন্দ্রনাথ-প্রমুখ ব্যক্তিগণের ব্যবহারে তাহার মূলেও কুঠারাঘাত হইল। বাঙ্গালী দাঁড়ায় কোথায়? বাঙ্গালী করিবে কি? খালি কলম-পেশা ধরিলে বাঙ্গালা-রক্ষার আর উপায় নাই। মাড়োয়ারীদিগের দৃষ্টান্তানুকরণে বাঙ্গালী ব্যবসা বাণিজ্যে মনোনিবেশ না করিলে আর মাথা তুলিতে পারিবেন না।

(৪২)

হিংসা, বিদ্বেষ এবং দলাদলিতেই বাঙ্গালীর সর্ব্বনাশ করিতেছে। কেহ কাহারও ভাল দেখিতে পারে না, কেহ কাহারও প্রশংসা শুনিতে পারে না। সাহিত্যে দলাদলি, সমাজে দলাদলি, জাতিতে জাতিতে দলাদলি, ধর্ম্মে দলাদলি—চতুর্দ্দিকে কেবল দলাদলি। কিছুদিন বঙ্গের রাজনীতির আন্দোলনে দলাদলি ছিল না, এবার তাহাও জাঁকিয়া উঠিয়াছে। এখন যেন দলাদলিরই রাজত্ব। দলাদলি এতদূর বাড়িয়া গিয়াছে যে, একদল অন্য দলকে অপদস্থ করিবার জন্য নানা অযোগ্য উপায়ও অবলম্বন করিতেছেন। দেখিতে দেখিতে আগুন যেন দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিতেছে। নেতৃবৃন্দ সতর্ক হউন।

(৪৩)

এখন ডেমোক্রেসীর স্থলে বুরোক্রেসিরই রাজত্ব। এমন যে এমেরিকা, সেও এখন বুরোক্রাট। ফ্রান্স মৃত, চীন মৃত, রুসিয়া মৃত, তুর্কী মৃত, এখন চতুর্দ্দিকে কেবল বুরোক্রেসি রাজত্ব করিতেছে। পৃথিবীর গতি কোন্ দিকে, চিন্তাশীল ব্যক্তিগণের প্রণিধানের বিষয়।

প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

৬। নামসুধা। শ্রীকালীনাথ ঘোষ প্রণীত, মূল্য ।০। অপূর্ব্ব সঙ্গীত পুস্তক। কাঙ্গাল হরিনাথ এবং চিরঞ্জীব শর্ম্মার তিরোধানের পর একালে এরূপ সুধা-মাখা হরিসঙ্কীর্ত্তনের ধ্বনি এদেশে আর কেহ তুলিতে পারেন নাই। কালীনাথের ভক্তি বিশ্বাস বাক্যে জমাট ভাব ধারণ করিতেছে। একটী উদাহরণ দিলাম

"নাম রেখেছি মনচোরা।
রূপ দেখায়ে প্রাণ মজায়ে করবে কেবল
মন বিভোরা।
হাট করিব ভবের হাটে,
পড়লাম ধরা রূপের ঠাটে,
এমনি তারি হল এ প্রাণ, অমনি প্রেমে
মাতোয়ারা।
করব না আর আনাগোনা,
ধরব ঘরে চাঁদের কণা,
দিব চোরের উচিৎ সাজা মারব তারে
প্রেমের ছোরা।

কালীনাথের লেখনী অক্ষয় সুধা বর্ষণ করিয়া তাপিত নরনারীর প্রাণকে সুশীতল করিতে থাকুন, আমরা শুনিয়া শুনিয়া ধন্য হইয়া যাই।

৭। গুরুগোবিন্দ সিং। শ্রীতিনকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত, মূল্য ২৲।

চুটকি গল্প প্রচারের এ যুগে এরূপ মৌলিক গ্রন্থ এই বাঙ্গালায় বড় বেশী প্রকাশিত হয় নাই, শ্রীযুক্ত সত্যচরণ যে কাজ করিয়াছেন, শ্রীযুক্ত তিনকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ও সেই কাজ করিলেন। বাঙ্গালা ভাষার উপর দিয়া বড়ই দুর্দ্দিন চলিয়া যাইতেছে;—কাগজের বাজার দুর্ম্মূল্য, ছাপাখানা সকল গবর্ণমেণ্টের তীব্র দৃষ্টিতে উঠিয়া যাইতেছে, সাজসরঞ্জাম অগ্নিমূল্য, তদুপরি, সাহিত্যের প্রতি কুদৃষ্টি। সাহিত্য না জাগিলে দেশের জাগরণের আর উপায় নাই। এ দেশের ভাল ভাল অধিকাংশ পুস্তকই বাজেয়াপ্ত হইয়া যাইতেছে, এখন মাসিক সাহিত্যের বাজার চুটকি গল্পে ভরিয়া যাইতেছে। এ হেন দুর্দ্দিনে এরূপ গবেষণাপূর্ণ মৌলিক গ্রন্থ প্রকাশিত হইল, ইহা বড়ই আনন্দের বিষয়। এই পুস্তক সঙ্কলনে গ্রন্থকার যে পরিশ্রম স্বীকার করিয়াছেন, তাহার তুলনা হয় না। ভাষা প্রাঞ্জল ও মাধুর্য্যভরা, সরল হইতেও সরল, তন্মধ্যে বাস করিতেছেন, প্রাণস্পর্শী উত্তেজনা। তিনকড়ি বাবুর অর্থ ছিল, তাহা সার্থক হইয়াছে, ক্ষমতা ছিল, তাহা সার্থক হইয়াছে, প্রাণ ছিল, তাহা ধন্য হইয়াছে, হৃদয় ছিল, তাহা বর্ষার প্লাবনের ন্যায় ঢালিয়া দিয়াছেন। ঘরে ঘরে এ পুস্তকের আদর হইলেই, এখন সব সার্থক হয়।

৮। উৎকলে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। ৺সারদাচরণ মিত্র প্রণীত, দ্বিতীয় সংস্করণ, মূল্য ১৲।

এই উপাদেয় পুস্তকখানির দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে দেখিয়া আমরা আনন্দিত হইয়াছি। পুরীর যাবতীয় কথা ইহাতে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। তীর্থ-ভ্রমণকারীদিগের নিত্য সহচর হইবার যোগ্য পুস্তক। ভাষা বিশুদ্ধ এবং মধুময়।

৯। সূচনা। শ্রীমনোরঞ্জন দাসগুপ্ত প্রণীত, মূল্য ॥০। মৌলিক চিন্তাপূর্ণ গ্রন্থ, লেখার ধরণ-ধারণ সবই নূতন। মনোরঞ্জন একজন মৌলিক কবি, অনুকরণ-স্পৃহা তাঁহার ধারেও ঘেঁষিতে পারে না। সাধনা করিলে তাঁহার লেখনী অমৃত ফল ফলাইবে। তাঁহার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইল।

১০। বলিদান ও আমিষাহার। দ্বিতীয় সংস্করণ। বিনামূল্যে বিতরণার্থ। শ্রীমৎ শ্রীকৃষ্ণানন্দ স্বামিজীর কাশী যোগাশ্রম হইতে প্রকাশিত। বলিদানের অযৌক্তিকতা বিশুদ্ধ সরল ভাষায় বর্ণিত হইয়াছে। এরূপ পুস্তক যত প্রচারিত হয়, ততই মঙ্গল। সর্ব্বত্র আদৃত হইলে আমরা যারপর নাই আনন্দিত হইব।

সমাজে স্ত্রীজাতির স্থান। (২)

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

পুংগণ চঞ্চল; স্ত্রীগণ স্থির—এই মূল স্বভাব হইতে আরও অনেকগুলি ধর্ম্ম জাত হওয়া যাইতেছে। পুরুষগণ যুদ্ধ বিগ্রহ করে, আহার সংগ্রহ করে এবং রিপু চালনার সময় অধিক চঞ্চল ও অসংযমী হয়; পক্ষান্তরে স্ত্রীগণ সেবায় আহার সংরক্ষণে এবং অপত্যপালনে পটু হইয়া থাকে। এ সকল ঐ একমাত্র মৌলিক প্রভেদ হইতেই উৎপন্ন হইয়া থাকে।

অনুন্নত, অসভ্য ও বর্ব্বর সমাজে মানুষ ভিন্ন ভিন্ন দলে ও গোষ্ঠীতে বিভক্ত ছিল। আহার সংগ্রহ এবং বাসের সংস্থান উপলক্ষে এই সকল দলে অথবা গোষ্ঠীতে অনেক সময় সংগ্রাম হইত। তাহাতে স্ত্রীগণ বিশেষ সহায়তা এবং উপকার করিতে ত পারিতই না, বরং অনেক সময় গলগ্রহ স্বরূপ হইত। সংগ্রাম কালে ইহাদিগকে রক্ষা করিতে, সংগৃহীত আহারের অংশ দিতে, অথবা স্থান হইতে স্থানান্তরে ক্ষিপ্র গতিবিধি করিতে হইলে ইহাদিগের অসমর্থতা হেতু বিপদগ্রস্ত হওয়া, ইত্যাদি নানা কারণে স্ত্রীগণ সেই ক্ষুদ্রদলের অথবা গোষ্ঠীর অপ্রিয় হইতে আরম্ভ করিয়াছিল। স্বদলে কন্যা সন্তান পালন করা অপেক্ষা ভিন্ন দল হইতে তাহাদিগকে সাময়িকভাবে প্রয়োজন মত সংগ্রহ করা ঐরূপ সমাজে সুবিধাজনক বোধ হইতে আরম্ভ করিল। ইহা হইতেই কন্যা বধ, এবং ভিন্ন দল অথবা গোষ্ঠী হইতে স্ত্রীসংগ্রহ করা প্রচলিত প্রথা হইতে লাগিল। কোন দল অথবা গোষ্ঠী ঐরূপে স্ত্রী সংগ্রহ করা বিপজ্জনক মনে করিয়া নিজ দলে অথবা গোষ্ঠীতেই নারীর সংখ্যা অস্বাভাবিক উপায়ে হ্রাস করিয়া তৎপর যাহারা অবশিষ্ট থাকিত, তাহাদিগকে এজমালী সম্পত্তির মত উপভোগ করিবার প্রথা প্রবর্ত্তিত করিল, অথবা নারীর সংখ্যা অল্প হওয়ায় একনারীর বহুপতিত্ব প্রথা (Polyandry) প্রচলন করিল। এইরূপে স্বদলে অথবা ভিন্নদলে নারী সংগ্রহের নিয়ম আরম্ভ হয়। ইহাই স্বগোত্রে বিবাহ* অথবা অসগোত্রে বিবাহের মূল বলিয়া বিবেচনা করিবার কারণ আছে। সে যাহা হউক, পুরুষগণের ঈদৃশ ব্যবহারে স্ত্রীগণ পরাপেক্ষী হইতে আরম্ভ করে, ক্রমে তাহাদিগের আত্মনির্ভরতা চলিয়া যাইতে থাকে, সাহস এবং তেজস্বিতা ক্রমে লোপ পাইবার কারণ হয়। নিজ জীবনের উপর তাচ্ছিল্য আসিয়া উপস্থিত হয়। অদ্যাপি স্ত্রীগণ ঐরূপই আছে।

কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর কথা, স্ত্রীগণের মাসিক লক্ষণের উপস্থিতি এবং গর্ভধারণ। এই দুইটী কারণে তাহাদিগকে প্রাথমিক সময় হইতে এ পর্য্যন্ত প্রায় সম্পূর্ণরূপে পরাপেক্ষী করিয়া তুলিয়াছে। মাসিক স্রাব আরম্ভ হইবার ঈষৎ পূর্ব্বে তাহাদিগের

* বর্ত্তমানকালেও অসভ্য হটেন্‌টট্‌দিগের মধ্যে স্বদলে বিবাহ (?) করা নিষিদ্ধ; অন্য দল হইতে স্ত্রী সংগ্রহ করিতে হয়। এস্কুইমক্‌স্ জাতি মধ্যে কখন কখন স্ত্রীগণের স্বদল মধ্যেই বহু পত্নী প্রথা দেখা যায়। অষ্ট্রেলীয় আদিম নিবাসীদিগের মধ্যেও কখন কখন সাময়িক পত্নী অথবা পত্নী দেখা যায়।

চক্ষু কর্ণাদি পঞ্চেন্দ্রিয়ই অধিকতর ক্রিয়াশীল হইয়া থাকে, শরীরও উত্তেজিত হয়, এবং মন বিভ্রান্ত হইয়া উঠে।* তখন তাহারা বহু পরিমাণে পুরুষের অধীন হইতে বাধ্য হয়। কিন্তু পূর্ণ গর্ভাবস্থায় এবং অপত্যের শৈশবকালে তাহারা সম্পূর্ণরূপে পুরুষের প্রতিপালনের অধীন হয়, এবং আত্মনির্ভরতা সম্পূর্ণরূপে নষ্ট হইয়া প্রাথমিক সমাজের গলগ্রহ হইয়া উঠে। যদি ভাগ্যক্রমে পুত্র সন্তান জাত হয়, তবে তাহার দল অথবা গোষ্ঠী কালে বলশালী হইবার আশায় তাহাকে যত্ন করিতে পারে, কিন্তু কন্যা জাত হইলে দলের অথবা গোষ্ঠীর বলক্ষয় হইবার আশঙ্কায় প্রসূতির উপর বিরক্ত হইবার কারণ উপস্থিত হয়। এই কারণ হইতে এখনও পুত্র-প্রসবিনীর এবং কন্যা-প্রসবিনীর আদরের তারতম্য হইয়া থাকে। যাহা হউক, রজোদর্শন এবং গর্ভসঞ্চার, এই দুই হেতু বশতঃ স্ত্রীগণের স্বভাব এত সঙ্কোচিত, কোমল এবং স্নেহপ্রবণ হইয়া উঠে যে, তাহারা জীবন-সংগ্রামের একরূপ অযোগ্য হয়। বিচার বুদ্ধি হ্রাস হইয়া তাহারা মায়ামোহে জড়িত হইয়া যায় এবং দুর্ব্বল রুগ্ন সুতরাং নিরানন্দ ও কোপন প্রভাব হইয়া অশান্তি ভোগ করে।

এই সকল এবং অন্য কারণে তাহাদিগের স্নায়ুমণ্ডল সুতরাং মস্তিষ্ক অনেক সময় উত্তেজনা এবং অবসাদে মিশিয়া একরূপ বিকৃতি প্রাপ্ত হয়। তাহা হইতে সময় সময় অজ্ঞান হইয়া পড়া,* অর্দ্ধচেতন অবস্থায় অপরের ইচ্ছামত কর্ম্ম করা, † বিবিধ প্রকার স্বপ্ন দর্শন এবং দূরদর্শন করা, ‡ ধর্ম্মোন্মত্ত হওয়া, ‖ এই সকল ব্যাপার (পুরুষগণ অপেক্ষা) স্ত্রীগণের অনেক সময় অধিক দেখা যায়।

উপরে যাহা বলা হইল, তাহা হইতে বুঝা যাইতেছে যে, স্ত্রীগণ স্বভাবতঃ এবং অনিবার্য্য সামাজিক বিবর্ত্তন অনুসারে বুদ্ধি-বৃত্তিতে এবং উদ্ভাবনী শক্তিতে সাধারণতঃ পুরুষ অপেক্ষা হীন হইবেই। কিন্তু তথাপি তাহাদিগের এ বিষয়েও একটী প্রধান গুণ এই দেখা যায় যে, পুরুষগণ কালব্যাপী চিন্তা ও যুক্তি মূলে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়, স্ত্রীগণ অতি শীঘ্র, (যেন কোন চিন্তা না করিয়াই), সেই সিদ্ধান্ত করিতে সমর্থ হইয়া থাকে। ইহা তাহাদিগের বিশেষ সুবিধার কথা। বোধ হয় ইহা তাহাদিগের স্থির-প্রকৃতি হইতে এবং পুরুষগণ কর্ত্তৃক নানা প্রকারে নিপীড়িত হইবার ফলে উৎপন্ন হয়।

স্বভাবজ কারণে, পারিপার্শ্বিক অবস্থার ফলে, এবং অনিবার্য্য সমাজিক বিবর্ত্তন বশতঃ পুরুষগণ যে সকল ধর্ম্ম প্রাপ্ত হয়, তাহাও এক্ষণে বিবেচনা করা আবশ্যক। তৎপর সমাজে স্ত্রীজাতির স্থান নির্ণয় করা যাইতে পারে।

পুত্র সন্তান অনেক সময় মাতার এবং কন্যা অনেক সময় পিতার ধাতু প্রাপ্ত হয়। কিন্তু যদি পুত্র পিতার আকৃতির এবং কন্যা মাতার আকৃতির ন্যায় হয়, তবে এই নিয়ম ন্যূনাধিক পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে। ইহা হইতে অনায়াসেই বুঝা যাইতেছে যে, উপরে নানা কারণে স্ত্রীজাতির স্বভাব যেরূপভাবে

---

* ইহা সকলেই জানেন। কিন্তু Havelock Ellis প্রণীত Man and women নামক গ্রন্থে ইহার বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে পরীক্ষিত প্রমাণ সংগ্রহ করা আছে।

* Hysteric fit ; † Hypnotism ; ‡ Clairvoyance ; ‖ Religious fanatism.

গঠিত হওয়া বলিলাম, তাহা যথাসম্ভব পুত্রেই অর্শিবে, কন্যাতে তাদৃশ পরিমাণে সংক্রমিত হইবে না। সুতরাং স্ত্রীগণকে সামাজিক নিয়মে খর্ব্ব করিয়া রাখিলে পুরুষগণেরই ক্ষতি। ইহাতে স্ত্রীগণ ও পুংগণ উভয়েই অবসন্ন হইয়া সমাজ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। স্বাভাবিক কারণেই স্ত্রীগণ অনেক পরিমাণে জীবন-সংগ্রামের অনুপযুক্ত হয়, তাহা দেখাইয়াছি; তাহার উপর স্ত্রীগণের প্রতি সামাজিক বিধির পীড়ন হওয়া অত্যন্ত অসঙ্গত। বরং ঐ সকল বিধি দ্বারা স্বাভাবিক অযোগ্যতা যাহাতে সংশোধন হইতে পারে, তাহাই করা উচিত।

এক্ষণে পুরুষগণের সম্বন্ধে বিবেচনা করিলে প্রথমেই দেখা যায় যে, অসভ্য বর্ব্বর সমাজ হইতে সভ্য সমাজ পর্য্যন্ত সর্ব্বত্রই আহার সংগ্রহ ও যুদ্ধ করা পুরুষগণের কার্য্য। ইহা স্বাভাবিক কারণ বশতঃই হইয়াছে। কারণ, কি উদ্ভিদ, কি জন্তুগণের মধ্যে পুংবীজ * ক্ষুদ্র, শীর্ণ, ক্ষুধার্ত্ত এবং চঞ্চল। পূর্ব্বে দেখাইয়াছি যে, সমস্ত জীবগণ মধ্যে পুংবীজ একস্থান হইতে অন্যত্র গিয়া স্ত্রী-ডিম্বকে অনুপ্রাণিত করে। অনুপ্রাণিত অর্থে খাইয়া ফেলা। জন্তুগণের পুংকীট স্ত্রীডিম্বের সহিত মিশিয়া যখন গর্ভসঞ্চার করে, তখন প্রকৃত পক্ষে পুংকীট স্ত্রীডিম্বকে স্বশরীরে মিশাইয়া লইয়া স্বয়ং পুষ্ট হয়। ইহাই তাহার আহার। এইভাবে মিশ্রিত-যুক্ত কোষ (Fygote) হইতে পুংগঠনের উপাদান যখন পৃথক হয় এবং পুংজাতীয় অপত্য গঠিত হয়, তখন সে পুংকীটের চঞ্চলতা এবং বুভুক্ষা স্বভাবতঃই প্রাপ্ত হইবে, ইহাতে আশ্চর্য্যের কথা ত নাই-ই; বরং ইহাই বিচার-সিদ্ধ। তৎপর, ঈদৃশভাবাপন্ন পুরুষ যে আহার সংগ্রহে এবং যুদ্ধকার্য্যে প্রাথমিক সময় হইতেই অগ্রণী হইবে, ইহা অনায়াসেই বুঝা যায়; কারণ এ সকল বুভুক্ষা ও চঞ্চলতার ফল। কিন্তু এসকল বিষয়ে কোন নিয়মই অব্যভিচারী নহে। বর্ত্তমান যুদ্ধে রুসিয়ার দুই চারিজন স্ত্রীলোক যুদ্ধ করিয়াছে। ভারতবর্ষে এ দৃষ্টান্তের অভাব নাই। টিউটন্, স্ল্যাভ্ প্রভৃতির মধ্যেও এরূপ দৃষ্টান্ত শুনা গিয়াছে। আহার অন্বেষণ বর্ত্তমান যুগেও ট্যাস্‌মেনিয়ান্ স্ত্রীলোকগণ করিয়াছে। তাহারা ডুব দিয়া মাছ ধরিত। মালদহ জেলায় চাঁইমণ্ডলদিগের স্ত্রীলোকগণ তরমুজ, পটল ইত্যাদি উৎপন্ন করে; এবং হাটে বাজারে লইয়া গিয়া বিক্রয় করে। এ সকল সত্বেও আহার অন্বেষণ এবং যুদ্ধ কার্য্য পুরুষের অভাববশতঃ তাহাদিগের কর্ত্তব্য কর্ম্ম বলিয়া সর্ব্বত্রই গণ্য হইয়াছে এবং তাহারাই এতদুভয় কর্ম্ম করে। এই হেতু ইহারা কর্কশ ও নিষ্ঠুর, দুঃসাহসী ও হঠকারী হইয়া উঠিয়াছে। এই হেতু বশতঃই ইহারা কৌশলী ও ন্যূনাধিক নীতিহীন হইয়াছে। আহার অন্বেষণ করিতে গিয়া ক্ষুধার্ত্ত সমাজের বহু ব্যক্তি দূর দূরান্তরে ছিটাইয়া পড়ে; তখন তাহারা সেই সকল দূরদেশের অধিবাসীদিগের মুখের অন্ন কাড়িয়া খাইতে আরম্ভ করে। ইহাতে তাহারা ধর্ম্মাধর্ম্ম জ্ঞান বিশেষরূপে ঠিক রাখিতে পারে না। সুতরাং ধর্ম্মহীন, উদর-সর্ব্বস্ব, উৎপীড়ক ব্যক্তিগণ ঈদৃশ পুরুষগণ মধ্যে যত অধিক দেখা যায়, স্ত্রীগণ মধ্যে তত নহে। ডারুইন তদীয় Descent of man নামক বিখ্যাত গ্রন্থে ইউরোপীয়গণের মানুষ শিকার করার কথা লিপিবদ্ধ করিয়া

* উদ্ভিদের পরাগরেণু এবং জন্তুর Spe

চিরতরে তাহাদিগের চরিত্রে কলঙ্ক মাখাইয়া রাখিয়াছেন। সে অধিক দিনের কথা নহে। যেমন লোকে বাঘ ভালুক শিকার করে, তেমনই ৮০।৯০ বৎসর পূর্ব্বে ইউরোপীয় বর্ত্তিপ্রিয় ক্ষুধার্ত্ত মানুষ (?) ট্যাসমেনিয়াতে যাইয়া মানুষ শিকার করিয়া তাহাদিগের * বস্তিতে আবাদের কার্য্য করিয়াছিল!! বিধাতার রাজ্যে হ্যাট্‌ কোট্‌ধারী মানুষে মানুষ শিকার করিয়াছিল, অর্থলোভে ও রাজ্যলোভে!! যাহারা এই নৃশংস কার্য্য করিতে পারিয়াছিল, তাহাদিগেরও স্ত্রীজাতীয়গণ এরূপ করিতে কখনই পারিত না। কোন কোন মাংসাশী পশু স্বীয় বাচ্চা খাইয়া ফেলে; কিন্তু সে পশু প্রায় সকল স্থানেই পুংজাতীয়। সুতরাং বুঝা যাইতেছে যে, অতি নিম্ন শ্রেণীস্থ জন্তু হইতে মানব পর্য্যন্ত সকলেরই শুক্রকীট ক্ষুধার্ত্ত, ক্ষীণ ও চঞ্চল হওয়াতে সর্ব্বত্রই পুংজাতীয়গণের এতদূর নৈতিক ও ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় শিথিলতা উৎপন্ন হইয়াছে। (ক্রমশঃ) শ্রীশশধর রায়।

মধ্যযুগের ইউরোপীয় দর্শন।

সেণ্ট্‌ আগস্টাইন্‌।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

জগৎ ঈশ্বরের স্বেচ্ছাকৃত বলিয়া ইহাও অবশ্য স্বীকার্য্য যে, জগতের এক সময়ে আদি ছিল। ওরিগেন ও নব-আদর্শবাদীর মতে সৃষ্টিকে যদি অনাদি বলিয়া গণ্য করা হয়, তাহা হইলে তাহাতে আর ঈশ্বরের কর্ত্তৃত্ব থাকে না, সৃষ্টির উপর ঈশ্বরের কোন হাতই থাকে না। এরূপ সৃষ্টিতত্ত্বকে বিকাশবাদেরই নামান্তর বলিতে হইবে। দার্শনিকদিগের আপত্তি, সৃষ্টি যদি কালের কোন এক নির্দ্দিষ্ট মুহূর্ত্তে আরব্ধ হইয়া থাকে, তাহা হইলে তদ্দ্বারা দীর্ঘকাল ঈশ্বরের অকর্ত্তৃত্ব বা জড়ত্বই সূচিত হয়, ঈশ্বর যেন দীর্ঘকাল নিশ্চেষ্ট থাকার পর এক সময়ে সৃষ্টির আবশ্যকতা অনুভব করিলেন এবং সেই হইতে তাহার আরম্ভ হইল। ইহা তাঁহাদের একটী ভ্রান্তমত এবং ভ্রমের কারণ, তাঁহারা সৃষ্টির পূর্ব্ববর্ত্তী সুদীর্ঘকালকে অসংখ্য মুহূর্ত্তের সমষ্টি বলিয়া জ্ঞান করেন। সত্য বটে, মুহূর্ত্ত বা ক্ষণই কাল। কিন্তু সৃষ্টির বহির্দ্দেশে অর্থাৎ সৃষ্টিকে ছাড়িয়া স্থান বা কাল কিছুরই অস্তিত্ব অনুভব হয় না, এবং কালের অভাবে ক্ষণেরও অস্তিত্ব নাই। ক্ষণ কিম্বা কাল গতির পরিমাপক, অতএব যে স্থলে গতির অভাব, সে স্থলে ক্ষণেরও অভাব হইবে। ঈশ্বর কিম্বা অনন্তে গতির অবিদ্যমানতা হেতু ক্ষণের সার্থকতা নাই। প্লেটো এই জন্যই বলিয়াছিলেন যে, গতি হইতেই কালের সূচনা হইয়াছে, অর্থাৎ কাল সৃষ্টবস্তুজাতের সমসামরিক। সুতরাং খ্রীষ্টানদিগের কল্পিত ঈশ্বর যে অসংখ্য এবং সুদীর্ঘ কালাংশ সমূহ নিষ্কর্ম্মাভাবে অতিবাহিত করার পর সৃষ্টি ব্যাপারে লিপ্ত হইয়াছিলেন, এরূপ মনে করা অন্যায়। বিপক্ষদলের ভ্রম দেখাইতে গিয়া সেণ্ট আগষ্টাইন্‌ যে নিজেও ভুল না করিয়াছেন, এমন নয়। জগৎ ঈশ্বরের স্বেচ্ছা-

---

* বাসস্থান অথবা পল্লী।

কৃত, অথচ জগতের ধারণা ব্যতীত ঈশ্বরের ধারণা হয় না। জগৎকে ছাড়িয়া দিলে ঈশ্বরের অস্তিত্ব কি, তাহা খুঁজিয়া পাওয়া কঠিন। তিনি আবার ইহাও বলিয়াছেন যে, জগৎ ঈশ্বরের স্বেচ্ছাকৃত অথচ আকস্মিক উত্তেজনার ফল না হইয়া এক অনন্ত এবং অপরিবর্ত্তনীয় বিধানে নিয়ন্ত্রিত। তাহাই যদি হয়, তাহা হইলে আর ঈশ্বরের কর্তৃত্ব কোথায়? অনন্ত এবং অপরিবর্ত্তনীয় নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া ঈশ্বর যখন সৃষ্টি না করিয়াই পারিলেন না, তখন সৃষ্টি কালেরই কোন মুহূর্ত্তে আরব্ধ হউক আর অনাদি অনন্ত হউক, উভয়স্থলেই পূর্ব্বনির্দ্দেশের অস্তিত্ব সূচিত হয়। সেন্ট আগষ্টাইন্ এই বিরোধ অনুভব করিয়াই অবশেষে মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন যে, ঈশ্বরের ইচ্ছায় এবং সৃষ্টির স্বাভাবিক নিয়মে প্রভেদ নাই, যে নিয়মে জগৎ-যন্ত্র চালিত হইতেছে, তাহাই ঈশ্বরের স্বাধীন ইচ্ছা এবং সৃষ্টির মূলে সেই ইচ্ছা বিদ্যমান। বস্তু মাত্রের মূলে যদি ঈশ্বরের প্রভাব বা স্বাধীন ইচ্ছা স্বীকৃত হয়, তাহা হইলে ত সকল বিবাদ মিটিয়া যায়, সৃষ্টির চরমোদ্দেশ্য সম্বন্ধেও বিচারের প্রয়োজন হয় না। তাহা হইলে বলিতে হইবে যে, ঈশ্বর আত্মসত্তা-ব্যতীত অপরাপর বস্তুর সৃজন করিয়াছিলেন, যেহেতু এইরূপ করাই তাঁহার অভিপ্রেত ছিল। মোটের উপর ইহাই সারতত্ত্ব, কেন না, মানববুদ্ধি ইহার অধিক আর অগ্রসর হইতে পারে না। তবে, এস্থলেও একটী প্রশ্নের উদয় হইতেছে। ঈশ্বর স্বেচ্ছাপূর্ব্বক দ্রব্যগুলিকে কেন ভিন্ন ভিন্ন আকার প্রকার দিয়া, পরস্পর হইতে এত বিভিন্নরূপে সৃজন করিলেন? সেন্ট আগষ্টাইনের উত্তর এই যে, অংশ সমূহের বৈসাদৃশ্য আছে বলিয়াই সমগ্র জগতের সামঞ্জস্য হইয়াছে, ব্যষ্টিভাবেই জগতের সৌন্দর্য্য ও শৃঙ্খলার বিকাশ। প্লেটোরও এইরূপ বিশ্বাস ছিল।

স্মৃতি, জাগরণ ও চিন্তা হইতে আত্মার উপলব্ধি হয়। যদি কেহ আমার অস্তিত্বে সন্দেহ করেন, তবে তাহার সেই সন্দেহ সহজেই দূর হইতে পারে। সন্দেহের অর্থ চিন্তা। আমি সন্দেহ করি, অতএব আমি আছি (Cogi.s. ergo sun)। আমি যদি সন্দেহই করিতে পারি, যদি ভাবিতেই পারি, 'আমি আছি কিম্বা নাই', তবে আর আমার অস্তিত্বে সন্দেহ কি? আমার অস্তিত্বের সহিত আমার আত্মার অস্তিত্বও সূচিত হয়। আমার সহিত আমার আত্মার অস্তিত্ব ত বুঝা গেল, কিন্তু আত্মা যে কি বস্তু, তাহা বুঝা কঠিন। কাহারও কাহারও মতে আত্মা অগ্নি, বায়ু কিম্বা ঈশ্বর হইতে সমুৎপন্ন এবং স্মৃতি বুদ্ধি ও চিন্তা আত্মারই ধর্ম্মরূপে বিদ্যমান। কেহ কেহ আবার আত্মাকে শোণিত অথবা মস্তিষ্কের সহিত অভিন্ন মনে করেন। তাঁহাদের মতে, চিন্তা বা ধারণা দৈহিক পুষ্টির ফলরূপে গণ্য। যিনি যাহাই বলুন, এই সকল উক্তি ভিত্তিহীন। তাঁহাদের এই সব অনুমান যদি সত্যই হইবে, তবে আত্মা অগ্নি কিম্বা বায়ু, অথবা রক্ত কিম্বা মাংস হইতে উৎপন্ন বলিয়া আমরা অনুভব করিতে পারি না কেন? আত্মা অগ্নি বায়ু কিম্বা অপর কোন পার্থিব উপাদানে গঠিত হইলে নিশ্চয়ই সেই উপাদানের প্রত্যক্ষ জ্ঞান জন্মিত এবং তাহা আমাদের আত্মসম্বিতের সহিত অবিচ্ছিন্ন থাকিত; অর্থাৎ যখনি আমরা আত্মার সম্বন্ধে চিন্তা করিতাম, তখনই তাহা যে কি উপাদানে গঠিত, তাহাও বুঝিতে পারিতাম। এরূপ

না হওয়ার কারণ, আত্মা যাবতীয় জ্ঞাত ও পার্থিব বস্তুর স্বরূপ হইতে ভিন্ন। ইহার প্রমাণ, রেখা, বিন্দু, দৈর্ঘ্য, বিস্তার প্রভৃতি বহু অপার্থিব বস্তুর জ্ঞানও আত্মার সহিত বিদ্যমান রহিয়াছে।

স্বীকার করা গেল, আত্মা পার্থিববস্তুজাত হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন, পার্থিব কোন উপাদানেই তাহার গঠন হয় নাই। কিন্তু, তাহা হইলে আত্মার উৎপত্তি কি? বহু চিন্তাশীল ব্যক্তি, এমন কি, খ্রীষ্টানদিগেরও অনেকে আত্মাকে ঈশ্বর-বিনিঃসৃত বলিয়া বিশ্বাস করেন। আত্মার পক্ষে এতখানি গৌরব শোভা পায় না। ইহাকে ঈশ্বর-বিনিঃসৃত না বলিয়া ঈশ্বর সৃষ্ট বলা যাইতে পারে এবং এ কারণ, অপরাপর সৃষ্ট বস্তুর ন্যায় আত্মারও প্রারম্ভ বা আদি স্বীকার করিতে হইবে। আত্মা ঈশ্বর সৃষ্ট, কিন্তু ঈশ্বর যে কি উপায়ে তাহার সৃষ্টি করিলেন, তাহাতে মতভেদ আছে। কেহ কেহ বলেন, ঈশ্বর কেবল আদি মানব আদমের আত্মারই সৃষ্টি করিয়াছিলেন, অপরাপর আত্মা আদি আত্মার বিকৃত-ভাব এবং বংশ-পরম্পরালব্ধ! অর্থাৎ সন্তানের আত্মা জন্মের সহিত পিতামাতার আত্মা হইতেই উদ্ভূত হয়। এই ধারণাকে "ট্রাডুসিয়ানিজম্" কহে। এইমত যতই সমীচীন হউক, ইহা জড়বাদ-সম্মত; কেন না, ইহাতে আত্মার দেহ সংক্রমণ এবং বিভাজ্যতা স্বীকৃত হইতেছে। অনেকে আবার এমনও বিশ্বাস করেন যে, দেহ সৃষ্টির পূর্ব্বেই আত্মাগুলির সৃষ্টি হইয়াছিল. আদম পাপগ্রস্ত হওয়ার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তাহারা জড়-দেহে প্রবেশ করিতে পারে নাই। আদি মানব যখন জ্ঞান-বৃক্ষের ফল ভক্ষণ করিয়া ধরাধামে পাপের সঞ্চার করিলেন, তখন হইতেই পূর্ব্ব জন্মকৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত হেতু আত্মার দেহরূপ বন্ধনের প্রয়োজন হইয়াছে। প্লেটোও এই মতের পক্ষপাতী ছিলেন। কিন্তু এমতও যে সমীচীন নহে, তাহার প্রমাণ পূর্ব্বজন্ম সম্বন্ধে স্মৃতির অভাব প্লেটো বলিয়াছিলেন, নিরক্ষর মূর্খকেও যদি প্রশ্ন করা যায় ও জিজ্ঞাস্য বিষয় বুঝাইয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলে তাহারাও গণিতের বহু গভীর তত্ত্বের পরিচয় দিতে পারে। অতএব, এই সকল লোক বর্ত্তমান জীবনের পূর্ব্বেও বিদ্যমান ছিল এবং প্রশ্ন দ্বারা এইরূপ তাহাদের মনে যে সকল ধারণা জাগরিত হইল সেগুলি প্রকৃত পক্ষে তাহাদের পূর্ব্ব জন্মের স্মৃতি। কিন্তু, এ সম্বন্ধে যখন আমরা সক্রেটিসের প্রশ্নপদ্ধতি স্মরণ করি, তখন আর প্লেটোর সিদ্ধান্তে বিশ্বাস হয় না। লোক মাত্রই সাধারণ জ্ঞানের অধিকারী। দেখিয়া শুনিয়া ভালমন্দ বিচার সম্বন্ধে যে জ্ঞান জন্মে, তাহাই সাধারণ জ্ঞান। সক্রেটিস্ যেভাবে প্রশ্ন করিতেন, তাহাতে লোকের মনে সাধারণ জ্ঞানের উদয় না হইয়া পারিত না। তাহার ফলে, তাহারা অনেক জটিল বিষয়ের যথাযথ উত্তর দিত। মানুষ মাত্রেই অল্পাধিক যে জ্ঞানের পরিচয় দেয়, তাহাকে যদি প্রাক্তন সংস্কাররূপে গ্রহণ করিতে হয়, তাহা হইলে প্লেটোর মতানুসারে পৃথিবীর যাবতীয় মনুষ্যই পূর্ব্বজীবনে গণিতবেত্তা ছিল, বলিতে হইবে। বস্তুতঃ বর্ত্তমানে বিশাল জনসঙ্ঘের তুলনায় গণিতশাস্ত্রজ্ঞের সংখ্যা এত কম যে, তাহাতে সকল লোক ত দূরের কথা, সামান্য কয়েকজনমাত্র পণ্ডিত ছিল কি না, সন্দেহ। প্লেটো যদি গণিতবিদ্যায় সকল লোককে পণ্ডিত না বলিয়া অল্প কয়েকজনকে বলিতেন, তাহা হইলে সম্ভবতঃ তাঁহার এই মত

পূর্ব্বজন্মবাদের অধিক উপযোগী হইত। আত্মার উৎপত্তি সম্বন্ধে তৃতীয় মত এই যে, দেহসৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গেই আত্মারও সৃষ্টি হয়। এই মত অপর দুই মতের অপেক্ষা আধ্যাত্মিকতার অধিক অনুকূল; তবে, ইহাতে আদি পাপ যে মানবমাত্রেই বর্ত্তিয়াছে, এই যুক্তির সার্থকতা থাকে না।

আত্মা অবিনাশী। প্রজ্ঞাই আত্মার অবিনাশিত্বের কারণ। প্রজ্ঞা আত্মার সহিত অনন্ত সত্যের সম্বন্ধ স্থাপন করে। বাস্তবিক আত্মা এবং সত্য উভয়ের একই অর্থ, উভয়ের মূলে একই সত্তার উপলব্ধি হয়। আত্মার যদি বিনাশ সম্ভব হইত, তাহা হইলে তাহার সহিত সত্যেরও চিরবিচ্ছেদ ঘটিত। আমরা ক্ষুদ্র নগণ্য জীব, আমাদের সাধ্য কি যে, আমরা আত্মা ও সত্যের দুশ্ছেদ্য বন্ধন শিথিল করি, অথবা উভয়কে পরস্পর হইতে বিযুক্ত করিয়া দেই। আর, সত্যস্বরূপ ভগবানই বা তাঁহার প্রকৃতির বিরুদ্ধে কেন এই বিচ্ছেদ ঘটাইবেন? তদ্ব্যতীত, পবিত্র ও অপার্থিব বস্তু সমূহের বিভাবন কিম্বা বিচিন্তন জড়দেহের ধর্ম্ম নয়। মোট কথা, প্রজ্ঞাধর্ম্ম বলিয়াই আত্মার বিনাশ বা মৃত্যু নাই এবং সেই জন্যই ভৌতিক দেহের অবসানে আত্মার অবসান হয় না।

পূর্ব্বজন্মবাদের পরিহার হইতে মনে হয় যেন সেণ্ট্ আগষ্টাইন্ মানবের স্বভাবসিদ্ধ সংস্কারগুলির অস্তিত্বে অবিশ্বাস করিতেন, বস্তুতঃ তাহা ঠিক নয়। কেননা, তিনি ইহাও বলিয়াছেন যে, ঈশ্বর মানবাত্মার সৃষ্টিকালে তাহাতে কতকগুলি শাশ্বত ধারণা প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন এবং সেই ধারণাগুলি বুদ্ধি ও সঙ্কল্পের মানসিক ভিত্তি বা হেতুরূপে গণ্য। স্বাভাবিক সংস্কারে অবিশ্বাস করুন, আর না করুন, সংস্কারগুলিকে তিনি পূর্ব্বজন্মের স্মৃতি বলিতে চান নাই। স্বাভাবিক সংস্কার পূর্ব্বজন্মের স্মৃতি বা নিদর্শন হইলে, মানবগণ ঈশ্বরের সৃষ্ট না হইয়া প্রত্যেকেই এক একজন ঈশ্বর হইত। পূর্ব্বজন্মবাদের মতে মানবজীবন অনাদি বলিয়া গণ্য, একারণ সেণ্ট্ আগষ্টাইন এই মতের পক্ষপাতী ছিলেন না। স্বাভাবিক সংস্কার সম্বন্ধেও তিনি ক্রমান্বয় সন্দিহান হন, কেন না, তাহাতে সংস্কারগুলি মূল হইতেই আত্মার সহজাত, কাহারও দ্বারা আত্মায় নিবদ্ধ হয় নাই, এরূপ ধারণাও আসিতে পারে। বস্তুতঃ, মানুষকে যতদূর সম্ভব ক্ষুদ্র ও হেয় করিয়া ঈশ্বরের মহিমা বাড়ানই তাঁহার লক্ষ্য ছিল। মানুষের কোন শক্তি বা স্বাধীনতাই নাই, পরন্তু তাহার যাহা কিছু আছে, তৎসমস্তই ঈশ্বর-প্রদত্ত। ঋষি পল্ বলিয়াছেন, "মানব, তোমার এমন কি ধন আছে, যাহা তুমি অপরের নিকট পাও নাই? তোমার সবই যদি পর-প্রদত্ত ধন হয়, তবে কিসের এত অহঙ্কার?" মানবের সব ধনই যদি পর-প্রদত্ত হয়, কিছুই যদি নিজস্ব না হয়, তাহা হইলে আর তার মনুষ্যত্ব কোথায়? মানব তাহা হইলে অভাব ও অসামর্থ্যেরই প্রতিমূর্ত্তি।

মানবাত্মা ক্রিয়াবিমুখ, গ্রহণশীল এবং চিন্তাপরায়ণ, এতদ্ব্যতীত তাহার কোন শক্তি বা সামর্থ্য নাই। ইন্দ্রিয় সাহচর্য্যে আত্মা যেমন পারিপার্শ্বিক দ্রব্যের জ্ঞানলাভ করে, অপার্থিব বা অতীন্দ্রিয় বস্তুর জ্ঞানও সেইরূপ আধ্যাত্মিক আলোকের সহায়তায় সঞ্চিত হয়। আধ্যাত্মিক বা পারমার্থিক জ্যোতিই ঈশ্বর এবং তাহা আমাদের অন্তর্নিবিষ্ট। এই জ্যোতিঃ যদি আন্তরিক না হইয়া বাহ্যিক

হইত, তাহা হইলে ঈশ্বর জড়ধর্ম্মী বা বিস্তারাদি গুণের অধীন হইতেন। ইহা আমাদের অন্তরেই বিরাজমান, অথচ আত্মা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক। এই জ্যোতির অভ্যন্তরেই আমরা বস্তুসমূহের অপরিবর্ত্তনীয় ও অনন্ত রূপের সত্তা (প্লেটোর আদর্শ) অনুভব করি। ঈশ্বর স্বয়ংই বস্তুজাতের অনন্ত ও অপরিবর্ত্তনীয় রূপ, অর্থাৎ তাহাদের উৎপত্তি, বৃদ্ধি ও স্থিতি সম্বন্ধীয় অলঙ্ঘ্য নিয়ম। তিনি আদর্শের আদর্শ বা পরমাদর্শ, এবং এই নিমিত্ত তিনি ঋত বা সনাতন সত্য। ঋত বাহিরের বস্তু নয়, অদৃশ্য জগতের অন্তর্নিহিত গূঢ় সত্তা; সে সত্তার সন্ধান জড়ে পাওয়া অসম্ভব।

সেণ্ট্ আগষ্টাইনের আদর্শবাদ প্লেটোর আদর্শবাদেরই রূপান্তর। নবযুগের দার্শনিক মালব্রাঞ্চের (Malbranche) ঈশ্বরদর্শন (Vision in God) এবং শেলিংয়ের মানসদর্শনও (Intellectual intuition) এই ঋতের অনুকূল। শেষ জীবনে সেণ্ট্ আগষ্টাইন্ ধর্ম্মতত্ত্বে মন দেন, এবং তাহার ফলে, যে অধ্যাত্মিক আলোকের তিনি এত গৌরব করিতেন, তাহাও তাঁহার নিকট নিষ্প্রভ হইয়া যায়। পতনের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত প্রজ্ঞাই ঈশ্বরের প্রতিনিধিরূপে যাবতীয় অলৌকিক ও অনৈসর্গিক পদার্থের সহিত মানবের সম্বন্ধ স্থাপন করিত; পতনের পর হইতে প্রজ্ঞা পাপকলুষিতা হইয়াছে, আধ্যাত্মিক আলোক অন্ধকারে মিশিয়া গিয়াছে। প্রজ্ঞা অবিকৃত থাকিলে ঈশ্বরকে যিশুখ্রীষ্টরূপে জন্ম লইতে হইত না, কেবল প্রজ্ঞাবলেই পতিত মানবজাতির উদ্ধার হইত। কিন্তু তাহা হয় নাই, এবং হয় নাই বলিয়াই বাণী বা আদেশ (Logos) দেহে পরিণত হইয়াছে। পাপসংস্পর্শে জ্ঞানালোক নিষ্প্রভ হওয়ায় আলোকমাত্রের মূল কারণ ঈশ্বরও ইন্দ্রিয়ের সাহায্য লইয়াছিলেন এবং তাহাতেই মানব চর্ম্মচক্ষে তাঁহার দর্শন পাইয়া পবিত্র হইয়াছিল। দার্শনিক আগষ্টাইনের আদর্শবাদ, ধার্ম্মিক আগষ্টাইন্ কর্ত্তৃক এইরূপে প্রত্যক্ষবাদে পরিবর্ত্তিত হয়।

সেণ্ট্ আগষ্টাইনের নৈতিক সংস্কার সমূহেরও মাঝে মাঝে পরিবর্ত্তন দেখা যায়। এ সম্বন্ধে যখনই তিনি প্লেটোর চিন্তায় অনুপ্রাণিত হইতেন, তখনই তাঁহার নীতিজ্ঞান সাধারণ ধর্ম্মপ্রচারকদিগের সংস্কার ছাড়াইয়া বহু উর্দ্ধে উঠিত। তিনি ল্যাক্টাণ্টিয়াসের প্রতিবাদে বলিয়াছিলেন যে, ধর্ম্ম বা কর্ত্তব্যজ্ঞানই জীবন-সাফল্যের উপায়, সুখের ভিতরে তাহার অনুসন্ধান বিড়ম্বনা। তিনি আবার টারটুলিয়ান্‌কে* লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন, নৈতিক নিয়ম সুখ দুঃখের বাধ্য নয়, ইহা নিরপেক্ষভাবে সর্ব্বাবস্থায় সকলের উপর স্বীয় প্রাধান্য বিস্তারিত করে। ঋত, সৌন্দর্য্য ও মঙ্গল ঐশী ইচ্ছার ফল নহে, পরন্তু এই তিন গুণেই ঐশী ইচ্ছার উৎপত্তি। ঈশ্বর জগতের একমাত্র নিয়ামক, তাই বলিয়াই কি নৈতিক বিধি শুভকর কখনই নয়। বৈদিক শুভকর বলিয়া, এই বিধি আমরা যাঁহার নিকট প্রাপ্ত হইয়াছি, তাঁহাকে (ঈশ্বরকে) অন্তরের সহিত ভক্তি করি। অসৎ কর্ম্ম অসৎ বলিয়াই তদনুষ্ঠানে ঈশ্বরের নিষেধ রহিয়াছে, নিষেধ থাকাতে যে অসৎ তাহা নয়।

* (১৬০-২২০ খ্রীঃ অঃ) ইঁহার পিতা একজন রোমান্ সৈন্যাধ্যক্ষ ছিলেন। টারটুলিয়ান্ লাটীন ধর্ম্মযাজকদিগের মধ্যে সর্ব্ব প্রথম বলিয়া গণ্য এবং উত্তর আফ্রিকার কার্থেজে বাস করিতেন। ইনি একজন উগ্রপ্রকৃতি লোক ছিলেন।

সেণ্ট্ জেরোমী * ও সেণ্ট্ ক্রিসস্তোম্ অনৃতকে ক্ষমা করিয়াছেন, শুধু ক্ষমা করা নয়, তাহার অনুমোদনও করিয়াছেন। হিপ্পোর বিশপ (আগষ্টাইন্) বলেন, "সেকি, অনৃতের আবার অনুমোদন! তাহা হইলেও পাপেরই প্রশ্রয় দেওয়া হইল!"

(ক্রমশঃ)

শ্রীদিগ্বিজয় রায়চৌধুরী।

গ্রাম্য স্বায়ত্তশাসন বিল এবং ব্যবস্থাপক সভায় গ্রামের প্রতিনিধি।

বাঙ্গালা দেশে যে সকল ইংরেজ এবং ইউরেশিয়ান বাস করেন, তাঁহাদের সংখ্যা ২৫,৫০০ এবং ২১,০০০ মাত্র। ইঁহাদের মধ্যে আবার জাতি-বিচার আছে, ইঁহারা জাতিকে ইংরাজীভাষায় ডিনমিনেসন্ (denomination) বলেন। জাতিভেদে পুরোহিত স্বতন্ত্র। শুধু তাহা নয়; উপাসনার (দেবার্চ্চনার) গির্জা বা মন্দির স্বতন্ত্র। শুধু তাহা নয়; মৃতদেহ সমাধির স্থান স্বতন্ত্র। হিন্দুদের জাতি অনুসারে পুরোহিত স্বতন্ত্র; বৈশ্যের ব্রাহ্মণ সুবর্ণবণিকের যাজন করেন না। কিন্তু এ সকলেই জাতিগণ বিশেষে একই কালীমন্দির অথবা একই মদনমোহনের মন্দিরে পূজা করেন; এবং মরিলে একই শ্মশানে নীমতলা ঘাটে মৃতদেহের সৎকার করেন। খ্রীষ্টানদের কতিপয় জাতির নাম, যথা, রোমান ক্যাথলিক, আংগ্লিকান, মেথডিষ্ট, ব্যাপটিষ্ট, প্রেসবেটেরিয়ান্, লুথারান, কংগ্রীগ্রেশানিষ্ট, ইত্যাদি। লোকসংখ্যানুসারে রোমান কাথালিক (১৭,০০০) আংগ্লিকান (২১,০০০) প্রেসবেটেরিয়ান্ (৩৫০০) এবং ব্যাপটিষ্ট (১,০০০) এই কয়েক জাতির লোকই প্রধান। ব্রাহ্মণ নমঃশূদ্রে যেমন অপ্রণয়, রোমান কাথালিকের সঙ্গে অন্যান্য জাতির তেমনি ভাব।

এখন ইংরেজেরা বলিতেছেন যে, হিন্দুদের মধ্যে নানাপ্রকার জাতি রহিয়াছে; এজন্য পরস্পরের মধ্যে প্রণয় নাই। সুতরাং ব্যবস্থাপক সভার সভ্য মনোনয়ন করিতে হইলে কোন এক স্থানের সকল জাতির উপযুক্ত ব্যক্তিরা মিলিয়া সভ্য নির্ব্বাচন করিতে পারিবে না। কিন্তু প্রত্যেক জাতির লোক স্বতন্ত্র ভাবে আপন আপন জাতির প্রতিনিধি নিযুক্ত করিবে।

ইংরেজেরা নিজের বেলায় তাঁহাদের denomination বা জাতি-অনুসারে স্বতন্ত্রভাবে সভ্য নির্ব্বাচন করিবেন না, কিন্তু হিন্দুদের সময়ে প্রত্যেক জাতি, স্বতন্ত্রভাবে সভ্য নির্ব্বাচন জন্য তাঁহারা বড়ই জেদ করিতেছেন। এজন্য বিলাতে (লণ্ডনে) ইণ্ডোব্রিটিশ (Indo-British) নামে এবং কলিকাতায় European association নামে নূতন সভা গঠিত হইয়াছে। যে সকল ইংরেজ এতদিন বঙ্গদেশে বসবাস করিয়া আসিয়াছেন, তাঁহারা বাঙ্গালীদিগকে যত বিদ্বেষ করেন, তাহা যথেষ্ট নয় বলিয়া মান্দ্রাজের "মান্দ্রাজ

---

* (৩৪০-৪২০ খ্রী অঃ) বাইবেল গ্রন্থের একজন প্রসিদ্ধ অনুবাদক ও টীকাকার। ইনি সন্ন্যাস-জীবনের বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন এবং দশ বৎসর ইতস্ততঃ পরিভ্রমণের পর ৩৮৬ খ্রীষ্টাব্দে বেথেলহেমের মঠে যাইয়া বাস করেন।

মেইল" (Madras Mail) নামক দৈনিক কাগজের ভারতবিদ্বেষী সম্পাদক ওয়েল্‌বী সাহেবকে কলিকাতায় আনা হইয়াছে।

কলিকাতার মিউনিসিপালিটির কর-দাতারা জাতি-বর্ণ নির্ব্বিশেষে একত্রিত হইয়া চিরকাল সভ্য নির্ব্বাচন করিতেছেন। নির্ব্বাচিত সভ্যের মধ্যে কেহ হিন্দু, কেহ মুসলমান, কেহ ইংরেজ, কেহ ইহুদী, কেহ আর্মেনিয়ান্। ওয়েলবী সাহেব বলিতেছেন যে, নির্ব্বাচনের তালিকা এখন আর এক থাকিবে না। খ্রীষ্টিয়ান, হিন্দু, মুসলমান এবং ইহুদীর জন্য স্বতন্ত্র তালিকা করিতে হইবে এবং সকল সম্প্রদায়ের লোক স্বতন্ত্রভাবে সভ্য মনোনয়ন করিবেন। এই প্রকার স্বতন্ত্রভাবে সভ্য মনোনয়ন করিলে হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে এবং ব্রাহ্মণ ও রাজবংশীর মধ্যে ভবিষ্যতে সমান স্বার্থ এবং সমান উদ্দেশ্য হইতে পরস্পরের মধ্যে কোন প্রকার আত্মীয়তা বৃদ্ধির সুযোগ হইবে না। আধুনিক ইংরেজ ও খ্রীষ্টিয়ানেরা, হিন্দু ও মুসলমানে এবং ব্রাহ্মণ ও নমঃশূদ্রে, পরস্পরের সান্নিধ্যে আসিয়া দেশের কাজে একপ্রাণ হয়, তাহা একেবারেই পছন্দ করেন না। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, ইংরেজ পাদরী এবং দেশী পাদরী পর্য্যন্ত এই সুর ধরিয়াছেন।

হিন্দু-মুসলমান মিলিয়া, কায়স্থ-কৈবর্ত্ত মিলিয়া, বৈদ্য বেণিয়া মিলিয়া এই কলিকাতা সহরে কত স্কুল কলেজ একত্রে চালাইতেছেন, কত কারবার একত্রে করিতেছেন, তাহার সংখ্যা নাই। ব্রাহ্মণ, বেণে ও বাগ্দী মিলিয়া একই রেলগাড়ীতে চড়িয়া কত দেশ ভ্রমণ করিতেছেন, এবং একই ঘাটে কাশী, বৃন্দাবন, পুরী, কালীঘাট প্রভৃতি সকল তীর্থস্থানে স্নানাদি করিতেছেন, এবং গয়াতে পিণ্ডদান করিতেছেন। কেহ তো কোন দিন ব্রাহ্মণ-বেণে-বাগদীর কলহের কথা শোনেন নাই। আজ চল্লিশ বৎসর হইতে এই কলিকাতা সহরে খ্রীষ্টিয়ান হিন্দু, মুসলমান ইহুদী প্রভৃতি সকল সম্প্রদায়ের লোক মিলিয়া সভ্য নির্ব্বাচন করিতেছেন। এই কথা লইয়া সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে বিরোধ হইয়াছে, তাহা ত কেহ কখনই শোনেন নাই। গবর্ণমেণ্ট বাছিয়া বাছিয়া শুধু বড়লোকদিগকে ধনী লোকদিগকে নির্ব্বাচক শ্রেণী করিয়াছেন। যে পাড়ায় ৫০০০ পাঁচ হাজার ট্যাক্‌স্-দাতা আছেন, সেখানে ৪৫০০ বাদ দিয়া শুধু ৫০০ পাঁচশত মাত্র নির্ব্বাচক শ্রেণীতে রাখিয়াছেন। এজন্য কলিকাতা মিউনিসিপালিটিতে লক্ষপতি না হইলে কাহারও সভ্য হইবার সুযোগ হয় না। এই দোষ খ্রীষ্টিয়ানের নয়, হিন্দুর নয়, অথবা মুসলমানের নয়, দোষ শুধু গবর্ণমেণ্টের। যাহাদের ট্যাক্‌সের পরিমাণ অল্প, তাঁহাদিগকেও নির্ব্বাচন করিবার অধিকার দেওয়া উচিত।

এই নির্ব্বাচনের কথা লইয়া ব্রাহ্মণ-বেণের মধ্যে বা কায়স্থ-কৈবর্ত্তের মধ্যে কোন সহরে বা মিউনিসিপালিটিতে বিরোধ হয় নাই। এখন শোনা যাইতেছে যে, সহরের বাহিরে পল্লীগ্রাম সমূহের লোকেরা প্রাদেশিক ব্যবস্থাপকসভায় এবং গ্রাম্য সমিতি-সমূহের সভ্য নির্ব্বাচন করিবেন। এতদুপলক্ষে নূতন কথা উঠিয়াছে। গ্রাম্যসমিতির সভ্য নির্ব্বাচন ক্ষমতা কাহাকে দেওয়া হইবে এবং যাহারা ব্যবস্থাপক সভার গ্রামবাসীদের প্রতিনিধি হইবেন, তাঁহাদিগকে কাহারা নির্ব্বাচিত করিবেন? গ্রামের লোকেরা রোডসেস দেয়; জমিদারেরা তাহা আদায় করিয়া জিলার কালেক্টর

সাহেবদিগকে দেন, এবং কালেক্টর সাহেব তাহা ডিষ্ট্রিক্টবোর্ডে পাঠাইলে ডিষ্ট্রিক্টবোর্ড এই টাকা গ্রাম্য-সমিতি সমূহে বণ্টন করেন। গ্রামবাসীদের প্রদত্ত রোডসেস্ দশহাত হইয়া আবার গ্রাম্য-সমিতির হস্তে আসিয়া পৌঁছে। গ্রাম্য সমিতির দ্বারা রোডসেস্ আদায় কার্য্য সহজে হইতে পারে কি না, তাহা এখন বিচার করিবার সময় হয় নাই। রোডসেস্ ভিন্ন গ্রামবাসীরা চৌকীদারী ট্যাক্স্ এবং অন্যান্য চাঁদা দেয়। তাহা গ্রাম্য সমিতি কর্ত্তৃক আদায় হয়। যদি ভবিষ্যতে পানীয় জলের পুষ্করণী খনন বা সংস্কার, যাতায়াত জন্য পথ-বাট, এবং পড়াশুনার জন্য পাঠশালার ব্যবস্থা করিতে হয়, তজ্জন্য গ্রাম্য-সমিতি গ্রামবাসীদের নিকট যথেষ্ট টাকা আদায় করিবেন। সুতরাং গ্রাম্য-সমিতির উপর তদন্তর্গত গ্রামবাসীদের মঙ্গলামঙ্গল সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিবে। এ হেন গ্রাম্যসমিতির সভ্য নির্ব্বাচন করিবার ক্ষমতা জাতি নির্ব্বিশেষে করদাতা মাত্রকেই দেওয়া উচিত। তাহা হইলে করদাতারা গ্রাম্যসমিতির যে সকল সভ্য অপদার্থ বা অযোগ্য, তাহাদিগকে আর দ্বিতীয়বার নিযুক্ত করিবে না।

গ্রামে ছোট বড় সকল জাতির লোকই বাস করে, এবং প্রায় সকলেই রোডসেস্ বা অন্য কোন প্রকার ট্যাকস্ দেয়। চাষের জমিজমা না রাখুক, বাস্তুভিটাত সকলেই রাখে, এবং তাহার জন্য খাজানা-সেস দেয়। ইহার উপর দুই চার আনা করিয়া চৌকীদারী ট্যাকস্ হইতে অতি অল্প লোকেই অব্যাহতি পায়। তবে কি প্রত্যেক করদাতাকে গ্রাম্যসমিতির সভ্য নির্ব্বাচনের ক্ষমতা দেওয়া উচিত।

আমাদের বিবেচনায়, তাহাই করা উচিত। সেস্, ট্যাকস্ দেওয়ার সময় আমি গরীব হইলেও আমার বড় আদর, আর সভ্য নির্ব্বাচন করিবার সময় আমি কেহই নই, এ কেমন বিচার? যদি আমার দেয় ট্যাকসের পরিমাণ অতি সামান্য ও তুচ্ছ হয়, তবে আমাকে তাহা হইতে অব্যাহতি দেও না কেন?

কেহ কেহ বলিবেন যে, যে ব্যক্তি যে পরিমাণে ট্যাকস্ দিবেন, তিনি ততটা ভোট দিবার ক্ষমতা পাইবেন। যে ব্যক্তি ৪০ টাকার জমা রাখেন এবং ১॥০ রোডসেস দেন, তাঁহার এক আনা প্রদানকারীর বিশ-গুণ ভোট দিবার ক্ষমতা থাকিবে। এই নিয়ম করিলে গ্রামবাসী শতেক লোকের মধ্যে ৫।৬ ধনী লোকজনের প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। করের পরিমাণ যাহাই হউক, প্রত্যেক করদাতার নির্ব্বাচন ক্ষমতা সমান থাকা উচিত। বিদ্যার প্রভাব, সচ্চরিত্রের প্রভাব, ধনের প্রভাব, সৎকুলে জন্মের প্রভাব সমাজে আপনা হইতেই বিস্তারলাভ করে। এই প্রভাব বজায় রাখিবার জন্য নির্ব্বাচনের ক্ষমতা হ্রাস বৃদ্ধি করিবার আবশ্যকতা নাই। যাহারা গরীব, তাহাদের একমাত্র ক্ষমতা নির্ব্বাচন। এজন্য ধনী ও দরিদ্র, গ্রামবাসী সকলকেই সমান ক্ষমতা দেওয়া উচিত। যদি তাহা না করা হয়, তবে গ্রাম্যসমিতি হইতে গ্রামবাসী সকলের উপকার না হইয়া গ্রামের ছোট বড় সকল লোকের টাকায় শুধু কয়েক জন বড় লোকেরই উপকার হইবে। তাঁহাদের বাড়ীর নিকট পথঘাট পরিষ্কার হইবে, তাঁহাদের পুত্রগণকে সুবিধাজনক পাঠশালায় শিক্ষাপ্রণালী প্রবর্ত্তিত হইবে, এবং চৌকীদারেরা তাঁহাদেরই ঘর-দুয়ারের পাহারা

দিবে। তাঁহাদিগকে যে সকল গ্রামবাসী মনোনয়ন করে না, তাহাদিগকে অবহেলা করিলেও তাহাদিগকে অবহেলিত গ্রামবাসী করদাতারা পদচ্যুত করিতে পারিবেন না।

গ্রামের প্রধান প্রধান ব্যক্তিদিগকে নির্ব্বাচন ক্ষমতা দিলে যে সকল ব্যক্তি সভ্য নির্ব্বাচিত হইবেন, গ্রামবাসী সমুদয় করদাতাকে নির্ব্বাচন ক্ষমতা দিলে সম্ভবতঃ তাঁহারাই নিযুক্ত হইবেন। তথাপি এতদুভয়ে গ্রাম্যসমিতির সভ্যদের ব্যবহারে অনেক তারতম্য হইবে। যাহারা নির্ব্বাচন করিবে, তাহাদের স্বার্থ বিনা কারণে অবহেলা করিলে তাহারা ভবিষ্যতে কখনই এই সকল সভ্যের জন্য ভোট দিবেন না। সুতরাং সভ্য সকলের উপকার হয়, এমনি করিয়া কাজ করিবেন।

গ্রামে ভদ্রলোকেরাই বর্দ্ধিষ্ঠ। নিজের প্রাধান্য বজায় রাখিতে চেষ্টা করা তাঁহাদের পক্ষে স্বাভাবিক। কিন্তু এই প্রাধান্য বজায় রাখার জন্য তাঁহারা যদি অপর লোকদিগকে নির্ব্বাচন অধিকার হইতে বঞ্চিত রাখিতে চেষ্টা করেন, তাহা হইলে স্বায়ত্তশাসনের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইবে। ভদ্রলোকেরা অন্যান্য লোকদিগকে নানাপ্রকারে নির্ব্বাচন-অধিকার হইতে বঞ্চিত রাখিবেন, এই আশঙ্কা করিয়াই ভারতবাসী ইংরেজের দল, ইংলণ্ডে প্রতিগত এংগ্লো-ইণ্ডিয়ানের দল তারস্বরে গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করিতেছেন যে প্রতি গ্রামে, প্রতিথানায়, ও প্রতি সবডিভিজনে অথবা প্রতিজিলায় হিন্দুদের এক এক জাতি স্বতন্ত্রভাবে তাহাদের প্রতিনিধি নিযুক্ত করুক।

খ্রীষ্টিয়ানেরা হিন্দুদের জাতিতে-জাতিতে যত বিদ্বেষ আছে বলিয়া মনে করেন, আমাদের বিশ্বাস,তাহা অনেকটা কল্পনামাত্র। এই ৫০।৬০ বৎসর স্কুল কলেজে, এক গুরুর নিকট একাসনে বসিয়া এক পাঠ পড়িয়া ব্রাহ্মণ-বেণের মধ্যে, বৈদ্য-বারুইর মধ্যে, কায়স্থ-কামার মধ্যে, সদ্‌গোপ-মাহিষ্যের মধ্যে, এমন কি, ব্রাহ্মণ-সাহার মধ্যে অসদ্ভাব সর্ব্বপ্রকার দূর হইয়াছে। কোনও দুইজাতির মধ্যে বিবাহ হয় না সত্য; কিন্তু একজাতির সকলের মধ্যেও বিবাহ হয় না। ব্রাহ্মণ মধ্যে বৈদিক, রাঢ়ি ও বারেন্দ্র ভেদ রহিয়াছে। কায়স্থ মধ্যে রাঢ়ি, বারেন্দ্র, বঙ্গজ ভেদ রহিয়াছে। বিবাহে জাতি বিচার করা হয়; শ্রাদ্ধ-দৈবশান্তি সময়ে ব্রাহ্মণ ডাকা হয়। এইজন্য জাতিমূলক কোন বিদ্বেষভাব বাঙ্গালা দেশে নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না। সাহা, শুঁড়ি, নমঃশূদ্র, পোদ, রাজবংশী জাতির বালক ও যুবকদের সঙ্গে ব্রাহ্মণ কায়স্থাদি জাতির বালক ও যুবকদের সঙ্গে একস্কুলে পড়িতেছে, এক গাড়ীতে চড়িতেছে, একসঙ্গে আমোদ আহ্লাদ করিতেছে। মন্বাদি শাস্ত্রকারদের সময়ে অথবা মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবের পূর্ব্বে বঙ্গদেশে জাতিবিদ্বেষ ছিল কি না, জানি না। কিন্তু এ কথা ঠিক, এখন আর বঙ্গদেশে হিন্দুসমাজে জাতি জাতিতে কোন বিদ্বেষ নাই। তাহার প্রমাণ ব্রাহ্মণ-বৈদ্য-কায়স্থ-বহুল জমিদার সভার বুলি (British Indian Association) প্রতিনিধি হইয়া সুবর্ণ বণিক্‌-তিলক রাজা হৃষিকেশ লাহা, তৈলিক কুলশোভন মহারাজা সর্ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী প্রভৃতি বড়লাট সভার সভ্য পদে মনোনীত হইতেছেন। উকীল, ব্যারিষ্টার, মোক্তার নিযুক্ত করিবার সময় কেহই জাতি-বিচার করেন না। স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের

শিক্ষক ও অধ্যাপক নিয়োগ সময়ে সকলেই জাতি ভুলিয়া গুণ দেখেন। নতুবা ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্যান্য জাতির এত লোক শিক্ষাবিভাগে স্থান পাইতেন না। রোগ প্রতীকার জন্য শুধু বৈদ্যবংশোদ্ভব ডাক্তারদিগকেই লোক ডাকেন না। দেশে দলাদলি যথেষ্ট আছে, তাহা এক জাতির মধ্যেই দেখা যায়। অথবা কোন গ্রামে দুই দল থাকিলে প্রত্যেক দলেই সকল জাতির লোকই দৃষ্ট হয়। ব্রাহ্মণের সহিত কায়স্থের, অথবা কায়স্থের সঙ্গে কৈবর্ত্তের বিরোধ এখন অতি অল্পই দৃষ্ট হয়।

বিশেষতঃ গ্রাম্য-সমিতির সভ্য মনোনয়ন উপলক্ষ করিয়া জাতিতে জাতিতে বিরোধ হইবার কোন কারণ দৃষ্ট হয় না। যে ব্যক্তি গ্রামবাসীদের প্রদত্ত সেস্ ট্যাক্স্ প্রভৃতি গ্রামের উপকারার্থ ব্যয় করিবেন বলিয়া গ্রামবাসীদের বিশ্বাস আছে, তাহারা তাঁহাকেই মনোনীত করিবে। যদি গ্রামবাসী ট্যাক্স্‌দাতা মাত্রেই এই মনোনয়ন ক্ষমতা পায়, তাহা হইলে দল বাঁধিবার সম্ভাবনা যত কম, জনকয়েক বর্দ্ধিষ্ণু ব্যক্তিকে এই মনোনয়ন ক্ষমতা দিলে দল বাঁধিবার সম্ভাবনা, তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক।

যাঁহারা এক আধটুকু ইংরেজী শিখিয়াছেন, বিশেষতঃ অধিকাংশ সময় সহরে বাস করেন, তাঁহারা অনেকে মনে করেন যে, গ্রামবাসী পণ্ডিত, জমিদার, লাখেরাজ, জোতদার, আয়মাদার, দোকানি, মহাজন, চাষী ও কামার কুম্ভকার যেন মানুষের মধ্যেই গণ্য নয়। শিক্ষিতম্মন্য শ্রেণীর সাহায্যনিরপেক্ষ হইয়া যাহারা বাঙ্গলাদেশে ২০।২৫ কোটি টাকা মূল্যের পাট এবং ততোধিক মূল্যের ধান, গুড় ইত্যাদি উৎপাদন করিতেছে এবং যাহাদের প্রদত্ত খাজনা হইতে জমিদারবর্গ এবং জ্ঞাতি কুটুম্ব এবং উকীল, মোক্তার প্রভৃতি সপরিবারে পরমসুখে ইংরেজ রাজত্বে বাস করিতেছেন, এই ৪ কোটী ২০ লক্ষ লোক মানুষের মধ্যেই নয়, আর যে সকল লোক সহরে বাস করিতেছেন বা ইংরেজী শিখিয়াছেন, তাঁহারাই ঐ সকল গ্রামবাসীদের নেতা, উপদেষ্টা, পরিচালকের উপযুক্ত। আমাদের বিবেচনায়, সহরবাসী এবং অল্পবিদ্য ইংরেজীভাষায় শিক্ষিত সম্প্রদায়ের এই ধারণা অত্যন্ত ভ্রান্ত। ইংরেজী পড়িয়া মাষ্টারি, কেরাণীগিরি, ওকালতি, ডাক্তারি শিক্ষা হয় সত্য। কিন্তু সেই সঙ্গে সঙ্গে গ্রামবাসীদের সহিত কি প্রকার ব্যবহার করিতে হয়, ইংরেজী পড়িয়া অনেকেই দাম্ভিকতাবশতঃ তাহার অনুপযুক্ত হইয়া পড়েন। ইংরেজী শিক্ষিত ব্যক্তিদের দাম্ভিকতা এত বেশী যে, তাঁহাদের সঙ্গে ইংরেজীজ্ঞানশূন্য গ্রামবাসীদের একসঙ্গে কোন কাজ করা অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে। বিশেষতঃ গ্রাম্যসমিতির হস্তে যে সকল কার্য্যের ভার অর্পণ করা হইবে বা হইয়াছে, তজ্জন্য ইংরেজী জানার কোন আবশ্যকতা নাই। গ্রামে পাঠশালা স্থাপন, শুভঙ্করীমূলক অঙ্কশাস্ত্র শিক্ষা, পুষ্করিণী খনন বা সংস্কার, পথ ঘাট পরিষ্কার, নালা, খাল দিয়া জলনিঃসরণ প্রভৃতি কার্য্যে নগর-বাস-লোলুপ ইংরেজী শিক্ষিতের সাহায্য না পাইলে কোন কাজ ঠেকিয়া থাকিবে না।

বাঙ্গালাদেশে ২৪টী জিলা, ৮৪টী সব-ডিভিসন, ৩৮০ থানা, এবং প্রায় ১,২০,০০০ গ্রাম এবং ১২০টী সহর। গ্রামবাসীর সংখ্যা ৪,২৫,০০,০০০ এবং সহরবাসীর সংখ্যা প্রায় ৩০,০০,০০০। হারাহারি প্রত্যেক গ্রামে

৩৫২ জনের এবং প্রত্যেক সবডিভিসনে ৫ লক্ষ লোকের বাস।

প্রত্যেক গ্রামেই মণ্ডল রহিয়াছে। কম-বেশ এক সহস্র লোক বাস করে, এমন এক বা ততোধিক গ্রামের সকল জাতির সেস্ দাতা লোকেরা মিলিয়া ২ জন মণ্ডল নিযুক্ত করুক। প্রাচীন শাস্ত্রে "গ্রামণী" বা গ্রামের নেতা বলিয়া যে উল্লেখ পাওয়া যায়, আধুনিক "মণ্ডল" তাহার প্রতিশব্দ বলিয়া বোধ হয়। যদি এই প্রকারের ১০টী গ্রাম সমবায় ২০ জন মণ্ডল নির্ব্বাচন করেন, তাহা হইলে দশ সহস্র লোকের প্রতিনিধি ২০ জন মণ্ডল লইয়া এক গ্রাম্য সমিতি গঠিত হইতে পারে। এক সবডিভিসনে যদি পাঁচ লক্ষ লোকের বাস হয়, তাহা হইলে ৫০টী গ্রাম্যসমিতি এবং ১,০০০ এক হাজার মণ্ডল পাওয়া যাইবে। সম্প্রতি বাঙ্গালার ব্যবস্থাপক সভায় যে গ্রাম্য স্বায়ত্তশাসন-বিল পেশ হইয়াছে, তদনুসারে প্রত্যেক উপবিভাগে (সবডিভিসনে, ২টী বা ৩টী) সার্কেল বোর্ড থাকিবে। সার্কেল বোর্ড হইতে গ্রাম্যসমিতির কার্য্যকলাপ পরিচালক ও পরিদর্শন করা হইবে। এক জন সবডিপুটী কালেক্‌টার আপাততঃ প্রত্যেক সার্কেল বোর্ডকে সাহায্য করিবেন। এই সকল সার্কেল বোর্ডের উপর সমগ্র জিলায় একটী ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড থাকিবে। যদি এক জিলায় ১৫ লক্ষ লোকের বাস হয়, তাহা হইলে প্রায় ১৫০ গ্রাম্য সমিতি এবং ৯টী সার্কেল বোর্ড হইবে। এখন প্রত্যেক উপবিভাগে যে লোকাল্ বোর্ড আছে, তাহা উঠিয়া যাইবে। এখনকার লোকাল্ বোর্ডের উপর যেরূপ ডেপুটী বাবুদের ক্ষমতা আছে, গ্রাম্যসমিতির উপর তেমন ক্ষমতা থাকিবে না।

আমার বিবেচনায়, সার্কেল বোর্ডের এবং ডিষ্ট্রিক্‌ট বোর্ডের অন্ততঃ বার আনা বা তিন চতুর্থাংশ লোক গ্রাম্যসমিতির সভ্য কর্তৃক মনোনীত হওয়া উচিত। অবশিষ্ট সভ্য জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেব অথবা কমিশনার সাহেব নিযুক্ত করিতে পারেন।

একটী কথা অবশেষে বলিতেছি। কিন্তু কথাটা সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর। হিন্দুদের ন্যাসন্যাল কংগ্রেস এবং মুসলমানদের মুস্‌লেম লীগ্ মিলিয়া স্থির করিয়াছেন যে, বঙ্গদেশে ব্যবস্থাপক সভা হইতে আরম্ভ করিয়া Village Committee বা সামান্য গ্রাম্য-সমিতি পর্য্যন্ত যে সকল সরকারী সভা ও সমিতির সভ্য দেশের লোক দ্বারা মনোনীত হইবেন, ঐ সভ্যদের ৩ জন হিন্দু হইলে অন্ততঃ ২ জন মুসলমান হইবেন। বাঙ্গালার হিন্দু মুসলমানের এই চুক্তি বা সন্ধি-ভঙ্গ করিবার উপায় নাই।

যদি বাঙ্গালার ব্যবস্থাপক সভার ১৬০ জন সভ্য হয়, এবং তন্মধ্যে ৩২ জন গবর্ণমেণ্ট কর্তৃক মনোনীত এবং অবশিষ্ট ১২৮ দেশের লোক দ্বারা মনোনীত হয়, তাহা হইলে বাঙ্গালার ৮৪ উপবিভাগ হইতে ৮৪ জন সভ্য গ্রাম্যসমিতির সভ্য কর্তৃক নির্ব্বাচিত হওয়া উচিত। অবশিষ্ট ৪৪ জন ৩০ লক্ষ সহরবাসী, ইংরেজ বণিক্, জমিদার, বিশ্ববিদ্যালয় এবং বিশিষ্ট মুসলমানেরা মনোনীত করুন্। নির্ব্বাচিত সভ্যদের অন্ততঃ দুই তৃতীয়াংশ (অর্থাৎ ॥৶১০।—) গ্রামবাসী কর্তৃক নির্ব্বাচিত হওয়া উচিত। এই ৮৪ জন সভ্যের মধ্যে ৩৪ জন মুসলমান হইবেন।

গ্রামবাসীরা সাবধান। চুপ করিয়া থাকিলে পরে অনুতাপ করিতে হইবে। সহরবাসীরা যেন তাহাদিগকে বঞ্চিত না করেন।

শ্রীশ্রীনাথ দত্ত।

সুখ।

যে সুখ পায়, সেই দুঃখ পায়। যে দুঃখ পায় না, সে সুখও পায় না।

এই দুইর মধ্যে কোন্‌টী ভাল? এক কৌটা সুখের মধু, দুঃখের গরলরাশিকে পরাস্ত করে। এক মুহূর্ত্তের জন্ত মনুষ্য অনন্ত কাল জলাঞ্জলি দিতে পারে। এ জন্ত মনুষ্য সুখ-দুঃখ-মিশ্রিত জীবনকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে।

সুখ দুঃখের প্রসূতি প্রবৃত্তি। প্রবৃত্তি-পরিচালিত মনুষ্য ও মনুষ্যের দেবতাগণ। নিবৃত্তি কল্পনায় জন্মে না। মানস সরোবর-সম্ভূত সে সরোরুহ। প্রবৃত্তির পরিচালনায় কর্ম্ম, কর্ম্ম হইতে সুখ বা দুঃখ। নিবৃত্তি নিষ্কাম, তাহা হইতে কর্ম্ম জন্মে না।

কর্ম্মের স্থিরতা নাই, আবিলতা বিস্তর, অথচ কর্ম্মফলের অখণ্ডনীয়তা দেবগণেরও অপরিহার্য্য। সে কর্ম্মের সুখ দুঃখে হৃদয় আমূল আলোড়িত হয়। আত্মার অনন্ত স্থায়িত্বের সহিত কর্ম্মের অস্থিরতা তুলনা করিলে বায়ুর একটী কণামাত্র বিচলিত হয় না—অথচ সেই কণামাত্রে অনন্ত জীবন পঙ্কিল হয়। নিষ্প্রবৃত্ত সন্ন্যাসী তুঙ্গ গিরি-শিখরে স্থির নীল শান্তিময় আকাশে উপবেশন করিয়া মানব সন্তানকে জল বুদ্‌বুদের অন্বেষণে দুরুস্তর পঙ্কে নিমজ্জিত হইতে দর্শন করেন। ক্রোধ, ভয়, প্রীতি অনন্ত জীবনে কতবার প্রবর্ত্তিত হইবে। অথচ যেটী বর্ত্তমান আছে, সেইটীর উপর মনুষ্য আপনার সর্ব্বস্ব পণ করিতে পারে। যেটী আছে, সেটী না থাকিলে সে দিশাহারা হয়।

প্রবৃত্তির প্রয়াস এক মুহূর্ত্তে চরিতার্থ হয়। সেই মুহূর্ত্তের সুখের পশ্চাতে অনন্ত জীবনের অবশ্যম্ভাবী দুঃখ। তাহা পরিহার করিবার শক্তি নাই জানিয়াও মনুষ্য প্রবৃত্তির পরাধীনতা স্বীকার করে।

কর্ম্মের পরিসর অল্প। কর্ম্ম আপনাকে ও প্রতিবেশী কয়েকজনকে অনুশাসন করে। আপনার ভিতর, আপনার অনন্ত পুরুষ। অসীম জগতের অল্প জীব আমার কর্ম্মে অনুপ্রাণিত হয় না—কিন্তু আমার জ্ঞানে হইতে পারে। আমার কথা, আমার মত, আমার আদেশ, আমার উপদেশ আমাকে ও আমার প্রতিবেশীকে অতিক্রম করিয়া অনন্ত জগতে উছলিয়া পড়ে। চিত্র বা কবিতা মূর্ত্তি বা অক্ষর কর্ম্ম নহে, জ্ঞান। আমরা যাহা কিছু শিখি অন্যের জ্ঞান হইতে, কর্ম্ম হইতে নহে। সে জ্ঞান নিরীহ কর্ম্মের মত সংক্রামক নহে। তোমার ইচ্ছা হয়, তুমি জ্ঞানকে উপেক্ষা করিতে পার, ইচ্ছা হয় গ্রহণ কর। কিন্তু তোমার অনিচ্ছাসত্বেও কর্ম্ম তোমার দেহ মন গরলিত করিবে।

প্রবৃত্তি বয়স-রেখা অতিক্রম করে না। যতদূর পৃথিবীর ধূলী বায়ুবলে তাড়িত হয়, প্রবৃত্তির ঊর্দ্ধগামিতা ততদূর। সত্য বটে, প্রবৃত্তির সীমার মধ্যে শ্যামলা ধরণী, তরুলতা, গোলাপ ও মালতী, কোকিল ও মলয় আছে, কিন্তু সেখানে তারকার রেখা নাই, সেখানে মন্দাকিনী বহে না। যেখানে ভাগীরথীর আবিলময় তরঙ্গ, সে নিম্নভূমি; যেখানে অনাবিল, সে হিমালয় বক্ষ। জীবনের আরম্ভ জগতের ঊর্দ্ধদেশে, জীবনের সংগ্রাম প্রবৃত্তি-পরিতাড়িত সমতল ক্ষেত্রে। মানব সুখের জন্ত লালায়িত। শান্তি ভিন্ন সুখ নাই। যাহা উদ্বেগপূর্ণ, যাহা হৃদয় আলোড়িত করে, তাহা আর কিছু হইতে পারে, সুখ নহে। তাহাতে শান্তি নাই। শান্তি আবেশময়, চিরনিদ্রিত। তাহাতে সংগ্রাম নাই, আলোক নাই। রক্ত গরম করিবার জন্য লোকে মদ খায়, মদ মাতালের আবশ্যক। উৎসাহের নেশা যাহারা করে, উৎসাহ না থাকিলে জীবনকে মৃত্যু বলিয়া অনুভব করে, তাহারা কর্ম্মের জন্য প্রয়াস করে। তাহারা লোভ মোহ ক্রোধের অবলম্বন অন্বেষণ করে। স্ত্রী সন্তান কামনা করে, একে তৃপ্ত না হইয়া আরও চাহে। নির্জ্জনতা সহ্য করিতে পারে না, সমিতি খুঁজিয়া বেড়ায়। একটী পদার্থে অনিমেষ মন সংযোগ তাহাদের প্রবৃত্তি-বিরুদ্ধ, অবলম্বন যত অধিক হয়;

ততই তাহারা আপনাদিগকে সুখী বলিয়া গণ্য করে। মানুষের শরীর রক্তে গঠিত, প্রবৃত্তি শোণিত-সঞ্জাত। রক্তমাংসের ক্ষমতা যতক্ষণ অতিক্রম না করিতে পারা যায় ততক্ষণ জ্ঞানের মহিমা অনুভূত হয় না। কুয়াসা ও মোহ আদরণীয় হয়।

প্রকৃতির সৌন্দর্য্য ধূলিমিশ্রিত। ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য সৌন্দর্য্য স্থূল। স্থূলতার সৌন্দর্য্য অকিঞ্চিৎকর। কবি, চিত্রকর ও ভাস্করাচার্য্য স্থূলতা অতিক্রম করেন। প্রকৃতিকে যে যত অতিক্রম করেন, তিনি তত উচ্চদরের মনীষী।

ইন্দ্রিয়ের স্থূলতা অতিক্রম করিতে প্রবৃত্তির সাধ্য নাই। নিবৃত্তি স্থূলতাকে অতিক্রম করিয়া যে সৌন্দর্য্য উপভোগ করে, প্রবৃত্তিপরায়ণ বিলাসীর ভাগ্যে তাহা ঘটিয়া উঠে না। এ জন্য প্রবৃত্তি তাহার অস্তিত্ব স্বীকার করে না। প্রবৃত্তি দেবতাকে স্থূল প্রতিমায় পরিণত করে, নিবৃত্তি রূপ ও আকার উড়াইয়া দিয়া অরূপ বলিয়া ধ্যান করে। নামের যে মধুরতা, তাহা প্রবৃত্তির অনুভব করিবার সাধ্য নাই। নিবৃত্তি একটী নামের মধ্যে বিশ্বের সকলই দেখিতে পায়। সে যাহাকে ভালবাসে, সে তাহার যে সৌন্দর্য্য দেখে, তাহা ভালবাসায় নাই—তাই সে তাহার জন্য পাগল।

প্রবৃত্তি বর্ত্তমানে ব্যস্ত, নিবৃত্তি অতীত ও ভবিষ্যৎপরায়ণ। বর্ত্তমান তাঁহার অতীত, কারণ ও ভবিষ্যৎ কার্য্যের চিন্তনীয়। প্রবৃত্তির ভবিষ্যদ্বাণী করিবার ক্ষমতা নাই। যাহা কেহ দেখে না, শুনে না, যাহার কেহ তত্ত্ব লয় না,—নিবৃত্তি তাহারই অনুসরণ করেন। কারণ, তাঁহার চক্ষে সেই গুলিই উজ্জ্বল। সকলের নিকট যাহা উজ্জ্বল বা সুন্দর, তাহা তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করে না। লোকে যাদুকর বা প্রতারক বলিয়া তাহাকে উপহাস করে!

মানুষের সৃষ্টি করিবার সাধ্য নাই। সৃষ্টি-কার্য্যের যে অদ্ভুত আনন্দ, তাহা মনুষ্যের ভাগ্যে ঘটে না। কিন্তু সৃষ্টির পরেই অধিকার। সৃষ্টি প্রথম, অধিকার দ্বিতীয়। নিবৃত্তিপরায়ণ মনুষ্য অজ্ঞেয় অগ্রাহ্য অসীমতার মধ্যে নূতন নূতন আবিষ্কার করেন। উন্নতি নিবৃত্তিমূলক। সকলে নিবৃত্তিপরায়ণ হইতে পারে না। নিবৃত্তির পদাঙ্কচারী প্রবৃত্তি। গুরুশিষ্যের সম্বন্ধ চিরকাল থাকিবে। একজন শিখাইবে, দশজন শিখিবে। একজন রোপিবে, দশজনে তাহার ফলভোগ করিবে। একজন আবিষ্কার করিবে, দশজনে তাহা দেখিবে। আজ গুরু যেখানে, কাল শিষ্য সেখানে উপস্থিত হইতে পারেন। আজ নিউটন যাহা জানেন, কাল মাঠের রাখাল তাহা শিখিতে পারে; কিন্তু সেই কালিকার দিনে গুরু আবার কতখানি অগ্রসর হইয়াছেন। তাঁহার গুরুত্ব চিরদিনই বজায় থাকিবে। যেদিন সকলই গুরু হইবে, শিষ্য থাকিবে না, সকলেই শিখিবে, কেহ শিখিবে না—সেইদিন উন্নতির পথ অবরুদ্ধ হইবে।

যেদিন নিবৃত্তি উপেক্ষিত হইবে সকলে প্রবৃত্তিপরায়ণ হইবে, যেদিন জ্ঞান ভাবের রাজ্য হইতে দূরীভূত হইবে, তুফানে শান্তি থাকিবে না. আঁধার ধ্রুবতারা ঢাকিয়া দেখিবে. যেদিন প্রতিমা ঘরে ঘরে প্রতিষ্ঠিত হইবে, অরূপ অলস শূন্যে পর্য্যবসিত হইবে, যেদিন কাব্য, ইতিহাস, চিত্র প্রতিকৃতিতে হইবে, সেইদিন প্রলয় ঘটিবে।

সুখ! সুখ! সত্যই কি সুখ জলবুদ্‌বুদ্‌, দূর হইতে দেখিতে সুন্দর, পাঁচ রঙ্গে খেলা করে—হাত বাড়াইলেই ভাঙ্গিয়া যায়? না। ভালবাসায় সুখ নাই. স্নেহে সুখ নাই, বিজয়ে সুখ নাই, সুখে দুঃখ নাই। প্রকৃতি মার্গে সুখ ঘটে না। উত্তেজনা ঘটিতে পারে, মত্ততা জন্মিতে পারে, নেশা হয় কিন্তু সুখ মিলে না; সুখ খুঁজিতে পারে না। সুখ একটী পদার্থ নহে, আত্মার অবস্থা বিশেষের নাম সুখ। অন্তরেন্দ্রিয়ের ক্রমবিকাশে সে অবস্থা ঘটিবে। তাহা অচল, অনন্তস্থায়ী, তাহা শূন্যগর্ভ নহে। প্রবৃত্তির নিকট যাহা আশা করি, প্রবৃত্তির নিকট তাহা পাওয়া যায় না, নিবৃত্তির আশ্রয়েই তাহা পাওয়া যায়। প্রবৃত্তি শোক জহরের আকর। Happiness is the last state of being—it is centred in a soul to which all passion is unknown.

শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র রায়চৌধুরী।

গয়ার ইতিহাস।

হিন্দুযুগ।

গয়া জেলার ইতিহাস খুব প্রাচীন। ইহা সাধারণতঃ চারি ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। ১। বৈদিক ও হিন্দুযুগ, ২। বৌদ্ধযুগ, ৩। মুশলমান কাল এবং ৪। ইংরাজাধিকার। ইংরাজ ও মুশলমানাধিকারের গয়ার ঐতিহাসিক বিবরণ যাহা পারিয়াছি, তাহা পরে লিপিবদ্ধ করিব। এখন প্রাক্‌বৌদ্ধযুগ এবং তদ্‌ পরে বৌদ্ধ যুগের কথা বর্ণন করিয়া এই ঐতিহাসিক প্রবন্ধ শেষ করিব।

প্রথম আলোচ্য যে বৌদ্ধ ও পৌরাণিক যুগের "মগধে"র পূর্ব্বে কি নাম ছিল এবং কবেই বা ইহা ব্রাহ্মণাবাসে পরিণত হয়? এ বিষয় আলোচনা করিবার বস্তু। কোন কোন ব্যক্তি বলেন যে, "মগধ" নামকরণ রাজা জরাসিন্ধুর সময় হইতে হইয়াছে। ইহা কিন্তু আমার সমীচীন বলিয়া মনে হয় না, কারণ বাল্মীকি কৃত রামায়ণে আমরা "মগধ" নামোল্লেখ দেখিতে পাই। পুরাণ 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায় এ বিষয়ে ছেলেবেলায় একটী লেখকের এসম্বন্ধে গবেষণা পূর্ণ প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলাম বলিয়া আমার মনে হয়। ১২৮৮ সালের 'ভারতী' পত্রিকায়ও গয়া সম্বন্ধে একটী প্রবন্ধ পাঠ করি। আমাদের বৈদিক, স্মার্ত্ত ও পৌরাণিক সাহিত্যে মগধের উল্লেখ দেখিতে পাই না। "বর্ত্তমানে আমরা যাহাকে মগধ বলি", তাহা পূর্ব্বে ঐ নামে খ্যাত ছিল না। অতি প্রাচীন কালে মগধ দেশ বনাকীর্ণ ও অসভ্য অনার্য্যগণের বাস ছিল। আর্য্যগণ পশ্চিম হইতে অর্থাৎ মধ্য এশিয়া খণ্ড হইতে বহু সহস্র সহস্র বৎসর পূর্ব্বে ভারতের পশ্চিমাংশে পঞ্চনদধৌত দেশে প্রথম উপনিবেশ স্থাপন করেন। ক্রমশঃ ক্রমশঃ তাঁহারা পূর্ব্বদিকে অগ্রসর হইয়া অনার্য্য অসভ্য বর্ব্বরগণকে তাড়াইয়া তাহাদের অধ্যুষিত দেশ অধিকার করিয়া বসবাস স্থাপন করেন। দিগ্বিজয়ী প্রাচীন আর্য্যগণ অনার্য্যগণের দেশকে খুব ঘৃণার চক্ষে দেখিতেন এবং সেইরূপ আখ্যায় তাহাদের দেশকে আখ্যাত করিতেন। সেই জন্য মগধের প্রাচীন "কীকট" নাম আমরা দেখিতে পাই। বায়ুপুরাণে যথা:—

"কীকটেষুগয়া পুণ্যা নদী পুণ্যা পুনঃ পুনা"।

গয়া জেলার মধ্যে বুদ্ধগয়া, গয়া, রাজগৃহ, চ্যবণাশ্রম, গৌতমাশ্রম প্রভৃতি তীর্থ বহু পরের সৃষ্টি ও রচিত বলিয়া আমাদের মনে হয়। যদি মগধে গমন অভিমত হইত, তাহা হইলে স্মৃতিতে আমরা নিম্নরূপ বচন দেখিতে পাইতাম না। "অঙ্গ, বঙ্গ কলিঙ্গেষু সৌরাষ্ট্রে মগধেষু চ বিনা যাত্রাং দ্বিজোগচ্ছন্ পুনঃ সংস্কারমর্হতি"। জরাসন্ধের পিতা বৃহদ্রথ চণ্ডকৌশিক ঋষিকে বলিয়া ছিলেন, "আমি মগধের রাজা"। স্মৃতি সূত্রগ্রন্থ, আরণ্যক প্রভৃতিতে "মগধ" নাম দেখিতে পাওয়া যায়। তাহা হইলে জরাসন্ধ অপেক্ষা "মগধ" আখ্যা বহু প্রাচীন বলিয়া মনে হয়। পণ্ডিত কালীবর বেদান্তবাগীশ এবং বাবু রামদাস সেন ইহাই বলেন। কীকটে আর্য্য উপনিবেশ স্থাপন হইতে "মগধ" নামের যে সূত্রপাত হইয়াছে, তাহা

বেশ জানা যায়। কীকট দেশের উত্তর ভাগটীই মগধ নামে অভিহিত হইতে লাগিল; যে অংশে অনার্য্যগণের বাস এবং যে অংশে আর্য্যগণ উপনিবেশ স্থাপন করেন নাই, তাহা পূর্ব্ববৎ কীকট নামেই অভিহিত হইতে থাকিল। যথা:—"দক্ষিণোত্তর ক্রমেণৈব......তদন্তর্মাগধোভবেৎ।" এই বিভাগ-বাক্য দ্বারা বেশ অনুমান হয় যে, উত্তরভাগেই আর্য্যেরা প্রথমে আশ্রয় করিয়াই বসবাস আরম্ভ করিয়াছিলেন। চণ্ডকৌশিকি ঋষি সত্যযুগে বর্ত্তমান ছিলেন। তাহা হইলে বেশ দেখা যাইতেছে যে, কীকটের "মগধ" নাম সত্য যুগের পূর্ব্বে প্রদত্ত হইয়াছিল। সত্যযুগের কাল নির্ণয় আবশ্যক। তাহা মোটামুটি কোটী কোটী বৎসর পূর্ব্বের কথা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এ সম্বন্ধে পরে আলোচনা করিয়াছি। আমার বোধ হয়, ইহার বহু বৎসর পরে "পিণ্ডং দত্বা গয়াং ব্রজেৎ" স্মৃতি বচন গয়া তীর্থ বলিয়া পরিচিত হইলে রচিত হইয়া থাকিবে। গয়ায় পিণ্ড দান হিন্দুর পক্ষে খুব পুণ্যময় কার্য্য।

বায়ু পুরাণের অন্তর্গত গয়া-মাহাত্ম্য নামক খণ্ডে গয়াক্ষেত্রে পিণ্ড দানের উপকারিতা বর্ণিত হইয়াছে। এ সম্বন্ধে যৎসামান্য যাহা বক্তব্য, তাহা ১২৯৮ সালের 'ভারতী'তে আমি বুদ্ধগয়া এবং মধুগয়া বা চৈত্র সংক্রান্তির মেলা শীর্ষক দুইটী প্রবন্ধে কীর্ত্তন করিয়াছি। গয় নামক অসুর সহস্র বৎসর তপস্যা করিয়া ব্রহ্মার নিকট বর প্রাপ্ত হয় যে, যে তাহাকে স্পর্শ করিবে, সেই সশরীরে স্বর্গে গমন করিবে। শেষে সে অত্যন্ত দুর্দ্দান্ত হইয়া দেবগণকে নিসূদন করে, কিন্তু তাহাকে কেহই মর্দ্দিত করিতে পারে না। শেষে বিষ্ণু-প্রমুখ দেবগণ তাহাকে যজ্ঞ করিয়া বলিলেন যে, তাহাই হইবে, কিন্তু তোমার শরীরের উপর যজ্ঞ করিতে হইবে; গয় তথাস্তু বলিয়া শয়ন করিলে সর্ব্ব দেবতাগণ তাহার শরীরের উপর অধিষ্ঠান করিলেন এবং যম তাহার বিশাল মস্তকে একটী প্রস্তর স্থাপন করিলেন। ইহাতেও সে স্থির হইল না, নড়িতে লাগিল। তৎপর দেবগণ ক্ষীরোদ তীরে গমন করিয়া বিষ্ণুর শরণাপন্ন হইয়া আরাধনা করিলে তিনি সন্তুষ্ট হইলেন এবং দেবগণের প্রার্থনায় গয়ায় আসিয়া গদার আঘাতে তাহাকে চিরতরে স্থির করিয়া তাহার মস্তকে পাদ অর্পণ করিয়া অধিষ্ঠিত হইলেন। গয়াসুর শেষ বর প্রার্থনা করে যে, সকল দেবতা চিরকালের জন্য তাহার দেহের উপর বিরাজমান থাকিবেন এবং যে এই স্থানে পিতৃলোকের পিণ্ডদান করিবে, সে স্বর্গে গমন করিবে। বিষ্ণু তথাস্তু বলিয়া তাহার মস্তকে পাদ রোপণ করিলেন। সেই অবধি আজ পর্য্যন্ত ভারত ও ভারতীয় ঔপনিবেশিক দ্বীপপুঞ্জের যাবতীয় হিন্দু গয়া তীর্থে পিণ্ডদান করিয়া থাকে। গয়াতীর্থে কোন দিন লুপ্ত-পিণ্ড হয় না, এইরূপ বিষ্ণুর বর আছে; যে দিন এইরূপ হইবে সেই দিন গয়াসুর পুনরায় সশরীরে উত্থিত হইবে; সেই জন্য যে দিন যাত্রীর পিণ্ড না পড়ে, গয়ালী পাণ্ডাগণ সেই দিন পিণ্ড দিয়া থাকেন। গয়াক্ষেত্র পঞ্চক্রোশী। গয়াসুরের মস্তকটীর উপর "বিষ্ণু পাদপদ্ম" নামক হিন্দুর মহান তীর্থ স্থানটী নির্দ্দিষ্ট। স্থানীয় ব্রাহ্মণগণ পূর্ব্ব কথিত যজ্ঞে দান গ্রহণ করিতে অস্বীকৃত হওয়ায় ব্রহ্মা চৌদ্দ গোত্রীয় চৌদ্দশত চৌরাশী ঘর তীর্থ ব্রাহ্মণ (গয়ালী) কল্পিত করিলেন। এ বিষয়ে পরে বিশদরূপে বিবৃত করিয়াছি। তাহার উল্লেখ আমরা ভূ

ভারত এবং অন্য পুস্তকে দেখিতে পাই :— "সর্ব্বে দ্বিজাঃ কাণ্যকুব্জাঃ মাগধং মাথুরং বিনা। মাগধো ব্রহ্মণা পূর্ব্বং কল্পিত এবচ। বরাংস্তু ধর্ম্মেণ মাথুরো জায়তে তথা।" এই মাগধ ব্রাহ্মণই বর্ত্তমান যুগের গয়ালী ব্রাহ্মণ। ইহাদের স্ত্রী বিয়োগ হইলে চিরজন্ম অপরিণীত থাকিতে হয়, কাজেই ইহাদের মধ্যে পাপ বেশী এবং সেই জন্য গয়ালী বংশ কালক্রমে নির্ব্বংশ হইয়াছে। গয়ালীগণ ব্রহ্মার দান গ্রহণ করিলে অপরের শ্রাদ্ধকালীন দান গ্রহণে নিষিদ্ধ হইলেন। তাহার পর তাঁহারা যমের নিকট ছলক্রমে স্বর্ণ দান গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। যমরাজ শ্রাদ্ধান্তে পানের মধ্যে স্বর্ণখণ্ড দিয়া ভোজনান্তে "তাম্বুল দানের" সময় ঐরূপ দিয়া গয়ালীগণকে ছলে দান গ্রহণ করাইলে তাঁহারা ব্রহ্মা কর্ত্তৃক অভিশপ্ত হন। শেষে অনেক অনুনয় বিনয়ের পরে ব্রহ্মা পিতামহ গয়ালীগণের উপর সন্তুষ্ট হইয়া বর দিলেন যে, যাত্রীদত্ত দানে তাহাদের জীবিকা নির্ব্বাহিত হইবে। সেই অবধি গয়ালীগণ গয়ার তীর্থ-ব্রাহ্মণ; চৌবেগণ মথুরার তীর্থ ব্রাহ্মণ!! ডাঃ রাজেন্দ্রলাল মিত্র বলেন যে, এই গয়াসুর-ঘটিত আখ্যায়িকাটী বৌদ্ধ ধর্ম্মের উপর ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের প্রাধান্য জ্ঞাপক রূপক। (see Dr. Rajendra Lala Mitra's Buddha Gaya P P. 9—78) ষ্টার্লিং সাহেব তাঁহার উড়িষ্যার ইতিহাস গ্রন্থে নাভি গয়া তীর্থের কথা আমূল বর্ণিত করিয়াছেন। কটকের সন্নিকট জাজপুরে নাভিগয়া স্থিত। গয়ার তীর্থস্থান রূপে পরিণতি আমরা অতি প্রাচীনকাল হতেই দেখিতে পাই; কিন্তু ডাঃ সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ ও মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী-প্রমুখ পণ্ডিতগণ "অযোধ্যা মথুরা মায়া কাশিকাঞ্চি অবন্তিকা, পুরী দ্বারাবতী চৈব সপ্তৈতে মোক্ষদায়িকা" শ্লোকের উপর নির্ভর করিয়া বলেন যে, উক্ত শ্লোক অষ্টম শতাব্দীতে বৌদ্ধ ধর্ম্মের খুব প্রাদুর্ভাবের সময় রচিত হয় এবং ঐ শ্লোকে গয়ার স্পষ্ট উল্লেখ না থাকায় ঐ তীর্থ পালরাজাগণের রাজত্বের সময় ভারতময় প্রসিদ্ধ তীর্থরূপে খ্যাতি পায় নাই। কিন্তু পুরাণ স্মৃতি এবং আরণ্যক ও উপনিষদ গ্রন্থে গয়ার উল্লেখ আমরা দেখিতে পাই। উপনিষদাদি গ্রন্থগুলি মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী-কথিত উপরোক্ত শ্লোকাপেক্ষা বহু প্রাচীন। পিতামহ ব্রহ্মা বহু প্রাচীনকালের লোক বা দেবতা ছিলেন। তাঁহার কাল নির্ণয় করা বড় সহজ ব্যাপার নহে। তাহা হইলেই মোটামুটীরূপে দেখা যাইতেছে যে, হিন্দু শাস্ত্র মতে গয়াতীর্থ অতি প্রাচীনকালে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। শাস্ত্রী মহাশয়ের গবেষণাপূর্ণ মতটী আমরা সহজে গ্রহণ করিতে পারি না। গয়া সহরে এবং জেলার মধ্যে যে সকল প্রস্তর ফলক, তাম্রশাসন, মন্দির, বৌদ্ধ স্তূপের ভগ্নাবশেষ, দেবালয়, চৈত্যাদি দেখা যায়, তাহা নগরের প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে বহুল প্রমাণদায়ক হইলেও আমরা তাহার মধ্যে অধিকাংশই হিন্দু যুগের নির্ম্মিত বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি না। হিন্দু যুগের architecture বড় দেখা যায় না। সবই প্রায় বৌদ্ধ যুগের বলিয়া মনে হয়। বৌদ্ধ ও বর্ত্তমান ইতিহাস পরে বলিব। এখন হিন্দু কালটা এবং শ্রাদ্ধ পদ্ধতিটী যথাসাধ্য আমার পাঠক পাঠিকাগণের অবগতির জন্য সংক্ষেপতঃ বর্ণিত করিব। উপরোক্ত বিষয়গুলি পরে বিশদভাবে বিবৃত করিয়াছি; এবং ললিতবিস্তরাদি গ্রন্থ পাঠে বুদ্ধদেব

ন্দুর দেবতা বলিয়া গৃহীত হইয়াছেন, তাহার হু প্রমাণ আমরা পাইয়া থাকি। এমত বস্থায় বুদ্ধ জন্মের পূর্ব্ব হইতেও বুদ্ধদেবের াবির্ভাবের সূচনা হইয়াছিল, যেমন াামবতারের বহু পূর্ব্বে পুরাণ কবি বাল্মীকি ামায়ণ গান ও রচনারূপ অমূল্য রত্ন জগৎকে ান করিয়াছিলেন!!!

বাবু চারুচন্দ্র বসু ও বাবু ঈশানচন্দ্র ঘোষ বৌদ্ধ জাতক প্রকাশিত করিয়া জগৎকে অমূল্য নিধি দান করিয়াছেন, তাহা সকলকে মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে হইবে।

এখন গয়া সহরের হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন, মুসলমান এবং ইংরাজ কীর্ত্তির কথা এক এক করিয়া সংক্ষেপে উল্লেখ করিব। গয়া-সহরটী অতি প্রাচীন, তাহা আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি। এই প্রাচীন হিন্দু নগরটীকে "গয়া সিটি" বলে। গয়া সিটি সমতল ও উচ্চ পাহাড়ের উপর স্থাপিত। পূর্ব্ব পার্শ্ব দিয়া পূতসলিলা ফল্গু প্রবাহিত হইয়াছেন। গয়ায় ফল্গু নদীর গঙ্গা সম মাহাত্ম্য, গয়া মাহাত্ম্য-পুস্তকে বিদিত হইয়াছে। মুসলমান শাসন কালে গয়া সিটির বহির্ভাগে সাহেবগঞ্জ চৌক সরাই মহল্লা পর্য্যন্ত গয়ার সীমার মধ্যে পরিগণিত হইত। বহিরাক্রমণ হইতে নগরটাকে রক্ষার জন্য রামনা এবং সরাইতে দুইটী তোরণ ছিল; রাত্রিকালে এইগুলির দ্বার বন্ধ করিয়া তোরণের উপর রক্ষিগণের নগর রক্ষা করিবার ব্যবস্থা ছিল। ইংরাজ রাজের অধিকার হইতে সেইগুলি বন্ধ হইয়াছে। তোরণ ও প্রাচীর দ্বারা সুরক্ষিত গয়ানগরের পূর্ব্ব সীমায় ফল্গুনদী, পশ্চিমদিকে উচ্চ প্রাচীর এবং দেওনাপুরে পশ্চিম তোরণ (কটক বা তোরণ), দক্ষিণ দিকে দক্ষিণ তোরণ, রামনী ঘাটের নিকট "উত্তর দরোয়াজা" বা উত্তর কটক প্রতিষ্ঠিত ছিল।

ডাঃ কানিংহাম ও রাজেন্দ্রলাল মিত্র-প্রমুখ মনীষিগণ বলেন যে, গয়া নগরটী প্রাচীন বৌদ্ধ ধর্ম্মের ভগ্নাবশেষের উপর স্থাপিত; যাবতীয় প্রাচীন দেব দেবীর মন্দির হিন্দুর অর্থাৎ বৈষ্ণব বা শৈব দেব দেবীতে পরিণত হইয়া বৌদ্ধ ধর্ম্মের উপর বিজয় ঘোষণা করিতেছে। গয়ার উত্তরদিকস্থ নব অংশটী, যাহা সাহেবগঞ্জ নামে খ্যাত, তাহা ইংরাজ শাসন কালে প্রাচীন কালেক্টার মিঃ ল কর্ত্তৃক স্থাপিত ও পরিবর্দ্ধিত; সেই জন্য ইহার নামও ল সাহেবের নামানুযায়ী "সাহেবগঞ্জ" হইয়াছে। সাহেবগঞ্জের মধ্যে "রামনা" একটী অংশ। এইখানে বৌদ্ধ যুগে বৌদ্ধ শ্রমণদের আশ্রম এবং "রমনক" (হরিণশালা or deer park) ছিল। ২১টী বৌদ্ধ-চৈতক-শোভিত হিন্দু দেবালয় ছাড়া এখানে আর কিছুই নাই। গয়া শ্রাদ্ধ বিধি "গয়া মাহাত্ম্যে" বিশদ ভাবে লিখিত আছে। বঙ্গবাসীগণ প্রায়ই ফল্গু, বিষ্ণুপদ এবং অক্ষয় বট, এই তিন বেদীতে পিণ্ড দান করিয়া "গয়া কার্য্য" শেষ করেন।

গয়া নগরের মধ্যে বৌদ্ধ যুগের বহু প্রাচীন দেবালয়, মন্দির, স্তূপ, ভগ্নাবশেষ, চৈত্য, এবং শিলালিপি আছে। বিষ্ণু মন্দিরের সম্মুখেই নরসিংহ দেবের মন্দিরের গাত্রে রাজা নারায়ণ পাল দেবের এক শিলালিপি আছে। ইহার পঞ্চদশ পংক্তিতে শ্রীনারায়ণপাল দেবের নাম দৃষ্ট হয়। ইহার পার্শ্বে আর একটী প্রাচীন শিলালিপি বিপরীত ভাবে বসান আছে। কৃষ্ণ দ্বারিকার ফটকে একটী কুটিল অক্ষরে উৎকীর্ণ শিলালিপি দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাতে মগধ রাজ নারায়ণপালদেবের নাম পাওয়া যায়। এই পাল রাজাগণ বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বী থাকিয়া

ভূপাল ছিলেন, তাহা জগৎ সমক্ষে বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিক গবেষণা প্রমাণিত করিয়াছেন। ইহার অনুলিপি নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

রাম গয়ার দশাবতার মূর্ত্তির নিম্নে, রাজা মহেন্দ্রপালদেবের নামে উৎকীর্ণ শ্লোক দৃষ্ট হয়। গদাধরের মন্দিরে অঙ্কিত একটী চতুর্ভুজ দেবী মূর্ত্তির নীচে এক শিলালিপি অঙ্কিত ছিল, তাহা আজ কাল কোন হিন্দু রাজা কর্ত্তৃক "সাক্ষী মহাদেবের" মন্দিরে বসাইয়া রাখা হইয়াছে। ইহা রাজা গোবিন্দপাল দেবের রাজত্বের চতুর্দ্দশ বৎসরে অর্থাৎ ১১৭৫ খ্রীষ্টাব্দে উৎকীর্ণ বলিয়া মনে হয়। সূর্য্যনারায়ণ দেবের মন্দিরে একটী শিলালিপি আঁটা আছে, তাহার সম্বন্ধে সূর্য্য কুণ্ড প্রবন্ধে সবিশেষ বলিয়াছি। বিষ্ণু পাদ মন্দিরের লাট মন্দিরের সম্মুখবর্ত্তী প্রাঙ্গনে একটী ৬ পংক্তির শিলালেখ দৃষ্ট হয়। ইহা ১০৭৮ খ্রীষ্টাব্দে উৎকীর্ণ। প্রপিতামহেশ্বর শিবের মন্দির গাত্রে আর একটী ১২০০ খ্রীষ্টাব্দের তুরস্ক সুলতান বুলবনের রাজত্ব কালের শিলালেখ দৃষ্ট হয়, ইহাতে মুয়াজুদ্দীন বিন সাম রাজার উল্লেখও দৃষ্ট হয়। বিষ্ণু পদে উত্তর পশ্চিম কোণে তুরস্ক রাজ বীরবুন (বুলবনের) উৎকীর্ণ এক অতি প্রাচীন শিলালেখ দৃষ্ট হয়; ইহার অষ্টম এবং নবম পংক্তিতে বাণ রাজা দেবের নাম দেখিতে পাওয়া যায়; কিন্তু ইনি কে, কোথায় রাজত্ব করিতেন, তাহার কোন নিদর্শন অদ্যাবধি পাওয়া যায় নাই। সূর্য্য কুণ্ডের সূর্য্যমন্দিরের অভ্যন্তরে আর একটী শিলালেখ আছে, তাহার বিষয় "সূর্য্য কুণ্ড" পর্য্যায়ে সবিশেষ আলোচনা করিয়াছি। গদাধরের মন্দিরের সম্মুখবর্ত্তী প্রাঙ্গনে একটী শিলালিপি কুটিল অক্ষরে উৎকীর্ণ আছে। ইহা সাতাইস পংক্তিতে শেষ হইয়াছে, কিন্তু উপরের দিকটা বিশেষরূপ নষ্ট হইয়াছে। গায়ত্রী ঘাটে অপর আর একটী শিলালেখ আঁটা আছে, তাহার সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা গায়ত্রী ঘাট প্রসঙ্গে করিব। বিষ্ণুপদের প্রাঙ্গনে ১৪২৭ খ্রীষ্টাব্দের এবং অক্ষয় বটে অপর আর একটী প্রস্তর লিপি নিবদ্ধ আছে। পিতৃচরণেশ্বর মহাদেবের দেওয়াল গাত্রে পঞ্চ গণেশের সম্মুখে বিষ্ণুপদ মন্দিরের লাট মন্দিরের সীমার মধ্যে "ষোল বেদীর" পার্শ্বেই আর একটী প্রাচীন শিলালেখ আছে। এই গুলির সবিস্তার আলোচনা যথাস্থানে করিব।

গয়ার প্রাচীনত্ব।

অতঃপর গয়ার "বেদী" প্রসঙ্গ বিবৃত করিতেছি। ব্রহ্মা প্রজাপতি গয়া শ্রাদ্ধ করিতে গয়ার "সঙ্কল্প" অর্থাৎ "ও বিষ্ণুর্বিষ্ণু র্বিষ্ণুঃ শ্রীমদ্‌বিষ্ণু রাজ্ঞা প্রবর্ত্তমাস্ত অদ্য ব্রহ্মণোঽহ্নি, দ্বিতীয় প্রহরার্দ্ধে শ্বেতবারাহ কল্পে বৈবস্বত মন্বন্তরে অষ্টাবিংশতি কলিযুগে কলেঃ প্রথম চরণে জম্বুদ্বীপ ভারত খণ্ডে অমুক দেশে অমুক ক্ষেত্রে বিক্রম শকে বৌদ্ধাবতারে অমুক সম্বৎসরে অমুক কামনা" ইত্যাদি ইত্যাদি। উপরোক্ত সংকল্প মন্ত্র পাঠ করিলে আমরা বেশ বুঝিতে পারি যে, এই বর্ত্তমান পৃথিবী শ্বেত বরাহ কল্পে রচিত হয় এবং উপরোক্ত সংকল্প মতে গয়াতীর্থের প্রাচীনত্ব নিম্নে প্রদত্ত হইল। শ্বেত বরাহ কল্পের পূর্ব্বস্থ সত্যযুগে গয়াতীর্থ ব্রহ্মা প্রজাপতির দ্বারা কল্পিত হয়। শ্বেত বরাহ কল্পের প্রথম ত্রেতাযুগে ভগবান রামচন্দ্র অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তিনি গয়ায় শ্রাদ্ধ করেন; তাহা হইলে গয়াতীর্থ রাম চন্দ্রের পূর্ব্বে বিদ্যমান ছিল। লিঙ্গ পুরাণের ৬৯ অধ্যায়ের মতে ব্রহ্মার পুত্র কশ্যপ,

কশ্যপের পুত্র সূর্য্য, তাঁহার পুত্র বৈবস্বত মনু, তাঁহার পুত্র সুদ্যুম্ন বা ইলা, ইলার পুত্র উৎপল, তাঁহার পুত্র গয় বিনতাশ্ব। তিনি গয়ায় যজ্ঞ করিয়াছিলেন, বায়ু পুরাণ পাঠে আমরা তাহা সমাগবগত হইতে পারি। তবে ইহা স্পষ্ট প্রমাণিত হইল যে, গয়ের পূর্ব্বে গয়ার অস্তিত্ব ছিল। বামনাবতারে ভগবান গয়াশিরের উপর পদ স্থাপন করেন; ইহাই "বিষ্ণুপদ" নামে খ্যাত হইয়াছে; এবং ধর্ম্মাবতার পিতা ধর্ম্মরাজ গয়া ক্ষেত্রে যজ্ঞ করেন। অতএব বেশ প্রমাণিত হইতেছে যে, শ্বেত বরাহ কল্পের প্রথম সত্যযুগে গয়া নির্ম্মিত হয়। শ্বেত বরাহ কল্পের পরিমাণ ৪৩২০০০০০০০ বৎসর হইতেছে; তাহার মধ্যে চতুর্দ্দশ মনুর কাল; তন্মধ্যে ছয়টী মনু অতীত হইয়াছে। এক মনুর পরিমাণ একাত্তর চতুর্যুগী কাল হইতেছে; একাত্তর চতুর্যুগীর পরিমাণ কাল ৩০৭১৬০০০০ বৎসর হইতেছে; অতএব এক চতুর্যুগীর পরিমাণ কাল ৪৩২০০০০ বৎসর হইতেছে। অতএব স্বায়ম্ভু + স্বারিচোষ + উত্তমোত্তা + তামস + রৈবতক + চাক্ষব = ৬ × ৩০৭১৬০০০০ + বৈবস্বত মন্বন্তরের ত্রয়োবিংশ চতুর্যুগীর ১১৬৬৪০০০০ গত হইয়া চতুর্বিংশতি চতুর্যুগীর সত্যযুগের ১৭২৮০০০ + ত্রেতার ১২৯৬০০০ + দ্বাপরের ৮৬৪০০০ + গত কলির সম্বৎ ১৯৬২ পর্য্যন্ত ৯০০৬ বর্ষ যোগ করিলে এক অর্ব্বুদ সাতানব্বই কোটী চৌত্রিশ লক্ষ নিরানব্বই হাজার এবং ছয় বর্ষ পরিমাণ হয়। কিন্তু শ্বেত বরাহ কল্পের প্রথম চরণ হইতে পাঁচ লক্ষ বৎসর বাদ দেওয়া যায় (কারণ ব্রহ্মার পুত্র মরিচি, তাঁহার স্ত্রী ধর্ম্মব্রতা (ধর্ম্মরাজের কন্যা) শাপগ্রস্তা হইয়া ধর্ম্মশীলারূপে পরিচিতা হইল। এই ধর্ম্মশীলা ধুন্ধুদৈত্যের পৌত্র এবং ত্রিপুরাসুরের পুত্র গয়াসুরের মস্তকোপরে রক্ষিত হয়; (এই কাল মোটামুটিরূপে পাঁচ লক্ষ বর্ষ ধরিলে) তাহা হইলে উপরোক্ত হিসাব মতে এক অর্ব্বুদ সাতানব্বই কোটী উনত্রিশ লক্ষ উনপঞ্চাশ হাজার সতের বর্ষ পূর্ব্বে আসিয়াছিলেন। অতএব, ঐ বৎসর পরিমাণ কাল গয়া তীর্থের নির্ম্মাণ কাল হইতেছে। ইংরাজি মতে গণনা করিলে গয়া তীর্থের বয়স অনেক কম হয়। ইংরাজি মতে পৃথিবীরই বয়স ছয় হাজার বৎসরের বেশী হয় না, কিন্তু ভূতত্ত্ব বিদ্যানুসারে ধরিত্রীর বয়স অনেক বেশী স্থির হয়!!! আমরা আমাদের ধর্ম্ম গ্রন্থে, বেদাদির উপর আস্থা না করিয়া সকল বিষয়ই বিলাতী চশমায় দেখি বলিয়া আমরা মহৎ ভ্রমে পতিত হইয়া থাকি, এবং সকল অনুসন্ধানাদিতে প্রকৃত তথ্য হইতে বহুদূরে গিয়া পড়ি। সবই আমাদের বরাতের দোষ!! *

গয়ার মধ্যে যাবতীয় তীর্থ আজ কাল প্রকাশ আছে, সেইগুলি সমুদয়েরই অধিকারী তীর্থগুরু গয়ালী ব্রাহ্মণগণ হইতেছেন। হিন্দু শাস্ত্র মতে প্রায় দুই অর্ব্বুদ বৎসর পূর্ব্বে গয়াতীর্থের কল্পনা হইয়াছিল বলিয়া প্রমাণিত হয়, তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি।

বর্ত্তমান সময়ে হিন্দু গয়ার প্রাচীনত্বের অনুসন্ধান করা বড়ই জটিল হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কারণ এদিকে অগ্রসর হইতে হইলেই একটা নূতন ভাব প্রবাহের আস্তরিণী ঠেলিয়া অগ্রসর হইতে হইবে। ইতিপূর্ব্বে যাঁহারা এ বিষয়ে অনুসন্ধান করিয়া গিয়াছেন, তাঁহারা বুদ্ধ গয়ার তত্ত্ব আবিষ্কার করিতে ব্যস্ত ছিলেন,

* কানুলাল গুর্দ্দার বৃহৎ গয়া মাহাত্ম্য পুস্তক দেখ।

অবসর সময়ে হিন্দু গয়ার ইতিহাসের অতি সামান্য পৃষ্ঠাই উদ্ঘাটন করিয়া জগৎকে দান করিয়াছেন। সেই আলোচনাও বৌদ্ধ ভাব প্রসূত, কারণ উহাতে দেখা যায়—'বৌদ্ধ ধর্ম্মের পরাজয় ও ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা' প্রতিপন্ন করাই গয়া মাহাত্ম্যের উদ্দেশ্য, গয়াসুর বৌদ্ধ ধর্ম্মের নির্য্যাতনের পরিকল্পনা ভিন্ন কিছুই নয়; এইরূপে হিন্দু গয়াকে বৌদ্ধভাবের সহিত মিশাইয়া তাঁহার মৌলিক অনুসন্ধানের পথ অধিকতর দুর্গম করিয়া রাখিয়াছেন। শাস্ত্রের দিকে একটু লক্ষ্য থাকিলে তাঁহাদের ন্যায় প্রতিভাশালী পণ্ডিতেরা শাস্ত্রের ভিতর হইতেই হিন্দু গয়ার প্রাচীনত্ব প্রমাণ করিয়া হিন্দু সমাজের প্রকৃত কল্যাণ সাধন করিতে পারিতেন। হিন্দু ধর্ম্ম বৌদ্ধ ধর্ম্মের নিকট নানাদিক্ দিয়া ঋণী. কেবল হিন্দু ধর্ম্মে নয়, তুর্কী, পারস্য, এমন কি রোমান কাথলিক্‌দের আচার ব্যবহার, রীতি নীতি, পূজা পদ্ধতিতেও বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রভাব বিস্তৃত ছিল বলিয়া কেহ কেহ অনুমান করেন। এই ধরণের অনেক নূতন কথা যে আজ চারিদিকে আমরা শুনিতে পাই ইহা তাঁহাদেরই অনুসন্ধানের ফল বলিতে হইবে।

কাশী বলুন, গয়া বলুন, সব তীর্থই বৌদ্ধদের অনুকরণে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। মোট কথা, আজকাল এক দল শিক্ষিত ভারতবাসী মাটী খুঁড়িয়া যাহা কিছু ইট কাঠ ও শিলালিপি পাইবেন, তাহাতেই বৌদ্ধ চিহ্ন দেখিতে পান। তাঁহারা মৃত্তিকাগর্ভ ও দীর্ঘিকা হইতে কিছু সংগ্রহ করিতে পারিলেই প্রথমে "ইহা অশোক যুগের কি কুশান যুগের" এই প্রণালীতে তত্ত্বান্বেষণে প্রবৃত্ত হন; তাঁহারা পূর্ব্বেই স্থির করিয়া লইয়াছেন, হিন্দুদের এ সব ছিল কিনা সন্দেহ, তাঁহারা অরণ্যে বসিয়া নিয়ত উপনিষদের ধ্যানে বিভোর থাকিতেন। কিন্তু যখন বিরাট বৌদ্ধ ধর্ম্মের ধাক্কা আসিয়া সনাতন ধর্ম্মের গায়ে লাগিল, তখন তাঁহারা উপনিষদের "ঘুমঘোর" হইতে জাগিয়া উঠিয়া কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলেন। এই জাগরণের ফলে নাকি আমরা হিন্দু ও বৌদ্ধের সংঘর্ষে পুরী ও গয়ার বৌদ্ধ মূর্ত্তির উপর হিন্দু মূর্ত্তির প্রতিষ্ঠা দেখিতে পাই!! এই যে দেশীয় ও বিদেশীয় কতিপয় পণ্ডিত হিন্দু ধর্ম্ম ও কর্ম্মকে বৌদ্ধধর্ম্ম ও সভ্যতার প্রভাবে বিকৃত করিতেছেন, এই চেষ্টা তাঁহাদের জ্ঞান ও অনুসন্ধিৎসার পরিচায়ক বটে, কিন্তু ইহাতে যে একটা খাঁটি সত্যকে বৃথা চাপা দেওয়া হইতেছে, তাহার প্রমাণ তাঁহারা হিন্দু শাস্ত্রেই দেখিতে পাইবেন।

বৌদ্ধ যুগ ত সেদিনকার কথা, বুদ্ধদেবের আবির্ভাবের বহু পূর্ব্বে গয়াতীর্থ হিন্দু নরনারীর নিকট পরিচিত ছিল। পিতৃ পূজা হইতেই গয়াতীর্থের উৎপত্তি। এই পিতৃপূজা কত যুগ-যুগান্তর হইতে যে আর্য্যজাতির ভিতর প্রচলিত, তাহা গণনা কতকগুলি সীমাবদ্ধ বি. সি (B. C.) অথবা এ. ডিতে (A. D.) হইতে পারে না। বি. সি. ও এ. ডি.র প্রতিষ্ঠাতৃগণ ত সেদিনকার জাতি। জাতি বিশেষের বয়োবৃদ্ধি ও অভিজ্ঞতার সহিত দূর দৃষ্টি জন্মিলে তখন পূর্ব্বের ভ্রান্ত সংস্কার দূরীভূত হয়। অষ্টম অথবা নবম শতাব্দের বহু পূর্ব্বে যে গয়া সর্ব্বত্র তীর্থ-প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল, তাহার প্রমাণ সংস্কৃত শাস্ত্র ও সাহিত্যের নানা স্থানে দেখিতে পাওয়া যায়। হইতে পারে বর্ত্তমান বিষ্ণুপদ মন্দির বেশী দিনের নয়, ইহা বিভিন্ন যুগে সংস্কারের

সময় নানা শিল্পীর হাতে পড়িয়া নূতন একটী মন্দিরে পরিণত হইয়াছে। বর্ত্তমান মন্দিরের স্থাপত্য দেখিয়াই গয়াতীর্থের প্রাচীনত্বে সন্দেহ করিবার কোনই কারণ নাই। সুপ্রতি পাটলিপুত্র খননে ডাঃ স্পূনার একখানা "প্লাক" আবিষ্কার করিয়া প্রমাণ করিয়াছেন যে, বর্ত্তমান বোধগয়া মন্দিরের সহিত প্রাচীন মূল মন্দিরের অনেক বিষয়ে বৈষম্য পরিলক্ষিত হয়। তাহা বলিয়া বোধগয়া মন্দির ১৮৮০ অব্দে নির্ম্মিত হইয়াছিল অথবা ১৮৮০ অব্দের পূর্ব্বে বৌদ্ধ ধর্ম্ম ভারতে প্রচারিত হয়, একথা বোধ হয় দুই হাজার বৎসর পর ভাবী প্রত্নতত্ত্ববিদেরা বলিবেন না!! মূলকথা, গয়া অথবা পুরীর প্রাচীনত্ব মীমাংসার জন্য আমাদের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিরা শাস্ত্রে যে তত্ত্ব আলোচনা করিয়া গিয়াছেন, তাহাই আমাদের সন্দেহ নিরাকরণ করিবার পক্ষে যথেষ্ট।!!

গয়া তীর্থক্ষেত্রের উৎপত্তি সম্বন্ধে আমার মত ক্ষুদ্র ব্যক্তির মনে যাহা উদিত হইয়াছে, তাহা হিন্দু শাস্ত্রাদি দেখিয়া ও বিশেষরূপ আলোচনা করিয়া পূর্ব্বে উল্লিখিত করিয়াছি। শক্তি সংগম তন্ত্র ও বায়ু পুরাণে আমরা দেখিতে পাই :—

"চরণাদ্রিং সমারভ্য গৃধ্র কূটান্তিকং শিবে। তাবৎ কীকটদেশস্যাৎ তদন্তর্গধো ভবেৎ॥" (শক্তি সংগম তন্ত্রে সপ্তম পটলে, শব্দ কল্পদ্রুমে ৭৪০ পৃষ্ঠায়াঙ্ক দ্রষ্টব্যং।")

"পুনশ্চ, কীকটেষু গয়া পুণ্যা নদী পুণ্যা পুনঃ পুনা। চ্যবনস্যাশ্রমঃ পুণ্যঃ পুণ্যং রাজগৃহং বনং।" বায়ুপুরাণ ৪৬ অঃ ৭৩ শ্লোকঃ। বায়ুপুরাণে গয়াতীর্থ সম্বন্ধে বিশেষ মাহাত্ম্য লিপিবদ্ধ আছে, তাহার পুনরুক্তি অত্র স্থলে নিষ্প্রয়োজন বলিয়া আমার মনে হয়। এ সম্বন্ধে বায়ু পুরাণের উত্তরার্দ্ধের ৪৩ অধ্যায়টী সম্যকরূপ পাঠ করা কর্ত্তব্য। ঐ পুরাণের ৪৩ অধ্যায়ের ৪,৮,৭২৪,২৫,২৭শ্লোকে আমরা দেখিতে পাই "পঞ্চ ক্রোশং গয়াক্ষেত্রং ক্রোশমেকং গয়া শিরঃ। তন্মধ্যে সর্ব্বতীর্থানি ত্রৈলোক্যে যানি সন্তিবৈ॥" পুনশ্চ ৪৭ অধ্যায়ের ২৬, ২৭, ২৮, ২৯ শ্লোকে আমরা—

"ধর্ম্মং ধর্ম্মেশ্বরং নত্বা......ভবার্ণবাৎ॥" শ্লোক দেখিতে পাই। ঐ পুরাণের ৪৯ অধ্যায়ে আমরা "চলদ্দলায় বৃক্ষায়...বৃক্ষরূপং পরং হরিং॥" বচন দেখিতে পাই। (২৬—২৯ শ্লোকাঃ) এবং ১১৫ অধ্যায়ের ৩৭ শ্লোকে আমরা পুনশ্চ "মহাবধি তরুনত্বা ধর্ম্মবান্ স্বর্গলোক ভাক্" রূপ বচন দেখিতে পাই। বৃহন্নীলতন্ত্রের পঞ্চম পটলে এবং ভাগবতের প্রথম স্কন্দের ২৪—২৯ শ্লোকে, ষষ্ঠ স্কন্দের ১৭ শ্লোকে, একাদশ স্কন্দের চতুর্থ অধ্যায়ের ২২ শ্লোকে, দশম স্কন্দের ৪০ অধ্যায়ের ২২ শ্লোকে, অগ্নি পুরাণের ১৬ অঃ ১ শ্লোকে, ঐ পুরাণের ৪৯ অঃ ৮ শ্লোকে, লিঙ্গপুরাণ, নির্ণয়সিন্দু, ভবিষ্য পুরাণ, হেমাদ্রী, বরাহ পুরাণ, গর্গ সংহিতা। (বিশ্বজিত খণ্ডে), ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ, কূর্ম্ম পুরাণ, নৃসিংহ পুরাণ, গরুড় পুরাণ ২ অঃ ৩২ শ্লোক; ১৪৯ অঃ ৩৯ শ্লোক, বৃহন্নারদীয় পুরাণ ২ অঃ ৩৯ শ্লোক, দেবী ভাগবত ১০ স্কঃ অঃ ৫ শ্লোক ১৪, পদ্ম পুরাণ, কল্কী পুরাণ, মেরুতন্ত্র, শঙ্কর বিজয় প্রভৃতি বহু হিন্দু গ্রন্থে গয়াক্ষেত্রের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।

গয়াতীর্থের প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ নাই। আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, এক অর্ব্বুদ সাতা-নব্বই কোটী বৎসর পূর্ব্বে ব্রহ্মা প্রজাপতি গয়ায় যজ্ঞ ও শ্রাদ্ধ করিতে আসিয়াছিলেন।

রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডের ১০৭—১১৩ শ্লোকে আমরা দেখিতে পাই:—

"এষ্টব্যাবহবঃ পুত্রো গুণবন্তো বহুশ্রুতাঃ।
তেষাম্বৈ সমচেতানামপি কশ্চিদ্গয়াং ব্রজেৎ॥"

ইহা ত্রেতাযুগের কথা। তাহার শত সহস্র সহস্র বৎসর পূর্ব্বে ব্রহ্মা গয়ায় আসিয়াছিলেন। কোন্ সময় হইতে গয়ায় তীর্থযাত্রিগণের সমাগম হয়, সে সম্বন্ধে মতভেদ আছে। শ্রীহর্ষদেবের সময় মগধরাজ্য সম্পূর্ণ বৌদ্ধধর্ম্মযুক্ত ছিল। নবম শতাব্দীর শেষ ভাগ হইতে এবং দশম শতাব্দীর প্রারম্ভ হইতে পালবংশীয় নৃপতিগণের শাসনকালে গয়া বিশেষভাবে তীর্থযাত্রীর নিকট পরিচিত হয়। অক্ষয়বটের সন্নিকট দশম শতাব্দীর একখানা শিলালিপি পাওয়া গিয়াছে। নরপালের শাসনকর্ত্তা বজ্রপাণির অপ্রকাশিত শিলালিপি পাঠে আমরা সম্যগবগত হই যে, ১ ৬০ খ্রীষ্টাব্দে ইনি গয়াকে নগণ্য পল্লী হইতে বৃহৎ সমৃদ্ধিশালী নগরীতে পরিণত করেন। অপর একখানি শিলালিপিতে প্রকাশ যে, কোন রাজপুত-মন্ত্রী ১২৪২ খ্রীষ্টাব্দে গয়াতীর্থে আসিয়াছিলেন, এই তীর্থ পর্য্যটন স্মরণীয় করিবার জন্য তিনি লিখিয়া গিয়াছেন "আমি গয়া কাজ করিয়াছি। প্রপিতামহ ইহার সাক্ষী।"

গয়াযাত্রী সর্ব্বপ্রথমে পুনঃ পুনঃ নদীতীরে ক্ষৌরকার্য্য সম্পন্ন করিয়া গয়াকৃত্য করিবে। অতি প্রাচীনকালে ৩৬০ বেদীতে পিণ্ড দান হইত; এখন সবই প্রায় লুপ্ত হইয়া ষোড়শ বেদী, ৪৫ বেদী এবং ৯ বেদী ও তিন বেদীতে পরিণত হইয়াছে। বঙ্গবাসীগণ প্রায় ফল্গু, বিষ্ণুপদ এবং অক্ষয়বট, এই তিন বেদীতে পিণ্ড দিয়া থাকেন, তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। গয়ায় ষোড়শ বেদীতে পিণ্ডযাত্রিগণ রুদ্রপদ, ব্রহ্মপদ, দক্ষিণাগ্নিপদ, গার্হপত্যপদ, আহবনীয়পদ, সত্যাগ্নিপদ, আবসথ্যাগ্নিপদ, সূর্য্যপদ, কার্ত্তিকেয়পদ, ইন্দ্রপদ, অগস্ত্যপদ, চন্দ্রপদ, গণেশপদ, ক্রৌঞ্চপদ, মাতঙ্গপদ এবং কশ্যপপদে পিণ্ডদান করিয়া থাকেন। এই ষোড়শ বেদীর মধ্যে প্রত্যেক বেদীতে পিণ্ডদানের ভিন্ন ভিন্ন রূপ ফল শাস্ত্রে লিখিত আছে। হিন্দুর পিণ্ডদান বৃহৎ ব্যাপার। পিণ্ডদান মন্ত্রটী কিরূপ সার্ব্বজনীন বিশ্বব্যাপী, তাহা দেখিবার ও প্রণিধান করিবার জিনিষ বলিয়া তাহার কিয়দংশ অত্র স্থলে উদ্ধৃত করিলাম:—

১। অস্মৎকুলেমৃতাযেচ গতির্যেষাং ন বিদ্যতে।
তেষামুদ্ধরণার্থায় ইমং পিণ্ডং দদাম্যহম্॥

২। ওঁ মাতামহকুলেযেচ গতির্যেষাং ন বিদ্যতে।
তেষামুদ্ধরণার্থায় ইমং পিণ্ডং দদাম্যহম্॥

৩। ওঁ বন্ধুবর্গকুলেযেচ গতির্যেষাং ন বিদ্যতে।
তেষামুদ্ধরণার্থায় ইমং পিণ্ডং দদাম্যহং॥

৪। ওঁ অজাতদন্তা যে কেচিংযেচ গর্ভে
প্রপীড়িতাঃ।
তেষামুদ্ধরণার্থায় ইমং পিণ্ডং দদাম্যহম্॥

৫। ওঁ অগ্নিদগ্ধাশ্চযে কেচিৎ নাগ্নিদগ্ধাস্তথাপরে।
বিদ্যুচ্চৌরহতাযেচ তেভ্য পিণ্ডং দদাম্যহং॥

৬। ওঁ দাবদাহেমৃতাযেচ সিংহব্যাঘ্রহতাশ্চযে।
দংষ্ট্রিভিঃ শৃঙ্গিভির্ব্বাপি তেভ্য পিণ্ডং
দদাম্যহং॥

৭। ওঁ উদ্বন্ধনেমৃতাযেচ বিষশস্ত্রহতাশ্চযে।
আত্মোপঘাতিনোযেচ তেভ্যঃ পিণ্ডং
দদাম্যহং॥

৮। ওঁ অরণ্যেবর্ত্মনি বনে ক্ষুধয়া তৃষ্ণয়াহতাঃ।
ভূতপ্রেতপিশাচাদ্যৈঃ (ভূতপ্রেত পিশাচাশ্চ (ইতি বা পাঠঃ) তেভ্যো পিণ্ডং
দদ ম্যহং॥

৯। ওঁ রৌরবেচান্ধতামিস্রে কালসূত্রে চযে-
স্থিতাঃ।
তেষামুদ্ধরণার্থায় ইমং পিণ্ডং দদাম্যহং॥
১০। ওঁ অনেক যাতনাসংস্থাঃ প্রেতলোকে
চযেগতাঃ।
তেষামুদ্ধরণার্থায় ইমং পিণ্ডং দদাম্যহম্॥
১১। ওঁ অনেক যাতনাসংস্থাঃ যেনীতা
যমকিঙ্করৈঃ।
তেষামুদ্ধরণার্থায় ইমং পিণ্ডং দদাম্যহং॥
১২। অসিপত্রবনেঘোরে কুম্ভীপাকে চযেগতাঃ।
তেষামুদ্ধরণার্থায় ইমং পিণ্ডং দদাম্যহং॥
১৩। ওঁ নরকেষু সমস্তেষু যাতনাসু চ
সংস্থিতাঃ।
তেষামুদ্ধরণার্থায় ইমং পিণ্ডং দদাম্যহং॥
১৪। ওঁ পশুযোনিগতা যেচ পক্ষীকীট-
সরীসৃপাঃ।
অথবা বৃক্ষযোনিস্থা তেভ্য পিণ্ডং দদাম্যহং॥
১৫। ওঁ জাত্যন্তর সহস্রেষু ভ্রমন্তঃ স্বেনকর্ম্মণা।
মনুষ্য দুর্ল্লভং যেষাং তেভ্য পিণ্ডং দদাম্যহং॥
১৬। ওঁ দিব্যান্তরীক্ষ ভূমিষ্ঠাঃ পিতরো
বান্ধবাদয়ঃ।
মৃতাপসংস্কৃতা যেচ তেভ্য পিণ্ডং দদাম্যহং॥
১৭। ওঁ যেচ কেচিৎ প্রেতরূপেণ বর্ত্তন্তে
পিতরো মম।
তে সর্ব্বে তৃপ্তিমায়ান্ত পিণ্ডেনানেন সর্ব্বদা॥
১৮। ওঁ যে বান্ধবাবান্ধবা বা যেঽন্য জন্মনি
বান্ধবাঃ।
তেষাং পিণ্ডো ময়াদত্তো অক্ষয্যমুপতিষ্ঠতাম্॥
১৯। ওঁ পিতৃবংশে মৃতাযেচ মাতৃবংশে-
চযেমৃতাঃ।
গুরুশ্বশুরবন্ধূনাং যেচান্যেঽ বান্ধবাঃ স্মৃতাঃ॥
যেমে কুলে লুপ্তপিণ্ডাঃ পুত্রদার বিবর্জ্জিতাঃ।
ক্রিয়ালোপ গতাযেচ জাত্যন্ধাঃ পাঙ্গবাস্তথা॥
বিরূপা আমগর্ভাশ্চ জ্ঞাতা জ্ঞাতা কুলে মম।
তেষাং পিণ্ডো ময়া দত্তো অক্ষয্যমুপতিষ্ঠতাম্॥

২০। ওঁ আব্রহ্মণোযে পিতৃবংশ জাতা।
মাতুস্তথা বংশভবামদীয়াঃ॥
কুলদ্বয়ে যে মম দাসভৃত্যাঃ।
ভৃত্যাস্তথৈবাশ্রিত সেবকাশ্চ॥
মিত্রানি সখ্যে পশবশ্চ বৃক্ষাঃ।
দৃষ্টাশ্চাদৃষ্টাশ্চ কৃতোপকারাঃ॥
জন্মান্তরে যে মম সঙ্গতাশ্চ।
তেভ্যঃ স্বধা পিণ্ডমহং দদামি॥

গয়াশ্রাদ্ধ কালে পিণ্ডাদিতে মধু অর্পণ করিতে হয়। মধু দান মন্ত্রটী আমাদের শাস্ত্রে অতি মনোরম; তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল:—
"ওঁ মধুবাতা ঋতায়তে, মধুক্ষরন্তু সিন্ধবঃ, মাধ্বির্ণঃ সন্তোষধীর্ম্মধুনক্তমুতোষসো মধুমৎ পার্থিবং রজঃ, মধুদ্যৌরস্তুনঃ পিতামধুমান্নো বনস্পতির্ম্মধুমাংস্তু সূর্য্যঃ মাধ্বীর্গাবো ভবন্তুনঃ। মধু, মধু, মধু।"

পিণ্ডদান বিধি বিশদরূপে অতুলবাবু তাঁহার "গয়াকাহিনী" পুস্তকে বিবৃত করিয়াছেন, তাহার পুনরুল্লেখ অত্র স্থানে নিষ্প্রয়োজন।

গয়া সহরের ২৬ ক্রোশ উত্তরদিকে পাটনা গয়া রেল লাইনের উপর পুনপুন ষ্টেশন হইয়া পুনপুনা নদী তীর্থে স্নান করিতে যাইতে হয়। গয়ামাহাত্ম্য অনুসারে গয়া কার্য্য করিবার পূর্ব্বে ক্ষৌরান্তে পুনপুন নদীতে স্নান করিয়া প্রথম পিণ্ড দান করিয়া "গয়াপুরীতে" প্রবেশ করিতে হয়। গয়া-মোগলসরাই রেল লাইন নির্ম্মিত হইলে পশ্চিম দিকে ২০ ক্রোশ গয়া হইতে উক্ত পুণ্যতোয়া নদী প্রবহমানা হইয়া গঙ্গায় মিলিতা হইয়াছে। উভয় স্থানেই যাত্রিগণের সুবিধার জন্য কলিকাতার দানবীর রাজা শিবপ্রসাদ ঝুনঝুনওয়ালা ধর্ম্মশালা নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়াছেন।

গয়া নগর হইতে ১৯ ক্রোশ দক্ষিণ দিকে হাজারিবাগ জেলার সীমার মধ্যে কৌলেশ্বরী পর্ব্বত অবস্থিত। এই পর্ব্বতে ৺কৌলেশ্বরী দেবীর মন্দির আছে। গয়ালীগণ এবং গয়া জিলার অনেক গৃহস্থগণ এই পর্ব্বতে গিয়া দেবীর সদনে "মানত" করেন এবং বালক বালিকাদের "মুণ্ডন" করিয়া থাকেন। বৌদ্ধ-যুগে এই পর্ব্বতকে "কোলাহল পর্ব্বত" নামে অভিহিত করা হইত। প্রবাদ আছে যে, গয়াসুর এই পর্ব্বতে তপস্যা করিয়াছিলেন। সপ্তম শতাব্দীতে চৈনিক পরিব্রাজক হিওয়েন্ সাঙ্ এই পর্ব্বত ও সন্নিকটস্থ বৌদ্ধবিহার পরিদর্শন করিতে আসিয়াছিলেন।

পূর্ব্বে মেলা প্রসঙ্গে বলিয়াছি যে, দেও-কুণ্ড গ্রামে কার্ত্তিক মাসে এবং ফাল্গুন মাসে শিবরাত্রির সময়ে বৎসরে দুই বার মেলা বসিয়া থাকে। এই স্থানকে চ্যবনাশ্রম নামে অভিহিত করা হইয়া থাকে। এই গ্রাম গয়া হইতে পশ্চিমোত্তর কোণে অব-স্থিত। গয়া হইতে ২০ ক্রোশ পূর্ব্বোত্তর কোণে রাজগৃহ তীর্থ অবস্থিত আছে।

শ্রীপ্রকাশচন্দ্র সরকার।

পোলাও।

তৃতীয় উচ্ছ্বাস।

১

মা'র নাম লেখা বিজয় নিশান
তুলিয়া উর্দ্ধে গৌরব ভরে
গাহিলা সাধক জীমূত মন্দ্রে
বাজিল বীষাণ ঈশান-করে!

২

ধন্য সমাজ! ধন্য রে তুই!
ছদ্মবেশীর ব্যসন ভূমি!
অর্থে দিলিরে শ্রেষ্ঠ আসন,
স্বার্থে নিলিরে হৃদয়ে চুমি'!

৩

ব্রাহ্মণ কোথা সমাজ-কিরীট,
কোথায় তেমন মহান্ প্রাণ,
ব্রহ্মতেজের মূর্ত্ত-বিগ্রহ,
জনহিতে সদা আপনা দান!

৪

সত্য-ন্যায়ের জ্ঞানের দণ্ড
ধরিয়া পুলকে রুদ্র-করে,
বিশ্ব মাঝারে পূজিতেন যাঁরা
বিশ্ব-অতীত বিশ্বেশ্বরে!

৫

সংসারে সৃজি' পূত তপোবন
ত্যাগের আদর্শ ছিলেন যাঁরা,
চরণে যাঁদের কত নৃপ শির
লুটাত হইয়ে গরব হারা!

৬

যজ্ঞসূত্রের অপমানকারী
ব্রাহ্মণ এরা কভু সে নয়,
দেবতা কখন নিয়েছে বিদায়
শূন্য দেউল দানবালয়!

৭

অন্ধ দেখায় অন্ধেরে পথ
দীক্ষা আহ্নিক-পূজার ছলে,
শিষ্যারে কয় "তুই রাই ধনী,
শ্যামরায় আমি অবনীতলে!"

৮

সকলি দেখিয়া বুঝিয়া সমাজ
চেয়ে রয় আজ মূঢ়ের মত,
কণ্ঠে ঝুলান বাঁধন-দড়ির
কে ভাবিত হবে মাহাত্ম্য অত!

৯

কর্ম্ম-কৌলীন্য কিছু নহে আজ
জন্ম-কৌলীন্য সমাজ চায়,
শিবের আসনে বানরে বসায়ে
অঞ্জলি দেয় তাহারি পায় !

১০

হোক্ নরাধম শত পাপাচারী
নাহি কোন দোষ রহিলে 'কুল',
ধার্ম্মিক যদি হন কুলহীন
তবু হেয় তিনি হায়রে ভুল !

১১

কৌলীন্য কভু ছিল না এমনি
জগতের বড়াই সার,
শাঁস দূরে ফেলি খোলস লইয়া
সমাজ খুলেছে পতন-দ্বার !

১২

কবীর নানক পূজিত যেথায়,
হরিদাস যেথা মুকুটমণি,
বংশগৌরব সেথা দিলি ঠাঁই,
কি করিলি আজ সমাজ-শনি !

১৩

মরণ-পথের যাত্রী যাহারা
বানপ্রস্থ যার শাস্ত্রে কয়,
'তৃতীয়া'র প্রেম খুঁজিতে তাহারা
ধিক্ ! ধিক্ ! আজি কুণ্ঠিত নয় !

১৪

শৈশববিধবা দুহিতা নিজের
তার তরে যত কঠোর বিধি,
আপনার তরে রয়েছে বিলাস
আছে শত আর ভোগের নিধি !

১৫

আদর্শ কোথা পাবে সে বালিকা
অধম জনক এমন যার,
মনোভুলে যদি কভু ভুল করে
নাই নাই ক্ষমা কখনো তার !

১৬

নারী-মেধ-যাগে মত্ত সমাজ,
অবলা-বধের পেষণ-যাঁতা,
শত নাগপাশে বাঁধিয়ে তাহার
গোপন পাপের সঙ্কেতদাত্রী !

১৭

মাতৃজাতির আঁখি ঝরে যথা
হৃদয়-মথিত দীর্ঘশ্বাসে,
নাই নাই সেথা কুশল কখনো
মৃত্যু কেবলি ঘনায়ে আসে !

১৮

ভাবী-শ্বশুরের গলাতে লাগায়ে
শিক্ষিত যুবা উপাধি-ফাঁস,
অর্থের পদে বিকে আপনায়
শুষিয়া রক্ত মিটায় আশ !

১৯

উচ্চ শিক্ষার এই পরিণতি,
সমাজ তাহার প্রশ্রয়কারী,
কত 'স্নেহলতা' দগ্ধ অনলে
অসহ পিতার নয়নবারি !

২০

কোথা পরিণয় আজিকে সমাজে,
"কণ্ঠীবদল" মানুষ-চাবে,—
মন্ত্র বুঝে না বর-পুরোহিত
টিয়াপাখী যথা যা' শ্রুত ভাবে !

২১

বিবাহের মত শ্রাদ্ধেও সার
বাহ্য-আচার-বিধান শুধু,
অমৃত-সাগর শুকায়ে গিয়েছে
পড়ে আছে আজ মরুভূ ধূ ধূ !

২২

সমাজের বুকে বসি ধনবান্
যাহা খুসী তাহা করিতে পারে,
সমাজের পতি আজিকে সে জন
কেহই তারে বাধা দিতে যে নারে !

২৩

তারপরে তার যদি থাকে টিকী,
যদি নামাবলী রহেগো গায়,
হরিনাম ঝুলি ঝুলায় অথবা,
তবে তার সীমা কে আর পায়!

২৪

সে যে সমাজের শুধু 'পতি' নহে,
সে যে সমাজের পাবন 'গুরু',
শত ব্যভিচার লীলা যে তাহার
রামপাখী—সে যে নিশীথে সুরু!

২৫

পঞ্চ 'ম' কারে পরম সাধন,
পাষণ্ড সে, যে ইহা না বুঝে,
সমাজ-স্বর্গে নাই ঠাঁই তার,
জীবনে নরক নিক্ সে খুঁজে!

২৬

জ্ঞানের গুণের নাই সমাদর,
নাই সমাদর প্রাণের আর,
অনর্থ হেতু অর্থই শুধু
সমাজ ভেবেছে আজিকে সার!

২৭

অর্থের পূজা চলেছে অবাধে
দলিত মথিত অভাগা দীন,
অর্থ পিশাচ অর্থের দাস
সমাজ আজিকে কাণ্ডারী-হীন!

২৮

শাস্ত্র আজিকে স্বার্থ-সিদ্ধির
শাণিত শস্ত্র সমাজ-করে,
দেশের আচার লোকের আচার
প্রাধান্য লভে সবার 'পরে!

২৯

দেশের রাজার জ্ঞানের সেবায়
যদি হতে হয় সাগর পার,
গোবরে তাদের শুদ্ধি বিধান
ঘুচাইতে কোন্ পাপের ভার?

৩০

ধনীর চরণ লেহন করিতে,
পীড়ন করিতে দীনের প্রাণ,
না হয় পাতক, পতিত সমাজ!
পাপ শুধু যেথা আপনা দান!

৩১

ছুৎমার্গ-পিষ্ট মানব-হৃদয়
মুক্তির তরে কাতরে কাঁদে,
কে জ্বালিবে আলো—সমাজ কেবলি
ভাই ভাই মাঝে প্রাচীর ফাঁদে!

৩২

'সর্ সর্ সর্' 'দূর্ দূর্ দূর্'
সমাজের কিবা সোহাগ-বাণী,
খসে পড়ে তাই সমাজ-অঙ্গ
খ্রীষ্ট-সেবকে ধরম দানি'!

৩৩

সে খবর হায়, রাখে না সমাজ,
আপন গরবে আপনি ভোর,
কে মুছাবে আজি পতিত জাতির
লাঞ্ছনাকুল নয়ন-লোর!

৩৪

ভণ্ডামী শুধু গুণ্ডামী শুধু
নষ্টামী শুধু সমাজময়,
দংশিবে কারে কখন কি ভাবে
পন্নগ ছলে অপেখি রয়!

৩৫

এমন দীনতা এমন হীনতা
এমন নীচতা কোথায় আর,
পলে পলে শুধু জমাট বেঁধেছে
ধর্ম্মের গ্লানি ব্যসন-ভার!

৩৬

কবে যুগ-ঋষি লভিবে জনম
জঞ্জাল যত করিয়া নাশ,
কবে ভগীরথ আনিবে গঙ্গা
উদ্ধারি হের ভস্মরাশ!

৩৭

কার অভিশাপ দেয় এত তাপ
ঘেরি ঘোর পাপ সমাজ-কায়,
সপ্ত সাগর উথলি কখন
ধুয়ে দিয়ে যাবে সকলি হায়!

৩৮

অনল-গর্ভ অশনি কোথায়,
কোথায় ঝঞ্ঝা প্রলয়োন্মাদ,
নন্দন আজি সমাধি-ভবন
কেন নাহি জাগে ভৈরব নাদ!

৩৯

হে ত্রিশূলি! তব বৃথায় ত্রিশূল,
বৃথা চক্র তব হে নারায়ণ!
অন্যায় যদি করে আস্ফালন,
দলিয়া সত্য-জীবন মন!"

৪০

সহসা থামিল ক্ষুব্ধ সাধক,
শুনিনু শূন্যে গরজে ঘন,
"হে ত্রিশূলি! তব বৃথায় ত্রিশূল,
বৃথা চক্র তব হে নারায়ণ!"

হো হো হো
সব serious, সব serious
কোথায় র'ল ব্যঙ্গ
পাঠক কেন পড়বে বল
না পাইলে রঙ্গ?
একটু হাসি প্রেমের গাথা
একটু রসের রভস,
বঁধুর বেণু দূরে বেজে
করবে প্রাণ অবশ।
সুরেন গাচ্ছেন, আত্ম-কীর্ত্তি
মতির জলে উঠ্‌ছে গা,
আমরা শুনছি আসছে ভেসে,
কোকিল বঁধুর মধুর রা।
নেতায় নেতায় লড়ালড়ি
চিম্‌টী কাটেন "অমৃত",
সত্য গেছেন হাওয়া খেতে
নৃত্য করেন অনৃত।
মনের মতন মালা গেঁথে
আয়রে সাজাই দুজনে,
প্রলয় বাতাস বচ্ছে দেশে
কাঁপ্‌ছে হৃদয় সঘনে।
"নারায়ণের" চিত্ত চোরের
জিভ বেড়েছে ইঞ্চি দুই,
গাচ্ছে হুমো গাল ফুলিয়ে
হুমী বল্‌ছে "আমি না তুই!
হায় মা আমার বঙ্গরাণী
সর্ব্ব দুঃখহরা,
তোর ছেলেদের হৃদয়গুলি
তীক্ষ্ণ বিষে ভরা।
সোণার স্বপন 'চিত্তে' আমার,
মদিরা দিতেছে ঢালি,
ব্যোমকেশ ঐ ত্রিশূল ছাড়িয়া
দিতেছেন করতালি।
পাঁচু ভায়ার এ billingsgate এ
মানের আগুন দক্‌লকায়,
নির্ঘোষিয়া দন্ত আসি
চড়ক পূজার ঢাক বাজায়।
সূর্য্যিমামার গায়ের আগুন
ওরেও বলি ঠাণ্ডা,
টাকার গরম আছি গরম
দগ্ধ করে প্রাণটা।
সাহিত্যের কুঞ্জে বসি
ভজছে হরি বল কে?
শক্তি থাক্‌লে চিন্‌বে ভায়া
এক নয়নের ঝলকে।
মতিচূর আর সীতাভোগটা
করিয়ে সুখে একচেটে,
কাটিয়ে দিচ্ছেন দিনগুলো সব
সাহিত্যের ভাব ঘেঁটে।

গল্পগুলো গল্প তো নয়
এক একটা abortion,
Sickly, ugly full of hurly
Excite করে avertion.
তোষারাণী হৃদয় খানি
সদাই রাখে ঘিরে,
স্বৈরিণীর হাস্যটুকু
মিশ্রিত মদিরে।
বিদ্যাভূষণ দূরে গেল
কৃষ্ণ ভাঙ্গলো বাঁশি,
বিবেক হারা হৃদয়টুকু
কত না উদাসী।
ঢেকী হচ্ছেন রাণীর রাণী
পাড় দিচ্ছেন নেকী,
সাহিত্যেতে এমন দিনেও
চল্‌ছে ভোড়ে মেকী।
হারাণ এখন মস্ত লেখক
কৈ ভক্ষী হেম,
এতো দিনে সার বুঝিলেন
সমাজপতির প্রেম।
গাধা নে'ড়ে ঘাড়ের ঝুল্‌টা
ভঙ্গি করেন কেশরীর,
চন্দ্রকলাপে মণ্ডিত কাক
নৃত্য করেন ময়ূরীর।
নরম পন্থীর conference এ
সুরেন চন্দ্র হোতা,
হে'লে দুলে গর্জ্জনিয়া
বল্‌ছেন সবাই ভোতা।
হোথায় ঈমাম ললামী সুঠাম
ধরিলেন সাম গান,
শ্বেতদ্বীপ মাঝে ছোটে প্রতিধ্বনি
আলোড়িত শত প্রাণ।
দান কর তো শবাং পতির
মস্তন কর দান,

মনুমেণ্টগুর ঐ মুষ্টি ভিক্ষায়
তুষ্ট নহে প্রাণ।
রাজার পূজায় ভারতবাসী
দিচ্ছে রুধির ঢে'লে,
ভক্ত তোমার কেমন তাই
পদ্ম নয়ন মে'লে।
রেখেছ শিল্প করি খণ্ড
উন্নতির বরষায়,
জল থৈ থৈ পৃথ্বী জুড়ি
আমরা মর্‌ছি পিপাসায়।
নূতন বিধি করবে প্রচার
ভুল বুঝাছ বলে,
(এখন কি)
বুকের পাথর বুকে ক'রে
ভা'সব নয়ন জলে?
শ্বেতদ্বীপের রাজার প্রজা
এও গরবের কথা,
নায়েব গু'লার অত্যাচারে
মর্ম্মে লাগে ব্যথা।
Burke Chatham র উদার ভাবে
ভারত পুলকিত,
ভবে পুলকিত লীলায়িত
সতত গর্ব্বিত।
Magnacharta Extortion
তোমার কাছেই শেখা,
তোমার কীর্ত্তি ঐ রয়েছে
কালের বুকে লেখা।
ন্যায়পরতা তোমার দেশেই
ছুটছে অবিরল,
তারেই সেধে বল্‌ছে সবাই
ঘু'চাক অশ্রুজল
অশ্রু ঝ'রে নির্ঝর হ'য়ে
শ্বেতদ্বীপে ধায়,
মায়ের মত ব্যথীতেরে
কোলে নিবি আয়।

শক্তি আছে ভক্তি আছে
আছে ব্যথা বোধ,
ক'রনাক এই মিনতি
তাদের গতিরোধ।
প্রতিভা তার আহার খোঁজে
সেথায় কেন বাধা,
শ্যাম চায় গো রূপের কমল
কমলিনীর রাধা।
কবিতা কবিতা রসিতা বনিতা
রস উগারিণী বালা,
রসিক হৃদয়ে দেও আলো ঢালি
আঁধারে করগো আলা।
চম্পক রঙে মণ্ডিত দেহ
হাসিতে মতির ভাতি,
সঙ্গীত-ঝরা বচনে তোমার
চিত্ত উঠে গো মাতি।
পৃথ্বীরাজের যোগেন ভায়া
নহেন প্রেমের কবি,
নীলবসনার চটুল হাসির
আঁকেন নাক ছবি।
বিরহিণীর হিয়ার মাঝে
কামের আগুন জ্বালি,
মৌরী মধু পান করায়ে
দেন না করতালি।
তাইতে তাহার আদর আজও
পোড়া দেশে হ'ল না,
গুপ্ত ব্যথায় মর্ম্ম ফাটে
ও কথা আর তু'লনা।
পৃথ্বীরাজের criticism
Baboon হবার লিখল কে?
লিখবেন যিনি ব'সে তিনি
বিরাগ ভরা বিবেকে,
—বোলপুরে
অমরুকের নূতন করি
হাত দেখাইলেন পাকা,
কস্তুরী আর Good wine
থাকে নাকো ঢাকা।

হিন্দু ভায়ার মধুর ভকে
জোর করে ঐ ব'সল কে।
মুকুর খানি প্রাণ সর্জ্জনী
সমুখে ওর রাখিয়া দে।
গণ্ডে শোভে লোধ্ররেণু
বাজান ধীরে মুগ্ধ বেণু,
মগ্ন থাকেন ধ্যান-সাগরে
মুক্তা-বিহীন শুক্তি তরে
পাত পেচীর ও ছবিখানি
সোণার frame এ আঁটা,
মূর্ত্তি পূজা ক'রতে গিয়ে
বুকে বেঁধে কাঁটা।
তাল বোধ নাই তবু বেহায়ার
ধুর পদে দেয় গিট্‌কিরী,
পঙ্কিল জল করিতে অমল
রাশি রাশি ঢালে ফিটকারী।
কবিতা আর নাগিক হৃদয়
রসের নাহিকো নব অভ্যুদয়
নারী আর নাই হৃদয়ময়ী
নারী আর নাই বিশ্বজয়ী।
মাতৃস্নেহের গোমুখী উচ্ছ্বাস
ফেনিল উর্ম্মির অনন্ত বিকাশ
দিন দিন ঐ যেতেছে সরি
কোন্‌খানে,
জানিস্ না তা পোড়ারমুখি
রূপ-নদীর ঐ মাঝখানে।
Pruning, pruning মাজন ঘসন
অঙ্গ করা চিক চিকি,
বাসন-বাসনা উঠেছে জাগিয়া
পিরীতি ক'রেছে ধিক্ ধিকি।
কজ্জল কালো কুন্তল রাশি
ছড়াইয়া দিয়া বরষা,
দরিদ্রের তরে করিছে গর্জ্জন
হইয়ে কেমন বিবশা।
কবিতায় এবে প্রহেলিকা ভরা
নীহারিকা ঢালে দীপ্তি,
রসের যেন বা কেমন অভাব
কিছুতে হয় না তৃপ্তি।
শ্রীব্রজগোপালগোপাল গোস্বামী।

হিন্দু সমাজে অসবর্ণ বিবাহ।

(এ আবার কি ?)

বড়লাট সাহেবের সভায় মধ্যপ্রদেশের নাগপুরের তেজস্বী প্রতিনিধি শ্রীযুক্ত পাটেল মহোদয় হিন্দুদের মধ্যে অসবর্ণ বিবাহ প্রচলিত এবং বৈধ করিবার মানসে এক বিল (পাণ্ডুলিপি) দাখিল করিয়াছেন। পুনার প্রতিনিধি শাস্ত্রী, মধ্য প্রদেশের প্রতিনিধি শুকুল, বোম্বাইর প্রতিনিধি শর্ম্মা, অযোধ্যা-আগ্রার প্রতিনিধি পণ্ডিত শাপ্রু এবং বাঙ্গালার প্রতিনিধি বন্দোপাধ্যায় প্রভৃতি ব্রাহ্মণগণ ঐ বিলের পৃষ্ঠপোষক বলিয়া জ্ঞাপন করিয়াছেন। তাঁহাদের এই জ্ঞাপন জানিয়া খ্রীষ্টান মহলে এবং ব্রাহ্মমহলে আতঙ্ক উপস্থিত হইয়াছে। আতঙ্ক উপস্থিত হইবার কারণ এই যে, এখন বিলাত-ফেরতাদিগকে হিন্দু সমাজে স্থান দেওয়া হয়; সুতরাং বিপদে পড়িয়া কোন হিন্দু ভদ্র-সন্তান আর খ্রীষ্টান বা ব্রাহ্ম হয়েন না। এখন যদি ত্রেতাযুগের ন্যায় মন্বাদি শাস্ত্রকারদের সংহিতানুসারে অসবর্ণ বিবাহ বৈধ বলিয়া এই কলিযুগে, এই ইংরাজাধিকৃত ভারতবর্ষে, চলিত হয়, তাহা হইলে খ্রীষ্টানদের এবং ব্রাহ্মদের কি উপায় হইবে? এখন ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বেণে প্রভৃতি জাতির লোকেরা এক বিদ্যালয়ে লেখা-পড়া শিখিয়া এবং বিলাতে যাইয়া সমশিক্ষ লোকের মধ্যে অসবর্ণ বিবাহের দোষ দেখিতে পান না; অনেকে বিলাতে ইংরেজ কন্যা বিবাহ করেন; অনেকে দেশে অসবর্ণা গ্রহণ করেন। পূর্ব্বে যেমন বিলাত-ফেরতাদিগকে হিন্দু সমাজ হইতে পঙ্‌ক্তিচ্যুত করা হইত, এখন অসবর্ণা-বিবাহকারীকে তেমনি সমাজের বাহিরে রাখিতে চেষ্টা করা হয়। তাঁহারা (অসবর্ণা-বিবাহকারীরা) অনন্যোপায় হইয়া হয় ব্রাহ্ম সমাজে, তা না হয় খ্রীষ্টান সমাজে ঢুকিয়া এই সকল সমাজের পুষ্টিবৃদ্ধি করেন। এজন্য শ্রীযুত পাটেল সাহেবের বিলে এতগুলি প্রতিনিধির অনুকূল মত দেখিয়া উভয় সমাজে একটা আতঙ্ক হইয়াছে।

এদিকে অনেক নিষ্ঠাবান্ হিন্দু কলিযুগে অসবর্ণ বিবাহের শাস্ত্রীয় বিধান নাই বলিয়া, অসবর্ণ বিবাহ দেশাচার-বিরুদ্ধ বলিয়া—উক্ত বিলের ঘোর প্রতিবাদ করিতেছেন। কলিযুগে বিধবাবিবাহের বা নিয়োগ প্রথার শাস্ত্রীয় বিধান নাই। তথাপি হিন্দুর বিধবা-বিবাহ-আইন পাস হইয়াছে, এবং পাস হওয়াতে এই উপকার হইয়াছে যে, বিধবা-বিবাহকারীরা এক পুরুষ অপাঙ্‌ক্তেয় থাকিয়া, দ্বিতীয় পুরুষ হইতে হিন্দু সমাজে চলিয়া যাইতেছেন। তাঁহাদিগকে খ্রীষ্টান সমাজের বা ব্রাহ্ম সমাজের অনুগ্রহের ভিখারী হইতে হয় না। ইহা কি হিন্দু সমাজের পক্ষে মঙ্গল না অমঙ্গলের কথা? স্বর্গীয় বেহারীলাল ভাদুড়ীর পরবংশ্য ব্যক্তিরা হিন্দু সমাজে রহিয়াছেন। হিন্দু সমাজের তাহাতে অনিষ্ট না হইয়া ইষ্টই হইয়াছে। পীর-আলি ব্রাহ্মণেরা হিন্দু সমাজে আছেন। তাহাতে কি হিন্দু সমাজ দুর্ব্বল হইয়াছে?

কোশল, পাঞ্চাল প্রভৃতি অঞ্চলে বিধবা-বিবাহকারীরা বা অসবর্ণ-বিবাহকারীরা এখন আর খ্রীষ্টান সমাজে বা ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ করেন না। সকলেই হিন্দু সমাজে বা বেদানু-

গামী আর্য্যসমাজে আশ্রয় পান। মহারাষ্ট্র, দ্রাবিড়, কর্ণাট প্রভৃতি অঞ্চলে বিধবা-বিবাহ বা অসবর্ণা-বিবাহ করিয়া কেহই হিন্দু সমাজে স্থান পান না। এজন্য অনেক অনিষ্টের উৎপত্তি হইয়াছে এবং হইতেছে। অসবর্ণ-বিবাহ-জাত সন্তানেরা আদালতে অবৈধ (illegitimate) জারজ সন্তান বলিয়া গণ্য হইতেছে। বিশেষতঃ সবর্ণ কে, এবং সবর্ণ বিবাহ কাহাকে বলে, তৎসম্বন্ধে আদালতে অনেক বিতণ্ডা হইয়াছে। মনু, যাজ্ঞবল্ক্য, বশিষ্ঠ প্রভৃতি সকলে চারি বর্ণ স্বীকার করেন যথা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র। তাঁহারা বলেন, এতদতিরিক্ত পঞ্চম বর্ণ নাই। এখন চারি শতের অধিক জাতি হইয়াছে। অন্য প্রদেশের কথা দূরে থাকুক, বাঙ্গালা দেশে কায়স্থ সদ্‌গোপের সবর্ণ কি না, বারুই তেলির সবর্ণ কি না, তাহা আদালতে অবিসংবাদিতরূপে স্থির হয় নাই। ব্রাহ্মণপুরোহিতেরা বলেন যে, ব্রাহ্মণ ও বৈদ্য ভিন্ন বঙ্গদেশের সকলেই শূদ্র। শূদ্রের দুই ভাগ, সৎ-শূদ্র এবং অশুদ্ধ শূদ্র। কায়স্থ ও নবশাখেরা সৎশূদ্র মধ্যে এবং সুবর্ণ বণিক সাহাদি ব্যক্তিরা অশুদ্ধ শূদ্র মধ্যে গণ্য। হাইকোর্টের কোন কোন বিচারপতি বলিয়াছেন, সকল শ্রেণীর শূদ্রই শূদ্র। সুতরাং কায়স্থ ও সাহাতে বিবাহ হইলে, তাহা সবর্ণ বিবাহ হয়। মগধ-বিদেহ-কাশী প্রভৃতি অঞ্চলে ভা।ন বা ভুঁইহার জাতি প্রবল। তাঁহারা ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয় দেন; কিন্তু কাহারও যাজন করেন না, এবং অন্য ব্রাহ্মণের সহিত তাঁহাদের যৌন সম্বন্ধ নাই। ব্রাহ্মণ ও ভুঁইহারে বিবাহ কি সবর্ণ বিবাহ অথবা অসবর্ণ বিবাহ ?

যাঁহারা মহাভারতাদি পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা জানেন, অসবর্ণ বিবাহ ত্রেতাযুগে অতি সাধারণ ছিল, এবং অসবর্ণ-জাত সন্তানেরা পিতার জাতি-কুল পাইত। মহাভারতকার ব্যাসমুনি মৎস্য-গন্ধার পুত্র। পাটনীর গর্ভে দ্রোণের জন্ম। অনুলোম বিবাহ চিরকালই প্রশস্ত বলিয়া চলিত ছিল; কিন্তু প্রতিলোম বিবাহ চলিত থাকিলেও, তাহা নিতান্ত গর্হিত বলিয়া অনেকে মনে করিতেন। শাস্ত্রানুসারে যে ত্রেতা-দ্বাপরে সকল কাজই হইত, তাহা নয়। এখনও তাহা হয় না। দেশ-কাল ভেদে, পারিপার্শ্বিক অবস্থা ভেদে, সামাজিক ব্যবহারের পরিবর্ত্তন হইয়াছে। এজন্য শাস্ত্রকারেরা দেশাচারকে তুচ্ছ করিয়া "সদাচার"কে শিরোধার্য্য করিয়াছেন; এবং শাস্ত্রের বিধি লঙ্ঘন করিয়া সমাজের সৎলোকদের আচরিত এবং অনুষ্ঠিত ব্যবহারকে অনেক স্থলে "ধর্ম্মের মূল" বলিয়া মন্বাদি শাস্ত্রকারেরা বিধান দিয়াছেন। এক সময়ে "নিয়োগ" প্রথার অত্যন্ত প্রচলন ছিল। তদনুসারে ব্যাসের ঔরসে ধৃতরাষ্ট্র এবং পাণ্ডুর জন্ম। তদনুসারে যম-পবন ইন্দ্রাদির দেবতার ঔরসে যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চ পাণ্ডবের জন্ম। ভারতবর্ষে এখন কোন "সৎ" লোক এই "নিয়োগ" প্রথার পক্ষপাতী নহেন। কিন্তু যেমন পারিপার্শ্বিক অবস্থা দাঁড়াইয়াছে, তাহাতে হিন্দুর বিধবা বিবাহের ন্যায় হিন্দুর অসবর্ণ বিবাহও নিঃসন্দিগ্ধ ভাবে বৈধ ও সঙ্গত বলিয়া আইন পাস হওয়া উচিত। বাঙ্গালার পূর্ব্বাংশে চট্টগ্রাম, শ্রীহট্ট প্রভৃতি অঞ্চলে এখনও ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ, বারুই ও সাহার মধ্যে ত্রেতা দ্বাপর যুগের ন্যায় অসবর্ণ বিবাহ প্রচলিত আছে। এই প্রকার অসবর্ণ বিবাহ প্রচলিত থাকায়, এই অঞ্চলে ব্রাহ্মণাদি পরস্পর বিবাহকারী জাতিসমূহের মধ্যে যেমন সদ্ভাব ও

সম্প্রীতি দৃষ্ট হয়, বাঙ্গালার অন্যান্য বিভাগে তাহা কদাচিত দেখিতে পাওয়া যায়।

যে সকল "ভদ্র" জাতির মধ্যে এক বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন এবং এক ব্যবসায় অবলম্বন হইতে বিদ্যা, বুদ্ধি ও চরিত্রগত সমতা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে, তাঁহাদিগকে শাস্ত্রের যথার্থ ব্যাখ্যানুসারে সবর্ণ বলিয়া স্বীকার করা উচিত। যতদিন "দ্বিজ" অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের মধ্যে গুরুগৃহে যাইয়া একত্র শিক্ষা দীক্ষা হইতেছিল, তত দিন ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের মধ্যে বিবাহের বিশেষ কোন বাধা ছিল না। বৌদ্ধধর্ম্মের অভ্যুদয়ে হিন্দুর পক্ষে গুরুগৃহে শিক্ষা এবং শিক্ষান্তে স্বগৃহে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া দারপরিগ্রহের কঠোর নিয়ম শিথিল হইয়া যায়। বাঙ্গালা প্রভৃতি দেশে ক্ষত্রিয় একেবারে লোপ পায়; বৈশ্যেরা শূদ্রবৃত্তিধারী শূদ্রাচারী হইয়া পড়ে। "বর্ণ" শব্দ লোপ পাইয়া "জাতি" শব্দের উদ্ভব হয়। "সনাতন ধর্ম্ম" দেশ ছাড়িলে তাহার ছায়া "হিন্দুধর্ম্ম" প্রবল হইয়া পড়ে। এক গুরুর নিকট ব্রাহ্মণের সহিত অন্য বর্ণের শিক্ষা দীক্ষা একেবারে বন্ধ হইয়া যায়। সহস্রাধিক বৎসর পরে ইংরেজাধিকারে কলেজ ও হোষ্টেল হইয়া আবার প্রাচীন ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য বর্ণ হইতে উদ্ভূত জাতিসমূহের এক গুরুর নিকট শিক্ষা, একত্রে অশন উপবেশনের নিয়ম চলিয়াছে। সুতরাং ত্রেতাদিযুগের অসবর্ণ-বিবাহের ন্যায় এই ইংরেজ যুগেও অসবর্ণ বিবাহে অনেক শিক্ষিত লোকের রুচি ও প্রবৃত্তি জন্মিয়াছে। ইহা স্বীকার করিতে হইবে।

মন্বাদি সকল শাস্ত্রেই ব্রাহ্মণাদি সকল বর্ণের পক্ষে "আপদ্-ধর্ম্মের" সুবিস্তার বিধান আছে। হিন্দু সমাজে বিধবা বিবাহের বিধান এবং অসবর্ণ-বিবাহের বিধান তেমনি আপদ্-ধর্ম্ম মধ্যে গণ্য করিতে হইবে। ব্রাহ্মণেরা যেমন অবস্থার তাড়নে ইংরেজাধিকারে শতকরা ৭৫ জন যাজন ও অধ্যাপনা পরিত্যাগ করিয়া অন্যান্য বৃত্তি অবলম্বন করিয়াছেন, তেমনি আধুনিক অবস্থার তাড়নে অনেক শিক্ষিত ব্যক্তি অসবর্ণা বিবাহ করিতেছেন। বেদ-পাঠ করেন না, এমন ব্রাহ্মণদিগকে ব্রাহ্মণ সমাজ হইতে তাড়াইলে যেমন ব্রাহ্মণ সমাজ চলিতে পারে না, তেমনি অবস্থানুসারে বিধবা-বিবাহকারী ও অসবর্ণা বিবাহকারীকে হিন্দু সমাজ তাড়না করিলে, হিন্দু সমাজ সবল থাকিতে পারিবে না।

যে সকল বাঙ্গালী বঙ্গের বাহিরে বাস করেন, তাঁহারা বেশ বুঝিতে পারেন যে, বিবাহ বিষয়ে ব্রাহ্মণ-বৈদ্য-কায়স্থাদি শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে বাধা থাকাতে কত অসুবিধা হয়। যদি স্বদেশে বা স্বগ্রামে না আসিয়া আসাম, উৎকল, মগধ ও কোশল প্রবাসী বাঙ্গালী ভদ্রলোকেরা কন্যাদিগকে অসবর্ণ পাত্রে সমর্পণ করিতে পারিতেন, তাহা হইলে সাংসারিক সুখ স্বাচ্ছন্দ্য কত বৃদ্ধি হইত। বাঙ্গালী কায়স্থ, উৎকলের করণ, আসামের কলিতা, মগধ ও কোশলের কায়স্থ ক্ষত্রিয়ে কোন বিভেদ নাই। হাইকোর্টের স্বর্গীয় জজ সারদাচরণ মিত্র তাহা বেশ বুঝিতেন। কিন্তু আধুনিক যুগের হিসাবে স্বতন্ত্র বর্ণ ভ্রমে ইহাদের মধ্যে কন্যা আদান প্রদান হইতে পারে না।

এই দেশে রাজনৈতিক উন্নতি বৃদ্ধি জন্য মুসলমানের সঙ্গে সম্প্রীতি স্থাপন করিতে হিন্দুরা কত ব্যগ্রতা প্রদর্শন করিতেছেন। যে লোক বিলাত-ফেরতাকে অথবা বিধবা-বিবাহকারীকে অথবা অসবর্ণ বিবাহকারীকে

হিন্দু সমাজ হইতে তাড়িত করিতে চেষ্টা করিতেছেন, মুসলমানের সহিত তাঁহার প্রীতি স্থাপন চেষ্টা অনেকটা অন্তঃসারশূন্য বলিয়া বোধ হয় না কি ?

শ্রীযুক্ত পাটেল মহোদয়ের প্রস্তাবিত অসবর্ণ বিবাহ আইন পাস হইলে, বিবাহকারী পুরুষ অসবর্ণা পত্নীকে পরিত্যাগ করিয়া অন্য পত্নী গ্রহণ করিতে পারিবেন। সবর্ণা পত্নীর জীবদ্দশায় যেমন হিন্দু দারান্তর গ্রহণ করিতে পারেন, এবং বিধবা বিবাহ করিলে, তাঁহার যেমন সেই অধিকার থাকে, অসবর্ণাকে বিবাহ করিলেও তাঁহার সেই অধিকার অক্ষুণ্ণ থাকিবে। অনেকে বিধবা বিবাহ করিয়া হিন্দু সমাজের তাড়নায় সেই পত্নীকে পরিত্যাগ করিয়াছেন। অসবর্ণা বিবাহ করিয়া যে অনেকে হিন্দু সমাজের অপাঙ্‌ক্তেয়তার ভয়ে অসবর্ণা স্ত্রীকে পরিত্যাগ করিবেন, তাহাও খুব সম্ভব। কিন্তু ইহার কি কোন প্রতি-বিধান আছে ? বহু বিবাহ নিবারণ জন্য প্রাতঃস্মরণীয় বিদ্যাসাগর মহাশয় যে চেষ্টা করিয়াছিলেন, আমরা তাহা প্রায় ভুলিয়া গিয়াছি। কুলীন ব্রাহ্মণদের মধ্যে বহু বিবাহের পরিমাণ ও সংখ্যা কতকটা কমিয়া আসিয়াছে বলিয়া, আমরা অনেকে মনে করিতেছি যে, এখন আর বিদ্যাসাগরের প্রদর্শিতরূপ "যথেষ্ট কারণ না থাকিলে, কেহ একাধিক বিবাহ করিতে পারিবে না", সেই প্রকার কোন আইন করিবার আবশ্যকতা নাই। তাহা আমার মত নয়। চোরের সংখ্যা কমিলেও এবং লম্পট ও পরদার-সেবীর সংখ্যা সমাজে অল্প হইলেও যেমন চৌর্য্যের দণ্ড এবং লাম্পট্যের দণ্ড প্রদানের বিধান থাকে, তেমনি বিদ্যাসাগরের প্রদর্শিত হেতু সকল আদালতে বা বিদ্বৎ-সমাজে প্রদর্শন এবং তাঁহাদের অনুমতি গ্রহণ না করিয়া, এক স্ত্রী জীবিত সত্ত্বে কাহারও দারান্তর পরি-গ্রহ করা উচিত নয়, এই প্রকার দণ্ডবিধি প্রণীত হওয়া উচিত।

কিন্তু শ্রীযুক্ত পাটেল মহোদয়ের প্রবর্ত্তিত আইনে সেই কথা উত্থাপন করা উচিত নয়। দুনিয়ায় সৎকাজ অনেক আছে। সকল সৎ-কাজ এক সঙ্গে কেহই করিয়া উঠিতে পারেন না। বিদ্যাসাগর মহাশয় হিন্দু সমাজে বিধবা বিবাহ প্রচলন করিয়াছেন; পাটেল মহাশয় অসবর্ণ বিবাহ প্রচলিত করুন্। দু-দশ বৎসর পরে অন্য কোন তেজস্বী ব্যক্তি স্ত্রী জীবিত সত্ত্বে বিনা কারণে দারান্তর গ্রহণের নিয়ম বন্ধ করিবেন। বহু বিবাহের পথ বন্ধ হইল না বলিয়া, অসবর্ণ বিবাহের দ্বার উন্মুক্ত করিতে কাহারও বাধা দেওয়া উচিত নয়।

আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, ব্রাহ্মণেরা অনেকে অসবর্ণ বিবাহের পক্ষপাতী, আর অব্রাহ্মণেরা অনেকে অসবর্ণ বিবাহের বিরোধী। সুপ্রীম্ কাউন্সীলে এক অ-ব্রাহ্মণ সভ্য বলিয়াছেন যে, অসবর্ণ বিবাহ প্রাচীন যুগে প্রচলিত ছিল না, এবং মন্বাদি প্রাচীন শাস্ত্রে তাহার কোন বিধান নাই। সুপ্রীম কাউন্সীলের অনেক হিন্দু সভ্য প্রাচীন যুগ সম্বন্ধে মহাভারত এবং মন্বাদি শাস্ত্রে কত অনভিজ্ঞ, অসবর্ণ বিবাহের বিরোধী সভ্যেরা তাহার প্রমাণ। সম্প্রতি বাবু বিজয়চন্দ্র মজুমদার কৃত "পৃথিবীর প্রাচীন ইতিহাস" নামে এক খণ্ড পুস্তিকা প্রবেশিকা পরীক্ষার পাঠ্যরূপে নির্দ্ধারিত হইয়াছে। তাহার একটী পাদ-টীকায় লিখিত আছে, "আমি জানি না।" এই কথা বলিতে কেহই স্বীকার করেন না। সকলেই মনে করেন, "সব-জান্তা।" পত্রিকার সম্পাদকদের, সভার

বক্তৃতাকারীদের, পল্লীগ্রামের বৃদ্ধাদের, "লব জাস্তা" না হইলে বোধ হয়, ব্যবসায় চলে না। কিন্তু ব্যবস্থাপক সভার মাননীয় সভ্যদিগকেও যে এই প্রকার মিথ্যা ভাণ না করিলে চলে না, তাহা জানিতাম না।

ব্রাহ্মণেরা অনেক জল-অচল জাতিকে জল-চল করিতে, এবং অস্পৃশ্য জাতিকে স্পৃশ্য করিতে ইচ্ছা করেন, কিন্তু অব্রাহ্মণ জল-চল জাতিরা এবং স্পৃশ্য জাতিরা তাহাতে বাধা দেন। জল-অচল জাতির সংখ্যা বাড়াইয়া আবশ্যক কি? অস্পৃশ্য জাতির সংখ্যা বাড়াইয়া আবশ্যক কি? যে সকল জাতির এই প্রকার ভাব, ব্যবহার ও মত, তাহারা যে জল-চল হইবার অযোগ্য—স্পৃশ্য হইবার অযোগ্য, তাহাতে সন্দেহ নাই। অসবর্ণ বিবাহ প্রচলিত হইলে, বোধ হয়, সেই ভাব আরো জাগিয়া উঠিবে। বৈদ্যেরা ব্রাহ্মণদিগকে বলিবেন, বৈদ্য কন্যা থাকিতে কায়স্থ কন্যা গ্রহণ করিবেন না। সদ্‌গোপেরা কায়স্থদিগকে বলিবেন—গোপ কন্যা থাকিতে সুবর্ণ-বণিক-কন্যার লোভ করিবেন না। সে যাহা হউক, বেদাদি শাস্ত্র সমূহ ৺যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু এবং অন্যান্য উদ্যোগী পুরুষের চেষ্টায় অনুদিত হইয়া এত বহুল পরিমাণে বঙ্গ দেশের সহরের প্রতি মহল্লায় এবং প্রতি পল্লীগ্রামে প্রচারিত হইয়াছে যে, কাহাকেও শাস্ত্রার্থের মিথ্যা ব্যাখ্যা করিয়া বিমোহিত করিবার আর দিন নাই। নিতান্ত পল্লীগ্রামেও শাস্ত্রের কল্পিত ব্যাখ্যা করা কঠিন হইয়াছে। ব্যবস্থাপক সভা তো অনেক দূরের কথা।

কোন হিন্দুকে ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিধবা বিবাহ করিতে হয় না; তেমনি কোন হিন্দুকেই ইচ্ছার বিরুদ্ধে অসবর্ণ বিবাহ করিতে হইবে না, অথবা অসবর্ণ পাত্রে কন্যা সম্প্রদান করিতে হইবে না। বিধবা বিবাহ প্রচলন করিয়া, এবং বিলাত-ফেরতাদিগকে তাড়িত না করিয়া, যেমন হিন্দু সমাজে দিন দিন অধিক বল সঞ্চয় করিতেছেন, তেমনি অসবর্ণ-বিবাহকারীদিগকে বক্ষে ধারণ করিয়া হিন্দু সমাজ অধিকতর বলবান্ হইবেন।

বাল্মীকি-কৃত ষট্‌কাণ্ড রামায়ণে ব্রাহ্মণেরা এক নূতন কাণ্ড (উত্তরা কাণ্ড) যোগ করিয়া এবং নবাগত রাজপুতদিগকে রামের বংশোদ্ভব সূর্য্যবংশীয় ক্ষত্রিয় বলিয়া স্বীকার করিয়াছিলেন বলিয়া, মুসলমান আক্রমণকারীদিগকে বাধা দিবার লোক ছিল। আর পঞ্চনদ হইতে গঙ্গাসাগর পর্য্যন্ত সহস্র-জাতিতে বিভক্ত হিন্দুরা মুসলমান আক্রমণ-কারীদিগকে কি বাধা দিয়াছিলেন? অসবর্ণ বিবাহ সূত্র দিয়া, আবার ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য শূদ্র সকল জাতিকে দৃঢ়রূপে এক জাতিতে (nation) আবদ্ধ না করিলে, আর দেশের মঙ্গল নাই। ইহা ধ্রুব সত্য।

অব্রাহ্মণের আচার্য্য হওয়া, এবং অসবর্ণ বিবাহ দেওয়া, এই দুই বিষয় লইয়া ৫০ বৎসর হইল, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ এবং ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রে মনোমালিন্য হয়। এই মনোমালিন্য হেতু ব্রহ্মানন্দ কলিকাতার আদিসমাজ পরিত্যাগ করিয়া ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন করেন। তাঁহার মূল মন্ত্র ছিল, "যাঁর আছে ভক্তি, পাবে মুক্তি, নাহি জাত্-বিচার।" এই "জাত্-বিচার নাই" ভিত্তি করিয়া, ১৮৭২ সালে বিবাহ বিষয়ক তিন আইন পাস হয়। ৺প্রিয়নাথ শাস্ত্রীর প্রকাশিত মহর্ষি দেবেন্দ্র-নাথের এক পত্র পাঠ করিয়া জানা যায় যে, মহর্ষি মনে করিতেন, "২০০ দুই শত বৎসর পরে অসবর্ণ বিবাহের কথা উঠিতে পারে, তাহার পূর্ব্বে নয়।" পঞ্চাশ বৎসর যাইতেই

দ্রাবিড়, মহারাষ্ট্র, কোশল, পাঞ্চাল এবং বঙ্গ হইতে ব্রাহ্মণ-প্রতিনিধিরা হিন্দু সমাজে অসবর্ণ বিবাহের বৈধতা সিদ্ধ করিবার জন্য ব্যবস্থাপক সভায় পাণ্ডুলিপি দাখিল করিলেন। ইহা কি সুখের কথা? মহর্ষি জীবিত থাকিলে আহ্লাদের সহিত তাঁহার ভ্রম সংশোধন করিতেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। ইংরেজেরা কি ১৮৯৩ সালে অথবা ১৯০৯ সালে মিণ্টো-মর্লীকৃত ভারত-সংস্কার প্রবর্তন সময়ে মনে করিয়াছিলেন, ১৯১৭ সালে ভারতবর্ষে কনোজ ও অষ্ট্রেলিয়ার ন্যায় দায়িত্বপূর্ণ স্বায়ত্তশাসনের প্রস্তাব উপস্থিত হইবে। "ধর্ম্মস্য সূক্ষ্মাগতিঃ"; শুধু তাহা নয়। ধর্ম্মস্য ত্বরিতা গতিঃ। যখন "বিশ্বাসো ধর্ম্মমূলং হি, সত্যংশাস্ত্রম্ অনশ্বরম্" কোন জাতির মূল মন্ত্র হয়, সকলেই অবিনশ্বর শাস্ত্র বলিয়া সত্যকে গ্রহণ করে, বিশ্বাসের সহিত তাহার অনুষ্ঠান করে, তখন সত্য জয়যুক্ত হইয়া দ্রুতগতিতে নির্ভয়ে চলিতে থাকে।

শ্রীশ্রীনাথ দত্ত।

গীতোক্ত ত্রিগুণতত্ত্ব। (৫)

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

পুরাণোক্ত ত্রিগুণতত্ত্ব।—আমরা পুরাণ হইতেও পরমেশ্বরের সচ্চিদানন্দ স্বরূপের সহিত পরমা প্রকৃতির এই সত্ত্ব রজঃ ও তমোগুণের যে সম্বন্ধ আছে, তাহার আভাস পাই। পুরাণমতে, এই ত্রিগুণ অনুসারে যিনি আদ্যাশক্তি মহামায়া—তিনি মহাকালী, মহালক্ষ্মী ও মহাসরস্বতী। তমঃশক্তিরূপা মহাকালী,—তিনি তমঃশক্তি-অভিমানিনী দেবতা, তমোগুণ হেতু সর্ব্বসংহার-রূপিণী। আর তিনিই আনন্দময়ী মাতা। সত্ত্বশক্তি-রূপা মহালক্ষ্মী,—তিনি সত্ত্বশক্তি-অভিমানিনী দেবতা, তিনি সত্ত্বগুণহেতু সর্ব্ব জগদ্ধাত্রী, সর্ব্বজগৎপালয়িত্রী, রক্ষাকর্ত্রী—পরমা শ্রী-রূপিণী। তিনি এই কর্ম্মাত্মক জগতের অধিষ্ঠাত্রী মহাদেবী সর্ব্বস্থিতিরূপা। আর রজঃশক্তিরূপা মহাসরস্বতী। তিনি মহা-বিদ্যারূপা, শব্দাত্মিকা বা শব্দব্রহ্ম হইতে অভিব্যক্ত জ্ঞানস্বরূপা মাতা,—তিনি ভোগ-মোক্ষদাত্রী। অবিদ্যারূপে তিনিই বন্ধন করেন, আর প্রসন্ন হইয়া পরাবিদ্যারূপে তিনিই মোক্ষদান করেন। তিনি রজঃশক্তি-অভিমানিনী দেবতা—বিশ্ব সৃষ্টিকারিণী। আর এই মহাশক্তির সহিত অভেদরূপ যে মহা-শক্তিমান পরমেশ্বর, আনন্দস্বরূপ, তিনি তমঃশক্তির নিয়ন্তৃরূপে মহারুদ্র সদাশিব। সৎ-স্বরূপ তিনিই সত্ত্বশক্তির নিয়ন্তৃরূপে মহাবিষ্ণু—নারায়ণ। আর চিৎস্বরূপ তিনি রজঃশক্তির নিয়ন্তৃরূপে মহাব্রহ্মা—কার্য্যব্রহ্ম বা হিরণ্যগর্ভ।

এস্থলে এসম্বন্ধে আর অধিক কিছু বলিবার প্রয়োজন নাই। পূর্ব্বে ৮ম অধ্যা-য়ের ব্যাখ্যাশেষে ওঁঙ্কার তত্ত্ব-বিবৃতি সময়ে ইহার আভাস দেওয়া হইয়াছে। আমরা ১৩শ অধ্যায়ের ব্যাখ্যাশেষে প্রকৃতি-পুরুষ তত্ত্ব আলোচনার সময়ে দেখিয়াছি যে, পরমাত্মা পরমপুরুষ হইতেই মূল প্রকৃতি পুরুষ ভাবে অভিব্যক্তি হয়। ব্রহ্ম বা পুরুষ যে আপনাকে পুং-স্ত্রীরূপে দ্বিধা বিভক্ত করেন, তাহাও বৃহদারণ্যক উপনিষদ হইতে আমরা জানিতে পারি। (১।৩।৩)। ব্রহ্ম আনন্দসম্ভোগার্থ

বা রমণার্থ আপনার দ্বিতীয় অভিলাষ করিয়া পুং-স্ত্রীভাবে আপনাকে প্রথমে দ্বিধা বিভক্ত করিয়াছিলেন। ইহাই ব্রহ্মের অনাদি পুরুষ-প্রকৃতিরূপ। এই উভয় রূপই সচ্চিদানন্দ-স্বরূপভেদে অথবা ক্রিয়া-ভেদে ত্রিধা বিভক্তের ন্যায় হয়। পুরুষ ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব আর প্রকৃতি সরস্বতী, লক্ষ্মী ও কালীরূপিণী হন। মহাকবি কালিদাস গাহিয়াছেন,

"নমস্ত্রি-মূর্ত্তয়ে তুভ্যং প্রাক্‌সৃষ্টেঃ কেবলাত্মনে।
গুণত্রয়-বিভাগায় পশ্চাদ্ভেদমুপেয়ুষে॥"

বেদান্তানুযায়ী সাংখ্যোক্ত ত্রিগুণ-তত্ত্ব।—এইরূপে সাংখ্যবেদান্ত শাস্ত্র সমন্বয় পূর্ব্বক ও অন্যান্য শাস্ত্র আলোচনা করিয়া এই ত্রিগুণের উৎপত্তি ও স্বরূপ সম্বন্ধে যাহা জানা যায়, তাহা আমরা সংক্ষেপে বুঝিতে চেষ্টা করিলাম। কেবল সাংখ্য শাস্ত্র আলোচনা করিলেও এই সিদ্ধান্তের যে আভাস পাওয়া যায়, তাহাও এক্ষণে দেখিতে হইবে। আমাদের মনে রাখা কর্ত্তব্য যে, সাংখ্য ও বেদান্তে বিশেষ বিরোধ নাই। তবে সাংখ্যের যেখানে শেষ, এক অর্থে বেদান্তের সেইখানে আরম্ভ,—ইহা মনে রাখিতে হইবে। প্রকৃতি পুরুষ-বিবেকজ্ঞান দ্বারা দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তির উপায় নির্দ্ধারণ করাই সাংখ্যশাস্ত্রের উদ্দেশ্য। এজন্য প্রকৃতি-পুরুষ-বিবেকজ্ঞান এবং প্রকৃতির ত্রিগুণের দ্বারা পুরুষের বন্ধন ও দুঃখভোগ এবং সেই বন্ধনমুক্তিতে অত্যন্ত দুঃখ-নিবৃত্তি জ্ঞান,—এই মাত্র সাংখ্যশাস্ত্রের আলোচ্য বিষয়; ইহাই এক অর্থে সাংখ্যজ্ঞান। সুতরাং প্রকৃতি ও পুরুষের স্বরূপ কি, ত্রিগুণের মূল বা স্বরূপ কি, তাহা সাংখ্যশাস্ত্রে বিশেষভাবে আলোচনার প্রয়োজন হয় নাই। বেদান্ত হইতে সে সকল তত্ত্ব জানিতে হয়। বিজ্ঞানভিক্ষু (সাংখ্য-সূত্রের ভাষ্যের উপক্রমণিকায়) এইরূপে সাংখ্য ও বেদান্ত শাস্ত্রের সম্বন্ধ নির্ণয় করিয়াছেন। সে যাহা হউক, সাংখ্যশাস্ত্র হইতে এই ত্রিগুণের উৎপত্তি ও স্বরূপ সম্বন্ধে যেটুকু আভাস পাওয়া যায়, তাহা এস্থলে দেখিতে হইবে।

সাংখ্যমতে পুরুষের সান্নিধ্যে প্রকৃতির পরিণাম হইয়া, এই জগৎ অভিব্যক্ত হয়। সাংখ্যসূত্রে আছে—"তৎসন্নিধানাৎ অধিষ্ঠাতৃত্বং মণিবৎ" (১।৯৬)। চুম্বক যেমন লোহের সন্নিহিত হইলে, তাহার অধিষ্ঠান হেতু চুম্বকের ধর্ম্ম লোহে সংক্রমিত হয়, সেইরূপ পুরুষ প্রকৃতির সন্নিহিত থাকিলে, প্রকৃতিও এক অর্থে পুরুষের ভাব প্রাপ্ত হয়। প্রকৃতি 'জ্ঞ'-স্বরূপ পুরুষের জ্ঞান ও চৈতন্যের আভাস গ্রহণ করে। এজন্য প্রকৃতিতে প্রথমে মহত্তত্ত্ব বা বুদ্ধিতত্ত্ব অভিব্যক্ত হয় অর্থাৎ প্রকৃতিতে 'জ্ঞ'-স্বরূপ পুরুষের জ্ঞানের প্রতিবিম্ব পতিত হইয়াই তাহাতে সত্ত্বগুণের অভিব্যক্তি হয় ও বুদ্ধিতত্ত্বের উৎপত্তি হয়, এই বুদ্ধিতত্ত্বে পুরুষ সান্নিধ্যে যে ক্রিয়া উৎপন্ন হয়, তাহাই জ্ঞানক্রিয়া, সেই ক্রিয়াহেতু বুদ্ধিতত্ত্বে 'অহং' (অহঙ্কার তত্ত্ব) ও 'ইদং' (তন্মাত্র) এই দুই ভাবের অভিব্যক্তি হইয়া পরস্পর ভিন্নরূপে প্রতীয়মান হয়। এই ক্রিয়া দ্বারাই বুদ্ধি বা জ্ঞান রঞ্জিত বা চালিত হয় বলিয়া, ইহাকে রজোগুণ বলা যায়। বুদ্ধিতত্ত্ব হইতে যে অহঙ্কারতত্ত্ব, মনস্তত্ত্ব, দশ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চতন্মাত্র ক্রমে ক্রমে অভিব্যক্ত হয়, সেই কয়টি মিলিয়া লিঙ্গ শরীর সৃষ্টি করে, এবং পুরুষের ভোগমোক্ষার্থ তাহাকে সেই লিঙ্গ শরীরে বদ্ধ করে। এই হেতু পুরুষের চিদ্‌ভাব গ্রহণ করিয়া, লিঙ্গ শরীর চেতনবৎ হয় বা চেতনভাবযুক্ত হয়। অতএব পুরুষ

হইতেই প্রকৃতি জ্ঞান বা বুদ্ধিতত্ত্ব ও চেতনভাব প্রাপ্ত হয়। ইহা হইতে বলা যায় যে, সত্ত্ব গুণের মূল ভাব এই জ্ঞান ও চৈতন্য, যাহা পুরুষ হইতেই প্রকৃতিতে অভিব্যক্ত হয়। এই জ্ঞান, বুদ্ধিজ্ঞান—সাত্ত্বিক বুদ্ধির এক মূলভাব। সেইরূপ রজোগুণের যে মূল ভাব প্রবৃত্তি বা ক্রিয়া, তাহাও প্রকৃতি পুরুষের সান্নিধ্য হেতু লাভ করে। আর তমোগুণের যে মূল ভাব স্থিতি ও জড়তা, তাহা পুরুষের অধিষ্ঠাতৃত্বে প্রকৃতির জ্ঞান ও কর্ম্মবৃত্তি বিকাশে বাধা দান (বা প্রতিক্রিয়া) হেতু অভিব্যক্ত হয়। আমরা অন্যরূপেও একথা বুঝিতে পারি। বুদ্ধিতত্ত্ব হইতে যে অহঙ্কার অভিব্যক্ত হইয়া 'অহং' ও 'ইদং' বা 'জ্ঞাতা' ও 'জ্ঞেয়' এই দুই ভাবের অভিব্যক্তি হয়, অথবা বুদ্ধির মূল ভাব জ্ঞান ভিন্ন হইয়া 'জ্ঞাতা' ও 'জ্ঞেয়' এই দুই ভাবে বিকাশ হয়; সেই 'জ্ঞেয়'ই জড়রূপে আমাদের জ্ঞানে প্রকাশিত হয়। ইহারই সূক্ষ্মরূপ পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়-গ্রাহ্য পঞ্চতন্মাত্র ও স্থূলরূপ পঞ্চ স্থূল ভূত। 'জ্ঞেয়'-রূপে ইহা জ্ঞাতার পরিচ্ছেদক বা আবরক, ইহাই জ্ঞান ও ক্রিয়ার অবরোধক। এজন্য ইহা তমোরূপ। অতএব 'আমরা বলিতে পারি যে, পুরুষ-সংযোগে' প্রকৃতিতে যে সত্ত্ব গুণের উদ্ভব হয়,—বুদ্ধিতত্ত্ব তাহার ঘনীভূত সূক্ষ্মরূপ, যে রজো গুণ উদ্ভূত হয়, অহঙ্কার-তত্ত্ব তাহার ঘনীভূত সূক্ষ্মরূপ, এবং মন ও দশ ইন্দ্রিয় তাহার ব্যাকৃত রূপ; আর যে তমোগুণ অভিব্যক্ত হয়, তন্মাত্র তাহার সূক্ষ্মরূপ ও স্থূলভূত তাহার স্থূলরূপ। অতএব সাংখ্য দর্শন হইতেও পুরুষের সান্নিধ্যজনিত অধিষ্ঠাতৃত্বে প্রকৃতিতে এই ত্রিগুণের উদ্ভব হয়, ইহা সিদ্ধান্ত করা যায়। এই পুরুষ-প্রকৃতির সংযোগই সাংখ্যদর্শন অনুসারে যে এই প্রকৃতি হইতে ত্রিগুণের উৎপত্তির মূল কারণ, তাহা সিদ্ধান্ত করা যায়। ত্রিগুণের কারণ কেবল প্রকৃতিতেই অনুসন্ধান করিবার প্রয়োজন হয় না, এবং মূল প্রকৃতি যে এই ত্রিগুণের সাম্যাবস্থা মাত্র এবং পুরুষের সান্নিধ্যে গুণক্ষোভ হেতু বা বিষম পরিণাম হেতু ভিন্ন হইয়া এই ত্রিগুণের পৃথক অভিব্যক্তি হয়, তাহাও স্বীকার করিবার প্রয়োজন হয় না। অতএব, এই কথা স্বীকার করিলে, সাংখ্য বেদান্ত সমন্বয় পূর্ব্বক ত্রিগুণকে প্রকৃতিতে পুরুষের সচ্চিদানন্দ স্বরূপের সংক্রমিত বা প্রতিবিম্বিত রূপ, ইহা সিদ্ধান্ত করা যায়।

জ্ঞাতা (ক্ষেত্রজ্ঞ) জ্ঞেয় (ক্ষেত্র) বিভাগ।—এইরূপে ত্রিগুণতত্ত্ব আমরা যতদূর সম্ভব, তাহা মননপূর্ব্বক বুঝিতে চেষ্টা করিলাম। এক্ষণে এই ত্রিগুণ সম্বন্ধে আরও দুই এক কথা বুঝিতে হইবে। আমরা দেখিয়াছি, সত্ত্বকে জ্ঞান বা প্রকাশ-শক্তি, রজঃকে ক্রিয়া শক্তি ও তমঃকে আবরণ শক্তি বলা যায়। সত্ত্ব যেমন জ্ঞানকে প্রকাশ করে, জ্ঞাতার স্বরূপকে জ্ঞেয় হইতে ভিন্ন করিয়া অভিব্যক্ত করে, সেইরূপ রজঃ জ্ঞানকে প্রবৃত্তিবলে পরিচালিত করে,—জ্ঞাতাকে জ্ঞেয়ের সহিত সম্বদ্ধ করে, জ্ঞাতাকে বিক্ষিপ্ত করে,—আর তমঃ জ্ঞাতার- স্বরূপ আবৃত্ত করে এবং জ্ঞাতার যে কর্ম্মপ্রবৃত্তি, তাহাকে অবসন্ন করে এবং 'জ্ঞেয়'রূপে 'জড়'রূপে জ্ঞানকে আবৃত করিয়া, তাহার প্রকাশে ও প্রবৃত্তিতে বাধা দেয়। আমাদের প্রথম ও প্রধান 'জ্ঞেয়' আমাদের শরীর বা ক্ষেত্র। এই ক্ষেত্রজ্ঞান হেতু আমরা ক্ষেত্রজ্ঞ হই। এই জ্ঞেয় ক্ষেত্র জড়। আমাদের স্থূল শরীরই প্রধানতঃ জড় তমোময়। ইহা হইতে

আমাদের তামসিক ভাবের অভিব্যক্তি হয়। আমাদের প্রাণময় কোষ ও মলিন মনোময় কোষরূপ যে সূক্ষ্ম শরীর, তাহা রজঃপ্রধান; তাহাতে আমাদের রাজসিক ভাবের অভিব্যক্তি হয়। আর শুদ্ধ মনোময় কোষ ও বিজ্ঞানময় কোষরূপ যে সূক্ষ্ম শরীর, তাহা সত্ত্বপ্রধান। তাহাতে আমাদের সাত্ত্বিক ভাবের অভিব্যক্তি হয়।'

ত্রিগুণ হেতু জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়ের বিভাগ, বাহ্য জ্ঞেয় বিষয়ের স্বরূপ। —আমরা বলিয়াছি যে, আমাদের প্রথম ও প্রধান জ্ঞেয় আমাদের স্থূল শরীর, ইহা আমাদের আন্তর প্রত্যক্ষের বিষয়। বাহ্য বিষয় সকল আমাদের বাহ্য প্রত্যক্ষ ইন্দ্রিয় দ্বারা জ্ঞেয় হয়, এই জ্ঞেয়রূপে তাহারা আমাদের জ্ঞানে স্থিত হয়। এই জ্ঞেয়ভাবে স্থিতির হেতু তমোগুণের স্থিতি রূপ। তমঃ দ্বারাই বাহ্য বিষয় সকল জ্ঞেয়রূপে জ্ঞানে স্থিত হয়। আমাদের জ্ঞান তমোরূপ অজ্ঞানের আবরণে আবৃত থাকায়, এই বাহ্য বস্তু সকলের স্বরূপ জানিতে পারা যায় না; আমাদের অজ্ঞান তাহাদিগকে তমঃ আবরণে আবৃত করিয়া রাখে। যাহা হউক, আমাদের এই অজ্ঞান আবরণ যথাসম্ভব উন্মুক্ত করিয়া, এই সকল জ্ঞেয় বিষয়ের তত্ত্ব—অথবা বাহ্য বস্তু সকলের স্বরূপ, তাহাদের মধ্যে এই ত্রিগুণের কিরূপ অভিব্যক্তি হয়, তাহার তত্ত্ব এ স্থলে সংক্ষেপে বুঝিতে হইবে। আমাদের প্রথমেই দেখিতে হইবে যে, আমিই যে একমাত্র 'জ্ঞাতা' আর সকলেই আমার জ্ঞেয় তাহা নহে। আমি চেতন 'জ্ঞাতা' (subject) এবং তুমি যেমন আমার জ্ঞেয় (object), সেই রূপ তুমি তোমার কাছে 'জ্ঞাতা' এবং আমি তোমার জ্ঞেয়। জগতে যাহা কিছু স্থাবর জঙ্গমাত্মক সত্তা আছে, প্রত্যেকেই তাহার নিজের সম্বন্ধে 'জ্ঞাতা' ও পরের সম্বন্ধে 'জ্ঞেয়'।

ত্রিগুণ দ্বারা আপরমাণু সর্ব্বভূতশরীরের ক্রমবিকাশ।—ভগবান্ বলিয়াছেন যে, সমুদায় স্থাবর জঙ্গমাত্মক সত্তাই ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ-সংযোগ হইতে উৎপন্ন। (১৩২৬) আমরা সে স্থলে বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি যে, তদনুসারে সামান্য বালু-কণাটী, এমন কি, যাহাকে আমরা পরমাণু বলি, তাহাও ভূত, তাহাও সত্তা, তাহাও ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ-সংযোগ হইতে উৎপন্ন; ইহা পূর্ব্বে উক্ত শ্লোকের ব্যাখ্যায় বিবৃত হইয়াছে। পাতঞ্জল দর্শনের ব্যাস-ভাষ্যে আছে যে, পরমাণু ও অযুত-সিদ্ধ-অবয়ব (সংঘাত) তাহাও দ্রব্য, তাহাও সত্তা। ইহারাই ভূতগণের সূক্ষ্মরূপ। * অতএব ক্ষুদ্র পরমাণুটীও ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ-যোগে উৎপন্ন। ভগবান্ গীতায় (১৩।৭-১১ শ্লোকে) এই ক্ষেত্রের স্বরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। মন বুদ্ধি অহঙ্কার বা অন্তঃকরণ ক্ষেত্রের উপাদান। অতএব

* যাহার অবয়ব পৃথক্ ভাবে থাকে না, পরস্পর মিলিত ভাবে অবস্থান করে, তাহাকে অযুত-সিদ্ধাবয়ব বলে, যেমন শরীর বৃক্ষ পরমাণু প্রভৃতি। ভগবান্ পতঞ্জলি বলেন,—অযুতসিদ্ধাবয়ব ভেদের অনুগত সমূহই দ্রব্য। উহার অবয়ব সকল পরস্পর অসংশ্লিষ্ট নহে, কিন্তু সর্ব্বতোভাবে মিলিত। ভূতগণের স্বরূপ অবস্থা পরমাণু। ভূতগণের কারণ বা তাহাদের সূক্ষ্ম অবস্থা পঞ্চতন্মাত্র, পরমাণু উহার এক পরিণাম বা অবয়ববিশেষ। পরমাণু বলিলে মূর্ত্তি প্রভৃতির (সামান্যের) ও শব্দাদি 'বিশেষে'র সমূহ বুঝায়। পরমাণুতে এই সামান্য ও বিশেষ অপৃথক ভাবে অবস্থিত। তন্মাত্র হইতে পরমাণুক্রমে স্থূল ভৌতিক ঘটাদি পর্য্যন্ত। গুণত্রয় তন্মাত্রে, পরমাণুতে, ও পঞ্চভূতে অনুগত আছে। ইহা ভূতগণের চতুর্থরূপ। (পাতঞ্জল সূত্র ৩।৪৪ ব্যাস-ভাষ্য)

পরমাণু প্রভৃতি সত্তার বা ভূতের সূক্ষ্মরূপে ও প্রচ্ছন্নভাবে অন্তঃকরণ আছে; তাহাতেও সত্ত্ব রজঃ ও তমঃ এই ত্রিগুণের ভাব—খ্যাতি বা প্রকাশ (সত্ত্ব) ক্রিয়া (রজঃ) ও স্থিতি (তমঃ) ভাব—আছে।

"অথ ভূতানাং চতুর্থরূপং খ্যাতিক্রিয়া স্থিতিশীলা গুণাঃ কার্য্যস্বভাবানুপাতিনঃ" (পাতঞ্জল ৩।৪৪ সূত্রের ব্যাসভাষ্য)।

এই জন্য আমরা বলিতে পারি যে স্থাবর-জঙ্গম ভূত সকল-সত্তাই ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ যোগে উৎপন্ন বলিয়া, তাহাদের মধ্যে চৈতন্য ও অন্তঃকরণ আছে। তবে আমরা যাহাকে জড় বলি, তাহার মধ্যে এই চেতনা ও অন্তঃকরণ (লিঙ্গাদি) প্রচ্ছন্ন অবস্থায় থাকে—বীজভাবে থাকে। তাহাদের মধ্যে এই অন্তঃকরণ ও ইন্দ্রিয়গণ অবিকাশিত থাকে,—জ্ঞান ও ক্রিয়ার অভিব্যক্তি থাকে না। তাহাদের জ্ঞানে জ্ঞাতৃজ্ঞেয় ভাবের বিকাশ থাকে না,—ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ অভিন্ন ভাবে থাকে, তাহাদের ক্ষেত্র সম্পূর্ণরূপে তমঃ দ্বারা অভিভূত থাকে। সে ক্ষেত্রজ্ঞ আপনার ক্ষেত্রমধ্যেই অভিভূত ভাবে অবস্থান করে; বাহ্য বিষয়ের সহিত তাহার বড় সম্বন্ধ রাখে না—বাহ্য বিষয়ের সম্পর্কে সে বড় সাড় দেয় না। এই অবস্থা তাহাদের অসম্পূর্ণ তম-আবৃত অবস্থা। তখন ক্ষেত্রজ্ঞ আত্মা সেই অবিকাশিত ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ রুদ্ধ থাকে,—সেই অবস্থায় সে বদ্ধ তমোভাবে একরূপ আনন্দ ভোগ করে। তাহার পর ক্রমে ক্রমে ক্ষেত্রের বিকাশ হইতে আরম্ভ হয়; স্থবির বৃক্ষাদিরূপে তাহাতে প্রাণ শক্তির বিকাশ ও ক্রিয়া আরম্ভ হয় এবং আন্তরানুভূতির বিকাশ হইতে আরম্ভ হয়। পরে সেই সত্তায় আরও বিকাশ হইলে, তাহার অন্তঃকরণ ও বহিঃকরণ, যাহা বীজভাবে ক্ষেত্রে নিহিত ছিল, তাহার বিকাশ হইতে আরম্ভ হয়,—ক্রমে সে সত্তা জঙ্গমজীবরূপে পরিণত হয়। তখন বাহ্য 'ইদং' এর সহিত তাহার সম্বন্ধ হয়, তাহার সহিত আদান প্রদান চলিতে থাকে, বাহ্য বিষয়ের সহিত সম্বন্ধ হইলে, তাহাতে সে সাড়া দেয়, এবং তদনুসারে প্রাণশক্তি দ্বারা * আপনার ধারণ, পোষণ ও রক্ষণ কার্য্যাদি পরিচালিত করে। ইহাই যে জীবের জীবত্ব ও বাহ্য বিষয়ের (ইদং, এর) সহিত সম্বন্ধ হেতু জৈবক্রিয়ার অবস্থা; ইহার ফলে তাহার ক্ষেত্রের ক্রমবিকাশ হইতে থাকে। পরে যখন এইরূপে বাহ্য বিষয়ের সহিত সম্বন্ধের বিকাশে তাহার বৃত্তিজ্ঞানের বিশেষ অভিব্যক্তি হয়, তখন আবার সে বাহ্য

* এই প্রাণ সম্বন্ধে এ স্থলে কয়েকটী কথা উল্লেখ করা আবশ্যক। বেদান্ত মতে মুখ্য প্রাণ শ্রেষ্ঠ, সমষ্টিভাবে তাহা হিরণ্যগর্ভ। তাহা হইতে সমুদায় ভূত-শরীর সৃষ্ট হয়। এই প্রাণ যে গীতোক্ত পরাপ্রকৃতি, তাহা পূর্ব্বে ৭।৫ শ্লোকের ব্যাখ্যায় বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি। এই প্রাণই জীবভূত হইয়া জগৎ ধারণ করে। গীতা অনুসারে প্রকৃতি দুইরূপ—পরা ও অপরা। সুতরাং ত্রিগুণ যখন প্রকৃতি-সম্ভব, তখন ইহাদের কারণরূপে প্রাণকেও গ্রহণ করা যাইতে পারে। আমাদের সূক্ষ্ম শরীর প্রাণময় কোষের দ্বারা আবৃত থাকে এবং এই প্রাণময় কোষেই সাহায্যের সূক্ষ্ম-শরীরের সংস্কারানুযায়ী আমাদের স্থূল শরীর গঠিত হয়। নিম্নশ্রেণী জীবে সূক্ষ্ম শরীর তম-আবৃত থাকিলে প্রাণময় কোষও তম-আবৃত থাকে; প্রাণ ক্রিয়া সংযত থাকে। সে জন্য স্থূল শরীর তম আচ্ছাদিত জড় রূপে প্রকাশিত হয়। অপেক্ষাকৃত উন্নতজীবে তমঃ প্রভাবের কিছু হ্রাস হওয়ায় প্রাণক্রিয়ার বিকাশ আরম্ভ হয়। তাই তাহাদের স্থূল শরীরে জীবভাবের অভিব্যক্তি স্পষ্টতর হয়। মানুষে এই প্রাণময় কোষপূর্ণ অভিব্যক্ত হয়; এজন্য তাহার স্থূল শরীর পূর্ণপরিণত হয়। এ সম্বন্ধে আর অধিক কিছু বলিবার প্রয়োজন নাই।

বিষয়কে আপনার করিয়া লইয়া, সর্ব্বত্র আত্মদর্শন করিয়া, জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়কে জ্ঞানে একীভূত করিয়া, ক্রমে সে ভূমার অভিমুখে অগ্রসর হইতে থাকে। তখন তাহার বিশুদ্ধ সাত্ত্বিক অবস্থা হয়। আত্মার এই পূর্ণ অভিব্যক্তি অবস্থার পরে সে ত্রিগুণাতীত হইয়া, ক্ষেত্রের বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া, কেবল অপরিচ্ছিন্নস্বরূপে অবস্থান করিতে পারে; ইহাই জীবের সৃষ্টি হইতে মুক্তি পর্য্যন্ত ক্রমাভিব্যক্তির সংক্ষিপ্ত ইতিহাস। এস্থলে তাহার বিবৃতির প্রয়োজন নাই। স্থাবর জঙ্গমাত্মক সমুদায় জীবের এই ক্রম-বিকাশ-নিয়ম মধ্যে,—এই প্রকৃতির ক্রম-আপূরণে জাত্যন্তর পরিণতি (পাতঃ সূত্র ৪।২) হইতে আমরা মূঢ়াবস্থার, ক্রিয়াবস্থার ও প্রকাশাবস্থার ক্রমবিকাশ হইতে এই ত্রিগুণের স্বরূপ কতকটা জানিতে পারি। *

আমরা উপরে প্রতি জীবের ক্ষেত্রের যে ক্রমবিকাশের কথা উল্লেখ করিয়াছি, সেই ক্রম-বিকাশ-তত্ত্বও এই ত্রিগুণ হইতে বুঝিতে পারা যায়। সাংখ্যদর্শন অনুসারে আমাদের শরীর দুইরূপ—সূক্ষ্ম ও স্থূল—তাহা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। এই ক্ষেত্রের বা শরীরের সূক্ষ্মাংশ বা লিঙ্গ যে বুদ্ধি, অহঙ্কার, মন, দশইন্দ্রিয় ও পঞ্চতন্মাত্র, আর ইহাদের মধ্যে বুদ্ধি যে সত্ত্বগুণ হইতে অভিব্যক্ত, অহঙ্কার মন ও ইন্দ্রিয় যে প্রধানতঃ রজোগুণ হইতে অভিব্যক্ত, এবং তন্মাত্র যে তমোগুণ হইতে অভিব্যক্ত, তাহাও পূর্ব্বে দেখিয়াছি। যত দিন জীবের জীবত্ব থাকে, ততদিন তাহার এই লিঙ্গশরীর থাকে। মৃত্যুতে তাহার নাশ হয় না। জীব যখন জন্মগ্রহণ করে, তখন তাহার লিঙ্গশরীরানুযায়ী স্থূল-শরীরের উৎপত্তি ও বিকাশ হয়। যে জীবের লিঙ্গ-শরীর যেরূপ পরিণত ও সংস্কার যুক্ত, তাহার স্থূল শরীরও তদনুরূপ হয়। তাহার লিঙ্গ শরীরে ত্রিগুণের যে ভাবে অভিব্যক্তি থাকে, স্থূল শরীরেও তাহাদের সেইরূপ বিকাশ হয় এবং সেই ত্রিগুণের ক্রিয়া হইতে শরীরের অবয়ব অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদির সংস্থান হয়। নিম্নশ্রেণী জীবের অল্প অভিব্যক্ত সূক্ষ্ম শরীর অনুসারে তাহার যেরূপ স্থূল শরীর গঠিত হয়, তাহার কথা এস্থলে উল্লেখের প্রয়োজন নাই। আমরা কেবল মানুষের বিশেষ বিকাশিত সূক্ষ্ম বা লিঙ্গ-শরীরের অভিব্যক্ত ত্রিগুণ ভাবের দ্বারা কিরূপে তাহার স্থূল বাহ্য শরীর গঠিত হয়, আমাদেরও স্থূল শরীরে এই ত্রিগুণের ভাব ও ক্রিয়াদি কিরূপ হয়—তাহার আভাস দিব।

ত্রিগুণের দ্বারা মানুষের স্থূল শরীরের বিকাশ।—আমাদের লিঙ্গ শরীরস্থ বুদ্ধির প্রকাশজন্য ও জ্ঞানক্রিয়ার জন্য স্থূল শরীরে নানারূপ যন্ত্রের বা অবয়বের বিকাশ হয়। আমাদের মস্তিষ্ক ও মেরুদণ্ডস্থ নাড়ী প্রভৃতি গঠিত হয়। মন ও ইন্দ্রিয়-গণের ক্রিয়ার জন্য বাহ্য বিষয়ের সহিত নানারূপ সম্বন্ধ স্থাপনের জন্য নানারূপ শারীর যন্ত্রের অভিব্যক্তি হয়। সর্ব্বদ্বারে জ্ঞান প্রকাশের জন্য সত্ত্বগুণ দ্বারা জ্ঞান ও কর্ম্ম-নাড়ী, ও নাড়ীকেন্দ্র (Sensory or Motor

* জার্ম্মান দার্শনিক-শ্রেষ্ঠ হেগেল এইরূপে আত্মার ক্রমাভিব্যক্তির কথা ইঙ্গিত করিয়াছেন। তিনি বুঝাইয়াছেন যে, 'Self' প্রথমে আপনার মধ্যে বদ্ধ থাকে। পরে Self goes out of itself to realize itself, শেষে Self comes back to itself, after realizing itself in and through its not self। এক অর্থে ক্ষেত্রবদ্ধ জীবাত্মার এই তিন অবস্থাই তামসিক, রাজসিক ও সাত্ত্বিক অবস্থা। সাত্ত্বিক অবস্থার পরে ত্রিগুণাতীত অবস্থায় পূর্ণ self-realized আত্মার coming back into itself অবস্থা।

Nerves, Nerve-centres Ganglia) প্রভৃতির অভিব্যক্তি হয়; ক্রিয়ার জন্য, কর্ম্মবৃত্তির অভিব্যক্তির জন্য, রজো গুণের দ্বারা নানারূপ পেশী (Muscles) প্রভৃতি গঠিত হয়,—বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ের কর্ম্মজন্য চক্ষুর্গোলকাদি বিভিন্ন ইন্দ্রিয়-যন্ত্রের অভিব্যক্তি হয়। তদনুসারে কর্ম্মশক্তিবাহী নাড়ীদ্বারা আমরা ইচ্ছামত কর্ম্মেন্দ্রিয়গণকে শরীরস্থ পেশী শিরা প্রভৃতির (Muscle arteries) সহায়ে বাহ্য বিষয় সম্বন্ধে কর্ম্মে প্রবর্ত্তিত করিতে পারি। আর জ্ঞানবাহী নাড়ী দ্বারা আমরা ইচ্ছা মত জ্ঞানেন্দ্রিয়গণকে বাহ্য বিষয়ের জ্ঞানলাভ জন্য প্রেরণ করিতে পারি। আর যখন তমঃপ্রভাবে বা অশক্তিহেতু আমাদের জ্ঞানাদি ক্রিয়ার ব্যাঘাত হয়, আমাদের জ্ঞান ও কর্ম্মশক্তি অভিভূত বা বাধাপ্রাপ্ত হয়, তখন আমরা বিষয় জ্ঞান উপযুক্তরূপে লাভ করিতে পারি না—কর্ম্মেও প্রবৃত্ত হইতে পারি না। তখন সম্ভবতঃ ধমনীতে দূষিত রক্তের আধিক্য হয়। অথবা শরীরের অন্য কোনরূপ অবসাদ-উৎপাদক ক্রিয়া হয়। এইরূপে আমাদের স্থূল পাঞ্চভৌতিক মাতাপিতৃজ শরীরে জ্ঞান ও সুখের প্রকাশ জন্য যে নাড়ী প্রভৃতি যন্ত্রসকলের অভিব্যক্তি হয়, তাহাদিগকে সত্ত্বগুণজ বলা যায়। শরীরের ধারণ, রক্ষণ ও পোষণ-ক্রিয়া নিষ্পাদন জন্য এবং আমাদের ইচ্ছানুযায়ী কার্য্য করিবার জন্য যে সকল যন্ত্রের অভিব্যক্তি হয়, তাহা রজোগুণজ বলা যায়। আর শরীরের যে সকল যন্ত্র জ্ঞান প্রকাশে ও কর্ম্মবৃত্তি পরিচালনে বাধা দেয়, তাহাদিগকে তমোগুণজ বলা যায়।

আমরা শাস্ত্র হইতে অন্যভাবেও আমাদের স্থূল দেহে ত্রিগুণের ক্রিয়া জানিতে পারি। দেহের নাড়ীর মধ্য দিয়াই ত্রিগুণের ক্রিয়া ও ভাবের অভিব্যক্তি হয়। ত্রিগুণ হইতে ত্রিবিধ নাড়ীর সৃষ্টি হয়। এই ত্রিবিধ নাড়ীর নাম ইড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্না। ছান্দোগ্য উপনিষদে আছে,—

"অথ যা এতা হৃদয়স্য নাড্যস্তাঃ পিঙ্গলস্যাণিম্নস্তিষ্ঠন্তি শুক্লস্য নীলস্য পীতস্য লোহিতস্য ইতি। অসৌ বা আদিত্যঃ পিঙ্গল এষ শুক্ল এষ নীল এষ পীত এষ লোহিতঃ ॥" (৮।৬।১)।

অর্থাৎ পিঙ্গল বর্ণের হৃদয় স্থান হইতে পীত বর্ণের (পিত্তাখ্য), নীল বর্ণের (বাতবহুল) শুক্লবর্ণের (কফ-বহুল) ও লোহিত বর্ণের (শোণিত-বহুল) বহু নাড়ী নিঃসৃত হইয়া শরীরের চতুর্দ্দিকে বেষ্টন করিয়াছে। আদিত্যের রশ্মি যেমন চারিদিকে বিকীর্ণ হয়, সেইরূপ সেই আদিত্যরশ্মি এই সকল নাড়ী দিয়া দেহের চতুর্দ্দিকে পরিব্যাপ্ত আছে।

আমরা পূর্ব্বে দেখিয়াছি যে, শ্রুতি অনুসারে যাহা লোহিত (অথবা নীল-পীত-লোহিতাদি বর্ণবিশিষ্ট) তাহা রজঃ; যাহা শুক্ল তাহা সত্ত্ব; আর যাহা কৃষ্ণ, তাহা তমঃ। শরীর মধ্যে যে নাড়ী শুক্ল (Nerves, Brain &c.) তাহা সত্ত্বগুণজ; যে নাড়ী লোহিত (Arteries &c.) তাহা রজোগুণজ; আর যে নাড়ী কৃষ্ণাভ (Veins) তাহা তমোগুণজ। আবার সূক্ষ্মভাবে শুক্ল নাড়ী ত্রিবর্ণাত্মক; সুতরাং তাহা সত্ত্বপ্রধান হইলেও রজঃ ও তমঃ সম্পৃক্ত। এই নাড়ী, তন্ত্র ও যোগশাস্ত্র মতে, ইড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্না, এই তিন মূল নাড়ী হইতে অভিব্যক্ত হইয়া অসংখ্য শাখায় বিভক্ত। ইড়া এবং লোহিত —রজোগুণজ, পিঙ্গলা এবং কৃষ্ণ—তমোগুণজ, আর সুষুম্না—শুক্ল সত্ত্বগুণজ। এই ত্রিবিধ নাড়ী ও নাড়ীকে আশ্রয় সুষুম্নার মূল

শরীর বিধৃত ও পরিপুষ্ট হয়। এস্থলে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র মতে আমাদের স্থূল শরীর বায়ু, পিত্ত, কফ এই ত্রিবিধ ধাতুর দ্বারা বিধৃত। ইহাদের মধ্যে বায়ুকে সত্ত্বগুণজ, পিত্তকে রজোগুণজ ও কফকে তমোগুণজ বলা হয় এবং ইহাদের বৈষম্য বা দোষ হেতু আমাদের যে নানারূপ পীড়ার উৎপত্তি হয়, ইহা সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে। যাহা হউক, এ সকল কথা এস্থানে আর বুঝিবার প্রয়োজন নাই। ইহা হইতে আমরা ত্রিগুণ দ্বারা কিরূপে আমাদের সূক্ষ্ম ও স্থূল শরীরের উৎপত্তি এবং সেই শরীরের ত্রিগুণজ ভাবের দ্বারা—আমাদের দেহাত্মজ্ঞান হেতু আমরা কিরূপে বদ্ধ হই, তাহাও কতকটা বুঝিতে পারি।

শ্রীদেবেন্দ্রবিজয় বসু।

মায়া।

(সুহৃদোত্তম সতীর্থ কবিবর শ্রীযুত দেবকুমার রায়চৌধুরীর কন্যা সম্বোধনে)

নন্দন-ঝরা মন্দাকিনীর
ছন্দটী ধরি কায়া,
মর্ত্ত্যের দেব গৃহখানি মাঝে
হাসিল এ কোন্ মায়া?
কোন্ সুরপুরে কাহার আঁচলে
কি রতন ছিল লুকি'?
কোন্ সাধনার ধরার ধূলায়
কেন বা দিল সে উঁকি?
শকুন্তলার কুন্তল-আড়ে
এ কোন্ লুকানো ফুল?
দেবকুমারের পূজার অর্ঘ্য
এ কোন প্রসাদী ফুল?
বেদান্ত-ছাঁকা ভূমার কমলে
এ কোন কোমল মায়া?
কোন্ শাশ্বত বীণার ত্রিতারে
মর্ত্ত্য গানের ছায়া?
সহজ সরল রঙীণ তুলির
ঘুমন্ত আধ টানে,
এ কোন্ নিটোল নব জাগরণ
ফুটিল ধরার প্রাণে?
কোন্ মলয়ার চুম্বন-চুণি
পথ-হারা হয়ে বলে,
দীন-দরিদ্র কুটীর দুয়ারে
হাসিল রে অকারণে?
মাধুরী আসিল আদর মাখিয়া,
ভক্তি লইয়া মুক্তি;
কনক মায়ার লীলার লহরে
হারাইল সব যুক্তি।
সান্ত্বনা লয়ে এলো বসন্ত,—
নবীন দিগ্বিজয়ী;
মর্ত্ত্যের ধূলি সার্থক করি
হাসিল রে মায়াময়ী।
শুভ্র শীতল সেফালির কলি,
ওরে মোর বেলা যুঁই,
কোন্ শরতের চির জাগরণ
জানাইতে এলি তুই?
দেব-বাঞ্ছিত যে-সুধা আছিল
কনক-কুম্ভ ভরা,
না জানি কেমনে এক কোঁটা তার
উপচিয়া এলো ধরা।
কোন্ সুদূরের অজানিত গাথা
গাহিবারে এলি তুই?
গোপন গানের কোন্ তান মাঝে
লুকাইয়া তোরে থুই?
আয় রে লাগিম-ললাম-লিলিটি,
মমতার কম-কায়া,
দেব গৃহখানি ধন্য করিয়া
ছড়াও তরুণ মায়া।

বরদেশ

(৪৪)

নব্যভারতের প্রসিদ্ধ কবি, গোবিন্দচন্দ্র দাস মহাশয় বিগত ১৩ই আশ্বিন (১৩২৫) সোমবার, শেষ রাত্রে ঢাকা নগরীতে দেহ রক্ষা করিয়াছেন। বিগত ৪ঠা আশ্বিন আমরা তাঁহার শেষ পত্র পাই, তাহাতে পীড়ার কথা কিছুই ছিল না, কেবল "অসুর পূজা" সম্বন্ধীয় কয়েকটী কথা ছিল। এই পত্র প্রাপ্তির কিছু দিন পরে আমরা পুরুষোত্তমে চলিয়া যাই। তাঁহার তিরোধানের সংবাদ কেহই আমাদিগকে জানায় নাই। ঘটনাক্রমে শ্রীযুক্ত জীবেন্দ্রকুমার দত্ত মহাশয়ের একটী কবিতায় কবির স্বর্গারোহণের সংবাদ পাই। কবির তিরোধানের পর তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র আনন্দ আশ্রমে উপস্থিত হইয়াছিলেন, সে কথা আমরা জানিতে পারি নাই। তাঁহার তিরোধানে আমাদের একাঙ্গ যেন ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। তিনি ভাওয়াল হইতে নির্ব্বাসিত হওয়ার পর একাদিক্রমে ৭ বৎসর আনন্দ আশ্রমে ছিলেন। তাঁহার কন্যা মণিকুন্তলা এই স্থানেই দেহ রক্ষা করেন। মণির স্বামী নিশ এইখানে থাকিয়া স্কুলে পাঠ করিতেন। গোবিন্দচন্দ্র যেন আমাদের এক পরিবারভুক্ত লোক ছিলেন। কত সময় যে আনন্দ-আশ্রমে আসিয়া শান্তি পাইতেন, তাহা ব্যাখ্যাত হইবার নয়। তিনি আমাদের হৃদয়-মন সব অধিকার করিয়া আছেন। তাঁহার শোকে আমরা অস্থির ও অবসন্ন। এই শোকের অবস্থায় কিছুই লেখা হইল না। তাঁহার সম্বন্ধে যে সকল প্রবন্ধ পাইয়াছি, অগ্রহায়ণ সংখ্যায় তাহা প্রকাশিত হইবে।

(৪৫)

বোম্বে নগরীতে মডারেট দলের কন্‌ফারেন্স হইয়া গিয়াছে, কিছুতেই সুরেন্দ্রনাথ ক্ষান্ত হইলেন না। সে সভা তেমন জমে নাই, লোক বেশী হয় নাই। তিনি ১৮ই সেপ্টেম্বর তারিখে লাট সভায় প্রেস সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন,—"In Bengal he had no Complaint, the Act had been administered with fairness" এ সম্বন্ধে ১৬ই আশ্বিনের বরিশাল-হিতৈষী লিখিয়াছেন—"আমরা এ কথা শ্রবণ করিয়া অবাক হইয়াছি। সুরেন্দ্রনাথ কি বলিতে চান যে, তাঁহার ছায়াসঙ্গী সঞ্জীবনীর প্রাচীন প্রিন্টারের মৃত্যুর পর নূতন প্রিন্টার গ্রহণ সময়ে যে এক সহস্র টাকা জামিন গৃহীত হইয়াছে, তাহা ন্যায়-সঙ্গত হইয়াছে? তিনি কি বলিতে চান যে, দৈনিক হিতবাদী যে কারণে বন্ধ হইয়াছে, তাহা সঙ্গত কারণ? তিনি কি বলিতে চান যে, জগৎসীর ব্যাপার লিখিতে গিয়া অমৃতবাজারকে যে পাঁচ সহস্র টাকা জামিন দিতে হইয়াছে, তাহা এই আইনের ন্যায্য প্রয়োগ? মুসলমানদের পত্রিকাগুলি যে দ্রুত বেগে ধ্বংস হইতেছে, তাহা কি তিনি লক্ষ্য করিয়াছেন? সুরেন্দ্রনাথ কি তবে নিজেকে নিরাপদ মনে করিয়াই ঐ সকল কথা বলিতেছেন? কি লিখিব? এ সব কথা লিখিতে যে প্রাণে দারুণ ব্যথা পাই! দেশীয় পত্রিকাগুলির নৈতিক দুরবস্থার কথা হৃদয়ঙ্গম করার শক্তি বোধ হয় সুরেন্দ্রনাথের আপাততঃ নাই, থাকিলে তিনি বর্ত্তমানে বাঙ্গালা দেশের পত্রিকাগুলির দুরবস্থা স্মরণ করিয়া অশ্রু মোচন করিতেন। প্রতি ছত্র লিখিতে গিয়া কি ভাবে হেঁয়ালিপূর্ণ ভাষা ব্যবহার করা আবশ্যক হয়, দক্ষ সম্পাদক তাহা অনুভব করিতে না পারেন—অনভিজ্ঞ আমরা কিন্তু তাহা নিত্য প্রাণে প্রাণে অনুভব করি। ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দের এক একটী পত্রিকার ফাইল আর ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দের পত্রিকার ফাইল দেখিলে বুঝা যায় যে, পত্রিকা সমূহের কতদূর নৈতিক অবনতি হইয়াছে। তাই মনে হয়, দেশবাসীর একবার জিজ্ঞাসা করা উচিত, সুরেন্দ্রনাথ এমন কথা কেন বলিলেন?"

বরিশাল-হিতৈষী এ দেশের একখানি নির্ভীক পত্রিকা। কিন্তু তিনি যে সব সংবাদ জানেন, তাহা মনে হয় না। কত পত্রিকা ও প্রেসের যে সর্ব্বনাশ হইয়াছে, তাহার সংখ্যা হয় না। উচিত বক্তা "হিতৈষী" "সময়" ও "হিতবাদী" না থাকিলে,

গড্ডালিকা প্রবাহের স্রোত আরো বাড়িয়া যাইত। কেহ কখনও ভাবিতে পারেন নাই, এ দেশের প্রধান নেতার এ হেন পরিণতি হইবে! ভারত মহাশ্মশানে কুরুক্ষেত্র-দিয়ার কাহিনী ও রৌলাট কমিশনের রিপোর্ট মহাগ্নির ধূম উদ্গীরণ করিয়া ঘোষণা করিতেছে, ভারত স্বার্থপরতার মহা-সাগরে ডুবিয়াছে! কি আর লেখ, কি আর বলিতে চাও?

(৪৬)

দশ বৎসর পূর্ব্বে যে এমেরিকাকে রাজ-নীতি জগৎ ঘৃণার সহিত উপেক্ষা করিত, বিধাতার ইঙ্গিতে সেই এমেরিকা আজ জগতের শ্রেষ্ঠ! ধনে মানে, ঐশ্বর্য্য সম্পদে, বিদ্যা বুদ্ধিতে—সব বিষয়ে সর্ব্বোৎকৃষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছেন। এমেরিকাকে বর্ত্তমান যুদ্ধ-ব্যাপারে আহ্বান করিতে যাঁহাদের একান্ত আগ্রহ হইয়াছিল, তাঁহারা আজ উইলসন সাহেবের "স্বাধীন সমুদ্র" ঘোষণার কথা শুনিয়া অবাক্ হইয়া তাঁহাকে নূতন নির্ব্বাচন হইতে সরাইতে সচেষ্ট! তিনি সরুন, বা না সরুন, তাঁহার কীর্ত্তি এ জগতে অক্ষয় হইবার যোগ্য হইয়াছে। শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে, চক্রান্তের ফল কি হইবে। চতুর্দ্দিকে কত চক্রান্তই চলিতেছে! তিনি বলিয়াছেন, রাজনীতিজ্ঞেরা নয়, জন-সাধারণ সন্ধির সূত্র নির্দ্ধারণ করিবে। কি মহোচ্চ কথা। তাঁহার বাণীতে পুষ্প চন্দন বর্ষিত হউক—তাঁহার ঘোষণায় প্রজাতন্ত্র রাজত্ব সর্ব্বত্র অধিকার পাইবে বলিয়া আশা হইতেছে। বর্ত্তমান যুদ্ধে পৃথিবীর যে কি অনিষ্ট করিয়াছে, তাহা শত মুখেও ব্যক্ত হইবার নয়, কিন্তু যদি সর্ব্ব-দেশে প্রজাতন্ত্র রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়, তবে এই যুদ্ধ চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে। তিনি থাকিলে ভারতের কিছু আশা আছে। ১১ই নবেম্বর ১৯১৮ যুদ্ধ-বিরতি-মন্ত্র ঘোষিত হইয়াছে।

(৪৭)

কলিকাতার পুলিস-কমিসনার মহোদয় পতিতাদিগকে ব্রাহ্মসমাজে দিবার প্রস্তাব করিয়া মহানুভবতার পরিচয় দিয়াছেন এবং কতিপয় বন্ধু সে ভার গ্রহণে প্রস্তুত হইয়াছেন, শুনিলাম। এরূপ মহৎ কার্য্য এদেশে আর কখনও হয় নাই। একজন বন্ধু বলেন, যাঁহারা "হাল ধরিতে পারেন না, তাঁহাদের কেউটে ধরিতে সাধ কেন?" যাঁহারা পতনের রাজ্যে নৃত্য করিয়া আসিয়াছেন, কিম্বা যাঁহারা পতিতাদিগকে দেখিলে ভ্রূকুঞ্চিত করেন, তাঁহারা এত বড় পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারিবেন কি? পারুন বা না পারুন, চেষ্টা করিতে দোষ নাই। তাহা করুন। এমন সৎ কার্য্য আর নাই। কিন্তু ইন্দুভূষণ সেন-প্রমুখ ব্যক্তিগণ পতিতাদের জন্য যে আশ্রমের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, তাহার প্রতি তাঁহারা অনাদর দেখাইলেন কেন? যেখানে অনিন্দিত-চরিত্র ইন্দুভূষণ সেন আছেন, সে স্থান তুচ্ছ নয়। বলি, তাঁহার ন্যায় চরিত্রবান ব্যক্তি এদেশে কয় জন আছেন?

(৪৮)

এবার আমরা উৎকলের মহাকীর্ত্তি-শ্মশান, ভাস্কর্য্যের চরমতীর্থ, শ্রেষ্ঠত্বের মহা-নিদান অর্কক্ষেত্র "কণারক" দেখিয়া জীবনকে সার্থক করিয়া আসিয়াছি। যাহা এখনও সেই শ্মশানে দেখা যায়, ভারতের আর কোথাও বুঝি বা তাহা নাই। এমন লোক নাই, তাহা দেখিলে যাহার নয়ন হইতে জলধারা না প্রবাহিত হয়। যাহা দেখিয়াছি, তাহা বর্ণনা করিতে পারে, এমন লেখনী নাই। তবু ভবিষ্যতে একবার চেষ্টা করিয়া দেখিব, যদি কিছু ব্যক্ত করিতে পারি।

প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

১১। গ্রীক দর্শন। শ্রীদিগিন্দ্র রায়-চৌধুরী প্রণীত, মূল্য কাগজের মলাট ১৷০। ইহা একখানি অপূর্ব্ব গ্রন্থ। নব্যভারতে গ্রীক-দর্শন সম্বন্ধে যে সকল প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল, উহা তাহার অভিব্যক্তি। ভাষার প্রাঞ্জলতা এবং বক্তব্যের সরলতায় এ গ্রন্থ বাঙ্গালা ভাষার অমূল্য নিধি বিশেষ হইয়াছেন। যিনি পড়িবেন, তিনিই মোহিত হইবেন। লেখার গুণে অনুবাদের কর্কশতা মোটেই উপলব্ধ হয় না। নব্যভারতে প্রকাশিত হইয়াছিল বলিয়া অধিক কিছু লিখিতে অক্ষম। যাহা লিখিলাম, তজ্জন্যও ক্ষমা চাই। এরূপ গ্রন্থের এদেশে আদর না হইলে বুঝিব, এদেশের উন্নতির আশা নাই।

১২। অনুষ্ঠান-সঙ্গীত। শ্রীকালীনাথ ঘোষ প্রণীত, মূল্য ৷৷০, ২২নং পার্ব্বতীচরণ ঘোষের লেন হইতে প্রকাশিত।

সে কোন্ সুর, যে সুরে মধু বর্ষিত হয়? সে কোন্ গাথা, যাহাতে অমৃত ঝরে? সে কোন্ কবিতা, যাহাতে অক্ষয় অনন্ত প্রেম জাগে? সে কোন্ সঙ্গীত, যাহাতে প্রাণকে অমরপুরে লইয়া যায়? তাহা জানিতে পাঠকদের যদি ইচ্ছা থাকে, তবে দয়া করিয়া এই অনুষ্ঠান-সঙ্গীত একবার পাঠ করুন। সময়ে সময়ে বসিয়া বসিয়া ভাবি, কালীনাথ কোন্ অমরপুর হইতে আসিয়াছেন? কত কথাই পাইলাম, কত উপদেশেই মাতিলাম,—জীবন যেন ধন্য হইয়া গেল। থাক্, আর বলিব না। বন্ধুর লজ্জা আর বাড়াইব না। থাক্, নীরব সাধনের ধন, নীরবেই থাক্।

১৩। কোচবেহার-সাহিত্য-সভা। দ্বিতীয় বার্ষিক কার্য্যবিবরণী, ১৩২২। এই কার্য্য-বিবরণ পড়িয়া বড়ই আনন্দিত হইলাম।

মহামহিম শ্রীশ্রীমহারাজা স্যর জিতেন্দ্র নারায়ণ ভূপের উহা অক্ষয় কীর্ত্তি। হায়, এরূপ সাহিত্য সভা যদি সকল বড় লোকের অঙ্গের ভূষণ হইত, তবে কত সুখের হইত! বিধাতার কৃপা বর্ষিত হউক।

১৪। God and Man, by P. M. Chowdhury. সুচিন্তিত সদ্ভাবপূর্ণ প্রবন্ধ-পুস্তক। গ্রন্থকার সাধন-রাজ্যের অত্যুচ্চ শেখরে অধিষ্ঠিত। তাঁহার চিন্তা, তাঁহার গবেষণা সাধনার পথ ধরিয়া এই ধরায় অবতরণ করিয়াছে। এই গ্রন্থ প্রতি সাধকের পাঠ করা উচিত। আমরা পড়িয়া খুব উপকৃত হইলাম।

১৫। পিতৃ-বিলাপ-কাব্য ও বিবিধ কবিতা। শ্রীস্যাকেশ-দত্ত প্রণীত, মূল্য ১৲।

এখানি কবিতা পুস্তক। কিন্তু সাধারণ কবিতার ন্যায় ইহা নয়—ইহাতে প্রাঞ্জলতা এবং সরলতা-মাখা মৌলিকতা আছে। কবির লেখা কেমন সরস—পাঠক দেখুন।

পথ পানে বড় আশে, চেয়ে থাকি বার মাস,
কবে আসি মোর বাসে, দেখা দিবে অবকাশ!
কত দিনে নেহারিব, সুচারু চাঁদের ভাতি,
নিভাইব,—জুড়াইব,—শুখাইব অশ্রু-ভাতি।
হৃদয়ের তন্ত্রী দল, কত বাজে প্রাণে প্রাণে
পেয়ে তব নব বল, তোমারি মধুর তানে।
বহু দিন পরে, আজ (পারয়া দানের বাস)
খুলিলে সুখের সাজ, কেন ওহে অবকাশ!
কেন আজি নাহি ঝরে, অধরে মধুর হাসি,
কেন আজি মোর ঘরে, বাজেনা তোমার বাঁশি।
নিরদয় কেন হেন, আমায় কাঙ্গাল দেখে,
কাঁদাতে রেখেছ যেন, শিশুরে আঁধারে ঢেকে।
ঘুরি ফিরি সব ঠাঁই, পথ, ঘাট, ঘর, দ্বার,
কোন খানে কিছু নাই "নীরবের হাহাকার॥"
হাসিমাখা মুখে মুখে আনন্দের কোলাহল,
কে জ্বালিল মোর বুকে, রাবণের চিতানল?
কি দুখে মুদিল আঁখি, রবি, শশী, তারা-হার,
কি দেখে খেলিল ফাঁকি, পোষা পাখী
অভাগার!

সকলি যে আভাহীন, শোভাহীন বাড়ী ঘর,
আশাহীন, ভাষাহীন, উষাহীন চরাচর!
কিবে নাচ, কিবে চাই, কিবে চাই হেরি নীরে,
কি বা নাই কি বালাই আঁখি ঢাকে আঁখি
নীরে!

অবকাশ, হর দুখ, এনে দাও হেম-হার,
চুমিয়া জুড়াই বুক, একবার! একবার!!

লেখকের অনিন্দ্য লেখনীতে পুষ্পচন্দন বর্ষিত হউক। তিনি সাধনা করিতে থাকুন, অমৃত ফল ফলিবে।

কবিবর গোবিন্দচন্দ্র দাস।

বঙ্গসাহিত্যের একটা ইন্দ্রপাত হইয়া গেল! কবিবর গোবিন্দচন্দ্র দাস আর ইহজগতে নাই। গত ১৩ই আশ্বিন সোমবার রাত্রিকালে কবির জীবনদীপ নিবিয়া গিয়াছে। তাঁহার আজন্মের যত দুঃখরাশির পরিসমাপ্তি হইয়াছে।

কবিবর গোবিন্দচন্দ্র ১২৬১ সালে ৪ঠা মাঘ তারিখে ঢাকা জিলার অন্তঃপাতী জয়দেবপুরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম রামনাথ দাস।

গোবিন্দচন্দ্র বাল্যকালে জয়দেবপুরে রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণের সহিত একত্রে একই শিক্ষকের নিকট শিক্ষাপ্রাপ্ত হন। জয়দেবপুর হইতে ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তিনি ঢাকা নর্ম্মাল স্কুলে পড়িতে আইসেন। স্বর্গীয় রাজা কালীনারায়ণ রায় মহাশয় তখন গোবিন্দ বাবুকে মাসে ৫৲ টাকা বৃত্তি দান করিতেন। গোবিন্দ বাবু নলগোলার বাসায় থাকিয়া নর্ম্মাল স্কুলে পড়িতেন। তখন তিন বৎসর পড়িয়া শেষ পরীক্ষা দেওয়ার নিয়ম ছিল। তৃতীয় বৎসরেই কোনও কারণে গোবিন্দচন্দ্র স্কুল পরিত্যাগ করেন। সুতরাং তাঁহার আর পরীক্ষা দেওয়া ঘটিল না। তার পর কিছুকাল বিদ্যালয়ে হেড্ পণ্ডিতের কার্য্য করিয়া তিনি ঢাকা মেডিকেল স্কুলে ভর্ত্তি হন। দুই বৎসর অধ্যয়ন করিয়া গোবিন্দ বাবু এই পন্থাও পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন।

ইহার পর তিনি রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণের প্রাইভেট সেক্রেটরীরূপে কিছুকাল জয়দেবপুরে অবস্থান করেন। ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষার পূর্ব্বেই ইহার 'কবি' আখ্যা প্রচার হইয়াছিল। এজন্য সদাশয় রাজা কালীনারায়ণ ইহাকে বিশেষ স্নেহ করিতেন।

এই সময় মুক্তাগাছার দুর্ভাগ্য জমিদার ৺দেবেন্দ্রকিশোর আচার্য্য-চৌধুরী মহাশয় অদৃষ্টের তাড়নায় জয়দেবপুরের রাজ-আশ্রয়ে বাস করিতেন। দেবেন্দ্র বাবুর সহিত গোবিন্দচন্দ্রের বিশেষ সৌহার্দ্দ্য স্থাপিত হয়। গোবিন্দচন্দ্রের মধুর কবিতাগুলি 'বান্ধবে' প্রকাশ করিতে দেবেন্দ্র বাবু তাঁহাকে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করেন। তদনুসারে তিনটী কবিতা বান্ধবে প্রেরিতও হইয়াছিল। বান্ধব-সম্পাদক মহাশয় গোবিন্দ বাবুকে ভাল বাসিতেন না, সুতরাং তাঁহার কবিতা বান্ধবে ছাপা হইল না। তেজস্বী গোবিন্দের আত্মসম্মানে আঘাত লাগিল। তার ফলে দেবেন্দ্র বাবুর দ্বারা প্রেরিত হইয়া 'পরশুরামের শোণিত তর্পণ' বান্ধবে মুদ্রিত হয়। সম্পাদক মহাশয় দেবেন্দ্র বাবুর নিকট কবিতা-লেখকের ভূয়সী প্রশংসা করেন। কিন্তু দেবেন্দ্র বাবু গোবিন্দচন্দ্রের নাম প্রকাশ করার পর, বান্ধবে আর গোবিন্দ বাবুর কবিতা প্রেরিত হয় নাই।

সংবাদপত্রে প্রকাশিত ভাওয়ালের কতিপয় অপ্রিয় সমালোচনা পাঠ করিয়া রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণ কতিপয় পার্শ্বদের মন্ত্রণায় উহা গোবিন্দ বাবুর লিখিত বলিয়া স্থির করেন, এবং সেই মুহূর্ত্তে তাঁহাকে ভাওয়াল পরিত্যাগ করিতে আদেশ দেন। কবি ভাওয়াল ত্যাগ করিয়া ময়মনসিংহে প্রস্থান করেন। ৪ দিন

অবিশ্রান্ত হাঁটিয়া বহু কষ্টে তিনি ময়মনসিংহে উপনীত হন। কবি বলিয়াছেন,—'হাঁটায় আমার পা ফুলিয়া গিয়াছিল।'

কিছুদিন সুসঙ্গ, শেরপুর ও ময়মনসিংহে চাকুরী করিয়া, গোবিন্দ বাবু মুক্তাগাছার মহারাজা সূর্য্যকান্তের বাঁসাটী ডিহিকাছারীর নায়েবের কার্য্য করেন। কয়েক বৎসর পর তিনি কলিকাতায় গিয়া "নব্যভারতের" কার্য্যাধ্যক্ষ হইলেন। এই দীর্ঘকাল ইনি যে দুঃখ দুর্দ্দশা ভোগ করিয়াছিলেন, তাহা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। এই দীর্ঘকাল মধ্যে তাঁহার বহু কবিতা নব্যভারত, ভারতমিহির প্রভৃতি পত্রে বাহির হয়। এই সময় তাঁহার উপর আর এক বিপদ পড়ে। সেই বিপদ তাঁহার প্রাণপ্রিয়তমা পত্নী সারদাসুন্দরীর অকালমৃত্যু। সারদার মৃত্যু বড় শোচনীয় কাহিনী। এই আঘাতে কবির হৃদয় ভাঙ্গিয়া পড়ে। অতঃপর কবি বিক্রমপুর ব্রাহ্মণগাঁয় পুনর্ব্বার বিবাহ করেন, এবং সেই খানেই স্থায়ীরূপে বাস করিতে আরম্ভ করেন। মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত ব্রাহ্মণগ্রামই তাঁহার বাসস্থান ছিল। পূর্ব্বপক্ষের একমাত্র কন্যা মণিকুন্তলার মৃত্যুর পর গোবিন্দ বাবুর অরবিন্দ ও বরুণ নামে দুই পুত্র, স্বাধীনতা, শক্তি ও ভক্তি নামে তিন কন্যার জন্ম হয়। স্বাধীনতা অল্প বয়সেই পরলোকগমন করে। কিছুদিন পূর্ব্বে কবি জ্যেষ্ঠ পুত্র অরবিন্দকে বিবাহ করাইয়া গিয়াছেন।

কবি গোবিন্দচন্দ্রের কবিত্ব সমালোচনা করিবার স্থান ইহা নহে। বারান্তরে তাঁহার কবিতা সম্বন্ধে দীর্ঘ আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

গোবিন্দচন্দ্র খাঁটী বাঙ্গালীর জাতীয় কবি। তাঁহার কাব্যের প্রায় সর্ব্বত্রই জাতীয়তায় পরিপূর্ণ। কেবল নিজের জাতি, সমাজ প্রভৃতির জন্য কবি বিলাপ করিয়াছেন; কখনও বা তীব্র গালি দিয়া সমাজকে উদ্বুদ্ধ করিতে প্রয়াসী হইয়াছেন।

গোবিন্দচন্দ্র দুঃখের কবি। এত দুঃখ, এত লাঞ্ছনা এক জীবনে কেহ ভোগ করিতে পারে, ইহাই আশ্চর্য্য! যেন দুঃখের পর দুঃখের পর্ব্বত ভার তাঁহার উপর পুঞ্জীভূত হইয়া পড়িয়াছে। বিপদের পর বিপদের মেঘমালা কালো হইয়া তাঁহার হৃদয়াকাশ ছাইয়া ফেলিয়াছে। কবি সাধক রামপ্রসাদ ব্রহ্মচারীর মত সগর্ব্বে বলিয়াছেন,—

"আমি কি দুঃখেরে ডরাই?"

আবার কখন কখন বিপদভারে অভিভূত হইয়া, দেশবাসীর অপদার্থতা তীক্ষ্ণকণ্ঠে ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন। পূর্ব্ববঙ্গবাসী এই কবির জন্য এইটুকু কিছু করিয়াছেন, বলিতে পারিলেও আজ তাঁহারা ধন্য হইতেন। কবি গোবিন্দচন্দ্র অনাহারে, অর্দ্ধাহারে দিন কাটাইয়াছেন; পূর্ব্ববঙ্গবাসী কেহ চক্ষু চাহিয়া দেখেন নাই। মুক্তাগাছার রাজা জগৎকিশোর আচার্য্য চৌধুরী মহাশয় মাসে মাসে কবিকে ২০৲ টাকা সাহায্য করিতেন, ইহাই তাঁহার একমাত্র সম্বল ছিল।

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ভূপেন্দ্রনাথ বসু-প্রমুখ ৫১ জন দেশনায়ক এক আবেদন পত্র স্বাক্ষর করিয়া ভাওয়ালের পরলোকগত কুমারগণের বিধবা পত্নীদিগের নিকট প্রেরণ করেন। ঐ পত্রে কবি গোবিন্দচন্দ্রকে সাহায্য করার জন্য প্রার্থনা ছিল। দুর্ভাগ্য, কবির কপালে এই পত্রেও কোনও উপকার হইল না।

"কয়েক বৎসর আগে কবি গোবিন্দচন্দ্র দুষ্টব্রণে পীড়িত হইয়া, ঢাকা হস্পিটালে আশ্রয়

গ্রহণ করেন। সেখানে পূর্ব্ববঙ্গের সাহিত্য-সেবিগণের মধ্যে শ্রদ্ধাস্পদ বাবু কামিনীকুমার সেন মহাশয় সর্ব্বদা তাঁহার সংবাদ লইতেন। আর ময়মনসিংহের বাবু কেদারনাথ মজুমদার মহাশয় মধ্যে মধ্যে যাইয়া কবিকে দেখিয়া আসিতেন। ঢাকার আর আর "সাহিত্যিক"-গণের মধ্যে কাহাকেও ত একদিন সেখানে দেখি নাই। মিঃ পিঃ, কে, বসু এক কি দুই দিন গিয়াছিলেন। অনেককে আমি নিজেও অনুরোধ করিয়াছি, কেহ সে দিকের ছায়াও মাড়ান নাই।" *

আরোগ্য লাভ করিয়া কবি "কেন বাঁচালে আমায়" শীর্ষক এক করুণ কবিতা সৌরভে প্রকাশ করেন। তাহা পাঠ করিলে অশ্রু সংবরণ কঠিন হইয়া পড়ে। "প্রতিভার" কবির "বাবা থাকুক আমার বিয়া" দেশময় কি ভাবে প্রচারিত হইয়াছিল, তাহা কে না জানেন ?

এই কিছুদিন পূর্ব্বে কবি তাঁহার বাস-গ্রামে পীড়িত হইয়া পড়েন। তখন "ঢাকা সাহিত্য-পরিষদের" কার্য্যকর্ত্তাগণ তাঁহাকে পরিষদের সম্মানিত বিশিষ্ট সভ্যরূপে গ্রহণ করেন, এবং পরিষদের আগামী বার্ষিক অধিবেশনে তাঁহাকে সভাপতি করার প্রস্তাব গ্রহণ করেন। কবি স্বীয় অভিভাষণ লিখিতেও অনুরুদ্ধ হইয়াছিলেন। গত ৮ই ভাদ্র পরিষদের বার্ষিক অধিবেশন হওয়ার কথা ছিল, কিন্তু নানা কারণে তাহা হয় নাই। অতঃপর ১৬ই আশ্বিন অধিবেশন হবার কথা হয়। পরিষৎ গোবিন্দ বাবুকে সভাপতিরূপে প্রাপ্ত হইবার সৌভাগ্য হইতে বঞ্চিত হইল। তাঁহার শোক-সভায় পরিষৎ-সম্পাদক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র গুহ মহাশয় অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে এজন্য তীব্র দুঃখ প্রকাশ করেন।

বিগত ঢাকা-সাহিত্য-সম্মিলনের কর্ম্ম-কর্ত্তাগণ কবি গোবিন্দচন্দ্রকে উপেক্ষা করিয়া কতিপয় তথাকথিত কবির পাল্লায় সম্মিলন শোভিত করেন। সম্মিলনের সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত—ঢাকাবাসীর কবির প্রতি চিরাচরিত পাপের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ সম্মিলনে উদ্বৃত্ত ৭০০৲ টাকা সর্ব্বসম্মতি ক্রমে কবিকে প্রদত্ত হয়। এই সংবাদটী কবির জীবন-মরণের বন্ধু কামিনী বাবু কবির মৃত্যুর পূর্ব্ব-দিন তাঁহাকে এই সংবাদ জ্ঞাপন করেন। তখনও কবির মৃত্যু লক্ষণ ছিল না। পরদিন প্রভাতে যখন কামিনী বাবু-প্রমুখ ব্যক্তিগণ ঐ টাকা লইয়া কবির নিকট যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছেন; তখন সংবাদ গেল, কবি আর ঐ টাকার জন্য বাঁচিয়া নাই। রাত্রিতেই (১৩ই আশ্বিন সোমবার) তাঁহার সকল দুঃখের অবসান হইয়া গিয়াছে!

ঢাকাবাসী জীবিত কবিকে কোনও সাহায্যই করিতে পারিলেন না। সম্প্রতি তাঁহারা কবির ঋণ পরিশোধ এবং তাঁহার দুঃস্থ পরিবারের সাহায্যের জন্য অর্থ সংগ্রহে চেষ্টিত হইতেছেন। যদি এ আশাটী হয়, তাহা হইলেও কবির পরলোকগত আত্মা ঢাকাকে আশীর্ব্বাদ করিবে।

কবি গাহিয়াছেন—

"দরিদ্র হয়েছি তবু নীচ নহে মতি
অগ্নি শিখা নিভে কিন্তু ঊর্দ্ধে করে গতি।"

গোবিন্দ দাস দরিদ্র হইলেও নীচ, ভীরু, কৈতববাদী ছিলেন না। তিনি চিরদিন সত্যাশ্রয়ী, স্বাধীন এবং একান্ত তেজস্বী। অশ্রদ্ধার দান গ্রহণ কখনও তিনি করিতেন না। স্তুতি মিনতির ভাষা তাঁহার ছিল না।

* শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের পত্র।

যদি থাকিত, তবে আজ তাঁহারও ঢাকায় বড় বাড়ী, জুড়ি গাড়ী, ষ্টেসনে অভ্যর্থনার বন্দোবস্ত হইত। এই সে দিন ঋণভার-পীড়িত কবি (২৮শে শ্রাবণ, ১৩২৫) গৌরীপুরের জমিদার বাবু ব্রজেন্দ্রকিশোর রায়-চৌধুরী মহাশয়ের নিকট অর্থ সাহায্য জন্য গমন করেন। কি জানি কেন কবির ধারণা হইল, সেখানে তাঁহার আত্মমর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ হইয়াছে, অমনি ব্রজেন্দ্র বাবুর ম্যানেজারের প্রদত্ত অর্থ ৫০৲ টাকা উপেক্ষা করিয়া চলিয়া আসিলেন। নাটোরপতি মহারাজা জগদিন্দ্রনাথের প্রদত্ত টাকাও নাকি ইতিপূর্ব্বে তিনি উপেক্ষা করিয়াছিলেন।

ইতিমধ্যে আমি অগ্রজ মহাশয়ের যে পত্র পাইয়াছিলাম, নিম্নে তাহা উল্লেখ করিয়াই অদ্যকার বক্তব্য শেষ করিব।

"কবি যে কত দুঃখ সহ্য করিতে পারেন, কবির ভাগ্যে যে কত দুঃখ ভগবানের কল্পনায় স্থান পাইয়াছে, কবিবর গোবিন্দ বাবুকে দেখিয়া তাহা অনুভব করিতেছি। আজ রাত্রি ৮টার সময় বাসায় আসিবার পথে কবির সহিত একত্রেই আসিতেছিলাম। পাটুয়াটুলী হিরণকুটীরে এক খানি ক্ষুদ্র প্লেটে তিনি নুন জল দিয়া চিড়া খাইতেছিলেন। পথে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন, 'কি খাইব পূর্ণবাবু? আজ ঠিক ৩০ দিনের মধ্যে মাত্র ৮বার ভাত খাইবার সৌভাগ্য হইয়াছে। অর্থাভাবে হোটেলে নিত্য খাইতে পারি না। তাই তিন বেলা তিন পয়সার চিড়া খাইয়া প্রাণ রক্ষা করি!' ভাই! গোবিন্দ বাবু যে কি দুঃখ তাহা কাহাকে বলিব! গত মাঘ মাসে তাঁহার দ্বিতীয় ছেলে বরুণকে লইয়া কত জনের দ্বারস্থ হইয়াছেন, শুধু চারিটী ভাতের জন্য। বরুণ এখানে স্কুলে পড়ে। ঢাকায় এমন কেউ নাই যে, কবির ছেলেটাকে ভাত দেয়। এত যে দুঃখ—তবু তাঁর মুখে হাসি, কথায় মধু! আমি প্রায়ই তাঁহাকে ধরিয়া, সাহিত্য পরিষদে লইয়া যাই; তাঁর কথা শুনিবার জন্য।.....সেদিন পরিষদের এক সভায় তাঁহাকে সভাপতি করা হইয়াছিল। এ সব তিনি মোটেই পছন্দ করেন না। সভার পরে আমাকে বলিলেন—'যান্, আপনি আমাকে আনিয়া এই অসুবিধায় ফেলিয়াছিলেন।''

এই পত্রের পরেও কবি সম্বন্ধে সময় সময় তিনি আমাকে পত্র লিখিতেন। আজ জানিলাম, জীবিত গোবিন্দ বাবুর কথা আর কোনও পত্রে লেখা সম্ভব নহে। তিনি স্বর্গারোহণ করিয়াছেন।

কবির কথায় বলিতে হয়—

"হায় মা ভারতি! চিরদিন তোর
কেন এ কুখ্যাতি ভবে,
যে জন সেবিবে ও পদ যুগল
সেই সে দরিদ্র হবে।''

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র শাস্ত্রী।

গোবিন্দ-বরণ।

(১)

গম্ভীর নিশীথে সহসা বাজিল
স্বরগে দামামা কাড়া;
ভেরীর নিনাদে বাজিল ত্রিদিব
উঠে সাজ সাজ সাড়া।
চির জ্যোতির্ম্ময় অমর ভবনে
পুলকে মিলিলা আসি,

বিধি বিষ্ণু ভব ইন্দ্র রবি শশী
কুবের জলেশ পাশী।
দেব বালাগণ করি হুলুধ্বনি
অম্বর পূরিলা গানে,
চড়িলা সত্বরে দেব কুতূহলে
বিবিধ সজ্জিত যানে।
রথ চূড়া'পরে বিচিত্র কেতন
নাচিছে মলয় বায়;
পারিজাত হারে দেব শিল্পদেব
সুখে সাজাইলা তায়।
স্বরগ হইতে ধরাতল পথে
ছড়াইলা ফুল রাশি,
সহসা মুখর করিয়া মধুরে
স্বরগে বাজিল বাঁশী।
সুধার সাগর সে তানে মথিয়া
আকুল বাঁশরী গায়,
"সুধা বিতরণ হয়ে গেছে শেষ
আয় রে গোবিন্দ আয়।"

(২)

নীরবে চলিল শত দেব যান
ছাড়িয়া অমর পুর,
গাহে দেববালা বরণ-সঙ্গীত
জিনিয়া বীণার সুর।
দেব রথ চলে ছড়াইয়া পথে
'কুঙ্কুম' 'কস্তুরী' 'ফুল',
'ফুলরেণু' দিয়া দেব 'বৈজয়ন্তী'
ভূষিলা অমর কুল।
'অগুরু চন্দনে' ললাট লেপিয়া
সাজি মনোহর বেশে,
দেব অভিযান আসিল নামিয়া
পুণ্যতীর্থ বঙ্গদেশে।
ঢাকা ছিল এক কুটীর মাঝারে
কৌস্তুভ রতন পড়ি,
বেড়িলা তাহারে হর্ষে দেবকুল
আলিঙ্গি তুলিলা হরি।
উঠিল আবার দেবকণ্ঠে শত
"জয় শ্রীগোবিন্দ জয়,
চল সখা আজ নবীন ভুবনে
নাহি দুঃখ দৈন্য ভয়।"

(৩)

চলিল অম্বরে শত দেব-রথ
দেববালা গাহে গান,
বরষে হরষে কুসুম আসার,
মোহিয়া কবির প্রাণ!
নাহি আর দুঃখ দেবের পরশে
দেবত্ব লভিলা কবি,
অতীতের যত যাতনা বেদনা
পলকে ভুলিলা সবি।
বাল্মীকি ভারত শ্রীমধুসূদন
মুকুন্দ নবীন সবে,
বরিলা কবিরে করি আলিঙ্গন
"জয় শ্রীগোবিন্দ" রবে।
ভাষা-জননীর স্বর্ণ-পথ হতে
শিরে বরষিলা রেণু,
'জয় শ্রীগোবিন্দ' গাইল ত্রিদিব
মধুরে বাজিল বেণু।
মঙ্গল প্রভাতে উঠে মর্ত্ত্যপুরে
'বল হরি, হরি বোল।'
চিরদুঃখী কবি মরণের পাড়ে
লভিলা শান্তির কোল।

শ্রীপূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

কবি গোবিন্দদাস।

বর্ত্তমান বর্ষে মা উমা আসিলেন, আমাদের দুঃখদারিদ্র্যভার, দুর্গোৎসবের দিনে আমাদিগকে কাঁদাইবার জন্য শোকের একটা মস্ত ভারি বোঝা আমাদের কাঁধের উপর চাপাইয়া দিতে। বিগত ১৩ই আশ্বিন সোমবার বর্ত্তমান কালে সর্ব্বপ্রধান বঙ্গকবি গোবিন্দ দাস আমাদিগকে দুঃখ-সাগরে ভাসাইয়া কাঁদাইয়া চলিয়া গিয়াছেন। গোবিন্দচন্দ্র হয়ত আরো কিছুদিন বাঁচিতেন, কিন্তু দুঃখ-দারিদ্র্য তাঁহাকে বিশেষ ভাবে পীড়িত করিয়া অকালে সমন সদনে লইয়া গিয়াছে। দুঃখ এই, গোবিন্দকে হারাইলাম সত্য, কিন্তু তাঁহার স্থান পূরণ করিবার জন্য যে কাহাকেও রাখিয়া গেলেন না। সে স্থানে যে কাহাকেও পাইলাম না। ভগবান আমাদিগকে চিরকাল শোকের বোঝা চাপাইয়া দিয়া কি তামাসা দেখিতেছেন? ঢাকায় তাঁহার জন্য শোকসভা হইয়াছে, তাঁহার তৈল-চিত্র স্থাপনের আয়োজন চলিতেছে। তিনি যে ঢাকাবাসী, কিন্তু কলিকাতাওয়ালা সংবাদ পত্রে লিখিলেন "ঢাকাই কবি, গোবিন্দচন্দ্র দাস পরলোকে গিয়াছেন, তিনি শুধু পূর্ব্ববঙ্গের নহেন, তিনি পশ্চিমবঙ্গেরও কবি ছিলেন।" কলিকাতাওয়ালা বা পশ্চিমবঙ্গের লোকের নিকট পূর্ব্ববঙ্গবাসী কেহ বহু জ্ঞানে গুণজ্ঞ হইলেও তাঁহারা উঠিতে পারেন না—পিছে পড়িয়াই থাকেন। কলিকাতার সংবাদ পত্র মুখে তাঁহার গুণ গরিমা কাহিনী শুনিলে মনে হয়, বঙ্গে তিনি অদ্বিতীয় কবি ছিলেন। আর কলিকাতার কাগজওয়ালারা গোবিন্দ-চন্দ্রকে এই যে একটু ইঙ্গিত করিয়াছেন, তাহাতে পূর্ব্ববঙ্গবাসীগণ বুঝিতে পারিয়াছে, তাঁহারা কি ভাবে পূর্ব্ববাঙ্গালাকে দেখিয়া থাকেন। এই যে ঢাকাই কবি, পূর্ব্ববাঙ্গালার কবি, এ কথাটুকু না লিখিলে চলিত না কি? আমরা এতই মূর্খ যে, বঙ্গভাগ রহিত জন্য আমরা তালে তালে নাচিয়াছি, ডুরী ধরিয়া তারা যেমন করিয়া নাচাইয়াছেন, তেমনই ভাবে নাচিয়াছি। তাঁহারা আমাদের চোখে ঠুলি দিয়া আমাদিগকে অন্ধ করিয়া আমাদের সর্ব্বস্ব ডাকাতি করিয়া লইয়া গিয়াছেন। হায়, আমরা কি মূর্খ, কি ভ্রান্ত!

তাঁহার জীবনের প্রধান গুণ ছিল যে, তাঁহাকে কোন দিন ক্রোধ করিতে দেখি নাই। আমার সঙ্গে মদীয় বাল্যকালাবধি তাঁহার পরিচয়। অতি দরিদ্র ভাবে তিনি চলিতেন, কখনো তাঁহাকে বাবু হইতে দেখি নাই। ময়মনসিংহে তিনি ভাওয়াল রাজের সম্পর্কে স্বর্গীয় বাবু দেবেন্দ্রকিশোর আচার্য্য-চৌধুরীর বাড়ীতে আশ্রয় গ্রহণ করেন। দেবেন্দ্র বাবুর বাড়ীতে ও স্বর্গীয় যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ এম-এ ডিপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটের গৃহে আমার যাতায়াত ছিল, উভয়ের বাড়ী একই স্থানে ছিল। তাঁহার আর এক ভ্রাতা দেবেন্দ্র বাবুর বাড়ীতে থাকিতেন, তাহার নাম আমার যেন মনে হয় জগদ্বন্ধু দাস, বোধ হয় জগদ্বন্ধু ইতিপূর্ব্বেই ইহজগত ত্যাগ করিয়াছেন। গোবিন্দচন্দ্রের ভ্রাতৃ-শোক গাথা কবিতা পাঠ করিয়াছিলাম। ময়মনসিংহ থাকাকালেই তাঁহার পত্নী-বিয়োগ ঘটে, পত্নী শোকোচ্ছ্বাস কবিতায় তাঁহার পত্নীর নাম উল্লেখ ছিল, পরে তিনি বিবাহ করিয়াছিলেন। কবি গোবিন্দচন্দ্রকে সকলে ভাওয়ালীয়া কবি কহিত, ভাওয়াল রাজ্যে তাঁহার বাড়ী ছিল।

কবির সর্ব্বপ্রধান গুণ ছিল, তিনি কাহারো মুখ দেখিয়া ভয় করিয়া কবিতা লিখিতেন না। দেবেন্দ্র বাবু, রাজা জগতকিশোর এবং যোগেন্দ্র বিদ্যাভূষণের উৎসাহ ও উদ্যোগে ময়মনসিংহে "আর্য্যলাইব্রেরী" নামে একটী সাধারণ লাইব্রেরী স্থাপিত হয়। স্বর্গীয় শিবদয়াল তেওয়ারীর বাড়ীতে লাইব্রেরী স্থাপিত হয়। রাজা জগতকিশোর হইলেন প্রেসিডেণ্ট, দেবেন্দ্র বাবু ও বিদ্যাভূষণ হইলেন ভাইস-প্রেসিডেণ্ট, কবি গোবিন্দচন্দ্র লাইব্রেরিয়ান ও তদীয় ভ্রাতা ক্লার্ক। দেবেন্দ্র বাবু রাজা জগতকিশোরের ভ্রাতা ছিলেন। গোবিন্দ ও তদীয় ভ্রাতাকে দেওয়া হইত মাসে ২০৲ কুড়ি টাকা, আহারাদির ব্যয়টা চালাইতেন দেবেন্দ্র বাবু। লাইব্রেরী অর্থাভাবে উঠিয়া গেল, কিছুদিন পরে গোবিন্দচন্দ্র সেরপুরের বিদ্যোৎসাহী জমিদার স্বর্গীয় হরচন্দ্র চৌধুরীর এষ্টেটে চাকরী গ্রহণ করিলেন। তিনি তেজস্বী পুরুষ ছিলেন। তিনি "গোবিন্দ-বিদায়" নামক কবিতা লিখিয়া চৌধুরী মহাশয়ের বাড়ী হইতে বিদায় হইলেন। ইহার কিছুদিন পরে তিনি মহারাজা সূর্য্যকান্তের এষ্টেটে বেগুণবাড়ী নামক কাছারীর নায়েব হইলেন। এ কার্য্যও তিনি স্বেচ্ছায় ছাড়িয়া দিলেন। তাঁহার স্বাধীন ভাব কি না, চাকরী করিয়া মনিবকে তোওয়াজ করা পোষাইবে কেন?

যখন তিনি বেগুণবাড়ীতে, তখন সে কাছারীতে আমার এক আত্মীয় সহকারী নায়েব ছিলেন। আমি গিয়া শুনিলাম, তিনি যে গৃহে নিত্য শয়ন করিতেন, তাহার এক দিকে তাঁহার পত্নী শয়ন করিতেন, অপর দিকে তিনি থাকিতেন। বিদ্রোহী প্রজারা এ কথা জানিত। কিন্তু ঐ দিন রাত্রেই আহারান্তে জরুরী কার্য্যে তিনি অন্যত্র চলিয়া গেলেন। তাঁহার শয়ন গৃহে তিনি যে দিক দিয়া থাকিতেন, সেই দিকে গভীর রাত্রে বিদ্রোহীরা কয়েকটা বল্লম চালাইল; গৃহের সকলে চীৎকার করিয়া উঠিল, বল্লমের সঙ্গে লেপ তোষকাদি বিদ্ধ হইয়া যাওয়ায় আততায়ীগণ প্রমাদ গণিয়া বল্লম ফেলিয়াই প্রস্থান করিল। কেহ কেহ নাকি তাহাদিগকে চিনিয়াছিল। তিনি সংবাদ পাইয়া পরদিন রাত্রে বেগুণবাড়ী চলিয়া আইসেন। বিদ্রোহীরা জানিত, তখনও তিনি সেখানে আছেন।

এই ভীষণ সংবাদ পাইয়া পরদিন তিনি কাছারীতে চলিয়া যাইলেন—রজনীযোগে। তাঁহার গমনবার্ত্তা সকলে জ্ঞাত ছিল না। গোবিন্দ বাবু সেখানে আছেন মনে করিয়া, বিদ্রোহীরা মফস্বলের সেই অস্থায়ী কাছারী গৃহ আক্রমণ করিয়া গোবিন্দচন্দ্রকে মারিয়া ফেলিবে, ইহাই তাহাদের উদ্দেশ্য। তাঁহাকে ঘুষ দিয়া মনের মত কার্য্য করিতে অকৃতকার্য্য হইল; যখন তাহারা অকৃতকার্য্য হইল, তখন তাহারা মরিয়া হইতে লাগিল। তিনি কখনো ঘুষ লইয়া মনিবের অনিষ্ট করেন নাই। তিনি মফঃস্বলে যে গৃহে শয়ন করিতেন, তিনি চলিয়া আসিলে সে শয্যায় জমানবিশ শয্যাটী কিছুদূর টানিয়া নিয়া শয়ন করিলেন। বিদ্রোহীরা সে রাত্রেও সে গৃহ আক্রমণ করিল, বল্লমগুলি একে একে ফিরিয়া আসিল, কাহারো কোন ক্ষতি হইল না। বাটীস্থ লোকের চীৎকারে আততায়ীগণ পলায়ন করিল, জমানবিশ প্রভৃতি সারারাত্রি অনিদ্র অবস্থায় থাকিয়া পরদিন কাছারীতে আসিয়া পৌঁছিল। দু' একজন হিন্দুমাত্র সরকার পক্ষে ছিল, বাকী সব মুসলমান-বিদ্রোহী। মামলা করিয়া সাক্ষী পাওয়া যাইবে না বলিয়া সে পক্ষে বিরত রহিলেন।

গোবিন্দদাস ইহাদিগকে সুশিক্ষা দেওয়া সঙ্গত বোধ করিয়া মহারাজার নিকট রিপোর্ট করিলেন। তিনি মহারাজাকে লিখিয়াছিলেন, "আপনার ও আপনার কর্মচারীর সম্মান রক্ষার্থ যে কোন উপায়ে যত ব্যয়ই হউক, ইহাদিগকে শাসন করা কর্ত্তব্য।" মহারাজা তাঁহার পত্র পাইয়া ত্বরিৎ ইহার উপায় নির্দ্ধারণ করিলেন না, গোবিন্দ বাবু মনে করিলেন, তিনি বুঝি কর্ণপাতই করিলেন না। ইহার কয়েক দিন পর তিনি এক দীর্ঘ কবিতা লিখিয়া চাকরী ইস্তফা দিয়া চলিয়া গেলেন। গোবিন্দচন্দ্র এ জীবনে কাহাকেও তোষামোদ করেন নাই। কবিতা লিখিবার চেষ্টায়ও কাহাকে গ্রাহ্য করেন নাই, বা কাহারো মুখ চাহিয়া কবিতা লিখেন নাই। তাঁহার কবিতাগুলি সমাজসংস্কারক, উদ্ধত, আত্মম্ভরী, মূর্খ ও অহেতুকী লোকের শিক্ষাদায়ক।

ইহার কয়েক দিন পূর্ব্বে আমি আমার আত্মীয় এসিষ্ট্যান্ট নায়েব মহাশয়ের সহিত কোন প্রয়োজনে দেখা করিতে যাই। পরের ট্রেণেই ফিরিয়া আসিব। আমি সেখানে গিয়া দেখি, গোবিন্দ বাবু মস্ত এক শনিপূজার আয়োজন করিয়াছেন। আমাদের বিশ্রামান্তে দেখি, সহকারী নায়েব মহাশয় সম্মুখে উপস্থিত, গোবিন্দ বাবু করযোড়ে দণ্ডায়মান। গোবিন্দ বাবুর হইয়া সহকারী নায়েব মহাশয় তাঁহার শনি-পূজায় নিমন্ত্রণ করিলেন। আমি তাঁহার বিনীত ব্যবহারে সেদিন সেখানে রহিয়া গেলাম। শনি-পূজা শেষ হইয়া গেলে, গোবিন্দ বাবু কহিলেন, "আমার পাড়ায় শনি আজ হইতে ছাড়িয়া গেল, আমি কালই আমার পদত্যাগ পত্র পাঠাইয়া দিব। মহারাজা যখন আমার কথায় কর্ণপাত করিলেন না, তখন তাঁহার মনের মত লোক আসুন, যে আ সয়া এখানে প্রাণ দিতে পারিবে।" ইহার পরই কবিতায় পদত্যাগ পত্র পাঠাইয়া তিনি বিদায় হইলেন। এ কার্য্য তাঁহার পক্ষে বড় ছিল, কিন্তু তাঁহার মনের বল এতটা ছিল যে, তিনি অবাধে, অগোণে এই দুর্লভ চাকরী পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। ভবিষ্যতে তাঁহাকে দরিদ্রতায় গ্রাস করিবে, সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া হেলায় কর্ম্ম পরিত্যাগ করিলেন।

"মগের মুলুক" বঙ্গসাহিত্যে উজ্জ্বল রত্ন। ভাওয়াল রাজ্যে তিনি বাস করিতেন, সে রাজ্যের অন্তরেই তাঁহার যা কিছু। তিনি কোন চিন্তা না করিয়া, পশ্চাৎ না ভাবিয়া "মগের মুলুক" লিখিয়া বসিলেন। ইহার জন্ত মামলা হইল। সর্ব্বপ্রথমে কলিকাতার এক সাপ্তাহিক পত্রে ইহা প্রকাশ হয়। আট হাজার টাকা ক্ষতিপূরণ দিয়া পত্রিকা-সম্পাদক ভাওয়াল রাজ ও তাঁহার ম্যানেজারের সহিত আপোষ করিলেন। সেই হইতে তিনি ভাওয়াল হইতে নির্ব্বাসিত হইলেন। তাঁহার দুর্দ্দশার সীমা রহিল না। যেদিন তিনি শুনিলেন, তাঁহাকে সপরিবারে বধ করিবার জন্ত রাজদস্যুগণ ফিরিতেছে, সেই দিনই তিনি নৌকাযোগে রজনীতে বিক্রমপুর পলায়ন করিলেন। রেলে গেলেন না—রেলে গেলে তাঁহার যাত্রাটা প্রকাশ্য হইয়া পড়ে, তজ্জন্ত যাত্রার ব্যাঘাত ঘটিতে পারে। তিনি জীবনের শেষ পর্য্যন্ত বিক্রমপুর ব্রাহ্মণগাঁ বাস করিয়া আসিতেছিলেন। তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি রাজ-সরকারে বাজেয়াপ্ত হইল, পরে রাজ-সম্পত্তি কোর্ট-অব-ওয়ার্ডস্‌এ গেলে তাহার কিয়দংশ উদ্ধার করিয়াছিলেন।

গোবিন্দ বাবুর মৃত্যুর কয়েক দিন পূর্ব্বে আমি ঢাকায় গিয়াছিলাম। তখন ঢাকায়

একজন পদস্থ ব্রাহ্ম বলিয়াছিলেন "কবি গোবিন্দ দাস উচ্চ দরের কবি হইলেও তিনি ভাল লোক নহেন। তাঁহার সবগুলি কবিতাই নিন্দাবাচক, কোন কবিতাই দেখিলাম না, যাহাতে তিনি ঘা না দিয়াছেন।" আমি কহিলাম, "তিনি কবি ও শাসক ছিলেন, এই জন্যই তাঁহাকে দেশের লোক ভালবাসে, কেবল যাঁহারা ঘা খাইয়াছেন, তাঁহারাই বিরক্ত। ব্রাহ্মসমাজের উপর তিনি চটা ছিলেন।" ঢাকায় ঐ সময় একদিন দেখা হইলে, গোবিন্দ বাবু কহিলেন, তিনি এক মাসে দু' একদিন ভাত খাইয়াছেন, কখন উপবাস, কখন চিপিটক। হা, কি সর্ব্বনাশ, তথাপি গোবিন্দ বাবু কোন আত্মীয় বন্ধুর বাড়ীতে আশ্রয় গ্রহণ করেন নাই, গোবিন্দচন্দ্র এতই অভিমানী ছিলেন। গোবিন্দচন্দ্রের সহিত শেষ যাত্রায় দেখা হইলে, তাঁহার দৈন্যাবস্থা আমাকে জানাইয়া বলিলেন, "আপনি নানা প্রকারে নানা উপায়ে নানা লোকের উপকার করেন, কিন্তু আমার প্রার্থনা সত্ত্বেও আমার কিছু করিলেন না। আমার দুর্ভাগ্য।" আমি কহিলাম "আপনার কিছু করিতে পারিলাম না, ইহা আমারই দুর্ভাগ্য। কই আপনি ত তেমন করিয়া ধরেন নাই।" পাটুয়াটুলির এক লাইব্রেরীতে বসিয়া, তাঁহার জীবনের দুরবস্থার কাহিনী দুই ঘণ্টাকাল পর্য্যন্ত আমাকে জ্ঞাপন করিলেন, অবশেষে তিনি কহিলেন, "আমি ১০০৲ টাকার জন্য সম্প্রতি বিশেষ ভাবে দায়ী আছি। আপনি ইহা হইতে উদ্ধার করুন। সকল রাজা জমিদারই আপনার নিঃস্বার্থতা গুণে আপনার নিকট বাধ্য, আপনি ইচ্ছা করিলে সহজেই ইহা আদায় করিয়া দিতে পারেন। তাহা না হইলে ভাওয়ালে আমার যে সম্পত্তি আছে, তাহার কিয়দংশ বিক্রয় করিলে তাহার মূল্য ১৩।১৪ শত টাকা হইবে। আপনি তাহা ক্রয় করিলেও তাহাতে উপকার করা হয়।" আমি কহিলাম, "৺শারদীয় পূজার পর সাক্ষাৎ করিবেন, যে উপায়ে পারি, আপনার ঋণ শোধ করিব।" কিন্তু হায়, ভগবান আমাকে সে সুযোগ প্রদান করিলেন না। ইহার পূর্ব্বেই মা জগদম্বা তাঁহাকে বাগ্‌বাদিনী, বীণাপাণির নিকট পঁহুছাইয়া দিলেন। পরলোকে তাঁহার আত্মার সদ্গতি হউক, ইহাই জগদীশ্বরের নিকট প্রার্থনা। তাঁহার শোক-সন্তপ্ত পরিবারকে কি বলিয়া সান্ত্বনা করিব? তাঁহারাও একচিত্তে এই বঙ্গব্যাপী সুযশ-প্রাপ্ত কবির সুনাম, সুযশ লইয়া স্বর্গে বীণাপাণির আশ্রয়ে এমন করিয়া আত্মমর্য্যাদা রক্ষা করুন, তাহাই প্রার্থনা করুন। তাঁহাকে আর পাওয়া যাইবে না, তাঁহার আত্মার সদ্গতি কামনা করুন। জগদীশ্বর আপনাদের প্রার্থনায় কর্ণপাত করিবেন।

শ্রীরাজেন্দ্রকুমার শাস্ত্রী, বিদ্যাভূষণ,
এফ-টি-এস্; এম্-আর-এ-এস্।

গোবিন্দ-প্রয়াণ।

বাঙ্গালা "গোবিন্দ"-হীন! গাহ আজি
গাহ বীণ্‌
সকরুণ স্বরে,—
থেমেছে ললিত বাঁশী, ফুরায়েছে অশ্রু-হাসি,
চিরদিন তরে!
হা কবি! হা দীন কবি! পূর্ব্ব বাঙ্গালার রবি!
প্রিয় সখা মম!

সত্য তুমি নাই আজ! কাব্যকুঞ্জে রুদ্র-রাজ
পড়েছে নির্ম্মম!
একি সেই যুগান্তের মহাদৃশ্য জগতের
পুনঃ অভিনয়,—
অনন্ত শয়ন 'পরে কাল-ব্যাধ ক্রূর-শরে
গোবিন্দ বিলয়!

২

গোবিন্দ! "গোবিন্দ" তুমি! তব চিত্ত রঙ্গভূমি
বিচিত্র লীলার,—
রাধা-প্রেম মনোহর, পাঞ্চজন্য ভয়ঙ্কর,
তুলেছে ঝঙ্কার!
গোবিন্দ! "গোবিন্দ"! তুমি-হারা জন্মভূমি
গোবিন্দের মত,—
অধর্ম্ম ও অত্যাচার, বিদলিতে অনিবার
ছিল তব ব্রত।
গোবিন্দ! "গোবিন্দ" তুমি! ছিল বঙ্গ
মোহে ঘুমি'
দুর্য্যোধন প্রায়,—
"বিদুরের ক্ষুদ" তরে যবে তুমি ঘরে ঘরে
ফিরিলে গো হায়!

৩

হে দুর্ভাগ্য বঙ্গবাসি! পিয়ে নিজে সুধারাশি
তীব্র হলাহল
তোমারি কবির করে তুমি দিলে হেলা ভরে
নিয়ত কেবল!
চিরফুল্ল ফুল-হার "কুঙ্কুম" "কস্তুরী" আর
সুরভি "চন্দন",
"প্রেমফুল" "ফুলরেণু" "বৈজয়ন্তী", দিব্য বেণু
মধুর নিক্বণ!
যে জন তোমার দ্বারে অর্পিলেন নেত্রাসারে
নির্ম্মাল্য বাণীর,—
তাঁরে দিলে প্রতিদান দারিদ্র্যের অপমান
বেদনা গভীর!

৪

শ্রীমধুসূদনে আর হেমচন্দ্রে দুর্নিবার
করিয়া দংশন,
নিয়তি! রাক্ষসী অয়ি! বাসনা মিটিল কই—
ক্ষুধা কি ভীষণ!
তিলে তিলে পলে পলে ভাসাইয়ে নেত্রজলে
গোবিন্দে আমার,
গ্রাসিলি—গ্রাসিলি শেষে, দারুণ দীনতা-বেশে
দলি' অনিবার!
আর কি চাহিস্ আজ, বাঁহুগর্ভ ভীম বাজ
হানিয়া নন্দনে,—
বারেক নিরস্ত হয়ে, কাঁদি আজি প্রাণ ভরে
নিষ্ঠুর ভুবনে!

৫

গোবিন্দ! সুহৃদ্ মম! হে শ্রদ্ধেয়! প্রিয়তম!
সব অবসান,—
নাহি দুঃখ-দৈন্য আর, নাহি অশ্রু-হাহাকার,
ব্যথা-অপমান!
সমাগত দেব-রথ, সিদ্ধ তব বাণী-ব্রত,
সিদ্ধ মনস্কাম,—
শান্তি-তৃপ্তি-পূর্ণ বুকে অগ্রসর কাম্য-মুখে
হর্ষে অভিরাম!
ধ্রুবতারা হয়ে রও, আত্মার আরতি লও,
যুগ-যুগান্তরে,—
হে অমর! মর্ত্ত্যলোক ধন্য হোক্! ধন্য হোক্!
তোমা লক্ষ্য করে!

শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত।

স্বর্গীয় গোবিন্দচন্দ্র।

(১)

কবিবর,

দুঃখের পাথারে সাঁতার দিতে হে

এসেছিলে বঙ্গে।

দুঃখ দারিদ্র্যের জ্বালা

করিয়া কণ্ঠের মালা

নিয়ে গেছ সঙ্গে।

শোকের রোদন বিষাদের অশ্রু

মেখেছিলে অঙ্গে,

তোমার জোড়া কি আর

মিলিবে এ বঙ্গে?

(২)

তোমার কণ্ঠ যে ছিল হে মধুর,

মরম যাতনা বিষাদ বিধুর।

সুপুত্র মাতার কোথা আজ তুমি,

আঁধার করিয়ে গেলে বঙ্গভূমি?

নক্ষত্র খসিয়া পড়িল ভূতলে,

পূর্ণচন্দ্র খসি পড়িল যে জলে;

মধ্যাহ্নে তপন গেল অস্তাচলে।

আঁধার হইবে দেশ চকিতে এমন,

ভাবি নাই বুঝি নাই এ যে গো স্বপন!

(৩)

গোবিন্দ,

ভাসাইয়া অশ্রুজলে

ডুবাইয়া সাগর তলে

বন্ধুজনে, পরিজনে

কোথায় গিয়েছ চলে?

সে দেশে কি আছে দুঃখ

হেন অবহেলা,

যার তরে কাঁদে প্রাণ

তার হেথা নাহি প্রাণ,

আপন সুখের লাগি

দিবানিশি থাকে জাগি

ফাটায় আকাশ কেঁদে

আপনার বেলা।

যে জন রয়েছে কূলে

তা'রে ভাসাতে অকূলে

জোরে দেয় ঠেলা।

সে দেশে কি আছে হেন

মর্ম্মদাহী ব্যবহার

মর্ম্মদাহী অবহেলা?

(৪)

যাও বন্ধু,

দীপ্তছায়া পথ ছাড়ি

ভবসিন্ধু দিয়ে পাড়ি

যে দেশে হে ধনী দীন

সমাসনে সমাসীন,

হিংসা দ্বেষ নাহি যথা

নাহি

নির্য্যাতন মর্ম্মব্যথা

অশ্রুজলে দিবানিশি

ধুইতে বিষাদ রাশি

নাহি হ'বে প্রয়োজন।

যাও তথা—

প্রেমের নন্দন বনে

বসন্ত কোকিল সনে

গাইবে প্রেমের গান

কেহ না করিবে কভু

তাহে বাধা দান।

নিত্যানন্দে পূর্ণ তথা

দেবের পরাণ।

গাইবে মধুর গাথা

হেথাকার সব ব্যথা

ধুয়ে দেবে মন্দাকিনী
চির শান্তি-জলে
কি আর বলিব সখা
তথা কি হইবে দেখা ?

আমি হীন আমি দীন
রোগে শোকে হয়ে ক্ষীণ,
ভাসি অশ্রুজলে।
শ্রীবিষ্ণুচরণ চট্টোপাধ্যায়।

নব্যভারতের কবি গোবিন্দচন্দ্র দাস

জন্ম—৪ঠা মাঘ, ১২৬১, জয়দেবপুর।
মৃত্যু—১৩ই আশ্বিন, সোমবার, ১৩২৫, ঢাকা।

বাঙ্গালা-সাহিত্যের ইতিহাসে বঙ্গদর্শন, আর্য্যদর্শন, বান্ধব এবং জ্ঞানাঙ্কুরের যুগ চিরস্মরণীয়। বঙ্কিম-যোগেন্দ্র-কালীপ্রসন্ন-শ্রীকৃষ্ণ-শক্তি-সমবায়ে এ দেশের জাতীয় জীবনে এক মহোচ্চ উন্নতির রেখা অঙ্কিত হইয়াছিল। বিদ্যাসাগর-অক্ষয়কুমার-প্যারীচাঁদ-মাইকেলের নাম যেমন বাঙ্গালা সাহিত্যে অক্ষয়, তেমনি অক্ষয়, ঐ শক্তি-সমন্বিত বীরপুরুষ-চতুষ্টয়। কাব্যে—নবীন-হেম-রঙ্গলাল-ঈশান-শিবনাথ গদ্যে অক্ষয়চন্দ্র, রজনীকান্ত, প্রফুল্লচন্দ্র, রাজকৃষ্ণ, চন্দ্রনাথ, হরপ্রসাদ; নাট্যে—দীনবন্ধু-উপেন্দ্র-গিরীশচন্দ্র প্রভৃতির নামও এ দেশে অক্ষয়। এ দেশের সকল আন্দোলন থামিয়া গেলেও ইঁহাদের নাম বিলুপ্ত হইবার নয়। যদি বিলুপ্ত হয়, বাঙ্গালা সাহিত্য অনন্তকালের বিস্মৃতিতে শয়ন করিবে। বিন্দু বিন্দু রক্তদানে উঁহারা বাঙ্গালা সাহিত্য গঠন করিয়াছেন। তাঁহাদের নামে চিরদিন পুষ্পচন্দন বর্ষিত হউক।

যখন বঙ্গদর্শন প্রভৃতির যুগ গিয়াছিল, তখন নব্যভারতের যুগের আরম্ভ। মহাত্মা রিপন এ যুগের প্রবর্ত্তক ছিলেন। ভারতী, নব্যভারত, সাধনা, নবজীবন, প্রচার, এই যুগের চিরস্মরণ্য। এই যুগের নায়কগণের নামও এ দেশে অক্ষয়। কাব্যে বিহারীলাল, রবীন্দ্রনাথ, অক্ষয়কুমার, যোগেন্দ্রনাথ, গিরীন্দ্রমোহিনী, বিজয়চন্দ্র, মানকুমারী, কামিনী, দ্বিজেন্দ্রলাল, গোবিন্দচন্দ্র, দেবেন্দ্রনাথ, নিত্যকৃষ্ণ, আনন্দচন্দ্র, দীনেশচরণ; গদ্যে—যোগীন্দ্রনাথ, নগেন্দ্রনাথ, বিজয়চন্দ্র, সুরেশচন্দ্র, ঠাকুরদাস, পাঁচকড়ি, স্বর্ণকুমারী এবং নাট্যে—রাজকৃষ্ণ, দ্বিজেন্দ্রলাল, ক্ষীরোদপ্রসাদ প্রভৃতির নামও চির-অমর। কিন্তু এ সকল কথার কারণ-নির্দ্দেশ এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়।

১২৯০ সাল হইতে নব্যভারত-যুগের আরম্ভ। এই সালেই বঙ্গবাসী, সঞ্জীবনী, নব্যভারত প্রকাশিত হয়। এই যুগের প্রধান লেখকগণের অনেকেই কালের কুক্ষিগত হইয়াছেন, তাঁহাদের জন্য সদা আমরা ম্রিয়মাণ রহিয়াছি। যাঁহারা আছেন, তাঁহাদিগকে অগণ্য ধন্যবাদ দিতেছি। সম্প্রতি নব্যভারতের অন্তরতর প্রসিদ্ধ কবি গোবিন্দচন্দ্র দাস দুঃখের বোঝা মস্তক হইতে রাখিয়া চিরপ্রস্থান করিয়াছেন। আজ তাঁহার অমর আত্মার উদ্দেশ্যে তর্পণ করি।

গোবিন্দচন্দ্রের জীবন নানা অস্থির ঘটনার সমাবেশে পূর্ণ। যে দেশে যাহার জন্ম, সে দেশ যদি তাহাকে রক্ষা না করে, তবে সে কোথায় যাইবে ? ১২৯০ সালের প্রথমেই তিনি ভাওয়ালে উপেক্ষিত হইয়া আমাদের সহিত

সাক্ষাৎ করেন। ১২৯০ সালের শ্রাবণ-মাসে তাঁহার কবিতা "সতীদেহস্কন্ধে মহাদেবের নৃত্য" এবং তৎপর আশ্বিন মাসে "প্রশ্নোত্তর" ও চৈত্র মাসে "বৃদ্ধের শেষ প্রণয়গীতি" প্রকাশিত হয়। এদেশের নানা কাগজে লিখিতেছেন, গোবিন্দচন্দ্র সম্পাদকবর্গের সহিত দেখা করিয়া সহানুভূতি পান নাই। এ সব মিথ্যা কথা। নব্যভারত যাহাকে প্রথম সাক্ষাতের দিন হইতেই সাদরে গ্রহণ করিয়াছিলেন, এবং আশ্রয় দিয়াছিলেন। নব্যভারতই প্রকৃতি-সম্পাদককে মগের মুলুক প্রকাশ করিতে অনুরোধ-পত্র দিয়াছিলেন, এবং মহারাজ সূর্য্যকান্তকে চাকরী দিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। গোবিন্দচন্দ্রকে আশ্রয় দেওয়ার জন্য নব্যভারত-সম্পাদককে মৃত্যুর ভয়ও দেখান হইয়াছিল। তিনি যদি তাঁহার আত্মীয়-বর্গের নিকট সে সকল কথা ব্যক্ত না করিয়া থাকেন, তবে ত্রিকালজ্ঞ দেবতার নিকট অপরাধী হইবেন। তাঁহার বন্ধুবর্গের তাহা অনুসন্ধান করা উচিত ছিল। ইতিহাস না জানিয়া বাক্যবিন্যাস করা ধৃষ্টতা মাত্র।

এ জগতে উত্থান-পতনের ইতিহাস সর্ব্বদাই চিত্তাকর্ষক। ঘটনা-পরম্পরায় রামের উত্থান, রাবণের বিনাশ ও প্রহ্লাদের উত্থান, হিরণ্যকশিপুর পতন, ম্যাট্‌সিনি গ্যারিবাল্ডির উত্থান, অষ্ট্রীয়ার পতন—ইত্যাদি কত কথারই উল্লেখ করা যাইতে পারে। কি পাপে কাহার কি সর্ব্বনাশ হয়, কেহ ব্যাখ্যা করিতে পারে না। কোন্ পাপে ভাওয়ালের রাজবংশ নির্ব্বংশ হইল, কে তাহা ব্যাখ্যা করিতে পারে? ধর্ম্মের সংসার মাণিকদহ-ষ্টেটের সোণার বিষয় কাহার পাপে বিক্রীত হইতে চলিয়াছে, কে তাহা নির্ণয় করিতে পারে? গোবিন্দচন্দ্রের উত্থানের ইতিহাস গভীর সমস্যাপূর্ণ। ভাওয়াল এবং মাণিকদহের সহিতও তাহা কিছু কিছু যুক্ত। সে সব কথা অনুধাবন করিতে হইলে, নব্যভারতের ৩৬ বৎসরের পৃষ্ঠা উদ্ঘাটন ক'রতে হইবে। কবিতার পরতে পরতে তদীয় ইতিহাস অঙ্কিত। যিনি তাহা না করিবেন, গোবিন্দচন্দ্রের ইতিহাস তিনি বুঝিবেন না। স্কুলে সামান্য অধ্যয়ন, জমীদারি-সরকারে সামান্য চাকরী গোবিন্দদাসের জীবনের প্রকৃত ইতিহাস নয়। তাঁহার ইতিহাস স্বাবলম্বনের ইতিহাস, চরিত্রের ইতিহাস, দুঃখ দারিদ্র্যের ইতিহাস, দেশাত্মবোধের ইতিহাস। সে ইতিহাস জানিতে হইলে নব্যভারতের পৃষ্ঠা উদ্ঘাটন করিতে হইবে। শত ব্যভিচারী তাহাতে উপেক্ষা জল নিক্ষেপ করিলেও তাহা ধামা চাপা থাকিবে না। সময়ে তাহা প্রকাশিত হইবেই হইবে। শুনিয়াছি, আধুনিক যুগের কোন সম্পাদক তাঁহাকে শুধু কেবল তাঁহার কাগজে লিখিত অনুরোধ করিয়া, সাহায্যের প্রলোভন দেখাইয়াছিলেন; কিন্তু গোবিন্দচন্দ্র তাহাতে স্বীকৃত হন নাই। তিনি দরিদ্র ছিলেন, কিন্তু কখনও পা-চাটার দলে নাম লিখিতে স্বীকৃত হন নাই—কত রাজা মহারাজাকে তিনি উপেক্ষা করিয়াছিলেন, তাহা ভাবিলেও চমৎকৃত হইতে হয়। যিনি চরিত্র রক্ষার জন্য হরচন্দ্রের সাহায্য উপেক্ষা করিয়াছিলেন, তিনি যে টাকার প্রলোভনে রাজা মহারাজা বা ধনী সম্পাদকের পা চাটিবেন, তাহা সম্ভব নয়। তিনি যেদিন বেশ্যাবাড়ী যাওয়ার সঙ্গী হইতে অনুরুদ্ধ হইয়াছিলেন, সেই দিন ঐ ক জমীদারের সম্বন্ধ ছিন্ন করেন। ঘুষের হাতে পড়িবার ভয়ে অন্য জমীদারের কার্য্য ছাড়েন। তিনি ভাওয়ালের কোন মহাত্মার বেশ্যার পুকুরে স্নান

করিয়া অনুতপ্ত হইয়াছিলেন। চাটুকারিতার ভয়ে বিপিনবিহারীর চাকরী অগ্রাহ্য করেন। ব্রহ্মোপাসক হইয়াও ব্রাহ্মসমাজের গণ্ডীতে যিনি আত্মবিক্রয় করেন নাই, তিনি দরিদ্র বলিয়া তাঁহাকে ক্রয় করিতে যিনি চাহিয়াছিলেন, তাঁহার বুদ্ধির প্রশংসা করিতে পারি না। তিনি স্বাবলম্বনকে আশ্রয় করিয়া বীরপদভরে দাঁড়াইতে সর্ব্বদা চেষ্টা করিয়াছিলেন। পাঠক, সুদীর্ঘকালের নব্যভারতের ইতিহাস অনুসন্ধান কর, সব কথা বুঝিতে পারিবে।

দ্বিতীয় খণ্ড নব্যভারতের বৈশাখ সংখ্যায় লিখিলেন—

"পৃথিবী !
আমিও তোমার মত, জীবন করিব গত,
ভ্রমিব সংসারশূন্য অবলম্বহীন,
তোমারি মতন হায়, অবিচল প্রতিজ্ঞায়
আপনি আপন বলে থাকিব স্বাধীন।
বিপদেরে তৃণজ্ঞানে, না চাহি পশ্চাত পানে,
সাধিব কর্ত্তব্য কর্ম্ম বাঁচি যত দিন,
হৌক না সংসার-শূন্য অবলম্বহীন ?
করিয়াছি নব শক্তি হৃদয়ে সঞ্চার,
পুণ্য যোগ শত বর্ষ জীবনে আমার।"

১২৯০ সালে তাঁহার জীবনের পুণ্য যোগের সময়—ভাওয়ালের সম্বন্ধ ছিন্ন হওয়ার অমোঘ যোগ। ইটালিতে ভ্রাতৃরক্তরঞ্জিত রিয়েঞ্জির উত্থান এইরূপেই হইয়াছিল।

১২৯১ সালের আষাঢ় মাসে লিখিলেন—

"অভাগিনি অশ্রুমুখি দুখিনি আমার !
প্রাণপণে অবিরত, যতন করিনু কত
মুছিতে পারিনু কই, শোকাশ্রু তোমার !
শত গ্রন্থি ছিন্নবাস, একাহার উপবাস,
এ জনমে অভাগিনি ঘুচিল না আর !
পত্র পুষ্প শূন্য যথা, শীতের বিশুষ্ক লতা,
অথবা মলিন যথা অঙ্গ বিধবার।
ম্লানতা দীনতা হায়, একাধারে সমুদায়
পরিম্লান পুষ্পভাণ্ড শরীরে তোমার
প্রিয়ে দুখিনি আমার !
* * *
পাপিষ্ঠ বিশ্বাসঘাতী, কৃতঘ্ন মানব জাতি
হৃদয় ভেঙ্গেছে করি চরণ প্রহার।
মূর্খের অধিক মূর্খ, কি বলিব সে যে দুঃখ
করিয়াছে মূর্খ বলি শত তিরস্কার।
সকলি সহিয়াছিরে, প্রাণময়ি প্রেয়সিরে,
কেবল চক্ষের জল মুছিতে তোমার।
কেবলি তোমারি তরে, সুখ শান্তি অকাতরে
জীবনের যত আশা করি পরিহার।
হায় এ সন্ন্যাসী বেশে, ফিরিতেছি দেশে দেশে
প্রাণময়ি প্রেয়সিরে কাঙ্গাল তোমার।
* * *
যাই আজ দিব্যধামে যেখানে মানব নামে
না আছে দানব দৈত্য কোনও প্রকার।
যাই আজ দিব্যধামে, পবিত্র তোমার নামে,
খুলিগে স্বর্গের আগে কনক দুয়ার।
তুমিও সে দিব্যধামে, পবিত্র ঈশ্বর নামে
পায়ে ঠেলে আসিও এ ঘোর অত্যাচার
প্রিয়ে দুখিনি আমার !"

১২৯১ সালের শ্রাবণ মাসে লিখিলেন—

"ইচ্ছা করে—
অই বুকে বুক রাখি, অমনি লুকা'য়ে থাকি,
ভুলে যাই এ সংসার জ্বালা যন্ত্রণার।
শত কষ্ট—শত দুঃখ, এ অন্তর দগ্ধ বুক,
নিবাই প্রাণের গুপ্ত জলন্ত অঙ্গার।"

১২৯১ সালের ভাদ্র মাসে লিখিলেন—

"এত প্রেম ভালবাসা ভুলিয়াছে সব,
এতই কি অকৃতজ্ঞ ধরার মানব ?
বুকে কি কলিজা নাই, কলিজায় প্রাণ,
মানবের বুক ভরা এত কি শ্মশান !
প্রাণে নাই প্রাণ দেওয়া, প্রেম ভালবাসা,
কেবলি আকণ্ঠপূর্ণ শোণিত-পিপাসা !
প্রেমে নাই প্রতিদান আছে প্রত্যাহার
সত্য কি মানব এত পশু নরাকার ?"

মানবের অত্যাচার-প্রপীড়িত গোবিন্দচন্দ্রের জীবন-ইতিহাস এইরূপে আরম্ভ হইল। কিন্তু তাহাতেও প্রকৃত গোবিন্দ দাসের অভ্যুদয় হয় নাই। তদীয় কন্যা প্রমদার মৃত্যু যদিও ১২৮৬ সালে হইয়াছিল, কিন্তু দুঃখস্রাবী অমলধারা ১২৯১ সালের কার্ত্তিক মাসে নব্যভারতে প্রকাশিত হইল—

"প্রমদা!
সেই যে মুকুতাদন্ত সহাস আনন,
সেই অর্দ্ধ উচ্চারিত "বাব্বা" সম্বোধন,
সেই দিবা অবসানে শ্যাম সন্ধ্যাবেলা,
জননীর সনে তোর ত্রিদিবের খেলা!
তারা ভরা চাঁদ ভরা নিরখি গগন,
সুধাভরা মুখে তুই হাসিতি যখন,
দেখি তোরে হাস্যময়ী আনন্দের ডালি,
আদরে সারদা কত দিত করতালি!
গোপনে দাঁড়ায়ে সেই একেলা একেলা,
দেখিতাম অভাগীর মেয়ে নিয়ে খেলা।
স্মরিতে এখনো উহা কেঁদে উঠে মন,
এ জনমে আর না কি দেখিব কখন?"

ইহার পর ১২৯১—ফাল্গুন মাসে লিখিলেন—

"মা! কেন অভিমান?
শত দোষে হই যদি, ও চরণে অপরাধী
ভারতি, ভারত তোর তথাপি সন্তান।
কে কোথা কোলের ছেলে, তোর মত ঠেলে ফেলে
কে কোথা দেখেছে হেন জননী পাষাণ?"

১২৯২ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে গাইলেন—

"জয় মরণের জয়, জয় শ্মশানের জয়
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড যার ভয়ে কম্পবান।
কি দেব দানব নর, যক্ষ রক্ষ বিদ্যাধর
অমর কথার কথা বোঝে না অজ্ঞান।
বাসরের বজ্রছার, বৃথা তার অহঙ্কার—
আপনি করিলে পাপ ভোগে ভগবান,
যত কিছু—এক ঠাঁই হইবেক ভস্ম ছাই,
দেখবে মোহান্ধ জীব নির্ব্বোধ অজ্ঞান।"

তারপর ভাদ্র মাসে লিখিলেন—
"যাই তবে জননি গো বিদায় এখন,
যাই যে স্বদেশ-বাসি! মনে রেখ ভাই,
তোমাদেরি তরে সহি এত নির্য্যাতন।
বিড়ম্বিত হইলাম, বর্ব্বরের ঠাঁই।"

ইহার পরই, ১২ই অগ্রহায়ণ, ১২৯২, তাঁহার পত্নী সারদাসুন্দরী স্বর্গারোহণ করেন। এই সময় হইতেই প্রকৃত দুঃখের কবি গোবিন্দচন্দ্রের অভ্যুদয় হইল—

কবি গাইলেন—

"রোগ শোক দুঃখ ভরা
ত্যজিয়া এ বসুন্ধরা
যায় আজ দিব্যধামে সারদাসুন্দরী
বল চন্দ্র বল তারা বল হরি হরি।"

সারদাসুন্দরী কবিতায় আর্টের অভাব আছে বলিয়া কোন বড় কবি দুঃখ করিয়াছিলেন, কিন্তু এরূপ হৃদয়ের বেদনা বাঙ্গালায় আর কোন্ কবিতায় প্রকাশিত হইয়াছে, জানি না। গোবিন্দচন্দ্র যে ভাব-ভোলা স্বভাব-কবি, তাহা এই দিন হইতেই বঙ্গে কীর্ত্তিত হইল। সারদাসুন্দরী উপলক্ষে কবি যে সকল কবিতা লিখিয়াছেন,তাহা বাঙ্গালা ভাষার মহাকীর্ত্তি। পড়িলে পাষাণও ফাটিয়া যায়। তোমারে কেবল, শ্মশানে সম্ভাষণ, মনের কথা, দেখি দেখিবে কি আর, কি হ'ল আমার, পত্র লিখিও, দেখিলাম কই, তোমার আমার, প্রভৃতি কবিতা তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য। ইহার পরই দেশাত্মবোধ গোবিন্দচন্দ্রকে আক্রমণ করিল, তিনি ১২৯৩ সালের বৈশাখ মাসে গাইলেন—

"এস ভাই ভিন্ন ভাব করি পরিহার
এস ভাই এক প্রাণে, এক ধ্যানে এক জ্ঞানে
অনন্ত জীবনে করি এক অঙ্গীকার।
রাখি এ অনন্ত হস্ত, সে কার্য্য সাধনে ন্যস্ত,
পবিত্র মহান সত্য করিতে উদ্ধার।
অর্থী করিতে ব্যয়, যদি আবশ্যক হয়
রাখি এই রক্তপূর্ণ কোটি বক্ষাধার,
(এস) অনন্ত জীবনে করি এক অঙ্গীকার।
ভাই!
এক হস্তে মুছিবে না এত অশ্রুজল!
এক হস্তে ছিঁড়িবে না এ পাপ-শৃঙ্খল।
রক্তের সাগর চাই, এত রক্ত কোথা পাই
এক বক্ষে নাহি তত শোণিত তরল,
অগস্ত্য আগ্নের আশা, সীমাশূন্য সে পিপাসা,
ব্যাদিত গগনময় গ্রাসে গ্রহ দল!
রক্তের সাগর চাই, কোটী ভুজবল!"
ইত্যাদি ইত্যাদি।

ইহার পর দেশাত্মবোধের যত কবিতা প্রকাশিত হইয়াছে, তন্মধ্যে গুরু গোবিন্দ সিংহ, কালীয়দমন, সরস্বতী পূজা, বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র, কার্ত্তিক পূজা, কি তাজ্জব, স্বাধীনচেতা, তাড়কার বন, তোমরাও মানুষ, ফুটবল, জন্মাষ্টমী গীতি ও কবিতা, বঙ্গ পেলে কই, হিন্দু মুসলমান, পুংসবন, জগন্নাথের রথ, আমরা হরিহর, অসুরপূজা, বঁশী, আমরাও মানুষ, দুর্গাপূজা প্রভৃতিই প্রধান। ১২৯৩ সালের ৩০শে শ্রাবণ তাঁহার একমাত্র সহোদর জগচ্চন্দ্র দাসের মৃত্যু হয়। ১৩০০ সালের ১৪ই কার্ত্তিক আনন্দ-আশ্রমে মণিকুন্তলার মৃত্যু হয়। ইহার কিয়দ্দিবস পূর্ব্বেই ১২৯৯ সালের ১লা মাঘ দ্বিতীয় বার বিবাহ করেন। মণিকুন্তলার সহিত জীবনের প্রথম পরিচ্ছেদ শেষ হয়। তৎপর দিন দিন দুঃখ কষ্টের কষাঘাত আরম্ভ হয়। আমাদের মনে হয়, দ্বিতীয় বার বিবাহ না করিলেই ভাল হইত। আমাদিগকে পরম বন্ধু মনে করিলেও দ্বিতীয় বার দারপরিগ্রহ করার সময় মত গ্রহণ করেন নাই। ১৩১৪ সালে তাঁহার বড় পুত্রের বিবাহেও আমাদের মত গ্রহণ করেন নাই। এই বিবাহোপলক্ষেও তিনি কলিকাতা আসিয়া আনন্দ-আশ্রমেই উঠিয়াছিলেন, আমরা পীড়িত হইয়া তখন পুরীতে ছিলাম। পণ দিয়া বধূ-ক্রয়-প্রথা আমরা অনুমোদন করি না। বরুণকে ঢাকা রাখিয়াছিলেন। কিন্তু আমাদের এখানে রাখার জন্য কোন প্রস্তাবই করেন নাই। শুনিতেছি, মহামারীর ভয়ে কলিকাতা পাঠান নাই। কিন্তু পাঠাইলে বোধ হয়, পুত্রদের জন্য তাঁহার কোন চিন্তা করিতে হইত না। * আমরা তাঁহার সমস্ত পুস্তকই একাধিকবার নব্যভারত প্রেসে সুলভ মূল্যে ছাপাইয়া দিয়াছিলাম। যদিও পরে পুস্তকের আয় হইতে তাহা শোধ হইয়াছে, কিন্তু প্রতিবারই আমরা কাগজের মূল্য ও প্রেসের ব্যয় দিয়া পুস্তক ছাপাইয়া দিতে কখনও কুণ্ঠিত হই নাই। কোন সম্পাদক তাঁহার সাহায্য করেন নাই, ইহা ঠিক নয়। আমরা তাঁহাকে আশ্রয় দিয়াছিলাম বলিয়া, ৺কালীপ্রসন্ন ঘোষ মহাশয়ের বাড়ীর কোন লোক এক সময়ে আমাদিগকে হত্যা করার ভয় দেখাইয়া পত্র লিখিয়াছিল। আমরা তাহা "সময়" প্রভৃতি পত্রিকায় ছাপাইয়াছিলাম, এবং রায়বাহাদুরের নিকট অবগতির জন্য পত্র প্রেরণ করিয়াছিলাম। তিনি এই মর্ম্মে লিখিয়াছিলেন—"এক শ্রেণীর লোক আত্মীয়তা ভাঙ্গিতে সর্ব্বদা চেষ্টা করে, আপনি কোন ভয় করিবেন না।" স্বাধীনতা তাঁহাকে স্বাবলম্বনের পথে চালিত করিত, তাহাতে কর্ম্মভোগ অপরিহার্য্য হইয়া পড়িত। তিনি স্বখাত সলিলে আপনাকে নিমগ্ন করিয়াছিলেন, নচেৎ দুঃখ দারিদ্র্যের চরমসীমায় তাঁহাকে যাইতে হইত না।

গোবিন্দচন্দ্র ভাওয়ালের লোক, ভাওয়াল এবং ঢাকা পর্য্যন্ত যেন বিদ্যাসুন্দরের সুরঙ্গ ছিল। ঢাকার কাহিনী যত ঢাকা থাকে, ততই ভাল। মগের মুলুক ও বিক্রমপুর লিখিয়া গোবিন্দচন্দ্র ঢাকার কোন কোন লোকের নিকট নিন্দিত হইয়াছিলেন, এবং তৎসহ নব্যভারতের সম্পাদকও সেখানে অপ্রিয়। ঢাকাই কাগজের কীর্ত্তি-কাহিনী বর্ণনা করিতে পারে, এমন লোক এদেশে আছে কি না, জানি না। "গাঁয়ে মানে না আপনি মোড়ল" এবং "নাড়াবুনে কীর্ত্তনে-

* সম্প্রতি বরুণ কলিকাতা আসিয়া আমাদের এখানে আছে।

দের” কাহিনী বিবৃত করার ইহা স্থান নয়। শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী, অমরেন্দ্রনাথ রায়, এবং হেমচন্দ্র চক্রবর্ত্তী তাহা করিতেছেন, করুন। আমরা বেশী কিছু আর লিখিব না। মগের মুলুক ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে "প্রকৃতিতে" প্রকাশিত হয়। ঢাকায় ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে ম্যাজিষ্ট্রেট কোর্টে প্রকৃতির বিরুদ্ধে লাইবেল মকদ্দমা উঠে। এই মকদ্দমা (নং ৪৬—১৮৯৩) উপলক্ষে কোর্টে ৺ঘোষ মহাশয় যে এফিডেভিট করিয়াছিলেন, তাহা পড়িলে লজ্জায় মুখ অবনত হইয়া যায়। ঢাকার কথা চাপা রাখাই ভাল। জয়দেবপুরের রাজ বংশ নির্ব্বংশ হইয়াছে, পাশাপাশি আজ গোবিন্দচন্দ্রের অত্যাচার-কাহিনী ঘরে ঘরে কীর্ত্তিত হইতেছে। শুনিয়াছি, মগের মুলুক পুস্তকখানি কণ্ঠে কণ্ঠে আজও বিচরণ করিতেছে। এরূপ বর্ণনা বিদ্যাসুন্দরের পর এদেশে আর কেহ করিতে পারিয়াছেন কি না, জানি না। মগের মুলুকের লেখক ভারতচন্দ্রের যোগ্য লেখনী ধারণ করিয়াছিলেন। নচেৎ এত অন্তর্জ্বালা উপস্থিত হইত না। তাহার বর্ণনা কত সুন্দর, পাঠকগণ দেখুন—

"বঙ্গদেশে আছে একটী স্বর্ণপুর গ্রাম
গাছ গাছলায় ভরা তাহা নবীন ঘনশ্যাম!
রাঙ্গা মাটী পলাকাটা খাঁটি সোনার মত,
টিলায় টিলায় ভুল হয়ে যায় মৈনাক শত শত।
উত্তরে তার রূপার রেখা ক্ষুদ্র স্রোতস্বতী,
মন্দাকিনীর মত তাহার মন্দ মন্দ গতি!
দেবপুর নিবাসী কত দেবের দেহ ছাই,
আখি বুকে মনের সুখে যখন দেখা যাই।
পূবের ধারে গাঙের পারে শ্যামল তপোবন।
চাঁপা বনে চাতক ডাকে চমকে উঠে মন!
কলসী কাখে আঁচল মুখে বেয়েগুলি আসে,
পাতা ঢাকা ফুলের মত কাঁকর হয়ে হাসে।
কেউ বা পড়ে কেউ বা ধরে উঠে ভিজা পায়
পিছলা ঘাটে আছাড় খেয়ে কলসী
ভেঙ্গে যায়।
পূবের দিকে পদ্মভরা বিলের সীমা নাই,
পিপী ডাকে কোড়া ডাকে কালেম কড গাই!
উত্তরে তার হাজার হাজার বিশাল গজার বন,
বাঘ ভালুকে বেড়ায় সুখে খেলায় হরিণগণ।
গাছে গাছে ময়ূর নাচে পেকম ধরে কত,
পুচ্ছে তার তুচ্ছ করে ইন্দ্রধনু শত।
বার মাসই ফুলের হাসি, হয় না বাসি তার,
ছায়া-ঢাকা স্নেহ-মাখা মায়ের মত প্রায়!
নানান্ ছন্দে নানান গন্ধ শীতল বায়ু বয়,
নন্দনে চন্দন বনে মলয় মনে লয়।
টিলার পাশে ঝরণা বহে, ঢাল গড়ানে ভুঁই,
দুধ খাইতে মায়ের বুকে কাপড় ঠেলে থুই।
ফাগুন মাসে আগুন হাসে সারা কানন ভরা,
ধুঁয়ায় ধুঁয়ায় দিক ছেয়ে যায় আকাশ
আঁধার করা!
চৈত্র মাসে জোর বাতাসে উড়ে তুলা রাশি,
পোড়া বনের পোড়া মনের শুভ্র শ্বেত হাসি।

* * *

পশ্চিমেতে বিশাল দীঘী নীল আরসির মত,
কাল জলে আকাশ ডোবা, মরাল
ভাসে কত।
তীরে তীরে খেজুর গাছের কাঁটাল
গাছের সারি,
মানের বাঁধা খাটুলা শোভে, পূবে
রাজার বাড়ী।
অন্দরেতে ফুলের বাগান বন্দরের প্রায়
গন্ধ মধুর ব্যবসা করে ভ্রমর-বণিক তায়।
কাল জলে ঝরে তাহার কেলি কদম ফুল
বৃন্দাবনের নিন্দা করে কালিন্দীর কূল।
দিবানিশি খেলে জলে লহর শত শত,
ঠিক যেন যে বরুণ রাণীর নীল আঁচলের মত।
রাজার বাড়ীর মেয়ে ছেলে বাঁধা ঘাটে নায়,
সদ্য ফোটা ভাদ্র মাসের পদ্ম বনের প্রায়।
অন্য তীরে গৃহস্থ বউ ঘোমটা মাথায় দিয়ে
ভিজা বাসে বাড়ী যায় কলসী কাখে নিয়ে,
কিবা তাহার রূপের বাহার মরি মরি হায়,
লণ্ঠনের ভিতরে যেন আলোক দেখা যায়।

কোণা ঘাটে সোণা বউ,—কলসী ভাসে জলে
মন ভাসে আরেক ঘাটে নিম গাছের তলে!
বামের দিকে দামের উপর বক রয়েছে খাড়া,
সন্ধ্যা করে বামনঠাকুর কোমর জলে দাঁড়া,
দুজনেই চুপ করিয়ে মিটি মিটি চায়,
দুজনারি ধর্ম্ম সমান কর্ম্ম সমান প্রায়।
পশ্চিমের পারে রাজার মেনেজারের বাসা,
বেল বনে বকুল বনে কলা বনে ঠাসা!
বেড়ার উপর বেড়া তাতে দৃষ্টি নাহি চলে,
আছে একটী গুপ্ত পথ যে গভীর বনের তলে,
সুন্দরের সুড়ঙ্গের মত আরেক মাথা তার,
মেনেজারের মাথা মুণ্ড বলব কিবা আর,—
পশ্চিমের গৃহস্থ বাড়ী লাগিয়াছে গিয়া,
পূবের দিকের পুকুর পারের কাঁটাল তলা দিয়া,
সে বাড়ীর বিধবা নারী সেই বিন্ধ্যাবতী,
মৎস্য মাংসে একাদশী নিত্য করেন সতী!
কোমরে তার চাবির শিকল গলায় সোণার হার,
অঙ্গুরীটী "মনে রেখো" স্মরণ চিহ্ন কাঁর!
মিশি-মাখা বাঁকা দাঁতে হাসে যখন তার,
পাতিলের তলাতে যেন আগুন লেগে যায়!
মেনেজারের চাকর একটী গয়লা ঘোষের পো,
খবরদারি কর্ত্তে গিয়ে নিজেও মারেন ছোঁ!"

আমাদের কোন বিখ্যাত কৃতবিদ্য কবিবন্ধু এক সময়ে বলিয়াছিলেন যে, গোবিন্দচন্দ্রের ন্যায় নির্দ্দোষ কবিতা এদেশে কেহ লিখিতে পারেন নাই। "বরষার বিল" কবিতা পড়িয়া ৺চন্দ্রনাথ বসু মহাশয় বলিয়াছিলেন, "এরূপ সরল স্বভাব-বর্ণনা বাঙ্গালা ভাষায় কুত্রাপি তিনি পাঠ করেন নাই। গোবিন্দচন্দ্রের কবিতা পাঠ করিয়া এক সময়ে চট্টোগ্রামের কমিশনার শ্রীযুক্ত কে, সি, দে মহোদয় বলিয়াছিলেন, "বাঙ্গালা ভাষায় যে এরূপ কবিতা হইতে পারে, এ ধারণা তাঁহার ছিল না।" গোবিন্দচন্দ্র ইংরাজি জানিতেন না, তাঁহার প্রতিভাই তাঁহাকে অদ্বিতীয় কবি-সিংহাসনে বসাইয়া দিয়াছে। তাঁহার স্বভাব-বর্ণনা কত সুন্দর, পাঠকগণ দেখুন—

(ক) "তৃতীয় প্রহর গত, নিখিল ভুবন,
একই শয্যায় শুয়ে ঘুমে অচেতন।
তরুলতা ঘুম যায়, ঘুম যায় ফুল,
পল্লবের কোলে কোলে ঘুমায় মুকুল।
আকাশে হেলান দিয়া ঘুমায় পর্ব্বত,
সম্মুখে সমুদ্র পাতা মহা শয্যাবৎ।
নিরাশার নিস্পেষিত মহা মরুভূমে,
কত বক্ষ অস্থিচূর্ণ আছে ঘোর ঘুমে!
ঘাসে ঘাসে ঘুম যায় কত অশ্রু জল,
সৈকতে শোকের শ্বাস ঘুমেতে বিহ্বল!
দিকবন্ধ শ্যামমাঠ অনিবদ্ধ নীবি,
স্খলিত অঞ্চল অঙ্গে ঘুমায় পৃথিবী!
অনন্ত শান্তির সুধা ভুঞ্জিছে সবাই,
একটী মায়ের চখে শুধু ঘুম নাই।
চিন্তাদাহ জাগরণ তার বুকে নিয়া
ঘুম যায় চিতা চুল্লী নিবিয়া নিবিয়া।"

(খ) "রজত ধুতুরা কর্ণে, বিমল রজত বর্ণে,
রজত বিভূতি মাখা তুষারের প্রায়।
রজত গিরির শিরে, রজত জাহ্নবী নীরে,
রজত শশাঙ্ক শোভা উছলিয়া যায়
উজলি উঠিল চিতা শত চন্দ্রমায়।"

(গ) "ফুটিয়াছে উপবনে নানা জাতি ফুল,
মল্লিকা মালতী জাতি, গোলাপ বান্দুলী পাতি,
গন্ধরাজ কৃষ্ণকেলি টগর পারুল।
নিশিগন্ধা কুন্দ জবা, চম্পক সুবর্ণপ্রভা,
শিরীষ রঙ্গণ রক্ত অশোক বকুল,
শেফালি কেতকী আদি ফুটিয়াছে ফুল।"

(ঘ) "পারে পারে ঘাটে ঘাটে লইবারে জল,
গ্রামের গৃহস্থ বধূ এসেছে সকল!
হারাণো কুমুদ জ্ঞানে, ভাসে শশী এই খানে,
না চিনিয়া মিছা মিছি হাসিছে কেবল!
কলসীতে ঢেউ দিয়া, শশধরে খেদাইয়া,
সরলা গৃহস্থ বধূ ভরিতেছে জল,
ও তরঙ্গ বিকম্পনে, কত যে পুলক মনে,
এক চন্দ্র শত হয়ে হাসিয়ে পাগল,
ভাবিয়া গৃহস্থ বধূ কুমুদ বিমল।"

(ঙ) "একখানি গ্রাম ভাসে জলময় মাঠে
গন্ধ মৃত্তিকার কোটা সাগর-ললাটে।"

(চ) "অস্ত গেছে দশমীর দীপ্ত শশধর
আচ্ছাদিয়া অন্ধকারে আকাশ-গহ্বর,
যেন কার ভবিষ্যের ভীষণ উদরে,
তারকার স্বপ্নগুলি হাবু ডুবু করে।"

(ছ) "আম কলা নারিকেল কাঁটাল গুপারী
চারিদিকে আছে সব সারি সারি সারি।
আরো আছে যথা তথা, কত তরু কত লতা,
স্বর্গের একটী যেন গৃহস্থের বাড়ী।
কোথায় দাড়িম গাছে, শ্যামালতা উঠিয়াছে,
লইয়া ডোগাটী হাতে দাঁড়ায়ে সুন্দরী!
সম্মুখে বাঁশের ঝাড়, বুক ভাঙ্গে হাসি তার,
চাতক চমকি উঠে হাহাকার করি,
দেখে না, শোনে না তারা, বোঝে না
সুন্দরী।"

(জ) বালিকা—
"ওঠেনি এখনো রবি ফোটেনি কিরণ,
সাদা সাদা ছায়াময় জ্যোতি সুকোমল,
হাসিমাখা আধ স্বপ্ন আধ জাগরণ,
উজলি উঠিছে যেন নীল নভতল!

জাগে জাগে হইয়াছে বন উপবন,
পবনে বহিছে ধীরে নব পরিমল,
বালিকার দেহে ছিল ঘুমায়ে যৌবন,
এখনি খুলিবে যেন নয়ন-কমল।

সোণার শৈশব স্বপ্ন করে পলায়ন,
চুপে চুপে লাজ ভয়ে তারকার মত,
বালিকা রূপের উষা করে আগমন,
পশ্চাতে লইয়া যেন স্বর্গ শত শত!

হৃদয়ে সুমেরু-শিশু জাগিতেছে কিবা,
অই বুঝি তোর হয় ত্রিদিবের দিবা।"

এইরূপ যে কত বর্ণনা আছে, তাহা দেখাই-বার স্থান নাই।

গোবিন্দচন্দ্র স্বভাব-কবি, প্রকৃতির বর্ণনা করিতে করিতে তিনি রুচি এবং কুরুচি ভুলিয়া যাইতেন। যাঁহারা তাঁহার কবিতা পড়েন নাই, তাঁহারা তাঁহার নামেই চটিয়া যান। তিনি রুচিবাগীশদিগের জন্য কবিতা লেখেন নাই। পৃথিবীর কোন্ কবিই বা তাহা করিয়াছেন? সব কবিই প্রকৃতির বর্ণনার সময় উলঙ্গ ছবিই অঙ্কিত করিয়াছেন। এদেশের বৈষ্ণবকবি বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস হইতে আরম্ভ করিয়া সকল কবির লেখাই কুরুচি-দুষ্ট। চিত্রকরেরা উলঙ্গ ছবিই অঙ্কিত করেন, তাহা দেখিতে যাঁহারা অনিচ্ছুক, চক্ষু মুদ্রিত করাই তাঁহাদের পক্ষে ভাল। যাঁহারা প্রকৃতির বর্ণনা পাঠের সময় কুরুচি কুরুচি করেন, তাঁহারা উপন্যাস, নাটক এবং কাব্য-গ্রন্থ না পড়িলেই ভাল হয়। দোষ শুধু গোবিন্দদাসের নয়, অধিকাংশ কবিই এই দোষে দুষ্ট।

গোবিন্দদাস কুরুচির প্রশ্রয় দিয়া থাকিলেও আমরা শত কণ্ঠে বলিব, তাঁহার ন্যায় চরিত্রবান ব্যক্তি আমরা অতি অল্পই দেখিয়াছি। জাত্যংশে তিনি হীন হইতে পারেন, জ্ঞান বিজ্ঞানে তিনি অনভিজ্ঞ হইতে পারেন, সভ্যতা ভব্যতায় তিনি অপটু হইতে পারেন, কিন্তু তিনি স্বাধীনচেতা, স্বদেশ-প্রেমিক, সর্ব্বোপরি তিনি চরিত্রবান। তদীয় প্রতিভার আশ্রয়-ভূমি ছিল চরিত্র—চরিত্র-বলেই তিনি দারিদ্র্যকে জয় করিয়াছিলেন, —ধনীর ভ্রূকুটি এবং উপেক্ষা, রাজার অত্যাচার এবং নির্য্যাতন, সব তিনি চরিত্র-বলে সহ্য করিতেন। বর্ত্তমান সময়ে তাঁহার ন্যায় অত্যাচারিত কোন লেখক বা কবি এদেশে আছেন কি না, আমরা জানি না। যাঁহাদের হাতে তিনি অত্যা-চারিত হইয়াছিলেন, তাঁহারা এদেশের পূজ্য, কিন্তু নির্য্যাত গোবিন্দচন্দ্র উপেক্ষিত, এ দুঃখ রাখিবার ঠাঁই নাই। হায় রে ঢাকা নগরী! কি মর্ম্মভেদী দুঃখে কবি "আমার বাড়ী", "কে আছে আমার" ও "ভাওয়াল" কবিতা লিখিয়াছিলেন। এমন লোক নাই, পড়িতে বসিলে যাঁহার অশ্রু পতন না হয়।

"গোবিন্দদাস উপেক্ষিত—বলিয়াছি; কিন্তু উপেক্ষিত শুধু ঢাকায়। অন্যত্র তাঁহার আদর, ব্রাহ্মসমাজ বাদে, সর্ব্বত্র। ৺বিপিন-বিহারী কুরুচির জন্য গোবিন্দ দাসকে চাকরী দেন নাই, সেজন্য "আমারি যে দোষ" কবিতা লেখেন, সেজন্য ব্রাহ্মসমাজের লোকেরা গোবিন্দদাসের প্রতি বিরক্ত হন। আর ব্রাহ্মসমাজের লোকেরা বিরক্ত নন্ কাহার প্রতি? যাঁহারা তাহাদের গণ্ডি-ভুক্ত নন, তাঁহাদের সকলের প্রতিই তাঁহারা বিরক্ত। গণ্ডিমুক্ত ৮।১০ জন বিশিষ্ট ব্রাহ্ম বাদ দিলে, অর্থাৎ যাঁহারা সমাজে যান না বা সমাজের ধার ধারেন না, তাঁহাদিগকে বাদ দিলে ত্রিভঙ্গী ব্রাহ্মসমাজের বিশিষ্টতা থাকে না, মনে হয় তাহা যেন "প্রবৃত্তির" হাট। গোবিন্দ-চন্দ্র গণ্ডিমুক্ত ব্রাহ্মের বাড়ীতে স্থান পাইতেন, এজন্যও আমাদিগকে কত গঞ্জনা সহ্য করিতে হইয়াছে।—এই সব জানিয়াই বুঝি গোবিন্দ-চন্দ্র চন্দনের উৎসর্গে আমাদিগকে লক্ষ্য করিয়া লিখিয়াছিলেন—

"তুমি হে শিবের মত কালকূটকণ্ঠগত,
নির্ভীক নির্ম্মুক্ত-চিত্ত মহা মৃত্যুঞ্জয়,
নিঃসহায়, নির্ব্বাসিত, উৎপীড়িত, উপেক্ষিত,
সকলে উদার বক্ষে দিতেছ আশ্রয়।"

তিনি বড় কঠোর-ভাষী, কঠোর সত্য-পিপাসু ছিলেন, লোকের দোষ দেখিলে উপেক্ষা করিতে পারিতেন না। তাই ঢাকা ও ব্রাহ্ম-সমাজে তাঁহার এত শত্রু! কিন্তু ঢাকা ও ব্রাহ্মসমাজ বাদে, তাঁহার আদর সর্ব্বত্র। যে ব্যক্তি তাঁহার কবিতা একবার পড়িয়াছেন, তিনিই তাঁহার অনুরক্ত হইয়াছেন। এমন ভাবাজ্ঞান কাহার? এমন মর্ম্মবাণী কোথায় মিলে? বোধ হয়, গোবিন্দদাসের কবিতা-গ্রন্থের ন্যায় অন্য কাহারও কবিতা গ্রন্থ বিক্রীত হয় না। তাঁহাকে লোকে ভাল-বাসে না, এ কথা ঠিক নয়। মৈমনসিংহ তাঁহার নামে অশ্রু ফেলিতেছে, বঙ্গদেশের অগণ্য নরনারী আজ গোবিন্দ দাসের জন্য নীরবে অশ্রু ফেলিতেছে। জগৎকিশোরের ন্যায় কত কত মহাজন তাঁহার নামে পুষ্প অর্পণ করেন! বোধ হয়, এ যুগে এরূপ ভালবাসা এবং সহানুভূতি আর কোন কবিই আকর্ষণ করিতে পারেন নাই।

আজ কাহার সহিত তাঁহার তুলনা করিব? তুলনার সময় আজও আইসে নাই। তবু বলি, গীতি-কবিতার সম্রাট বিহারীলাল বা অক্ষয়কুমার, দীনেশচরণ বা নিত্যকৃষ্ণ, বিজয়চন্দ্র বা চিত্তরঞ্জন, রবীন্দ্রনাথ বা দ্বিজেন্দ্রলাল, কাহারও সহিত তাঁহার তুলনা হয় না। কেন না, তাঁহারা সকলেই ইংরাজি সাহিত্যে গৌরবান্বিত, তাঁহারা উঠিতে বসিতে, শুইতে খাইতে কেবল ইংরাজির আদর্শ-স্বপ্নে উদ্বুদ্ধ। সুতরাং গোবিন্দদাসের তুলনা কেবল গোবিন্দদাসই। যদি তুলনা সম্ভব হয়, তবে চণ্ডীদাস, জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস বা বিদ্যা-পতি পাঠ করিবার সময়ে পাঠক এই গোবিন্দদাসকে স্মরণ করিও। আমাদের মনে হয়, সে কালের গোবিন্দদাস যেন এই গোবিন্দদাসে পুনরুত্থিত। প্রতি পংক্তিতে অলঙ্কার, প্রতি শব্দে রস, প্রতি ঝঙ্কারে প্রাণ, প্রতি কথায় ভাব, প্রতি বিবৃতিতে মাধুর্য্য, এবং তাহাতে মাখামাখি সরলতা ও প্রাঞ্জ-লতা। এরূপ লেখা এদেশের আধুনিক অন্য সাহিত্যেই প্রস্ফুট হইয়াছে। তাঁহার পশ্চাতে কোনও ঢাক ঢোল বাজে নাই, বুঝি বা তাই তিনি উপেক্ষিত, নচেৎ অনেক নোবেল-প্রাইজ-ওয়ালায় তিনি শিরোভূষণ। খোলা প্রাণের উন্মুক্ত গাথা—চাপাচাপি নাই, ঢাকা-

ঢাকি নাই, কুহেলিকা নাই, জটিলতা নাই, দুর্ব্বোধ্যতা নাই, কুজ্ঝটিকা নাই—পাদপূরণে কষ্ট নাই, কষ্টকল্পনা কোথাও নাই— যেন অবাধ ফোয়ারা ছুটিয়াছে, যেন বিদ্যুৎ চমকিয়া যাইতেছে, যেন অগ্নিস্ফুলিঙ্গ খেলিতেছে। এরূপ সরল লেখা বর্ত্তমান কালে এদেশে আর কাহারও কাব্যে পাওয়া যায় নাই। গোবিন্দদাস এদেশে অক্ষয় এবং অমর। তুমি বিরুদ্ধবাদী, কত কি কথা বলিয়া আসর জমকাইতেছ? অনুরোধ করি, একবার ১২৯০ হইতে ১৩২৫ সালের নব্য-ভারতগুলি, একবার বাণার সংখ্যাগুলি, একবার ভারতমিহির, প্রতিভা, সৌরভ এবং নারায়ণ কখানি এবং তাঁহার প্রকাশিত পুস্তক ছয় খানি এবং মগের মুলুক এবং তাঁহার অপ্রকাশিত গীতা ও অনান্য ৩খানি পুস্তক পাঠ করিও, তারপর যাহা বলিতে চাও, তাহা বলিও। আমরা আজ নির্ভয়ে বলিতেছি, গোবিন্দচন্দ্র এদেশে অমরত্ব লাভ করিয়াছেন।

আমরা গোবিন্দদাসের ভক্ত, কিন্তু অন্ধ-ভক্ত নহি। তাঁহার সকল কার্য্যের অনুমোদন কখনও করি নাই, এবং কখনও করিব না। তাঁহার সকল কবিতাই নিখুঁত, এমন কথা আমরা বলি না। আর্ট হিসাবে তাঁহার কোন দোষ হয় নাই, তাহাও বলি না। তাঁহার "দীপান্বিতা" প্রভৃতি কবিতা লিখিত না হইলেই ভাল হইত। নরদেহে দেব-মানবের অধিষ্ঠানে দোষ ত্রুটী থাকা অপরিহার্য্য। গোবিন্দদাস মানুষ ছিলেন, তাঁহার দোষ ত্রুটীও ছিল; কিন্তু প্রতিভায় তিনি অপ্রতি-দ্বন্দ্বী, চরিত্রে তিনি অনিন্দিত, ধর্ম্মে তিনি অটল বিশ্বাসী, তিনি নরদেহে দেবতার ন্যায় ছিলেন। ঢাকা এবং ভাওয়ালের শত কীর্ত্তি এবং উপেক্ষা বিলুপ্ত হইবে, কিন্তু গোবিন্দ দাসের কীর্ত্তি কখনও বিলুপ্ত হইবে না। গোবিন্দদাস এদেশে অমরত্ব লাভ করিয়াছেন।

পূজা শেষ।

অকস্মাৎ শুন্‌লাম যখন
গোবিন্দদাস নাই,
বুকটা যেন থর্‌থর করে'
কেঁপে উঠল ভাই।
ভাদ্র মাসের শেষেও পে'লেম
পত্র এক খান তাঁর,
ক্ষেত খানি যায় নীলাম হ'য়ে,
স্কন্ধে ঋণ-ভার!
'ভগবানই দিবেন শান্তি'
লেখলাম তার উত্তরে,
জান্‌তাম ত না ল'বেন পিতা
এত যে সত্বরে!
কিশোর বয়সে সেধে'ছিলেম
তাঁরি' সুরে সুর,
তাতেই আজি তাঁহার কারণ
দুঃখ এত দূর!
'নব্যভারত' খুলেই দেখতেম
সূচী পত্র খানি,
আছে কি না আছে, তা'তে
দুটি মর্ম্মবাণী।
যাও কবি, যাও জুড়াও জ্বালা
ছেড়ে' ধূলো বালি,
আমরা এখন বসে' বসে'
নয়নের জল ঢালি।
জগতে অসহায় ভাবে
স'য়েছ খুব ক্লেশ,
'অসুর-পূজা' লিখেই তোমার
মায়ের পূজা শেষ।

শ্রীমহেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, কবিভূষণ।

'সুকবি গোবিন্দদাস।

ওরে মোর শ্রাবণের সজল নয়ন!
রুদ্ধ কর ক্ষণকাল অশ্রু বরিষণ,
মুছে দাও কপোলের সন্তসিক্ত ধারা;
শোকাকুলা মূরছিতা পাগলিনী-পারা
বিবশা দেখ'ন ওগো! চল ধীরে ধীরে,
দেখাও সবারে ধনি, বুকখানি চিরে,
কত আশা, ভালবাসা, কত কৃতজ্ঞতা,
কত স্বপনের ছবি রহিয়াছে তথা।
ওগো ওগো ভূলুণ্ঠিতা কল্পনা-কামিনী!
হাহাকারে কেঁদোনা গো দিবস যামিনী;
ধৈরয ধরহ চিতে সম্বর ক্রন্দন,
আলু থালু কেশ পাশ কর গো বন্ধন।
শক্তিতে বাঁধিয়া বুক এস মোর সাথে,
হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা চল ল'য়ে মাথে,
দিই গে গোবিন্দদাসে মরমের দান,
বাঙ্গালী গুণজ্ঞ মোরা নহিত পাষাণ!
নহিত কৃতঘ্ন মোরা, নহিত কুখ্যাত,
এ রীতি যে বাঙ্গালীর কুল ক্রমাগত!
রহিয়াছে; সহিয়াছে মজ্জায় মজ্জায়,
জীবিতে দগ্ধা'তে এরা মরে না লজ্জায়।
দগ্ধাইয়া মারি কাঁদে মৃতের কারণ,
পুজিতে লাগিয়া শেষে ধরয়ে চরণ।

বাঙ্গালার সারস্বত মঞ্জু-কুঞ্জবনে,
এসেছিল, গেয়ে'ছল গান কত জনে
সুছন্দ মৃদঙ্গ তালে, বীণার ঝঙ্কারে,
শিঙ্গার জলদ মন্দ্রে ভৈরব হুঙ্কারে।
এনেছিল মধু-শিল্পী মধু মধুকর,
রচিবারে মধুচক্র অমৃত নিঝর;
পিয়াইতে গৌড়জনে, চেতাইতে সুপ্তে,
মাতাইতে, জাগাইতে, ফিরাইতে লুপ্তে।
পথ ভুলে গিয়েছিল, এসেছিল ফিরে,
এনেছিল কত রত্ন আহরিয়া শিরে।
ডেকেছিল কেঁদে কেঁদে দ্বারে কত হায়!
"দ্বার খুলে ঘরে তুলে লহ গো আমায়!"

কেহ না সুধানু তারে, না হেরিনু তায়,
উপেক্ষার শেলাঘাতে দ্রব-অশ্রুধার।
আরো দ্বারে এঁটে দিনু অর্গল বন্ধন,
ফিরে গেল বাগেশীর অমর-নন্দন।
অভিমানে, কুড়াইয়া শত তিরস্কার,
স্বদেশীর ঢেলে দেওয়া যোগ্য পুরস্কার।
দাতব্য-চিকিৎসাগারে অন্তিম-শয়নে,
যেচেছিল ক্ষমা কত কাতর নয়নে।
তবুত গলিনি মোরা, খুলিনি অর্গল,
দিই নাই মুখে ক্ষুদ্র জাহ্নবীর জল!
তা' বলে কি অকৃতজ্ঞ আমরা সকলে?
বাঙ্গালী নিগুর্ণ-বেত্তা এ কথা কে বলে?
বরষে বরষে তাঁর মৃত্যু তিথি দিনে,
করিতেছি প্রেতপূজা আনন্দিত মনে।
গাহিতেছি—"ধন্য ধন্য! কবিকুল-চন্দ্র,
ধন্য মোরা তোমা পেয়ে স্বভাব-কবীন্দ্র।"
লিখিয়াছি নাম তাঁর কনক রেখায়,
বাঙ্গালার গৌরবের দাবির খাতায়।

অতীত, অতীত কথা, যুগ বর্ত্তমানে,
যে রবির স্বতঃপ্রভা ছুটি মর্ত্ত্য-পানে।
আলোকিল দেশ দেশ, বিশ্ব সমুদয়,
মুক্ত স্বরে গায় বিশ্ব যাঁর জয় জয়!
তবু বলি,—ও-যে চন্দ্র! নহে খাঁটি রবি,
ওঁর যত তেজ-প্রভা ধার করা সবি।
যে আলোকে বিশ্ব হাসে, হাসে চরাচরে,
হায়! তা' সহে না চোকে, লুকাই
কোঠরে।

তা' বলে হবে কি বঙ্গ, নিমকহারাম,
লিখিবারে এ রবির বিশ্বজয়ী নাম।
বাঙ্গালার গৌরবের দাবির খাতায়,
কনক-কিরণে ঢাকা প্রথম পাতায়।
বাঙ্গালার মর্ম্ম-কবি গোবিন্দের তরে,
কেন না কাঁদিব তবে আহা! উহু! ক'রে!
কেন না করিব তাঁর প্রেতের সম্মান,
যদিও জীবিত কালে দগ্ধায়েছি প্রাণ।

কত রূপে করিয়াছি কত নির্য্যাতন,
হাসি মুখে দিছি তাঁরে চির নির্ব্বাসন!
আজনম সহি নানা স্বদেশীর শ্লেষ,
যাতনে জলিয়া আজ জীবনের শেষ!
স্বভাবের সুভাবের মধুকণ্ঠ পিক,
গাহিছিল মর্ম্মগীতি সরল নির্ভীক।
অতর্কিতে হানি বুকে ব্যঙ্গ-বিষ-বাণ,
নিবাইয়া দিছি তার সুধা-কল-তান!!
হাতে পেয়ে ফেলিয়াছি মৃগমদগন্ধ,
"কস্তুরী" ফেলিয়া দিছি, নাসা করি বন্ধ!
"কুঙ্কুম" "চন্দন" আর নানা গন্ধ "ফুলে",
হৃদয়ের "প্রেম" দিয়া আপনারে ভুলে।
পূজারত যে সাধক একাগ্র মননে,
ভাঙ্গিয়াছি ঘট তার, ভাঙ্গিয়াছি ধ্যানে।

অকস্মাৎ গোবিন্দের লীলা অবসানে,
কাঁদিব না একটুকু? মস্তক পাষাণে
ভাঙ্গিব না? কবে সবে—"বাঙ্গালী বর্ব্বর,
গুণীর চিনে না গুণ জানে না কদর।"
হে বরেণ্য বঙ্গ-কবি! হে গোবিন্দদাস!
কেন না ছাড়িলে বল এ বঙ্গের বাস।
জীবনে সয়েছ দুঃখ দৈন্যের পীড়ন,
পড়েনিকো ভালে কভু সুখের কিরণ।
অভাবের তীব্র বিষে দগ্ধ জরজর,
হইয়াছ, পাইয়াছ ঘৃণা থরথর।
যুঝিয়া ব্যাধির সহ জন্মব্যাপী রণে,
পরাজিত, হত বীর হ'লে এত দিনে।
চিরজীবী হ'য়ে দুঃখ নিয়ত সহিবে,
হৃদয়ের তুষানলে সতত দহিবে!
তা নয় মরণ তব!—যুক্তিযুক্ত নয়;
অনুচিত! অকার্য্য এ! না আছে সংশয়!
যা' হবার হ'য়েছে, মনে কিছু করোনা,
আমরা যা' ক'রেছি দোষ ব'লে ধরোনা।

চিন্তা নাই! আর দুঃখ রবে না, রবে না,
অর্থাভাবে মনো-ক্লেশ সবে না সবে না।
খুলিব ভাণ্ডার আজি যোগাইব অর্থ,
ঘুচাব অভাব তব, কথা নহে ব্যর্থ।
মর্ম্মরে গঠিত তব মূরতি সুঠাম,
পরশ অক্ষরে তাহে লিখিব সুনাম।
আত নিজজন তুমি নহত অপর,
স্বদেশে স্বদেশী পাশে কেন রবে পর?
হে চির কাঙ্গাল কবি, হে চির কাঙ্গাল।
রচিলে হে চির-স্থির কীর্ত্তির জাঙ্গাল!
যত দিন সূর্য্য রবে আকাশের গায়,
তত দিন নাম তব গাবে বসুধায়।
যত দিন ভাষা রবে, আশা রবে বঙ্গে,
বঙ্গবাসী গাবে জয়, গৌরবের সঙ্গে।
ভাষা-মাঝে ভাব তুমি, ছন্দের নর্ত্তন,
কবিত্ব-দেউল-ভিত্তি, ললিত পত্তন।
আছ তুমি স্বরগের ওই কবি-কুঞ্জে,
যেথা বাজে বীণা বাঁশী অলিদল গুঞ্জে।
বাজাও বাজাও বীণা ঢাল সুধাধার,
ভয় নাই সেথা কেহ ছিঁড়িবে না তার।
নাহি সেথা ভা(ও)য়ানের দুরন্ত ভল্লুক,
নাহি সেথা সমাজের বন্ধন উল্লুক।
নাহি সেথা দানবের দৃপ্ত অভিমান,
মানবের দাম্ভিকতা ধরা সরাজ্ঞান।
স্নেহের নাহিকো সেথা মোহকর ফাঁস,
দেহের গেহের যত ভাবনা নিরাশ।
মনানন্দে রহি সেই ভূমানন্দ পুরে,
বাজাও বীণাটী তব চিত্ত-চোরা সুরে।
চেয়ে দেখ সেথা হ'তে পাপ ধরা 'পরে,
লিখিয়াছি নাম তব অমর অক্ষরে।
বাঙ্গালার গৌরবের দাবির খাতায়,—
"শুকাব গোবিন্দ দাস, কবিত্ব কথায়।"

শ্রীকৈলাসচন্দ্র মোহরার।

স্মৃতিপূজার কথা।

এই আশ্বিনের মালঞ্চে শ্রীযুক্ত অশ্বিনী-কুমার সেন, কবি ৺কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদারের স্মৃতিপূজার বন্দোবস্ত করিয়াছেন। পূর্ব্ববঙ্গ ছাড়া—বঙ্গের অন্যান্য অংশে স্মৃতিপূজা চলিতেছে। কৃত্তিবাস, রামপ্রসাদ, কাশীরাম, জয়দেব, মধুসূদন, কৃষ্ণচন্দ্র প্রভৃতির স্মৃতিপূজা হইতেছে। আমাদের পূর্ব্ববঙ্গে তাহা হয় না। কারণ পূর্ব্ববঙ্গে খাঁটী সাহিত্যসেবী প্রায় নাই বলিলেই চলে। পূর্ব্ববঙ্গে যাঁহারা সাহিত্যিক বা সাহিত্যসেবী,—তাঁহারা কেবল নামের

কাঙ্গাল। প্রত্যেকেরই মনে মনে পুরাদস্তুর অহঙ্কার আছে—"ও লোকটা বোকা;—আমি বুদ্ধিমান্; ও সাহিত্য চুরি করে,—আমার সাহিত্য নির্জ্জলা সাঁচ্চা।" সুতরাং পূর্ব্ববঙ্গে খাঁটী সাহিত্যিক জন্মায় না। নহিলে দীনেশ-চরণ বসু, আনন্দচন্দ্র মিত্র, রজনীকান্ত গুপ্ত, নবীনচন্দ্র সেন, কালীপ্রসন্ন ঘোষ, হরিশ্চন্দ্র মিত্র প্রভৃতির নাম পূর্ব্ববঙ্গ ভুলিয়াছে কেন? নূতন সাহিত্যিক বলিয়া পূর্ব্ববঙ্গে যাঁহারা পসার জমাইতেছেন, তাঁহাদের মধ্যে কয়জন— দীনেশচরণ বা আনন্দ মিত্রের নাম জানেন? ঢাকার কোন্ লাইব্রেরীতে ঐ দুই জনের বই আছে? শুধু এই কারণেই পূর্ব্ববঙ্গে খাঁটী সাহিত্যিক নাই—এ কথা বলিতেছি না। আমরা বারান্তরে ও সময়ান্তরে পূর্ব্ব-বঙ্গ-সাহিত্যের সমালোচনা তীব্র ভাবে করিব মুসলমান ছাড়া—কয়জন হিন্দু কায়কোবাদের নাম জানেন? কয়জন হিন্দু তাঁহার বই পড়েন? না পড়িয়া সাহিত্যিক হওয়ার রুচি পূর্ব্ববঙ্গে সম্প্রতি বাণ ডাকিয়া উঠিতেছে। কেহ কবি, কেহ ঔপন্যাসিক, কেহ ঐতি-হাসিক, কেহ সম্পাদক, কেহ সবজান্তা!

আজ একটা ভাবী স্মৃতিপূজার আলোচনা করিবার সুযোগ পাইয়াছি। আমি ইতি-মধ্যে ঢাকায় গিয়াছিলাম। পূর্ব্ববঙ্গের গৌরব, স্বভাবকবি শ্রীযুক্ত গোবিন্দচন্দ্র দাস মহাশয়ের নামটী মাত্র জানা ছিল—তাঁহাকে দেখি নাই। এবার তাঁহাকে দেখিয়া আসিয়াছি। আর ইহা বুঝিয়াছি—শীঘ্রই অনাহারে অর্দ্ধাহারে গোবিন্দচন্দ্রের জীবনের দিন ফুরাইয়া যাইবে! তখন একটা স্মৃতি-পূজা কেন না হইবে? কবি গোবিন্দচন্দ্র একবার লিখিয়াছিলেন—

"ও ভাই বঙ্গবাসী
আমি মলে তোমরা আমার চিতায় দিবে মঠ!"

কবিও নিশ্চিন্ত চিত্তে স্মৃতি-তর্পণের অঞ্জ-লির ভরসায় হাঁ করিয়া থাকুন। আমরা তাঁহার এ কামনা হয়ত পূর্ণ করিতে পারিব। সম্প্রতি গোবিন্দচন্দ্রের বর্ত্তমান অবস্থার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়া অদ্যকার বক্তব্য শেষ করিব।

ঢাকায়ই গোবিন্দবাবু অনেক সময় থাকেন। সহরের পূর্ব্বপ্রান্তে সা সাহেব লেনে এক পরিচিত ভদ্রলোকের পরিত্যক্ত বাড়ীতে গোবিন্দ বাবুর শয়ন-স্থান। আহার করা হয়—সহরের মধ্যভাগে (প্রায় মাইল দূরে) পাটুয়াটুলীর এক হোটেলে। এখন বুঝুন, আমাদের কবির সম্মান কত? হোটেলে মাসিক ৭৲ টাকা দক্ষিণা দেবার কথা। বাসায় সাত পয়সার যোগাড় নাই—সে ৭৲ টাকা দিবে কোথা হইতে? কবি নিজ মুখে বলি-য়াছেন—আমার পথ্য তিন বেলাই জলচিড়া!! কবি পাটুয়াটুলীর এক দোকানে বসিয়া জল নুন দিয়া চিড়া ভক্ষণ করেন,—আর দিন কাটান। ছেঁড়া কাপড়, ছেঁড়া জামা, ছেঁড়া ছাতা—জুতাহীন পায়ে সহর ভ্রমণ— এই ত তাঁহার কাজ! এই আমাদের পূর্ব্ব-বঙ্গের কবির মর্য্যাদা শেষ! এ-ই পূর্ব্ববঙ্গে খাঁটি সাহিত্য সেবার পরিণাম! পূর্ব্ববঙ্গের খাস প্রধান নগর ঢাকায় যাঁহারা বেজায় বড় সাহিত্যিক, তাঁহাদের নাম উল্লেখ করিলে বড় অপ্রীয় হয় না। তবে মোটামুটি বলা চলে, এইখানে সাহিত্য-পরিষৎ ও সাহিত্য সমাজ নামে দুইটী প্রবল পরাক্রান্ত দলাদলির ভুঁই আছে। ঐ দুই দলের কেহ কি গোবিন্দ দাসকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করেন? কেহ কি নিজের আপ্‌ কাওয়াস্তে পদগৌরব ভুলিয়া গোবিন্দ দাসকে সম্মান করেন? সকলেই নিজের ঘরে বড়—তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু ক্ষুদ্র হইলে ত গোবিন্দদাস তাঁহাদের মাথার মণি। অস্বীকার করুন, আপত্তি নাই। কিন্তু কালকণ্ঠে তাহার সত্যতা অবিরল ধ্বনিত হইবে।

শুনিতেছি—সাহিত্য-সম্মিলনের উদ্বৃত্ত টাকা গোবিন্দবাবুকে দেওয়ার প্রস্তাব হই-য়াছে। ঢাকায় এই কাজ সহজেই হইবে— এরূপ বিশ্বাস হয় না। কবির অদৃষ্ট যে এমন সুপ্রসন্ন, তাহা ত মনে হয় না। দেখি, কত দূর দাঁড়ায়।

বারান্তরে ঢাকার সাহিত্যিকগণের একটা কোষ্ঠি বিচার করিবার আকাঙ্ক্ষা রহিল।

শ্রীঅক্ষয়কুমার মৌলিক, বিদ্যাভূষণ।

সঙ্কলিকা।

(৪৯)

কলিকাতার সুবিখ্যাত কবিরাজ শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদচন্দ্র সেন মহাশয়, বিগত ৮ই অগ্রহায়ণ রবিবার, রাত্রে দেহরক্ষা করিয়াছেন। ৺দ্বারকানাথ সেন কবিরাজ মহাশয় বহরম পুরের গঙ্গাধর কবিরাজ মহাশয়ের ছাত্র, তাঁহার ছাত্র ক্ষীরোদচন্দ্র সেন। ক্ষীরোদচন্দ্রকে দ্বারকানাথ পুত্র-নির্ব্বিশেষ পালন করিয়াছিলেন। কবিরাজ ক্ষীরোদচন্দ্র ফরিদপুরের অধীন পিঞ্জরী গ্রামে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। বাল্যে পিতা মাতার বিয়োগের পর দারুণ কষ্টে পড়িয়াছিলেন। দ্বারকানাথের কৃপায় তাঁহার আশ্রয়ে থাকিয়া ক্ষীরোদচন্দ্র আয়ুর্ব্বেদে সুশিক্ষিত হন। বিধাতার অযাচিত কৃপায়, কলিকাতার চিকিৎসকমণ্ডলীর মধ্যে আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে প্রাধান্য লাভ করিয়া গৌরব ঘোষণা করেন। গঙ্গাধর, দ্বারকানাথ এবং ক্ষীরোদচন্দ্র, তিন জনই মহা গৌরবান্বিত ব্যক্তি ছিলেন। চরিত্রগুণে তিন জনই সকলের পূজ্য। ক্ষীরোদচন্দ্র মহা ধার্ম্মিক ব্যক্তি ছিলেন। তিনি সুপ্রসিদ্ধ যোগী কাঠিয়া বাবার শিষ্য ছিলেন। ক্ষীরোদচন্দ্র দুর্গাপূজায় ছাগ-বলি-প্রথা রহিত করিয়াছিলেন। পরোপকার তাঁহার জীবনের ব্রত ছিল। এরূপ নিষ্ঠাবান ব্যক্তি বৈদ্য সমাজের গৌরব বিশেষ। তিনি বহুদিন হৃদ্‌রোগে কষ্ট পাইতেছিলেন, শেষে ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগে দেহত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার অকাল মৃত্যুতে বঙ্গের একজন বিশিষ্ট ব্যক্তির তিরোধান হইয়াছে। তাঁহার উপযুক্ত পুত্র শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র সেন বি-এ, বিদ্যানিধি পিতার নিকট আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র শিক্ষা করিয়া পিতার কীর্ত্তি বজায় রাখিতে সচেষ্ট আছেন। বিধাতা শোকদগ্ধ পরিবারে শান্তি বর্ষণ করুন। আমাদের বিশ্বাস, রমেশচন্দ্র অচিরকাল মধ্যে কলিকাতায় গণ্য মান্য চিকিৎসক হইবেন।

(৫০)

আমরা যখন নবদ্বীপে গমন করিয়াছিলাম, তখন শ্রীযুক্ত রাজকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে সাধুসন্দর্শনে যাওয়ার ইচ্ছা জানাইলে, তিনি শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের নিকট লইয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার অমায়িক ব্যবহারে যারপর নাই তৃপ্তিলাভ করিয়াছিলাম। তিনি নবদ্বীপে "ভেট" গ্রহণ সম্বন্ধে তীব্র ভাবে প্রতিবাদ করিয়া বলিয়াছিলেন, "এইরূপেই ধর্ম্ম ব্যবসাদারীতে পরিণত হইতেছে। কত লোক যে পয়সার অভাবে মন্দিরে প্রবেশ করিতে পারে না, তাহার সংখ্যা হয় না।" এই মহানুভব ব্যক্তি ১০ই অগ্রহায়ণ ৬৭ বৎসর বয়সে দেহরক্ষা করিয়াছেন। তাঁহার গৌরবে বঙ্গদেশ কৃতার্থ হইয়াছে। তিনি নবদ্বীপ হিন্দু স্কুলের প্রধান শিক্ষক, Manual of Translation প্রভৃতির অন্যতম গ্রন্থকর্ত্তা, প্রসিদ্ধ সাহিত্যসেবী ছিলেন। পীড়িত হইয়া ৺কালীপূজার পরে চিকিৎসার্থ তাঁহার কলিকাতাস্থ ভবনে আনীত হন। কলিকাতাতেই পবিত্র ভাগীরথীতীরে তাঁহার পূতদেহের অবসান ঘটিয়াছে। তিনি বহুকাল নবদ্বীপ হিন্দু স্কুলের প্রধান শিক্ষকের কার্য্য করিয়া যশস্বী হইয়াছিলেন। বঙ্গের অভিজ্ঞ আদর্শ শিক্ষকমণ্ডলীর মধ্যে তিনি অন্যতম ছিলেন। বঙ্গের আধুনিক কৃতবিদ্য যুবকমণ্ডলীর মধ্যে তাঁহার Manual of Translation, Junior Translation পাঠ করে

নাই, এরূপ যুবকের সংখ্যা বিরল। তিনি ভবানীপুর সাউথ সুবারবণ স্কুলের প্রসিদ্ধ হেডমাষ্টার স্বর্গীয় বেণীমাধব গাঙ্গুলী এম-এ, মহাশয়ের সহিত একযোগে এই সকল পুস্তক রচনা করেন। নানা কার্য্যে ব্যস্ত থাকিয়াও তিনি কখনও সাহিত্যসেবায় বিরত ছিলেন না। তাঁহার "ছাত্রশিক্ষা" "বালিকারঞ্জন", "গীতাভ্যাস" প্রভৃতি পাঠ্যপুস্তকগুলি সাহিত্য-সংসারে সুপরিচিত। তাঁহার উপাসক ও আনন্দগীত বঙ্গসাহিত্যে অপূর্ব্ব সৃষ্টি ও সাহিত্য-ভাণ্ডারের রত্ন। সুধীজন সমাজে এই গীতিকাব্য দুইখানি বিশেষরূপে প্রশংসিত। কর্ম্মক্ষেত্র হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াও বঙ্গভাষার উন্নতিকল্পে তিনি ইংরাজি ভাষায় ট্রান্‌ক্‌ সাহেবের কৃত The Study of words এর অনুকরণে, বাঙ্গালা ভাষায় বাঙ্গালা শব্দাবলী সম্বন্ধে "শব্দশিক্ষা" নামে একখানি পুস্তক প্রকাশ করেন।

(৫১)

আমরা শোকসন্তপ্তচিত্তে প্রকাশ করিতেছি, বাঙ্গালী বীর শ্যামাকান্ত বা সোঽহং স্বামী গত ২৯শে অগ্রহায়ণ নিশীথ কালে তাঁহার হিমাচলস্থ যোগাশ্রমে দেহত্যাগ করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৬২ বৎসর হইয়াছিল। ৪০ বৎসর বয়ঃক্রম কালে ইনি পার্থিব সুখ সম্পদ পরিহার পূর্ব্বক সন্ন্যাস ধর্ম্ম গ্রহণ করেন, এবং অল্পকাল মধ্যেই প্র ঢ় সাধক বলিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার রচিত সোঽহং গীতা, সোঽহং সংহিতা প্রভৃতি পুস্তক নিচয় তাঁহাকে সাধক-সমাজে অমর করিয়া রাখিবে। তিনি জীবনের প্রথম ভাগে দৈহিক উন্নতি সাধন করিয়া বাঙ্গালার চিরকলঙ্ক "ভীরু" আখ্যা দূর করিবার অভিপ্রায়ে ব্যাঘ্র ভল্লুকাদি হিংস্র জন্তুর সহিত অবলীলাক্রমে ক্রীড়া করিতেন। তিনি দুষ্টের যম ও শিষ্টের বন্ধু ছিলেন। আর্ত্তের আপদুদ্ধারে তাঁহার বাহুবিক্রম সতত প্রযুক্ত হইত। তিনি কত বিপন্নের উদ্ধার ও কত রমণীর সম্মান রক্ষা করিয়াছেন। একাধারে তিনি বলীয়ান, সংযমী, নির্ভীক ও তেজস্বী পুরুষ ছিলেন। তাঁহার অসীম সাহস ও অলৌকিক বীরত্ব কাহিনী বঙ্গের আবাল-বৃদ্ধ বনিতা কে না জানেন? তাঁহার দেহত্যাগে বঙ্গমাতার একটী বীর সন্তান অন্তর্হিত হইলেন!

(৫২)

ব্রাহ্মসমাজের ভক্ত উমানাথ গুপ্ত মহাশয় ৭৬ বৎসর বয়সে ১৪ই অগ্রহায়ণ, রবিবার, দেহরক্ষা করিয়াছেন। তিনি নিষ্কাম ভোগী ছিলেন। তাঁহার আন্তরিকতা, সরলতা এবং বিশ্বাসের প্রগাঢ়তা সাধক মাত্রেরই অনুকরণের জিনিস। তিনি ধর্ম্মোন্মত্ত বীর ছিলেন। তাঁহার সংস্পর্শে যে একবার আসিয়াছে, সে-ই তাঁহার চরিত্রমাধুর্য্যে মুগ্ধ হইত। হালিসহর গ্রামে তাঁহার জন্ম হয়, পিতার নাম ব্রজকিশোর গুপ্ত। উমানাথ বাল্যে পাঠশালায় অধ্যয়ন করেন। ষোড়শ বর্ষ বয়সে দশমবর্ষীয় বালিকাকে বিবাহ করেন। পাঠশালার শিক্ষা শেষ করিয়া, হুগলি কলেজে অধ্যয়ন করেন। কলেজে ভাল ছেলে ছিলেন। বাল্যেই বিশুদ্ধ চরিত্র লাভ করিয়াছিলেন। ঘটনাক্রমে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা তাঁহার হাতে পড়ে। তাহার পর অক্ষয়কুমারের বাহ্যবস্তুর সহিত মানবপ্রকৃতির সম্বন্ধ পুস্তক পাঠ করেন। পঠদ্দশায় নীতিবিষয়ক আলোচনার জন্য একটী সভা করেন, তাহাতে শম্ভুচন্দ্র গড়গড়ি ও বীরেশ্বর চক্রবর্ত্তী যোগ দিতেন। তাঁহারা মিলিয়া হালিসহরে একটী

ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন করেন। মহর্ষি গৃহ-নির্ম্মাণে সহায়তা করিয়াছিলেন। মহর্ষি হালি-সহরে যাইয়া গৃহ প্রতিষ্ঠা করেন। ব্রাহ্মেরা রুগ্ন ও বিপন্নদের সহায় ও মৃত ব্যক্তিদের সংকার করিতেন, এজন্য দেশের লোক সমাজে যাইতেন। স্কুল ছাড়িয়া উমানাথ ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলের আফিসে কর্ম্ম করেন। এই সময়ে কেশবচন্দ্রের সহিত আলাপ করেন। এই সময় হইতে ব্রাহ্ম সমাজের প্রতি অনুরাগ বৃদ্ধি হয়। তিনি কেশবচন্দ্রের বক্তৃতা ও কথাবার্ত্তা শুনিতে ও তাঁহার সঙ্গলাভে বড়ই তৃপ্তি পাইতেন। এইরূপে তিনি কেশবচন্দ্রের যে আনুগত্য লাভ করিয়াছিলেন, জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত তাহা রক্ষা করিয়াছিলেন। তাঁহার ন্যায় নিষ্ঠাবান ধার্ম্মিক ব্যক্তি যে কোন সমাজের গৌরব। তাঁহার সম্বন্ধে বসুমতী ২০শে অগ্রহায়ণ যাহা লিখিয়াছেন, তাহা সর্ব্বতোভাবে আমরা অনুমোদন করি। তাহা সাদরে এস্থলে তুলিয়া দিলাম।

"স্বর্গীয় কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়ের সহচর, সহকর্ম্মী ও পরম ভক্ত ভাই উমানাথ গুপ্ত মহাশয় ১৬ই অগ্রহায়ণ, রবিবার, লোকান্তরিত হইয়াছেন। ছিয়াত্তর বৎসর বয়সে তাঁহার দেহত্যাগ হইল। তিনি বাঙ্গালার গত শতাব্দীর ধর্ম্ম ও সমাজের বিবর্ত্তের সাক্ষী ছিলেন। ইনি কেশব বাবুর প্রথম শিষ্য। কেশবের 'প্রেরিত'-গণের অন্যতম ছিলেন। ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ড হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া কেশব বাবু "সুলভ-সমাচারে"র প্রতিষ্ঠা করেন। ভাই উমানাথ "সুলভে"র সম্পাদক হইয়াছিলেন। তাঁহার চেষ্টায় ও যত্নে "সুলভ" বাঙ্গালীর নিত্যসহচরে পরিণত হইয়াছিল। "পূজার সুলভ" নব-বঙ্গের মত বাঙ্গালার শারদ-উৎসবের অঙ্গ ছিল। সংবাদ-পত্রের ভাষা-গঠনেও "সুলভ-সমাচার" যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিল। উমানাথের নেতৃত্বে "সুলভ-সমাচার" বাঙ্গালীকে সংবাদপত্রের পাঠক করিয়াছিল। সহস্র সহস্র বাঙ্গালী "সুলভ" পাঠ করিত। "সুলভ-সমাচার" দ্বারা ভাই উমানাথ বাঙ্গালায় লোকমতের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। "সুলভে"র প্রথম 'মটো' ছিল—

"ধন মান লাভ করি, সকলেই চায়,
সকলের ভাগ্যে তাহা ঘটে উঠা দায়।
জ্ঞান ধর্ম্ম চাও যদি, অবারিত দ্বার,
দরিদ্র ধনীর সেথা সম অধিকার।"

তাহার পর "সুলভে"র এই শিরোভূষণ পরিবর্ত্তিত হয়। তাহা এই,—

"সহজে পাইতে যদি চাও জ্ঞান-ধন;
সুলভ সংবাদপত্র কর অধ্যয়ন।
সকলের প্রিয় ইহা গরীবের মিত্র;
প্রকাশে বিবিধ তত্ত্ব, মানব চরিত্র।"

বাস্তবিক, "সুলভ" তাহার মূলমন্ত্র সার্থক করিয়াছিল। প্রতি সপ্তাহে সহস্র সহস্র পাঠক সাগ্রহে "সুলভে"র প্রতীক্ষা করিত। এ যুগের বাঙ্গালী সে যুগের কথা বিস্মৃত হইয়াছেন। কিন্তু কেশবের ও ভাই উমানাথের এ ঋণ বাঙ্গালী কখনও পরিশোধ করিতে পারিবে না। এখনকার অতিকায় পত্রে "সোমপ্রকাশ" ও "সুলভ-সমাচারে"র রক্ত আছে। "সুলভ-সমাচার" ইংলণ্ডের "পেনী-পেপারে"র আদর্শে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। পরবর্ত্তী কালে প্রতিভাশালী যোগেন্দ্রচন্দ্র দুই পয়সা মূল্যে "সুলভ সমাচারে"র দ্বিগুণ আকার "বঙ্গবাসী" প্রকাশিত করিয়া বাঙ্গালা সংবাদপত্রে যুগান্তর উপস্থিত করেন। কেশব যে ব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন, যোগেন্দ্র-

চন্দ্র সেই ব্রতের উদ্‌যাপন করেন। তাই উমানাথ "বালক-বন্ধু" নামক এক খানি শিশুপাঠ্য মাসিকপত্রের সম্পাদক ছিলেন। "বালক-বন্ধু" এই শ্রেণীর পত্রের পথপ্রদর্শক ও প্রবর্ত্তক। শিশুদের মনোরঞ্জন সাহিত্য রচনায় উমানাথের অসাধারণ শক্তি ছিল। তিনি সুরসিক ছিলেন। চিত্রে ও রচনায় তাঁহার প্রেম উজ্জ্বল হইয়া উঠিত। তাই উমানাথ কেশবের প্রতিভার অন্তরালে দেশের সেবায় আত্মোৎসর্গ করিয়াছিলেন। কেশবের ভক্ত-মণ্ডলে এই শিষ্যসত্তমের গুরুভক্তি আদর্শ বলিয়া পরিগণিত হইত।—বাঙ্গালায় যাহাকে 'সদানন্দ' ও 'মাটীর মানুষ' বলে, উমানাথে এই উভয় প্রকৃতির সমাবেশ ছিল। তিনি সাধনোচিত ধামে প্রস্থান করিলেন। কিন্তু আত্মবিস্মৃত হইয়া কেমন করিয়া আদর্শের অনুসরণ করিতে হয়, তাই উমানাথ বাঙ্গালীর উত্তর-পুরুষের জন্য তাহার আদর্শ রাখিয়া গেলেন। আমরা যেন সে আদর্শের অনুসরণ করিতে পারি।"

(৫৩)

সংবাদপত্রে এই দুইটী সংবাদ ঘোষিত হইয়াছে।

(১)

"We are very sorry to hear of the death, on the 21st November, (১৫ই অগ্রহায়ণ) at Chittagong of Miss Nirmala Ray, B. A., daughter of the late Babu Tripura Charan Ray, Second Mistress of the local Annadacharan Khastagir Girls' School. She died of fever and pneumonia, deeply mourned by a widowed mother, a large family of brothers and sisters and a wide circle of friends. 'Our hearty condolence to the bereaved family."
—*Indian Messenger, 1918.*

(২)

The sad death, through Influenza, of Miss Kshemoda Roy, sometime Lady Principal, Victoria Institution, Calcutta, will come as a shock to those who knew her. Full of the vitality and health of youth she was stricken down by the Unseen Hand and passed away quietly at 11 A.M. on Wednesday, Dec. 11th (২৫শে অগ্রহায়ণ). Nobody, suspected that the attack would turn out to be fatal till the day before her death. Long before consciousness deserted her she knew the end was near, and prepared herself for it. She was a sister-in-law of the Late Chandi Charan Banerji, the talented biographer of Pandit Ishwar Chandra Vidyasagar, and was a source of strength and comfort to the family of her widowed sister. For sometime past she had been living at 4 Williams Lane,—whence she passed to her final rest, with the mother and sister of Brother Satyananda Roy and had become a part of the family. We offer our sincere condolence to the relatives and friends of the deceased. May the Divine Mother bless the departed spirit !"—*The world and the New Dispensation, Dec. 19, 1918.*

এই অগ্রহায়ণ মাসে যে কত গৃহে হাহাকার উঠিয়াছে, তাহার সংখ্যা হয় না। পৃথিবীর প্রতি নগরই যেন শ্মশানে পরিণত হইয়াছে।

প্রায় কোটী লোকের তিরোধান হইয়াছে। এরূপ পৃথিবীব্যাপী মারিভয় আর কখনও উপস্থিত হইয়াছে বলিয়া দেখা যায় নাই। সাঙ্ঘাতিক ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কলিকাতার স্কুল কলেজ ক্রমাগত বন্ধ দেওয়া হইতেছিল। ঘরে ঘরে শোকের উচ্ছ্বাস বহিতেছে, এবং শ্মশানের আগুন জ্বলিতেছে।

নির্ম্মলা রায় বি-এ, এবং ক্ষেমদা রায় বি-এ, বি-টি কে ছিলেন, এবং কি ছিলেন, উপরোক্ত সংবাদে তাহা বুঝা যায় না। এই দুটী মহিলা সাধ্বী কমলকামিনীর হাতে গড়া দেবী এবং আনন্দ-আশ্রমের মহা কীর্ত্তি। নির্ম্মলা রায়, রাঁচির সুবিখ্যাত সাধু ত্রিপুরা-চরণ রায়ের কন্যা এবং ক্ষেমদা কলিকাতার সাধু বৈকুণ্ঠনাথ রায়ের কন্যা। ত্রিপুরাচরণ রায় আনন্দ-আশ্রমেই দেহরক্ষা করিয়াছিলেন, এবং বৈকুণ্ঠনাথ রায়,আনন্দ-আশ্রমের পার্শ্বের বাড়ীতেই দেহরক্ষা করিয়াছিলেন। তিনি সপরিবারে বহুদিন আনন্দ-আশ্রমে ছিলেন, সেই অবস্থিতির সময়েই আনন্দ-আশ্রমে ক্ষেমদা জন্মগ্রহণ করে। ক্ষেমদা এবং নির্ম্মলা আনন্দ-আশ্রমে থাকিয়াই লেখা পড়া করিয়া-ছিলেন, এবং তাঁহাদের জীবনের অধিকাংশ কাল আনন্দ-আশ্রমেই অতিবাহিত করিয়া-ছিলেন। বনমুকুল, নির্ম্মলা এবং ক্ষেমদা সমবয়স্কা, এক সঙ্গে খেলা করিতেন,এক সঙ্গে পড়াশুনা করিতেন, এক সঙ্গে ধর্ম্মচর্চ্চা করিতেন। তাঁহারা তিন জনে একাত্মক ছিলেন। রক্তের সম্বন্ধ ছিল না, কিন্তু দেখিলে মনে হইত, তিনটী যেন যমজ-মেয়ে। এরূপ ঘনীভূত যোগ এ সংসারে বড় অধিক দেখা যায় না। একজন হাসিলে অপরে হাসিত, একজন কাঁদিলে অপরে কাঁদিত। একজনের পীড়ার সময় অন্যের হৃদয় ভাঙ্গিয়া পড়িত, এবং দিবারাত্রি সেবাশুশ্রূষা চলিত। একজনের পীড়ার সময় অন্য জন হাজার আনন্দ উৎসবেও যোগ দিতেন না। এরূপ মিলন এ জগতে বড় দুর্লভ।

ক্ষেমদার পিতা কাণে শুনিতেন না, এবং চক্ষে দেখিতেন না, মেয়েটী দীর্ঘকাল পিতার সঙ্গে সঙ্গে পিতার হাত ধরিয়া বেড়াইত, এবং অন্যের কথা পিতাকে বুঝাইয়া দিত। এমন সুমিষ্ট ব্যবহার এ সংসারে বড় অধিক দেখা যায় না। রীতিমত অধ্যয়ন এজন্য সে করিতে পারিত না। মাতা এবং পিতার মৃত্যুর পর রীতিমত পড়িতে আরম্ভ করে। এমনই তাহার প্রখর বুদ্ধি ও প্রতিভা ছিল, অল্প সময়ের মধ্যেই অনেক উন্নতি করিতে লাগিল। নির্ম্মলা সহজেই অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছিল, ক্ষেমদা তাহাকে ধরিয়া ফেলিল। দুটীই তীক্ষ্ণ প্রতিভাশালিনী, দুয়ে দুজনার সঙ্গিনী—পড়া শুনায় দুজনই ভাল। যে দেখিত, সে-ই মোহিত হইত। দুজনই সমান। প্রতিদ্বন্দ্বীতা নাই, দুজনেই সহজ সরল স্রোতের ন্যায় চলিতে লাগিলেন। শেষে ঘটনাক্রমে উভয়ের ছাড়াছাড়ি হইল বটে, কিন্তু প্রাণের মিল কখনও যায় নাই। প্রতিকূল ঘটনা এবং অবস্থাকে জয় করিয়া, উভয়েই বি-এ উত্তীর্ণা হইলেন, ক্ষেমদা B.T.ও পাশ করিল। বি-এ পাশ করার পর নির্ম্মলা চট্টোগ্রামে কাজ লইয়া গেলেন, ক্ষেমদা গিরিধিতে কাজ নিল, মুকুলের বিবাহ হইল। তিন জনের ছাড়াছাড়ি হইল বটে,. কিন্তু ভাবের মিল, প্রাণের মিল, জীবনের মিলন কখনও যায় নাই। হঠাৎ নির্ম্মলা যখন দেহরক্ষা করিলেন, সঙ্গিনী ক্ষেমদার হৃদয় ভাঙ্গিয়া পড়িল। তাঁহার বৌদিদিকে যে পত্র লিখিয়াছিল, তাহা পড়িলে পাষাণ হৃদয় দ্রব হয়। এমনই শোকের উচ্ছ্বাস!

এই মিলনে সাধ্বী কমলকামিনীর আধ্যাত্মিক প্রেমভক্তিপূত জীবন খানি বিমি-শ্রিত হইয়াছিল। এই প্রেমধারা সকলের হৃদয়কে স্পর্শ করিত। যেখানে নির্ম্মলা এবং ক্ষেমদা গিয়াছে, সেখানেই সকলের চিত্তকে আকর্ষণ করিয়াছে। তাহাদের কার্য্য-প্রণালী ও কর্ম্মদক্ষতা দেখিয়া সকলেই মোহিত হইত। নির্ম্মলার সঙ্গিনী মুকুলের দিদি বনলতাকে চট্টোগ্রাম স্কুলে আনিয়া কাজ দিয়াছিল। ক্ষেমদা ইন্দুপ্রকাশের পত্নীকে স্কুল কলেজে পড়াইতেছিলেন। উভয়েই প্রেমিকা, উভয়েই ধার্ম্মিকা, উভয়েই বুদ্ধি-

মতী, উভয়েই চরিত্রবতী, উভয়েরই আদর্শ জীবন। উভয়েই মহিলাকুলের মুখ উজ্জ্বল করিয়া গিয়াছেন। ইহাদের মুখে কখনও পরনিন্দার কথা শুনা যাইত না। ক্ষেমদা এসিস্‌টেণ্ট ইনস্পেক্টরী পাইয়াছিল। ২রা জানুয়ারী কাজ গ্রহণ করিবে ধার্য্য ছিল, কিন্তু বিধাতার ইচ্ছা অন্য প্রকার। নির্ম্মলা এবং ক্ষেমদা দ্বারা ত্রিপুরাচরণ এবং বৈকুণ্ঠনাথের বংশ ধন্য হইয়াছে। সবে উভয়ের জীবন আরম্ভ হইয়াছিল, বাঁচিয়া থাকিলে না জানি কত মহৎ কাজ করিতে পারিতেন। এরূপ নিষ্কাম পবিত্র জীবন বড় অধিক দেখা যায় না। ইহাদের জীবনাদর্শে সাধ্বী কমলকামিনীর জীবন ধন্য হইয়াছে।

চতুর্থ পন্থা।

ষ্টেটস্‌-সেক্রেটরী মহাশয় তাঁহার বিলের বিলাতী প্রতিবাদীদিগকে বুঝাইবার জন্য যে বক্তৃতা দিয়াছেন, তাহাতে তিনি বলিয়াছেন যে, তিনটী মাত্র পন্থা (Schemes) আছে, (১) ভারতের শাসন যন্ত্র যেরূপ চলিতেছে, এই রূপই চলুক। (২) ভারতকে হোমরুল দেওয়া হউক। (৩) তাঁহার প্রস্তাবিত বিল গ্রহণ করা হউক।

১ম পন্থাকে তিনি ব্রিটিস সাম্রাজ্যের উন্নতি-নাশী-শাসন-প্রণালীর বিরোধী বলিয়াছেন। ২য় পন্থা সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছেন যে, ভারতবাসী স্বায়ত্তশাসন পাইতে অনিচ্ছুক! সুতরাং ৩য় পন্থা অর্থাৎ তাঁহার প্রণীত বিল গ্রহণ করা ভিন্ন অন্য পন্থা নাই। মিঃ মণ্টেগু সতেজে জিজ্ঞাসা (Challenge) করিয়াছেন যে, এই তিন পন্থা ভিন্ন কেহ কি অন্য কোন পন্থা (Scheme) বাহির করিতে পারেন? আমরা বলি, পন্থা অনেক আছে, সকলগুলি বলা অনাবশ্যক, একটা ৪র্থ পন্থা বলিতেছি।

যাহাতে ভবিষ্যতে ভারতরাজ্য ইংরাজের হস্তচ্যুত হওয়ায় বিন্দুমাত্র সম্ভাবনা না থাকে, এমন করিয়া গঠিত না করিলে কোন স্কিমই ইংরাজ মঞ্জুর করিতে পারেন না, কিছু চাহিতে হইলে এই গণ্ডীর মধ্যে থাকিয়া চাহিতে হইবে। ইংরাজ ইহার অতিরিক্ত দিতে পারেন না। তুমি যে বামন সাজিয়া তিনপাদ ভূমি চাহিয়া সর্ব্বস্ব অধিকার করিবে, ইংরাজ সেরূপ দাতা বলীরাজা নহেন যে, তোমাকে সেইরূপ তিনপাদ ভূমি দিবেন। আর ইংরাজকে মনে রাখিতে হইবে যে, যতটুকুতে ইংরাজাধিপত্য অক্ষুন্ন থাকে, অর্থাৎ ভারত তাঁহার (ইংরাজের) প্রতাপ ও প্রভাবের হাত অতিক্রম করিতে না পারে, শুধু ততটুকু দেখিয়া যদি চলেন, তবে ভারতকে বহু পরিমাণে আভ্যন্তর স্বায়ত্তশাসন দিতে পারেন। আর যদি সিভিল সার্ভিসের বেষ্টনী, উপনিবেশ-কৃত অত্যাচার ও অপমান, শ্বেতাঙ্গদিগের অন্যায় আবদার, সমস্ত এই ভাবেই বজায় রাখিতে চাহেন, তবে স্বায়ত্তশাসনের অনুগামী কোন স্কিমই হইতে পারিবে না, আর যদি এই সকল স্বার্থ যথাসাধ্য পরিত্যাগ করিতে চাহেন, তবে ৪র্থ পন্থা বলা যাইতে পারে।

৪র্থ পন্থা কি?

"সামন্ত-রাজ্য-তন্ত্রের প্রণালীতে প্রাদেশিক স্বায়ত্ত-শাসন প্রতিষ্ঠা"। কথাটা সহজ হইলেও আরও পরিষ্কার করা কর্ত্তব্য।

ভারতবর্ষে ইংরাজের প্রভাবাধীনে বহু সংখ্যক সামন্ত রাজ্য আছে। সে সকলের মধ্যে কতকগুলি এতই ক্ষুদ্র যে, উহাদের বার্ষিক আয় এক লক্ষ টাকার অধিক নহে। আর এমন কতকগুলি বৃহৎ রাজ্য আছে, যাহাদের বার্ষিক আয় দুই কোটী হইতে তিন কোটী। এই সকল রাজ্য হিন্দু ও মুসলমান রাজাদিগের দ্বারা শাসিত। আজ পর্য্যন্ত, ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট এবং য়ুরোপীয় লেখক ও পর্য্যটক কেহই ঘুণাক্ষরে বলেন নাই যে, এই সকল রাজ্য অশাসিত বা কুশাসিত। প্রত্যুত: ইহাদের শাসন-সুখ্যাতির কথা সর্ব্বত্র সুবিদিত।

এই সকল রাজ্যে বিবিধ ধর্ম্মাবলম্বীর বাস, কিন্তু কখনও ধর্ম্মবিরোধের জন্য ইহাদের শাসন-যন্ত্র বিকল হয় নাই। এই সকল রাজ্যে হিন্দুর বর্ণাশ্রম প্রথা প্রচলিত, কিন্তু

বিচার ক্ষেত্রে তাহা লইয়া কোনওরূপ পক্ষপাতিতা ঘটে না। সকল বিষয়েই হিন্দু, বৌদ্ধ, ইহুদী, পার্শি, জৈন, মুসলমান এবং খ্রীষ্টান প্রভৃতি সকল ধর্ম্মাবলম্বী সকলেই সমান অধিকার লাভ করিতেছে। খনির কার্য্য, রেলওয়ে ইহাদের নিজের অধীনে চলিতেছে। পুলিস, কোর্ট ফি, শাসন বিচার সমস্তই ইহাদের নিজের। এই সকল রাজ্যে শিক্ষা, শিল্প ও কৃষি বাণিজ্যের যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছে ও হইতেছে।

এক শ্রেণীর লোকেরা এদেশের নানা প্রথা ও জাতিভেদ লইয়া স্বায়ত্তশাসনের বিরুদ্ধে যে সকল প্রতিবন্ধকতা উপস্থিত করেন, দেশীয় রাজ্যগুলির সুখ শান্তি ও সুশাসন, সে সকল বৃথা তর্কের জীবন্ত-উত্তর।

স্বায়ত্তশাসন প্রণালীই সর্ব্বদেশে নিম্ন শ্রেণীর লোকদিগকে তুলিয়া ধরিবার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপায়। যাঁহারা প্রকৃতপক্ষে নিম্নশ্রেণীর উন্নতি-প্রয়াসী, স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য তাঁহাদের প্রাণপণ চেষ্টা করা কর্ত্তব্য।

আজ কয়েক বৎসর হইল, ব্রিটিস্ গভর্ণমেণ্ট একজন মধ্য শ্রেণীর জমিদারকে রাজসিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, ইহা দ্বারাই প্রমাণিত হয় যে, দেশীয় লোকের শাসনক্ষমতার উপর ইংরাজ রাজের অবিশ্বাস নাই; কাশী নরেশের মধ্যে এমন অসামান্য কিছুই নাই, যাহা এদেশে খুঁজিয়া পাওয়া দুষ্কর।

স্যর টি মাধবরাও, স্যর শেষাদ্রি আয়ার, স্যর সালরজঙ্গ প্রভৃতি রাজমন্ত্রিগণ পৃথিবীর যে কোনও দেশে মন্ত্রী হওয়ার উপযুক্ত এ কথা ভারতের ইতিহাস-লেখক কোনও কোনও সত্যবাদী ইংরাজ স্বীকার করিয়াছেন। কার্য্যক্ষেত্র প্রশস্ত হইলে এদেশে এরূপ শত শত লোক জন্মিবে। অধিকার না পাইলে এদেশের লোকেরা মুনসেফ হওয়ারও অযোগ্য হইত, এবং যোগ্যতার প্রমাণ দেওয়া অসম্ভব হইত। এ কথা বলিতে পারেন যে, প্রবল প্রতাপ ব্রিটিসসিংহ মাথার উপর থাবা পাতিয়া আছেন বলিয়াই এই সকল ক্ষুদ্র বৃহৎ রাজ্যগুলি অন্তর্ব্বিপ্লব ও বহিঃশত্রুর হস্ত হইতে রক্ষা পাইতেছে এবং আভ্যন্তর-শাসন-শৃঙ্খলা রক্ষা করিতেছে। এ কথা অস্বীকার করিবার কারণ কিম্বা প্রয়োজন কিছুই নাই। আমরাও ব্রিটিস সিংহকে নিদ্রা যাইতে বলিতেছি না। কি করিতে বলিতেছি, তাহা নিম্নে ধারামত লিখিত হইল।

১। ইংরাজাধিকৃত ভারত এবং ব্রহ্মদেশকে কতকগুলি খণ্ডরাজ্য অথবা প্রদেশে বিভক্ত করা হইবে।

২। সেই সকল খণ্ডরাজ্যে এক এক জন নির্ব্বাচিত জন-প্রতিনিধি নির্দ্দিষ্ট কালের জন্য শাসন-দণ্ড ধারণ করিবেন।

৩। এই নির্ব্বাচন কার্য্য জাতিধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে চলিবে।

৪। এই নির্ব্বাচিত শাসন-যন্ত্রকে, সামন্ত রাজাদিগের যে ক্ষমতা আছে, সেই ক্ষমতা দেওয়া হইবে।

৫। বর্ত্তমানে ব্রিটিস রাজ্যের সহিত সামন্ত রাজ্যগুলির যেরূপ সম্বন্ধ, এই স্বায়ত্তশাসিত খণ্ডরাজ্যগুলির সঙ্গেও সেইরূপ সম্বন্ধ থাকিবে।

৬। বাহিরের শত্রু হইতে ভারতকে রক্ষা করিতে এবং ভিতরের শান্তি, শৃঙ্খলা ও বৃটনের আধিপত্য রক্ষা করিবার জন্য সেনা বিভাগের যেরূপ বন্দোবস্ত করা আবশ্যক, বৃটন তাহা করিবেন।

৭। একমাত্র সেনা বিভাগ ভিন্ন শাসন, বিচার, কর নির্দ্ধারণ, শিক্ষা, বাণিজ্য প্রভৃতি সকল ব্যাপারেই স্বায়ত্ত-শাসিত রাজ্যগুলি সামন্ত রাজ্যের সমান অধিকার পাইবে।

৮। সেনা বিভাগের সমগ্র খরচই স্বায়ত্তশাসিত রাজ্যগুলি হইতে প্রদত্ত হইবে।

৯। ইংলণ্ডকে একটা নির্দ্দিষ্ট কর দেওয়া হইবে।

সবিশেষ (Details) বলিবার প্রয়োজন নাই, কেন না প্রণালীটা মনোনীত হইলে বাজে কাজ ও বন্দোবস্তের জন্য ঠেকিবে না।

এই প্রণালীতে ভারতবাসীর মর্য্যাদা কিছু পরিমাণে রক্ষিত হইবে। দেশীয় প্রণালীতে রাজ্যশাসন করিলে খরচ কমিবে, আয় বাড়িবে।

এই প্রণালী প্রতিষ্ঠিত হইলে ভারতের স্বাধীনতাপ্রিয় যুবকগণের ক্ষোভ অনেক পরিমাণে কমিবে এবং ইংলণ্ড ও ভারতের প্রকৃত বান্ধবতা জন্মিবে। এই প্রণালীতে দেশ শাসিত হইলে কোনও প্রবল প্রতিবেশীর ন্যায়তঃ ধর্ম্মতঃ এদেশ আক্রমণ করার অধিকার থাকিবেনা।

এই প্রণালীতে দেশ শাসিত হইলে এখন যে সকল যুবক ইংরাজের বিদ্রোহী হইয়া দেশে অশান্তির সৃষ্টি করিয়াছে, তাহারা কার্য্যক্ষেত্র পাইয়া দেশ ও ইংরাজ উভয়ের জন্য প্রাণপাত করিবে।

জার্ম্মাণ, রুষ, ফরাসী, চীন কিম্বা জাপান কাহারওই এদেশের উপর লোভ করার ন্যায্য অধিকার থাকিবে না।

হিন্দু মুসলমানের ভোটের কথা লইয়া স্বায়ত্তশাসনের বিরুদ্ধে যে একটা প্রবল (?) আপত্তি উত্থাপিত করা হইয়াছে, তাহার মীমাংসা হওয়া কিছুই কঠিন কার্য্য নহে।

প্রেসিডেন্ট সম্বন্ধে এরূপ নিয়ম চলিতে পারে যে, একজন হিন্দু প্রেসিডেন্টের কার্য্যাবসানে একজন মুসলমান প্রেসিডেন্ট হইবেন।

ধর্ম্ম ও রাষ্ট্র সম্বন্ধে ইংলণ্ডের নিয়ম একান্তই শোচনীয়। রাজা রোমান ক্যাথলিক হইতে পারেন না, অথচ সে দেশে উক্ত সম্প্রদায়ের লোক অনেক আছেন। এদেশে রাষ্ট্রতন্ত্রে একরূপ পার্থক্যের স্থান থাকিবে না।

ভোট সম্বন্ধে হিন্দু মুসলমানে বিরোধের যে কথা উঠিয়াছে, তাহাও অনায়াসে মীমাংসিত হইতে পারে। হিন্দু ভোটারগণ শুধু যে হিন্দুকেই ভোট দিবেন এবং মুসলমান ভোটারগণ শুধু মুসলমানকেই দিবেন, এরূপ কিছু কথা নয়। মিউনিসিপাল কিম্বা বোর্ডের নির্ব্বাচনে হিন্দুমুসলমান পরস্পরকে ভোট দিতেছেন, এমন কি হিন্দু এবং মুসলমানের দ্বারা ইংরাজও নির্ব্বাচিত হইতেছেন। তথাপি হিন্দু মুসলমান এই দুইটী প্রবল জাতির মধ্যে বিরোধের কথা তুলিয়া যাহারা স্বায়ত্ত-শাসনের পথ রুদ্ধ করিতে চাহে, তাহাদের কথায় উত্তর দেওয়ার জন্য বলা যায় যে, ভোটের মীমাংসা করাও অসাধ্য ব্যাপার নহে।

মনে করুন, কোন একটা প্রদেশে ১০০ এক শত জন প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হইবেন, ভোটারের সংখ্যানুসারে হিন্দু পাইবেন ৬০টী এবং মুসলমান পাইবেন ৪০টী ভোট। এরূপ অবস্থায়, হিন্দু ও মুসলমান আপনাপন সম্প্রদায়কে ৪০টী করিয়া ভোট দিবেন, বাকী ২০টী যদিও হিন্দুর প্রাপ্য, তথাপি সামঞ্জস্য করার জন্য উহার ১০টী ভোট মুসলমানগণ তাঁহাদের মনোনীত হিন্দুকে দিবেন। আবার যে প্রদেশে মুসলমানের সংখ্যা বেশী হইবে, সে প্রদেশে হিন্দু এইরূপ অধিকার পাইবেন, অর্থাৎ জনসংখ্যার হিসাবে মুসলমানের যে কয়টী ভোট বেশী প্রাপ্য হইবে, তাহার অর্দ্ধেক ভোট হিন্দুগণ মুসলমানকে দিবেন। হিন্দুগণ আপনাদের বিশ্বাসী দশ জন মুসলমান পাইবেন না, এবং মুসলমানগণ দশ জন হিন্দুকে বিশ্বাস করিতে পারিবেন না, এমন কথা যদি কেহ বলে, তেমন ঝগ্‌ড়াটে লোকের কথার উত্তর দিতে নাই।

যদিও সম্প্রতি মুসলমান্ অপেক্ষা হিন্দুর সংখ্যা অধিক, কিন্তু যেরূপে মুসলমান জাতি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে, তাহাতে তাঁহারা সংখ্যায় অল্প একথা ভাবিয়া কোনও সংকার্য্য এবং দেশের স্বার্থে বাধা দেওয়া উচিত নয়, কেন না, এ কাজটী শুধু বর্ত্তমান সময়ের জন্য নহে, কালে এদেশে হিন্দু অপেক্ষা মুসলমানের সংখ্যা বেশী হইবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। ভোট সম্বন্ধে আমি যাহা বলিলাম, তাহা চিরকালের তরে হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের কল্যাণকর প্রস্তাব। ইহাতে স্বায়ত্তশাসন বিরোধীদিগের আমাদের মধ্যে গৃহ বিচ্ছেদ ঘটাইবার সুবিধা থাকিবেনা।

যাহার কিছু মাত্র মনুষ্যত্ব আছে, সে কখনও স্বায়ত্তশাসনের বিরোধী হইতে পারেনা। আমরাও সম্পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন চাই, কিন্তু ইংরাজ তাহা দিতে পারেন না বলিয়াই ৪র্থ পন্থা দেখাইলাম।

শ্রীমনোরঞ্জন গুহঠাকুরতা।

পরলোকে কবি গোবিন্দচন্দ্র।

"নহে কোন ধনী, নহে কোন বীর,
নহে কোন কর্ম্মী—গর্ব্বোন্নত শির,
কোন মহারাজ নহে পৃথিবীর
নাহি প্রতিমূর্ত্তি ছবি ;
তবু কাঁদ কাঁদ, জনমভূমির
সে এক দরিদ্র কবি।"

—অক্ষয়কুমার—

যাহা যায়, তাহা আর হয় না। এই নশ্বর জগতে কিছুই চিরস্থায়ী নহে। মনুষ্যের জীবনও ক্ষণস্থায়ী। জন্ম মৃত্যুর ব্যবধানে ক্ষণস্থায়ী জীবন লইয়া এই পৃথিবীতে যাঁহারা তাঁহাদের জীবন-স্মৃতি রাখিয়া যাইতে পারেন, তাঁহারাই বরণীয়, পূজনীয় এবং আদরণীয়। মানুষ একদিন চলিয়া যায়, কিন্তু থাকে তাঁহার স্মৃতি। যাঁহাদের স্মৃতি পৃথিবী হইতে মুছিয়া যায় না, তাঁহারা মৃত হইয়াও অমর। বঙ্গসাহিত্যের স্বভাবকবি গোবিন্দচন্দ্র দাস আজ পরলোকে কিন্তু তাঁহার স্মৃতির সৌরভে বঙ্গের সাহিত্যকুঞ্জ আমোদিত।

তাঁহার অন্তর্ধানে বঙ্গ-সাহিত্য-কাননের একটী কলকণ্ঠ কোকিলের ধ্বনি নীরব হইয়াছে। বঙ্গসাহিত্যের অকৃত্রিম সেবক, খাঁটি বাঙ্গালীর কবি আজ পরলোকে। বঙ্গবাসী তাঁহার অমিয় মধুর গীতি-কবিতা আর শুনিবে না। তাঁহার সুমধুর কণ্ঠ চিরতরে নিস্তব্ধ হইয়াছে।

গোবিন্দচন্দ্র দরিদ্র ছিলেন, কিন্তু বঙ্গসাহিত্যকে তিনি যাহা দান করিয়া গিয়াছেন, তাহা অতুলনীয়। ইংরাজ কবির কথায় বলিতে গেলে তিনি বনকুসুমের মত নিভৃতে ফুটিয়া নীরবে ঝরিয়া পড়িয়াছেন।

মৃত্যু তাঁহাকে লইয়া গিয়াছে, কিন্তু ...র প্রতিভার জ্যোতি বাঙ্গালীর সাহিত্য-...র উজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছে। যতদিন ...ভাষা থাকিবে, ততদিন কেহ তাঁহাকে ভুলিতে পারিবে না।

গোবিন্দচন্দ্র গিয়াছেন। তিনি একজন খাঁটি বাঙ্গালী কবি ছিলেন ; তাঁহার অভাবে ...সাহিত্যের যে ক্ষতি হইয়াছে, তাহা আর হইবে না। তাই বলিতেছিলাম, যাহা ...তাহা আর হয় না। মধুসূদন, হেমচন্দ্র, ...চন্দ্র গিয়াছেন ; বঙ্গসাহিত্যে তাঁহাদের অভাব আর পূর্ণ হয় নাই। বিহারীলাল, ঈশানচন্দ্র সম্বন্ধেও সেই কথা। গোবিন্দচন্দ্রও গেলেন এবং তাঁহার অন্তর্ধানও মর্ম্ম-স্পর্শী।

তাঁহার প্রতিভা অনন্যসাধারণ ছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা-সম্পর্ক-শূন্য এবং ইংরাজি ভাষায় অনভিজ্ঞ কবি বঙ্গবাসীকে অপূর্ব্ব সম্পদ-সম্ভারে সজ্জিত করিয়া গিয়াছেন। সহজ সরল ভাষায় বাঙ্গালীর হৃদয়ের কথা তাঁহার গীতি কবিতার সর্ব্বত্র প্রতি-ধ্বনিত হইয়াছে।

তিনি ভাগ্যলক্ষ্মীর কৃপা হইতে চিরবঞ্চিত ছিলেন। তাঁহার মত একজন বরেণ্য কবি আজীবন দারিদ্র্যের কঠোর পেষণে নিষ্পেষিত হইয়া গিয়াছেন। তাঁহার অসামান্য প্রতিভার সঙ্গে মন্দ ভাগ্যের সংঘর্ষণ নিতান্তই পরিতাপের বিষয়। দুর্ভাগ্যের ভীষণ ঝঞ্ঝাবাত একদিনের তরেও তাঁহাকে সাহিত্য-...হইতে বিচ্যুত করিতে পারে নাই।

সে কর্মচারীর পদে ... একটা প্রধান ইহা ...জেন্দ্রনারায়ণ তখন ১৭।১৮ বৎ... বিশেষজ্ঞ।

মাতৃভাষার সেবায় তিনি নানা মূর্ত্তি[illegible] প্রকটিত হইয়াছিলেন। বঙ্গসাহিত্যে তাঁহ[illegible] দান "প্রেম ও ফুল", "কুঙ্কুম" "কস্তুরী"[illegible] "চন্দন", "ফুলরেণু" ও "বৈজয়ন্তী"। তাঁহা[illegible] প্রেম-সঙ্গীত, শোক-সঙ্গীত এবং দেশভক্তি[illegible] মূলক গীতি-কবিতা পাঠ করিতে বসিলে[illegible] মনের অনুভূতি অতি প্রবলবেগে জাগিয়া উঠে। তিনি যৌবন কাল হইতে আরম্ভ করিয়া মৃত্যুর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত দেশবাসীকে দেশাত্মবোধের কথা বুঝাইতে চেষ্টা করিয়[illegible] গিয়াছেন। জীবন-সায়াহ্নে তিনি দেশহি[illegible] ব্রতের গান গাহিয়া অনাদৃত, অপরিজ্ঞা[illegible] ভাবে জীবন নাট্য সাঙ্গ করিলেন। আ[illegible] তাঁহাকে হারাইয়া শোকসন্তপ্ত হৃদয়ে অশ্রু বর্ষণ করিতেছি। আমরা তাঁহার স[illegible] ব্যক্তিগতভাবে পরিচিত ছিলাম এবং তাঁহার জীবনের কৌতূহলোদ্দীপক সকল কথাই জানি। যথা সময়ে আমরা তাঁহার বিস্তারিত জীবন-কথা প্রকাশিত করিব। তিনি এই অক্ষম প্রবন্ধ-লেখকের পরম হিতৈষী বান্ধব ছিলেন। আজ তাঁহার সংক্ষিপ্ত জীবনকাহিনী লিখিয়া অশ্রুজলে তাঁহার তর্পণ করিতে বসিয়াছি।

উদ্দেশ্য বুঝিয়া পাঠকগণ আমাদের অক্ষমতা মার্জ্জনা করিবেন।

স্বভাব-কবি গোবিন্দচন্দ্র দাস ঢাকা জেলার অন্তর্গত জয়দেবপুরে ১২৬১ সালের ৪ঠা মাঘ জন্মগ্রহণ করেন। কবির পাঁচ বৎসর বয়সের সময় তাঁহার পিতা রামনাথ দাস পরলোক গমন করেন। পিতার মৃত্যুর পর সংসারে তাঁহার অতিবৃদ্ধ পিতামহ, পিতামহী এবং মাতা [illegible] করিতে চাহে, তাঁহার ক[illegible]

পিতৃ-বিয়োগের পর এই কবি-পরি[illegible] বারের এতদূর অর্থকষ্ট উপস্থিত হয় যে, [illegible]কবেলা আহারের সংস্থান পর্য্যন্ত ছিলনা। এই দারুণ দুর্দ্দশায় পতিত হইয়া কবির শিশু ভ্রাতাটীর জীবন নষ্ট হইবার উপক্রম হইলে তদানীন্তন ভাওয়ালের রাজা ৺কালীনারায়ণ রায় প্রত্যক্ষ দেবতার মত তাঁহাদিগকে রক্ষা করিতে লাগিলেন।

কবির শোচনীয় অবস্থা দৃষ্টে দয়ালু রাজা কালীনারায়ণ প্রতিমাসে চারিটী মুদ্রা বৃত্তি স্বরূপ দান করিতে লাগিলেন এবং কতকদিন পর এই বৃত্তির পরিবর্ত্তে কতক নিষ্কর ভূমি প্রদান করেন। দানশীল, পুণ্যশ্লোক রাজা কালীনারায়ণ ব্যতিরেকে এই কবি-পরিবারের যে কি শোচনীয় অবস্থা ঘটিত, তাহা অন্তর্যামীই জানেন।

আট বৎসর বয়সের সময় কবির অক্ষর পরিচয় আরম্ভ হয়। তাঁহার জনৈক আত্মীয়ের কাছে তিনি সর্ব্বপ্রথম বিদ্যাশিক্ষা আরম্ভ করেন। কিন্তু শুনা যায় যে, তিনি বিদ্যা[illegible] কার্য্যে অতি অল্প সময়ই অতিবাহিত করিতেন। দিবসের অধিকাংশ সময়, হ[illegible] গোচারণে, নতুবা অন্য কোন খেলায় ম[illegible] থাকিতেন।

ইহার কিছুদিন পর রাজ-দুহিতা কৃপামরী দেবীর সহিত ৺কালীনাথ মিত্রের নিকট লেখা পড়া শিখিতে লাগিলেন। পরে মি[illegible] মহাশয়ের মৃত্যু হইলে জয়দেবপুর বাজারে জনৈক দোকানদারের নিকট লিখিতে অভ্যাস করেন।

পূর্ব্বে জয়দেবপুরে কোন বিদ্যালয় ছি[illegible] না। রাজকুমার রাজেন্দ্রনারায়ণ বিদ্যা[illegible] শিক্ষার উপযোগী বয়সপ্রাপ্ত হইলে রা[illegible] কালীনারায়ণ রাজকুমারের শিক্ষার নিমি[illegible]

জয়দেবপুরে বাঙ্গালা ছাত্রবৃত্তি এবং মাইনর স্কুল স্থাপিত করিলেন।

কবির গুরুপুত্র এবং রাজকুমার রাজেন্দ্রনারায়ণের মধ্যম মাতুল ৺প্যারীমোহন গোস্বামী রাজমাতা সত্যভামা দেবীকে অনুরোধ করিয়া গোবিন্দচন্দ্রকে সেই স্কুলে প্রবেশ করাইয়া দেন, এবং রাণী সত্যভামা দেবী দয়াপরবশ হইয়া কবির আবশ্যকীয় পুস্তকাদি ক্রয় করিয়া দেন। রাজকুমার রাজেন্দ্রনারায়ণের নিকট তাঁহার থাকিবার ব্যবস্থা হইল। এইরূপে রাজবাড়ীতে থাকিয়া রাজকুমারের সঙ্গে তিনি একত্র বিদ্যাভ্যাস করিতে লাগিলেন এবং যথাসময়ে সেই স্কুল হইতে ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন।

রাজা কালীনারায়ণ রায় ভাওয়ালের প্রজাগণের উন্নতিকল্পে জয়দেবপুরে "প্রজা হিতৈষিণী সভা" স্থাপিত করিয়াছিলেন। প্রতি বৎসর শ্রাবণ ভাদ্র মাসে পুণ্যাহের সময় সেই সভার অধিবেশন হইত। ভাওয়ালের উন্নতি-বিষয়ক নানা কথা সেই সভায় আলোচিত হইত। ঐ সভায় দাস-কবি একদিন স্বরচিত একটী কবিতার আবৃত্তি করেন। তাহা এতদূর হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল যে, বিদ্যোৎসাহী রাজা অত্যন্ত সন্তুষ্ট চিত্তে গোবিন্দচন্দ্রকে ঢাকা নর্ম্মাল স্কুলে পড়িবার জন্য মাসিক পাঁচটী মুদ্রা বৃত্তি প্রদান করেন। তদনুসারে তিনি ঢাকা নর্ম্মাল স্কুলে প্রবিষ্ট হইলেন। দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে উঠিয়া আর অধ্যয়ন সমাপ্ত করিতে পারিলেন না। তিনি গণিতে অত্যন্ত অপটু ছিলেন। এই কারণে ১ম বার্ষিক শ্রেণীতে বৃত্তি পাইলেন না। সেই মনোকষ্টে এবং অন্যান্য কারণে তিনি বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিয়া বাড়ী চলিয়া আসিলেন। ইতিমধ্যে ভাওয়ালের অন্তর্গত ব্রাহ্মণগ্রামে প্রথম বাঙ্গালা বিদ্যালয় স্থাপিত হইলে রাজা কালীনারায়ণ তাঁহাকে উক্ত স্কুলের হেড পণ্ডিত নিযুক্ত করিয়া পাঠাইলেন।

কয়েক মাস কার্য্য করিবার পর পণ্ডিতি পরিত্যাগ করিয়া ঢাকা মেডিকেল স্কুলে প্রবিষ্ট হইলেন। রাণী সত্যভামা দেবী তাঁহার ব্যয় ভার বহন করিতেন। তারপর অতি অল্প সময় চিকিৎসা শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া শব-ব্যবচ্ছেদের ভয়ে মেডিকেল স্কুল পরিত্যাগ করিলেন।

এইরূপ অসম্পূর্ণ ভাবে, অস্থির গতিতে তাঁহার শিক্ষা-জীবন পরিসমাপ্ত হইল। ইংরেজি শিক্ষার সুযোগ তাঁহার ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে নাই। তিনি ইংরেজি ভাষায় সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ ছিলেন। এই জন্যই তাঁহাকে আমরা একজন খাঁটি বাঙ্গালী কবি রূপে পাইয়াছি। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, ইংরেজি না জানা সত্বেও, তিনি তাঁহার বহু কবিতায় এমন সুসংযত ভাবে অনেক ইংরেজি শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন যে, তাহা পাঠ করিয়া মনে হয় না যে, তিনি ইংরেজি ভাষায় অনভিজ্ঞ ছিলেন।

মেডিকেল স্কুল পরিত্যাগের পর বাড়ী গিয়া কিছু দিন বসিয়া থাকিলেন। ইহার পর তাঁহার কর্ম্ম-জীবনের আরম্ভ হইল। নৈসর্গিক সৌন্দর্য্যের লীলাভূমি, নিবিড় বনানী-সঙ্কুল ভাওয়ালের কবি অতঃপর কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হইলেন।

১২৮৩ সালে ভাওয়ালরাজ কালীনারায়ণ ৺কালীপ্রসন্ন ঘোষ মহাশয়কে তাঁহার প্রধান কর্ম্মচারীর পদে নিযুক্ত করেন। কুমার রাজেন্দ্রনারায়ণ তখন ১৭।১৮ বৎসরের তরুণ যুবক।

১২৮৪ সালে রাজা কালীনারায়ণ তাঁহার চক্ষু চিকিৎসার জন্য কলিকাতা আগমন করেন। তাঁহার অনুপস্থিতির সময় কুমার রাজেন্দ্রনারায়ণের হস্তে রাজ্যভার অর্পণ করা হয়। সেই সময় কুমারের প্রাইভেট্ সেক্রেটারীর পদ শূন্য হইলে কবি গোবিন্দ-চন্দ্র সেই পদে নিযুক্ত হইলেন।

কুমার রাজেন্দ্রনারায়ণ রাজকার্য্যে বিশেষ মনোযোগ দিতেন না। এ বিষয়ে তিনি নিতান্ত উদাসীন ছিলেন। কালীপ্রসন্ন ঘোষের হস্তে সমস্ত রাজকার্য্য অর্পণ করিয়া তিনি নিশ্চিন্ত প্রাণে বিলাসিতার স্রোতে গা ভাসাইয়া দিয়াছিলেন। তখন কালীপ্রসন্ন ঘোষ মহাশয় রাজ্যের সর্ব্বময় কর্ত্তা হইয়া উঠিলেন। তখন ভাওয়ালে ভীষণ দুর্ভিক্ষ। রাজেন্দ্রনারায়ণের অমনোযোগে রাজ্যের আভ্যন্তরিণ অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হইয়া উঠিল এবং সমস্ত ভাওয়াল দ্রুতগতিতে অধঃ পতনের পথে অগ্রসর হইতে লাগিল। এই অধঃপতনের প্রমাণ "প্রজাহিতৈষিণী সভার" অপঘাত মৃত্যু। রাজা কালীনারায়ণের সময় "প্রজাহিতৈষিণী সভা" দেশের মেরুদণ্ড স্বরূপ ছিল। সঙ্গে সঙ্গে জয়দেবপুরে যে একটী মাত্র বিদ্যালয় ছিল, তাহাও বিলুপ্ত হইল।

অশান্তি এবং প্রজার ক্রন্দনে দেশ তখন ভাসিয়া যাইতেছিল। যখন রাজ্যের এই হীনাবস্থা, গোবিন্দচন্দ্র তখন রাজার পার্শ্বচর কর্ম্মচারী।

রাজার অমনোযোগ দর্শন করিয়া দাস-কবি রাজাকে সর্ব্বদাই অনুযোগ দিতে আরম্ভ করিলেন এবং রাজ্য-সংক্রান্ত কার্য্যে তাঁহার নিজেরই পরিদর্শন করা সঙ্গত, এরূপ পরামর্শ দিতে লাগিলেন। কাহারও প্রতি অন্ধ বিশ্বাস করিয়া একটা বিস্তৃত সম্পত্তির ভারার্পণ করা যে বুদ্ধিমানের কার্য্য নহে, তাহা প্রায়ই রাজাকে বলিতেন। ক্রমে ইহার ফল নিতান্ত বিষময় হইয়া পড়িল। কালীপ্রসন্ন ঘোষ মহাশয়ের কাণে এই কথা পৌঁছিলে তিনি দাস কবির প্রতি নিতান্ত বিরূপ হইলেন। এ সম্বন্ধে দাস মহাশয় আমাদিগকে একখানি পত্রে লিখিয়াছিলেন,

"ক্রমে এ কথা কালীপ্রসন্নের কাণে পৌঁছিল। * * * আমাকে কিরূপে রাজার নিকট হইতে তাড়াইয়া তাহার অনুগত ও বাধ্যলোক আমার কার্য্যে নিযুক্ত করিবে, এখন তাহার সেই চেষ্টা হইল। কিন্তু আমার কোন ত্রুটী না পাইলেও অন্য কারণে তাহার অভীষ্ট সিদ্ধ হইল।"

তথাপি তিনি রাজ্য-সংক্রান্ত অনেক বিষয়ে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া প্রজামণ্ডলীর পক্ষ সমর্থন করিতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে জনৈক অপমানিত প্রজার পক্ষ সমর্থন করিয়া অকৃত-কার্য্য হইলে তিনি নিতান্ত ক্ষুব্ধ হৃদয়ে ১২৮৪ সালেই রাজার কার্য্য পরিত্যাগ করিলেন। যেখানে অন্যায়ের পক্ষ সমর্থন হয়, সেখানে আর চাকুরী করিবেন না বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন। সেইদিন হইতে তিনি জয়দেবপুরে আর চাকুরী করেন নাই। তিনি আমা-দিগকে একখানি পত্রে লিখিয়াছিলেন,—

"সেইদিন হইতে জয়দেবপুরের চাকুরী আমার ক্ষান্ত হইল। * * * প্রকারা ন্তরে কালীপ্রসন্ন ঘোষের মনস্কাম পূর্ণ হইল। সে তাহার অনুগত লোক রাজার নিকট আমার কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া দিল।"

রাজা কালীনারায়ণ তাঁহার চক্ষু চিকিৎ-সার পর নানা তীর্থভ্রমণে বহির্গত হইয়া-ছিলেন। অবশেষে প্রত্যাবর্ত্তনের পর ১২৮৫ সালে অকস্মাৎ তাঁহার মৃত্যু হইলে রাজেন্দ্র-নারায়ণ রাজ্যভার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

গোবিন্দচন্দ্র রাজকার্য্য পরিত্যাগ করিয়া

এমন দুর্দ্দশায় পড়িলেন যে, দিনান্তে একবেলা আহারের সংস্থান ছিল না। স্ত্রী কন্যাসহ অতি কষ্টে তিনি দিনপাত করিতে লাগিলেন।

দাস মহাশয় ১৫ বৎসর বয়সে প্রথম দারপরিগ্রহ করেন। এই পত্নীর নাম ছিল সারদাসুন্দরী। সারদার গর্ভে তাঁহার প্রমদা ও মণিকুন্তলা নামে দুইটী কন্যা সন্তান জন্ম গ্রহণ করে। প্রমদা মাত্র এক বৎসর জীবিতা ছিল।

১২৮৫ সালে প্রমদা দাস মহাশয়কে শোকসাগরে ভাসাইয়া অনন্তধামে প্রয়াণ করে। সে সময় দাস কবির অন্য আত্মীয় স্বজন কেহই ছিল না। পিতামহীর মৃত্যুর পর তিনি স্ত্রী কন্যাসহ শ্বশুরালয়ে অবস্থান করিতেন। শ্বশুরালয়ও তাঁহার বাড়ীর অনতিদূরেই অবস্থিত ছিল। তাঁহার শ্বশুরও নিতান্ত দরিদ্র ছিলেন, সুতরাং স্ত্রী কন্যাসহ অতি কষ্টে তিনি দিনপাত করিতেন। এই কারণে কর্ম্মহীন জীবন তাঁহার নিকট নিতান্ত দুঃসহ হইয়া উঠিল। তখন অনন্যোপায় হইয়া অন্ন সংস্থানের নিমিত্ত বিদেশ যাত্রা করাই স্থির করিলেন।

সংকল্প অনুসারে একদা জয়দেবপুর হইতে পদব্রজে রওনা হইয়া পঞ্চমদিনে ময়মনসিংহ পৌঁছিলেন। ১২৮৬ সালের পৌষ মাসে গোবিন্দ দাস প্রথম ময়মনসিংহে গমন করিলেন। তখনও ঢাকা ময়মনসিংহে রেলপথ হয় নাই। একে মানসিক সন্তাপ, তদুপরি অর্দ্ধ অনশন ও দীর্ঘ পর্য্যটনে তিনি একেবারে ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন।

মুক্তাগাছার ভূম্যধিকারী দেবেন্দ্রকিশোর আচার্য্যচৌধুরীর সঙ্গে তিনি জয়দেবপুর থাকিতেই পরিচিত ছিলেন। উক্ত জমিদার তখন ময়মনসিংহে ব্রহ্মপুত্রের তীরে অবস্থান করিতেছিলেন। ময়মনসিংহ পৌঁছিয়া দাস-কবি দেবেন্দ্রকিশোর আচার্য্য চৌধুরীর আতিথ্য গ্রহণ করিয়া কিছুদিন বিশ্রাম করিলেন। তখন ময়মনসিংহে সারস্বত উৎসব হইতেছিল। সেই উৎসবে প্রবন্ধ, কবিতা পাঠ, সঙ্গীত, বক্তৃতা, শিল্প প্রদর্শনী, নাট্যাভিনয় প্রভৃতি অনেক অনুষ্ঠান হইত। প্রথম বৎসর উৎসবে "মহাপ্রস্থান", "মানস-বিকাশ" প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থপ্রণেতা সুকবি পরলোকগত দীনেশচরণ বসু স্বরচিত কবিতার আবৃত্তি করিয়াছিলেন।

এ বৎসর দেবেন্দ্রকিশোর, দাস-কবিকে কবিতা রচনা করিতে অনুরোধ করেন। তদনুসারে তিনি একটী কবিতা রচনা করেন এবং দেবেন্দ্রকিশোর তাহা উক্ত অধিবেশনে আবৃত্তি করেন। যথা সময়ে তাহা স্থানীয় পত্রিকা "ভারতমিহিরে" প্রকাশিত হয়। সে সময় সুসঙ্গ দুর্গাপুরের মহারাজা কমলকৃষ্ণ সিংহের উৎসাহে দুর্গাপুর হইতে "কৌমুদী" ও "আর্য্য প্রদীপ" নামে দুইখানি পত্রিকা প্রকাশিত হইত। "ভারত-মিহিরে" দাস-কবির কবিতা পাঠ করিয়া মহারাজা কমলকৃষ্ণ তাঁহার অনুসন্ধান করেন। তিনি তখন কর্ম্মপ্রার্থী, সুতরাং এই সূত্রে তিনি সুসঙ্গ যাইতে প্রস্তুত হইলেন এবং যথা সময়ে সুসঙ্গ উপস্থিত হইলে মহারাজা কমল কৃষ্ণ তাঁহাকে যথোপযুক্ত অভ্যর্থনা করিলেন। মহারাজা তাঁহার থাকিবার সুবন্দোবস্ত করিয়া দিলেন এবং অল্পদিনের মধ্যেই তাঁহাকে খাজাঞ্চির পদে নিযুক্ত করিলেন।

সুসঙ্গে তিনি মাত্র পাঁচমাস অবস্থান করিয়াছিলেন। অবশেষে অসুস্থ হইয়া মুক্তাগাছার অন্যতম জমিদার ৺কেশবচন্দ্র আচার্য্যের নিকট কার্য্য গ্রহণ করেন। ১২৮৯

সন পর্য্যন্ত তিনি এই কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। অতঃপর জন্মভূমি জয়দেবপুরে চলিয়া আসেন।

এই সময় কবি রাজকৃষ্ণ রায়ের কবিতা-প্রসবিনী পত্রিকা "বীণা" মধুর ঝঙ্কারে বঙ্গ-সাহিত্যকে মুগ্ধ করিতেছিল। গোবিন্দ-চন্দ্রের বহু কবিতা সে সময় "বীণা" পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

অনন্তর কিছুদিনের জন্য ময়মনসিংহ আসিয়া তথাকার এক এনট্রান্স স্কুলের দ্বিতীয় পণ্ডিতের কার্য্য প্রাপ্ত হন। ঐ পদ উঠিয়া গেলে ময়মনসিংহ সাহিত্য-সমিতির লাইব্রেরিয়ান নিযুক্ত হইয়া কিছুদিন অবস্থান করেন। পরে কিছুদিনের জন্য ময়মনসিংহের স্থানীয় কাগজ "চারুবার্ত্তার" কার্য্যাধ্যক্ষতা করিলেন। অবশেষে সেরপুরের বিদ্যোৎসাহী জমিদার হরচন্দ্র চৌধুরী মহাশয়ের প্রাইভেট সেক্রেটারীর পদে নিযুক্ত হইলেন। এখানে ৮।৯ বৎসর চাকুরী করেন।

দাস-কবির শিক্ষা ও কর্ম্মজীবনে একটা আশ্চর্য্য অসম্পূর্ণতার চিহ্ন বিদ্যমান দেখিতে পাওয়া যায়। অদৃষ্টের এই অনিবার্য্য চাঞ্চল্য তাঁহার দুঃখময় জীবনের এক মূলীভূত কারণ।

১২৯২ সাল কবির একটী মহাদুর্ব্বৎসর। এই বৎসর তাঁহার প্রাণসমা প্রেয়সী সারদা-সুন্দরী পরলোক গমন করেন। পত্নীবিয়োগ-বিধুর কবি সে সময় যে কয়েকটী কবিতা রচনা করিয়াছেন, তাহা বঙ্গসাহিত্যে অমূল্য রত্ন।

১২৯৩ সালে তাঁহার অমিয় মধুর গীতি-কাব্য "প্রেম ও ফুল" প্রকাশিত হয়। ১২৯৮ সনে তিনি "কুঙ্কুম" প্রকাশ করেন। বিদেশে চাকুরী করিবার সময় তিনি মাঝে মাঝে জন্মভূমি জয়দেবপুরে আসিতেন। সে সময় তাহার জীবনের শেষ অবলম্বন মণিকুন্তলা জীবিতা আছে। "কুঙ্কুম" রচনার পর একবার জয়দেবপুর আসিয়া এক খণ্ড পুস্তক রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণকে উপহার দিয়াছিলেন। রাজা তাহা পাঠ করিয়া এতদূর মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে, বিশেষভাবে দাস কবিকে দ্বিতীয় পরিণয়ের জন্য অনুরোধ করেন এবং তাঁহার সমস্ত ব্যয়ভার বহন করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। কিন্তু ইতিমধ্যে একটী দুর্ঘটনা ঘটিল। রাজেন্দ্রনারায়ণ অকস্মাৎ একদিন তাঁহার প্রতি নিতান্ত বিরক্ত হইয়া উঠিলেন।

তখন "নবযুগ" নামে কলিকাতা হইতে একখানা সাপ্তাহিক কাগজ প্রকাশিত হইত। সেই কাগজে রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণ এবং তাঁহার ম্যানেজার কালীপ্রসন্ন ঘোষ মহাশয়ের বিরুদ্ধে অতিশয় তীব্র ভাষায় একটী প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। যে কোন কারণেই হউক, রাজার বিশ্বাস জন্মিল যে, গোবিন্দ-চন্দ্রই এই প্রবন্ধের লেখক। সেই সন্দেহের বশীভূত হইয়া রাজা গোবিন্দচন্দ্রকে জয়দেব-পুর পরিত্যাগ করিয়া যাইতে আদেশ করিলেন। ১২৯৮ সনের ফাল্গুন মাসে এই কঠোর রাজাজ্ঞা প্রচারিত হইল। তখন অনন্যোপায় হইয়া দরিদ্র পত্নীহারা কবি প্রিয় জন্মভূমি জয়দেবপুর পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন। এই ভাবে বিধি বিড়ম্বনায় বাঙ্গালার একজন শ্রেষ্ঠ কবি স্বীয় জন্মভূমি হইতে নির্ব্বাসিত হইলেন। ১৩২৪ সালের বৈশাখ সংখ্যা "নব্যভারত" লিখিয়াছিলেন ;—

"কালীপ্রসন্ন "বঙ্গবাসীর" সাহায্যে নিজ দুষ্কৃতি ঢাকিতে সচেষ্ট হইলেন। তিনি গোবিন্দচন্দ্রের প্রতি যে অত্যাচার করিয়া গিয়াছেন, তাহা পড়িলে পাষাণও ফাটিয়া যায়।"

নির্ব্বাসিত হইয়া তিনি কলিকাতা আগমন

করেন এবং প্রত্যেক কাগজের সম্পাদকগণের নিকট নিজের অবস্থার কথা বর্ণনা করিয়া প্রতিকার প্রার্থনা করিয়াছিলেন। এই সময়ে কবির অমৃতময়ী লেখনীর মুখে "নির্ব্বাসিতের আবেদন" কবিতার সৃষ্টি হয়। তাহা পাঠ করিলে চক্ষের জল সম্বরণ করা কঠিন। দেশবাসীগণের প্রতি তাঁহার গভীর বিশ্বাস এই কবিতায় বিদ্যমান দেখিতে পাওয়া যায়। তিনি লিখিয়াছিলেন,—

সংসারে আমার ভাই, যদিও কেহ নাই
তবুত তোমরা আছ দেশবাসীগণ?

কিন্তু কবির এই বিশ্বাস মরীচিকার মত বিলীন হইয়া গেল। দেশবাসীগণ তাঁহার ক্রন্দনে সাড়া দেয় নাই। ইহা জাতীয় কলঙ্ক-কাহিনীর একটী জ্বলন্ত প্রমাণ।

যখন কোন দিকেই কোন প্রতিকার পাইলেন না, তখন তাঁহার প্রতিভা প্রবল বেগে জ্বলিয়া উঠিল। তাঁহার সেই জ্বালা-ময়ী প্রতিভার ফল "মগের মুলুক"। "মগের মুলুক" একখানা বিদ্রূপ রসাত্মক কাব্য। কলিকাতা হইতে প্রকাশিত "প্রকৃতি" পত্রিকায় তাহা মুদ্রিত হয় এবং পরে পুস্তিকা-কারেও ছাপা হইয়াছিল। ১২৯৯ সালে তিনি এই কাব্যখানা রচনা করেন।

এই কাব্যে তিনি ভাওয়ালের অধঃপতন কাহিনী অগ্নিময়ী ভাষায় বর্ণনা করিয়া-ছিলেন। পাপ ও অন্যায়ের প্রতি তীব্র কটাক্ষপাতই সেই কাব্যের প্রাণ। "মগের মুলুক" বঙ্গ সাহিত্যের ইতিহাসে যে কলঙ্ক কাহিনী লেপিয়া দিয়াছে, তাহা মুছিয়া ফেলিতে কাহারও সাধ্য নাই। "মগের মুলুক" প্রকাশিত হইলে ভাওয়ালের ম্যানে-জার কালীপ্রসন্ন ঘোষ মহাশয় "প্রকৃতি" পত্রিকার নামে ঢাকার আদালতে মানহানির মোকর্দ্দমা আনয়ন করেন। অবশেষে নানা কারণে বাধ্য হইয়া সেই মোকর্দ্দমা আপোষে মিটাইয়া ফেলেন।

নির্ব্বাসিত হওয়ার পর তিনি কিছুদিন "নব্যভারত" প্রেসের ম্যানেজর হইয়াছিলেন। অবশেষে মুক্তাগাছার ভূম্যধিকারী মহারাজা সূর্য্যকান্ত আচার্য্যচৌধুরীর ষ্টেটে একটী নায়েবের পদ প্রাপ্ত হইয়া তিনি তাঁহার পূর্ব্বপরিচিত কর্ম্মস্থান ময়মনসিংহ চলিয়া আসিলেন।

১২৯৯ সনের ১লা মাঘ প্রথমা পত্নী সারদা সুন্দরীর মৃত্যুর প্রায় ৭ বৎসর পর দাস কবি বিক্রমপুরের অন্তর্গত ব্রাহ্মণগাঁয়ে দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ করেন। এই বিবাহ তাঁহার গুরু এবং রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণের প্রধান মাতুল মদনমোহন গোস্বামী মহাশয় স্থির করিয়া দিয়াছিলেন।

এই বিবাহের পর তিনি লিখিয়াছিলেন,

"প্রেমদা পদ্মার কূলে, কোমল শেফালি ফুলে,
করিয়া বাসর শয্যা ডাকিছে আমায়।
সারদা চিলাই তীরে, আমকাঠ দিয়ে শিয়ে
আঁচল বিছায়ে ডাকে চিতা বিছানায়।"

সংসারে অবলম্বনহীন হইয়া নিঃসঙ্গ জীবন যাপন করা একান্ত দুরূহ ব্যাপার; এই জন্যই তিনি দ্বিতীয়বার বিবাহ করিয়াছিলেন। দ্বিতীয় পরিণয়ের পরেও প্রথমা পত্নী সারদা-সুন্দরীর প্রেম-স্মৃতি তাঁহার হৃদয়ে একই ভাবে জাগরূক ছিল। যখনই এ প্রসঙ্গে কথা উঠি-য়াছে, তখনই তাঁহার বিদীর্ণ হৃদয়ের দীর্ঘ নিঃশ্বাস অপনা আপনি প্রবাহিত হইত।

কবির দ্বিতীয় পত্নীর নাম প্রেমদা সুন্দরী। প্রেমদার গর্ভে তাঁহার পাঁচ পুত্র ও চারি কন্যা জন্মগ্রহণ করে। তন্মধ্যে বর্ত্তমান মাত্র তিন পুত্র ও দুই কন্যা জীবিতা আছে।

মহারাজা সূর্য্যকান্তের ষ্টেটে তিনি প্রায় ৫।৬ বৎসর চাকুরী করিয়াছেন। জমিদারী কার্য্যে প্রজাপীড়ন করিতে হয় বলিয়া তিনি এই কার্য্যও ছাড়িয়া দিলেন। তদনন্তর মুক্তাগাছার অন্যতম ভূম্যধিকারী দানবীর জগৎকিশোর আচার্য্যচৌধুরীর শরণাগত হইলেন। তিনি দাস-কবিকে তদবধি নিয়মিত ভাবে প্রতিমাসে ২০৲ টাকা করিয়া সাহায্য করিয়া আসিয়াছেন।

রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণের মৃত্যুর পর ১৩০৮ সালে ভাওয়ালের রাণী বিলাসমণি দেবী ৺ কালীপ্রসন্ন ঘোষ মহাশয়ের নামে আদালতে ১০ লক্ষ টাকার দাবীতে এক অভিযোগ আনয়ন করেন। উক্ত অভিযোগে ঘোষ মহাশয়ের নামে যে তুরপনেয় কলঙ্ক আরোপিত হইয়াছিল, তাহা পাঠ করিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। একজন সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিকের পক্ষে এই কলঙ্ক নিতান্ত লজ্জাজনক, সন্দেহ নাই। বহু চেষ্টায় সেই মোকদ্দমা আপোষে মিটিয়া যায় এবং কালীপ্রসন্ন ঘোষ মহাশয় জয়দেবপুর হইতে প্রস্থান করেন। তাঁহার প্রস্থানের পর ভাওয়ালের মৃত রাজকুমারত্রয় (রাজেন্দ্রনারায়ণের পুত্রগণ) দাস-কবির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিয়া পত্র দ্বারা তাঁহাকে তাঁহার প্রিয় জন্মভূমিতে আহ্বান করিয়াছিলেন এবং তিনজনে গোবিন্দচন্দ্রকে মাসিক ৮৲ করিয়া ২৪৲ টাকা বৃত্তি নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু শেষে গভর্ণমেণ্টের ইঙ্গিতে তাহা বন্ধ হয়। তিনি শেষ জীবন অতি কষ্টে যাপন করিয়া গিয়াছেন।

মৃত্যুর কয়েক বৎসর পূর্ব্বে তাহার স্বাস্থ্য অত্যন্ত ভগ্ন হইয়া গিয়াছিল। তথাপি এই ভগ্ন স্বাস্থ্য লইয়া তিনি এই "নব্যভারতে" কত কবিতাই লিখিয়া গিয়াছেন। ১৩১৮ সালের ২৮শে ভাদ্র তিনি একখানি পত্রে তাঁহার ভগ্ন স্বাস্থ্যের কথা আমাদিগকে লিখিয়াছিলেন। তিনি লিখিয়াছিলেন,—

"আমার শরীর আজকাল নিতান্ত খারাপ হইয়াছে। সামান্য একটু মাথা ধরিলেও আমি নিতান্ত কাতর হইয়া পড়ি, যেন উঠিতে পারি না। আগে এমন অসুখ গ্রাহ্যই করিতাম না। আর সর্ব্বদাই আমার অসুখ লাগিয়া আছে। একদিনও স্বাস্থ্য-সুখ ভাগ্যে ঘটে না। শরীর নিতান্ত দুর্ব্বল হইয়াছে, উঠিতে বসিতে যেন হাত পা ভাঙ্গিয়া পড়ে। পুষ্টিকর আহার অভাবে আরও কাতর হইয়া পড়িয়াছি। জয়দেবপুরের কুমারেরা যে মাসিক ২৪৲ টাকা সাহায্য করিতেন, তাহা বন্ধ হইয়াছে। একমাত্র রাজা জগৎকিশোরের সাহায্যে প্রাণে বাঁচিয়া আছি। দুধের সের ।০, ।/০ আনা, মাছ দুষ্প্রাপ্য। ভাত খাইয়া বাঁচিতে পারি না, দুধ মাছ কি করিয়া খাইব! একদিন একটা কবিতা লিখিলে পাঁচদিন মাথা ঘোরে। পুষ্টিকর খাদ্যের অভাবেই আমার এ দুর্দ্দশা হইয়াছে।"

প্রবন্ধ-লেখক ব্রহ্মপ্রবাসে থাকিতে কবির এই পত্রখানি তাহার হস্তগত হয়। তার পর সুদীর্ঘ চারিটী বৎসর অন্তে যখন তাঁহার সঙ্গে আমাদের সাক্ষাৎ ঘটে—তখন দেখিয়া আশ্চর্য্য হইলাম যে, কবির সেই পূর্ব্ব চেহারার বহু পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। তাঁহার দেহ অত্যন্ত জীর্ণ হইয়াছে, কিন্তু সেই হাস্যোজ্জ্বল চক্ষু এবং উন্নত প্রতিভামণ্ডিত ললাটের জ্যোতি যেমন ছিল তেমনই আছে।

আজ তিনি এ জগৎ হইতে অন্তর্হিত হইয়াছেন, কিন্তু তাঁহার কথা থাকিয়া থাকিয়া প্রাণের ভিতর বেদনা জাগাইয়া তুলিতেছে। কত দিন প্রভাতে, সন্ধ্যায়, দ্বিপ্রহরে, নিশীথে তাঁহার সঙ্গসুখ লাভ করিয়াছি, তাহার ইয়ত্তা নাই। আজ সেই বিগত কাহিনীগুলি একে একে মনে জাগিতেছে। কতদিন পদ্মার

তাঁর সন্ধ্যাকালে ভ্রমণে বহির্গত হইয়া তাঁহার সঙ্গে কথোপকথনে এত তন্ময় হইয়া গিয়াছিলাম যে, রাত্রি হইয়াছে তাহা লক্ষ্য করি নাই। আজ তাঁহার বিয়োগে অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছি।

মৃত্যুর ৪ দিন পূর্ব্বে তিনি আমাদিগকে যে পত্রখানা লিখিয়াছিলেন, তাহা পাঠ করিয়া কিছুতেই মনে করিতে পারি নাই যে, এত শীঘ্র তাঁহাকে হারাইতে হইবে।

বিগত ৩০শে সেপ্টেম্বর সোমবার রাত্রি ৫টা ১৫ মিনিটের সময় কবি গোবিন্দচন্দ্র ঢাকা নগরীতে দেহত্যাগ করিয়াছেন। মৃত্যুর সময় তাঁহার দুইটী পুত্র নিকটে উপস্থিত ছিল। যাহাদের আলয়ে তিনি অন্তিম নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়াছেন, শুনা যায় যে, কেহই তাঁহার প্রতি তাদৃশ যত্ন করেন নাই।

তিনি ভাওয়াল ষ্টেটের কতকগুলি জমি পত্তনি লইয়াছিলেন। কিন্তু যথাসময়ে সেই জমির খাজানা না দিতে পারায়, তাঁহার নামে নালিশ হয়। সেই মোকদ্দমার জন্য তিনি মৃত্যুর অল্পদিন পূর্ব্বে অত্যন্ত বিব্রত হইয়াছিলেন। এই উপলক্ষে তাঁহাকে ঢাকা, জয়দেবপুর, ময়মনসিংহ এবং মুক্তাগাছায় কতকদিন বিশেষ ভাবে যাতায়াত করিতে হইয়াছিল। দুশ্চিন্তা, এবং অসময়ে অনুপযুক্ত আহারের দরুণ তাঁহার বৃদ্ধ শরীর ভিতরে ভিতরে জীর্ণ হইয়া পড়িয়াছিল।

মৃত্যুর ৪ দিন পূর্ব্বে তিনি আমাদিগকে লিখিয়াছিলেন,—

"আপনার স্নেহপূর্ণ পত্রখানা পাইয়া নিতান্ত সুখী হইয়াছি। আমার অবস্থার কথা আর কি লিখিব? আজিও বাড়ী যাইতে পারি নাই, কারণ ১লা অক্টোবর নীলামের তারিখ। ঐ তারিখের পর ছাড়া আর যাইবার উপায় নাই। জগদীশ্বর রক্ষা করেন কি না দেখিব। * * * আমি হয়ত পূজায় সময় বাড়ী যাইব। আজ ৬।৭ দিন যাবৎ জ্বর হওয়ায় বড় কষ্ট পাইতেছি। আজও ভাত খাই নাই, এই অবস্থায় কাছারীতে ঘুরি। বাড়ী গিয়া আপনার নিকট যাওয়ার চেষ্টা করিব। আমারও একবার কলিকাতা যাওয়ার বিশেষ আবশ্যক। * * * আমার শরীর বড় ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। সর্ব্বদা বিদেশে থাকিয়া, অনিয়মিত ও অনুপযুক্ত আহারে স্বাস্থ্য একেবারে নষ্ট হইয়া গিয়াছে।"

সাংসারিক নানা যন্ত্রণায় বিরক্ত হইয়া, তিনি সেই যাত্রা ঢাকা গিয়াছিলেন। তাঁহার স্ত্রী বলেন যে, ঢাকা যাওয়ার পূর্ব্বে তিনি তাঁহার দেনা পাওনার কথা তাঁহার স্ত্রীকে বলিয়া গিয়াছিলেন, এবং ইহাও বলিয়াছিলেন যে, তিনি আর দীর্ঘদিন বাঁচিবেন না।

ঢাকার শ্যামপুর শ্মশানে তাঁহার দেহ চিতা-ভস্মে মিশিয়া গিয়াছে। সে সময় ঢাকা সেবাশ্রম হইতে সেবকগণ আসিয়া সাহায্য করিয়াছিলেন। কিন্তু কোন কবি, কি লেখক, কি সাহিত্যিক তাঁহার শ্মশানে উপস্থিত ছিলেন বলিয়া শুনা যায় নাই। দেশবাসীগণের নিকট তিনি পূর্ব্বাপর যে ব্যবহার পাইয়া গিয়াছেন, শেষ দশায়ও দেশবাসীগণ তাঁহার প্রতি সেই ব্যবহারের কিঞ্চিৎ তারতম্য করে নাই। ঢাকায় বহুতর সাহিত্যসেবীর বাস, কিন্তু এই আদরণীয় মৃত কবির প্রতি তাঁহাদের উপেক্ষা কি কলঙ্কের কথা নহে? বিগত বর্ষে ঢাকায় যে সাহিত্য-সম্মিলন হইয়াছিল, তাহাতেও তিনি যথাসময়ে নিমন্ত্রিত হন নাই। কবির একজন স্বগ্রামবাসী সাহিত্যিক ঢাকায় বাস করেন। কবির প্রতি তাঁহার উপেক্ষা আরো মর্ম্মপীড়ক।

তিনি গিয়াছেন, ভগবান তাঁহার আত্মার মঙ্গল বিধান করুন। তাঁহার শোক-দুঃখ-জর্জ্জরিত আত্মা পরপারে শান্তিলাভ করুন।

১২৮৬ সনে কবি লিখিয়াছিলেন,—

"সবাই আমারে করে নাথ ঘৃণা

অনেক সয়েছি, আর ত পারি না,

দেও হে আশ্রয়, প্রাণেশ আমার—"

কবির সেই কাতর প্রার্থনা সুদীর্ঘ চল্লিশ বৎসর পর জগদীশ্বর পূর্ণ করিয়াছেন।

শ্রীহেমচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

মহর্ষি গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

জন্ম—১৮৪৪ খ্রী, ২৬শে জানুয়ারি।

মৃত্যু—১৯১৮, ২রা ডিসেম্বর, ১৬ই অগ্রহায়ণ, সোমবার।

ঋষির সংজ্ঞা এই, যিনি সাংসারিক সুখ ত্যাগ করিয়া জ্ঞানপথে গমন করিয়াছেন। পুরাণ মতে যাঁহা হইতে বিদ্যা, সত্য ও তপঃ ও শ্রুতি, এই সকল সম্যক রূপ নিরূপিত হয়, তিনিই ঋষি। নীতিশাস্ত্র মতে, যিনি পরমার্থে সম্যক দৃষ্টি স্থাপন পূর্ব্বক সর্ব্বতোভাবে পরোপকার করেন, তিনিই ঋষি। ঋষি সপ্তবিধ,—শ্রুতর্ষি, কাণ্ডর্ষি, পরমর্ষি, মহর্ষি, রাজর্ষি, ব্রহ্মর্ষি ও দেবর্ষি।

মহর্ষির সংজ্ঞা এই, বেদান্তাদিতে ঈশ্বরকে মহৎ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যিনি বুদ্ধিবলে বর্দ্ধিত হইয়া, সম্যকরূপে সেই মহত্ব লাভ করেন, তিনিই মহর্ষি।

ব্যাসাদি মুনিগণ এদেশে মহর্ষি নামে আখ্যাত। এ কালে বাঙ্গালার মহর্ষি ছিলেন, দেবেন্দ্রনাথ। আমাদের মতে তাঁহার পার্শ্বেই বসিবার যোগ্য ব্যক্তি, স্যর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। যে সমাজে এবং যে দেশে এ হেন অজাতশত্রু লোকের আবির্ভাব হয়, সেই সমাজ ও সেই দেশ ধন্য। বঙ্গদেশ পরম সৌভাগ্যশালী এই জন্য যে, এদেশে গুরুদাসের ন্যায় নিষ্ঠাবান মহর্ষির অভ্যুদয় হইয়াছিল। আমরা সর্ব্বাগ্রে বিধাতার নাম স্মরণ পূর্ব্বক এই মহাত্মার সংক্ষিপ্ত জীবন-কাহিনী বিবৃত করিতেছি।

স্যর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দে ২৬শে জানুয়ারি নারিকেলডাঙ্গায় জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহাদের আদি নিবাস ২৪ পরগণা-বোড়ুগ্রামে। অতি শৈশবে তাঁহার পিতৃবিয়োগ ঘটে। মাতুলালয়ে বিধবা জননীর স্নেহে বালক গুরুদাস প্রতিপালিত হন। বাল্যে জননীর নিকট তিনি যে সৎশিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন, তাহাই ভবিষ্যৎ জীবনে তাঁহাকে উন্নতির পথে পরিচালিত করিয়াছিল। শৈশবাবধি শিক্ষার দিকে তাঁহার ঐকান্তিক আগ্রহ পরিলক্ষিত হইত। এমন কি, কোন কোন দিন তিনি রাস্তার আলোকে দাঁড়াইয়া পাঠ সমাধা করিতেন। বালক গুরুদাস প্রথমে পুরাতন হেয়ার স্কুলে ভর্ত্তি হন। তখন ঐ বিদ্যালয়ের নাম ছিল কলুটোলা ব্রাঞ্চ স্কুল। এই স্কুল হইতে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা উত্তীর্ণ হইয়া তিনি বৃত্তি লাভ করেন। বৃত্তি পাইয়া উৎসাহী গুরুদাস প্রেসিডেন্সি কলেজে প্রবেশ করেন। ঐ কলেজ হইতেই তিনি এফ-এ ও বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। শেষোক্ত পরীক্ষায় তিনি সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনি গণিতে এম-এ পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়া স্বর্ণপদক প্রাপ্ত

হন। ইহার পর তিনি কিছুদিন প্রেসিডেন্সি কলেজে ও পরে জেনারেল এসেম্ব্লিজ কলেজে গণিতের অধ্যাপনা করিয়াছিলেন। অতঃপর ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে আইন পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়া তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রদত্ত স্বর্ণ পদক লাভ করেন। আইনে উত্তীর্ণ হইয়া যুবক গুরুদাস কলিকাতা হাইকোর্টে ওকালতি করিতে প্রবৃত্ত হন।

এই সময়ে বহরমপুর কলেজে আইন অধ্যাপকের পদ খালি হয়। গুরুদাস বাবু ছয় বৎসর কাল বহরমপুরে ঐ কার্য্য করিয়াছিলেন। তিনি কলেজে আইন পড়াইতেন এবং সঙ্গে সঙ্গে তত্রত্য জেলা কোর্টে ওকালতি করিতেন। ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি সেখান হইতে কলিকাতায় আসিয়া পুনরায় স্বাধীনভাবে হাইকোর্টে ওকালতি ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হন। ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি আইনের অনার্স পরীক্ষায় ও ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে ডি-এল পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ হন। ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ ছাত্রগণকে বিবাহ ও স্ত্রীধন বিষয়ক হিন্দু আইন শিক্ষা দানের তাঁহাকে 'ঠাকুর প্রফেসর' পদে নিয়োগ করেন।

এই সময়ে দেশে শিক্ষা বিস্তারের নিমিত্ত তিনি প্রভূত চেষ্টা করেন। ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে তিনি কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ফেলো শ্রেণীভুক্ত হয়েন। ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্যপদে তিনি প্রতিষ্ঠিত হন। ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল আইনের বিচার কালে তিনি প্রভূত পরিশ্রম করিয়াছিলেন। ১৮৮৯-১৮৯২ অব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চান্সেলার ছিলেন। ১৮৯২ অব্দে পুনঃ ঐ কাজে নিযুক্ত হন। ১৮৮৬ অব্দে মিউনিসিপ্যাল কমিশনার হন। ১৮৮৭ অব্দে প্রেসিডেন্সি ম্যাজিষ্ট্রেটের কার্য্য করেন। ১৮৯৬ হইতে ১৮৮৯ সেণ্ট্রাল টেক্স্টবুক কমিটীর প্রেসিডেণ্ট ছিলেন। ১৯০২ ইউনিভারসিটি কমিসনের সদস্য হন। ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দে জজ মিঃ কানিংহাম অবসর গ্রহণ করিলে গুরুদাস বাবু পাকা জজ বলিয়া পরিগণিত হন। তিনি ষোল বৎসর কাল হাইকোর্টের জজিয়তি করিয়াছিলেন।

বিশ্ব-বিদ্যালয়ের গঠন ও কার্য্যপ্রণালী কি উপায়ে উন্নত হইতে পারে, তৎসম্বন্ধে আলোচনার নিমিত্ত গবর্ণমেণ্ট ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে এক কমিশন নিয়োগ করেন। কমিশনে সদস্যগণের মধ্যে প্রথমে কোন ভারতীয় বিশ্ব-বিদ্যালয়ের প্রতিনিধি স্থান পান নাই। এজন্য চারিদিক হইতে প্রতিবাদ ধ্বনি উঠিতেছে দেখিয়া কর্তৃপক্ষ পরে গুরুদাস বাবুকে কমিশনের সদস্যশ্রেণীভুক্ত করিয়া লয়েন। গুরুদাস বাবু কিন্তু অন্যান্য সদস্যগণের সহিত সকল বিষয়ে একমত হইতে পারেন নাই। তজ্জন্য তিনি কমিশনের প্রদত্ত রিপোর্টের সঙ্গে পৃথক্ অভিমত প্রকাশ করিয়াছিলেন। এ বিষয়ে তাঁহার অনেক অভিমত কর্তৃপক্ষ পরে বিবর্ত্তিত আকারে গ্রহণ করিয়াছেন। তাহাদের মধ্যে কয়েকটী এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে,—(১) কমিশন স্থির করেন যে, কোন কলেজ নামঞ্জুর করা সম্বন্ধে সিণ্ডিকেটের সিদ্ধান্তের উপর সেনেটের কোন কর্তৃত্ব থাকিবে না। গুরুদাস বাবু ইহার প্রতিপক্ষতা করেন। বলা বাহুল্য, বর্ত্তমান কার্য্য ব্যবস্থা তাঁহারই প্রদর্শিত পথে চলিয়াছে। (২) কমিশন সিদ্ধান্ত করেন যে, আর্ট স কলেজসমূহের বেতনের হার বিশ্ব-বিদ্যালয় বাঁধিয়া দিবেন। ইহার বিরুদ্ধে গুরুদাস বাবু বলেন,—"দরিদ্র

সন্তানগণকে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের বাহির করিবার জন্য এরূপ আয়োজন নিতান্ত অন্যায় ও অজ্ঞতামূলক।" (৩) কমিশনের অন্যান্য সদস্যগণ স্থির করেন যে, দ্বিতীয় শ্রেণীর কলেজগুলি হয় উঠাইয়া দেওয়া হউক, নয়ত প্রথম শ্রেণীর কলেজে পরিণত করা হউক। গুরুদাস বাবু এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে যে গবেষণাপূর্ণ অকাট্য যুক্তি পরম্পরা উত্থাপন করেন, তাহা যথার্থই তাঁহার অদ্ভুত মনীষা ও কৃতিত্বের পরিচায়ক। তাঁহারই সপক্ষতা ফলে আজিও বঙ্গের মফস্বলে অনেক দ্বিতীয় শ্রেণীর কলেজ জীবিত রহিয়াছে।

১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দের ২৬শে জানুয়ারি গুরুদাস বাবু হাইকোর্টের জজিয়তি হইতে অবসর গ্রহণ করেন। গুরুদাস বাবু ইচ্ছা করিলে যতদিন ইচ্ছা জজিয়তি করিতে পারিতেন, কিন্তু তিনি ষাট বৎসরের পর আর চাকুরী করা উচিত নহে বলিয়া অবসর লইলেন। ঐ বৎসর গবরমেণ্ট তাঁহাকে স্যর উপাধিদানে সম্মানিত করেন। ১৯০৮ অব্দে পিঁ, এইচ, ডি, উপাধি পান। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, বঙ্গীয় জাতীয় শিক্ষা পরিষৎ, বিজ্ঞান সভা, কলিকাতা গণিত-সমিতি প্রভৃতি স্বদেশী প্রতিষ্ঠানগুলিতে তাঁহার প্রাণের ঐকান্তিক যোগ ছাত্রগণের উপকারার্থ কলিকাতা ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউট স্থাপনে তিনি যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছিলেন। বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সেনেট সভায় বা অন্যান্য বৈঠকে তিনি প্রায় অনুপস্থিত থাকিতেন না। অন্যান্য কতিপয় পুস্তকের মধ্যে বাঙ্গালায় "জ্ঞান ও কর্ম্ম" নামে অতি সুচিন্তিত তাঁহার একখানি পুস্তক আছে।

গুরুদাস বাবু তাঁহার বিধবা পত্নী এবং চারিটী উপযুক্ত পুত্র রাখিয়া গিয়াছেন। তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠ শ্রীযুক্ত হারাণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় রিপণ কলেজের ভূতপূর্ব্ব ভাইস প্রিন্সিপাল-রূপে এবং মধ্যম শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কলিকাতা ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রষ্টের অন্যতম জজ রূপে সাধারণে পরিচিত।

গুরুদাস বাবুর সংক্ষিপ্ত জীবনী এই। বিগত ৫০ বৎসরের বঙ্গের ইতিহাসের প্রতি ঘটনায় তিনি সংযুক্ত, তাঁহার জীবন এবং বঙ্গের উন্নতির জীবন একই। কিন্তু তিনি জজ হওয়ার পর হইতে রাজনীতির আন্দোলনে কখনও যোগ দিতেন না। তাঁহার বিশ্বাস ছিল, রাজার কাজ রাজা করুন, আমাদের কাজ আমরা করি। বিশ্বাস ছিল, পরস্পরের কর্ত্তব্য পরস্পরে পালন করিলেই দেশের উন্নতি হইবে, শুধু আবেদন নিবেদনে কিছুই হইবে না। রাজনীতির সভা ভিন্ন অন্য যে কোন সভায় তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিলেই তিনি তাহাতে উপস্থিত হইতেন। দেশের হিতের জন্য সর্ব্বদা তাঁহার প্রাণ কাঁদিত। এরূপ স্বদেশগত প্রাণ সচরাচর দেখা যায় না।

বঙ্গের উন্নতির ইতিহাস দুই কথায় বিবৃত হইবার নয়। সুতরাং গুরুদাসের সর্ব্ববিধ কার্য্য সংক্ষেপে বিবৃত হইবার নয়। তাঁহার বিস্তৃত জীবনী লিখিত হইলে, সকলে বুঝিতে পারিবেন, তিনি কি উপাদানে গঠিত ছিলেন। সময়ে তাহা নিশ্চয় বিবৃত হইবে।

বহুদিন পূর্ব্বে একদা সন্ধ্যার পর আমরা ৺ত্রৈলোক্যনাথ সান্ন্যাল (চিরঞ্জীব শর্ম্মা) মহাশয়ের হালুলুক্কা ব্যাণ্ডের সহিত মিলিত হইয়া তাঁহার বাড়ীতে গিয়াছিলাম। সান্ন্যাল মহাশয় সদলে প্রমত্ত ভাবে কীর্ত্তন করিতে করিতে যখন তাঁহার বাড়ীতে প্রবেশ করিলেন, তখন বোধ হয় বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সন্ধ্যাহ্নিক করিতেছিলেন। অল্পক্ষণ পরেই তিনি কাষ্ঠপাদুকা-পরিহিত হইয়া সেখানে আগমন করিলেন, গায়ে সামান্য উত্তরীয়। আমরা দেখিলাম, কীর্ত্তন শুনিতে শুনিতে তিনি তন্ময়

হইয়া যাইতেছেন, বৈষ্ণব সাত্ত্বিক ভাবের স্বেদ, পুলক, কম্প, অশ্রু, তদীয় আকৃতিতে ফুটিতেছে—অচলা ভক্তিতে তিনি গদগদচিত্ত হইয়া কীর্ত্তন শুনিতেছেন। কীর্ত্তনান্তে তিনি দশ টাকার একখানি নোট সান্যাল মহাশয়ের হস্তে প্রদান করিয়া বলিলেন, এইরূপ পবিত্র কাজে এই অর্থ ব্যয় করিবেন। তাঁহার ঐকান্তিকতা, নিষ্ঠা, ভক্তির পরিচয় পাইয়া আমরা ধন্য হইয়া বাড়ীতে ফিরিলাম। সে দিনের চিত্র জীবনে কখনও ভুলিতে পারি নাই।

আর একদিন ৺চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের মধ্যম কন্যার বিবাহোপলক্ষে নব্যভারত-কার্য্যালয়ে তাঁহার চরণ-ধূলি দিয়াছিলেন। অসবর্ণ-ব্রাহ্ম-বিবাহে তাঁহার এরূপ সহানুভূতি দেখিয়া আমরা মুগ্ধ হইয়াছিলাম।

আর একদিন চণ্ডীচরণের আকস্মিক মৃত্যু সংবাদ আমরা তাঁহার নিকট প্রেরণ করিয়াছিলাম। যিনি সংবাদ লইয়া গিয়াছিলেন, তাঁহার হস্তে বিপন্ন পরিবারের সাহায্যার্থ তিনি দশটী টাকা দিয়াছিলেন। কি সহানুভূতি!

এরূপ দান তিনি যে কত করিয়াছেন, তাহার হিসাব নাই। আমরা যখনই কোন লোককে তাঁহার নিকট প্রেরণ করিয়াছি, কেহই প্রত্যাবৃত্ত হয় নাই, সকলেই কিছু কিছু পাইয়াছিলেন।

এদেশে মহারাণী স্বর্ণময়ী, বিদ্যাসাগর এবং তারক প্রামাণিকের দ্বারস্থ হইয়া যেমন কেহ কখনও প্রত্যাবৃত্ত হইত না, বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের দ্বারস্থ হইয়াও, সেইরূপ, কেহ কখনও প্রত্যাবৃত্ত হইত না। তিনি বিপন্ন এবং দুঃখী গরিবের মা বাপ ছিলেন।

তিনি স্বদেশানুরাগে যেন শিশিরকুমার ঘোষ, আইন-অভিজ্ঞতায় রাসবিহারী ঘোষ, প্রতিভায় আনন্দমোহন বসু, কর্ম্মশীলতায় সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বুদ্ধিতে মনোমোহন ঘোষ এবং উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, দরিদ্রপ্রেমে, চাকরিত্যাগে ও মাতৃভক্তিতে বিদ্যাসাগর, দানে মহারাণী স্বর্ণময়ী, বিশ্বাসে কেশবচন্দ্র এবং রামকৃষ্ণ পরমহংস, কৃতিত্বে আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, বিনয় ও সৌজন্যে রামতনু লাহিড়ী, বিচক্ষণতায় রামমোহন, তিনি একাধারে বঙ্গের সমবেত শক্তিতে অধিষ্ঠিত ছিলেন। গুরুদাসকে স্মরণ করিলে, এই সকল মহাত্মাকেই স্মরণ হয়। তিনি বর্ণাশ্রমী নিষ্ঠাবান হিন্দু ছিলেন, কিন্তু নির্ম্মুক্ত এবং অনাসক্ত সন্ন্যাস ধর্ম্ম তাঁহার অপরিজ্ঞাত ছিল না। তিনি কর্ম্মশীল যোগী ছিলেন, কিন্তু নির্ব্বাণ মুক্তি তাঁহার অনভিজ্ঞাত ছিল না। তিনি আচার-নিরত সাধক ছিলেন, কিন্তু দল বা গণ্ডির তিনি অতীত ছিলেন, অসাম্প্রদায়িক সার্ব্বভৌমিকত্বে তাঁহার সাধনার আসন প্রতিষ্ঠিত ছিল। এ কালের ধার্ম্মিকদিগের ন্যায় পরস্পরের নিন্দা প্রচারে বা রক্ত-মাংস-চর্ব্বণে কেহ তাঁহাকে কখনও ব্যাপৃত হইতে দেখে নাই। হিন্দু মুসলমান, খ্রীষ্টান ব্রাহ্ম, সকলের সহিতই যেন অঙ্গাঙ্গী ভাবে তিনি যুক্ত ছিলেন। তিনি নিজত্ব বিসর্জ্জন দিতেন না, অন্যের বিশেষত্বও খর্ব্ব করিতেন না। তিনি অনাবিল পবিত্রতার সাধনায় তৎপর থাকায়, সকল পবিত্রচেতাই তাঁহার অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন। সকল হিন্দুর সার হিন্দুত্বের চরম সাধক তাঁহাতে সকলের সকল বিশেষত্ব যেন কেন্দ্রীভূত হইয়াছিল। তিনি এদেশের সর্ব্বধর্ম্ম-সমন্বয়ের মূর্ত্তীভূত কারণরূপে হিন্দুত্বের শিরোভূষণ ছিলেন। এরূপ হিন্দুত্ব আজ কালকার দিনে এদেশে বড়ই দুর্লভ হইয়াছে। গুরুদাসের আবির্ভাবে হিন্দুধর্ম্ম এদেশে জাগ্রত ধর্ম্মে পরিণত হইয়াছে।

আধুনিক কালে, ধর্ম্ম এদেশে বহিরঙ্গ সাধনায় পরিণত হইয়াছে। বহিরঙ্গ সাধনায় তৎপর না হইলে এদেশে ধার্ম্মিক নামে অভিহিত হওয়া যায় না। কত যোগী ঋষিকে জানি, তাঁহারা কেবল বহিরঙ্গ সাধনায় সিদ্ধি লাভ করিয়া এদেশের কত শত শত এম-এ, বি-এ, বি-এলকে দলভুক্ত করিতেছেন? সাধক হইলেই বুজরুকি করিতে হইবে—অলৌকিক কিছু দেখাইতে হইবে, এদেশের বিশ্বাস। ধর্ম্মটা দিন দিনই জটিল হইতে জটিলতর হইতেছে। জিজ্ঞাসা কর, কে ধার্ম্মিক? উত্তর পাইবে,

জটাজুট-গৈরিকধারী অমুক গিরি, বা অমুক বাবা, বা অমুক স্বামী। ধার্ম্মিকের লক্ষণ কি, জিজ্ঞাসা কর, উত্তর পাইবে, অমুক রোগ আরোগ্য করিতে পারেন, অমুক নদীর উপর দিয়া যাইতে পারেন, অমুক ভবিষ্যৎ বক্তা, অমুক কত ভেল্কি দেখাইতে পারেন। প্রাচীন কালের সাত্ত্বিকতার-লক্ষণ থাকুক বা না থাকুক, জিতেন্দ্রিয়ত্ব লাভ হইয়া থাকুক বা না থাকুক, সংযম এবং অনাসক্তি উপার্জ্জিত হইয়া থাকুক, বা না থাকুক, তিলক-মালা বা গৈরিক জটাজুটধারী বা ভস্মাচ্ছাদিত হইলেই এ কালে লোকেরা ধার্ম্মিক বলিয়া পরিচিত হইয়া থাকেন। গুরুদাস এহেন ধার্ম্মিকতাকে সর্ব্বপ্রযত্নে পরিত্যাগ করিতেন, এবং নিষ্কাম ব্রতধারী হইয়া, নির্ব্বিকল্প সাধনার পথে সর্ব্বপ্রযত্নে শনৈঃ শনৈঃ অগ্রসর হইতেন। তিনি কখনও গৈরিক বা মালাতিলকধারী হন নাই, কিন্তু মহা কৈবল্য সাধনায় মহা সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। তাঁহাকে দেখিলেই মনে হইত, তিনি ইন্দ্রিয়গ্রাম হইতে চিরবিদায় গ্রহণ করিয়া, এবং রিপুসংগ্রামে জয়ী হইয়া মহা যোগধ্যানে আরূঢ় হইয়াছেন। মাধুর্য্য তাঁহার চেহারায় ফুটিয়া বাহির হইত, চখে মুখে কথাবার্ত্তায় চলন ফেরনে শুধু মধু বর্ষিত হইত। তাঁহার চাহনিতে পূত ভাব, বদনে ভক্তির গদ গদ ভাব, সর্ব্বাঙ্গে আনন্দের পুলক দেখিলে মনে হইত, তিনি সংসারকে জয় করিয়া, অচ্যুতত্ব লাভ করিয়াছেন। তিনি আজীবন অজাত-শত্রু ছিলেন। তিনি শিষ্য জুটাইতে চেষ্টা করিলে অসংখ্য শিষ্য জুটিত, কিন্তু তাহা তদীয় জীবনের কলঙ্ক বিশেষ ছিল। আপনি সাধনার নিগূঢ় রাজ্যে চলিয়া গেলেন, কাহাকেও সাথের সাথী করিলেন না। একাকী আগমন, একাকী তিরোধান; তাঁহার পশ্চাতে পড়িয়া রহিল—অক্ষয় সাধন-পূত মহর্ষিজনোচিত চরিত্র। এরূপ নিষ্কাম জীবন, এদেশে, শ্রীচৈতন্যের পর আর হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। তিনি ন্যায়ে যে শ্রীরামচন্দ্র, বুদ্ধিতে বৃহস্পতি, অনাসক্তি ও নির্ব্বাণে বুদ্ধ, প্রেমে শ্রীচৈতন্য পাণ্ডিত্যে ভাস্করাচার্য্য, মহা সাধনায় তিনি ব্যাস-বাল্মীকি। অথবা তিনি যে কি ছিলেন, তাহা ব্যাখ্যা করিতে পারি, আমাদের এমন শক্তি বা ভাষাজ্ঞান নাই। এরূপ ধর্ম্মানুষ্ঠান করিতে করিতে সজ্ঞানে মৃত্যু অতি অল্প লোকের মধ্যেই দেখা যায়। * তিনি অত্যুচ্চ নির্ব্বিকল্প সাধনার রাজ্যে মহর্ষি নামে আখ্যাত হইয়াছেন।

* "When the fatal disease with which Sir Gurudas was attacked, took a serious turn, he realised that his end was near and signified his wish to be taken to his house on the banks of the Ganges. It was during this period, he called his four sons and told them in the minutest details all that should be done from the moment he would die till the performance of his Sradh ceremony. He gave up taking any food for five or six days before his death and lived upon drops of the sacred water of the Ganges. A few hours before his death he asked his eldest son to read a chapter from the Bhagabat Gita, the constant companion and solace of his life. When it was finished he suddenly said, "Cover up my eyes." The attendants thought that the gas light might have hurt his eyes and they therefore put it out. But he insisted on having his eyes covered up. When the attendants covered his eyes, he said thrice in a loud voice, "This is the last,—'*Ei Shesh*'" and then chanted the holy Gayatri Mantras. They were his last words and the great soul passed away."—*Amrita Bazar Patrika.*

তাঁহার গৌরবে বঙ্গ ধন্য, তাঁহার মহিমায় ভারত, তাঁহার প্রভাবে পৃথিবী গৌরবান্বিত। আজ নির্ভয়ে সকলে গাও জয় মহর্ষি গুরুদাসের জয়।

প্রাপ্তগ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

১৬। নরদেব শিবচন্দ্র দেব ও তৎ সহধর্ম্মিণীর আদর্শ জীবনালেখ্য। শ্রীঅবিনাশচন্দ্র ঘোষ, এম-এ, বি-এল কর্ত্তৃক সঙ্কলিত, মূল্য ২৷৷০ টাকা।

যেমন স্যর গুরুদাস, তেমনি এ দেশের আধুনিক যুগের ঋষি শিবচন্দ্র দেব। শিবচন্দ্র দেব বঙ্গের উন্নতির যুগের অন্যতম নেতা ছিলেন। তাঁহার জীবন তাঁহার সমপাঠীদের জীবনের অভিব্যক্তি। কিরূপ মহানুভব জীবন-সংঘের দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিলেন, পাঠক দেখুন—

"(১) হরচন্দ্র ঘোষ (জন্ম ১৮০৮—মৃত্যু ১৮৬৮ খৃঃ অঃ) যেমন কৃতবিদ্য, তেমনি সচ্চরিত্র ছিলেন; দেশীয়দের মধ্যে ইনিই সর্ব্বপ্রথম কলিকাতার পুলিশ ম্যাজিষ্ট্রেটের পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন; ইনি পঞ্চদশ বৎসর কলিকাতা ছোট আদালতের জজ ছিলেন। ডিরোজিওর ভক্ত হইয়াও, ইনি নিষ্ঠাবান্ হিন্দু ছিলেন।

(২) রসিককৃষ্ণ মল্লিক—হিন্দুকলেজের একজন সর্ব্বোৎকৃষ্ট ছাত্র ছিলেন; ইনি প্রথম বয়সে প্রচলিত হিন্দুধর্ম্মের ঘোর বিদ্বেষী ছিলেন এবং কিয়ৎকালের জন্য "জ্ঞানান্বেষণ" নামে একখানি ইংরাজি সাময়িক পত্রিকা সম্পাদন করেন; শিবচন্দ্রের ন্যায়, ইনিও একজন সুযোগ্য ডেপুটি কালেক্টার বলিয়া খ্যাত হইয়াছিলেন।

(৩) কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় (জন্ম ১৮১৩—মৃত্যু ১৮৮৫ খৃঃ অঃ) কুড়ি বৎসর বয়সে খৃষ্টধর্ম্ম অবলম্বন করেন; বহুবৎসর বিশপস্ কলেজে অধ্যাপক ছিলেন এবং কলিকাতার লর্ড বিশপের চ্যাপ্লেন নিযুক্ত হইয়াছিলেন; গ্রীক, লাটিন, সংস্কৃত প্রভৃতি একাদশটি ভাষা জানিতেন; হিন্দু দর্শন শাস্ত্র ও প্রত্নতত্ত্ব বিষয়ক কয়েকখানি পাণ্ডিত্য ও গবেষণাপূর্ণ পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন; কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে সম্মান-সূচক "ডি এল্," উপাধি পাইয়াছিলেন।

(৪) রামগোপাল ঘোষ (জন্ম ১৮১৫—মৃত্যু ১৮৬৮ খৃঃ অঃ) প্রসিদ্ধ বাগ্মী ছিলেন এবং বাণিজ্য ও বিদ্যাবুদ্ধি দ্বারা ইউরোপীয় বণিক্ সমাজে বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন; রাজনৈতিক আন্দোলনে ইনি আমাদের একজন প্রথম পথপ্রদর্শক; গবর্ণমেণ্টও ইঁহাকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা করিতেন এবং ক্রমান্বয়ে শিক্ষাসমিতির (Council of Education) ও বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্য নিযুক্ত করিয়াছিলেন। ইনি প্রথম বয়সে, ডিরোজিওর প্রভাবে, হিন্দু আচার ব্যবহারে বিশিষ্টরূপে অনাস্থা দেখাইয়াছিলেন।

(৫) রাধানাথ শিকদার (জন্ম ১৮১৩—মৃত্যু ১৮৭০ খৃষ্টাব্দ) গণিতশাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন এবং ভারতবর্ষীয় গ্রেট্ ট্রিগনমেট্রিক্যাল জরিপ (Great Trigonometrical Survey) বিভাগে বহুবৎসর বিশেষ সম্মান ও দক্ষতার সহিত কর্ম্ম করিয়াছিলেন। ইনি কর্ণেল (সার জর্জ) এভারেষ্টের বিশেষ প্রিয়পাত্র ছিলেন; আমরা শিবচন্দ্রের মুখে শুনিয়াছি যে, উভয়ে (সাহেব ও শিকদার) গভীর নিশীথে, এক তাম্বুতে বসিয়া অতি দুরূহ গাণিতিক তত্ত্বের আলোচনা করিতেন। ইংরাজী ১৮৫৪ সালে, ইঁহারই সংযোগিতায় স্বর্গীয় প্যারীচাঁদ মিত্র, বঙ্গমহিলাগণের পাঠার্থ, "মাসিক পত্রিকা" প্রচার করিতে প্রবৃত্ত হন। ইঁহার এক খেয়াল ছিল যে, গোমাংসভোজী না হইলে আমরা উন্নতি লাভ করিতে পারিব না।

(৬) রাজা দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় (জন্ম ১৮১৪—মৃত্যু ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দ) সিপাহী বিদ্রোহের সময়ে গবর্ণমেণ্টকে সাহায্য করিয়াছিলেন বলিয়া লর্ড ক্যানিং ইঁহাকে অযোধ্যার জনৈক বিদ্রোহী ভূস্বামীর বাজেয়াপ্ত ভূমি-সম্পত্তি দান করেন এবং

ইহার দ্বাদশ বৎসর পরে, লোকহিতৈষিতা ও স্বদেশপ্রিয়তার পুরস্কারস্বরূপ, গবর্ণমেণ্ট ইহাকে রাজোপাধি দ্বারা ভূষিত করেন।

(৭) রামতনু লাহিড়ী (জন্ম ১৮১৩—মৃত্যু ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দ) আদর্শ চরিত্রগুণে ও শিক্ষা-নৈপুণ্যে "বঙ্গের আর্ণোল্ড" বলিয়া খ্যাত হইয়াছিলেন; ইহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে।

(৮) প্যারিচাঁদ মিত্র (জন্ম ১৮১৪—মৃত্যু ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দ) বঙ্গীয় উপন্যাস সাহিত্যের আদি পুস্তক "আলালের ঘরের দুলালে"র রচয়িতা; স্ত্রী-শিক্ষার জন্য বিশেষ ভাবে সম্পাদিত সাময়িক পত্রিকারও ইনিই প্রথম প্রবর্ত্তক—ইহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি; ইনি "ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন", "বেঙ্গল সোস্তাল সাইয়েন্স এসোসিয়েশন", "পশুদিগের প্রতি অত্যাচার নিবারিণী সভা" প্রভৃতি বিবিধ সভা স্থাপনের একজন প্রধান উদ্যোগী ছিলেন এবং সাধারণের হিতকর নানাপ্রকার অনুষ্ঠানে যোগ দিয়াছিলেন। ইনি একসময়ে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য ছিলেন।

(৯) হরিমোহন সেন—বেঙ্গল ব্যাঙ্কের দেওয়ান রামকমল সেন মহাশয়ের জ্যেষ্ঠপুত্র; পিতার মৃত্যুর পর, ইনি ১৮৪৪ হইতে ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত উক্ত পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন এবং কিয়ৎকালের জন্য গবর্ণমেণ্ট ট্রেজারির দেওয়ানিও করিয়াছিলেন; পরিশেষে, ইনি জয়পুরাধিপতি মহারাজাধিরাজ রামসিংহের প্রধান মন্ত্রীর পদ প্রাপ্ত হইয়া মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত অতীব দক্ষতার সহিত উক্তপদ অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। জয়পুরে বাঙ্গালির প্রতিপত্তি ইহার আমলে আরম্ভ হইয়া অদ্যাবধি চলিয়া আসিতেছে। শিবচন্দ্র, তাঁহার সংক্ষিপ্ত আত্মজীবনীতে লিখিয়াছেন—"বাবু হরিমোহন সেন আমার একজন ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন; তিনি আমার অনেক উপকার করিয়াছিলেন, এজন্য আমি তাঁহার নিকট ঋণী। যখন আমরা কলেজে পড়িতাম, তখন হরিমোহন ও আমি, উভয়ে মিলিয়া, আরব্য উপন্যাসের কিয়দংশের বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করিয়াছিলাম।"

পরে তাঁহার দাম্পত্য-জীবন কত উন্নত ও পবিত্র, দেখুন—

"শিবচন্দ্রের দাম্পত্য জীবনের কথা অধিক আর কি বলিব? পঁয়ষট্টি বৎসরের মধ্যে স্বামী ও স্ত্রীর এক দিনের তরেও পরস্পরের মধ্যে কথান্তর বা মনান্তর উপস্থিত হয় নাই, এ কথা শুনিলে সহজে বিশ্বাস হয় না। কিন্তু যে সকল কারণে এই অদৃষ্টপূর্ব্ব ফল ফলিয়াছিল, তাহা বিবৃত হইলে ইহাতে বিস্ময়ের বিষয় কিছুই থাকিবে না। শিবচন্দ্রের দাম্পত্য জীবন যে নিরবচ্ছিন্ন সুখে অতিবাহিত হইয়াছিল, তাঁহার অসাধারণ চরিত্রবলই তাহার মুখ্য কারণ। আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি যে, প্রথম যৌবনেও তিনি তৎকালসুলভ রঙ্গরসে মত্ত না হইয়া অসীম অধ্যবসায় ও সংযম সহকারে তাঁহার বালিকা স্ত্রীকে শিক্ষাদান করিয়া সম্পূর্ণরূপে নিজের মনের মত করিয়া লইয়াছিলেন।"

তৎপরে যে সকল ব্রাহ্মসমাজের বন্ধুগণের আত্মীয়তা-সূত্রে বদ্ধ ছিলেন, তাঁহাদের নাম ২১৯ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত হইয়াছে; যথা—

"তন্মধ্যে যাঁহারা শিবচন্দ্রের বিশেষ পরিচিত ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে কয়েক জনের নাম নিম্নে উল্লেখ করিলাম:—

৺আনন্দমোহন বসু, ৺উমেশচন্দ্র দত্ত, ৺বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী, ৺দুর্গামোহন দাস, ৺ভুবনমোহন দাস, ৺ডাক্তার মোহিনী মোহন বসু, ৺ভগবান চন্দ্র বসু, ৺দ্বারকানাথ গাঙ্গুলী, ৺গুরুচরণ মহলানবিশ, ৺রজনীনাথ রায়, বাবু নবদ্বীপ চন্দ্র দাস, ডাক্তার প্রসন্নকুমার রায়, ডাক্তার প্রফুল্লচন্দ্র রায়, ৺নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, ৺রামকুমার বিদ্যারত্ন, ৺নবীনচন্দ্র রায়, ৺কেদারনাথ রায়, ৺কালীনাথ দত্ত, বাবু যদুনাথ চক্রবর্ত্তী, বাবু শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়, বাবু দেবীপ্রসন্ন রায় চৌধুরী।"

শিবচন্দ্রের এই জীবন-চরিত বাঙ্গলা ভাষার গৌরব। তিনি বাঙ্গালীর গৌরব ছিলেন। এই পুস্তকখানি বাঙ্গালা ভাষার বিশেষ গৌরব। এরূপ পুস্তক যে কোন দেশের সাহিত্যকে গৌরবান্বিত করিতে পারে। আমরা পুস্তকখানি পড়িয়া যারপরনাই উপকৃত হইলাম।

বঙ্গসাহিত্যে প্যারীচাঁদ।*

অর্দ্ধ শতাব্দীর মধ্যে বাঙ্গালা সাহিত্যের যেরূপ বিপুল উন্নতি সাধিত হইয়াছে, পৃথিবীর অন্য কোন সভ্য দেশের সাহিত্য এই অল্প সময়ের মধ্যে সেরূপ উন্নতি লাভে সমর্থ হয় নাই। পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে বাঙ্গালা সাহিত্যের অবস্থা কিরূপ ছিল, এবং এক্ষণে উহা কিরূপ দাঁড়াইয়াছে, তাহা ধীর মনে পর্য্যালোচনা করিলে হৃদয় যুগপৎ বিস্ময় ও আনন্দে অভিভূত হইয়া পড়ে। বঙ্গ ভাষার ও বঙ্গ সাহিত্যের বিগত পঞ্চাশ বৎসরের ক্রম-বিকাশ ও উন্নতির ইতিহাস সহৃদয় ও স্বদেশানুরাগী ব্যক্তিগণের পক্ষে বড়ই তৃপ্তিজনক ও আশাপ্রদ। বঙ্গভূমির যে সকল প্রতিভাশালী সুসন্তানের সাধনা প্রভাবে আমাদের জাতীয় সাহিত্যের প্রাণ প্রতিষ্ঠিত ও জাতীয় জীবনের ভিত্তি সংস্থাপিত হইয়াছিল, মহাত্মা প্যারীচাঁদ তাঁহাদের মধ্যে একজন। ইঁহার জন্মভূমি ও বিশাল কার্য্যক্ষেত্র কলিকাতায় হইলেও ইনি এই হুগলি জেলার অন্তর্গত পানিসেওলা গ্রামের সুপ্রসিদ্ধ মিত্র বংশসম্ভূত। ইঁহার পিতামহ স্বর্গীয় গঙ্গাধর মিত্র কলিকাতায় আসিয়া নিমতলা ষ্ট্রীটে বাস করেন। ইঁহার পিতৃদেব স্বনাম-প্রসিদ্ধ স্বর্গীয় রামনারায়ণ মিত্র এক সময় কলিকাতার সমাজে বিশেষ সম্মান ও প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। বঙ্গজননীর সুসন্তান স্বদেশ-প্রেমিক নির্ভীক কর্ত্তব্যপরায়ণ, কলিকাতা হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব সুদক্ষ বিচারপতি, আমাদের পরম শ্রদ্ধাস্পদ মাননীয় শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র মহাশয় উল্লিখিত মিত্র বংশের অপর এক শাখা গৌরবের সহিত অলঙ্কৃত করিয়াছেন।

প্যারীচাঁদ যখন মাতৃভাষার পরিচর্য্যা ও অঙ্গ-সৌষ্ঠব সাধনের জন্য লেখনী ধারণ করিয়াছিলেন, তখন উহার বড়ই হীনাবস্থা ছিল।

তৎকালে বঙ্গদেশে দুইটী সম্পূর্ণ পৃথক ভাষা প্রচলিত ছিল। একটী কথোপকথনের ভাষা বা চলিত ভাষা, অপরটী প্রবন্ধাদি লিখিবার ভাষা বা সাধু ভাষা। তৎকালে বাঙ্গালা গদ্যের অবস্থা নিতান্ত দীনভাবাপন্ন ছিল এবং পদ্য গ্রন্থ রচনায় সংস্কৃতমূলক শ্রুতি-কঠোর ও নীরস শব্দ বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হইত। কি গদ্য, কি পদ্য, কোন গ্রন্থ বা প্রবন্ধ সে সময় সহজে সাধারণের বোধগম্য হইত না। সে সময় পাশ্চাত্য শিক্ষার স্রোত বঙ্গ দেশের একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত তরতর বেগে প্রবাহিত হইতেছিল। ইংরাজী শিক্ষার নবীন আলোকে দেশের অজ্ঞানান্ধকার দিন দিন ধীরে ধীরে বিলুপ্ত হইতেছিল। দেশের ধনশালী ও মধ্যবিত্ত ব্যক্তিগণ এবং অনেক দরিদ্র পরিবার ইংরাজী শিক্ষার একান্ত পক্ষপাতী হইয়া উঠিয়াছিলেন। ইংরাজী ভাষায় যাঁহারা সুশিক্ষিত ছিলেন, তাঁহাদের অধিকাংশের সহিত বাঙ্গালা ভাষার কোনরূপ সম্পর্ক ছিল না, এ কথা বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই বাঙ্গালা ভাষাকে একটী ভাষা বলিয়াই গণ্য করিতেন না। তৎকালে দু'দশ জন লোক যদি বা দুই একখানি কদর্য্য প্রণালীতে লিখিত বাঙ্গালা গ্রন্থ পাঠ করিতেন, কিন্তু বাঙ্গালায় গ্রন্থ রচনার জন্য তাঁহাদের মনে কোনরূপ অনুরাগ বা আগ্রহ জন্মিত

---

* চুঁচুড়া সাহিত্য-সম্মিলনীতে পঠিত।

না। আবর্জ্জনা ও জঞ্জাল-পরিপূর্ণ অপরিচ্ছন্ন দুর্গন্ধময় কূপোদকের ন্যায় বঙ্গভাষা পীড়াদায়ক ও অরুচিকর বোধে অধিকাংশ পাশ্চাত্য শিক্ষাভিমানী ব্যক্তিগণ কর্তৃক অনাদরে পরিত্যক্ত হইত।

বঙ্গভূমির ক্ষণজন্মা সুসন্তান মহাত্মা রামমোহন রায়-প্রমুখ কতিপয় স্বদেশানুরাগী ব্যক্তির যত্নে বাঙ্গালা ভাষার কিছু কিছু উৎকর্ষ সাধিত হইলেও তৎকালে জনসাধারণের রুচি ও প্রবৃত্তির কোন বিশেষ পরিবর্ত্তন হয় নাই। কিন্তু এ কথা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, উক্ত মহাত্মা ও তাঁহার সহাশয়গণের যত্নে বঙ্গভাষা ধীরে ধীরে উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে আরম্ভ করিয়াছিল। তাঁহার পরলোকগমনের পর পণ্ডিতাগ্রগণ্য মহাপ্রাণ বিদ্যাসাগর মহাশয় ও সুপণ্ডিত অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয় বঙ্গ ভাষার পরিমার্জ্জন ও বঙ্গ সাহিত্যের উৎকর্ষ ও সম্পদ বর্দ্ধনে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জ্ঞান-গর্ভ পুস্তক নিচয়ের পরিচয় দান অনাবশ্যক। চিন্তাশীল সুলেখক অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয়ের সুনাম শীঘ্রই চারিদিকে প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছিল। এই সময় কলিকাতার আদি ব্রাহ্মসমাজ হইতে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হয়। তিনি একাদিক্রমে দ্বাদশ বর্ষকাল উহার পরিচালন-কার্য্যে ব্রতী ছিলেন। তাঁহার লেখনী-প্রসূত গম্ভীর চিন্তাপূর্ণ বিবিধ দার্শনিক ও ধর্ম্মনৈতিক প্রবন্ধে প্রতি মাসে উহার কলেবর শোভিত হইত। বিদ্যাসাগর মহাশয় অধিকতর পরিমার্জ্জিত ও কথঞ্চিৎ প্রাঞ্জল ভাষার গ্রন্থ রচনা করিয়া পাঠকগণের রুচি ও প্রকৃতি ক্রমশঃ উন্নতির পথে লইয়া গিয়াছিলেন। কিন্তু তখনও বঙ্গসাহিত্যের পরিপুষ্টি সাধনের কোন প্রকৃষ্ট পন্থা আবিষ্কৃত হয় নাই। তীক্ষ্ণবুদ্ধি-সম্পন্ন সহৃদয় প্যারীচাঁদ তাঁহার সমসাময়িক বঙ্গভাষায় রচিত গ্রন্থ নিচয়ের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়াছিলেন। তিনি ইংরাজী ভাষায় সুপণ্ডিত হইলেও সংস্কৃত ভাষায় তাঁহার যথেষ্ট অধিকার ছিল। তিনি দীর্ঘকাল তদানীন্তন মেট্‌কাফ্‌ হলের সুপ্রসিদ্ধ পুস্তকালয়ের অবৈতনিক সম্পাদকীয় কার্য্যভার গ্রহণে উক্ত বিশাল পুস্তকালয়ের নানা বিভাগের রাশি রাশি জ্ঞান-গর্ভ পুস্তক পাঠে নিযুক্ত ছিলেন এবং মধ্যে মধ্যে কলিকাতা রিভিউ, হিন্দু পেট্রিয়ট, বেঙ্গল হরকরা প্রভৃতি মাসিক পত্রিকা ও সংবাদ পত্রে এবং ইংলণ্ডের কোন কোন প্রসিদ্ধ সাময়িক পত্রিকায় বিস্তর সুযুক্তিপূর্ণ সারগর্ভ প্রবন্ধ লিখিয়া যশস্বী হইয়াছিলেন। তৎপ্রণীত কতিপয় ইংরাজী গ্রন্থ হইতে পরিচয় পাওয়া যায় যে, ইংরাজী ভাষায় তাঁহার বিশেষ অধিকার ছিল। তিনি ইচ্ছা করিলে তাঁহার সমসাময়িক কোন কোন ইংরাজী ভাষায় সুশিক্ষিত ব্যক্তির ন্যায় আজীবন ইংরাজী ভাষায় পরিচর্য্যা এবং উক্ত ভাষায় বিস্তর গ্রন্থ প্রণয়নে ইংরাজী সাহিত্যের পুষ্টিসাধনে যশঃ ও সম্মান লাভ করিতে পারিতেন। কিন্তু স্বদেশানুরাগী প্যারীচাঁদ সেরূপ প্রশংসা লাভের জন্য বিন্দুমাত্র ব্যাকুল হন নাই। মাতৃভাষার দুর্গতি ও বঙ্গসাহিত্যের দীনতা উপলব্ধি করিয়া তাঁহার হৃদয় আকুল হইয়াছিল। তিনি সংস্কৃত ভাষাকে দেবভাষা জ্ঞানে আদর করিতেন এবং দেব ভাষায় লিখিত বিবিধ অমূল্য ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠে তিনি বিপুল আনন্দ উপভোগ করিতেন। বিবিধ শাস্ত্রীয় গ্রন্থ, বিশেষতঃ হিন্দুর পরম উপভোগ্য

উপনিষদাদি যত্ন সহকারে পাঠ করিয়া তাঁহার অন্তরে মাতৃ ভাষায় ঐ সকল গ্রন্থের সরল সত্য প্রচারের প্রবল বাসনা জন্মিয়াছিল। স্ত্রীশিক্ষার প্রতি তাঁহার একান্ত অনুরাগ ও উৎসাহ ছিল। তাঁহার সময়ে বঙ্গদেশে স্ত্রীশিক্ষা প্রচারের উপযোগী বিদ্যালয় বা পাঠশালা ছিল না। তিনি তাঁহার সহধর্ম্মিণীকে প্রকৃত প্রস্তাবে তাঁহার শিক্ষা, চিন্তা, সংযম ও সাধনার প্রিয় সহচরী করিবার জন্য সর্ব্বান্তঃকরণে যত্নবান এবং তৎসঙ্গে সঙ্গে সাধারণ ভাবে স্ত্রীশিক্ষা প্রচলনে বিশেষ উৎসাহশীল ছিলেন। তাঁহার সময়ে বাঙ্গালা ভাষায় প্রবন্ধ রচনা বা গ্রন্থ প্রণয়ন কিছুমাত্র সম্মান বা গৌরবের বিষয় না হইলেও তাঁহার পত্নীর শিক্ষার সহায়তা দান এবং তাঁহার স্বদেশবাসী জনসাধারণের জ্ঞানোন্নতির জন্য তিনি সর্ব্বান্তঃকরণে মাতৃভাষার পরিচর্য্যায় বঙ্গসাহিত্যের উৎকর্ষ সাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। বাঙ্গালীর পক্ষে বাঙ্গালা ভাষার পরিচর্য্যা যে কত গৌরবের বিষয়, তাহা তিনি প্রাণ ভরিয়া উপলব্ধি করিয়াছিলেন। এ জন্য তিনি চিরপ্রচলিত প্রথা পরিহার পূর্ব্বক অভিনব পন্থাবলম্বনে বঙ্গসাহিত্যে নূতন প্রাণ, নবীন আলোক ও অভিনব মধুরতা ঢালিয়া দিয়া উহার প্রকৃত উন্নতির পথ প্রসারণে হৃদয়ের সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করিয়াছিলেন।

কিছু কাল ধরিয়া তিনি মনে মনে চিন্তা করিয়াছিলেন, কি উপায়ে তিনি তৎকালীন বাঙ্গালা ভাষা সাধারণের বোধগম্য ও চিত্তাকর্ষক করিয়া উহার পরিপুষ্ট সাধনে সক্ষম হইবেন, এবং কি প্রণালীতে সহজ ভাষায় বিবিধ উপদেশপূর্ণ গ্রন্থাদি লিখিত হইলে তৎসমস্ত গ্রন্থ অন্তঃপুরবাসিনী অশিক্ষিতা মহিলাগণের প্রীতিপ্রদ ও উন্নতির পথপ্রদর্শক হইতে পারে। তাঁহার কতিপয় বন্ধুর সহিত তিনি তদ্বিষয়ের আলোচনা করিয়া তাঁহাদের অভিপ্রায় অনুসারে ১৮৫৪ খ্রীঃ অব্দে তাঁহার প্রিয় বন্ধু রাধানাথ সিকদারের সহিত মিলিত হইয়া তৎকালের উপযোগী সহজ চলিত বাঙ্গালা ভাষায় লিখিত নানা বিষয়ক প্রবন্ধপূর্ণ একখানি মাসিক পত্র প্রচারে ব্রতী হইলেন। "মাসিক পত্রিকা" এই নামে উহা মাসে মাসে নিয়মিতরূপে প্রকাশিত হইতে লাগিল। তিনি স্বহস্তে উহার সম্পাদকীয় কার্য্যভার গ্রহণ পূর্ব্বক উহাতে নিয়মিতরূপে লিখিতে আরম্ভ করিলেন। বঙ্গদেশের উহাই সর্ব্বপ্রথম বাঙ্গালা মাসিক পত্রিকা। তিনি পূর্ব্ব হইতেই জানিতেন যে, তাঁহার অবলম্বিত ভাষা সংস্কৃত ভাষাভিমানী সংস্কৃতমূলক সাধুভাষা-প্রিয় পণ্ডিত ও লেখকগণের অনুরাগ আকর্ষণে সমর্থ হইবে না; পক্ষান্তরে তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই তাহার সুতীব্র সমালোচনা করিবেন। তিনি তাঁহার আন্তরিক সঙ্কল্প হইতে বিন্দুমাত্র বিচলিত না হইয়া উল্লিখিত "মাসিক পত্রিকা"র শিরোভাগে প্রতি মাসে নিম্নলিখিত বিজ্ঞাপন বা কৈফিয়ৎ দিতে লাগিলেন:—

"এই পত্রিকা সাধারণের বিশেষতঃ স্ত্রীলোকদিগের জন্য লিখিত হইতেছে। যে ভাষায় আমাদের সচরাচর কথাবার্ত্তা হয়, তাহাতেই প্রস্তাব সকলের রচনা হইবে। বিজ্ঞ পণ্ডিতেরা পড়িতে চান, পড়িবেন, কিন্তু তাঁহারা মনে রাখিবেন, তাঁহাদের জন্য এই সকল প্রবন্ধ লিখিত হইতেছে না।"

আলালের ঘরের দুলাল।—উক্ত মাসিক পত্রিকার প্রথম খণ্ড হইতেই উহাতে তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ "আলালের ঘরের দুলাল" প্রতিমাসে

নিয়মিতরূপে প্রকাশিত হইতে লাগিল। অতি অল্প দিনের মধ্যেই ইংরাজী-শিক্ষিত ব্যক্তিগণের মধ্যে বিশেষতঃ তাঁহাদের গৃহ-লক্ষ্মীগণের মধ্যে অনেকের নিকট উক্ত পত্রিকার আদর বাড়িতে আরম্ভ হইল। মাসিক পত্র প্রকাশের কিছুকাল পরেই প্যারীচাঁদ স্বীয় নামের পরিবর্ত্তে "টেকচাঁদ ঠাকুর" এই কল্পিত নাম দিয়া "আলালের ঘরের দুলাল" গ্রন্থাকারে মুদ্রিত ও প্রকাশিত করিলেন। অমানিশার প্রগাঢ় অন্ধকারের পর উষার মধুর আলোক যেমন পথভ্রান্ত পথিককে আশ্বস্ত, আনন্দিত ও উৎসাহিত করে, মহাত্মা প্যারীচাঁদ প্রবর্ত্তিত তরল, আবেগময়ী এবং অভিনব ভঙ্গিমাশালিনী ভাষা তেমনই অনেক পথ-ভ্রান্ত, সন্দেহাকুল সাহিত্য-সেবিগণের সম্মুখে নূতন আলোক, নূতন মাধুরী ও নূতন মদিরা আনিয়া তাঁহাদের গন্তব্য-পথ অবধারণে বিশেষ সহায়তা দান করিল। ইহার পূর্ব্বে সংস্কৃতা-ভিমানী পণ্ডিতগণের অবলম্বিত কর্কশ ও শ্রুতিকঠোর ভাষা এবং মহাত্মা বিদ্যাসাগর মহাশয়-প্রমুখ সুপ্রসিদ্ধ লেখকগণের অপেক্ষা-কৃত অধিকতর পরিমার্জ্জিত ভাষা লইয়া বিভিন্ন প্রকৃতির ও ভিন্ন ভিন্ন রুচির পাঠক, লেখক ও সমালোচকগণের মধ্যে বিষম মতভেদ ও বিবাদ বিসম্বাদ চলিয়াছিল। কত তীব্র সমালোচনা, কত বিদ্রূপ ও শ্লেষপূর্ণ উপহাস অবাধে স্রোতের ন্যায় চলিয়াছিল, কিন্তু কোন পক্ষই কোন একটী সন্তোষজনক সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারেন নাই। এমন সময় "আলালের ঘরের দুলালে"র আড়ম্বর-বিহীন, শ্রুতি-মধুর সহজ চলিত ভাষা অবরোধ-মুক্তা, স্বচ্ছন্দ-বিহারিণী তরঙ্গিণীর ন্যায় তরতর প্রবাহে প্রবাহিত হইয়া বঙ্গ সাহিত্যের অভিনব শোভা ও সম্পদ সম্বর্দ্ধন করিতেছে দেখিয়া একদল ইংরাজী শিক্ষিত সহৃদয় লোক উহার বিশেষ পক্ষপাতী হইয়া উঠিলেন। পক্ষান্তরে প্রবীণ সংস্কৃতাভিমানী সুবিজ্ঞ পণ্ডিতের দল উহা গাম্ভীর্য্য-বিহীন, তরল ও গ্রাম্য ভাষার মিশ্রণজনিত অসার বলিয়া উহার দোষ কীর্ত্তনে বদ্ধপরিকর হইলেন। প্রাচীন তন্ত্রের সহিত নব্যতন্ত্রের ঘোরতর মতভেদ ও বিবাদ জন্মিতে আরম্ভ হইল। দেখিতে দেখিতে প্যারীচাঁদ-প্রবর্ত্তিত নূতন ভঙ্গিমা বিশিষ্ট সহজ ভাষার প্রভাব বঙ্গসাহিত্যে নব প্রাণ ঢালিয়া দিয়া চারিদিকে উহার গৌরব ও সমাদর বর্দ্ধন করিল। তাঁহার প্রদর্শিত পথ অবলম্বনে বঙ্গ-সাহিত্যানুরাগী ব্যক্তিগণের মধ্যে কেহ কেহ বিবিধ প্রবন্ধ ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রন্থ রচনায় প্রবৃত্ত হইলেন। বঙ্গদেশের চারিদিকে নূতন ছাঁচের ও নূতন ভঙ্গিমার আবেগময়ী ভাষার প্রভাব ও প্রতিপত্তি ক্রমশঃ বিস্তৃত হইতে লাগিল এবং অল্প সময়ের মধ্যেই উহা বঙ্গ-সাহিত্যের পরিপুষ্টি সাধন ও গৌরব শ্রী সম্পাদনের পক্ষে এক নূতন যুগ আনয়ন করিল।

প্যারীচাঁদ-প্রবর্ত্তিত সহজ ও শ্রুতি-মধুর ভাষার প্রসার ও প্রতিপত্তি দেখিয়া কতিপয় সংস্কৃতাভিমানী পণ্ডিত তাঁহার প্রতি তীব্র সমালোচনার বাণ বর্ষণে প্রবৃত্ত হইলেন। এই সকল সমালোচকগণের মধ্যে 'সোম-প্রকাশে'র খ্যাতনামা সুবিজ্ঞ সম্পাদক স্বর্গীয় দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ ও স্বর্গীয় পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয়দ্বয়ের নাম সর্ব্বাগ্রগণ্য। ন্যায়রত্ন মহাশয় তৎপ্রণীত "বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য" শীর্ষক প্রবন্ধে প্যারীচাঁদের প্রবর্ত্তিত ভাষার "আলালী ভাষা"

নাম দিয়া উঁহার বিস্তৃতরূপ সমালোচনা করিয়াছিলেন। নিম্নে উঁহার কিঞ্চিৎ নমুনা প্রদত্ত হইল :—

"আলালের ঘরের দুলাল" বল, "হুতুম পেঁচার নকসা" বল, আর "মৃণালিনী"ই বল—পত্নী বা পাঁচজন বয়স্তের সহিত পাঠ করিয়া আমোদ অনুভব করিতে পারি—কিন্তু পিতা পুত্রে একত্র বসিয়া অসঙ্কুচিত মুখে কখনই ও সকল পড়িতে পারি না। বর্ণনীয় বিষয়ের লজ্জাজনকতা উহা পড়িতে না পারার কারণ নহে,—ঐ ভাষাতে কেমন এক ভঙ্গী আছে, যাহা গুরুজন সমক্ষে উচ্চারণ করিতেও লজ্জা বোধ হয়।"......... "আলালী ভাষা সম্প্রদায় বিশেষের বিশেষ মনোরঞ্জিকা হইলেও উহা সর্ব্ববিধ পাঠকের পক্ষে উপযুক্ত নহে। যদি তাহা না হইল তাহা হইলে জিজ্ঞাস্য হইতেছে যে, ঐরূপ ভাষায় কোন গ্রন্থ রচনা করা উচিত কি না? আমাদের বোধে অবশ্য উচিত। যেমন ফলারে বসিয়া অনবরত মিঠাই মণ্ডা খাইলে জিহ্বা একরূপ বিকৃত হইয়া যায়—মধ্যে মধ্যে আদার কুচি ও কুমড়ার খাট্টা মুখে না দিলে সে বিকৃতির নিবারণ হয় না, সেইরূপ কেবল বিদ্যাসাগরী রচনা শ্রবণে কর্ণের যে একরূপ ভাব জন্মে, তাহার পরিবর্ত্তন করণার্থ মধ্যে মধ্যে অপরবিধ রচনা পাঠ করাও আবশ্যক।"

কোন কোন সমালোচক আলালী ভাষার প্রতি নির্দ্দয় ভাবে আক্রমণ করিতে প্রবৃত্ত হইয়া পরক্ষণেই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন যে, উহা নাগপাশ-বদ্ধ সঙ্কীর্ণ বঙ্গভাষাকে নির্দ্দিষ্ট সীমাবদ্ধ গণ্ডীর বাহিরে আনিয়া, বঙ্গ-সাহিত্যের পরিপুষ্টি সাধনের এক অভিনব প্রণালী প্রবর্ত্তন করিয়াছে। বস্তুতঃ প্যারী-চাঁদের আলালী ভাষায় যিনি যতই দোষ বাহির করুন না কেন, তাঁহাকে এ কথা মুক্তকণ্ঠে অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, প্যারীচাঁদ প্রকৃত ভক্ত সাধকের ন্যায় সর্ব্বপ্রথমে মাতৃভাষাকে সুদৃঢ় ও সুরক্ষিত গণ্ডীর বাহিরে আনিয়া উহার কঠিন অবরোধ মোচন পূর্ব্বক উহাতে নূতন প্রাণ, নূতন তেজ, নবীন মাধুরী ও অপূর্ব্ব আবেগ ঢালিয়া দিয়া জাতীয় সাহিত্য ও তৎসঙ্গে সঙ্গে জাতীয় জীবনের বিশেষ কল্যাণ সাধন করিয়াছেন। সেই যোগরত স্বদেশ-প্রেমিক মহাজ্ঞানী বিশেষরূপে বুঝিয়াছিলেন যে, প্রাতঃস্মরণীয় আর্য্য সন্তানগণের প্রতিভা ও সুকৃতির বিশাল ক্ষেত্র সুজলা সুফলা বঙ্গভূমি আহারে, বিহারে, আচারে, ব্যবহারে, আমোদে, প্রমোদে, শিক্ষায়, দীক্ষায়, সামাজিক ও ধর্ম্মনৈতিক আলোচনায় সকল বিষয়ে যেরূপ বিজাতীয় ভাবে অনুপ্রাণিত ও স্বেচ্ছাচারানুমোদিত কদর্য্য ও জঘন্য রীতি, নীতি ও প্রথায় পরিপ্লাবিত হইতে আরম্ভ করিয়াছে, অচিরে তাহার পরিবর্ত্তন ও সংশোধন না হইলে বঙ্গ-জননীর শোচনীয় দুরবস্থা উপস্থিত হইবে। তিনি ইহাও জানিতেন যে, চলিত ভাষায়, সহজ কথায়, সরল ভাবে লিখিত হাস্য ও করুণ রস মিশ্রিত শ্লেষ-গর্ভ প্রবন্ধে জনসাধারণের চিত্ত অধিক পরিমাণে আকৃষ্ট হইবে এবং উক্তরূপ প্রবন্ধের বহুল প্রচারে বঙ্গ-সাহিত্যের যথেষ্ট উন্নতি ও তৎসঙ্গে বঙ্গভূমির বিস্তর কল্যাণ সাধিত হইবে। এই বিশ্বাস প্রভাবে তিনি তাঁহার সমালোচকবৃন্দের আক্রমণ অগ্রাহ্য করিয়া তাঁহার সাধনার পথে নির্ভয়ে অগ্রসর হইয়াছিলেন।

তিনি যে উদ্দেশ্যের বশবর্ত্তী হইয়া

"আলালের ঘরের দুলাল" প্রণয়ন করিয়াছিলেন, তাহা সর্ব্বথা সুসিদ্ধ হইয়াছিল। অতি অল্পকালের মধ্যেই উঁহার যশঃ-সৌরভ বঙ্গদেশের নানা স্থানে বিস্তৃত হইয়া পড়িল। যে দেশে বর্ত্তমান সময়ে বঙ্গ-সাহিত্যের বিশেষ আদর হইলেও বিদ্যালয়ের নির্দ্দিষ্ট পাঠ্যপুস্তক ভিন্ন, বিস্তর উৎকৃষ্ট ও উপাদেয় গ্রন্থ অনাদরে উপেক্ষিত হয়, সেই দেশে এক সময়ে "আলালের ঘরের দুলালে"র বিশেষ আদর ও প্রতিপত্তি হইয়াছিল। তৎকালে এ দেশে যে সকল ভাগ্যবান পুরুষ 'সুরসিক' বলিয়া পরিচিত ছিলেন, যে সকল শিক্ষিত লোক অন্তঃপুরে পুরমহিলাগণের সহিত সুমিষ্ট আলাপনে সম্মান লাভ করিতেন, ছাত্রদিগের সভায়, বরের বাসরে, বৈঠকখানার খোস গল্পে, ও অন্যান্য প্রকাশ্য সম্মিলন স্থলে যাঁহারা রসাত্মক মধুমাখা কথার অবতারণা করিতে ভাল বাসিতেন, শুনিয়াছি, এক সময় 'আলালের ঘরের দুলাল' তাঁহাদেরও প্রধানতম উপভোগ্য ছিল। তদ্ভিন্ন সাধারণ পাঠক ও পাঠিকাবর্গের মধ্যে অনেকেই এই পুস্তকখানি একান্ত অনুরাগ সহকারে পাঠ করিতে ভালবাসিতেন।

"আলালের ঘরের দুলালে"র প্রতিপত্তি বিস্তৃত হইবার পর বঙ্গদেশে দীর্ঘকাল দুই প্রকার ভাষার প্রভাব বিদ্যমান ছিল। একটী বিদ্যাসাগর মহাশয়-প্রমুখ ইংরাজী ও সংস্কৃত উভয়বিধ ভাষাবিদ্ লেখকগণের পরিমার্জ্জিত সাধু ভাষা; অপরটী প্যারীচাঁদ-প্রমুখ লেখকগণের অবলম্বিত চলিত কথা-মিশ্রিত সরল ভাষা। ভবিষ্যতে কোন্ ভাষা শিক্ষিত-সমাজে জয়লাভ করিবে, তৎসম্বন্ধে অনেক চিন্তাশীল ব্যক্তির অন্তর দীর্ঘকাল গভীর সন্দেহে আন্দোলিত হইয়াছিল। দূরদর্শী চিন্তাশীল সুশিক্ষিত ব্যক্তিগণ ধীরভাবে পর্য্যালোচনা করিয়া স্থির করিয়াছিলেন যে, উক্ত দুই প্রকার ছাঁচের ভাষার সম্মিলনে একটী সুমধুর মিশ্রভাষার উৎপত্তি হইবে, পরে তাহাই বঙ্গ-সাহিত্যে বিশেষ আধিপত্য-বিস্তার ও প্রতিপত্তি লাভ করিবে। এই মিশ্রভাষার সাহায্যে বঙ্গ জননীর স্বর্ণপ্রসূ সুসন্তান মহাত্মা বঙ্কিমচন্দ্র বঙ্গ-সাহিত্যের পুষ্টিসাধনে বঙ্গভূমির মুখোজ্জ্বল করিয়াছেন।

তিনিই সর্ব্বপ্রথমে ভক্ত শিষ্যের ন্যায় প্যারীচাঁদ-প্রদর্শিত পথ অবলম্বনে তৎপ্রবর্ত্তিত ভাষা অধিকতর পরিমাণে মার্জ্জিত সুকোমল, শ্রুতিমধুর ও মনোরঞ্জকর করিয়া বঙ্গ-সাহিত্যকে বিবিধ রত্নালঙ্কারে বিভূষিত ও উহার বিপুল গৌরব দেশদেশান্তরে পরিব্যাপ্ত করিয়া অমরতা লাভ করিয়াছেন। সহৃদয় বঙ্কিমচন্দ্র আলালী ভাষা ও তাহার ভঙ্গিমার প্রতি অনুরাগ-পূর্ণ দৃষ্টি রাখিয়া প্যারীচাঁদের দৃষ্টান্ত অবলম্বনে "বঙ্গদর্শন" নামক সুবিখ্যাত মাসিক পত্রিকার অবতারণায় প্রতি মাসে নিয়মিতরূপে তাহাতে বিবিধ সুপাঠ্য প্রবন্ধ ও সুন্দর সুন্দর উপন্যাস লিখিয়া বঙ্গ-সাহিত্যের পরিচর্য্যা ও গৌরব বর্দ্ধনে নিযুক্ত হইলে উহার উন্নতির পথ প্রসারিত হইয়া পড়িল। দেখিতে দেখিতে মাতৃভাষা বিপুল শক্তি ও সমৃদ্ধিশালিনী হইলেন।

বর্ত্তমান যুগের বঙ্গসাহিত্যের মহাশক্তিশালী সম্রাট সহৃদয় বঙ্কিমচন্দ্র স্বয়ং মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছিলেন যে, উক্ত সাহিত্যের সেবা ও উৎকর্ষ সাধনে মহাত্মা প্যারীচাঁদ তাঁহাকে পথ প্রদর্শন পূর্ব্বক যথেষ্ট উৎসাহ দান করিয়াছিলেন। তিনি স্বয়ং শক্তিশালী মহাপুরুষ ছিলেন, সুতরাং গুণের প্রকৃত আদর করিতে কখনই কুণ্ঠিত হইতেন না।

তিনি মহাত্মা প্যারীচাঁদের ভক্ত মন্ত্রশিষ্যরূপে তাঁহার সর্ব্বতোমুখী প্রতিভা ও ক্ষমতার প্রতি সম্মান প্রদর্শনে বিশেষ আনন্দ অনুভব করিতেন। তিনি সরল হৃদয়ে অকপটে বলিয়াছিলেন যে, মহাত্মা প্যারীচাঁদ "আলালের ঘরের দুলাল" প্রণয়নে বঙ্গসাহিত্যের মধ্যে যে আলোক আনয়ন করিয়াছিলেন, তাহার সুবিমল জ্যোতি তাঁহাকে বঙ্গভাষায় উপন্যাস লিখিতে অনুপ্রাণিত ও প্রবর্ত্তিত করিয়াছিল। বিগত ১৩০১ সালের আষাঢ় মাসের ভারতীতে "বঙ্কিমচন্দ্র" শীর্ষক প্রবন্ধে এ বিষয়ের কিঞ্চিৎ উল্লেখ আছে।

কেবলমাত্র বাঙ্গালী সমাজে নহে, ভারতবাসী ইঙ্গবঙ্গ সমাজেও 'আলালের ঘরের দুলালে'র বিশেষ আদর ও প্রতিপত্তি হইয়াছিল। যে সকল ইংরেজ সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া এ দেশে রাজকার্য্যে নিযুক্ত হইতেন, বাঙ্গালা ভাষায় অধিকার লাভের জন্য দীর্ঘকাল ধরিয়া উক্ত পুস্তক তাঁহাদের প্রিয় পাঠ্য পুস্তকরূপে সমাদৃত হইয়াছিল। তাঁহারা তদানীন্তন পণ্ডিতগণের কঠিন ও দুর্ব্বোধ ভাষা পরিহার পূর্ব্বক আবেগময়ী আলালী ভাষার মধুরতা পূর্ণ মাত্রায় উপভোগ করিতে ভালবাসিতেন। অনেক ইংরেজ বণিকও যত্নের সহিত উহা পাঠ করিতেন। বঙ্গদেশের প্রিয় সুহৃদ সুপ্রসিদ্ধ কাউয়েল সাহেব একবার ইংরাজী ভাষায় উহার অনুবাদ করিতে যত্নবান ও অগ্রসর হইয়া তাঁহার অভীষ্ট সহজসাধ্য নহে বিবেচনায়, সে চেষ্টায় নিবৃত্ত হইয়াছিলেন। উক্ত উদ্যমের দীর্ঘকাল পরে সহৃদয় অলিভেন্ট সাহেব উক্ত গ্রন্থের আদ্যন্ত ইংরাজী ভাষায় সুন্দররূপে অনুবাদ পূর্ব্বক একখানি উপাদেয় ইংরাজী গ্রন্থ প্রণয়নে বিশেষ প্রশংসাভাজন হইয়াছেন। আমি "আলালের ঘরের দুলাল" সম্বন্ধে বিস্তৃতরূপে অনেক কথা বলিলাম; উহার একমাত্র কারণ এই যে, এই পুস্তকখানিই ঘটনা বৈচিত্র্যে ও ভাষার অভিনব ভঙ্গিমা ও মাধুরীতে গ্রন্থকর্ত্তার সর্ব্বপ্রধান পুস্তক—উহাই প্রকৃত প্রস্তাবে বঙ্গ-সাহিত্যের বিকাশ ও উন্নতির পথে নবযুগ আনয়ন করিয়া গ্রন্থকর্ত্তার মস্তকে চিরস্থায়ী যশের মুকুট পরাইতে সমর্থ হইয়াছে—উহাই অন্ধকারে আলোক বর্ত্তিকার ন্যায় পথ-প্রদর্শন পূর্ব্বক অনেক প্রতিভাশালী সহৃদয় বঙ্গসন্তানকে বঙ্গসাহিত্যের পরিচর্য্যায় প্রাণ মন উৎসর্গ করিতে প্রবৃত্ত করিয়াছে।

"আলালের ঘরের দুলাল" শেষ করিয়া প্যারীচাঁদ ক্রমান্বয়ে "মদ খাওয়া বড় দায়", "রামারঞ্জিকা", "কৃষিপাঠ", "গীতাঙ্কুর", "যৎকিঞ্চিৎ", "অভেদী", "এতদ্দেশীয় স্ত্রীলোকগণের পূর্ব্বাবস্থা", "ডেভিড হেয়ারের জীবন চরিত", "আধ্যাত্মিকা", ও "বামাতোষিণী" প্রভৃতি কতিপয় উপাদেয় গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। এই সকল গ্রন্থের মধ্যে কতকগুলি শ্লেষাত্মক ও হাস্যরসপূর্ণ হইলেও বিশেষ শিক্ষাপ্রদ। এক একখানি গ্রন্থ এক একটী মহৎ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য লিখিত হইয়াছিল। কি সামাজিক, কি ধর্ম্মনৈতিক, যে বিষয়ে তিনি যখন যে পুস্তক রচনা করিয়াছেন, তাহাতেই তিনি লোক-চরিত্র, সামাজিক রীতিনীতি, দেশীয় আচার ব্যবহার ও সনাতন উদার ধর্ম্মনীতি বিষয়ক গভীর জ্ঞান, সহৃদয়তা ও কর্ত্তব্যপরায়ণতার যথেষ্ট পরিচয় দান করিয়াছেন। তাঁহার এক একখানি গ্রন্থের বিস্তৃত সমালোচনা করিতে গেলে প্রবন্ধ সুদীর্ঘ হইয়া পড়িবে। এস্থলে তাহা অনাবশ্যক—সংক্ষেপে ইহা উল্লেখ করিলেই

যথেষ্ট হইবে যে, তাঁহার প্রত্যেক গ্রন্থ নীতি-শিক্ষাদান বা ধর্ম্ম সাধনের সহায়তা প্রদর্শন উদ্দেশ্যেই লিখিত হইয়াছিল। তাঁহার "যৎ-কিঞ্চিৎ", "অভেদী" ও "আধ্যাত্মিকা"র প্রতি পত্রে গভীর ধর্ম্মভাব নিহিত রহিয়াছে। তাঁহার "এতদ্দেশীয় স্ত্রীলোকদিগের পূর্ব্বাবস্থা" ও "রামারঞ্জিকা" পাঠে জানিতে পারা যায়, বঙ্গ-ভূমির নারী জাতির জ্ঞানোন্নতি ও হৃদয়ের উৎকর্ষ সাধন জন্য তাঁহার কিরূপ আন্তরিক যত্ন ও উৎসাহ ছিল। নারীজাতির প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় ভক্তি ছিল—তিনি সৎকুল-সম্ভূতা ললনা মাত্রকেই মাতৃদেবী অথবা সাক্ষাৎ ভগবতীর ন্যায় মান্য করিতেন। তিনি তাঁহার স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ক একখানি গ্রন্থের ভূমিকায় এইরূপ লিখিয়াছিলেন—"………স্ত্রীলোক যে অবস্থাতেই থাকুন—বিবাহিতা কিম্বা অবিবাহিতা, সধবা কিম্বা বিধবা, সম্পদে কিম্বা বিপদে, সকল অবস্থাতেই তাঁহার আত্মা ঈশ্বরের সহিত সংযুক্ত না হইলে, তাঁহার ঐহিক বা পারত্রিক কোন প্রকার উন্নতি বা মঙ্গল কখনই সাধিত হইতে পারে না। এই সত্যের প্রতি মনোনিবেশ করিবার জন্য, আমি আপনাদিগকে আহ্বান করিতেছি—আপনাদের চিত্ত যেন সর্ব্বক্ষণ ঈশ্বরে নিমগ্ন থাকে।"

তিনি উক্ত পুস্তকে সুস্পষ্টভাবে এই মহা-শিক্ষা দান করিয়াছেন যে, সুমাতাই সু-পুত্রের জননী—মাতার হৃদয় ধর্ম্ম-ভাবে পরিপূর্ণ ও মন জ্ঞানের আলোকে উদ্ভাসিত না হইলে পুত্র কখনই মহাজ্ঞানী ও ধর্ম্মানুরাগী হইতে পারে না। এই জন্যই স্ত্রীশিক্ষা এতই প্রয়োজনীয়।

তাঁহার "যৎকিঞ্চিৎ" নামক ক্ষুদ্র গ্রন্থখানির পত্রে পত্রে, ছত্রে ছত্রে তাঁহার ধর্ম্মভাব-পূর্ণ উদার হৃদয়ের সুন্দর প্রতিবিম্ব প্রতিফলিত দেখিতে পাওয়া যায়। উক্ত গ্রন্থে তিনি ইহাই প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, ধর্ম্মই মানুষের প্রধান সহায় ও একমাত্র সুহৃদ্। ধর্ম্মবিহীন হইয়া নর-নারী জগতের কোন উন্নতিকর কার্য্য সাধন করিতে সক্ষম হয় না। ধর্ম্মই তাহাদিগকে সকল অবস্থাতে রক্ষা ও জয়যুক্ত করে। বর্ত্তমান জাতীয় উন্নতির আন্দোলনের দিনে যাঁহারা ধর্ম্মভাববিহীন বিশুষ্ক রাজ-নৈতিক আন্দোলনে জাতীয় সমাজে উচ্চ আসন অধিকার করিতে অভিলাষী, তাঁহারাও উক্ত ক্ষুদ্র পুস্তক হইতে শিক্ষা পাইবেন যে, ধর্ম্মই জাতীয় জীবনের মূল ভিত্তি। ধর্ম্ম ও নীতির অনুশাসন মানিয়া না চলিলে কোন মহৎ কার্য্য সিদ্ধ হয় না।

"Religion comes from God's right hand
And needs a Godly train,
For'tis righteousnees that makes our land
A nation once again!"

প্রায় ত্রিশ বৎসর গত হইল কর্ম্মবীর প্যারীচাঁদ স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। তাঁহার দীর্ঘকালব্যাপী সাধনা সফল হইয়াছে। আজি যদি তাঁহার পরলোকগত আত্মা স্বর্গধাম হইতে ক্ষণকালের জন্য অবতরণ করিয়া বঙ্গদেশের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত পর্য্যবেক্ষণ করেন, তাহা হইলে, তিনি ইহা দেখিয়া একান্ত পরিতৃপ্ত হইবেন যে, তাঁহার সাধনার ধন বঙ্গ-সাহিত্য আজি পৃথিবীর সকল সভ্যদেশের ভাষা হইতে বিপুল রস, মধু, সুধা ও মদিরা আকর্ষণ করিয়া পরিপুষ্ট ও সমুন্নত হইয়াছে—আজি তাঁহার ও তাঁহার মন্ত্র-শিষ্যগণের সাধনার দেশে শত শত মাতৃভক্ত সু-সন্তান

মাতৃভাষায় পরিচর্য্যা ও জাতীয় সাহিত্যের উন্নতি সাধনে স্ব স্ব জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন।

১৮৮৩ খ্রীঃ অব্দে মহাত্মা প্যারীচাঁদের পরলোক গমনের কিছুকাল পরে তৎপ্রণীত অনেকগুলি গ্রন্থ বিলুপ্তপ্রায় হইবার উপক্রম হইয়াছিল। বিগত ১২৯৯ সালে তাঁহার পুত্রগণের উৎসাহে কলিকাতা ক্যানিং লাইব্রেরীর অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় স্বর্গীয় মহাত্মার বাঙ্গালা গ্রন্থাবলী "লুপ্তরত্নোদ্ধার" নামে পুনর্মুদ্রিত ও প্রকাশিত করিয়া বাঙ্গালা সাহিত্যানুরাগী ব্যক্তিগণের বিশেষ উপকার সাধন করিয়াছেন। বঙ্গসাহিত্যের অসাধারণ উন্নতি-বিধাতা মাতৃপূজার মহামন্ত্রের মহাশক্তিশালী ঋষি, মহাত্মা বঙ্কিমচন্দ্র উক্ত গ্রন্থের যে একটী সুন্দর ভূমিকা লিখিয়াছিলেন, তাহা পাঠ করিলে বুঝিতে পারা যাইবে, বঙ্গ-সাহিত্যে মহাত্মা প্যারীচাঁদের স্থান কত উচ্চ এবং উহা তাঁহার নিকট কি পরিমাণে ঋণী। তিনি উহার প্রথমেই লিখিয়াছেন—"বাঙ্গালা সাহিত্যে প্যারীচাঁদের স্থান অতি উচ্চ। তিনি বাঙ্গালা সাহিত্যের ও বাঙ্গালা গদ্যের একজন প্রধান সংস্কারক।" অনন্তর তিনি মহাত্মা প্যারীচাঁদ মিত্রের সময়ের বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যের দুরবস্থার বিষয় উল্লেখ পূর্ব্বক উহাতে প্যারীচাঁদের কৃতিত্বের পরিচয় দান করিয়া লিখিয়াছেন—"দুইটী গুরুতর বিপদ হইতে প্যারীচাঁদ মিত্রই বাঙ্গালা সাহিত্যকে উদ্ধার করেন। যে ভাষা সকল বাঙ্গালীর বোধগম্য এবং সকল বাঙ্গালী কর্ত্তৃক ব্যবহৃত, প্রথমে তিনিই তাহা গ্রন্থ প্রণয়নে ব্যবহার করেন এবং তিনিই প্রথমে ইংরাজী ও সংস্কৃতের ভাণ্ডারে পূর্ব্বগামী লেখকদিগের উচ্ছিষ্টাবশেষের অনুসন্ধান না করিয়া স্বভাবের অনন্ত ভাণ্ডার হইতে আপনার রচনার উপাদান সংগ্রহ করেন। এক "আলালের ঘরের দুলাল" হইতে এই উভয়বিধ উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল। উহার অপেক্ষা উৎকৃষ্ট গ্রন্থ তৎপরে কেহ প্রণীত করিয়া থাকিতে পারেন, অথবা ভবিষ্যতে কেহ করিতে পারেন, কিন্তু "আলালের ঘরের দুলালে"র দ্বারা বাঙ্গালা সাহিত্যের যে উপকার হইয়াছে, আর কোন বাঙ্গালা গ্রন্থের দ্বারা সেরূপ হয় নাই, এবং ভবিষ্যতেও হইবে কিনা সন্দেহ"..........

"প্যারীচাঁদ আদর্শ বাঙ্গালা গদ্যের সৃষ্টিকর্ত্তা নহেন, কিন্তু বাঙ্গালা গদ্য যে উন্নতির পথে দাঁড়াইয়াছে, প্যারীচাঁদ তাহার প্রধান ও প্রথম কারণ; ইহাই তাঁহার অক্ষয় কীর্ত্তি। আর তাঁহার দ্বিতীয় অক্ষয় কীর্ত্তি এই যে, তিনিই সর্ব্বপ্রথমে দেখাইলেন যে, সাহিত্যের প্রকৃত উপাদান আমাদের ঘরেই আছে—তাহার জন্য ইংরাজী বা সংস্কৃতের নিকট ভিক্ষা চাহিতে হয় না। তিনিই প্রথম দেখাইলেন যে, যেমন জীবনে, তেমনই সাহিত্যে ঘরের জিনিষ যত সুন্দর, পরের সামগ্রী তত সুন্দর বোধ হয় না। তিনিই প্রথমে দেখাইলেন যে, যদি সাহিত্যের দ্বারা বাঙ্গালা দেশকে উন্নত করিতে হয়, তবে বাঙ্গালা দেশের কথা লইয়াই সাহিত্য গড়িতে হইবে। প্রকৃত পক্ষে আমাদের জাতীয় সাহিত্যের আদি "আলালের ঘরের দুলাল"। প্যারীচাঁদ মিত্রের ইহাই দ্বিতীয় কীর্ত্তি।"

বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমি কেবল মাত্র মহাত্মা প্যারীচাঁদের বঙ্গ-সাহিত্যে কৃতিত্বের পরিচয় দিলাম—ইহাতে তাঁহার সমুন্নত কর্ম্মময় জীবনের অজ্ঞাত মধুময় কাহিনীর পরিচয় দানের সুবিধা হইল না। তাঁহার সুবিস্তৃত

জীবনচরিতে তদ্বিষয়ের প্রকৃষ্টরূপে পরিচয় দান করা হইবে। যত দিন বাঙ্গালী জাতি ও বাঙ্গালা সাহিত্য জীবিত থাকিবে, ততদিন কর্ম্মবীর প্যারীচাঁদের অপূর্ব্ব কীর্ত্তি অক্ষুণ্ণ ও সমুজ্জ্বল ভাবে বিদ্যমান রহিবে। সেই আদর্শ-চরিত্র মহাপুরুষের বিপুল সাধনা তাঁহার স্বদেশবাসিগণের উপাস্য হউক, ইহাই আমার আন্তরিক প্রার্থনা।

শ্রীবিজয়লাল দত্ত।

গয়া-মাহাত্ম্য।

রামশীলা।

রামশীলা নামক একটী পর্ব্বত গয়ানগরের উত্তর সীমায় অবস্থিত। ইহা পাটনা-গয়া পুরাতন রাস্তার পার্শ্বেই বর্ত্তমান। রামশীল নামক পাহাড়ের দক্ষিণ দিকে একটী ক্ষুদ্র উপপর্ব্বত বিরাজমান। এই ক্ষুদ্র পাহাড়ের উপর ওলন্দাজদের এক পুরাতন কুঠী ছিল। তাহা আজও এইখানে দাঁড়াইয়া আছে এবং অতীত ইতিহাসের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। এই কুঠীর সত্বাধিকারী গয়ার বরেণ্য ফৌজদারী উকীল এবং মিউনিসিপ্যালিটীর ভাইস্-চেয়ারম্যান এবং বিহার প্রদেশের লাট দপ্তরের সদস্য মাননীয় সাইয়দ খাজা মহম্মদ নুর সাহেব। ত্রেতাযুগে ভগবান রামচন্দ্র মহারাজ দশরথের পিণ্ডদানোপলক্ষে আসিয়া প্রথমে এইখানে অবস্থান করেন বলিয়া পর্ব্বতটীর নাম "রামশীলা" হইয়াছে। পর্ব্বতের উপরের মন্দিরাভ্যন্তরে রাম, লক্ষ্মণ ও সীতাদেবীর মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। রামশীলা পর্ব্বতের কটিদেশে "প্রেতশীলা" তীর্থ, নিম্নে "রামকুণ্ড", শিখরদেশে "রামেশ্বর", পূর্ব্বভাগে "প্রভাষ তীর্থ", দক্ষিণভাগে নগপর্ব্বত, এবং ইহার সন্নিকট কিছু দক্ষিণ দিকে "কাকবলি" তীর্থ অবস্থিত। এই সকল তীর্থে থাপর গয়ান্তর্গত পিণ্ড প্রদত্ত হইয়া থাকে।

রামশীলা পর্ব্বতের শিখরদেশে আরোহণ করিয়া যাত্রীগণের সুবিধার জন্য টিকারীর ভূতপূর্ব্ব রাজা রণবাহাদুর সিংহ বহু অর্থব্যয়ে সর্পাকৃতি পাকা সিঁড়ি নির্ম্মাণ করাইয়া অক্ষয় কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। এই সোপান মধ্যে ৩৩২টী পাদ আছে। পাহাড়ের পাদদেশে পুরাতন টিকারীর রাজগণের নির্ম্মিত সুন্দর মন্দিরাভ্যন্তরে পঞ্চদেব মূর্ত্তি বিরাজ করিতেছে। পর্ব্বতটী ৩৭২ ফিট উচ্চ।

পর্ব্বতের শিখরস্থিত রামশীলার মূর্ত্তিগুলির গঠন ও কারুকার্য্য দেখিলে বেশ জানা যায় যে, এইগুলি কদাচ হিন্দুযুগের দেব দেবীর আদর্শ নহে, বরং ইহাদিগের স্থাপত্য ও ভাস্কর-বৈচিত্র্য স্বতই আমাদের মনে ডাঃ রাজেন্দ্র লালার মতের পোষণ করিয়া দেয় যে, এইগুলি বৌদ্ধ দেব দেবীর মূর্ত্তি ছিল, ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের পুনঃ প্রতিষ্ঠার পর হিন্দু ধর্ম্মের গণ্ডীর মধ্যে আনীত হইয়া হিন্দু দেব দেবীর মূর্ত্তিরূপে সাধারণে পরিচিত হইয়াছে। রামশীলা পর্ব্বতের পাদদেশ দিয়া পুরাণ পাটনা-গয়ার পাকা রাস্তা উত্তরাভিমুখে গিয়াছে, তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। রেল হইবার পূর্ব্বে এই রাস্তাই গয়ায় আসিবার প্রধান রাজকীয় পথ ছিল। ঐ গিরিরাজির নিম্ন দিয়া আর এক রাস্তা কাত্তীনওয়াদা গ্রাম দিয়া পুরাতন ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের রাস্তা

অতিক্রম করিয়া পশ্চিমাভিমুখে প্রেতশীলা পর্ব্বত পর্য্যন্ত গিয়াছে। এই প্রেতশীলা পর্ব্বত নেয়াজীপুর গ্রামের পার্শ্বেই, গয়া সহর হইতে ৬ মাইল উত্তর পশ্চিম কোণে অবস্থিত, তাহাও পূর্ব্বেই বলিয়াছি। রামশীলা পর্ব্বতের পূর্ব্বদিকেই "বাহাদুর গীর" দ্বীপ, ইহা ফল্গু-নদীর মধ্যে অবস্থিত। এই দ্বীপের উত্তর দিকে একটী প্রাচীন মহাশ্মশান আছে। এই দ্বীপ সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণ পরে লিখিত হইয়াছে। বাহাদুর গিরি বাবা অতি প্রাচীন-কালে এইখানে এক সিদ্ধ পুরুষ হইয়া গিয়াছেন। তিনি অদ্ভুত অদ্ভুত সিদ্ধি প্রদর্শন করিয়া সেকালকার লোক সমূহের নিকট পূজা হইয়াছিলেন। এখন প্রবাদ যে, লোকে তাঁহাকে বিরক্ত করায় তিনি গুপ্ত হইয়াছেন।

গয়া নগরের উত্তর সীমায় রামশীলা এবং দক্ষিণ সীমায় ব্রহ্মযোনী পর্ব্বত বিদ্যমান। রামশীলা পর্ব্বতে যাত্রীদের উঠিবার জন্য ৺রাজা রণবাহাদুর সিংহ মহাশয় বহু অর্থ ব্যয়ে পাকা সোপানাবলী নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়াছেন। রামশীলা পর্ব্বতের সম্মুখে ফল্গু-নদীর মধ্যে একটী দ্বীপ দেখিতে পাওয়া যায়। এই দ্বীপটীর উত্তর দিকে একটী অতি প্রাচীন মহাশ্মশান আছে। এই দ্বীপের উপর দিয়া গয়া-কাত্রাসগড় ও সাউথ-বিহার রেল লাইনের সুন্দর ফল্গুনদীর উপর সেতু দীর্ঘ সর্পাকৃতিতে বিস্তৃত আছে। এই দ্বীপটীর নাম "বাহাদুরগীর।" বাহাদুরগীরি নামক একটী সন্ন্যাসী অতি প্রাচীনকালে এই স্থানে তপস্যা করিয়া সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার নামে এই দ্বীপের নাম "বাহাদুরগীর" হইয়াছে। বিখ্যাত হিন্দী উপন্যাস লেখক কাশীবাসী ৺দৈবকী নন্দন ক্ষেত্রী বাবু তাঁহার "চন্দ্রকান্তা" ও "সন্ততি" উপন্যাসের আংশিক বিবরণী ও দৃশ্য এই বাহাদুর-গীরিতে স্থাপিত করিয়াছেন। বাহাদুরগীর বেশ নিভৃত ও জাগ্রত সাধনার স্থান। এই আসনে বসিয়া সহজে কোন লোক সিদ্ধিলাভ করিতে পারে না। স্থানটী বড়ই উগ্রতেজা। রামশীলা পর্ব্বতের শিখরদেশে এক প্রাচীন মন্দিরাভ্যন্তরে ৺পাতালেশ্বর শিব এবং পার্ব্বতীর মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছেন। এই মন্দির ১০১৪ খ্রীষ্টাব্দে নির্ম্মিত হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়। সম্বৎ ১০৭১ অব্দে এই মন্দিরের গাত্রস্থ প্রস্তরলিপি দৃষ্টে ইহার নির্ম্মাণ সময়ের অবধারণ করা যায়। *

রামশীলার পাদদেশে সাহেবদের একটী "গোরস্থান" আছে। এই গোরস্থানে মিঃ ফ্রানসিস্ গিলাণ্ডার্সের সমাধি প্রতিষ্ঠিত আছে। তিনি গয়ার যাত্রীদের উপর কর বা শুল্ক সংগ্রাহক ছিলেন, এবং বিষ্ণুপাদ মন্দিরে সম্মুখবর্ত্তী নাট মন্দিরে যে দোদুল্যমান সুন্দর ঘণ্টা দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা তাঁহারই উৎসর্গীকৃত। তিনি ১৮২১ সালে ৬০ বৎসর বয়সে গয়ায় পরলোক গমন করিলে তাঁহার নশ্বর দেহ এই স্থানেই সমাধিস্থ করা হয়। ইহার পার্শ্বেই মুসলমানদিগের "কারবালা।" এইখানে মহরমের সময় গয়া সহর এবং পার্শ্ববর্ত্তী সকল গ্রামের যত "তাজিয়া" ভাসান দেওয়া হইয়া থাকে। এই সময়ে এখানে খুব মেলা হয়।

প্রেতশীলা।

গৃহে প্রেতের উপদ্রব হইলে, প্রেত পর্ব্বত বা প্রেতশীলায় পিণ্ড দিলে, তাহার শান্তি হইয়া থাকে। আমি এইরূপ বহু ভদ্রলোকের অনুরোধে প্রেতশীলা পর্ব্বতে প্রেতোদ্ধারোপ-

* Reports Arch Surv. Ind. Vol I P 1—4
" " " III. P 107—139.

লক্ষে পিণ্ডদান করাইয়াছি। পর্ব্বতের নিম্নদেশে শিব প্রতিষ্ঠিত আছেন। তাহার পার্শ্বেই কুণ্ড আছে। বায়ুপুরাণধৃত প্রেতশীলা তীর্থ রামশীলা পর্ব্বতের কটিদেশে অবস্থিত; ইহা প্রেত পর্ব্বতের সহিত মিশাইয়া ভ্রম বাঞ্ছনীয় নহে। বাবু কানাইলাল গুরদা গয়ালী মহাশয় তাঁহার 'বৃহদ্গয়া মাহাত্ম্য' পুস্তকের পরিশিষ্ট ভাগে গয়ার যাবতীয় তীর্থস্থানগুলির নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহা প্রত্যেক ঐতিহাসিকের পাঠ করা কর্ত্তব্য। প্রেত পর্ব্বতের শিখরদেশে "ব্রহ্মবেদী" এবং পাদদেশে "ব্রহ্মকুণ্ড" তীর্থ প্রতিষ্ঠিত আছে। এই পর্ব্বতের উচ্চতা অন্যূন ৫৫০ ফুট হইবে, কিন্তু ডাঃ কানিংহ্যাম বলেন, ইহা ৫৪১ ফুট উচ্চ; এবং ইহার শিখরদেশে যমরাজ ধর্ম্মের নামে একটী উৎসর্গীকৃত মন্দির আছে; শিখরদেশে আরোহণ করিবার প্রস্তর-নির্ম্মিত সোপানাবলী কশ্চিৎ ধার্ম্মিক বঙ্গদেশবাসী (সম্ভবতঃ ২৪ পরগণার অন্তর্গত বাওয়ালির বিখ্যাত ভূস্বামী ৺প্রীতিরাম মাড় ১৭৭৪ খ্রীষ্টাব্দে) নির্ম্মাণ করিয়া যাত্রীদের ভাবী বহু কল্যাণ সাধন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার পরে ৺রাণী রাসমণি দাসী (কলিকাতার অন্তর্গত জানবাজার-নিবাসী প্রখ্যাত মাহিষ্য ভূম্যধিকারিণী) এবং ২৪ পরগণা জেলার অন্তর্গত বজবজ থানার অন্তঃপাতী বাওয়ালী গ্রাম-নিবাসী মণ্ডল বংশাবতংশ প্রাচীন ভূম্যধিকারী ৺হারানন্দ মণ্ডল, ৺বিষ্ণুপদ মন্দিরের নিত্য তুলসী পত্র পূজার জন্য ব্যবহৃত হইবার কারণ প্রত্যেকে ১০ বিঘা এবং ৫ বিঘা যথাক্রমে নিষ্কর ক্ষেত্র দান করিয়া গিয়াছেন। উক্ত ভূম্যধিকারীগণ কোন কালে অমরধামে চলিয়া গিয়াছেন, কিন্তু তাঁহাদের কীর্ত্তি অদ্যাবধি জগত সমক্ষে দেদীপ্যমান রহিয়াছে!!!

প্রেতশীলা পর্ব্বতের পাদদেশে চারিটী কুণ্ড বর্ত্তমান আছে, এইগুলি সতি, নিগ্রা, সুখ এবং রাম কুণ্ড নামে যথাক্রমে পরিচিত। এইখানে স্নানান্তে পিণ্ড দিতে হয়। প্রেতশীলা পর্ব্বতে স্বর্ণ পাওয়া যায় বলিয়া এক প্রবাদ আছে এবং এই পর্ব্বতে ঔষধি সকল বিরাজমান। পিতৃগণের প্রেতত্ব হইতে মুক্তির জন্য প্রেতশীলায় পিণ্ডদানের বিধি আছে। প্রেতশীলা পর্য্যন্ত গয়া সহর হইতে বরাবর পাকা রাস্তা আছে। ইহা গয়া নগর হইতে তিন ক্রোশের উর্দ্ধ দূরে উত্তর পশ্চিম কোণে অবস্থিত, তাহা পরে বলিয়াছি। এইখানে ধামীগণ পিণ্ডদান করায়। লব্ধ দক্ষিণার তিন ভাগ ধামীগণ এবং এক ভাগ গয়ালীগণ গ্রহণ করিয়া থাকেন। কোন লোকের গৃহে প্রেতযোনীর উপদ্রব হইলে এই স্থানে পিণ্ডদান করিলে তাহার উপশম হইয়া থাকে। আমি বহুলোকের পক্ষ হইতে সময়ে সময়ে এইস্থানে পিণ্ডদান করাইয়া ফল পাইয়াছি। প্রতি বৎসরের মধ্যে আমাকে এইরূপ বহু আবদার সহ্য করিতে হয়; তাহার কারণ এই যে, আমরা গয়ার সদাসর্ব্বদা থাকি এবং বহুকাল হইতে গয়ার আমাদের পাকা "আড্ডা" আছে। এই প্রেতশীলা পর্ব্বত গয়ানগর হইতে ৬ মাইল উত্তর পূর্ব্ব (বায়ু) কোণে অবস্থিত। প্রেতশীলাকে "প্রেত পর্ব্বত" তীর্থ বলা হয়। "প্রেতশীলা" বেদী রামশীলা পর্ব্বতের মধ্যে অবস্থিত আছে, তাহা কানুলাল গুর্দা মহাশয়ের 'বৃহৎ গয়া মাহাত্ম্য' পুস্তক দেখিলে জানা যাইবে। "প্রেতশীলা বেদী" এবং "প্রেতশীলা পর্ব্বত" দুইটী পৃথক স্থান।

গায়ত্রী ঘাট।

গায়ত্রী ঘাট মধ্যস্থ স্থানে খাপর গয়া

শ্রাদ্ধান্তর্গত এক বেদী পিণ্ডদান করিতে হয়। এই বেদীর যাবতীয় আয়ের অধিকারী বাবু নরসিংহলাল মাহতো গয়ালী। গায়ত্রী ঘাটে ৺গায়ত্রী দেবী অধিষ্ঠিত আছেন। ৺গায়ত্রী দেবীর মন্দির গোয়ালীয়র রাজ ৺দৌলৎরাও সিন্ধিয়ার স্ত্রী রাণী গঙ্গাবাই ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দে গয়া শ্রাদ্ধ করিতে আসিয়া নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়া অক্ষয় কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। এই ঘাট সম্বন্ধে মার্টিন সাহেব তাঁহার ইষ্টার্ণ ইণ্ডিয়া নামক পুস্তকের প্রথম ভাগে বিস্তৃত বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন।

গায়ত্রী ঘাটের সন্নিকটেই গদাধরের মন্দির। এইখানে একটী শিলালিপি আছে। এই মন্দির ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতায় আহিরীটোলা পল্লীর বিখ্যাত বণিক এবং জমীদার ৺মদন মোহন দত্ত সংস্কৃত ও উদ্ধার করিয়া দিয়া যান। মিঃ মণ্টগো মেরী মার্টিন তাঁহার পুস্তকে এই সম্বন্ধে বিশদভাবে আলোচনা করিয়াছেন। পাল রাজগণের সময় এই মন্দিরই প্রধান পূজার স্থান ছিল বলিয়া মার্টিন সাহেব অনুমান করেন। তিনি আরও বলেন যে, প্রেতশীলার সোপান ৺মদনমোহন দত্ত নির্ম্মাণ করেন। কিন্তু তাহা আমার ঠিক বলিয়া মনে হয় না। আমি জানবাজারের মাড় বাবুদের পুরাণ খাতাপত্র দেখিয়াছি এবং তাহাতে হিসাব লিখা আছে যে, ৺প্রীতিরাম মাড় ১৮১৫ সালে গয়া শ্রাদ্ধ করিতে গিয়া ধামুকদিগের বিশেষ বিনয় ও অনুরোধে প্রেতশীলার সোপান নির্ম্মাণের ব্যয়ভার বহনে প্রতিশ্রুত হন। ঐ টাকা অর্থাৎ ৮২৭২৫৸৶০ তাঁহার কোষ হইতে ১৮২৬ সালে দেওয়া হয় এবং ঐ সাল হইতে ১৮৩০ সালের মধ্যে তাহার নির্ম্মাণ শেষ হয়।

শ্রীপ্রকাশচন্দ্র সরকার।

হিন্দু রমণীর শিক্ষা ও গৃহকর্ম্ম।*

সমাজবদ্ধ না হইয়া মানুষ থাকিতে পারে না। সমাজবদ্ধ হইতে হইলেই কতকগুলি নিয়মে আবদ্ধ হইতে হয়। সমাজে স্ত্রী অর্দ্ধাঙ্গী, পুরুষ অর্দ্ধাঙ্গ। স্ত্রী ও পুরুষ উভয়কে লইয়াই সমাজ-শরীর পূর্ণাঙ্গ। এক অঙ্গ দুর্ব্বল ও রুগ্ন হইয়া থাকিলে অন্য অঙ্গ স্বাস্থ্যসম্পন্ন থাকিতে পারে না—সংসারও ঠিক চলিতে পারে না। সাধারণতঃ হৃদয়বলে স্ত্রী এবং বুদ্ধিবলে পুরুষ অধিক পরিমাণে বলীয়ান। বুদ্ধিবলে ও কর্ম্মবলে পুরুষ সংসারের জন্য অর্থ উপার্জ্জন করিবে—বুদ্ধিবলে, কর্ম্মবলে এবং হৃদয়বলে স্ত্রী তদ্দ্বারা সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিবে। সংসারে এই উভয়েরই বিশেষ প্রয়োজন। একখানি পাখাযুক্ত পাখী যেমন উড়িতে পারে না, স্ত্রী পুরুষের একের দ্বারাও তেমনি সংসার চলিতে পারে না। সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে হইলে, এই উভয় শক্তির মিলন হওয়া আবশ্যক, নতুবা সংসার চলিতে পারে না। তাই সমাজে বিবাহ বিধি প্রচলিত হইয়াছে। বিবাহ দ্বারা এই উভয় শক্তির মিলন হয়, এই মিলিত শক্তি একযোগে সংসারের কার্য্য নির্ব্বাহ করে।

* চৈতন্য লাইব্রেরী হইতে সরোজিনী-বিভাবতী-পারিতোষিক-প্রাপ্ত প্রবন্ধ।

পুরুষ পুরুষের কর্ত্তব্য কার্য্য করে, স্ত্রী স্ত্রী-লোকের কর্ত্তব্য কার্য্য করে। যে সংসার এই ভাবে চলে, সেই সংসারই প্রকৃত সুখের। যেখানে এই উভয় শক্তির মিলন নাই, অর্থাৎ পুরুষ পুরুষের কার্য্য করে, স্ত্রীলোকেও পুরুষোচিত কার্য্য করে, সে সংসারকে সংসার বলা যায় না; তাহা সং মাত্রেই সার হয়। যাহার যে কর্ত্তব্য কার্য্য, তাহা করিবার জন্যই ঈশ্বর স্ত্রী ও পুরুষ সৃষ্টি করিয়াছেন। স্ত্রী ও পুরুষে যে প্রভেদ, তাহাদের কার্য্যও সেইরূপ বিভিন্ন।

রঙ্গালয়ে যেমন স্ত্রীলোকের দ্বারা পুরুষের অভিনয় করাইতে হইলে তাহাকে পুরুষবেশে না সাজাইলে হয় না, এবং পুরুষের দ্বারা স্ত্রীলোকের অভিনয় করাইলে তাহাকে স্ত্রীলোক না সাজাইলে হয় না, তেমনি ঈশ্বর যাঁহাকে যে বেশ দিয়াছেন, তাঁহারা সংসাররূপ রঙ্গালয়ে সেই বেশেই আপনাপন কর্ত্তব্য কার্য্য করিবেন, আপন আপন ধর্ম্ম প্রতি-পালন করিবেন। স্বধর্ম্ম প্রতিপালন করিতে গিয়া যদি মরিতে হয়, মরিবে, তথাপি পরধর্ম্ম চর্চ্চা করিবে না। সেই জন্যই পরধর্ম্ম চর্চ্চার নাম অনধিকার চর্চ্চা—তাহা অতি ভয়াবহ অর্থাৎ বিপজ্জনক।

পৃথিবী মধ্যে আর্য্য জাতিই সুসভ্যজাতি। এ সভ্যতা যে কতকাল হইতে চলিয়া আসি-তেছে, তাহা নির্ণয় করা যায় না। এই প্রাচীন সভ্যজাতি অতি প্রাচীনকালে ভারতে আসিয়া বাস করিয়াছিলেন এবং সেই হইতেই তাঁহারা সমাজকে রক্ষা করিয়া আসিয়াছেন। ভারতবাসী আর্য্যগণ এখন হিন্দু নামে কথিত হইতেছেন। অন্য দেশের আর্য্যগণ আর্য্যত্বের চিহ্ন রক্ষা করিতে পারেন নাই, কিন্তু হিন্দুগণ প্রাচীন আর্য্য-সভ্যতার নিদর্শন এখনও কিছু কিছু রক্ষা করিয়াছেন। তাহা হইতে আমরা দেখিতে পাই, অতি প্রাচীন কালেই আর্য্য ঋষিগণ বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, স্ত্রী-পুরুষের এই মিলন ব্যতীত সংসার চলিতে পারে না, তাই তাঁহারা অতি প্রাচীনকালেই বিবাহ-পদ্ধতি প্রচলিত করিয়াছিলেন, তাই আমরা দেখিতে পাই, পৃথিবীর যাবতীয় সভ্য, অসভ্য, আর্য্য ও অনার্য্য জাতিমধ্যেই বিবাহ প্রথা প্রচলিত আছে। হিন্দুগণ সেই পুরাতন পবিত্র পদ্ধতিই বজায় রাখিয়াছেন। অন্যান্য দেশে বিভিন্ন পদ্ধতি প্রচলিত হইয়াছে। হউক, মূল উদ্দেশ্য সকলেরই এক—সংসার-যাত্রা সুশৃঙ্খলে নির্ব্বাহ করা।

সংসার যাত্রা সুশৃঙ্খলে এবং সহজে নির্ব্বাহ করিতে হইলে এই উভয় শক্তির একযোগে কার্য্য করা আবশ্যক হয়। পুরুষ বুদ্ধিবলে বাহির হইতে অর্থ আনিয়া স্ত্রীর হস্তে সমর্পণ করেন, স্ত্রী বুদ্ধিবলে ও হৃদয়বলে তাহা ব্যয় করিয়া সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করেন। পুরুষ সংসারের কর্ত্তা বটে, কিন্তু তিনি অর্থ যোগান ব্যতীত সংসারের আর কোন ধারই ধারেন না, সমস্তই স্ত্রীর উপর নির্ভর করে। এই জন্যই পুরুষ বাড়ীর কর্ত্তা হইলেও স্ত্রী গৃহের কর্ত্রী। বাড়ীর মধ্যে তাঁহার কর্ত্তৃত্বই অগ্রগণ্য। পুরুষ আনিবার কর্ত্তা, স্ত্রী তাহা ব্যয় করিবার কর্ত্রী। স্ত্রী বলিবেন "আন", পুরুষ নিরাপত্যে সে আদেশ প্রতিপালন করিবেন।

হিন্দু জাতির মধ্যে যে একান্নভুক্ত পরি-বার প্রথা প্রচলিত আছে, ইহা কেবল গৃহকর্ত্রীর গুণে। যে কর্ত্রীর যত হৃদয়বল, তিনি তত অধিক সংখ্যক পরিবারকে একত্র রাখিতে পারেন। এ বিষয়ে পুরুষের কোনই হাত নাই। এখানে পুরুষের কোন বুদ্ধিই

খাটে না। যদি স্ত্রী-শক্তি সুশিক্ষার অভাবে হৃদয়হীনা হইয়া বিরুদ্ধাচারিণী হয়, তবে কোন পুরুষেরই সুখে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিবার উপায় নাই। সুতরাং সংসারে স্ত্রী-শক্তিই মূল। সুশিক্ষার দ্বারাই এই শক্তি সুপথে এবং কুশিক্ষার দ্বারা কুপথে চালিত হয়।

এই জন্যই হিন্দুর মূল মন্ত্র—"কন্যাপ্যেব শিক্ষনীয়া পালনীয়াতি যত্নতঃ।" এই শিক্ষা দুই প্রকারে হয়—(১) দেখিয়া এবং স্বয়ং করিয়া আচার ব্যবহার ও কর্ম্ম শিক্ষা, (২) প্রয়োজন-সাধক বিদ্যাশিক্ষা। সম্পূর্ণ শিক্ষা কেবল বিদ্যালয়ে হয় না, কেবল বিদ্যা-শিক্ষাতেও হয় না। ইহা সংসর্গজাত, সুতরাং বাড়ীতে হয়। এই জন্যই হিন্দু রমণীর বিদ্যালয়ে শিক্ষার ব্যবস্থা নাই। কিণ্ডার-গার্টেন প্রণালীতে সে জন্ম হইতে বাড়ীতেই শিক্ষা লাভ করিয়া থাকে। প্রয়োজন-সাধক লেখাপড়া শিক্ষাও বাড়ীতেই হয়। যে শিক্ষা রমণীকে প্রকৃত রমণী করে, সেই শিক্ষাই প্রকৃতপক্ষে কার্য্যকরী শিক্ষা। দিবা রাত্রি পুঁথির উপরে মাথা ভাঙ্গিয়া রাশি রাশি পুস্তক পড়িয়া পুরুষে লেখাপড়া শিক্ষা করিবে, জ্ঞান উপার্জ্জন করিবে, চাকুরী করিবে, অর্থ আনিবে, এই পর্য্যন্ত। উচ্চশিক্ষায় পুরুষ বিদ্বান, জ্ঞানবান হইতে পারে, কিন্তু সংসারে তাহার কিছুমাত্র অভিজ্ঞতা জন্মে না। কিরূপে সংসার চালাইতে হয়, তাহা সে কিছুই জানে না। উচ্চশিক্ষা-প্রাপ্তা রমণীও উচ্চ পুরুষের গুণবিশিষ্টই হয়, তাই ভাণ্ডারির উপর ভাণ্ডারের ভার, দাসীর উপরে সংসারের ভার, পাচকের উপর পাকের ভার দিয়া তাহাদের উপর প্রভুত্ব করতঃ তিনি নিশ্চিন্ত মনে আলস্যে সময় কাটাইয়া থাকেন। ইহাদিগকে গৃহকর্ত্রী বলা যাইতে পারে, কিন্তু সহধর্ম্মিণী বলা যায় না।

পুরুষ পুরুষের কার্য্য শিক্ষা করিবে এবং রমণী রমণীর কার্য্য শিক্ষা করিবে, উভয়ে মিলিয়া এক হইয়া সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিবে। এই জন্যই সংসারে এক অর্দ্ধাঙ্গ পুরুষ, আর এক অর্দ্ধাঙ্গ স্ত্রী—উভয়ে মিলিয়া একাঙ্গ হয়। পুরুষ সংসারে দাস, স্ত্রী সংসারে দাসী। দাস মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া অর্থ উপার্জ্জন করিয়া আনিবে, দাসী তাহা খরচ করিয়া সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিবে। দাস কাহার জন্য কঠোর পরিশ্রম করে? মাতা, ভগ্নী, স্ত্রী, পুত্র, কন্যা প্রভৃতি যাহারা তাহার উপরে নির্ভর করে, তাহাদের জন্য। সুতরাং তিনি মাতা, ভগ্নী, স্ত্রী, পুত্র, কন্যা প্রভৃতির আপ্‌খোরাকী বিনাবেতনের দাস। এই হিসাবে স্ত্রী তাহার সংসারে দাসী, কিন্তু পুরুষের ন্যায় নিজ মাতা ভগ্নীর দাসী নহেন, এই কারণে স্ত্রীর কার্য্য পুরুষ অপেক্ষা কঠিন। বিশেষ শিক্ষার আবশ্যক। পরকে আপন করিতে পারা সহজ শিক্ষার কার্য্য নহে—পুথি পড়িয়া হয় না, অভ্যাস করা আবশ্যক। স্ত্রী সংসারের দাসী হইলেও পুরুষের ন্যায় আপ্‌খোরাকী দাসী নহেন। তাঁহার স্বার্থ আছে। তিনি যেমন সংসারে দাসীত্ব করেন, তেমনি খোরাক, পোষাক, নগদ অর্থ, অলঙ্কার প্রভৃতি পাইয়া থাকেন। কিন্তু খোরাক পোষাক পাইলেও তিনি নিঃস্বার্থ দাসী। যে স্ত্রী মনে করেন, পরের সেবার জন্যই তাঁহার জীবন, তিনিই প্রকৃত দাসী, তিনিই সংসারের প্রকৃত কর্ত্রীর যোগ্যা। আপ্‌খোরাকী দাস তাঁহার নিকট কি আশা করে, একটু সেবা যত্ন, সংসারে শান্তি, এই আর কি? ইহাতে যে স্ত্রী আপনাকে

সংসারের দাসী মনে করিয়া কুণ্ঠিতা হয়, শাশুড়ী প্রভৃতির সহিত বিবাদ করিয়া পাস্থিভঙ্গ করে, সে স্ত্রী স্ত্রীনামের অযোগ্যা। তিনি যতই শিক্ষিতা হউন, তাঁহাকে স্ত্রী বলা যায় না। তাঁহার প্রকৃত শিক্ষা হয় নাই বলিতে হইবে।

স্ত্রীকে হিন্দুশাস্ত্রে সহধর্ম্মিণী বলে। এই সহধর্ম্মিণী অর্থ সমান ধর্ম্মী বটে, কিন্তু এখন যেরূপ স্ত্রীকে সহধর্ম্মিণী বলে, তাহা নহে। মাতা, স্ত্রী, ভ্রাতা, ভগ্নী, পুত্র, কন্যা প্রতিপালনের জন্য অর্থোপার্জ্জনে এক অর্দ্ধাঙ্গ, অর্থাৎ স্বামী যেমন কঠোর পরিশ্রম সহকারে অপরের দাসত্ব করিবেন, স্ত্রীও তেমনি শাশুড়ী, ননদ, দেবর, পুত্র, কন্যাকে প্রতিপালনের জন্য নিজ সংসারে দাসীত্ব করিবেন। এই দাসীকেই সহধর্ম্মিণী বলে। নিজ সংসারে দাসত্বই পুরুষের ধর্ম্ম, যে স্ত্রী স্বামীর এই ধর্ম্মের অর্দ্ধাংশভার গ্রহণ করেন, তিনিই সহধর্ম্মিণী। এইরূপ দাসীই সংসারের প্রকৃত দাসী, স্বামীর প্রকৃত সখী, স্বামীর প্রকৃত উপদেষ্ট্রী হইয়া স্বামীকে কর্ত্তব্যের পথে অটল রাখিতে পারে।

সংসারে পুরুষ একাধারে রাজা, দাস ও প্রতিপালক; স্ত্রী মন্ত্রী, দাসী এবং প্রতিপালিকা, অন্যান্য সকলেই প্রতিপাল্য। যে রাজ্যে সকলেই রাজার বশ্যতা স্বীকার করে, সেই রাজ্যই সুখের রাজ্য। যে রাজ্যে সকলেই স্ব-স্ব প্রধান, কেহ কাহাকেও মানে না, সে রাজ্য যেমন টিকিতে পারে না, যে সংসারে সকলেই স্ব স্ব প্রধান সে সংসারও তেমনি টিকিতে পারে না। স্বামীকে মনে করিতে হইবে সংসারের জন্যই তিনি, স্ত্রীকেও তেমনি মনে করিতে হইবে, স্বামীর সংসারের জন্যই তিনি। স্বামীকে মনে করিতে হইবে, তিনি সংসারের অধীন অথচ কর্ত্তা—স্ত্রীকে মনে করিতে হইবে, তিনি স্বামী এবং তাঁহার সংসারের অধীন অথচ কর্ত্রী। রাজা এবং রাণী আত্মসুখে মত্ত হইলে যেমন রাজ্য নষ্ট হয়, কর্ত্তা এবং কর্ত্রী আত্মসুখে মত্ত হইলেও তেমনি সংসার নষ্ট হয়। সংসার ক্ষেত্রে স্বামী স্ত্রী স্বেচ্ছা-সেবক (ভলাণ্টিয়ার) এবং স্বেচ্ছা-সেবিকা। স্বেচ্ছা-সেবক যেমন আত্মসুখের প্রতি কিছুমাত্র দৃষ্টি না করিয়া পরের সুখের জন্য সম্পূর্ণরূপে আত্মনিয়োগ করে, সংসারের কর্ত্তা এবং কর্ত্রীও তদ্রূপ আত্মনিয়োগ করিলে, সে সংসার সুখের হয়। ইহাতে আমি দাস, আমি দাসী ভাবিয়া অভিমান করিলে চলিবে না। স্ত্রী ও পুরুষ উভয়েই এই নিয়মে শিক্ষিত হওয়া আবশ্যক। স্ত্রী পুরুষ উভয়ে মিলিয়াই যদি একাঙ্গ হয়, তবে কে কার দাস, কে কার দাসী? তবে কর্ত্তার অধীনতা স্বীকার সকলকেই করিতে হইবে। কিন্তু অধীনতা স্বীকার করিলেই যে দাসী হইতে হইল, এমন নহে। প্রকৃতপক্ষে সংসারের প্রতিপালক স্বামী, স্ত্রী প্রতিপালিকা, মাতৃস্বরূপা। স্ত্রী আপনাকে দাসী মনে করিবে কেন?

সংসারের কর্ত্তা হইলেই পুরুষ স্বাধীন নহে। সাংসারিক কার্য্যে তাহাকে স্ত্রীর অধীনতা স্বীকার করিতেই হয়। আহার বিষয়ে পুরুষের কিছুমাত্র স্বাধীনতা নাই। অতিকষ্টে উপার্জ্জিত অর্থ স্ত্রীর হস্তে দিয়া, আহারের জন্য তাহার মুখাপেক্ষা হইয়া থাকিতে হয়। প্রকৃত হিন্দু রমণীও শিক্ষার গুণে অন্নপূর্ণা রূপে, স্বামীকে অতিযত্নে পাক করিয়া, আহার করান, আর যিনি বিলাসিনী, সংসারে অনভিজ্ঞা, সংসারে খাটাকে যিনি দাসীত্ব মনে করেন, তিনি পাচকের উপর

বরাত দিয়া নিশ্চিন্ত হন। এই দুইয়ের মধ্যে কোন্‌টী ভাল, কোন্‌টী রমণীর কর্ত্তব্য, যিনি সুশিক্ষা পাইয়াছেন, নিজের মাতা প্রভৃতিকে করিতে দেখিয়াছেন, তিনিই তাহা বাছিয়া লইতে পারেন। যাঁহারা পুরুষের সহিত সমান অধিকার পাইতে চাহেন, তাঁহারা কিছুতেই এ শিক্ষা গ্রহণ করেন না। সুতরাং সেখানে স্বামী নিজের সংসারেই ঠিক পরের মত পরপ্রত্যাশী হইয়া থাকেন। সে সংসারে কে থাকিবে, আর কাহাকে তাড়াইতে হইবে, এ বিষয়েও স্ত্রী সম্পূর্ণ স্বাধীনা। যদি স্ত্রী দাসীই হইতেন, তবে কি শাশুড়ীকে তাড়াইয়া মাতাকে আনিতে পারিতেন—দেবরকে তাড়াইয়া নিজের ভ্রাতাকে আনিতে পারিতেন—ননদিনীকে তাড়াইয়া ভগ্নীকে আনিতে পারিতেন? এখন আমরা প্রায় সংসারেই এই ভাব দেখিতে পাই। স্ত্রী সুশিক্ষা না পাওয়াতেই আমাদের সংসার এখন এই দশায় উপস্থিত হইয়াছে। তথাপি স্ত্রীকে দাসীত্ব করিতে হইতেছে বলিয়া আমরা চীৎকার করিতেছি। রমণীকে রমণীত্ব শিক্ষা দিবার অন্তরায় আমরাই।

হিন্দুগণ কোন দিনই স্ত্রীকে দাসী বিবেচনা করেন না। তবে বিবাহে যাত্রার সময় মাতা রীতি অনুসারে জিজ্ঞাসা করিলে বলিতে হয়, মা! তোমার জন্য দাসী আনিতে যাইতেছি। কিন্তু এই কথাতেই কেহ দাসী হয় না। আমি যেমন মাতার দাস, আমার স্ত্রীও তেমনী আমার মাতার দাসী। যদি তুমি মাতার দাসত্ব স্বীকার না কর, তবে তোমার স্ত্রী কেন তোমার মাতার দাসীত্ব স্বীকার করিবেন? তবে কেন তিনি তোমার মাতাকে তাড়াইয়া তাঁহার মাতাকে তোমার সংসারে আনিয়া না রাখিবেন? যে পুরুষ মাতাকে অন্ন-বস্ত্র দিতে পারেন না, তিনি অনায়াসেই শাশুড়ীকে অন্ন-বস্ত্র দিয়া থাকেন। যে পুত্র মাতার দাস হইতে লজ্জা বোধ করে, কিন্তু শাশুড়ীর দাস হইতে মাথা পাতিয়া দেয়, সে পুত্র নামের যোগ্যই নহে—সে সংসারে কর্ত্তা হইবার যোগ্যই নহে। সে স্ত্রীর দাস পদবাচ্য। তাহাকে ধিক্, শত ধিক্! যে স্বামী স্ত্রীকে সুশিক্ষা দেয় না, যাহার স্ত্রী পিতামাতার নিকট সুশিক্ষা পায় নাই, তাহার সংসারে এইরূপই ঘটিয়া থাকে।

কেহ কেহ বলেন, "হিন্দুগণ স্ত্রীকে রত্ন বলিতেন বটে, কিন্তু রত্ন [illegible] যত্ন করিবার জন্য অথবা বা [illegible] সহধর্ম্মিণী করিবার জন্য স্ত্রীলোকের [illegible] করিতেন, তাহা নহে। স্ত্রী দাসীর মত খাটিবে, নিজে না খাইয়া এবং সহস্র কষ্ট স্বীকার করিয়া পুরুষের সেবা করিবে এবং সংসারের স্থিতি সাধন করিবে, এই জন্যই স্ত্রীর প্রয়োজন হইত। এখন দেশ মধ্যে সভ্যতার বিস্তারে জীবনযাত্রার উচ্চতর আদর্শ প্রতিষ্ঠিত হইতেছে। লোকের বিবাহিত জীবনের দায়ীত্ব জ্ঞান জন্মিতেছে, নারীজাতির প্রতি সম্মান বর্দ্ধিত হইতেছে, নারীজাতিকে সুশিক্ষিত করা হইতেছে, সুতরাং এখনকার শিক্ষিত পুরুষ এরূপ ইচ্ছা করেন না যে, তাঁহার স্ত্রী দাস দাসীর মত খাটিয়া কষ্ট পায়।" এইরূপ পুরুষের দ্বারাই এখন স্ত্রীগণ কুশিক্ষা পাইতেছে।

হিন্দুগণ কোন্ স্ত্রীকে স্ত্রীরত্ন বলিতেন? যে স্ত্রী সংসারের জন্য দাসীর ন্যায় পরিশ্রম করে, শাশুড়ী, ননদিনী প্রভৃতির যত্ন করে, অন্নপূর্ণার ন্যায় পাক করিয়া সকলকে খাওয়াইয়া শেষে আহার করে, স্বহস্তে স্বামীর সেবা

করে, সংসারে যাহার প্রতি যেমন ব্যবহার করা কর্ত্তব্য তাহাই করে, সেই স্ত্রীই প্রকৃত রত্ন। এখন যে স্ত্রী স্বামীকে নিজের বিলাসের সামগ্রী যোগাইবার জন্য দাস মনে করে, সংসারের সকলকে দাস দাসীর মত মনে করিয়া ঘৃণা করে, কেহ না খাইতেই আপনি খাইয়া বসিয়া থাকে, শাশুড়ীকে তাড়াইয়া দেয়, সেই স্ত্রীই রত্ন বলিয়া কথিতা হয়। হিন্দুগণ এরূপ স্ত্রীকে "রত্ন" বলিতেন না। তাহাদের জন্য তাঁহারা "অলক্ষ্মী" শব্দ সৃষ্ট করিয়াছেন। কুশিক্ষাই রমণীরত্নকে এইরূপে নষ্ট করে।

হিন্দুর সংসারে স্ত্রী দাসীই বটে, কিন্তু কাহার দাসী? শাশুড়ীর দাসী, স্বামীর দাসী, ননন্দিনীর দাসী, পুত্রের দাসী, কন্যার দাসী। এক কথায় সংসারে যত প্রতিপাল্য থাকে স্ত্রী অর্থাৎ গৃহকর্ত্রী, সে সকলেরই দাসী, তেমনি পুরুষও সেই সকলের দাস। রাজা রাণী প্রজা রক্ষা করেন বলিয়াই কি তাঁহাদিগকে প্রজার দাস দাসী বলিতে হইবে? যে স্ত্রী কর্ত্রী হইয়াও নিজেকে সংসারের দাসী মনে করিতে পারে, নিজের সুখ স্বচ্ছন্দতার দিকে কিছুমাত্র দৃষ্টি রাখে না, পরের সুখ স্বচ্ছন্দতার দিকে সর্ব্বদা দৃষ্টি রাখে, সেই স্ত্রীই রত্ন নামের যোগ্যা। পিতামাতার সংসারে বালিকা বয়সে এবং বিবাহের পরে শ্বশুরালয়ে সুশিক্ষা পাইলেই স্ত্রী এইরূপ রত্ন হয়। এখন সেরূপ শিক্ষার অভাব, তাই রত্নের অর্থ পরিবর্ত্তিত হইয়াছে।

হিন্দুরমণীর কর্ত্তব্য কি? এ সম্বন্ধে হিন্দুশাস্ত্র লিখিত আছে—"স্ত্রীলোক বালিকাই হউন, যুবতীই হউন বা বৃদ্ধাই হউন, গৃহে থাকিয়া স্ত্রীলোকের কিঞ্চিৎমাত্র কার্য্যও স্বতন্ত্রভাবে করা উচিত নয়। স্ত্রীলোক বাল্যাবস্থায় পিতার বশে, যৌবনে স্বামীর বশে, স্বামী মরিয়া গেলে পুত্রের বশে থাকিবে, কখনও স্বাধীনভাবে থাকিবে না। স্ত্রীলোক পিতা, ভর্ত্তা বা পুত্রের সহিত বিচ্ছিন্নভাবে থাকিতে চেষ্টা করিবে না। ইহাদের সহিত পৃথক হইলে তিনি পিতৃকুল ও পতিকুল উভয় কুলই কলঙ্কিত করিয়া থাকেন। স্ত্রীলোকেরা সদাই প্রহৃষ্টমনে কাল যাপন করিবে, গৃহকর্ম্মে সুদক্ষা হইবে; গৃহসামগ্রী সকল পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখিবে এবং ব্যয় বিষয়ে অমুক্ত-হস্ত হইবে। পিতা যাহাকে দান করিয়াছেন, কিম্বা পিতার অনুমতিতে ভ্রাতা যাঁহাকে দান করিয়াছেন, সেই স্বামীর জীবিতকাল পর্য্যন্ত শুশ্রূষা করা ও স্বামীর মৃত্যুর পরেও তাঁহাকে উল্লঙ্ঘন না করা অর্থাৎ ব্যভিচারাদি না করা স্ত্রীলোকের কর্ত্তব্য।........শীল রহিত, পরদাররত, বিদ্যাদিগুণ বর্জ্জিত হইলেও পতিকে উপেক্ষা না করিয়া সাধ্বী স্ত্রী সর্ব্বদা দেবতার ন্যায় তাঁহার সেবা করিবেন। স্ত্রীলোক সম্বন্ধে—স্বামী বিনা পৃথক যজ্ঞ নাই; স্বামীর অনুমতি বিনা ব্রত নাই, উপবাস নাই, কেবল পতিসেবা দ্বারাই স্ত্রীলোক স্বর্গে গমন করেন। স্বামী জীবিত থাকুন বা মৃতই হউন, সাধ্বী স্ত্রী পতিলোকগামী হইয়া কখন তাঁহার অপ্রিয় আচরণ করিবেন না। পতি মৃত হইলে স্ত্রী বরং শুদ্ধ পুষ্পমূল ফলের দ্বারা জীবন ক্ষয় করিবেন, কিন্তু কখন পতি বিনা পরপুরুষের নামোচ্চারণও করিবেন না। যতদিন আপনার মরণ না হয়, ততদিন তিনি ক্লেশসহিষ্ণু ও নিয়মাচারী হইয়া মধু-মাংসাদি বর্জ্জনরূপ ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া একমাত্র পতিপরায়ণা সাধ্বী স্ত্রীলোকের যে অনুত্তম পরমধর্ম্ম, তৎপালনেই একাগ্র হইবেন।" *

* বালয়া বা যুবত্যা বা বৃদ্ধয়া বাপি যোষিতা। ন স্বাতন্ত্র্যেণ কর্ত্তব্যং কিঞ্চিৎ কার্য্যং গৃহেষপি।।১৪৭

এইরূপ ব্যবস্থা দেখিয়াই কেহ কেহ বলেন, "নারী হৃদয়ের স্বাভাবিক গতি ও বেদনাকে উপেক্ষা করিয়া পুরুষগণ ব্যবস্থা দিলেন যে, স্বামী যেমন চরিত্রেরই হউক, স্ত্রী তাহাকে দেবজ্ঞানে ভক্তি করিবে। তিনি পানাসক্ত ব্যভিচারী হউন, নরহন্তা দস্যু হউন, স্ত্রীকে তিনি যন্ত্রণার উপর যন্ত্রণা দিন, প্রহারের উপর প্রহার করুন, তবুও স্ত্রী যদি তাহাকে দেবতা ভিন্ন অন্য কিছু ভাবে, মনে মনে যদিও তাঁহাকে এক মুহূর্ত্তের জন্য নিন্দা করে, তবে পরকালে অনন্ত নরক ভোগ ভিন্ন তাহার আর উপায় নাই।"

এ কথা ঠিক। হিন্দুরমণীগণকে শাস্ত্রে এইরূপ শিক্ষাই দেয় বটে, এবং অনেক হিন্দুরমণী স্বামীর অপরাধের বিচারভার নিজ হস্তে না লইয়া, এই শিক্ষা অবনত মস্তকে প্রতিপালন করিয়া থাকেন। অবশ্য স্বামীর চরিত্র সংশোধন করিতে স্ত্রী চেষ্টা করিবেন, যদি নাই পারেন, তবে কি স্বহস্তে বিচারভার গ্রহণ করিয়া সংসারে অশান্তি ঘটাইবেন? তাহাতে কি সংসার টিকে? এ স্থলে সুতরাং স্ত্রীকে বাধ্য হইয়াই সংসারের শান্তি রক্ষা করিতে হইবে। অশান্তি করিলে বিপরীত ফল হইতে পারে। সুতরাং স্বামী ব্যভিচারী হইলে স্ত্রী তাহার সেবা করিবে না, এ শিক্ষাই কুশিক্ষা। শান্তির প্রতিমূর্ত্তি হিন্দু রমণীকে এ শিক্ষা দেওয়া উচিত নহে। কথায় কথায় স্বামী পরিত্যাগ, স্ত্রী পরিত্যাগ হিন্দুর কার্য্য নহে।

অনেকে বলেন, "নিজে ভক্তির যোগ্য না হইয়া স্ত্রীর কাছে ভক্তি পাইবার যে চেষ্টা, স্বর্গের লোভ ও নরকের ভয় দেখাইয়া এই শাসন বাক্য তাহারই একটা সামাজিক কৌশল মাত্র। কিন্তু ইহাতে যেমন নিজেদের ক্ষুদ্রতার পরিচয় দেওয়া হয়, তেমনি নারীগণকেও ক্ষুদ্র করিয়া তুলিবার চেষ্টা করা হয়। ফলতঃ নারীর নিকট হইতে যদি আমরা ভক্তি পাইতে চাই, তবে সর্ব্বাগ্রে আমাদিগকে সেই ভক্তি পাইবার যোগ্য হইতে হইবে। এবং নারীও যাহাতে মহত্ত্ব চেনে তজ্জন্য তাহাদের তদুপযোগী চিত্তবিকাশের উপায় করিতে হইবে। নারীকে দাসী মনে করিয়া কেবল মাত্র তাহাকে দাসীর কর্ত্তব্য শিক্ষা দিলে চলিবে না। কারণ, বস্তুতঃ নারী দাসী নহে। নারীর সমস্ত শক্তিই যদি সেবা ধর্ম্মে পর্য্যবসিত হইয়া যায়, তবে আমরা সংসারের কঠোর কর্ম্মক্ষেত্রে দাঁড়াইব কাহার অবলম্বনে? সুতরাং আমাদের ব্যক্তিগত জীবনে স্ত্রী যেমন দাসীর ন্যায় সেবা করিবেন, সেইরূপ আমাদের সামাজিক জীবনেও সখার ন্যায়, বন্ধুর ন্যায়, উপদেষ্টার

বাল্যে পিতুর্ব্বশে তিষ্ঠেৎ পাণিগ্রাহস্য যৌবনে।
পুত্রাণাং ভর্ত্তরি প্রেতে ন ভজেৎ স্ত্রী স্বতন্ত্রতাম্॥ ১৪৮
পিত্রা ভর্ত্রা সুতৈর্ব্বাপি নেচ্ছেদ্বিরহমাত্মনঃ।
এষাং হি বিরহেণ স্ত্রী গর্হ্যে কুর্য্যাদুভে কুলে॥ ১৪৯
সদা প্রহৃষ্টয়া ভাব্যং গৃহকার্য্যেষু দক্ষয়া।
সুসংস্কৃতোপস্করয়া ব্যয়ে চামুক্তহস্তয়া॥ ১৫০
যস্মৈ দদ্যাৎ পিতা ত্বেনাং ভ্রাতা বানুমতে পিতুঃ।
তং শুশ্রূষেত জীবন্তং সংস্থিতং চ ন লঙ্ঘয়েৎ॥ ১৫১
বিশীলঃ কামবৃত্তো বা গুণৈর্বা পরিবর্জ্জিতঃ।
উপচর্য্যঃ স্ত্রিয়া সাধ্ব্যা সততং দেববৎ পতিঃ॥ ১৫৪
নাস্তি স্ত্রীণাং পৃথগ্‌যজ্ঞো ন ব্রতং নাপ্যুপোষিতম্।
পতিং শুশ্রূষতে যেন তেন স্বর্গে মহীয়তে॥ ১৫৫
পাণিগ্রাহস্য সাধ্বী স্ত্রী জীবতো বা মৃতস্য বা।
পতিলোকমভীপ্সন্তী নাচরেৎ কিঞ্চিদপ্রিয়ম্॥ ১৫৬
কামন্তু ক্ষপয়েদ্দেহং পুষ্পমূলফলৈঃ শুভৈঃ।
নতু নামাপি গৃহ্ণীয়াৎ পত্যৌ প্রেতে পরস্য তু॥ ১৫৭
আসীতামরণাৎ ক্ষান্তা নিয়তা ব্রহ্মচারিণী।
যো ধর্ম্ম একপত্নীনাং কাঙ্ক্ষন্তী তমনুত্তমম্॥ ১৫৮

মনুসংহিতা ৫ম অধ্যায়।

স্থায় আমাদিগকে কর্ত্তব্যের পথে অটল রাখিতে চেষ্টা করিবেন। এ বিঘ্নসঙ্কুল সংসারে মানুষ সকল সময়ে লক্ষ্যের পথ ঠিক রাখিয়া চলিতে পারে না। এইরূপে পুরুষের লক্ষ্যচ্যুতির সম্ভাবনা যখন প্রবল হইবে, স্ত্রী তখন আত্মশক্তির প্রভাবে তাঁহাকে আত্মজ্ঞান ও সংযমের মধ্যে প্রবুদ্ধ করিয়া তুলিবেন। ইহাই সহধর্ম্মিণীর কাজ। সুতরাং স্ত্রীকে সহধর্ম্মিণী হইতে হইবে।"

উপরের কথাগুলি বিদ্যালয়ে শিক্ষিত ব্যক্তির কথা। কিন্তু সংসারে যে ব্যক্তি অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন, ইহা তাঁহার কথা নহে। আজ কাল হিন্দুরমণীগণ এইরূপ শিক্ষিত পুরুষের নিকট শিক্ষা পাইয়াই সংসারে অশান্তি সৃষ্টির কারণ হইতেছেন। হিন্দুগণ স্ত্রীকে দাসী মনেই করিতেন না। হিন্দুর সংসারে স্ত্রী পুরুষ উভয়েই স্বেচ্ছাসেবক এবং স্বেচ্ছাসেবিকা স্বরূপ। সমাজ রক্ষার্থ—সমাজে বিশৃঙ্খলা নিবারণার্থ ইহাদিগকে কতকগুলি নিয়মে আবদ্ধ রাখিতে হয় মাত্র। ভক্তি পাইতে ইচ্ছা করিলে ভক্তির যোগ্য হইতে হইবে, ইহা সুশিক্ষা বটে, কিন্তু কয়জন তাহা পারে? যদি কেহ না পারে, তবে কি তাহার সংসার ছারখার করিতে হইবে? খ্রীষ্ট উপদেশ দিয়াছেন, "তোমার বাম গণ্ডে কেহ চড় মারিলে তুমি দক্ষিণ গণ্ড পাতিয়া দিবে।" তাঁহার কয়জন শিষ্য এই উপদেশ মানিয়া চলে? হিন্দুভাবে শিক্ষিতা রমণীই প্রকৃত সহধর্ম্মিণী।

কলিকাতা কালীঘাটে বিশেষ বিশেষ পর্ব্বোপলক্ষে যাত্রীর অত্যন্ত ভিড় হয়। অনেকে সুবিধা মত দেবীকে দর্শন করিতে পায় না, অনেকে বিবিধ প্রকার লাঞ্ছনা ভোগ করেন। এইরূপ পর্ব্বের সময় কতকগুলি স্বদেশহিতৈষী সহৃদয় যুবক স্বেচ্ছাসেবক হইয়া যাত্রীদিগের দেবী দর্শনের সুবিধা করিয়া দেন। একবার একদল স্বেচ্ছাসেবক এইরূপ কার্য্যে ব্রতী হইয়াছিলেন। যিনি দেবীর মন্দির মধ্যে থাকিয়া যাত্রীদিগকে দেবী দর্শনের সুযোগ করিয়া দিতেন, তাঁহার একঘণ্টা পর বদলী হইবার নিয়ম ছিল। তাঁহাদের ক্যাপ্টেন একথা ভুলিয়া যাওয়ায় যে যুবকের পালা ছিল, তিনি অসহ্য হইলেও আর একজন না যাওয়া পর্য্যন্ত বিনা আদেশে স্থান ত্যাগ করেন নাই। পরে ক্যাপ্টেনের মনে হইলে তিনি আর একজনকে পাঠাইয়া দিলেন। সে ব্যক্তি যাইয়া তাঁহার নিকট হইতে কার্য্যভার গ্রহণ করিল। তখন যুবকটী সেই স্থানেই অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া গেলেন। সকলে ধরাধরি করিয়া বাহিরে আনিয়া সুশ্রূষা করিলে যুবক সুস্থ হইলেন। যতক্ষণ কর্ত্তব্যজ্ঞান ছিল, ততক্ষণ এই যুবক গ্রীষ্মাতিশয্যে অত্যন্ত পীড়িত হইলেও মূর্চ্ছিত হন নাই, আপন কর্ত্তব্যকার্য্য সম্পাদন করিয়াছেন। কর্ত্তব্যজ্ঞানে লোক অন্ধ না হইলে এরূপ ভাবে কার্য্য করিতে পারে না। সংসারে স্ত্রী-পুরুষও এইরূপ কর্ত্তব্যজ্ঞানে আত্মসুখের প্রতি অন্ধ হইয়া সংসারে দাসীত্ব এবং দাসত্ব করিবেন। হিন্দুর সংসারে ও শাস্ত্রে ইহাই ব্যবস্থা। প্রকৃত পক্ষে ইহা দাসীত্ব ও দাসত্ব নহে, মাতৃত্ব ও পিতৃত্ব। এখন হিন্দুরমণী এ শিক্ষা পায় না।

স্বেচ্ছাসেবকগণ স্বীয় কার্য্যের জন্য যেরূপ সম্মান পাইতে স্বত্ববান, শাস্ত্রকারগণ হিন্দুরমণীর পক্ষে সে ব্যবস্থার কিছুমাত্র ত্রুটী করেন নাই। মনু লিখিয়াছেন :—

"স্ত্রীলোককে বহুমান পূর্ব্বক ভোজনাদি প্রদান ও ভূষণাদি দ্বারা সদাই ভূষিত করা

বহু কল্যাণকামী পিতা, ভ্রাতা, পতি এবং দেবরগণের কর্ত্তব্য। যে কুলে নারীগণের সম্যক সমাদর আছে, দেবতারা তথায় প্রসন্ন আছেন। আর যে পরিবারে স্ত্রীলোকের পূজা নাই, সেই পরিবারে যাগাদি ক্রিয়া কর্ম্ম সমুদায় বৃথা হইয়া যায়। যে পরিবার মধ্যে স্ত্রীলোকেরা সদাই দুঃখিতা থাকেন, সেই কুল আশু বিনাশ প্রাপ্ত হয়। যথায় স্ত্রী-লোকের কোন দুঃখ নাই, সেই পরিবারের সর্ব্বদা শ্রীবৃদ্ধি হয়। স্ত্রীলোকগণ অসৎকৃত থাকাতে যে গৃহে অভিসম্পাত করেন, সেই কুল অভিচারাহতের ন্যায় সর্ব্বতোভাবে বিনাশ প্রাপ্ত হয়। অতএব যাঁহারা শ্রীবৃদ্ধি কামনা করেন, বিবিধ সৎকার্য্যকালে এবং উৎসবকালে নিত্যই অসন বসন ভূষণাদিদ্বারা স্ত্রীলোকের সমাদর করা তাঁহাদের কর্ত্তব্য। যে পরিবার মধ্যে ভর্ত্তা ও ভার্য্যা উভয়ে পরস্পর পরস্পরের উপর নিত্য সন্তুষ্ট থাকেন, নিশ্চয়ই সে কুলে কল্যাণ অবস্থিতি করে।"*

যে সংসারে স্ত্রীলোক এইরূপে সম্মানিতা হয়, সে সংসারে কি তাহাকে দাসী বলা যাইতে পারে? হিন্দুগণ স্ত্রী পুরুষকে যেমন নিজ সংসারের স্বেচ্ছাসেবক করিয়া দিয়াছেন, তেমনি তাহাদের সুখ সম্মানের বিধানও করিয়া দিয়াছেন। এ শিক্ষা বিদ্যালয়ে বিদ্যাশিক্ষা করিয়া হয় না, ইহার শিক্ষা স্বতন্ত্র। পুরুষ বিদ্যালয়ে বিদ্যাশিক্ষা করিয়া বুঝিলেন, স্ত্রীর সহিত দাসীর ন্যায় ব্যবহার করা অন্যায়। স্ত্রী বিদ্যালয়ে বিদ্যাশিক্ষা করিয়া ভাবিলেন, তিনি পুরুষের অধীন হইবেন কেন? সংসারেই বা দাসীত্ব করিবেন কেন? শাশুড়ী, ননদিনী প্রভৃতিই বা তাহার উপর প্রভুত্ব করিবেন কেন? তিনি এসব কিছুই হইতে দিবেন না। এই স্ত্রী পুরুষ উভয়ের মিলন হইল, কিন্তু উভয়েই সংসারে অনভিজ্ঞ। পুরুষ গোলামী করিয়া অর্থ আনিয়া স্ত্রীকে দিলেন। স্ত্রী তাহার সদ্ব্যয় করিতে শিক্ষা করেন নাই, সংসারের কার্য্যেও সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞা, মিলিয়া মিশিয়া থাকিতে শিক্ষা পান নাই, সুতরাং স্বামীর অতিকষ্টে উপার্জ্জিত সেই অর্থ বৃথা কার্য্যে ব্যয় করিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি সেই অর্থদ্বারা দাস নিযুক্ত করিয়া তাহার হস্তে ভাণ্ডার সমর্পণ করিলেন। সে সংসারে আনীত দ্রব্যাদির একজন ভাগী হইয়া দাঁড়া-ইল, অনেক জিনিস ভাণ্ডার হইতে তাহার বাড়ীতে গেল, অনেক জিনিস তাহার দ্বারা গোপনে বাজারে বিক্রীত হইতে লাগিল। সুশিক্ষিতা গৃহিণী স্বামীর কষ্টে উপার্জ্জিত অর্থ দ্বারা দাসী রাখিলেন। ভাণ্ডার হইতে জিনিস তাহার হাতে গেল। সে ত ধর্ম্মপুত্রী নহে, সে একজন ভাগী মাত্র, সুতরাং সে ঐ জিনিস হইতে কতকাংশ সরাইয়া রাখিল, যথাসময়ে তাহা তাহার বাড়ীতে নীত হইল। স্বামীর উপার্জ্জিত অর্থ দ্বারা গৃহিণী পাচক রাখিলেন—অবশিষ্ট জিনিসগুলি সেই পাচকের

---

* পিতৃভির্ভ্রাতৃভিশ্চৈতাঃ পতিভির্দেবরৈস্তথা।
পূজ্যা ভূষয়িতব্যাশ্চ বহুকল্যাণমীপ্সুভিঃ॥ ৫৫
যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ।
যত্রৈতাস্তু ন পূজ্যন্তে সর্ব্বাস্তত্রাফলাঃ ক্রিয়াঃ॥ ৫৬
শোচন্তি জাময়ো যত্র বিনশ্যত্যাশু তৎকুলম্।
ন শোচন্তি তু যত্রৈতা বর্দ্ধতে তদ্ধি সর্ব্বদা॥ ৫৭
জাময়ো যানি গেহানি শপন্ত্য প্রতি পূজিতাঃ।
তানি কৃত্যাহতানীব বিনশ্যন্তি সমন্ততঃ॥ ৫৮
তস্মাদেতাঃ সদা পূজ্যা ভূষণাচ্ছাদনাশনৈঃ।
ভূতিকামৈর্নরৈর্নিত্যং সৎকারেষূৎসবেষু চ॥ ৫৯
সন্তুষ্টো ভার্য্যয়া ভর্ত্তা ভর্ত্রা ভার্য্যা তথৈবচ।
যস্মিন্নেব কুলে নিত্যং কল্যাণং তত্র বৈধ্রুবম্॥ ৬০
মনুসংহিতা ৩য় অধ্যায়।

হাতে পড়িল। সে তাহা হইতে স্বীয় ভাগ গ্রহণ করিল, যাহা থাকিল, তাহা হইতে নিজের যোগ্য উত্তম খাদ্য রাখিয়া যাহা অবশিষ্ট থাকিল, তাহা হইতে দাস দাসীর জন্য কিছু কিছু রাখিয়া দিল। না রাখিলে তাহারা অসন্তুষ্ট হইবে, তাহাতে স্বীয় ভাগ গ্রহণে অসুবিধা হইবে। এইরূপে ভাগীগণ আপনাপন ভাগ লইয়া যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহাই কর্ত্তা ও কর্ত্রীর সম্মুখে নীত হয়। কর্ত্তা গোলামী করিতে যাইবেন, তাঁহার দেখিবার সময় কোথায়? তিনি তাড়াতাড়ি মুখ পোড়াইয়া খাইতে বসিলেন। কর্ত্তব্য-পরায়ণা কর্ত্রী বড় জোর একখানি পাখা লইয়া বসিলেন, স্বামী মহাশয় স্ত্রীর যত্ন দেখিয়া ভুলিয়া গেলেন। স্ত্রী সুবিধা বুঝিয়া কাছারী হইতে আসিয়া শ্যাকরা ডাকাইবার কথাটী মনে করিয়া দিলেন। কর্ত্তা কাছারীতে গেলেন, তখন কর্ত্রী যৎকিঞ্চিৎ আহার করিলেন। তিনি অধিক খাইতে পারেন না, কেন না, পরিশ্রমের অভ্যাস না থাকায় তাঁহাকে নিষ্কর্ম্মা হইয়া বসিয়া থাকিতে হয়, সুতরাং বেশী খাইলে অজীর্ণ হয়। গৃহিণী স্বামীর কষ্টোপার্জ্জিত অর্থ দ্বারা দুগ্ধ কিনিলেন, তাহা দাসী ও পাচকের হাতে পড়িল। একে গোয়ালার দুগ্ধ, নিতান্ত পক্ষে অর্দ্ধপরিমাণ জল বিশিষ্ট, দাসী ও পাচক তাহাদের ভাগ লইয়া তাহাতে আরও জল মিশ্রিত করিয়া রাখিল। কর্ত্তা ও গৃহিণী তাহাই পরিতোষ সহকারে পান করিলেন। যে সংসারে স্ত্রী দাসী নহেন, স্বহস্তে কার্য্য করেন না, নিজে ভাণ্ডার রাখেন না, নিজে পাক করেন না, সে সংসারে এইরূপ দশা নিত্য ঘটিতেছে। কে বলিবে এই সংসার সুখের! এখন যে কর্ত্তা যত উপায় করেন, তাঁহার ভাগ্যে তত অধিক, এইরূপ দুঃখ ঘটিয়া থাকে—তাঁহার সহধর্ম্মিণী তত অর্থ এইরূপে নষ্ট করিয়া থাকেন। কুশিক্ষাতেই এইরূপ হইতেছে।

যে রমণী বাল্যকালে কোন শিক্ষা পায় না, সেই সংসার পরিচালনে অনভিজ্ঞা, ১৫।১৬ বৎসর বয়সে স্বামীর সংসারে গিয়া একেবারে কর্ত্রী হইয়া বসেন। সংসারটী যে তাঁহার, এ জ্ঞান সঙ্গে সঙ্গেই হয়। তখন শাশুড়ী, ননদিনী প্রভৃতির কর্ত্তৃত্ব তিনি মোটেই পছন্দ করেন না, সতত তাঁহাদের উপর প্রভুত্ব করিতে চান—তাঁহাদিগকে প্রকৃত দাসীত্বে পরিণত করিতে চান, কাজেই সংসার তখন বিষময় হইয়া উঠে, কর্ত্তা বিচলিত হন, মাতা, ভগ্নী, ভ্রাতা প্রভৃতি স্বেচ্ছাসেবকগণকে তাড়াইয়া দেন। কিন্তু সংসারের কার্য্য ত চলা চাই, সুতরাং তাহাদের পরিবর্ত্তে বেতনভুক্ দাস দাসী আসিয়া জুটে। সকলেই জানেন, অবৈতনিক স্বেচ্ছাসেবক দ্বারা যে কার্য্য হয়, দাস দাসী দ্বারা তাহার একাংশও হয় না। সুতরাং নিতান্ত অসুবিধা ঘটিলে, সুবিধা থাকিলে, কর্ত্রী নিজের বিধবা মাতা, বিধবা ভগ্নী প্রভৃতিকে আনিয়া রাখেন। এইরূপে পুরুষের কষ্টোপার্জ্জিত পয়সা তাহার মাতা ভগ্নী প্রভৃতি নিঃস্বার্থ স্বেচ্ছাসেবকেরা ভোগ করিতে পান না, স্ত্রীর মাতা, ভগ্নী প্রভৃতি তাঁহাদের স্থান গ্রহণ করে। তাঁহাদের প্রাপ্য ভাগ একটা অবশ্যই থাকে, তাহা তাঁহাদের বাড়ীতে যায়। এই জন্যই শাশুড়ী প্রভৃতিকে নিঃস্বার্থ স্বেচ্ছাসেবক বলা যায় না। মাতা, ভগ্নী যেরূপ প্রাণের টানে সেবা শুশ্রূষা করে, দাস দাসী প্রভৃতির নিকট এরূপ আশা করা যায় কি? যে পুরুষের সংসার এইরূপ বিশৃঙ্খল, তাহার সুখ কোথায়? এইরূপ স্ত্রীকে কি সহধর্ম্মিণী বলা যায়?

যাঁহারা সংসারে স্ত্রীর দাসীত্বের ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাঁহারাও মানুষ ছিলেন, আমাদের অপেক্ষা যে একেবারে নির্ব্বোধ ছিলেন, তাহা নহে। তাঁহারা স্ত্রীর সম্বন্ধে যেমন দাসীত্বের ব্যবস্থা করিয়াছেন, তেমনি আবার তাঁহাদের সাহায্য জন্য নিঃস্বার্থ দাসীর ব্যবস্থা করিয়াছেন। বিধবা শাশুড়ী, বিধবা ননদিনী, বিধবা দেবর পত্নী প্রভৃতি সংসারের নিঃস্বার্থ সেবাপরায়ণা দাসী। এমন নিঃস্বার্থ যে একবেলা একমুষ্টি আতব চাউল ও কাঁচকলা, পরিধেয় বস্ত্র, সম্বন্ধানুসারে অবশ্য প্রাপ্য একটু সম্মান এবং মিষ্ট কথা ব্যতীত আর তাঁহারা কিছুর প্রত্যাশা রাখেন না। এখনকার সুশিক্ষিতা স্ত্রী এটুকুও দিতে এবং করিতে প্রস্তুত নহেন। তাই তাঁহারা বিধবা শাশুড়ী, বিধবা ননদিনী প্রভৃতিকে দেখিতেই পারেন না। এ ভাব সযত্নে পরিহার করিতে শিক্ষা করাই কর্ত্তব্য।

আজ আমরাই সংসার করিতেছি, আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ, হিন্দুশাস্ত্রকর্ত্তাগণ, সংসার করেন নাই, এরূপ নহে। তাঁহারা দেখিয়া, ঠেকিয়া, শিখিয়া যে ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন, তাহাতে কাহারও প্রতি অব্যবস্থা, কাহারও প্রতি সুব্যবস্থা করা হয় নাই। যে খানে যেমন আবশ্যক, সেখানে তাহাই করিয়াছেন। তাঁহাদের নির্দ্দেশমত প্রস্তুত করিতে হইলে সেইরূপ শিক্ষা আবশ্যক। সে শিক্ষা বিদ্যালয়ে হয় না। কিণ্ডারগার্টেন প্রণালীতে, আমোদের সঙ্গে, খেলার সঙ্গে, সংসারের কার্য্যের সঙ্গে, এই শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা আছে। এ ব্যবস্থা কাহাকেও বলিয়া দিতে হয় না। পরস্পর দেখিয়া বালক-বালিকাগণ শিক্ষা করে।

বালিকা খেলা করিতে করিতে পাক করিতে শিক্ষা করে। তাহার সেই খেলার পাকশালা কিরূপে সাজাইতে হয়, কিরূপে পরিষ্কার রাখিতে হয়, কিরূপে পাক করিতে হয়, কিরূপে তরকারী কুটিতে হয়, তাহা খেলার সঙ্গে সঙ্গেই শিক্ষা করে। পরস্পরের খেলা ঘর তাহারা তুলনা করিয়া দেখে, কে কাহার ঘর কত পরিষ্কার রাখিয়াছে। ইহা ছাড়া পুতুল খেলা আছে। বালিকাগণ নানাবিধ পুতুল লইয়া নিজের খেলাঘর সাজায়। কোন পুতুল তাহার পুত্র, কোন পুতুল তাহার কন্যা, কেহ বা পৌত্র, কেহ বা দৌহিত্র। একজন অপরের কন্যার সহিত নিজ পুত্রের বিবাহ দেয়। এই বিবাহ-ব্যাপারে ভোজের ঘটা অতি শিক্ষাপ্রদ। কাহার শাশুড়ী কিরূপ, কাহার ননদিনী কিরূপ, তাহার অভিনয়ও মুখে মুখে হয়। শাশুড়ী পূজ্যা, তিনি শাসন করিলে উত্তর করিতে হয় না, শ্বশুরবাড়ীর নিন্দা করিতে হয় না ইত্যাদি শিক্ষাও এই সময় বালিকারা নিজ নিজ পুতুল কন্যাদিগকে শিক্ষা দেয়। কেহ পুত্রবধূকে আনিয়া আর ছাড়িয়া দেয় না, তাহা লইয়া পরস্পর কৃত্রিম ঝগড়া পর্য্যন্ত করে। কখন কখন এই কৃত্রিম ঝগড়া আসলে পরিণত হইয়া বহুদিন কথা পর্য্যন্ত বন্ধ থাকে। পুরুষের সমক্ষে কেমন করিয়া ঘোমটা দিতে হয়, "চুক্ চুক্" শব্দ করিয়া কেমন করিয়া ডাকিতে হয়, ইত্যাদি শিক্ষা করে। "অমুক ঘোমটা দেয় না", বড়ই নির্লজ্জ, "অমুক অন্য লোকের সমক্ষেই স্বামীর সহিত বড় বড় করিয়া কথা বলে, তাহার মত নির্লজ্জ আর নাই", ইত্যাদিরূপে অভিনয়চ্ছলে অতি শৈশবকাল হইতেই বালিকাগণ স্বামীগৃহে বাস-প্রণালী শিক্ষা করে। খেলার ঘরে কন্যার শ্বশুরবাড়ী

যাইবার অভিনয় হয়। খেলার শ্বশুরবাড়ী যাইবার সময় পিতা কান্দিতেছেন দেখিয়া কন্যা বলিতেছে—

এত টাকা দিয়ে বাবা দূরে দিলে বিয়ে।
এখন কেন কাঁদ বাবা গামছা মুড়ি দিয়ে॥

এইরূপ ক্রীড়াচ্ছলে বালিকা শৈশবকাল হইতেই দূরে শ্বশুরালয়ে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতে থাকে। গৃহকার্য্য করিতে শিক্ষা করে। কাহার সহিত কিরূপ ব্যবহার করিতে হয়, খেলাচ্ছলে তাহাও শিক্ষা করে। একটু বড় হইলে মাতা প্রভৃতির সহিত গৃহকার্য্য হাতে হাতে শিক্ষা পায়। মাতা, ভ্রাতৃবধূ প্রভৃতির দেখিয়া শ্বশুরালয়ের লোকের প্রতি ব্যবহার শিক্ষা করে। সুতরাং এ সব শিক্ষা তাহার উত্তমরূপেই হয়। যেমন শিক্ষা করে, সেখানে গিয়া ঠিক সেইরূপই করে।

পিতৃগৃহে শিক্ষা হইতে হইতেই অষ্টম বৎসরে বিবাহ হইলেই, কন্যা শ্বশুরালয়ে গিয়া তথাকার রীতিনীতি হাতে হাতে শিক্ষা করে। শাশুড়ীকে মাতার ন্যায় জ্ঞান করিতে শিক্ষা করে, কাহার সহিত কিরূপ ব্যবহার করিতে হইবে, তাহা শিক্ষা করে, দেবরগণের সহিত ছোটবেলা হইতে বাস করিয়া তাহাদিগকে নিজের ভ্রাতার ন্যায় দেখিতে শিক্ষা পায়। কাঁচা বয়সে গিয়া শ্বশুর শাশুড়ীকে যে মান্য করিতে শিক্ষা করে, তাঁহাদের নিকট যে অবনত হয়, সে চিরকাল সেইরূপ থাকিতে পারে। যে বালিকা শাশুড়ীর পায়ে প্রতিদিন তৈল মর্দ্দন করিয়া তাঁহার পদে অভিমানকে উৎসর্গ করিতে শিক্ষা করে, সে বড় হইলে আর শাশুড়ীর অবাধ্য হইতে পারে না, তাঁহাকে মাতার ন্যায় দেখে, তাড়াইতে পারে না, যা তা বলিয়া ঝগড়া করিতে পারে না। যে সমস্ত বালিকার অধিক বয়সে বিবাহ হয়, তাহারা স্বামীর বাড়ীতে গিয়া ঠিক সেই পরিবারের সহিত মিশিতে পারে না, তাহাদিগকে আপন মনে করিতে পারে না। সে কাহারও পদে তৈল মর্দ্দন করিয়া আত্মাভিমানকে সেই পদে বলি দিতে পারে না, কাহারও নিকট নিজ মস্তক অবনত করিতে পারে না, সুতরাং শ্বশুরালয়ে গিয়া শাশুড়ীর পায়ে তৈল মর্দ্দন করিতে বলিলে তাহার আত্মাভিমানে আঘাত লাগে, তাই তাহার উন্নত মস্তক কাহারও নিকট নত হয় না; স্বামীর নিকটেও না। সে পারেই না। শাশুড়ীকে মা বলিতে সে লজ্জায় মরিয়া যায়—তাই শাশুড়ীকে এবং স্বামীর আর কোন আত্মীয়কেই আপন ভাবিতে পারে না। উপার্জ্জনক্ষম স্বামীকে লইয়া সে স্বতন্ত্রা হইতে ইচ্ছা করে। কোন কোন স্থলে এমন প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে যে, শ্বশুর শাশুড়ীর অধীনতা ত্যাগ করিয়া পৃথকভাবে বাস করিবার ইচ্ছায় বিবিধ অবৈধ কৌশলও অবলম্বন করে। অধিক বয়সে বালিকাদিগের বিবাহ হইলে, বাল্যশিক্ষার অভাবে এই সমস্ত ঘটিয়া থাকে। স্বামী ঠেকাইতে পারেন না। যে স্বামী স্ত্রীর বাধ্য হইয়া বিধবা মাতা বা বিধবা ভগ্নীকে তাড়াইয়া দেন, তিনিই আবার স্ত্রীকে দাসীত্ব করিতে হইবে বলিয়া দাস দাসী, পাচক ইত্যাদি রাখিয়া দেন। অবৈতনিক প্রতিপাল্যা স্বেচ্ছাসেবিকা ও স্বেচ্ছাসেবকদিগকে তাড়াইয়া দিয়া, বৈতনিক সেবক ও সেবিকাদিগকে রাখেন। একমুষ্টি আতব তণ্ডুল দিলে যিনি সন্তুষ্ট থাকেন, তাঁহাকে তাড়াইয়া দিয়া কত খরচ বৃদ্ধি করিয়া থাকেন। আজ কাল যাঁহারা শিক্ষিত

বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন, তাঁহারাই এরূপ করেন। পল্লীগ্রামেও এই বাতাস বহিয়াছে। সেখানকার শান্তিও নষ্ট হইয়াছে। এখন আর পল্লীগ্রামের সে দিন নাই। আমরাই দেখিয়াছি এবং দেখিতেছি, যে পল্লীগ্রামে ঘরে ঘরে অন্নপূর্ণা বিরাজ করিত, এখন সেখানে পাকের নাম শুনিলে বধূগণের হৃৎকম্প উপস্থিত হয়, গায়ে জ্বর আইসে। কোন ব্যাপারের বাড়ীর লোক দেখিলে পাক করিতে বলিতে আসিতেছে মনে করিয়া আগেই পলাইয়া যায়, না হয় রোগের ভান করে। পাচক ব্রাহ্মণ ব্যতীত ব্যাপার নির্ব্বাহ হয় না। ইহা হিন্দু বাঙ্গালীর যে ঘোর দুরদৃষ্টের বিষয়, তাহাতে সন্দেহ নাই।

যে বঙ্গবধূ নিজে রন্ধন করিয়া স্বামী, শ্বশুর, দেবর প্রভৃতিকে সযত্নে আহার করাইয়া, দাস দাসীগণকে আহার করাইয়া, নিজে আহার করতঃ তৃপ্তি লাভ করিতেন, আপনাকে কৃতার্থ বোধ করিয়া কত আহ্লাদিত হইতেন, অমুক ব্যঞ্জন ভাল হইয়াছে বলিলে নিজের ভাগশুদ্ধ তাহাকে খাওয়াইয়া তৃপ্তি লাভ করিতেন, আজ সেই স্থান কে অধিকার করিয়াছে? পরিশ্রম করিতে কাতরা, সুতরাং রুগ্না, একান্নভুক্ত পরিবার-রীতির প্রতি বিদ্বেষযুক্তা, শাশুড়ী ননদিনীকে বহিষ্করণ-নীতিযুক্তা, বিদ্যালয়ে সুশিক্ষিতা, পুরুষভাবাপন্না সফ্রিগেট রমণী আজ সেই মায়াময়ী মাতৃসমা স্বেচ্ছাসেবিকা অন্নপূর্ণার স্থান অধিকার করিয়াছে। কন্যার মাতা জামাতার বাড়ীতে আশ্রয় পাইতেছে, কিন্তু পুত্রবতী মাতার মাথা লুকাইবার স্থান নাই। এ কি দুর্দ্দৈব! কি দুরদৃষ্ট! যাঁহারা অবস্থাপন্ন, তাঁহারা এ দুর্দ্দৈবের মর্ম্ম বুঝিবেন না, স্ত্রীর অধীন মাতা থাকিতে না পারিলে, তিনি মাতাকে কিঞ্চিৎ মাসহারা দিয়া তীর্থস্থানে পাঠাইয়া তাঁহার সুবিধা করিয়া দিতে পারেন—কিন্তু যিনি দরিদ্র, যিনি অতিকষ্টে যৎসামান্য অর্থ উপার্জ্জন করেন, তিনি সেই অর্থদ্বারা বৃদ্ধা মাতার সেবা করিতে পারেন না, অথচ বহু অর্থ ব্যয় করিয়া স্ত্রীর দাসীত্ব দূর করিবার জন্য দাসী রাখিয়া অর্থ নিঃশেষিত করেন, মাতাকে কিঞ্চিৎ মাসহারা দিবার সামর্থ্যও রাখেন না। হিন্দুরমণীর সুশিক্ষা অভাবেই যে এরূপ ঘটিতেছে, তাহাতে কি আর সন্দেহ আছে? সুশিক্ষা বলেই এখন সকলেই বিদ্যালয়ে রাশি রাশি পুস্তক পড়া বুঝেন। এইরূপ বুঝিবার দোষেই বঙ্গের ঘরে ঘরে অশ্রুজলে গণ্ডস্থল প্লাবিতা বৃদ্ধা মাতা, নিরাশ্রয়া ভগ্নীমূর্ত্তি দেখা যায়।

অনেকে বলেন, "বাল্য বিবাহের জন্য বঙ্গদেশ ছারখার হইয়া গেল। অদূরদর্শী শাস্ত্রকর্ত্তাগণ বাল্য বিবাহের ব্যবস্থা দিয়া বাঙ্গালাকে ডুবাইয়া দিয়াছেন। একথা ঠিক বলিয়া বোধ হয় না। প্রত্যেক হিন্দুর সংসারকে তাঁহারা এক একটী শিক্ষার আগার করিয়াছেন। এই শিক্ষাগারে বালিকা বিবাহের পূর্ব্বে মাতার নিকট এবং বিবাহের পরে শাশুড়ীর নিকট সংসারের রীতিনীতি শিক্ষা পান। শাস্ত্রকর্ত্তাগণ কোন কালেই কামের প্রশ্রয় দেন নাই। এখনকার স্বামীগণ স্ত্রীকে বিলাসের সামগ্রীরূপে দেখিয়া থাকেন, তাই তাহাদিগকে বাল্য বিবাহের কুফল ভোগ করিতে হয়। ইহা শাস্ত্রকর্ত্তাগণের দোষ নহে, ইহা সমাজের দোষ নহে। হিন্দু শাস্ত্রকর্ত্তাগণ বাল্য বিবাহের ব্যবস্থা দিয়াছেন বটে, কিন্তু কেন? পরকে আপন হইতে শিক্ষা দিবার জন্য—পরকে আপন করিতে শিক্ষা দিবার জন্য। বালক বালিকা যে

কাম চরিতার্থ করিবে, তজ্জন্য নহে। তাই তাহারা যৌবনে স্বামীর অধীনে, স্ত্রী থাকিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। সকল শিক্ষার মধ্যে সংযম শিক্ষাই হিন্দুর সর্ব্বপ্রধান শিক্ষা। এখনকার শাস্ত্রদ্রোহী পিতামাতা, বালক বালিকার বিবাহ দিয়া তাহাদিগকে একত্র শয়ন করাইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়েন। ইহা শাস্ত্রকারের দোষ নহে—শাস্ত্রদ্রোহীর দোষ। তুমি তৎপরতার সহিত গায়ের জোরে কুশিক্ষা দিবে, কদাচার করিবে, নিষিদ্ধ কার্য্য করিবে, আর শাস্ত্রকর্ত্তাকে তাহার ফলের দায়ী করিবে, তা কেন? তুমি কর্ম্মদোষে, বুদ্ধিদোষে যাহা করিতেছ, যে কুশিক্ষা দিতেছ, তাহার জন্য তুমিই দায়ী।

দশ বৎসর বয়স্কা একটী বালিকার সহিত আমার বিবাহ হইয়াছিল। আমার বয়স তখন ১৮ বৎসর। মা এই বালিকা বধূকে নিজের মত করিয়া শিক্ষা দিয়াছিলেন। বধূকে কাজের জন্য শাসন করিতেন বলিয়া লোকে তাঁহাকে অনেক গঞ্জনা দিত। তিনি এক এক দিন কাঁদিয়া আমাকে বলিতেন, "তোর বউকে আমি আর কিছু বলিব না। কাজ শিখাইতে হইলেই কখন কখন শাসন করাও আবশ্যক হয়, তার জন্য লোকে এত গঞ্জনা দিলে আমি কেমন করিয়া বউকে শিক্ষা দিব? বৌয়ের যাহা ইচ্ছা সে তাহাই করুক, না হয় না করুক।" আমি তাঁহাকে বলিতাম, "মা! আপনি কাহার কথায় রাগ করিয়া নিজের পুত্রবধূকে সুশিক্ষা দিবেন না? তাহারা আমাদের সংসারের কে? আমাদের সংসারের বউএর ভাল মন্দে তাহাদের কি ক্ষতিবৃদ্ধি হইবে? বউ যদি গৃহকার্য্য শিক্ষা করে, পাকা গৃহিণী হইতে পারে, তবে তাহার সুফল যেমন আমি ভোগ করিব, পাকা গৃহিণী হইতে না পারিলে তেমনি আমিই তাহার কুফল ভোগ করিব। সুতরাং আমার বিশেষ অনুরোধ, আপনি লোকের কথায় বউকে শিক্ষা দিতে বিরত হইবেন না।" স্নেহময়ী মা আমার কথায় লোকের গঞ্জনা অম্লান বদনে সহ্য করিয়া আমার স্ত্রীকে শিক্ষা দিয়াছিলেন, ঠিক তাঁহার মত করিয়াই পাকা গৃহিণী প্রস্তুত করিয়াছিলেন।

মা আমার কেমন গৃহিণী ছিলেন, একটু বলি। পিতা পাচকের হাতে খাইতেন না। মা অতি আহ্লাদের সহিত পাক করিয়া খাওয়াইতেন, কিছুমাত্র কষ্ট বোধ করিতেন না। যে দিন পাক করিতে পাইতেন না, সে দিন তাঁহার পরিতাপের সীমা থাকিত না। ২।৩ খানি লেপ মুড়ি দিয়া জ্বরে পড়িয়াও মা স্বামীকে স্বহস্তে পাক করিয়া খাইতে দেন নাই। কেবল আমার মা বলিয়া নহে, যে সংসারে গৃহিণী নিজেকে দাসী মনে করেন না, সেই সংসারেই এরূপ গৃহিণী ছিলেন। তাঁহারা সংসারে ২৪ ঘণ্টা দাসীর কার্য্য করিতেন, কিন্তু কখনও নিজেকে দাসী মনে করেন নাই, এমনি কর্ত্তব্য-জ্ঞান ছিল।

অতি অল্প খরচে মা যেরূপ পঞ্চোপচারে খাওয়াইতেন, পাচক ব্রাহ্মণের সাধ্যও নাই যে, সেই খরচে ঐরূপ খাওয়াইতে পারে। প্রতিদিন নিয়মানুসারে যে সমস্ত দ্রব্য বাজার হইতে আসিত, তাহা স্বয়ং সযত্নে রক্ষা করিতেন। দাস দাসীকে সে ঘরে যাইতেই দিতেন না। তৈল, ঘৃত ইত্যাদি সঞ্চয় করিয়া রাখিতেন। বাবা পাঁচ জনকে খাওয়াইতে বড় ভাল বাসিতেন। কিন্তু আগে বলা তাঁহার অভ্যাস ছিল না। হয়ত তৈল মাখিতে মাখিতে বলিলেন, অমুক অমুককে দ্বিপ্রহর

করিয়াছি, তাহারা খাইবে। মা তাহাতে কোন দিন অসন্তোষ প্রকাশ করেন নাই, বাজারের সুদীর্ঘ ফর্দ্দ দেন নাই, অল্প সময়ের মধ্যে হইতে পারে না বলিয়া আপত্তি করেন নাই। ঐ সময়ের মধ্যেই পোলাও পর্য্যন্ত পাক করিয়া তাঁহাদিগকে পরিতোষ পূর্ব্বক খাওয়াইতেন এবং নিজের পরিশ্রম ও সঞ্চিত জিনিষগুলি সার্থক হইল বলিয়া পরম আনন্দ প্রকাশ করিতেন। ২৪।২৫ বৎসরের পুরাতন তেঁতুল, পুরাতন ঘৃত, ৫।৭ বৎসরের পুরাতন মিহি চাউল কয়জনের ঘরে থাকে, পয়সা দিয়াই বা কয়জন কিনিতে পারে, পাওয়াই বা যায় কোথায়? আমাদের ঘরে তাহা সর্ব্বদা থাকিত। ৪।৫ সের করিয়া দুগ্ধ লওয়া হইত, স্বয়ং জ্বাল দিয়া তাহা হইতে সর তুলিয়া ঘৃত করিতেন। সে ঘৃত কি উপাদেয়, কি সুঘ্রাণযুক্ত! বাজারে সেরূপ খাঁটি ঘি বহু মূল্য দিয়াও পাওয়া যায় না। সেই ঘৃতে সরভাজা যে কি উপাদেয়, তাহা যিনি খাইয়াছেন, তিনি ব্যতীত অন্যে বুঝিতে পারিবেন না। উহা অতি দুর্লভ।

তাঁহার একটী পুরাতন বেতের পেটরা ছিল, যে খানে যে গাছড়া ঔষধ পাইতেন, কুড়াইয়া তাহাতে রাখিতেন। অনেক মুষ্টিযোগ ঔষধ জানিতেন, তাহাতে অনেক লোকের উপকার হইত। তাঁহার সেই পেটরা খুঁজিলে অনেক দুর্লভ দুষ্প্রাপ্য ঔষধ প্রয়োজন মত পাওয়া যাইত। শিশু চিকিৎসায় তাঁহার বিশেষ দক্ষতা ছিল। হরিণের শৃঙ্গ, শূকরের দাঁত, রসসিন্দুর, রসমাণিক, পুরাতন আমের বীজ, কালজিরা, ছোট পিঁয়াজ, রশুন, সমুদ্রের ফেণা প্রভৃতি শিশু-চিকিৎসার উপকরণ সেই পেটরা খুঁজিলে পাওয়া যাইত। এখন এরূপ পেটরা কয়জনের ঘরে আছে? সামান্য শিরঃপীড়া হইলে এখন ডাক্তারের ভিজিট, ঔষধের মূল্য দিতে দরিদ্র স্বামী ফকির হইয়া যান। মা সামান্য একটী প্রলেপেই কত শিরঃপীড়া আরোগ্য করিয়াছেন। এখন তেমন গৃহিণী দুর্লভ। এখনও সেরূপ গৃহিণীর কথা পুস্তকের কথা মাত্রে পর্য্যবসিত হয় নাই, বৃদ্ধাগণ দেখিয়াছেন, যুবকগণ এখনও পল্লীগ্রামে কোন কোন গৃহে দেখিতে পাইবেন। কিন্তু এ সৌভাগ্য আর অধিক কা থাকিবে না।

বয়া সং ।। বিদেশগমন সময়ে, কি নৌকায়, নেনে পুথি আহারের অতি সুবন্দোবস্ত [illegible]রিতেন। সে উদ্যোগ পর্ব্ব অতি অদ্ভুত ছিল। বিদেশে যাইতেছি, এরূপ বোধই হইত না। তিনি ভ্রমণকালে ছোট একটী চাঙ্গারীর মধ্যে বাঁশের চোঙ্গে করিয়া বিবিধ প্রকার মসলার গুঁড়া লইতেন। একটী বোতলে তৈল এবং একটী শিশিতে ঘৃত লইতেন। ভাঙ্গিয়া যাইবার ভয়ে অধিক শিশি না লইয়া তিনি বাঁশের চোঙ্গ ব্যবহার করিতেন। সেই চাঙ্গারীটী কাপড়ে বাঁধিয়া হাতে ঝুলাইয়া লইয়া রেলে উঠিতেন, নিজেই নামাইতেন, ফেলিয়া দিবে ভয়ে কোন কুলির হাতে দিতেন না। কোন ষ্টেসনে দুই ঘণ্টা অপেক্ষা করিতে হইলে আমরা সেখানে ঠিক বাড়ীর মতই খাইতাম। আমার ভগ্নীগণও এইরূপ শিক্ষিতা।

একদিনের ঘটনা বলি। আমাদের গ্রামে এক বাড়ীতে একটী ব্যাপারে আমার ছোট ভগ্নীকে পাক করিতে বলিয়াছিল, সেও স্বীকার করিয়াছিল। ব্যাপারের দিন প্রত্যুষে স্নান করিয়া গিয়া সে পাক আরম্ভ করিয়াছিল। তাহার সমবয়স্কা আর একজনও পাক করিতে প্রস্তুত হইয়া আসিয়া বলিল,

সে একাই সমস্ত পাক করিবে, আর কাহাকেও পাক করিতে দিবে না। আমার ভগ্নীও বলিল, সে একাকিনীই পাক করিবে, আর কাহাকেও পাক করিতে দিবে না। উভয়ে ঘোর বিবাদ হইল। আমার ভগ্নীই রন্ধন করিল, অপরা রাগ করিয়া চলিয়া গেল। তিন মাস পর্য্যন্ত তাহাদের মধ্যে বাক্যালাপ বন্ধ ছিল। এ দৃশ্য এখন বিরল। বলিলে কেহ সহসা বিশ্বাস করিতে পারে না। এখন বাঙ্গালী রমণীর অধঃপতন হইয়াছে। এখন যিনি হাকিমী কাকে ৭।৮ শত টাকা মাসে উপায় করেন কেন? অপেক্ষা তাঁহার ২০৲ বেতনের পেন্সনভোগী স্থখী। হাকিমের স্ত্রী অন্নপূর্ণার ভার পাচক ঠাকুরের প্রতি দিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছেন, সুতরাং তিনি পাচকের সেই অমৃতোপম রন্ধন দ্বারা তৃপ্তি সাধন করিতে বাধ্য। একদিন পাচক না আসিলে উপবাস করিতে বাধ্য। কিন্তু দরিদ্র পেন্সনের গৃহলক্ষ্মী অন্নপূর্ণার ন্যায় দুই বেলা নিজে রন্ধন করিয়া স্বামীকে আহার করাইয়া তবে নিজে আহার করতঃ আপনাকে কৃতার্থ বোধ করেন। এই গৃহিণীকে দাসী বলিতে পারেন কি? ইনি নিজেকে দাসী মনে করেন কি? এখনকার সুশিক্ষায় আর তখনকার সুশিক্ষায় কতখানি প্রভেদ? যে স্বামী কার্য্যস্থানে কঠোর পরিশ্রম করিতে কষ্ট বোধ করেন না, তাঁহার স্ত্রী নিজের সংসারে একটু পরিশ্রম করিতে গেলে নিজেকে দাসী মনে করিয়া অপমান জ্ঞান করেন। কি দারুণ অধঃপতন!

আমার স্ত্রী ঠিক মার মতই পাকা, গৃহকার্য্যে সুদক্ষা গৃহিণী হইয়াছিল। মার স্বর্গপ্রাপ্তির পর ৭ বৎসর সে আমার সংসারে ছিল। মাকে দেখিতে না পাওয়া ব্যতীত তাঁহার আর কোন অভাব আমি বুঝিতে পারি নাই। ৭ বৎসর পরেই সে আমার সংসার ত্যাগ করিয়া স্বর্গে গমন করিয়াছে, সঙ্গে সঙ্গে আমার সাংসারিক সুখটুকুও অন্তর্হিত হইয়াছে। তাহার মৃত্যুর পরে কত দরিদ্রা অনাথা বিধবা স্ত্রীলোক কাঁদিয়া অস্থির হইয়াছে, আমি দেখিয়া অবাক্ হইয়াছি। তাহারা মুক্তকণ্ঠে বলিয়াছে, "আমরা মাতৃহারা হইলাম।" আমরা পাড়াগেঁয়ে গৃহস্থ, আমাদের ধানী জমি আছে, বাড়ীতে গোলা আছে, তাহাতে ধান্য রাখা হয়। প্রয়োজন মত চাষা স্ত্রীলোকদিগের দ্বারা সেই ধান্য ভানিয়া চাউল করিয়া লওয়া হয়। ১৩০৩ সালের দুর্ভিক্ষের সময় চাষা, দরিদ্রা, বিধবা, অনাথা স্ত্রীলোকেরা ধান্য খাইয়া ফেলিবে, আর পাওয়া যাইবে না ভয়ে অনেকে তাহাদিগকে ধান্য ভানিতে দেয় নাই। আমার স্ত্রী সেই সমস্ত স্ত্রীলোককেই ধান্য দিত। তাহারা চাউল করিয়া দিয়া লভ্যাংশ দ্বারা সে দুর্ভিক্ষে জীবনধারণ করিয়াছিল। আমি ইহা জানিতাম না। পরে তাহাদের নিকট শুনিয়াছি। ইচ্ছা থাকিলে এবং ভাল শিক্ষা পাইলে এইরূপে নিজের ক্ষতি না করিয়াও অনায়াসে নীরবে লোকের উপকার করা যায়। এ শিক্ষা বিদ্যালয়ে হয় না। সুশিক্ষা দ্বারা মনটী প্রস্তুত হইলে, হৃদয় বলে উপায় আপনা হইতেই মনে উদয় হয়। আমি অবশ্যই আবার বিবাহ করিয়াছি, কিন্তু যে দুর্লভ রত্ন হারাইয়াছি, তাহা আর পাইবার যো আছে কি? আমার সে সুখের দিন তাহার সঙ্গে সঙ্গেই চলিয়া গিয়াছে, আছে কেবল সেই স্মৃতিটুকু, কেবল আমাকে মনঃপীড়া দিবার জন্য। সবই তো হইয়াছে,

কিন্তু সে অভাব ভুলিতে পারি না কেন? সে স্মৃতিটুকু মুছিয়া ফেলিতে পারি না কেন? আহারের সময় চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হয় কেন? মা থাকিলে এটুকু হইত না। তিনি আবার সুগৃহিণী প্রস্তুত করিতে পারিতেন। এখন শিক্ষা দিবে কে? আদর্শ হইবে কে?

হিন্দু বিধবা সংসারে স্বেচ্ছাসেবিকা স্বরূপা। প্রৌঢ়ার কথা ছাড়িয়া দেওয়া যাউক, যাহারা স্বামী কি পদার্থ তাহা বুঝে নাই, স্ত্রীর গুরুত্ব জানে নাই, সংসারের দায়িত্ব যে মাথায় লয় নাই, সেই বালিকা বিধবাদিগকে ব্রহ্মচর্য্য করিতে বাধ্য না করিয়া পুনরায় বিবাহ দিয়া সংসারে কর্ত্রীর আসনে বসাইয়া দেও, উহারা জগতের অন্যান্য প্রাণীদের ন্যায় প্রকৃতির নিয়ম পালন করিয়া সন্তান ধারণ ও সন্তান পালন দ্বারা হাসিয়া খেলিয়া জীবন অতিবাহিত করুক, এ দৃশ্য দেখিতে কোন্ পিতা মাতার অসাধ?

কিন্তু আমরা জোর করিয়া স্বাভাবিক গতি রোধ করতঃ ঐ অপরিপক্ক জীবটীকে যদি অবশ্য প্রয়োজনীয় বোধে শুকাইয়া ফেলিতে চাই বা উহাকে প্রকৃতির বিরুদ্ধে চালাইতে ইচ্ছা করি, তাহা হইলে প্রথম হইতেই তাহাদিগকে সেই ভাবে প্রস্তুত করিতে হইবে। তাহাদের শিক্ষার ব্যবস্থা করা যে নিতান্ত আবশ্যক, তাহা হিন্দুশাস্ত্র কর্ত্তাগণ বিলক্ষণ বুঝিতেন, এবং বুঝিতেন বলিয়াই তাহার ব্যবস্থাও করিয়া গিয়াছেন। হিন্দু-সাধারণ অবনত মস্তকে সেই ব্যবস্থা মত চলিলে বিধবাগণের দ্বারা সংসারে অনায়াসেই স্বেচ্ছাসেবিকার কার্য্য করাইয়া লইতে পারেন।

বাল্যকাল হইতেই কন্যাদিগকে এ জন্য শিক্ষা দিয়া প্রস্তুত করা হয়। আদর্শের মধ্যে থাকিয়া তাহারা দেখিয়া শুনিয়া সংযম শক্তি ও ত্যাগশক্তি শিক্ষা দ্বারা অনায়াসে লাভ করিতে পারে। কন্যাদিগকে ভবিষ্যতের বিবাহিত জীবনের কর্ত্তব্য সম্বন্ধেই মুখ্যতঃ শিক্ষা দেওয়া হয়। সঙ্গে সঙ্গে আপনা হইতেই ব্রহ্মচর্য্যের নিয়মগুলি সংসারস্থ বিধবাদিগকে দেখিয়া শিখিতে পারে।

আজকাল অবশ্য অনেক সংসারে এ শিক্ষা অতি দুর্লভ। বালিকাগণ অতি অল্প বয়সেই এত সৌখিন হইয়া উঠে, পিতা মাতার আদরে আদরিণী হইয়া উঠে, যে তাহারা সংসারের কোন ধারই ধারে না। সর্ব্বদা পুঁথি বা উল হাতেই আছে। সংসারের কোন কাজ কর্ম্ম করে না। কখন নাটক বা নভেল লইয়াই ব্যস্ত থাকে। বিধবাদিগের অসম্মান, বিড়ম্বনা স্বচক্ষে দেখে। এইরূপ আদর্শে প্রস্তুত, ব্রহ্মচর্য্যে অপ্রস্তুত বাল-বিধবাকে বিধবা রাখিতে হইলে, অবশ্যই শিক্ষা দ্বারা ব্রহ্মচর্য্য শিখান আবশ্যক হয়। কিন্তু স্বচক্ষে বিধবার অসম্মান ও কষ্ট দেখিয়া যদি তাহারা সমাজদ্রোহী হয়, বিধবা না থাকিতে ইচ্ছা করে, তবে সে দোষ কি শাস্ত্রকর্ত্তাদের—না আমাদের? শাস্ত্রকর্ত্তাগণ বিধবাদিগের সম্বন্ধে যেরূপ নিগ্রহের ব্যবস্থা করিয়াছেন, সেইরূপ নীরবে সঙ্গে সঙ্গে সর্ব্বপ্রকার শিক্ষা ও সম্মান পাইবার ব্যবস্থাও করিয়াছেন। আমরা যদি তাহাদিগের অপেক্ষা অধিক জ্ঞানাভিমানী হইয়া বসি, এবং সভ্য সাজি, তাঁহাদের আদর্শ নষ্ট করি, পুরুষের সঙ্গে স্ত্রীলোক সমান অধিকার কেন পাইবে না, বিধবা বিবাহ কেন হইবে না বলিয়া যদি আমরাই অস্থির হই, তবে শাস্ত্র-কর্ত্তাদের দোষ কি? আমাদের এ অস্থিরতা, আমাদের এ সভ্যতা, আমাদের এ জ্ঞানাভি-

মানের ফল তাহা "সু" হউক আর "কু" হউক, আমাদিগকেই ভোগ করিতে হইবে, আর ভোগ করিবে পরবর্ত্তী বংশীয়েরা।

হিন্দুর গৃহে গৃহে বিধবা বর্ত্তমান। বালিকাগণ এই বিধবা ও সধবাগণের মধ্যে বাস করিয়া, তাঁহাদের সঙ্গে নিয়ত সাংসারিক কার্য্য করিয়া,কাহার কি কর্ত্তব্য তাহা শিখিয়া লয়। একটী ১২ বৎসরের বালিকাকে জিজ্ঞাসা করিলে, বিধবাগণ কিরূপ নিয়ম প্রতিপালন করে, তাহা অতি সুন্দররূপে বলিতে পারিবে। কেমন করিয়া সে শিখিল, জিজ্ঞাসা করিলে অনায়াসে বলিবে, তাহার বৃদ্ধা পিতামহী, মাতামহী, পিশি, মাসী প্রভৃতি এই নিয়মে চলিয়া থাকেন, তাহা দেখিয়াই তাহারা শিক্ষা করিয়াছে।

প্রকৃত হিন্দুর সংসার এমনি শিক্ষার স্থান যে, যন্ত্রের ন্যায় অনায়াসে তাহাতে সুগৃহিণী প্রস্তুত হয়, তজ্জন্য কিছুমাত্র আয়াস করিতে হয় না। হিন্দু রমণী গৃহকার্য্য করিবে, বিধবা ব্রহ্মচর্য্য পালন করিবে, ব্যবস্থা যাঁহারা করিয়াছেন, তাঁহাদের শাস্ত্রানুসারে, তাঁহাদের নির্দ্দেশ অনুসারে চল, দেখিবে, আদর্শ দেখিয়া, সেই আদর্শের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদের কার্য্য করিয়া, কেমন করিয়া বালিকাগণ নীরবে গৃহকার্য্য শিক্ষা করে। আজিও যদি কোন হিন্দুর সংসার শাস্ত্রসঙ্গত ব্যবস্থা দ্বারা পরিচালিত হইতে দেখা যায়, তবে নিশ্চয় জানিবেন, তাহা এই হতভাগ্য দেশের মূর্খ অথচ গৃহকার্য্যে সুশিক্ষিতা গৃহলক্ষ্মীদিগের গুণে। আজিও যদি কোন গৃহে অন্নপূর্ণার অধিষ্ঠান দেখা যায়, পাচকের প্রবেশাধিকার না থাকে, তবে সে সেই মূর্খ অথচ গৃহকার্য্যে সুদক্ষা স্ত্রীলোকদিগের গুণে। আজিও যদি কোন সংসারের গৃহকর্ত্রী মনে করেন যে, তিনি স্বহস্তে পাক করিয়া স্বামী এবং অন্যান্য লোককে খাওয়াইয়া কৃতার্থ হইবেন, তবে সে সেই মূর্খ অশিক্ষিতা গৃহলক্ষ্মী। কেহ অসভ্য বলিতে হয় বলুক, বর্ব্বর বলিতে হয় বলুক, যাহা ইচ্ছা হয়, যাহা প্রাণে চায় তাহাই বলুক, কিন্তু নিশ্চয় জানিও, হিন্দুর সংসারের ন্যায় সুব্যবস্থা কোন সুসভ্যতাভিমানী জাতির সংসারে নাই। এখানে অনধিকার চর্চ্চা নাই, যাহার যে অধিকার, তাহা বাল্যকাল হইতেই সে বুঝিয়া লয়, শিখিয়া লয়। হিন্দু স্ত্রীকে পাকপ্রণালী পড়িয়া রন্ধন শিক্ষা করিতে হয় না। মাতৃশিক্ষা পড়িয়া সন্তান পালন করা শিক্ষা করিতে হয় না, গৃহলক্ষ্মী কেমন করিয়া হয়, তাহা পুস্তক পাঠ করিয়া শিখিতে হয় না। অতি শৈশবকাল হইতে হিন্দু বালিকা নীরবে হাতে হাতে সে সব শিক্ষা পায়। এখন যেমন ৩০৲ টাকার কেরাণীও পাচক ব্রাহ্মণ রাখিতে বাধ্য হয়, এবং প্রাইভেট টুইসানি করিয়া তাহার বেতন সংগ্রহ করিতে হয়, চাকর চাকরাণী রাখিতে হয়, হিন্দুর নিয়মানুসারে চলিলে সে সবের কোন প্রয়োজন হয় না। হিন্দুর কঠোর শাসনে পুরুষ পুরুষের কার্য্য, স্ত্রীলোক স্ত্রীলোকের কার্য্য করিতে বাধ্য হয়। সময় গুণে, অদৃষ্ট গুণে, নিজের কর্ম্মদোষে লক্ষ্মী এখন সিংহাসনে আরোহণ করিয়া অকর্ম্মণ্য হইয়াছেন। যে যত সংসারের কার্য্য না করিবে এখন সে তত লক্ষ্মী, আর যে যত সংসারে খাটিবে, সে তত দাসী। আপনার সংসারে কে কাহার দাসী? আপনার সংসার যে চিনিতে পারে নাই, চিনিতে শিক্ষা পায় নাই, সে-ই মনে করে যে, সংসারে সে দাসীবৃত্তি করিতেছে। স্বামীর সংসারকে যে আপনার সংসার মনে করিতে

শিক্ষা পায় নাই, সেই মনে করে সংসারে কার্য্য করিলে দাসী হইতে হয়। নিজের সংসারে যে কেহ দাসী নহে, লক্ষ্মী, হিন্দুভাবে শিক্ষার অভাবে এ কথা আজকাল কেহ বুঝে না।

এখনকার শিক্ষিত যুবকগণ বলেন, "মেয়েদের এত কষ্ট দিবার আবশ্যক কি? বালবিধবাদিগকে পীড়ন করিয়া লাভ কি? যদি কোন লাভ না থাকে, অনর্থক তবে কেন তাহাদিগকে এত কষ্ট দেওয়া হয়? এ প্রশ্নের উত্তর আছে।

স্ত্রী পুরুষ লইয়াই সংসার। কতকগুলি বিষয়ে স্ত্রী ও পুরুষকে আত্মোৎসর্গ করিতে হয়। পুরুষ সংসারের দাস, স্ত্রী সংসারের দাসী। সংসারে যত জন বাস করে, সকলের সুখ স্বচ্ছন্দতার জন্য পুরুষ দায়ী। অনাহারী বা ক্রীতদাসের ন্যায় তিনি সকলের জন্য অর্থ যোগাইবেন। সেই অর্থ দ্বারা গৃহিণী বা ক্রীতদাসী আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি আনাইবেন, ভাল করিয়া রাখিবেন, যখন যেরূপ প্রয়োজন তদনুসারে ব্যয় করিবেন। পুরুষের কার্য্যের জন্য সহায় পুরুষ, অর্থাৎ ভ্রাতা ভ্রাতুষ্পুত্র পুত্র ইত্যাদি, গৃহিণীর সাহায্য জন্যও তেমনি শাশুড়ী, দেবরবধূ, পুত্রবধূ, কন্যা এবং বিধবাদির প্রয়োজন হয়। এইরূপ বৃহৎ সংসারে একজন মাত্র কর্ত্তা এবং একজন মাত্র কর্ত্রী থাকিবে। কর্ত্রী কর্ত্তার অনুগত হইয়া চলিবে, আর সকলে কর্ত্তা ও কর্ত্রীর অনুগত হইয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবে। কেহই নিজের স্বার্থের দিকে দেখিবে না। এরূপ হইলে সংসারে চাকর চাকরাণীর প্রয়োজন হয় না। সংসারের সকলেই নিজ নিজ কার্য্য মনে করিয়া পরিশ্রম করিলে একটী পয়সাও নষ্ট হইতে পারে না। সংসারে শাশুড়ী থাকিলে কর্ত্রীর কর্ত্তব্য তাঁহাকে সম্মান করা, তাঁহার নির্দ্দেশ মত চলা। ইহাতে শাশুড়ীরও মান্য থাকে, অথচ নিজের কর্ত্তৃত্ব করাও হয়।

সংসারের কার্য্যের প্রধান সহায়ই বিধবা। বিধবাগণের নিজের স্বার্থ নাই, পরের জন্যই তাঁহারা পরিশ্রম করেন। কেবল একটু সম্মান, একটু শ্রদ্ধা, একটু যত্নের ভিখারিণী। তাই শাস্ত্রে উল্লিখিত ভাবে নারীর পূজা ও সম্মান করিতে ব্যবস্থা দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু আমরা তাহাতেই কাতর হই, বিধবাকে ঘৃণা করি, কটু কথা বলি, নানাপ্রকারে লাঞ্ছনা করি, অপমান করি। বিধবাকে ভার জ্ঞানে তাড়াইয়া দিয়া চাকরাণী রাখি। তাহার জন্য ১০,১২, টাকা খরচ করি, অথচ একটী বিধবার জন্য ৫, টাকা ব্যয় করিতে পারি না। স্ত্রীদিগকে সুশিক্ষা না দেওয়াতেই এরূপ হয়, যে স্ত্রী নিজেকে সংসারের দাসী মনে করিতে শিহরিয়া উঠে, সে কেন শাশুড়ীর সহিত দাসীর ন্যায় ব্যবহার করিবে, ননদিনীর সহিত দাসীর ন্যায় ব্যবহার করিবে? তাহারা কি স্ত্রীলোক নহে?

যদি বলেন, বিধবাদিগকে বিবাহ দিয়া সংসারের কণ্টক দূর করিলেই ত হয়। একের সুখ বিধানের জন্য অপরের সুখ বিসর্জ্জন দিতে তাহাকে বাধ্য করা হইবে কেন? তাহার কি সুখভোগ করিতে ইচ্ছা করে না? করে বটে, কিন্তু সংসারের নিয়মই এই যে, কতকগুলি লোকের জন্য কতকগুলি লোককে আত্মবিসর্জ্জন বা আত্মোৎসর্গ করিতে হয়। না করিলে সমাজ চলে না। রাজার রাজ্য চলে না। রাজার জন্য প্রজা প্রাণ দিতে সর্ব্বদা প্রস্তুত, তেমনি

সংসার রাজ্যের রাজা ও রাণীর জন্য কতকগুলি মানুষকে আত্মসুখ বিসর্জ্জন দিতে হয়। শাস্ত্রকর্ত্তাগণ বিধবাকেই সংসারে স্বেচ্ছাসেবিকা নিযুক্ত করিয়াছেন। তাহাদিগকে একবার সুবিধা দিয়াছেন। সে সুবিধা যাঁহাদের ভাগ্যে স্থায়ী হয় নাই, তাঁহাদিগকেই আত্মোৎসর্গে বাধ্য করিয়াছেন, তবু কি শাস্ত্রকর্ত্তাদিগের দোষ দিতে হইবে? যে ব্যবস্থা মত চলিলে সংসার নির্ব্বিঘ্নে চলিয়া যায়, চাকর চাকরাণীর ধার ধারিতে হয় না, অনর্থক ঘরের পয়সা বাহিরের লোককে দিতে হয় না, সে ব্যবস্থা, সে শিক্ষা বর্জ্জন করা কি কর্ত্তব্য?

এখন বিধবাগণকে যেমন পদদলিত করা হয়, শাস্ত্রের ব্যবস্থা তাহা নহে। যাঁহারা বলেন, "অন্যের নিকট ভক্তি পাইতে ইচ্ছা করিলে প্রথমে নিজে ভক্তির পাত্র হও।" তাঁহাদের এই শিক্ষা, বিধবাদিগের প্রতি ব্যবহার শিক্ষার সময়, স্ত্রীর খাতিরে বিধবা মাতা, বিধবা ভগ্নী প্রভৃতি পূজনীয়াগণকে তাড়াইয়া দিবার সময় কোথায় থাকে? বিধবাকে ভক্তি করিবার সময় সে জ্ঞানটী কোথায় থাকে? শাস্ত্র সকলের প্রতি সমান ব্যবহার শিক্ষা দেয়। শাস্ত্রে যেমন বিধবা হইলেই তাহাকে আজীবন বিধবা রাখিবার ব্যবস্থা দিয়াছে, তেমনি তাহাদিগকে সসম্মানে রাখিতেই শিক্ষা দিয়াছে। তুমি যদি তোমার স্ত্রীর ভক্তি আকর্ষণ করিবার জন্য যথার্থ ভক্তির পাত্র মাতাকে তাড়াইয়া দিয়া স্ত্রীলোকের প্রতি ভক্তির পরাকাষ্ঠা দেখাও, তবে সে দোষ কি শাস্ত্রের? তুমি যদি আদর্শ হইয়া তোমার পুত্রকে, তোমার কন্যাকে এই শিক্ষা দাও, তবে তাহা কি হিন্দু শাস্ত্রের দোষ?

একে পুরুষের নিকট এইরূপ শিক্ষা পায়, তাহার উপরে অধিক বয়সে বিবাহ হয়, তাই মেয়েরা এখন স্বেচ্ছাচারিণী এবং স্বার্থপরতার প্রতিমূর্ত্তি হইয়া উঠিতেছেন। তাহারা সমস্ত সম্মান আত্মসাৎ করিয়া বসিয়াছেন। যিনি সধবা এবং সংসারের কর্ত্রী, সম্মান তাঁহারই একচেটিয়া হইয়া পড়িয়াছে। তিনি বিধবা হইলে তাঁহারও যে ঐরূপ দুর্দ্দশা হইবে, ইহা ভাবিয়া দেখিতেছেন না। শাশুড়ীর প্রতি তাঁহার ব্যবহার দেখিয়া তাঁহার পুত্রবধূও যে ঐ নীতি শিক্ষা করিতেছেন, তাহা ভাবিয়াও দেখেন না। বিধবাকে তাঁহারা চাকরাণী অপেক্ষা অধম মনে করেন। শ্বশুর শাশুড়ীকে কিছু মাত্র ভক্তি করিতে প্রস্তুত নহেন, তাহাদিগকে পদে পদে অবজ্ঞা করিয়া থাকেন। বাড়ীর সর্ব্বময় কর্ত্রী হইবার ইচ্ছাই তাঁহাদিগকে এইটা দান করিয়াছে। তাহারা গুরুলোকের সম্মান করিতে চাহে না, কেবল আত্মসম্মানই চায়, এমন কি, শ্বশুর শাশুড়ী তাহাদিগের আজ্ঞাবহ হইয়া সংসারে থাকে থাকুক, তাহার অবজ্ঞার পাত্র হইয়া থাকে থাকুক, নতুবা যেখানে ইচ্ছা হয় চলিয়া যাউক, এইরূপ দুরাশা হৃদয়ে পোষণ করিয়া থাকে এবং স্থলবিশেষে কৃতকার্য্যও হয়। এ দোষ শাস্ত্রকর্ত্তার নহে, এ দোষ নব্য শিক্ষিত যুবকের। হিন্দু রমণী সুশিক্ষা অভাবেই এমন হয়।

এই সমস্ত শিক্ষার জন্যই শাস্ত্রকর্ত্তাগণ বাল্য বিবাহের ব্যবস্থা দিয়াছেন। বালিকা বধূ গৃহে আসিয়া শ্বশুর শাশুড়ীকে পিতা মাতার মত দেখিতে শিখে, তেমনি সম্মান করে, সেবা শুশ্রূষা করে, দেবরদিগকে নিজের ভ্রাতার মত জ্ঞান করে, তেমনি

করিয়া ভালবাসিতে শিখে, ক্রমে শ্বশুর-গৃহকেই সে পিতামাতার গৃহের ন্যায় মনে করে, ক্রমে সে সংসার তাহার নিজের বলিয়াই বুঝিতে পারে, তখন যাহাদিগকে ভক্তি করিতে অভ্যস্ত হইয়াছে, তাহাদিগের প্রতি অন্যায় ব্যবহার করিতে পারে না। অধিক বয়স পর্য্যন্ত বধূ পিতৃগৃহে থাকিলে এবং সংসারের কার্য্যে লিপ্ত না হইলে, এইরূপ শিক্ষা হয় না, বুদ্ধি পরিপক্ক হওয়া হেতু কাহারও নিকট নত হইতে পারে না। এই জন্য যেখানে অধিক বয়সে মেয়েদের বিবাহ হয়, সেখানেই এই সংসার-বিধ্বংসী চিত্র দেখিতে পাওয়া যায়, সেখানেই বধূ পৃথক থাকেন, শ্বশুর শাশুড়ী লইয়া, দেবর দেবর-বধূ প্রভৃতি লইয়া ঘর করিতে পারেন না। যদি বা করেন, তবে সেখানে তিনিই রাণী, অন্য সকলকেই তাঁহার আজ্ঞাবহ দাস দাসী মাত্র করিয়া রাখেন।

শাস্ত্রকর্ত্তাগণ এ সব বেশ বুঝিতেন. কাঁচা বাঁশ যে দিকে নোয়ান যায়, সেই দিকেই যায়, বক্র হইলেও অগ্নিতাপে সোজা করা যায়, তাহা তাঁহারা জানিতেন, তাই তাঁহাদের ব্যবস্থা এত সুন্দর, এত সর্ব্বাঙ্গসম্পন্ন এবং একদেশদর্শী নহে। যে ভাবে চলিলে, যেরূপ ব্যবস্থা যে বিষয়ে চাই, তাহা তাঁহারা ঠিক করিয়া রাখিয়াছেন। আমরা যদি তাহার একটা ব্যবস্থা নষ্ট করি, তবে কেবল সেই দিকেই নহে, সকল দিকেই বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইবে। তাই যদি আমরা সংসারে স্বার্থশূন্য অথচ আপনার নিজের লোক পাই, তবে তাহাকেই সেবকরূপে বা সেবিকারূপে পাইলে, সংসার শৃঙ্খলার সহিত চলে বলিয়া শাস্ত্রে বিধবাকে বিবাহ না দিয়া, সসম্মানে গৃহে রাখিবার ব্যবস্থা দিয়াছেন। যদি এই ব্যবস্থানুসারে চলিতে চাই, তবে বিধবার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিতে হইবে, নিজে কর্ত্তা বা কর্ত্রী হইলেও তাঁহার নিকট তৃণের ন্যায় সুনীচ হইতে হইবে, অন্যায় কর্ত্তৃত্বাভিমানকে তাঁহার পদে বলি দিতে হইবে, আর দিতে হইবে কেবল মাত্র এক বেলা কিছু আতব চাউল আর কয়েকখানি কাপড়। কে বলিবে দাস দাসী রাখা অপেক্ষা এই ব্যবস্থা ভাল নহে—কে বলিবে ক্রীত সেবা অপেক্ষা এই বিধবাদিগের প্রাণের টানের সেবা ভাল নহে, প্রার্থনীয় নহে? মাতার সেবা অপেক্ষা ক্রীত সেবা কি এতই মিষ্ট! ভগ্নীর সেবা অপেক্ষা কি ক্রীত সেবা এতই মিষ্ট! পিতামহী, পিসী প্রভৃতির সেবা অপেক্ষা ক্রীত সেবা কি এতই মিষ্ট।

এই সব বিধান মানিয়া বাল্যবিবাহ দিতে হইবে, অথচ কামরিপুকে শত্রু মনে করিয়া সংযম শিক্ষা করতঃ দূরে বর্জ্জন করিয়া, তাহার কুফল হইতে আত্মরক্ষা করিতে হইবে, পুত্রাদিকে রক্ষা করিতে হইবে। হঠাৎ সংসারে অনভিজ্ঞা একটা স্ত্রীলোককে আনিয়া একটা সম্পূর্ণ অপরিচিত সংসারে বসাইয়া দিলে চলিবে না। একটা কাঁচা বয়সের গৃহকার্য্যে সুশিক্ষিতা বালিকাকে আনিতে হইবে, তাহাকে হাতে হাতে খাটাইয়া সমস্ত রীতি নীতি গৃহকর্ম্মাদি শিক্ষা দিতে হইবে, তাহাকে আপনার করিতে হইবে, তবে সে আপনার হইবে, তবেই সে বংশের রীতি শিক্ষা করিতে পারিবে, তবেই সে আম্রের কলমের ন্যায় সুমিষ্ট ফল প্রসব করিবে। যাহারা কলম করে, তাহারা জানে কত কাঁচা শাখায় কত সুন্দর কলম হয়। কেহ পাকা ডালে কলম বাঁধে না। একটা পরের মেয়েকে নিজের সংসারে নিজের

বংশের ধারায় আনিতে হইলে কাঁচা বয়স ব্যতীত হয় না। এ কথার প্রমাণের অভাব নাই। যে পিতা মাতা বালিকা কন্যাকে সংসারের কার্য্য শিক্ষা দেন না, সংসারে খাটান না,—দুদিন পরে শ্বশুর বাড়ী যাইবে বলিয়া মায়া করিয়া বড় কথাটী পর্য্যন্ত বলেন না, তাঁহারা ঘোর শত্রুতার কার্য্য করেন, যে মেয়ে পিতা মাতার সংসারে যেমন ডানপিটে অকর্ম্মা হয়, শ্বশুরালয়ে গিয়ে তাহার কোনটীই ত্যাগ করিতে পারে না। এরূপ স্ত্রী সংসারের কর্ত্রী হইলে সে সংসারের কি পরিণাম হয়, তাহা কি বলিয়া বুঝাইতে হইবে? এইরূপ মেয়েকেও হয়ত একদিন বিধবা হইতে হইবে, সে যেমন শ্বশুর শাশুড়ীর প্রতি ব্যবহার করিয়াছে, তাহার পুত্রবধূও তাহার প্রতি সেইরূপ ব্যবহার করিবে, তখন তাহার কি দশা হইবে, তাহা কেহ ভাবে না। কিন্তু শাস্ত্রকর্ত্তাগণ, আইনকর্ত্তাগণ এইরূপ অদূরদর্শী নহেন, তাই তাঁহারা সকল দিকে সামঞ্জস্য রাখিয়া ব্যবস্থা করেন। সে ব্যবস্থা মানিয়া চলিলে কোন কুফল হয় না, বরং সুশিক্ষার গুণে সুফলই হয়।

বাল্যবিবাহের ফলে সন্তান হইলে দীর্ঘজীবী হয় না, রুগ্ন, দুর্ব্বল হয় ইত্যাদি আপত্তি এখন অনেক শুনিতে পাওয়া যায়। বক্তাগণ কি মনে করেন, তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষ এই শাস্ত্রকর্ত্তাগণ তাঁহাদের অপেক্ষা মূর্খ ছিলেন, তাই এই অব্যবস্থা তাঁহাদের শাস্ত্রে দেখা যায়? তাহা নহে। তাঁহারা এ সব তত্ত্ব বিলক্ষণ জানিতেন, এবং জানিতেন বলিয়াই তাঁহাদের ব্যবস্থাও দোষশূন্য। বধূ গুরুজনের সম্মুখে স্বামীর সহিত কথা পর্য্যন্ত বলিতে পায় না, নিকটে যাওয়া ত দূরের কথা। বালিকা বধূকে স্বামীর নিকট যাইতে কি কথা বলিতে, এমন কি, তাকাইতেও এদেশী লোকাচারে নিষেধ করে। কেন? বালিকা বধূর সহিত কোন সংস্রব না ঘটে, এই জন্য। পিতা মাতাগণ সাধ করিয়া বালক পুত্রের নিকট বালিকা পুত্রবধূকে শয়ন করাইয়া দেন, জোর করিয়া শয়ন করাইয়া দেন, ইহা কোন্ শাস্ত্রে আছে? যদি পিতামাতা সংযম শিক্ষা না দেয়, কামের প্রশ্রয় দেয়, তবে সে দোষ কি শাস্ত্রের? অগ্নি ও খড় এক সঙ্গে থাকিলে তো জ্বলিবেই, ইহা কে না জানে?

সুশিক্ষা, কর্ম্মশিক্ষা এবং সংযম শিক্ষার অভাবেই এখন সংসারে যত কিছু বিশৃঙ্খল ঘটিতেছে। পাশ্চাত্য দেশে অধিক বয়সে যেমন বিবাহ হয়, তেমনি তথায় একান্নভুক্ত বহু পরিবারের ব্যবস্থা নাই। অধিক বয়সে বিবাহ দিলে এই নিয়মই আবশ্যক। কিন্তু সমাজ করিয়া থাকিলে এরূপ নিয়ম প্রশংসনীয় নহে। সকলে মিলিয়া মিশিয়া থাকাই সমাজ। পিতা মাতা পুত্রকে অতি কষ্টে লালন পালন করিলেন, পুত্র বিবাহ করিয়াই পর হইয়া গেল, এ দৃশ্য পশু বা অসভ্য মনুষ্য সমাজেই শোভা পায়। হিন্দু এমন সমাজ চায় না, এমন সংসার চায় না। তাহারা চায়, পুত্রকে যেমন পিতা মাতা নিজের সুখ স্বচ্ছন্দতার দিকে দৃষ্টি না রাখিয়া প্রতিপালন করিয়াছে, পুত্রও তেমনি ভাবে তাহাদিগকে অশক্তাবস্থায় প্রতিপালন করিবে। পুত্রের কর্ত্তব্যও পিতা মাতার সুখ সাধ্যমত বিধান করা। পিতা মাতা যেমন পেটে না খাইয়া পুত্রকে লেখাপড়া শিখাইয়া মানুষ করিয়াছেন, পুত্রও তেমনি মানুষের ন্যায় আত্মসুখ বিলাসিতার দিকে দৃষ্টি না করিয়া সস্ত্রীক পিতামাতার সেবা করিবে। এই নিয়মই সভ্য মানুষের মধ্যে থাকা উচিত

বিলাসিতাকে প্রশ্রয় দিয়া পিতা মাতাকে কষ্ট দেওয়া সভ্য মানুষের কার্য্য নহে, পিতা মাতার সেবা না করা সভ্য মানুষের কর্ত্তব্য নহে। গায়ের জোরে সে সমাজ সভ্য সাজিতে পারে, কিন্তু ব্যবহারে সে সভ্য নহে, পশু সমাজ মাত্র। হিন্দু মানুষকে পশু হইতে শিক্ষা দেয় না। হিন্দুর সমস্ত ব্যবস্থাই অতীত, বর্ত্তমান এবং ভবিষ্যৎ বিবেচনা করিয়া রচিত হইয়াছে। সুসভ্য সমাজ যদি পৃথিবীতে থাকে, তবে এখনও হিন্দু সমাজই সুসভ্য, বল প্রকাশে নহে, অবশ্য নীতিশাস্ত্রে।

আমরা স্ত্রী-স্বাধীনতা, স্ত্রী-স্বাধীনতা বলিয়া চীৎকার করি। এ স্ত্রী স্বাধীনতা কি কেবল সধবা কর্ত্রী সম্বন্ধেই না সকলের সম্বন্ধেই খাটাইতে হইবে। আমরা স্ত্রীকে কর্ত্রী মনে করি, আর সকলকেই দাসী মনে করি। ইহা কি স্ত্রী স্বাধীনতার বিপরীত নহে? মুক্ত স্থানে পুরুষের সহিত সমান ভাবে বিচরণ করার নামই কি স্ত্রী-স্বাধীনতা? এ শিক্ষা হিন্দুর নহে। হিন্দু রমণীর এ শিক্ষা পাওয়া উচিত নহে। হিন্দু শাস্ত্রে যাহার যে স্থান, তাহাকে সেই স্থানে থাকিতে বলিয়াছে। জলের জীবকে জলে থাকিতে, এবং স্থলের জীবকে স্থলে থাকিতেই হিন্দুশাস্ত্র ব্যবস্থা দেয়।

অতএব হিন্দু রমণীকে হিন্দুভাবে গৃহকর্ম্ম শিক্ষা দিতে হইবে, হিন্দুভাবে চালাইতে হইবে। কেবল ইহাই যথেষ্ট নহে। তাঁহাদিগের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়া শিক্ষা দিতে হইবে। নব্য শিক্ষায় তাঁহারা বিগড়াইয়া যাইতেছেন। তাঁহাদিগকে গার্হস্থ্য ও শাস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা দিতে হইবে। বাজারের হিসাব, ধোপার হিসাব, দাস দাসীর বেতনের হিসাব ইত্যাদি রক্ষা করিবার জন্য এবং সহজ সহজ হিন্দুধর্ম্ম গ্রন্থ পড়িতে পারে, তজ্জন্য যে পরিমাণ বিদ্যাশিক্ষা আবশ্যক, তাহাই শিক্ষা দেওয়া উচিত। সহজ ইতিহাস, ভূগোল ইত্যাদি শিক্ষাও মন্দ নহে। পুরুষের ন্যায় রাশি রাশি পুস্তক পাঠ জন্য বিদ্যালয়ে শিক্ষার ব্যবস্থা করা অনুচিত। স্ত্রীজনোচিত কার্য্য সংসারে মিশিয়া করার সঙ্গে সঙ্গে রমণী পিতা, মাতা, ভ্রাতা প্রভৃতির নিকট প্রয়োজন-সাধক বিদ্যা শিক্ষা করিবে। পুরুষের ন্যায় অর্থকরী বিদ্যা শিখিবার কোন প্রয়োজন নাই। বি-এ., এম-এ. পাশ না করিলে পুরুষ অর্থকরী ব্যবসা করিতে পারে না, সুতরাং তাহাই শিক্ষা করিতে হইবে। স্ত্রীকে অর্থ উপার্জ্জন করিতে হইবে না, সুতরাং তাহার বি-এ., এম-এ. পাশ করার কোন প্রয়োজন নাই। তাহার আরও শিখিবার অনেক কার্য্য আছে, সে তাহাই শিক্ষা করিবে। যাহার জীবনকে যে ভাবে চালাইতে হইবে, তাহাকে সেই ভাবে শিক্ষা দেওয়াই উচিত।

এই জন্যই স্ত্রী ও পুরুষের শিক্ষাপ্রণালী স্বতন্ত্র। কতকগুলি শিক্ষা সম্পূর্ণ বিপরীত। যাহাকে যে কার্য্যে নিয়োগ করিতে হইবে, সৃষ্টিকর্ত্তা তাহাকে তদনুরূপ অঙ্গ প্রত্যঙ্গ এবং মস্তিষ্ক দিয়াছেন। সুতরাং সেইরূপ শিক্ষা দিয়াই সেই অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ও মস্তিষ্ককে পূর্ণতা লাভ করিতে দেওয়া উচিত।

হিন্দু শাস্ত্রের ব্যবস্থা স্বাস্থ্যরক্ষার সহিত জড়িত। ধর্ম্মকার্য্যের সঙ্গে সঙ্গে স্বাস্থ্যরক্ষার কার্য্য অজ্ঞাতসারে আপনিই হইয়া যায়। শাস্ত্রের এ অংশ হিন্দু স্ত্রীলোকেরই কর্ত্তব্য। সাধারণতঃ পুরুষই ধর্ম্মদ্রোহী হয়। স্বামী ধর্ম্মকার্য্য করিতে ইচ্ছুক নহেন, কিন্তু স্ত্রী যদি তাঁহার ধর্ম্মকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া

তাহাকে ডাকে, পুরুষ সে আহ্বান অবহেলা করিতেই পারে না। সুতরাং শাস্ত্রের এ অংশটী হিন্দু রমণীর শিক্ষা করা অবশ্য কর্ত্তব্য। গৃহকার্য্যের সঙ্গে সঙ্গে হিন্দু বালিকা ইহা দেখিয়া শুনিয়া মুখে মুখে, হাতে হাতে শিক্ষা করে। শাস্ত্র পাঠ করিলে শিক্ষাটী আরও ভাল হয়। পুরুষ বালক কাল হইতে বিদ্যালয়ে পুস্তকস্থ বিদ্যা উপার্জ্জন করে, অন্য শিক্ষার সময় বা সুযোগ তাহার ঘটে না। স্ত্রীলোকেও তদ্রূপ বালিকা বয়স হইতে, সংসার-বিদ্যালয়ে কিণ্ডারগার্টেন প্রণালীতে, পিতা মাতার কার্য্য দেখিয়া এমন শিক্ষা লাভ করিবে, যাহা শিক্ষা করিবার সুযোগ স্কুলে হয় না। এই উভয়ে মিলন হইলে স্ত্রী কার্য্যক্ষেত্রে স্বামীকে সেই শিক্ষা অনুসারে তাহা অভ্যাস করাইবে। স্বামীর শিক্ষার যে অভাবটুকু তাহা পূরণ করিবে। এই ভাবে কার্য্য চলিবে বলিয়াই পুরুষ সংসারে অর্দ্ধাঙ্গ এবং স্ত্রী অর্দ্ধাঙ্গী। একের কার্য্য অপরে করিলেই অনধিকার চর্চ্চা হইবে, এবং সে দিকে ত্রুটী হইবে। পুরুষ পুরুষের বিদ্যা শিখিল, রমণীও যদি সেই বিদ্যাই শিক্ষা করে, তবে পূর্ণাঙ্গ হইল কৈ?

যে স্ত্রী স্বামীর ধর্ম্মের সহায়তা করেন, তিনিই প্রকৃত সহধর্ম্মিণী। স্ত্রী বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী স্বামীর ধর্ম্মকার্য্যে সহায়তা করিতে পারে না। রমণী কিরূপ স্বামীর হাতে পড়িবে, তাহার স্থিরতা নাই, এই জন্যই শাস্ত্র-কর্ত্তা বলিয়াছেন, "স্বামী বিনা স্ত্রীর পৃথক যজ্ঞ নাই, স্বামীর অনুমতি বিনা ব্রত নাই বা উপবাস নাই। কেবল পতি-সেবা করিয়াই স্ত্রীলোক স্বর্গে গমন করেন।" এইরূপ শিক্ষা পাইয়া হিন্দু রমণী স্বামীর ঘরে গিয়া স্বামীর মতে মত মিলাইয়া দেয়, নিজে ব্রত না করিয়া স্বামীর দ্বারা ধর্ম্মানুষ্ঠান করাইয়া নিজের পরকালের পথ করিতে চেষ্টা করিতে লাগিল। এইরূপে স্বামীর অজ্ঞাতে বিনা লোকাচারে স্ত্রী যেমন স্বামীকে ধর্ম্মপথে আনিতে পারে, এমন আর কাহারও দ্বারা হয় না। সুতরাং সংসারে স্ত্রীকেই আত্মোৎসর্গ করিতে শিক্ষা না দিলে, স্বামীর ব্রতই নিজের ব্রত বলিয়া শিক্ষা না দিলে, এ ভাবটুকু আইসে না। হয়ত স্বামী স্ত্রীতে মনের মিল না হওয়া একটা গোলযোগ ঘটিয়া অশান্তির সৃষ্টি করে, তাই শাস্ত্রের ঐ আদেশ। সে আদেশটী যাহাতে সম্পূর্ণরূপে প্রতিপালিত হইতে পারে, এইরূপ শিক্ষাই হিন্দু রমণীর পক্ষে সুশিক্ষা। স্বামীর যজ্ঞ কি? পিতা মাতার সেবা করা, সংসার প্রতিপালনের ব্যবস্থা করা। স্ত্রীরও তাহাই যজ্ঞ। তিনিও স্বামীর সেই যজ্ঞে ব্রতী হইয়া স্বামীর পিতা মাতার সেবা করিবেন। এরূপ শিক্ষা পাইলে স্ত্রী স্বামীর সংসারে গিয়া শ্বশুর শাশুড়ীকে তাড়াইতে চাহে না, সে সংসারটী শান্তি ও সুখের আগার করিয়া প্রকৃত সহধর্ম্মিণীর পরিচয় দেয়। অতএব বালিকাগণকে এইরূপ শিক্ষা দেওয়াই প্রত্যেক হিন্দুর কর্ত্তব্য।

ভাই হিন্দু! তুমি হিন্দুই থাক। অন্যের সহিত নিজেকে মিশাইয়া আত্মাকে হারাইও না। হিন্দু রমণীকে হিন্দু রমণীই থাকিতে দেও, অন্যের সহিত মিলাইয়া অর্দ্ধাঙ্গের পক্ষাঘাতের কারণ হইও না। শাস্ত্রকর্ত্তা যাহা বহু পূর্ব্বে বলিয়াছেন, তুমিও বেশ বিবেচনা করিয়া দেখিলে সেই সিদ্ধান্তেই উপস্থিত হইবে। কে বলে হিন্দু হীন জাতি, কে বলে হিন্দু অসভ্য? হীন আচারকে ত্যাগ করে বলিয়া, হীন আচারে দোষ দেয় বলিয়াই হিন্দুজাতি—হিন্দু। অতএব হিন্দুশাস্ত্রানুসারে

রমণীকে শিক্ষা দেও, সম্মান কর, তোমার সংসার সুখের হইবে।

হিন্দুর সংসারে—

"পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্ম্মঃ পিতাহি পরমং তপঃ।
পিতরিপ্রীতিমাপন্নে প্রীয়ন্তে সর্ব্ব দেবতাঃ॥"
"জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী॥"

পুরুষের, পিতা মাতার সেবা এবং সংসার-ধর্ম্ম প্রতিপালনই যজ্ঞ। "স্ত্রীদিগের পৃথক যজ্ঞ নাই, ব্রত নাই, উপবাস নাই।" অতএব মা হিন্দু রমণী!

"নাস্তিস্ত্রীণাং পৃথক যজ্ঞো ন ব্রতং
নাপ্যুপোষিতম্।"

তাই মা! তুমি স্বামীকে যজ্ঞেশ্বর করিয়া, তুমি যজ্ঞেশ্বরী হও। তাহাই তোমার যজ্ঞ, তাহাই তোমার ব্রত। এই শিক্ষা গ্রহণ করিলেই তুমি সংসারে সুখী হইতে পারিবে।

শ্রীবিনোদবিহারী রায়।

পরলোক তত্ত্ব

লোক দ্বিবিধ—ইহলোক ও পরলোক। মুখ আর দর্পণ-বিম্বিত মুখের মত ইহ ও পরলোক পরস্পর বিম্ব-প্রতিবিম্ব। পরলোক ইহলোকের প্রতিচ্ছবি। ইহলোক স্থূল, পরলোক সূক্ষ্ম। ইহলোক পার্থিব, পরলোক অপার্থিব। ইহলোকে যাহা বিদ্যমান, সংস্কার রূপে তাহাই পরলোকেও বিদ্যমান। ইহলোকে ভোগ দৈহিক, ঐন্দ্রিয়ক ও মানস। পরলোকে মাত্র মানস ভোগ। ইহলোক জাগরণবৎ, পরলোক স্বপ্নবৎ। ইহলোকের কর্ম্ম ফলরূপে, বাসনা মূর্ত্তিমতী রূপে, স্মৃতি অনুভূতি রূপে দেখা দেয়। ইহলোকের যে দেহ, পরলোকে সে দেহ থাকে না, তাহার ছায়ামাত্র থাকে। স্থূলদেহের উপর আসক্তি কমিয়া গেলে, পরবর্ত্তী দেহ ধারণের উৎকট আকাঙ্ক্ষা জন্মিলে, আর নবশরীর গ্রহণের কাল উপস্থিত হইলে ঐ ছায়া ক্রমেই সূক্ষ্ম, সূক্ষ্মতর ও সূক্ষ্মতম হইয়া শেষে লয় প্রাপ্ত হয়। ঐ ছায়ার মধ্যে যাহা অনশ্বর অংশ—তাহা জীব চৈতন্য। উহা মনপ্রাণোপাধিক। সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়, লিঙ্গ দেহ লইয়া উক্ত মনোপাধিক জীব জন্ম গ্রহণ করে। এই বায়ু মণ্ডলে, বাষ্পপুঞ্জে, এই সলিল রাশিতে, এই জলে, স্থলে, ভূতলে সর্ব্বত্রই সূক্ষ্ম জীব সকল অবস্থিতি করে। ঐ সর্ব্বত্র পরিভ্রমমাণ কীটাণু, কত মানব জীব, কত পশুজীব, কত কৃমিকীট হইয়া জন্মিবে, কে বলিতে পারে?

মানব মৃত্যুর পর যায় কোথায়?—এ সম্বন্ধে সকলের গতি একরূপ নহে। কাহারা জলৌকার মত তৎক্ষণেই জন্মে, কাহারা অণুরূপ দেহ ধারণের জন্য কিছুদিন অপেক্ষা না করিয়া তৎক্ষণেই জন্মিতে পারে না, কাহাদিগকে কর্ম্মানুরূপ মানস সুখ দুঃখ ভোগ করিয়া তবে জন্ম লইতে হয়, আর কাহাদিগকে বা কখনই মর্ত্তভূমে শরীর গ্রহণ করিতে হয় না—এই দুরূহ তত্ত্ব আমি অন্য যুক্তিযুক্তভাবে যতটা পারি, বুঝাইতে যত্ন পাইব।

বর্ত্তমান দেহের উপর যাহাদের তাদৃশ মায়া জন্মে না, তাহারা দেহান্তে দেহের ছায়া গ্রহণ করিতে পারে না। সে কাহারা? সে শিশুগণ। ২।৩ বৎসরের শিশুদের—জীবের জীবোচিত সহজ জ্ঞান জন্মিলেও জ্ঞান

* জ্ঞানানন্দ স্বামীর অধিনায়কতায় বারাণসী হরি-সভায় বৎপ্রদত্ত বক্তৃতা হইতে সঙ্কলিত।

জন্মে না বলিতে পারা যায়। বর্ত্তমান দেহ আমার, এ প্রকার মমতা দেহের উপর তাদৃশ জন্মিবার সম্ভাবনা থাকে না। মৃত্যুর পর সে শিশু পূর্ব্ব স্থূল দেহের স্মরণ করিতে পারে না, সে দেহের কথা তাহাদের মনে থাকে না, আর বর্ত্তমান দেহে কোনরূপ পাপপুণ্য করিয়া যায় না; মনে নানারূপ সংস্কারও লইয়া যায় না। কাজেই লিঙ্গদেহে তাহাদের অবস্থিতি যেমন সম্ভব নহে, তদ্রূপ সুখদুঃখ ভোগও সম্ভব নহে এবং নানাবিধ কর্ম্মবৈচিত্র্য না থাকায় অনুরূপ দেহ সহজে মেলে, অপেক্ষা করার প্রয়োজন হয় না। তাই আমাদের শাস্ত্রকারগণ শিশুদের দাহ শ্রাদ্ধের ব্যবস্থা করিয়া যান নাই। যে দাহ শ্রাদ্ধ না করিলে প্রেত দেহ বিমুক্তি ঘটিবে না বলিয়া এবং ঘোরতর পাপ হইবে বলিয়া ভয় দেখাইয়া গিয়াছেন—সেই দাহ শ্রাদ্ধের বিধান শিশুদের সম্বন্ধে করেন নাই। বাস্তবিক ইহা বিস্ময়ের নহে কি?

দাহ শ্রাদ্ধ প্রভৃতি আধ্যাত্মিক চিকিৎসা। চিকিৎসা না করিলে রোগ কি একেবারে সারিত না, সকলেই কি মরিয়া যাইত, তাহা নহে। অথচ চিকিৎসার উপযোগিতাও বড় অল্প নহে। বীজ আপনা আপনি অঙ্কুর হয়, ক্রমে বৃক্ষরূপে ফল দান করে, প্রকৃতির নিয়মেই ইহা হয়। তথাপি জল-রৌদ্রের ব্যবস্থায় আমাদের চেষ্টার উপকারিতা অস্বীকার করা যায় না। চিকিৎসা না করিলে কোন কোন রোগ কখন আরোগ্য হইত না। কোন কোন বীজ কখন কখন অঙ্কুর রূপে উদ্ভিন্ন হইত না। আধ্যাত্মিক চিকিৎসার বেলায় আমাদের ঐ কথাই। যাহারা আপনাদের গুণে জন্মিতে পায় না, বাধাপ্রাপ্ত হয়, তাহাদিগকে আমাদের সাহায্য করিতে হইবে। মৃত্যুর পর লিঙ্গদেহে মানবের জীবদশায় অভ্যস্ত সংস্কার বশতঃ জীবের ক্ষুধা তৃষ্ণার বোধ জন্মে, অনুরূপ দেহ ধারণের জন্য জীবগণের উৎকণ্ঠা ও চেষ্টা দেখা দেয়। স্থূল দেহোচিত ভাবনায় অনুভাবিত হইয়া কর্ম্মানুরূপ মানস সুখ দুঃখ করিতে হয়, আবার পাপপুণ্যানুকারী উৎকৃষ্টাপকৃষ্ট জন্মলাভও করিতে বাধ্য হইতে হয়। সাধারণতঃ এগুলি নিজ নিজ কর্ম্মানুসারে ব্যবস্থিত হইয়া থাকে। তথাপি যদি সেই স্বাভাবিক পরিণতি না ঘটে, কোনরূপ বাধা আসিয়া উপস্থিত হয়, ভাবনাজ ক্ষুধাতৃষ্ণা বোধ, সংস্কারোপনীত মানস সুখ দুঃখের কোন প্রকার শুভ ইতর বিশেষ করা যায়, তাহা করিলে লাভ বৈ কোন ক্ষতি নাই। বালকের পীড়া জন্মিলে বালকের মাতা ভগবানকে ডাকার মত ডাকিলে পীড়া কখন কখন সারে, স্বামীর বিপদ হইলে সতী রমণীর আন্তরিক আবেদন ভগবানের চরণে পৌঁছিয়া বিপদের শান্তি করে। তবে মৃত ব্যক্তির পারলৌকিক সদ্গতি বা কোনরূপ উপকারের জন্য আমাদের ঐকান্তিক প্রার্থনা কোনরূপ সাধনা বিফল হইবার কোন কারণ নাই। খ্রীষ্টিয়ান মুসলমান প্রভৃতি সকল জাতিই মৃত ব্যক্তির (আত্মার) সদ্গতি বা উপকারের জন্য প্রার্থনা করিয়া থাকেন। ঐ প্রার্থনাও তাহাদের একরূপ আধ্যাত্মিক চিকিৎসা। তবে আমাদের দাহশ্রাদ্ধে যেমন সূক্ষ্ম প্রণালীর চিন্তার পরিচয় আছে, অন্য জাতিদের তাহা নাই। শাস্ত্রকারগণের ব্যবস্থিত দাহ শ্রাদ্ধ উন্নত প্রণালীর আধ্যাত্মিক চিকিৎসা। কোন্ দেশে কোন্ কোন্ চিকিৎসা উন্নত প্রণালীসিদ্ধ—ইহা ত মানিবার উপায় নাই। প্রার্থনায় যদি বল থাকে, তবে আমাদের

অনুষ্ঠিত শ্রাদ্ধ যদি শ্রদ্ধাহীন, মন্ত্রহীন বা দুষ্ট হয়, তবে হয়ত প্রার্থনার ফল অধিক হইতে পারে। আমাদের শ্রাদ্ধেও প্রার্থনা ত আছেই, উপরন্তু অধিক কিছু আছে।

দাহে যে কার্য্য সিদ্ধ হয়, মুসলমান খ্রীষ্টিয়ানদের কবরেও সেই কার্য্য সিদ্ধ হয় তবে আমাদের কার্য্য সিদ্ধির যতটা সম্ভাবনা উহাদের ততটা সম্ভাবনা নাই। মৃত্যুর পক্ষে জীবের দেহ বয়সেই হউক আর রোগেই হউক, জীর্ণ ও বিকল হইয়া আইসে, জীবের থাকার যোগ্য হয় না। মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হইলে জীব যেমন স্বস্তিবোধ করে, দেহ ত্যাগের পরও জীব যতই সুখ মনে করে। মৃত্যুর পূর্ব্বে দেহ হইতে বাহির হইবার জন্য জীব আকুলি বিকুলি করে। মৃত্যুর পরই "আঃ বাঁচলাম" বলিয়া অনির্দ্দিষ্ট লক্ষ্যে ছুটিয়া যায়। কিয়দ্দূর যাইয়া তখন আবার স্থূল দেহের জন্য তাহাদের মনটি ব্যাকুল হয়। তৎপরে কেহ কেহ মৃত্যুস্থানে আসিয়া থাকে, কেহ কেহ বা শবের অনুগমন করে। দেহ দগ্ধ হইলে স্থূল দেহের চিহ্ন থাকে না, কাজেই তখন স্থূল দেহের উপর মায়া একরূপ ছুটিয়া যায়। ভূমির মধ্যে প্রোথিত হইলেও দেহ আর দেখা যায় না, কাজেই তাহাতেও মায়া দূর হয়। তবে দাহই প্রশস্ত। ভূমির মধ্যে প্রোথিত আছে —এই ধারণা মৃতের থাকা ভাল নহে।

মৃত দেহ যদি ঔষধের বলে অবিকৃত রাখিয়া কাচের পাত্রে রাখিয়া দেওয়া যায়, আর ঐ দেহ যদি সকল দিক্ হইতে সহজেই যাহাতে দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার ব্যবস্থা থাকে, তবে নিশ্চয়ই ঐ দেহ মৃত-জীবকে অনর্থক আকর্ষণ করিবে। ঐ আকর্ষণের ফলে জীবের স্বাভাবিক গতির বড়ই ব্যাঘাত জন্মে। ফটো পর্য্যন্ত মৃত জীবের আকর্ষণের একটী প্রধান উপায়।

এক সময়ে মহাত্মা শিশিরকুমার ঘোষ তাঁহার মৃত পুত্রের ফটো তুলিবার জন্য আমেরিকায় লিখিয়া পাঠান। তাঁহারা জিজ্ঞাসা করেন, ঐ পুত্রটীর বালককালের কোন ফটো আছে কি না? পরে ফটো ছিল না বলিয়া বালকের সর্ব্বদা ব্যবহৃত প্রিয় কোন বস্তু আছে কি না জিজ্ঞাসা করেন। পরিশেষে সেই প্রিয় বস্তুটীর আকর্ষণে মৃত পুত্রের ফটো তোলা হয়।

শিশুদের সম্বন্ধে বলিতেছিলাম। শিশুকালে মৃত্যু হওয়া সর্ব্বত্রই যে পূর্ব্ব পাপের ফলে ঘটে, তাহাতে সন্দেহ নাই। তবে তাহা বলিয়া ঐ শিশুরা যে সর্ব্বত্রই পাপী, তাহা নহে। এমন কোন কোন মহাত্মা মুক্ত হইবার মত সাধনা করিয়া প্রারব্ধের কিঞ্চিৎ অবশেষ থাকায় একবার মাত্র জন্ম মৃত্যু যাতনা ভোগ করিয়া যান। তাঁহারা শিশু অবস্থায় মৃত্যু হইবামাত্র ভগবানে মিলিত হন। কোন কোন ব্যক্তি বহুকাল ধরিয়া বহু জন্মে নানা পাপ পুণ্য কর্ম্মফল ভোগ করিয়া পরিশেষে এমন অবস্থায় আসিয়া উপনীত হন যে, যাহাকে প্রথম পয়েন্ট হইতে আরম্ভ বলা যায়। অর্থাৎ পরবর্ত্তী জন্ম এমন হইবে, যাহাতে প্রারব্ধ-সঞ্চিত অর্থ বড় বেশী থাকিবে না। মাত্র জন্ম পর্য্যন্তই পূর্ব্বকর্ম্মের ফল স্বরূপ হইবে। এইরূপ অবস্থায় উপনীত হইবার পূর্ব্বে কেহ কেহ শিশু হইয়া মৃত্যু লাভ করতঃ পূর্ব্ব পাপের শেষ করিয়া যান। পরবর্ত্তী জীবনে ক্রিয়মাণ কর্ম্ম যাহা অনুষ্ঠিত হইবে, তাহারই কর্ম্মফল তাঁহাকে ভোগ করিতে হইবে মাত্র।

সাধারণতঃ শিশু অবস্থায় মৃত্যু দুর্ভাগ্যের

পরিচারক। পূর্ব্বকৃত পাপের ক্ষয় হইয়া গেল, ইহাই মাত্র লাভ। কিন্তু সে জন্মে ত কোন কার্য্য হইল না। পশু জন্মের মত কেবল পাপের ক্ষয় করিয়া যাওয়াই মানবের কার্য্য নহে। পুণ্য লইয়া যাওয়া, পরবর্ত্তী জীবন মহত্তর করা, পরিশেষে ভগবৎ পদ লাভ করাই মানবের আকাঙ্ক্ষার বিষয় হওয়া উচিত। এমন এক এক পাপের ফলে কাহাকে কাহাকে দুই তিন চারি কি আরও অধিকবার শিশু অবস্থায় মৃত্যুলাভ করিয়া যাইতে হয়। দুই একটী শিশু একই বয়সে একই রোগে উপর্য্যুপরি তিন চারি বার মৃত্যু লাভ করিয়াছে, তাহারও উদাহরণ পাওয়া যায়। একই মায়ের গর্ভে শিশু দুই তিন বার আসিয়া মরিয়া গেল, হয়ত বা শেষবার আসিয়া জীবিত রহিল। তদ্বিষয়ে দুই তিনটী ঘটনার কথা আমরা জানি। একই গৃহে আত্মীয় স্বজনের গৃহে শিশুদের জন্মানই স্বাভাবিক। বয়স্ক লোকদের নানা কর্ম্মবৈচিত্র্য তাহাদের নানারূপ ইচ্ছা জন্মাইয়া দেয়, ইচ্ছার পরিপূরণ করিতে দেয় না। শিশুদের বেলায় ইচ্ছাও সাধারণতঃ জন্মে, আর সে ইচ্ছার প্রয়োজন বড় কিছু থাকে না। একই গৃহে জন্মিলে শিশুদের উদ্বোধঃ কারণের উপস্থিতিতেও জন্মান্তর স্মৃতি উদ্রিক্ত হয় না। কারণ শিশুরা শৈশব অবস্থা হইতে দেখিয়া আসিতেছে বলিয়া পরবর্ত্তী জন্মে দৃষ্ট কিনা, এরূপ সন্দেহ পর্য্যন্ত তাহাদের হয় নাই। আমরা যদি পূর্ব্ব জন্মের পিতা মাতা, ভাই বন্ধু, স্ত্রী পুত্রকে এবং গ্রাম, পথ, ঘাট, গৃহ প্রভৃতি একেবারে এখন দেখিতে পাই, তাহা হইলে আমাদের জন্মান্তর স্মৃতি অস্ফুটভাবে উদ্রিক্ত হইবেই। স্পষ্ট উদ্রিক্ত হওয়া অবশ্য প্রকৃতির নিয়ম-বিরুদ্ধ, কিন্তু কখন কখন তাহাও ঘটিয়াছে বলিয়া আমরা শুনিয়াছি। কয়েক বৎসর হইল, একটী বালিকা পূর্ব্ব জন্মের স্বামী পুত্রকে সম্পূর্ণ চিনিতে পারিয়াছিল, তাহার ইতিহাস অনেকের স্মরণ থাকিতে পারে।

আমারই দিদিমার ভাই এক সময়ে তাহার পিতার সহিত গোন্দলপাড়ায় কুকুরে কামড়ানের ঔষধ খাইতে যায়, তখন তাহার বয়স পাঁচ বৎসর মাত্র। ফিরিবার সময়ে সেই পাঁচ বৎসরের শিশু সেইখানকার একটী বাড়ী দেখাইয়া পিতাকে বলে, বাবা, আমি এই বাড়ীতে ছোটবেলায় কত খেলা করিয়াছি। এই বাড়ীতে একটী পেয়ারা গাছে পেয়ারা পাড়িয়া খাইয়াছি। এই বাড়ীতে আমার কেমন একটী সুন্দর মা আছে, ইত্যাদি ইত্যাদি। ইহার কিছু দিন পরে উক্ত বালকের মৃত্যু হয়। পাঁচ বৎসর পরে দিদিমার পিতা গোন্দলপাড়ায় পুনরায় যাইয়া সেই শিশুটীকে যেন আবার দেখিলেন। তিনি আর তাহার সহিত দেখা না করিয়া চক্ষু মুছিতে মুছিতে ফিরিয়া আসিলেন। সেই শিশুটীর স্বর অবিকল তাহারই শিশুর মতই। আকৃতির কিঞ্চিৎ বৈলক্ষণ্য ছিল বটে, ভাব ভঙ্গী আদব কায়দা একই রূপ ছিল।

জন্মান্তর-স্মৃতি স্পষ্ট উদ্রিক্ত হইলে মায়ার কোমল বন্ধন শিথিল হইয়া আসে, দেহের উপর ও আপনার জনের উপর তেমন আস্থা থাকে না; বর্ত্তমান জীবন ভাল লাগে না। অস্পষ্ট উদ্রেকে কোন ক্ষতির সম্ভাবনা নাই। মহাকবি কালিদাসের জন্মান্তর স্মৃতির অস্পষ্ট উদ্রেক বিষয়ে একটী সুন্দর শ্লোক আছে, তাহা এই—

রম্যাণি বীক্ষ্য মধুরাংশ্চ নিশম্য শব্দান্
পর্য্যুৎসুকী ভবতি যৎ সুখিতোঽপি জন্তুঃ।
তচ্চেতসা স্মরতি নূনমবোধপূর্ব্বং
ভাবস্থিরাণি জন্মান্তর সৌহৃদানি॥

সুখী জনও কখন কখন রমণীয় কিছু দেখিয়া মধুর স্বর সঙ্গীতাদি কিছু শুনিয়া পর্য্যুৎসুক হইয়া থাকেন। নিশ্চয়ই সেই ব্যক্তির "অবোধপূর্ব্ব" "ভাবস্থির" জন্মান্তর সৌহৃদাই তাহার চিত্তে ফুটিয়া উঠে। ক্রমশঃ

শ্রী বেদান্তশাস্ত্রী।

কবি-বিদায়।

(কবিবর ৺গোবিন্দচন্দ্র দাসের পরলোক গমনে)

১

কবিবর!
এ কি নিদারুণ কথা এ কি সমাচার?
শারদ-নিশীথে নাকি,
তুমি দিয়ে গেছ ফাঁকি,
আকাশ ভরিয়াছিল মেঘ-অন্ধকার;
পাখী ছিল ঘুমি নীড়ে,
ফুলেরা পড়িল ছিঁড়ে,
বহিল আকুল বায়ু করি হাহাকার;
কি আতঙ্কে পদ্মা ফুলে,
ঢেউ আছাড়িল কূলে,
এসেছিল মহানিদ্রা নেত্রে বঙ্গ মা'র;
হেরি সে ঘুমের ঘোর,
সহসা পশিয়া চোর,
হরি নিল অভাগীর রত্ন-অলঙ্কার!
বঙ্গের সাহিত্য আজি,
পুষ্প হীন—শূন্য সাজি,
"চন্দন কুঙ্কুমে" রাণী কে পূজিবে আর?
হার গাঁথি "প্রেম ফুলে"
কে বা "বৈজয়ন্তী" তুলে,
ছুটিবে "কস্তুরী" রূপে যশোরাশি কার,
নীরব জন্মের মত সে বীণা ঝঙ্কার?

২

আমরা এ মুখ বিশ্বে দেখাব কেমনে,
বঙ্গের অমর কবি,
মধ্যাহ্ন সূর্য্যের ছবি,
চলি গেল অনাহারে অশ্রুল নয়নে;
আমরা যা' নিত্য খাই,
চর্ব্ব চোষ্য—ভস্ম ছাই!—
দেই নাই এক মুঠা ক্ষুধিত বদনে!—
এ অসহ্য অপরাধ,
এ কলঙ্ক অপবাদ,
শুনি কি কহিবে কালি বিশ্ব জনগণে?
আর রবি! উঠ না'কো,
অন্ধকার! ছেয়ে থাক,
থা'ক কৃষ্ণা একাদশী! তিমির বসনে;
থাক কবি! থাক শুয়ে,
ঢেকে রাখি বেলা যুঁয়ে,
ঘুমাও বঙ্গের রত্ন! ব্রত অনশনে!—
কেহ যেন নাহি জানে,
না যায় কাহারো কানে,
বাঙ্গালীর কৃতঘ্নতা নৃশংসাচরণে!—
কালি মোরা পোড়া মুখ দেখাব কেমনে?

৩

কেন এলে কবিবর, এ যে শুষ্ক বন—
ভস্মাবৃত বৈশ্বানর,
মেঘাবৃত প্রভাকর,
তুমি পেলে হেথা আসি, দরিদ্র-জীবন!
তবু তুমি শূর বীর,
শত ঝঞ্ঝা মাঝে স্থির,
ভীষণ শ্মশানে শিব যোগীন্দ্র যেমন!
অপমান, অবহেলা,
দারিদ্র্য রাক্ষস খেলা,
ফেলিয়াছ অবহেলি বীরেন্দ্র মতন,

তোমার লেখনী, মসী,
সহস্র শাণিত অসি,
ঝরিবে আগের গিরি অনল স্ফুরণ।
সে ভীম ভৈরব রাগে,
মৃত বক্ষে প্রাণ জাগে,
পায় ভক্ত, মনুষ্যত্ব অপদার্থ জন—
কেমনে চিনিব মোরা, তুমি কি রতন!

৪

এথা বিধি দিলা তোমা কি ভাবিয়া মনে,
রাজার প্রসাদে নয়—
নাহি খ্যাতি পরিচয়,
দীন বাঙ্গালার এক দীন নিকেতনে।
মা ভারতী চুপে চুপে,
নিজ বর-পুত্র রূপে,
গড়িলা বিজনে বসি "দুরন্ত" নন্দনে;
—সে যে অভিমানী ভক্ত—
তার বুকে বীর রক্ত,
ঘৃণিত সে স্বার্থপর তোষামোদী জনে।
মা' তারে শিখা'লে গান,
অপূর্ব্ব বীণার তান,
উদারা মুদারা তারা জাগে এক সনে!
আরাধিতা মাতৃভূমি,
তারি পদরেণু চুমি,
গাহিত সে কলকণ্ঠ তাহারি বিজনে!
কি দুর্ভাগ্য! তার পর,
হারাইল বাড়ী ঘর,
"নির্ব্বাসিত বিড়ম্বিত" অদৃষ্ট ছলনে!—
হারায়ে মায়ের কোল কি লাগিল মনে!

৫

সত্যই আমরা "প্রেত" মানুষ তো নয়;
বুঝি না মণির মূল্য,
কাঞ্চন কাচের তুল্য
হীরক অঙ্গার সহ করি বিনিময়!
আমরা সে "মহাপ্রাণ"
করিয়াছি শতখান!—
অত্যাচার অবিচার আরো নিরাশ্রয়!
পরায়েছি জীর্ণবাস,
ফেলায়েছি দীর্ঘশ্বাস,
নিশায় পিশাচ সাজি দেখায়েছি ভয়!
নরাধম শ্যামা, রামা,
ধরি তাহাদেরি ধামা,
দাতব্য চিকিৎসালয়ে শ্রীমধু বিলয়!
অন্নহীন—চিন্তা-জ্বরে,
আমাদের কবি মরে,
আমরা সঙ্গীত নৃত্যে মগ্ন রঙ্গালয়!
এ দুঃসহ মহাপাপ,
ঈশ্বরের অভিশাপ,
চিতায় রচিলে "মঠ" কভু হবে ক্ষয়?
আমরা "মানুষ যদি, প্রেত কারে কয়"!

আর কি সুধাংশো! তুমি আসিবে গগনে,
তেমতি জ্যোছনা রাশি,
ঢালিবে রজত-হাসি,
জাগিবে রোহিনী চিত্রা নিত্য তব সনে?
তুমি কি আসিবে উষা
পরিয়া মুকুতা ভূষা,
উজলি পূরবাচল অরুণ কিরণে?
তুমিও প্রভাত রবি,
দেখাবে প্রবাল ছবি,
ঢালিবে সোণালী-আলো কমল-কাননে?
পরি' সে বসন খানি,
তুমি কি বাসন্তী রাণি,
জাগাবে সবুজ ছটা পুনঃ বনে বনে?
ফুল সব ফুটি ফুটি,
পুলকে পড়িবে লুটি,
মলয় পবন ব'বে সে মৃদু বাজনে?

পুনঃ পিক পাপিয়ারা,
গানে হবে মাতোয়ারা,
নিকুঞ্জ মুখর হবে মধুপ গুঞ্জনে ?
ফিরে বরষার ধরা,
জলে জলে হবে ভরা,
বিজলী কি উজলিবে জলধর সনে ?
সবি কি তেমনি রবে,
কারো কিছু নাহি হবে,
"ভাওয়াল" কি বেঁচে রবে গোবিন্দ-বিহনে
শুধুই বিধবা তার কাঁদিবে বিজনে ?
শুধু তার পুত্র দীন,
তারি কন্যা পিতৃহীন,
আর কি গোবিন্দে কেহ করিবে না মনে !
সবি কি তেমনি রবে গোবিন্দ-বিহনে ?

৭

যাও সুখে কবিবর ! ত্রিদিব ভবনে,
যেখানে তোমার লাগি,
বহু নিশা আছে জাগি,
জননী, সোদর, জায়া, প্রিয় পরিজনে ;
উথলিছে মন্দাকিনী,
চির পুণ্য প্রবাহিনী,
ধুয়ে দিবে সব ব্যথা, পেলে যা' জীবনে
বসি দেব-তরু-শিরে,
স্বরগ বিহঙ্গ ধীরে,
শুনা'বে মধুর গীতি কবির শ্রবণে।
সেথা সুধামাখা বায়ু,
দিবে নব শক্তি আয়ু,
"অমর অমৃত গন্ধ" নন্দন কাননে !
দেব-সম্মিলন-সভা,
না জানি কেমন শোভা,
তোমারে বরিবে তা'রা সভা সুশোভনে ;
গন্ধর্ব্ব, কিন্নর বালা,
সুগন্ধি মন্দার মালা,
পরাইবে কবি শিরে সাদরে যতনে,
সেখানে মা' বীণাপাণি,
রত্নাসন দিবে আনি,
রাজ-রাজেশ্বর করি দরিদ্র নন্দনে ;
কবীন্দ্র গোবিন্দ, যাও সে স্নেহ-ভবনে ।

৮

হেথায় পদ্মার তীরে তোমার শ্মশান,
দেশের কপাল ভাঙ্গা,
চিতার আগুন রাঙ্গা,
পোড়াইল বাঙ্গালীর মহাশক্তিমান।
নিঃস্বার্থ—পরার্থ আর,
এমন দেখিব কার,
পাপাত্মা "অন্নদা" তরে কাঁদে কার প্রাণ ?
বিধবা বালিকা দুঃখে,
অশ্রু বহি পড়ে মুখে,
কুলটা কাহিনী শুনি কত কৃপাবান !
প্রিয় ভাওয়ালের দুখে,
শত বজ্র বাজে বুকে,
আপনি মরিয়া চাহে তাহারি কল্যাণ !
দেশে আছে এত জন,
কার এ উদার মন,
কার বুকে এত দয়া দেবের সমান !
হায় ! আজি পদ্মা-তীরে,
বাঙ্গালার বুক চিরে।
পুড়ি গেল চিতানলে অমর সন্তান !
জানি এ "মরণ" নয়,
কবি আজি মৃত্যুঞ্জয়,
কি সাধ্য শমনে ছোঁবে হেন কীর্ত্তিমান !
প্রতিদিন যে' সে' মরে,
পরে কার খোঁজ করে,
কিন্তু এই শোক-বহ্নি "চির-অনির্ব্বাণ"
ধুইবে না পদ্মা জলে,
জুড়াবে না হরিবোলে,
সকলেরি বুকে রবে চির-দীপ্তিমান,
কবীন্দ্র গোবিন্দ ! তব এ মহাপ্রয়াণ।

শ্রীবীরকুমার-বধ-রচয়িত্রী।

সমাজে স্ত্রীজাতির স্থান। (৩)

অধীনতা।

সকলেই জানেন, সভ্য অসভ্য উভয়বিধ সমাজেই বহু স্ত্রীলোক ধনোপার্জ্জন করেন; এবং সাধারণের সমক্ষে বাহির হইতে পারেন। কিন্তু আমাদিগের ন্যায় আরও কতিপয় সভ্য সমাজে ইহার বিপরীত প্রথা দেখা যায়। এই সকল সমাজে স্ত্রীলোক ধনোপার্জ্জন করেন না; এবং সাধারণের সমক্ষে প্রায়শঃ বাহির হইতে পারেন না। একে উপার্জ্জন না করা হেতুবশতঃই স্ত্রীগণ পুরুষের অধীন হইয়া পড়েন; তাহার পর অসূর্য্যম্পশ্যা ভাবে আবদ্ধ হওয়ায় তাঁহাদিগের স্বাস্থ্যভঙ্গ হইয়া যায়। তৃণ অবধি মানুষ পর্য্যন্ত সকলেরই মুক্ত আলো এবং মুক্ত বায়ু আবশ্যক, নচেৎ কোন জীবই টিকিতে পারে না। সুতরাং অবরোধের ফলে স্বাস্থ্যভঙ্গ হইবেই। ইহাতে মনেরও অনিষ্ট হয়। অবরুদ্ধ অবস্থায় পশু, পক্ষী, মানব, সকলেরই মনের স্থিতিস্থাপকতা, উদ্ভাবনী শক্তি, তেজঃ, সাহস ইত্যাদি উন্নত গুণ সকল কালক্রমে নষ্ট হইয়া যায়। উপার্জ্জন ক্ষমতা না থাকিলে, দেহ ভগ্ন হইলে, মন অবসন্ন হইলে, সাধারণতঃ যাহা হইয়া থাকে, নারীজাতির ভাগ্যেও তাহাই হইয়াছে। যিনি উপার্জ্জনক্ষম, বলবান এবং তেজস্বী, নারীগণ তাহার সম্পূর্ণ অধীন হইয়া পড়িয়াছে।

যেখানে অধীনতা, সেই খানেই অত্যাচার। অন্নদাতার নিপীড়ন অধীনকে বাধ্য হইয়া সহ্য করিতে হইয়াছে। যদিও অপেক্ষাকৃত তেজস্বী স্বভাব থাকায় কতিপয় স্ত্রীলোক নিপীড়নের হস্ত হইতে আত্মরক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে অন্নদাতার আশ্রয় ত্যাগ করিতে কখন কখন বাধ্য হইয়াছে, সত্য; তথাপি ধনোপার্জ্জনের কোন সদুপায় জ্ঞাত না থাকা হেতু অথবা কোন সুযোগ প্রাপ্ত না হওয়ায়, ঘৃণিত অধঃপতিত জীবিকা অবলম্বন করিয়াও, দুশ্চরিত্র পুরুষের অধীনতা স্বীকার না করিয়া উপায়ান্তর পায় নাই। ইহা নিশ্চিত ভাবে বলা যায় যে, যতদিন স্ত্রী-জাতি স্বয়ং উপার্জ্জন-ক্ষম না হইবে, ততদিন তাহাদিগের নিপীড়নের হস্ত হইতে উদ্ধার নাই। কিন্তু ইহাই প্রচুর নহে। অস্মৎ সমাজের ধর্ম্মশাস্ত্রকারগণ স্ত্রীজাতির ধনাধিকার দেন নাই, এমত নহে; কোন কোন স্থলে তাঁহাদিগের ধনাধিকার দিয়াছেন। তাঁহারা এতদূর অগ্রসর হইয়াছিলেন যে, স্ত্রীগণের "স্ত্রীধনে"র উপর কাহাকেও হস্তক্ষেপ করিবার অধিকার দেন নাই, স্বামীকেও না। স্ত্রীধন সম্পত্তিতে শাস্ত্রকার নারীগণকে সম্পূর্ণ স্বত্ব দিয়াছেন। কিন্তু তাহাতেও তাঁহাদিগকে দুর্বৃত্তের অত্যাচার হইতে রক্ষা করিতে সমর্থ হন নাই। তাঁহারা আজিও বহুক্ষেত্রে অসহ্য অত্যাচার সহ্য করিয়া চখের জলে দুটী অন্ন কোন মতে গলাধঃকরণ করিতেছেন। হৃদয়বান সত্যনিষ্ঠ পাঠককে ইহার দৃষ্টান্ত স্মরণ করাইয়া দিতে হইবে না। ধনাধিকার পাইয়াও যখন স্ত্রীগণের এরূপ দুরবস্থা দেখা যাইতেছে, তখন বিবেচনা হয় যে, স্বাধীন উপার্জ্জনের ক্ষমতা না পাইলে তাঁহাদিগের দুরবস্থা নিবৃত্ত হইবে না। কিন্তু ইংলণ্ড, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশে বহু নারী স্বাধীন উপার্জ্জন করিয়া থাকেন; তাহাতেও দেখা যাইতেছে যে, তাঁহারা পুরুষ-

জাতির নিপীড়ন সহ্য করিতে অনেক স্থলে বাধ্য হইতেছেন। এ দুরূহ সমস্যার উত্তর কি? কেন এরূপ হয়? এ প্রশ্নের উত্তর দিতে পুরুষগণ চিরদিনই অনিচ্ছুক। কিন্তু বিশেষরূপে অনুধাবন করিলে বোধ হয় ইহা অস্বীকার করা যাইবে না যে, নারীগণকে যথাসম্ভব পুরুষগণের অনুরূপ করাই এ প্রশ্নের প্রকৃত সদুত্তর। কিন্তু "অনুরূপ" করার অর্থ কি? আমি এ শব্দ দ্বারা ইহাই বুঝাইতে চাই যে, সমস্ত সামাজিক কার্য্যে স্ত্রীগণকে পুরুষগণের প্রকৃত সহায়-স্বরূপা করিতে হইবে। তাঁহাদিগের মৌলিক ধাতু যেরূপ স্বভাবতঃই হইয়া উঠিয়াছে, তাহা পূর্ব্বে বুঝাইয়াছি। পুরুষগণের ধাতুও স্বভাবতঃ যেরূপ হইয়াছে, তাহাও বিবৃত করিয়াছি। সুতরাং উভয় ধাতুর মৌলিক প্রভেদ বুঝা যাইতেছে। মূল ধাতু * পরিবর্ত্তিত হইতে পারে না। সুতরাং সামাজিক বিধান এবং শিক্ষা ও সংসর্গ দ্বারা যতদূর সম্ভব, তদনুসারে নারীজাতিকে এরূপ ভাবে গঠিত করা উচিত, যাহাতে তাঁহাদিগের স্বভাবের শুভ অংশ সামাজিক কর্ম্মে প্রযুক্ত হইতে পারে, এবং অশুভ অংশ যথাসম্ভব পুরুষগণের দ্বারা সংযমিত হয়। তেমনই পুরুষগণকেও মূল ধাতু অপরিবর্ত্তিত রাখিয়া এরূপে গঠিত করা সঙ্গত যে, তাঁহাদিগের চরিত্রের শুভ অংশ দ্বারা সমাজ উপকৃত হইতে পারে, এবং অশুভ অংশ যথাসম্ভব নারীগণ কর্ত্তৃক সংযমিত হয়। পূর্ব্বে দেখাইয়াছি যে, কেবল পুরুষের ধর্ম্মে সামাজিক উচ্ছৃঙ্খলতা ও বিনাশ; এবং কেবল স্ত্রীগণের ধর্ম্মে জড়তা ও নাশ। উভয়ের সামঞ্জস্যে এবং সম্মেলনে স্থিতি ও উন্নতি। মানব সুতরাং মানব সমাজ যেমন এক হইতে জাত হয় না, তেমনই এক হইতে উন্নতও হয় না। বরং যুগ যুগান্তর হইতে মানব সমাজ প্রায় সর্ব্ব বিষয়েই পুরুষগণ কর্ত্তৃক পরিচালিত হইয়া আসিতেছে; তথাপি তাহার অধোগতিও প্রত্যক্ষসিদ্ধ। সে অধোগতির অন্য কারণও আছে; কিন্তু এ কারণও উপেক্ষা করা যায় না।

পরস্পরের মূল প্রকৃতি স্থির রাখিয়া স্ত্রীগণকে সর্ব্ব বিষয়ে পুরুষের সহায় স্বরূপ গ্রহণ করিলে, তাঁহাদিগের অধীন ভাব ও পদানত ভাব বিদূরিত হইবে। ইহা হইতেই কর্ম্মোপযোগী সাহস, উদ্যম, প্রতিজ্ঞা ও চেষ্টা দেখা দিবে। পদানত ভাব দূর হইলে পুরুষের তুচ্ছ স্বার্থ সকল কিছু কিছু নষ্ট হইবে, সন্দেহ নাই; কিন্তু পরিণামে পুরুষগণ লাভবান হইবেন; সমাজও উন্নত হইবে। তুল্যাবস্থ ব্যক্তিগণের প্রণয় প্রকৃত সফলতা লাভ করে। নচেৎ পদানতার উপর প্রভুর ভালবাসা, গৃহসামগ্রীর উপর গৃহকর্ত্তার ভালবাসার ন্যায় হইয়া উঠে। বস্তুতঃও স্ত্রীগণ অস্মদাদির সমাজে গৃহ-সামগ্রীর ন্যায়ই ব্যবহৃত হইতেছেন।

মৌলিক কারণ অনুসরণ করতঃ আমরা দেখিয়াছি, স্ত্রীগণ সাধারণতঃ ধীর, সহিষ্ণু, ত্যাগশীল, দয়ালু ও ধর্ম্মভাব-যুক্ত হইয়া থাকেন; এবং যদিও পুরুষের ন্যায় তীক্ষ্ণধী না হউন, তথাপি অনেক বিষয়ে সহজ বুদ্ধিতেই দ্রুতগতি সুমীমাংসা করিতে সমর্থ হন। অন্য দিকে তাঁহারা বিষণ্ণ, সাহসশূন্য, পরিবর্ত্তনে ভীত এবং নিস্তেজ হইয়া থাকেন। পুরুষগণ সাধারণতঃ যেমন একদিকে, সাহসী, আত্মবশ ও তেজস্বী হন, তেমনই অন্য দিকে চঞ্চল, নিষ্ঠুর, স্বার্থপর ও ধর্ম্মজ্ঞানে হীন

* যাহা পুংকীট ও স্ত্রীডিম্বের প্রকৃতি হইতে জাত হইয়াছে।

হইয়া পড়েন। উভয়ের পক্ষেই এ পরিণাম স্বাভাবিক। সুতরাং শিক্ষা ও সংসর্গ দ্বারা উভয়ের দোষ সকল গুণ দ্বারা সংযত করা আবশ্যক। ইহা এরূপ ভাবে করা উচিত যে, পরস্পরের সহায়তায় পরস্পর পূর্ণতা প্রাপ্তির দিকে অগ্রসর হইতে সমর্থ হন। তাহা হইলে পরস্পর পরস্পরের প্রকৃত সহায় স্বরূপ হইতে পারেন। পারিবারিক সহায় হইলেই প্রচুর হয় না; সামাজিক, জাতীয় এবং রাষ্ট্রনীতিক বিষয়েও সহায় হওয়া উচিত। তা'র পর, সর্ব্বাপেক্ষা বড় কথা ধর্ম্মসম্বন্ধীয়। সেই বিষয়ে পরস্পর পরস্পরের সহায় স্বরূপ হইলেই নরনারীর পারিবারিক সম্বন্ধ সার্থক হয়।

আমি এস্থলে কেবল স্বামী স্ত্রীর কথাই ভাবিতেছি না। মাতা পুত্র, ভ্রাতা ভগ্নী, স্বামী স্ত্রী, শ্বশুর পুত্রবধূ, ভ্রাতা ভ্রাতৃবধূ প্রভৃতি সকলের কথাই বলিতেছি। যাহাদিগকে লইয়া এতদ্দেশে পরিবার গঠিত হয়, তাহারা সকলেই পরস্পরের ধর্ম্ম বিষয়ে সহায় হইবে। প্রকৃতপক্ষে, পারিবারিক, সামাজিক, জাতীয় অথবা রাষ্ট্রনীতিক বিষয় বলিয়া কোনও কথাই হইতে পারে না। মনুষ্য জীবনের এক উদ্দেশ্যই ধর্ম্মসাধন। সকল বিষয়, সকল কর্ম্মই ঐ একমাত্র কর্ম্মের সহায় স্বরূপ হওয়া উচিত। পারিবারিক অশান্তি ও ক্লেশ, সুতরাং দুশ্চিন্তা থাকিলে, সামাজিক দুর্নীতির মধ্যে বসবাস করিলে, জাতীয় অথবা রাষ্ট্রনীতিক উচ্ছৃঙ্খলতা, পীড়ন ও বন্ধনের অধীন হইয়া সুখস্বাচ্ছন্দ্য বিনষ্ট হইতে গেলে, শরীর ও মনের অবস্থা যেরূপ হইয়া উঠে, তাহাতে ধর্ম্মসাধন হইতেই পারে না। ধর্ম্মসাধন পক্ষে দেহে স্বাস্থ্য ও মনে সুখশান্তি থাকা অত্যাবশ্যক। সুতরাং ইহা অনায়াসেই বুঝা যাইতেছে যে, পরিবারস্থ নরনারীগণ এরূপ হওয়া প্রয়োজন যে, পারিবারিক সুখশান্তি রক্ষা হইতে পারে।

কর্ম্মবিভাগ।

এ দিক হইতে দেখিলে সহজেই প্রতীয়মান হইবে যে, পারিবারিক প্রভৃতি উপরের লিখিত চতুর্ব্বিধ বিষয়েই নরনারীগণের মধ্যে কর্ম্মবিভাগ থাকা আবশ্যক। কর্ম্মবিভাগ না থাকিলে প্রতিদ্বন্দ্বিতা আসিবেই; সুতরাং সুখ শান্তি নষ্ট হইবার বিশেষ সম্ভাবনা উপস্থিত হইবে। নরের অথবা নারীর সুখ শান্তি এরূপ স্থলে রক্ষা করা দুঃসাধ্য। ইহা হইতে সামাজিক, জাতীয় ও ধর্ম্মবিষয়ক অনিষ্ট উৎপন্ন হইবে। সুতরাং উভয়ের মধ্যে আপনাপন স্বাভাবিক এবং শিক্ষালব্ধ ও সংসর্গজাত উপযোগীতা অনুসারে সর্ব্ববিধ আবশ্যকীয় কর্ম্মবিভাগ থাকা অত্যাবশ্যক। এইরূপ হইলে জীবন-সংগ্রামে উভয়েই জয়যুক্ত হইতে পারিবেন। জীবন-সংগ্রামে জয়ী হওয়া পরস্পরের সহায়তার উপর যতদূর নির্ভর করে, প্রতিদ্বন্দ্বিতা অথবা বিরোধের উপর ততদূর নহে।

বলিয়াছি, যিনি স্বয়ং উপার্জ্জনক্ষম নহেন, অন্যের মুখাপেক্ষী মাত্র, তিনি নিপীড়িত হইবেন, ইহাতে সন্দেহ নাই। নারীগণের প্রতি অত্যাচার ও পীড়ন, প্রায় সকল সমাজেই দেখা যায়। ঐ অত্যাচার আরও ভীষণ হইত, যদ্যপি তাঁহারা পুত্রের সংসারে (অন্ততঃ নাম মাত্রও) কর্ত্রীস্থানীয়া না হইতেন। বিশেষতঃ সভ্য সমাজে মাতার প্রতি পুত্রের একটা মায়া ও ভক্তি যাহা প্রায় (!) সর্ব্বত্রই দেখা যায়, তন্নিমিত্তও নারীগণের দুর্দ্দশা আংশিক দূর হইয়া থাকে। তার পর, স্বামী যত বড় অত্যাচারীই হউক

না কেন, সেও সময়ে একটু হাসি মুখে কথা না বলিয়া পারে না। ইহাতেও অভাগিনী নারী অনেক দুঃখ ভুলিয়া যাইবার অবসর পায়।

প্রায় সর্ব্বত্রই নারীগণ গৃহকর্ম্ম করেন। ইহা তাঁহাদিগের (দৈহিক) দুর্ব্বলতার এবং (মানসিক) দয়া ও কোমলতার ফল। বিশেষতঃ সন্তান ধারণ ও সন্তান পালনের আবশ্যকতা হেতু বাহিরের কষ্টকর, বিপদজনক এবং উগ্রভাবাপন্ন কর্ম্ম করিবার অবসর ও উপযোগীতা না থাকায় তাঁহাদিগের পক্ষে গৃহকর্ম্ম করাই প্রথা হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু কেবল এই কর্ম্ম করিতে করিতে কালক্রমে তাঁহাদিগের অন্তর্দৃষ্টি অতি সংকীর্ণ হইয়া পড়ে; এবং তাঁহাদিগের স্বার্থও অধিকাংশ ক্ষেত্রে নিজ পরিবারের সীমা অথবা গণ্ডী ছাড়াইয়া সমাজ মধ্যে বিস্তৃত হইতে পারে না। তাঁহারা দয়ালু, ত্যাগশীলা, ধর্ম্মপ্রাণা হন, সন্দেহ নাই; কিন্তু দয়া, ত্যাগ ও ধর্ম্ম প্রায়শঃ নিজ পরিবার মধ্যেই আবদ্ধ থাকে; উহা ক্রমে প্রসার লাভ করিবার অবসর পায় না। তথাপি যে ক্ষেত্রে দয়া মাতৃভাবকে অনুসরণ করে, সে ক্ষেত্রে উহা সমস্ত পৃথিবীকে আপন করিয়া লইতে পারে। কবি রবীন্দ্রনাথের "গোরা" একটা খামখেয়ালী নহে; উহা নারীহৃদয়ের মাতৃভাবের বিশালতা প্রমাণ করিতেছে। কিন্তু এই ভাব ব্যতীত মানব হৃদয়ের অন্যান্য ভাব সম্বন্ধে ইহাই দেখা যায় যে, নারীগণ ভাবসম্পন্না হইলেও প্রায়শঃ সঙ্কীর্ণ-হৃদয়া হইয়া থাকেন। তাঁহাদিগের ভাব গভীর হইতে পারে এবং হয়ও; কিন্তু বিস্তৃত হইতে প্রায়শঃ দেখা যায় না। সুতরাং জীবন-সংগ্রামের যে অংশ সংগ্রাম, তাহা তাঁহাদিগের আয়ত্ত হয় না; কিন্তু উহার যে অংশ সহানুভূতি ও সহায়ের * উপর নির্ভর করে, সে অংশের তাঁহারা বিশেষভাবে উপযোগী। সে অংশ জীব-বিবর্ত্তনের ও সমাজ-বিবর্ত্তনের পক্ষে, কম প্রয়োজনীয় নয়; বরং অপর অংশ অপেক্ষা অধিক প্রয়োজনীয়।

দেহ ও মন গূঢ় এবং গাঢ় সম্বন্ধে যুক্ত। অতি নিম্নশ্রেণীর প্রাণী হইতে ক্রমে মানব পর্য্যন্ত বিবেচনা করিলে অনায়াসে প্রতীয়মান হয় যে, যে প্রাণীর ভিতর বাহিরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের, শিরা স্নায়ুর, অস্থি মজ্জার এবং মস্তিষ্কের বাহুল্য ও জটিলতা যত অধিক, তাহার মনের বিকাশ এবং উন্নতিও তত অধিক। ইহা সকলেরই প্রত্যক্ষসিদ্ধ কথা। নারীগণের দেহ অনুন্নত অথবা অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি বাহুল্যহীন কিম্বা জটিলতাশূন্য, এমন কথা বলিতেছি না। কিন্তু প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষগণের তুলনায় তাঁহাদিগের দেহ শিশু দেহবৎ। মানব শিশুর দেহের তুলনায় মাথা বড় ও গোলাকার, পেট বিশেষতঃ তল পেট বড় ও স্ফীত, পদতলে বিশেষ খাল নাই, উহা সমান; দেহের উপরার্দ্ধ সম্মুখের দিকে ঈষৎ অবনত; হাঁটিবার সময় উভয় পার্শ্বে ঝুঁকিয়া অথচ সম্মুখের দিকে হেলিয়া গতি, প্রায় 'মরালগমনে'র ন্যায়। উহাদিগের বক্ষঃস্থল ছোট, উরু ও পায়ের অস্থি ছোট, কিন্তু বাহু হাতের অস্থি অপেক্ষাকৃত বড়; নিতম্ব দেশ স্থূল, দেহ কেশহীন। স্ত্রীলোকের দেহও অনেকাংশে এই প্রকার। কিন্তু প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষের দেহ ভিন্ন প্রকার। তাহাদিগের মস্তক ছোট, বক্ষঃস্থল বড়, পেট ও তলপেট স্ফীত নহে, উরু ও পায়ের অস্থি বড়, বাহু ও হাতের অস্থি অপেক্ষাকৃত ছোট,

* Co-operation.

নিতম্বদেশ স্থূল নহে, পদতলের মধ্যভাগে খাল আছে; দেহ লোমশ। ভূমিষ্ঠ হইবার সময়ও পুত্রগণ কিছু দীর্ঘকায় ও ভারি থাকে; কন্যাগণ খর্ব্ব ও পাতলা হয়। চিরজীবন এ প্রভেদ থাকিয়া যায়। যদিও সকল স্থলেই এই সমস্ত কথা সম্পূর্ণ সত্য নহে, তথাপি মোটের উপর সত্য বলিয়া স্বীকার করা যায়। ইহা হইতে দেখা যাইতেছে যে, স্ত্রীগণের দেহ অনেকাংশে শিশুর ন্যায়, সুতরাং মনও অনেকাংশে তদ্রূপ। সরলতায়, স্নেহে, পবিত্রতায় উভয়েই তুল্য দেখা যায়। কিন্তু পুরুষের দেহ সুতরাং মনও অন্য প্রকার। এমন কি, কোন কোন বিষয়ে যেন বিপরীত ভাবাপন্ন। এই নিমিত্তই পূর্ব্বে বলিয়াছি, স্ত্রী পুরুষ উভয়ের মিলনে পূর্ণতা, একে অপূর্ণ; উভয়ের মিলিত শক্তির চেষ্টায় সমাজের কল্যাণ, একের শক্তিতে অকল্যাণ। এই কথা স্মরণ রাখিয়া, এবং উভয়ের স্বাভাবিক ও অর্জ্জিত * মনোবৃত্তির ও দৈহিক অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া, সমাজে নারীগণের প্রকৃত স্থান নির্দ্দেশ করা দুঃসাধ্য নহে, বরং ঐরূপে নরনারীগণের কর্ম্মভেদ ও ব্যবসায় নির্দ্ধারিত হওয়াই সমাজের পক্ষে কল্যাণকর।

শ্রীশশধর রায়।

কবিবর গোবিন্দচন্দ্র দাস

হে আমার চিরপ্রিয়, হে স্বদেশী কবি,
জয়ী কি হইলে আজ শোক-সাধনায়?
দেবপুরে, চিলাইর "শ্যাম তপোবনে"
পাইলে কি সারদারে "চিতা-বিছানায়"?
প্রকৃতির রম্যভূমি, অমর-নন্দন,
শস্য ভারে শ্যামাঙ্গিনী ভাওয়াল আমার,
হায় কবি ভুলে গেলে বিদায়ের কালে
কে তুলিবে কর্ণে তাঁর বীণার ঝঙ্কার।
যাও তবে—দুঃখদগ্ধ জীবনের ভার,
কর্ম্মক্ষেত্র ধরাতলে ফেলি অবজ্ঞায়।
কর্ত্তব্যে নির্ভীক চির—দৈন্যে অবিচল
লহ শান্তি, লহ সুখ, প্রিয় অমরায়,
ভাওয়ালের বনভূমে, যুগ যুগ ধরি
বাঙ্গালী খুঁজিবে তব "চন্দন" "কস্তুরী"।

শ্রীঅর্দ্ধেন্দুরঞ্জন ঘোষ।

যুদ্ধ ও ধর্ম্ম

যুদ্ধের অবসান হইয়াছে। কিন্তু যুদ্ধের প্রভাব অবসিত হয় নাই। এই যুদ্ধ জগৎকে অনেক কথা শিখাইয়াছে এবং যুদ্ধের অবসানে অনেক দিন পর্য্যন্ত জগৎকে আরো অনেক কথা শিখাইবে। জগতে এক নব যুগ আসিতেছে। মানবসঙ্ঘ নব আকারে গঠিত হইবে। জেতা পরাজিতের অস্তিত্ব হরণ করিবেন না—পরাজিতকে শূদ্রত্বে পরিণত করিয়া তদ্দ্বারা আপনার পদ-সেবা করাইবেন না। জগতে নূতন সাম্য মন্ত্র প্রচার হইবে। সে যুগের সুপ্রভাতে আমরাই কি কেবল নীরবে বসিয়া থাকিব?

বলিবার কথা অনেক, কিন্তু মুখফুটে সব

* বেইনী হইতে জাত।

কথা বলা এখনও আমাদের ন্যায় শূদ্র জাতির পক্ষে সম্ভব নহে। কতদিন আমাদের এ শূদ্রত্ব থাকিবে, জানি না, কিন্তু এখন তো আছে। এ জন্য শূদ্রের যে বিভাগে অধিকার নাই, সে বিভাগ ছাড়িয়া অন্য বিষয়ে কথা বলিলে বোধ হয় তার গলা রোধ করা হইবে না। এ কারণ আমি রাজনীতি ছাড়িয়া ধর্ম্মের কথা পাড়িতে ইচ্ছা করিয়াছি।

যুদ্ধের অবসানে জগৎ পুনর্গঠিত হইতে বসিয়াছে। রাজনীতি, সমাজনীতি, অর্থ-নীতি, ধর্ম্মনীতি,সর্ব্ব বিভাগে পুনর্গঠন হইবে। আমি নানা নীতির নানা তত্ত্ব জানি না। যৌবনের প্রারম্ভ হইতে বার্দ্ধক্যের প্রাক্কাল পর্য্যন্ত শুধু ধর্ম্মের বাজারে সং সেজে বেড়াচ্ছি। সুতরাং এই পুনর্গঠনের সময়ে ধর্ম্মের পুনর্গঠন সম্বন্ধে এক আধটা অভিমত প্রকাশ করিলে বোধ হয় এই বার্দ্ধক্যের প্রলাপ মার্জ্জনীয় হইতে পারে।

যুদ্ধের অবসানের পূর্ব্বেই ধর্ম্মের উপর বর্ত্তমান যুদ্ধের যে প্রভাব পড়িয়াছে, এবং যুদ্ধের অবসানে ধর্ম্ম-জগতে যে সকল পুনর্গঠন আবশ্যক হইবে, তাহা অবধারণের জন্য গ্রেট-বৃটেন ও আমেরিকায় কয়েকটী সমিতি গঠিত হইয়াছে। এই সমিতিগুলি নানা জনের নানা মত সংগ্রহ পূর্ব্বক একটা সাধারণ সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার জন্য কতকগুলি প্রশ্ন মুদ্রিত করিয়া জগতের নানা দেশের নানা জনের কাছে পাঠাইয়া দিয়াছেন। আমি বৃটিশ সমিতিগুলির বিষয় বেশী জানি না। আমেরিকার সমিতির নাম "Committee on the War and the Religious outlook". সমিতির সভ্যগণের তালিকায় যুক্তরাজ্যের নানা সম্প্রদায়ের মহা মহা ধর্ম্মনেতা-গণের নাম দৃষ্ট হয়। এই ধর্ম্মমহামণ্ডলের জনৈক গণ্যমান্য সভ্য আপনার একখানা পত্র সহ সমিতির প্রশ্নাবলী এই নগণ্যের নিকটও প্রেরণ করিয়াছেন। তাঁহার পত্র ও সমিতির প্রশ্নাবলীর উত্তর এখনও দেওয়া হয় নাই। সেই সকল জটিল প্রশ্নের উত্তর সহজে দিতে পারিব বলিয়াও বোধ হয় না। একটা বিশ্ব-ব্যাপী আন্দোলনে এই ক্ষুদ্র ব্যক্তির কোন বিষয়ে মত প্রকাশ অসম্ভব হইলেও, তার নিজ দেশ সম্বন্ধে কোন কোন কথা বলায় বোধ হয় তার অধিকার আছে।

আমি একজন খ্রীষ্টান। ভারতে আমার সমাজ, মণ্ডলী ও ধর্ম্ম একটা ক্ষুদ্র গণ্ডিতে আবদ্ধ—অন্যান্য ধর্ম্ম-সঙ্ঘের তুলনায় সমুদ্রে জলবিন্দুবৎ। তবু এই জলবিন্দু সমুদ্রেরই জলবিন্দু—সাগর ভরা জলসমষ্টির একটা ক্ষুদ্র ব্যষ্টি। সমষ্টি আপনার বিপুল কলেবর দেখিয়া এই ক্ষুদ্র ব্যষ্টিকে হেয় জ্ঞানে আপনার গণনার মধ্যে না আনিতে পারেন, কিন্তু ব্যষ্টি আপনাকে সমষ্টি হইতে পৃথক করিয়া আপনার একটা পৃথক সত্তা রক্ষা করিতে সমর্থ নহে। অতএব এই পুনর্গঠনের যুগে এই ক্ষুদ্র ব্যষ্টিকে এই মহাসমষ্টির মধ্যেই পুনর্গঠিত হইতে হইবে। সুতরাং সমষ্টিকে ছাড়িয়া ব্যষ্টির পুনর্গঠন সম্বন্ধে কিছু বলাও দুষ্কর।

ভারতে প্রাতঃস্মরণীয় কেরী সাহেবের পদার্পণের পর ১২৫ বৎসর গত হইয়াছে। এই ১২৫ বৎসরের মধ্যে ইউরোপ ও আমেরিকার নানা নামধেয় নানা মণ্ডলীর পক্ষ হইতে নানা প্রচার সমিতি গঠিত হইয়া, এ দেশে ধর্ম্ম প্রচারার্থ আসিয়াছেন। ঐ সকল প্রচার-সমিতি কর্ত্তৃক এ দেশে যে সকল খ্রীষ্টীয় মণ্ডলী গঠিত হইয়াছে, সে সকলের নাম তাহাদের প্রতিষ্ঠাতৃগণের স্ব স্ব মণ্ডলীর

নামানুসারেই রক্ষিত হইয়াছে। শুধু নামকরণ নহে, মণ্ডলীর শাসন ও উপাসনা-প্রণালী ও ধর্ম্মমত গুলিও প্রতিষ্ঠাতাগণের শাসন ও উপাসনা-প্রণালী ও ধর্ম্মমত গুলির অনুরূপ হইয়াছে। একটুকু এদিক ওদিক হইবার যো নাই। ধর্ম্মমত সম্বন্ধে কোন নূতন কথা বলিলে heretic বা বিধর্ম্মী নামে অভিহিত হইতে হয়—মণ্ডলীর উপাসনা বা শাসন সম্বন্ধে নূতন কথা বলিলে কর্ত্তাগণ গলায় ধাক্কা দিয়া মণ্ডলীর বাহিরে নিক্ষেপ করেন। তাই এই খ্রীষ্টান নাম ক্ষুদ্র ভারতীয় ব্যষ্টি, ভারতীয় ধর্ম্ম সাগরে কিম্ভূতকিমাকার বেশে আপনার ক্ষুদ্র অস্তিত্ব কাটাইয়া দিতেছে। সমষ্টির সঙ্গে তার মেল খায় না। আবার সমষ্টিও তাকে একটু কটু নয়নে দেখে।

কিন্তু এই পুনর্গঠনের যুগে তার এই কিম্ভূত-কিমাকার বেশে আর অধিক দিন অবস্থিতি সম্ভব নহে। হয় তাকে অনস্তিত্বে পরিণত হইতে হইবে, নয় তাকে সমষ্টির সঙ্গে মিলে মিশে চলিতে হইবে। ভারতীয় খ্রীষ্টীয় মণ্ডলীর সর্ব্বত্র চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ আপনাদের এই বিপদ যে বুঝিতে পারিয়াছেন, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। যেখানে যাও, সেখানেই এক প্রকার unrest বা উচাটন দেখিতে পাইবে। কিন্তু মুখের কথা মুখেই রহিয়া যাইতেছে, কার্য্যে বড় একটা কিছু হইতেছে না।

এদিকে বিলাতের মিশন সমিতিগুলিও ভারতীয় খ্রীষ্টান্ মণ্ডলীগুলিকে মুখেই হোম-রুল দিচ্ছেন—কার্য্যে তাঁরাই প্রভু—তাঁরাই চালক। এইরূপে বৎসরের পর বৎসর যাইতেছে, ভারতীয় মণ্ডলী অভারতীয় বেশে ভারতীয় ধর্ম্ম মহামণ্ডলীতে অজীর্ণ ও অস্পৃশ্যবৎ আপনার ক্ষুদ্র অস্তিত্ব কাটাইয়া দিতেছে।

কিন্তু এখন পুনর্গঠনের দিন আসিয়াছে। পাশ্চাত্য জগতের খ্রীষ্টীয় মণ্ডলী ও খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মমতগুলি নব অবস্থার অনুরূপ গঠিত ও নব অবস্থার অনুরূপ ব্যাখ্যাত হইবে। এ যুগে আমাদের কর্ত্তব্য কি, একবার ভেবে দেখা উচিত।

খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম বিলাতীয় বেশে ভারতীয় ধর্ম্ম-সঙ্ঘে স্থান পাইবে বলিয়া আমার বোধ হয় না। খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের প্রাচীন ইতিহাসও এই কথা প্রমাণ করে। খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের প্রারম্ভ ইহুদিদের দেশে, প্রাথমিক শিষ্যগণ ইহুদী-ভাবাপন্ন ছিলেন। অপর জাতিগণকে খ্রীষ্টীয় মণ্ডলীতে গ্রহণ করিতে তাঁহারা ইতস্ততঃ করিতেন। যখন অপর জাতিগণের জন্য খ্রীষ্টীয় মণ্ডলীর দ্বার উদ্ঘাটিত হইল, তখনও ইহুদী খ্রীষ্টানেরা তাঁহাদের সঙ্গে এক পংক্তিতে ভোজন পর্য্যন্ত করিতে প্রস্তুত ছিলেন না। ইহুদী খ্রীষ্টানেরা ত্বক্‌চ্ছেদ ও মুসার বিধির পদানুসরণ ভিন্ন অপর জাতীয় খ্রীষ্টানদের জন্য মুক্তির দ্বার পর্য্যন্ত অবরুদ্ধ বলিয়া বিবেচনা করিতেন। কিন্তু খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম যখন সিরিয়ার রাজধানী আন্তিয়ক নগরে প্রবেশ করিল ও এশিয়া মাইনরের নানা নগরে খ্রীষ্টীয় মণ্ডলী স্থাপিত হইল, তখন খ্রীষ্টীয় মণ্ডলীতে এক মহাবিপ্লব ঘটিল। ইহুদী খ্রীষ্টানগণকে অনিহুদী-খ্রীষ্টানদিগকে মুসার বিধি ও ত্বক্‌-চ্ছেদ প্রথা ব্যতীতই ভাই বলিয়া গ্রহণ করিতে হইল। এই ভ্রাতৃভাব যে অত্যন্ত গাঢ় ছিল, তা তো বলা যাইতে পারে না। তবু খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম ইহুদী গণ্ডি ভাঙ্গিয়া, অনিহুদী জাতিদের মধ্যে অতি স্বাধীন ভাবে প্রবেশ করিল। অতঃপর খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম যখন গ্রীস-দেশের নগরে নগরে প্রচারিত হইয়া রোম সাম্রাজ্যের রাজধানীতে গিয়া জয়-

পতাকা উড্ডীয়মান করিল, তখন খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম হইতে মুসার বিধির বাহ্যিক পরিচ্ছদ একেবারে খসিয়া পড়িল ও তাহার স্থানে গ্রীক্ দার্শনিকদের উজ্জ্বল আলোকে খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম ব্যাখ্যাত হইয়া এক সুরম্য আকার ধারণ করিল। বিদেশী ও সঙ্কীর্ণ ইহুদী বেশে খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম কখনই চিন্তাশীল গ্রীক্ ও মার্জ্জিত-বুদ্ধি রোমক জাতির ধর্ম্মরূপে পরিণত হইতে পারিত না। অতএব এশিয়া মাইনর, গ্রীস্, ইটালী ও উত্তর আফ্রিকায় খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মকে গ্রীক্ ও রোমক বেশে প্রবিষ্ট হইয়া ঐ সকল দেশের জাতীয় ধর্ম্মরূপে পরিণত হইতে হইয়াছে। আমার বিবেচনায়, ভারতে ভারতবাসীর ধর্ম্ম হইতে হইলেও খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মকে ভারতীয় বেশ পরিধান করিতে হইবে।

এই পুনর্গঠনের যুগ সাম্যের যুগ হইবে। অস্ত্রের ঝনঝনা আর শুনিতে পাওয়া যাইবে না। যদি একথা সত্য হয়, তবে ধর্ম্মরাজ্যে আমরা কেন সংগ্রাম করি? খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম এ দেশের ধর্ম্মগুলির সঙ্গে কেন সংগ্রাম করে? প্রাচীন গ্রীক্ ও রোমকদের দেশে পৌত্তলিকতা ও উপধর্ম্মের প্রবল প্রাদুর্ভাব ছিল। খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের আগমনে সেই পৌত্তলিকতা ও উপধর্ম্ম সমগ্র রোম-সাম্রাজ্য হইতে বিলুপ্ত হইয়াছে। কিন্তু সত্য সত্যই কি খ্রীষ্টের শিষ্যগণ পৌত্তলিকতা ও উপধর্ম্মের উপর খড়্গাঘাত করিতেন? আমি ঐতিহাসিক নই, তবু এ সম্বন্ধে যতটা পড়িয়াছি, তাহাতে একথা তো সম্পূর্ণ সত্য বলিয়া বোধ হয় না। পৌত্তলিকতা ও উপধর্ম্মের শত্রু প্রকৃত প্রস্তাবে গ্রীক্ দার্শনিকগণ ছিলেন। কিন্তু দার্শনিক আক্রমণে মানুষের মন হইতে পৌত্তলিকতা ও উপধর্ম্ম দূর হইলেও কার্য্যতঃ পৌত্তলিকতা ও উপধর্ম্ম দূর হয় নাই। খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম প্রচলিত ধর্ম্মের প্রতিবাদ না করিয়াও অতৃপ্ত মানুষের সম্মুখে যখন জীবন্ত ঈশ্বর ও "যীশুখ্রীষ্ট" নামক একটা মহা personality বা ব্যক্তিত্ব স্থাপন করিল, তখন দলে দলে মানুষ সেই personality গ্রহণ পূর্ব্বক জীবন্ত ঈশ্বরের পূজায় প্রবৃত্ত হইল। এইরূপে পৌত্তলিকতা ও উপধর্ম্ম আপনা আপনি রোম-রাজ্যে বিস্মৃতির জলে বিসর্জ্জিত হইয়া গেল। তবু একথা সত্য যে, উপধর্ম্মের নেতাগণ অনেক সময় ভ্রমক্রমে অনর্থক খ্রীষ্টানদিগকে অগ্নিকুণ্ডে দগ্ধ করিয়াছেন। প্রকৃত প্রস্তাবে তাঁদেরি দার্শনিকেরা তাঁদের প্রচলিত ধর্ম্মের শত্রু ছিলেন।

ভারতের উপধর্ম্মের সঙ্গে সংগ্রাম করাও খ্রীষ্টানের কর্ত্তব্য নয়। জীবন্ত ঈশ্বর ও যীশুখ্রীষ্ট নামক personality বা ব্যক্তিত্ব ভারতের ধর্ম্ম-সঙ্ঘের মধ্যে স্থাপন কর। মানুষ আপনা আপনি এই অদ্ভুত "ব্যক্তিত্বকে" গ্রহণ পূর্ব্বক তদীয় রশ্মিতে জীবন্ত ঈশ্বরের উপাসনা করিবে।

আরো একটা ঐতিহাসিক রহস্য দেখ। প্রাচীন গ্রীক্ ও রোমক ধর্ম্মের রক্ষক কে? এ প্রশ্নের উত্তরেও আমি ইতিহাস হস্তে লইয়া মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি "খ্রীষ্টানেরা।" যাহা নশ্বর, তাহা নাশ হইয়া গিয়াছে। গ্রীক্ ও রোমক ধর্ম্মে যাহা অনশ্বর সত্য ছিল, তাহা খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মতত্ত্বের প্রতি পৃষ্ঠায় অনশ্বররূপে আজও বিদ্যমান রহিয়াছে। যদি এ যুগে জিজ্ঞাসা করা হয়, হিন্দু ধর্ম্মের প্রকৃত রক্ষক কে হইবেন, আমি যদিও ভবিষ্যদ্বক্তা নই, তবু পূর্ব্ব প্রশ্নের সমাধানের রশ্মিতে অতি বিনয়ে বলিতে পারি, হিন্দু ধর্ম্মেরও প্রকৃত রক্ষক খ্রীষ্টানুগণই হইবেন।

পাঠকগণ উত্তরটাকে প্রগল্‌ভতা কিম্বা ভ্রিজ

মনে করিতে পারেন। কিন্তু আমি অতি দীনভাবে আপনাদের চরণে নিবেদন করিয়া বলিতেছি, যদি ভারতের খ্রীষ্টীয়মণ্ডলী আপনার বিদেশী পোষাক খুলিয়া ফেলিয়া সত্য সত্য ভারতীয় মণ্ডলীই হন, তবে নিশ্চয়ই মণ্ডলীই হিন্দু ধর্ম্মের রক্ষক হইবেন। হিন্দু ধর্ম্মের প্রকৃত গৌরব প্রধান প্রধান তীর্থক্ষেত্রে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড মন্দির বা ইষ্টক স্তূপ নহে। ইষ্টক স্তূপ কোন ধর্ম্মেরই গৌরব নহে। য়িহুদীদের স্বুবর্ণ খচিত ইষ্টক স্তূপ বা মহা মন্দির রোমকেরা ধ্বংস করিয়াছে। রোমকদিগের ইষ্টক স্তূপ অন্য জাতিরা ধ্বংস করিয়াছে। খ্রীষ্টানদের কত কত ইষ্টক স্তূপ বর্ত্তমান যুদ্ধে জর্ম্মণীর বোমা ধ্বংস করিয়াছে। ইষ্টক স্তূপ অবিনাশী নহে। অবিনাশী পদার্থ মানবের হৃদয়ে নিহিত। হিন্দু ধর্ম্মের মাহাত্ম্য হিন্দু চরিত্রের সাত্ত্বিকতা। ইষ্টক-স্তূপের ধ্বংসে এ সাত্ত্বিকতা ধ্বংস হইবে না। কিন্তু এ যুগের জড়বাদী সভ্যতার কুহকে পড়িয়া সে সাত্ত্বিকতার ধ্বংস যেন অনিবার্য্য বলিয়া বোধ হইতেছে। হিন্দু মহামণ্ডল বাহ্যিক উপায়ে সে সাত্ত্বিকতা রক্ষা করিতে পারিবেন বলিয়া বোধ হয় না। বারাণসীর হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় দর্শন বিজ্ঞান পড়িয়া প্রাচীন গ্রীস্ ও রোমের দার্শনিকদের ন্যায় যে দিন বারাণসীর মন্দির সমূহে কুঠারাঘাত করিবেন, সে দিন সেই অবিশ্বাসের মহা শ্মশানে হিন্দুর এই সাত্ত্বিকতাকে রক্ষা করিবেন?

গ্রীক্ ও রোমকেরা আপনাদের ধর্ম্মের উজ্জ্বল রত্নগুলি রক্ষা করেন নাই। সেনেকা বা ইপিক্‌টেটস্ যে সাত্ত্বিকতা তৎসময়ের রোমক চরিত্রে দেখিতে অভিলাষী হইয়াছিলেন, তাহা তাঁহারা তৎসময়ের অখ্রীষ্টীয় রোমক চরিত্রে দেখিতে পান নাই। অথচ খ্রীষ্টে বিশ্বাসী একটী দাসী বালিকা (a slave girl) বা সামান্য দাস ঐ সকল মহাপুরুষের স্বপ্নদৃষ্ট সাত্ত্বিকতা তাহাদের জীবনে দেখাইয়া গিয়াছে।

উপনিষদাদি প্রাচীন শাস্ত্রে—বৌদ্ধ ও জৈন মহাপুরুষদিগের উপদেশ ও ধর্ম্ম-সূত্রে যে সকল অমূল্য রত্ন গাঁথা আছে, কেবল ইষ্টক স্তূপের রক্ষকগণ সে সকল অমূল্য রত্ন রক্ষা করিতে পারিবেন বলিয়া বোধ হয় না। অন্ততঃ খ্রীষ্টীয় মিশনগুলির ভারতে প্রবেশ কালের পূর্ব্ববর্ত্তী ও সমসাময়িক ইতিহাস এই কথা সপ্রমাণ করিতেছে। বাহ্যিক ধর্ম্মের আড়ম্বরের ত্রুটি ছিল না; কিন্তু যাহা ধর্ম্মের প্রাণ, তাহা কোথায় ছিল? তোমার মতন পণ্ডিতেরা ঐ সকল শাস্ত্র পড়িতেন বটে, কিন্তু জীবন ঐ শাস্ত্রগুলি হতে সহস্র যোজন দূরে ছিল। যদি তাহা না হইত, তবে রামমোহন রায়কে খ্রীষ্টীয় মণ্ডলীর আদর্শে উপনিষদাদি প্রাচীন শাস্ত্রের সত্য-পুঞ্জসংরক্ষণে ব্রাহ্মসমাজ নামে একটা নূতন সমাজ গঠন করিতে হইত না।

আবার যে কালে রামমোহন রায় জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, যদি সে কালের মিশনরীগণ পল-প্রমুখ প্রেরিতগণের ন্যায় উদার-প্রাণ হইতেন ও ভারতীয় ধর্ম্ম-সাগরের অভ্যন্তর হইতে খাঁটি রত্ন আহরণ পূর্ব্বক খ্রীষ্টের মুকুট সুশোভিত করিতেন, তাহলে ব্রাহ্মসমাজ নামে একটা নব সমাজের আবশ্যকতাও হইত না। খ্রীষ্ট এখন হিন্দু সমাজের যতটা বাহিরে আছেন, ততটা বাহিরে থাকিতেন না।

আবার একটা নব যুগ আসিয়াছে। ইউরোপের কুরুক্ষেত্রে ইউরোপের ক্ষত্রিয়

শক্তি ধ্বংস হইয়াছে। এখন পৃথিবীতে বৈশ্যরাজ্য * প্রতিষ্ঠিত হইতে বসিয়াছে। এ যুগ "ব্যক্তিত্ব" বা individualityর যুগ হইবে। আবার ঐ ব্যক্তিত্বে বৈচিত্র্য ও সাম্য থাকিবে। ভারতেও এই বৈচিত্র্য ও সাম্য আসিবে। আমি খ্রীষ্টান্ বলিয়া আমার ভাই আমাকে একঘোরে করিবেন না, আবার আমি আমার ভাইকে ঘৃণিত "heathen" নামে ডাকিব না। এ সাম্যের যুগ—ভাই বলে কোলাকুলির যুগ। এ যুগে খ্রীষ্টীয় মিশন ও খ্রীষ্টীয় মণ্ডলীগুলিকে নব ভাবে কাজ করিতে হইবে। আবার হিন্দু সমাজকেও নব ভাবে গঠিত হইতে হইবে। যে এ যুগে আপনাকে গড়িবে না, সে ভাঙ্গিয়া পড়িবে।

কিন্তু এই ব্যক্তিত্ব বা বৈশ্যত্বের যুগে কি কর্ত্তৃত্ব বা ব্রাহ্মণত্বের ভিত্তিতে ধর্ম্মগঠন সম্ভব? ব্রাহ্মণত্বের ভিত্তিতে সমাজ পর্য্যন্ত গড়া যায় না, তাতে ধর্ম্ম কি করে গড়া যাইতে পারে? এ যুগে কে কার পদলেহন করিবে? শ্রমজীবীরা ধর্ম্মঘট করে মূলধনওয়ালাদের বিপর্য্যস্ত করে ফেলিতেছে। তোমার মূলধন আছে বলে তাদের শ্রমোৎপন্ন পদার্থ হতে একটা প্রকাণ্ড ভাগ পেতে পার না। তারা তাদের শ্রমের যথাযথ ভাগ চায়। সমাজ গঠনেরও এই নিয়ম। আভিজাত্য বা বর্ণাশ্রমের নামে আর তুমি কাহাকেও আপনার পদতলে নিষ্পেষিত করিতে পার না। সেইরূপ ধর্ম্মরাজ্যেও তোমাকে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা দিতে হইবে, ব্যক্তিগত বিবেককে মান্য করিয়া চলিতে হইবে। প্রত্যেক ব্যক্তি বিশ্বাসে স্বাধীন হইবে, আবার প্রত্যেক ব্যক্তি ভ্রাতৃস্নেহে এক অপরকে আলিঙ্গন করিবে। এ যুগে এই বৈচিত্র্য ও সাম্য মন্ত্রই ধর্ম্ম-জগতের মহামন্ত্র হইবে।

আবার এ যুগটা প্রাচী ও প্রতীচীর মিলন যুগ হইবে। প্রাচ্য জগৎ একলা গঠিত হইতে পারিবে না, আবার প্রতীচ্য জগৎও প্রাচ্য জগৎকে অবহেলা করিয়া স্বকার্য্যসাধনে কৃতকার্য্য হইতে পারিবে না। যুদ্ধ যদিও আসুরিক ব্যাপার, তবু বর্ত্তমান যুদ্ধেই আমরা প্রাচী ও প্রতীচীর সম্মিলন দেখিয়াছি—সন্ধি-সভায়ও প্রতীচীর সঙ্গে প্রাচী বসিতে যাইতেছেন। যখন রাজনৈতিক জগতে বৈশ্যনীতি প্রবর্ত্তিত হইতেছে, তখন আর অধিক দিন প্রতীচী প্রাচীর অধিকার অস্বীকার করিতে পারিবেন না। এ দিকে কৃষি, বাণিজ্য, শিল্প ও সর্ব্বপ্রকার পারিশ্রমিক জগতেও প্রাচীর অধিকার প্রাচীকে দিতে হইবে। যতদিন প্রাচীর মূলধন বর্দ্ধিত না হয়, ততদিন বোধ হয় প্রাচীকে কুলিগিরি ও কেরানীগিরি দ্বারাই জীবিকা অর্জ্জন করিতে হইবে। কিন্তু এ অবস্থা চিরস্থায়ী হইবে না। শান্তির যুগ বুদ্ধির যুগ। পশুবল ও আসুর বলের অবসানে প্রকৃত মনুষ্যত্ব ও দেবত্বের আবির্ভাব হইবে। বাণিজ্য ও ব্যবসায়ের মূলে দেবশক্তি কার্য্য করিবে। তখন এমন সময় আসিবে, যখন মনিব চাকরকে ভাই বলিয়া আলিঙ্গন করিবেন। আমরা সে যুগের স্বপ্ন দেখিতেছি বটে, কিন্তু আমার বিশ্বাস, বিধাতা আমাদের এ স্বপ্ন নিশ্চয়ই সফল করিবেন।

যাহা হউক, প্রাচী ও প্রতীচীর মিলনটা ধর্ম্ম-জগতেও হইবে। যতই রক্ষণশীল হিন্দু হওনা কেন, যখন বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রতীচ্য দর্শন বিজ্ঞান হাতে তুলিয়া অধ্যয়ন করিতেছ, তখন জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে তোমার সমস্ত অস্থি মজ্জা সেই সকল প্রতীচ্য দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক চিন্তায় পরিপুষ্ট হইতেছে।

---

* "বিশ্"—সাধারণ। বৈশ্য সাধারণ লোক।

কে এ কথা অস্বীকার করিতে পারে? আলিগড়ের অরিএন্ট্যাল কলেজই বল, আর বারাণসীর হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ই বল, কার্য্যতঃ প্রাচীর গায়ে প্রতীচীর পোষাক মাত্র। হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় সবে ভূমিষ্ঠ হইয়াছে। সে শিশু আমাদের দেশী খোকার মত স্থাকড়া জড়ান, কি বিলেতি শিশুর ন্যায় ফ্রক্‌-পরিহিত, তাহা আমি জানি না। তবে উত্তর ভারতে আলিগড়ের অরিএন্ট্যাল কলেজে শিক্ষাপ্রাপ্ত যে সকল মুসলমান যুবকের সঙ্গে দেখা হয়, তাঁরা তো রূপে গুণে, ভাব ভঙ্গিতে, আদবেই অরিএন্ট্যাল নন। অতএব প্রাচ্য জগৎ যতই কেন রক্ষণশীল না হউন, প্রতীচীর বন্যায় তাঁর রক্ষণশীলতা বালির বাঁধের ন্যায় ভাঙ্গিয়া যাইবে।

ভক্ত কেশব এক সময় ধর্ম্মজগতে প্রাচী ও প্রতীচীর সম্মিলন-স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন। সেই স্বপ্নে তিনি প্রাচ্য ও প্রতীচ্য জগতের দেবগণকে এক সঙ্গে বাহু তুলে, গলা ধরে, হরি বলে নাচাইয়াছিলেন। কিন্তু ভক্ত কেশবের সে স্বপ্ন সে কালে কেহ বুঝিতে পারে নাই। বুঝিতে পারিলে ক্ষুদ্র ব্রাহ্মসমাজ কবে তিন খণ্ড ভেঙ্গে একখণ্ড হয়ে যেত। না বুঝিবার কারণ বৈগুনীতির অভাব। Individuality বা ব্যক্তিত্বও বজায় থাকিবে, আবার সব মিলে মিশে এক হইব, এ কথাটা তখন কেহ শেখেন নাই। আমি সে কালের সেই সব পূজ্যপাদ ব্রাহ্ম নেতাগণের নামে দোষারোপ করিতেছি না। সেকাল সেকালই ছিল। তখন "unity in diversity." বা "বৈচিত্র্যে সমন্বয়" কথাটা মানবের ধর্ম্ম ও সমাজ-নৈতিক অভিধানে আসে নাই। সেকালে সমন্বয়ের অভিলাষ তো ছিল, কিন্তু সমন্বয়ের এই গূঢ়তত্ত্ব সম্যক আবিষ্কৃত হয় নাই। অনেকে নিজ মতে আনিয়া মানুষ সমন্বয় চাহিতেছিলেন। তাহা জগতের ইতিহাসে কখনও হয় নাই, হইবেও না।

এই ভয়ঙ্কর নরঘাতী যুদ্ধের অবসানে জগৎ এই "বৈচিত্র্যে সমন্বয়" মন্ত্রে দীক্ষিত হইবে। প্রাচ্য জগৎ আপনার প্রাচ্য ভাব বজায় রাখিয়া অনেক বিষয় শিখিবার জন্য প্রতীচীর সম্মুখে দাঁড়াইবেন। আবার প্রতীচীও আপনার বিশেষত্ব বজায় রাখিয়া—বৃদ্ধ প্রাচীকে আপনার কুলি ডিপোর ক্রীতদাস না ভাবিয়া—তাঁহাকে গুরুর আসনে বসাইয়া তাঁহার নিকট কত আধ্যাত্মিক তত্ত্ব শিক্ষা করিবেন।

এই পুনর্গঠনের সময় আপাততঃ বৃদ্ধ স্থবির প্রাচ্য জগৎ কতটা প্রতীচ্য দেশে স্ব প্রভাব বিস্তার করিতে পারিবেন, তাহা বলা যাইতে পারে না। সম্ভবতঃ সম্প্রতি প্রতীচীকে আপনারই রণাবশিষ্ট উপাদান লইয়া আপনাকে গড়িতে হইবে। কিন্তু প্রাচীর অবস্থা অন্যবিধ। প্রতীচীর দেশে প্রাচী-সমুদ্রে জলবিন্দুবৎ হইলেও প্রাচীর দেশে প্রতীচী জলবিন্দু নহেন। বল দেখি, প্রতীচ্য জগতে তোমাদের কটা দোকান আছে? প্রতীচ্য সাগরে তোমাদের কখানা জাহাজ চলে? প্রতীচ্য বিশ্ববিদ্যালয়ে তোমাদের কজন অধ্যাপক পড়ান? প্রতীচ্যের ধর্ম্মমন্দিরে তোমাদের কজন আচার্য্য উপদেশ দেন? কিন্তু প্রাচ্য জগতের প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বিপনিগুলি প্রতীচ্য সওদাগরদের সম্পত্তি—প্রাচ্য সাগরে অবিরত প্রতীচীর জাহাজ চলে—প্রাচ্য দেশের বুকের উপর সারাদিন প্রতীচীর রেলগাড়ী দৌড়ায়—প্রাচ্য কলেজে প্রতীচ্য অধ্যাপকগণ অধ্যাপনা করেন—প্রাচীর নগরে নগরে, পল্লীতে পল্লীতে, প্রতীচ্য মিশনরীগণ

প্রচার করেন। অতএব আমরা সর্ব্ববিভাগে শত স্থানে প্রতি নিয়ত প্রতীচীর সংসর্গে আসিতেছি। এই প্রতীচীর সংসর্গে থাকিয়া আর কি আমরা খাঁটি প্রাচ্যভাবে আপনাদিগকে গড়িতে পারি? আমরা চাই আর না চাই—জ্ঞাতসারে হোক্ বা অজ্ঞাতসারে হোক্—আমরা প্রতীচীর ছাঁচে ঢালিয়া যাইতেছি। এই পুনর্গঠনের সময় এ কথাটা আমাদের মনে রাখা কর্ত্তব্য।

এ যুগের আর একটা প্রকাণ্ড সমস্যা হিন্দুজগতের পুনর্গঠন। আবার এই গঠন কে করিবেন? আপনারা বলিতে পারেন "এ প্রশ্ন উত্থাপনে তোমায় অধিকার কি? তুমি খ্রীষ্টান্, জাতিভ্রষ্ট, কুলভ্রষ্ট, ম্লেচ্ছ। তুমি আপনার চরকায় তেল দাও। আমাদের কর্ত্তব্য আমরা করিব। তুমি আমাদের কাজে হস্তার্পণ করো না।"

আপনাদের কথা শিরোধার্য্য করিয়া আমি এক পাশে বসিয়া থাকিতে পারি, কিন্তু আমার রক্তের টান আমাকে এক পাশে বসিয়া থাকিতে দেয় না। আমি স্বয়ং আমাকে জাতি ও কুল হইতে বিচ্ছিন্ন করি নাই। অপনারাই আমাকে একঘোরে করে আমার সঙ্গে পানাহার ও আদান প্রদান বন্ধ করিয়াছেন। কিন্তু আপনারা আমাকে এই প্রকাণ্ড হিন্দু সঙ্ঘের বাহিরে মনে করিলেও আমি আমাকে এই সঙ্ঘের বাহিরে মনে করি না।

আপনাদের চরণে প্রণিপাত পূর্ব্বক এ সময় আপনাদিগকে একটা কথা মনে রাখিতে অনুরোধ করি। সেটা একটা ঐতিহাসিক কথা। প্রাচীন রোমরাজ্য ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। কিন্তু সেই প্রাচীন রোমের ভগ্নাবশেষ হইতে নব ইউরোপ কে গঠন করিয়াছেন? ইহার উত্তর আপনারা জানেন। নব ইউরোপের গঠনকারী অবশ্যই খ্রীষ্টানেরা।

তাঁহাদের গঠনে অনেক দোষ থাকিতে পারে, তাহা আমি স্বীকার করি। কিন্তু ঈশ্বরের বিধানে প্রাচ্য জগৎ হইতে সে সময় যদি খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম নাম মহাশক্তি রোমরাজ্যে প্রবেশ না করিত, তবে ইউরোপ নামে একটা মহা জগতের অস্তিত্ব অসম্ভব হইত। জগতের মহাগুরু গ্রীস্ বহু পূর্ব্বে ধরাশায়ী হইয়াছিল। রোম আপনার কর্ম্মফলে ভাঙ্গিয়া পড়িল। বহু আড়ম্বরে অনুষ্ঠিত তাহার উপধর্ম্ম তাহাকে বাঁচাইতে পারিল না। যদি খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম এ সময়ে রোমে ও রোমের অধিকৃত দেশ সকলে বিস্তারিত না হইত, তবে রোম ও তদ্‌গুরু গ্রীসের জ্ঞান-ভাণ্ডার রোমের ভস্ম রাশির নীচে চিরতরে দাবিয়া পড়িত। রোম-ধ্বংসকারী ইউরোপের বর্ব্বর জাতিগণ সে সকল অমূল্য নিধির সন্ধান পাইত না। তাহাদের বর্ব্বরতা ইউরোপে জ্ঞানের বাতি জ্বালাইত না। ইউরোপ এ পর্য্যন্ত অমা-নিশার অন্ধকারে আচ্ছন্ন রহিত। অতএব নব ইউরোপের গঠনকারীগণ খ্রীষ্টান্ ছিলেন।

পতনোন্মুখ রোমেরও প্রধান বন্ধু খ্রীষ্টান্‌গণই ছিলেন। কিন্তু রোমের শাসন-দণ্ড তখন নর-পিশাচদের হাতে। নানা চক্রান্তে স্বাধীন প্রজাতন্ত্র রোম কৈসর নামধারী আততায়ীদের পদানত হইয়াছিল। আগস্তস্ কতকটা ভাল মানুষ ছিলেন বটে, কিন্তু আগস্তসের পরবর্ত্তী ইতিহাস কেবল রক্ত-রঞ্জিত। রোমের সাধারণ লোক রোমের সম্রাট্ ও মন্ত্রীগণ অপেক্ষা শতগুণে শ্রেষ্ঠ ছিল। তবু রোমের নীতি ভয়ঙ্কর দুর্নীতিতে পর্য্যবসিত হইয়াছিল। ভোগ ও বিলাসের ইয়ত্তা ছিল না। সরলতা ও পবিত্রতা রোম-

রাজ্য হইতে নির্ব্বাসিত হইয়াছিল। নিরোর গুরু ও মন্ত্রী সেনেকা বলেন, "Women married in order to be divorced and were divorced in order to marry". ধন প্রাণ কাহারই নিরাপদ ছিল না। রোমের বরপুত্র সেনেকা নিজ শিষ্য নিরোর চক্রান্তে প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়াছিলেন। অতএব রোমের ভরা যখন পরিপূর্ণ হইল, তখন তাহার কর্ম্মানুসারে তাহাকে ধরাশায়ী হইতে হইল। খ্রীষ্টানেরা তাহাকে এই পতন হইতে রক্ষা করিতে পারিত, কিন্তু রোম খ্রীষ্টের সুসমাচারে কর্ণপাত করিল না, বরং রোম-রাক্ষসী দলে দলে খ্রীষ্ট-বিশ্বাসী নরনারীকে কুঠার তলে বা অ্যাম্ফিথিয়েটরে নিধন করিয়া আপনার রক্ত পিপাসা চরিতার্থ করিতে লাগিল।

কিন্তু এই সকল বিশ্বাসীদের প্রাণ-বলিদান বিফল হইল না। "The blood of the martyrs is the seed of the church" রোম আপনার কর্ম্মফলে ধরাশায়ী হইল, কিন্তু তাহার শ্মশান-ভূমিতে আর এক রোম উত্থিত হইল। এ রোম খ্রীষ্টীয় রোম। এই রোমই নব ইউরোপের নির্ম্মাতা।

খ্রীষ্টীয়মণ্ডলীর অতীত ইতিহাস আর একটা অকাট্য সত্য প্রকাশ করিতেছে। যখনি যখনি খ্রীষ্টীয়মণ্ডলী খ্রীষ্টের আদর্শ পরিত্যাগ পূর্ব্বক অন্য উপাদানে ইউরোপ গঠন করিতে উদ্যত হইয়াছে, তখনি তখনি তাহার নির্ম্মাণে বিঘ্ন ঘটিয়াছে। বর্ত্তমান যুদ্ধের পূর্ব্ববর্ত্তী ইউরোপকে দেখ। ইউরোপীয় সভ্যতা কি সত্য সত্য খ্রীষ্টীয় সভ্যতা ছিল? ইউরোপ খ্রীষ্টীয় আদর্শ পরিত্যাগ পূর্ব্বক বিলাসিনী ও রাজ্যলোলুপা রোমের পদানুসরণে আপনার শাসন ও সভ্যতা বিস্তার করিতেছিল। কিন্তু একজন ঈশ্বর আছেন, সে ঈশ্বর প্রেমময় হইলেও ন্যায়বান। তাঁর একটা নৈতিক নিয়ম আছে। সে নিয়মের হস্ত কেহ এড়াইতে পারে না। তাই ইউরোপকে—নিয়তির বশে নহে, কিন্তু এই নৈতিক নিয়ম বা ন্যায়দণ্ডের অধীনে—গত চারি বৎসর যুদ্ধক্ষেত্রে আপনার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইল। রোমের ন্যায় বর্ত্তমান ইউরোপের অতটা অধোগতি তো হয় নাই, তবু চারি বৎসর পূর্ব্বে যে ইউরোপ বিদ্যমান ছিল, তাহা আর এখন নাই। সে ইউরোপ এখন ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। ইউরোপের এই মহা শ্মশানে আর একটা নব ইউরোপ কে বানাইবে, তাহাই তো এ যুগের মহা প্রশ্ন।

রাজনৈতিক, সমাজনৈতিক ও অর্থনৈতিকগণ যাহাই বলুন না কেন, আমার বিবেচনায় যে শক্তি রোমের পতনের পর ইউরোপকে বানাইয়াছিল, সেই শক্তিই পুনর্ব্বার যুদ্ধাবসানে নব ইউরোপকে বানাইবে। ধর্ম্ম ভিন্ন অন্য কোন ভিত্তিতে নব ইউরোপ গঠন করিলে পুনঃ তাহা পড়িয়া যাইবে—অথবা তাহার দশা আরো শোচনীয় হইবে। এক সময় প্রাচ্য জগৎ প্রতীচ্য জগতে খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম প্রেরণ পূর্ব্বক প্রতীচীকে বানাইয়াছিল। সে যুগ এখন অতীতের স্মৃতি। প্রাচী নিজেই পড়ে আছে—প্রতীচীর মুখ পানে চেয়ে আছে। প্রতীচী গায়ের ধুলো ঝেড়ে উঠে দাঁড়ালে প্রাচীরও মঙ্গল হইবে। সে ভিক্ষুর ন্যায় হস্ত প্রসারণ পূর্ব্বক পতিত ধনীর দ্বারদেশে দণ্ডায়মান। সে তাকে শুধু আশীর্ব্বাদ করিয়া চলিয়া যাইতে পারে, কিন্তু তার কোন কাজে আসিতে পারে না। অতএব আমাদের কাছে এমন শক্তি নাই, যদ্দ্বারা আমরা প্রতীচীকে একটা দৃঢ় ধর্ম্ম ও

নীতির ভিত্তিতে দাঁড় করাইতে পারি। আমাদের কাছে আর পরিব্রাজক পল নাই, যাঁর সম্মুখে একদিন প্রতীচ্য জগৎ হেলিস্পন্টের তীরে দণ্ডায়মান হইয়া হাত যোড়ে বিনতি করিয়া বলিয়াছিল, "এপারে এসে আমাদের সাহায্য করুন।" (পড়ুন Acts of the Apostles, 16 : 9.)

তবু যে পলকে আমরা প্রতীচ্য জগতে পাঠাইয়াছিলাম, তিনি অমর। রোমের নিরো আমাদের পলকে কুঠারাঘাতে নিধন করিয়াছিল, কিন্তু আমাদের পল ধর্মরাজ্যে রক্তবীজ। তাঁহার সে রক্তে যীশু নামে ইউরোপ baptized হইয়াছিল। সে baptism (বাপ্তিস্ম) মুছিয়া যায় নাই। আবার ইউরোপে সে রক্ত হইতে সহস্র সহস্র রক্তবীজ উৎপন্ন হইবেন। আবার ইউরোপ এই রক্তবীজগণ দ্বারা গঠিত হইবে। কেবল ইউরোপ নহে—সমগ্র জগৎ নব গঠনে গড়িবে।

এই প্রবন্ধের প্রারম্ভে আমি যে সমিতি-গুলি ও অনেক মার্কিনবাসী মহাপুরুষের পত্রের উল্লেখ করিয়াছি, তাহাতেই প্রমাণ হইতেছে যে, প্রতীচ্য মণ্ডলীর রক্তবীজগণ আবার জাগিয়া উঠিয়াছেন। তাঁরা এবার "জগৎ গড়া" মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া জগতের ভাবী সভ্যতাকে একটা নূতন ভিত্তিতে স্থাপন করিবেন, ও জগতের আন্তর্জাতিক (international) সম্বন্ধকে প্রশস্ত ভ্রাতৃ ভাবে প্রতিষ্ঠিত করিয়া আর একবার খ্রীষ্টের আদর্শ দৈনিক জীবনে আনিবেন। যে মহাপুরুষ আমাকে আমেরিকা হইতে পত্র লিখিয়াছেন, তাঁহার নিম্নোদ্ধৃত তিনটী প্রশ্ন দেখুন :—

"5. What is your view of Western civilization in the light of the war? Has your view been changed in any respect by the War?

"6. In the light of the war what changes do you think ought to be made in international relationships and in the social, industrial or political life of each nation?

"7. How may the greatest amount of good be secured to humanity out of the tragedy of the war?"

অতএব দেখুন, নবজগৎ গড়িতে মণ্ডলী পুনর্ব্বার জাগ্রত হইয়াছে। নব ভারত গড়িতেও ভারতীয় খ্রীষ্টীয় মণ্ডলীর একটা কর্ত্তব্য আছে কি না, তাহা আপনারাই ভাবিয়া দেখুন। এই নব ভারত অবশ্যই হিন্দু ভারত হইবে। কেন না, হিন্দুত্ব আমাদের জাতীয়ত্ব বা nationality. আমাদের ধর্ম্মবিশ্বাস যাহাই হউক না কেন, আমরা জাতীয়ত্ব হারাইতে ইচ্ছা করি না। খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম কোন জাতিকে এ শিক্ষা দেয় না। ইউরোপের প্রত্যেক জাতির খ্রীষ্টানেরা জাতীয় নাম রাখেন। চীন, জাপান, কোরিয়ার খ্রীষ্টানেরা আপনাদের জাতীয় নাম রাখেন ও জাতিভুক্তই থাকেন। তাঁহাদের ভ্রাতৃগণ অন্য ধর্ম্মাবলম্বী হইলেও তাঁহাদের সঙ্গে পানাহার ও আদান প্রদান করেন। কেহ খ্রীষ্টান হওয়ায় জাতিভ্রষ্ট হয় না।

আপনারা আমাদিগকে ছাড়িয়া একেলা এই সুবৃহৎ হিন্দু জগতের পুনর্গঠন করিতে পারিবেন বলিয়া আমার মনে হয় না। আপনাদের কাছে হিন্দু জগৎ গড়িবার উপাদান যথেষ্ট আছে। তাহা আমি জানি। রোমের কাছেও রোমের পুনর্গঠনের উপাদান

যথেষ্ট ছিল। কিন্তু রোমের ছিল না দুটী জিনিস। এক আদর্শ, অপর শক্তি। পুরাতন আদর্শে নব রোমের উত্থান সম্ভব ছিল না। আবার নব আদর্শে উঠিতে যে নৈতিক ও ধর্ম্মবল চাই, তাও তার ছিল না। সে তার পৌত্তলিকতা ও উপধর্ম্ম লইয়া পুনর্ব্বার জগতে মস্তকোত্তোলন করিতে পারিত না। জীবন্ত ঈশ্বরের জীবন্ত শক্তিই তাহাকে জগতে দাঁড় করাইতে সক্ষম ছিল। যুদ্ধের পর যে নব জগৎ গঠিত হইবে, তাহাতে প্রাচীন উপকরণ তো থাকিবে, কিন্তু সেই উপকরণ জড় সভ্যতার আদর্শে জড় শক্তি দ্বারা সংগৃহীত ও সংহিত হইয়া নব জগৎ গঠন করিবে না। নব জগতের আদর্শ খ্রীষ্টীয় আদর্শ হইবে—স্বার্থান্ধ জাতিগণের ব্যাখ্যাত খ্রীষ্টীয় আদর্শ নয়, কিন্তু স্বয়ং যীশুখ্রীষ্ট প্রচারিত খ্রীষ্টীয় আদর্শ। বিধাতা নিজ শক্তিতে সেই আদর্শের অনুরূপ করিয়া নব জগৎ গঠন করিবেন।

হিন্দু জগতে উপাদান যথেষ্ট আছে। কিন্তু কোন্ আদর্শে আপনারা হিন্দু জগৎকে পুনর্গঠন করিতে চান? প্রাচীন বৈদিক যুগ ভারতে পুনর্ব্বার ফিরিয়া আসিবে না। আর্য্যগণ পুনর্ব্বার স্বদেশ ও স্বজন হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া সপ্তনদী তটে নূতন করিয়া নব আবাস স্থাপন করিবেন না। অতএব প্রাচীন বৈদিক আদর্শে নব ভারত গঠিত হইতে পারে না। এদিকে আমাদের আন্তর্জাতিক (international) সম্বন্ধ আমাদিগকে মন্বাদি শাস্ত্রকারগণের বিধি হইতে বহু দূরে লইয়া ফেলিয়াছে। এখন আর ঐ সকল বিধি ব্যবস্থার অনুরূপ বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের উপর হিন্দু সমাজ ও হিন্দু ধর্ম্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠা সম্ভব নহে। সে যুগের বিধি সে যুগের উপযুক্ত ছিল, এ যুগে তাহা আর চলিতে পারে না।

ব্যবস্থাপক সভায় অসবর্ণ বিবাহের বিল পেশ হইয়াছে, অমনি ধর্ম্ম গেল, জাত গেল, বলিয়া কোটী কণ্ঠে আর্ত্তনাদ উঠিয়াছে। এদিকে হোটেলে খেলে কারো জাত যায় না, ধর্ম্ম যায় না—রেলগাড়ীতে কারো জাতি ও ধর্ম্মের বিপর্য্যয় হয় না—জীবনের কোন বিভাগেই আর বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম চলে না, শুধু বিবাহের বেলা জাত ও ধর্ম্মের বন্ধন। মনুর সময়ে কর্ম্মানুসারে জাত ছিল, বা বর্ণানুসারে কর্ম্ম ছিল। এখন বামুন ঠাকুর জুতো বেচেন ও শূদ্র বেদ শুনায়। অতএব অসবর্ণ বিবাহের নামে মিছামিছি চেঁচাচেঁচি কেন কর ভাই?

আমি আমেরিকায় কখনও যাই নাই, কিন্তু আমার অনেক আমেরিকান্ বন্ধু আছেন। তাঁহাদের মুখে শুনেছি, সেখানকার শাদা লোকেরা সেখানকার কালো লোকদের কন্যা দিতে চায় না। বরং এ সম্বন্ধে নাকি আইনও আছে। কিন্তু কালো লোকদের এখন অনেক টাকা হয়েছে। যেখানে টাকা, সেখানেই বড় মানুষী। তারা শিক্ষাও বেশ পাচ্ছে। ইহার ফলে অনেক কৃষ্ণকায়ের গৃহে গৌরাঙ্গী মেম গৃহিণী হয়ে বেশ ঘরকন্না কচ্ছেন। যেখানে টাকা আছে, শিক্ষা আছে, যোগ্যতা আছে, সেখানে না মনুর বিধি চলে, না আর কোন বিধি ব্যবস্থাই কৃতকার্য্য হয়।

অতএব চেঁচাচেঁচি করে লাভ নাই, যাহা রক্ষার উপযুক্ত, তাহা রক্ষা কর, যাহা অরক্ষণীয়, তাহা পরিবর্জ্জন কর। যে শক্তি ও যে আদর্শে নব জগৎ গড়িতে বসিয়াছে, সেই শক্তি ও সেই আদর্শেই হিন্দু জগৎকেও গঠিত হইতে হইবে। অথচ গঠনে জাতীয় বিশেষত্বও থাকিবে। যদি হিন্দু জগৎ এ

সম্বন্ধে উদাসীন হন, তবে রোমের ন্যায় তাঁহাকেও শ্মশানে শয়ন করিতে হইবে; এবং যাহাদিগকে একঘোরে করে তাড়াইয়া দিয়াছ, তাহারাই তোমার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সাধন পূর্ব্বক তোমার চিতা-ভস্ম হইতে ভস্মাবশিষ্ট হাড়গুলি সংগ্রহ করিয়া আর এক হিন্দু জগৎ গড়িবে। সে গঠন কিরূপ হইবে, জানি না। তাহাতে কতটা প্রাচ্য ও কতটা পাশ্চাত্য ভাব থাকিবে, জানি না।

অতএব সময় থাকিতে এস। আমরা সব মিলে-মিশে এক হই—"বৈচিত্র্যে সমন্বয়" মন্ত্রে দীক্ষিত হই। এক নূতন হিন্দুজাতি ও হিন্দু জগৎ গঠন করি। যা আমি পেয়েছি, তা আমি আনি। যা আমাদের পিতৃগণ ছেড়ে গেছেন, তা আমরা রক্ষা করি। দুই নিধি মিলাইয়া মালা গাঁথি। তা তুমি পর, আর আমি পরি। এইরূপে নব বেশে, নব সাজে, এস আমরা নব ভারত গঠন করি।

শ্রীবিনোদবিহারী রায়।

দেশপূজ্য গুরুদাস পরিনির্ব্বাণে।

(শোক-সভায় পঠিত।)

হা মোর স্বদেশ!
নিভে গেল হোমশিখা, পুণ্যজ্যোতিঃ হইল নিঃশেষ
কি দুর্দ্দিনে আজি হায়! জীবন-মরণ-সমস্যার
মহাসন্ধিক্ষণে যবে দীপ্ততেজে দলি' অন্ধকার
তোমারে দাঁড়াতে হবে গৌরব উজ্জ্বল বসুধায়
উন্নত আদর্শ লয়ে, অকস্মাৎ সকল আশায়
চূর্ণ করি বজ্রাঘাতে মহাকাল তীব্র অট্টহাসে
কণ্টকিল দশদিশ! উৎসবের পূত পট্টবাসে
উড়াইল মহাঝড়! মহাযজ্ঞ সমাপ্তির কালে
যেন কোন্ অচিন্তিত স্বপ্নাতীত মহামায়াজালে
অন্তর্হিত যজ্ঞেশ্বর! বজ্রাহত স্তব্ধ চারিধার!—
অন্তরের অন্তস্থলে গুমরিয়া উঠে হাহাকার
আগ্নেয়গিরির বক্ষে রুদ্ধ যেন গৈরিক উচ্ছ্বাস
দগ্ধ করে সারাহৃদি—ঘনাইয়ে আনে সর্ব্বনাশ!

শূন্য দেবালয়!—
স্বধর্ম্মের মূর্ত্তিমান জনপূজ্য জীবন্ত বিগ্রহ
হয়ে গেল বিসর্জ্জিত! শুষ্ক হল জাহ্নবীর ধারা
জননীর পদদ্বন্দ্বে শুদ্ধ শান্ত নিত্য আত্মহারা
বহিত যা' মর্ত্ত্যভূমে কত শত তৃষ্ণার্ত্ত হৃদয়
তৃপ্ত করি স্নেহরসে। ভগ্ন বুঝি চিরমধুময়
অনিন্দ্য মঙ্গল ঘট! দাবানলে দগ্ধ তপোবন—
"জ্ঞান-কর্ম্ম" মন্ত্রদ্রষ্টা যজ্ঞে রত মহাতপোধন
তুরীয় ব্রহ্মের ধ্যানে কোন্ মহাবিশ্বারাধ্য লোকে
লভিলা নির্ব্বাণ যেন! সম্মিলিত আলোকে আলোকে
দিব্য চিদাকাশে আজ! মর্ত্ত্যবাসী দুর্ভাগ্য আমরা
তমাচ্ছন্ন দীর্ঘপথে বহিবারে শোকের পশরা
পড়ে আছি ধূলিতলে, সর্ব্বশক্তি সর্ব্ব আশাহীন
অপমানে বেদনায় দীর্ণবক্ষ বিষাদ-মলিন!

বন্দি হে মহান্!
দুর্জ্জের দেশের যাত্রি! পুণ্যশ্লোক! সুধাস্নিগ্ধ প্রাণ!
পেয়েছিনু তোমা মাঝে দয়াব্রতী বিদ্যাসাগরের
অপূর্ব্ব সন্ধান যেন! জুড়াইতে ব্যথা অন্তরের
তাই ছুটে কতদিন আসিয়াছি পদপ্রান্তে তব
দুর্ব্বল সন্তান যথা ভুলিতে মর্ম্মের আর্ত্তরব

পিতার আশ্রয় মাগে ! চিরদিন রয়েছে উন্মুখ
প্রসারিত বাহু আর অফুরন্ত স্নেহভরা বুক
এ দীন তনয় তরে ! জীবনের শুভক্ষণে মম
আশিস-নির্ম্মাল্য তব দেবতার আশীর্ব্বাদ সম
ধরিয়াছি নতশিরে !' হে উদার ! আর্য্যকুল-
রবি !
অর্ঘ্যরূপে অশ্রুমাল্য আনিয়াছে তব প্রিয় কবি
এ বাণী-মন্দিরে আজি ! কর তুমি সার্থক
সুন্দর
শ্রদ্ধার অঞ্জলি এই দিব্যস্পর্শে, করুণা সাগর !
হে বিশ্ববিধাতা !
নাহি বুঝি বিশ্বসূত্র কোন্ গূঢ় শুভোদ্দেশ্যে
গাঁথা
আঘাত সংঘাতে এত ! নাহি জানি ঘোর
অমঙ্গল
কি মঙ্গল নিয়ে আসে ! বিশ্বচিত্ত ব্যাকুল চঞ্চল
দুঃখ দৈন্য যাতনার পদে তব লুটাইয়ে পড়ে
সান্ত্বনা-আশ্বাস-আশে, নাহি ভাবে মুহূর্ত্তেক
তরে
সে যে তব রুদ্র-দান ! হে ভৈরব ! হে রুদ্র
দেবতা !
সহস্র হৃদয় আজি লয়ে হেন তীব্র আকুলতা
মিলিয়াছে দ্বারে তব ! কৃপা করে, করুণা
শেখর !
পূর্ণ করে দাও শুধু শোকাহত সকল অন্তর
দেশপূজ্য নায়কের শান্তোজ্জ্বল মূরতি-প্রভায়
ধ্যানলব্ধ জ্যোতিঃ সম ! তাঁরি লক্ষ্যে তাঁরি
অর্চ্চনায়
ধন্য হোক্ লক্ষ প্রাণ। প্রিয়তম স্বদেশ আমার
যুগ-যুগান্তরে দিক্ মহাত্মার মহা সমাচার !

শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত।

গুরুদেব ৺বিশ্বেশ্বর চক্রবর্ত্তী।

নবদ্বীপ-নিবাসী প্রসিদ্ধ শিক্ষক Manual of Translation প্রভৃতি পুস্তক প্রণেতা, এই অকৃতী লেখকের পূজ্যপাদ শিক্ষাগুরু সাধু ভক্ত নিষ্ঠাবান্ ধার্ম্মিকপ্রবর বিশ্বেশ্বর চক্রবর্ত্তী মহাশয় আর ইহলোকে নাই। বিগত ১০ই অগ্রহায়ণ তিনি সাধনোচিত ধামে প্রস্থান করিয়াছেন, এ সংবাদ নব্যভারতের পাঠকবর্গের অবিদিত নাই। গুণগ্রাহী সম্পাদক মহাশয় তাঁহার মৃত্যুতে শোক প্রকাশ এবং সংক্ষেপে তাঁহার গুণগ্রামের পরিচয়, বিগত অগ্রহায়ণ মাসের নব্যভারতের "সঙ্কলিকা"তে প্রকাশ করিয়াছেন। পিতৃ-তুল্য-স্নেহপরায়ণ গুরুদেবের পরলোক গমনে শোকসন্তপ্ত-হৃদয় আমি অশ্রুজলে তাঁহার তর্পণ করিবার উদ্দেশ্যে এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের অবতারণা করিতেছি।

পরম শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত দেবীপ্রসন্ন বাবু সত্যই লিখিয়াছেন যে, তাঁহার বাঙ্গালা হইতে ইংরাজি অনুবাদ গ্রন্থদ্বয় পাঠ করেন নাই, এরূপ যুবকের সংখ্যা বঙ্গদেশে বিরল। কেবল বঙ্গদেশে কেন, বিহার, উড়িষ্যা, উত্তর পশ্চিম প্রদেশ পর্য্যন্তও তাঁহার ঐ পুস্তক শিক্ষা-বিভাগে বিশেষ আদৃত।

বিশ্বেশ্বর বাবু ঐ পুস্তকগুলিকে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র বলিতেন, প্রকৃতপক্ষেও তাঁহার সে কথা যথার্থ। তাঁহার আর্থিক স্বচ্ছলতা বিধানে ঐ পুস্তকই যে তাঁহার প্রধান অবলম্বন ছিল, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

তারপর তাঁর ছাত্রশিক্ষা প্রভৃতি বাঙ্গালা গ্রন্থও শিক্ষাবিভাগে সে সময় বিশেষ আদর পাইয়াছিল। এখন আর সে সবের পশার প্রতিপত্তি নাই। ৺অক্ষয়কুমারের চারুপাঠ প্রভৃতিরও যখন সেই দশা, তখন আর তাহাতে ক্ষোভের বিষয় কি আছে। তাঁহার 'শব্দ শিক্ষা' পুস্তকখানি যাঁহারা পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা বেশ বুঝিতে পারিবেন যে, তিনি বঙ্গভাষার সম্বন্ধেও কত গভীর আলোচনা করিতেন। তাঁহার উপাসক এবং আনন্দ-গীতি প্রকৃতই সাহিত্য-ভাণ্ডারের রত্ন, সাধু ভক্তগণের অতি আদরের জিনিস।

আমার পরমারাধ্য জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কলিকাতা সেণ্ট্রাল কলেজের সংস্কৃতাধ্যাপক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্যনাথ কবিভূষণ আমাদের গ্রাম যশাইর নিকটস্থ মেঘনা গ্রামের (ফরিদপুর জেলা) মধ্যইংরাজি বিদ্যালয় হইতে ১৮৮৫ সালে বৃত্তি প্রাপ্ত হইয়া নবদ্বীপ হিন্দু স্কুলে পড়িতে যান। সেই সময় হইতেই দাদার কবিতা লেখার অভ্যাস ছিল, এবং দাদার বাঙ্গালা রচনা এবং কবিতা দেখিয়া প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর বাবু, ২য় শিক্ষক শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ অধিকারী মহাশয়, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শিবনারায়ণ শিরোমণি মহাশয় প্রভৃতি তাঁহাকে বড়ই স্নেহ করিতেন, এবং শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর বাবু আদর করিয়া তাঁহাকে Goldsmith এই উপনাম প্রদান করেন। বর্ত্তমান কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ মহামহোপাধ্যায় ডাক্তার সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম্-এ, পি-এচ-ডি মহাশয় দাদার সতীর্থ ছিলেন। ইনিও মধ্যইংরেজি পরীক্ষায় বৃত্তি প্রাপ্ত হইয়া ১ম স্থান অধিকার করিয়াছিলেন, দাদা ২য় হন। উভয়েই ভিন্ন ভিন্ন স্থান হইতে একই ইংরেজি স্কুলে প্রবিষ্ট হন, এবং উভয়ের মধ্যে সেই সময়ে যে সৌখ্য অঙ্কুরিত এবং বর্দ্ধিত হয়, তাহা আজ পর্য্যন্ত সেইরূপই পবিত্র ভাবে অক্ষুণ্ণ আছে। বিশ্বেশ্বর বাবু উভয়কেই বিশেষ স্নেহ করিতেন, এবং উভয়কেই বঙ্গভাষায় রচনা বিষয়ে বিশেষ উৎসাহ দিতেন।

তৎপর বৎসর ১৮৮৬ খ্রীঃ আমিও ঐ বিদ্যালয় হইতে মধ্য ইংরেজি বৃত্তি প্রাপ্ত হইয়া দাদার সঙ্গে নবদ্বীপ স্কুলে প্রবিষ্ট হই। মধ্য ইংরেজি বিদ্যালয়ে পাঠ করিবার সময় হইতেই আমার বঙ্গভাষার উপর একটা প্রবল অনুরক্তি ছিল, এবং তখন হইতেই আমি বাঙ্গালা ভাষায় গদ্য প্রবন্ধ এবং পদ্য রচনা করিতাম, তাহাতে আমার তাৎকালিক শিক্ষকবর্গ (প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত ললিতমোহন সরকার এবং প্রধান পণ্ডিত শ্রীযুক্ত লালনচন্দ্র দাস, আমার গ্রামের নিকটস্থ হাবাসপুর গ্রামনিবাসী পণ্ডিত শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্র নাগ দাদামহাশয়) আমাকে বিশেষ উৎসাহ দিতেন, এবং পুরস্কৃতও করিয়াছিলেন।

আমি নবদ্বীপের স্কুলে ভর্ত্তি হইতেই আমার সহাধ্যায়ীগণ, দাদার বিশ্বেশ্বর বাবু প্রদত্ত Goldsmith উপনামের কথা বলিয়া আমাকে Silversmith উপনাম প্রদান করিল। বিশ্বেশ্বর বাবু তাহা শুনিয়া বড় হাসিয়াছিলেন।

দাদার ন্যায় আমারও বঙ্গভাষার প্রতি একান্ত অনুরক্তির কথা জানিতে পারিয়া গুরুদেব আমাকে বড়ই স্নেহ করিতেন এবং নানারূপে আমাকে ঐ বিষয়ে উৎসাহ দিতেন। আমার কৃত ইংরাজি হইতে বাঙ্গালা অনুবাদ গুলি তিনি বড়ই পছন্দ করিতেন এবং সময় সময় আদর করিয়া তাহা আর আর শিক্ষকবর্গকে পড়িয়া শুনাইয়া বলিতেন, "দেখ ত,

কেমন সুন্দর অনুবাদ করেছে।" আমি তৃতীয় শ্রেণীতে ভর্ত্তি হইয়াছিলাম। আমার বেশ মনে আছে, ঐ শ্রেণীর বাৎসরিক পরীক্ষার ইংরাজি হইতে বাঙ্গালা অনুবাদ এবং বাঙ্গালা রচনার প্রশ্নের আমার কৃত উত্তর-পত্রের প্রতি তিনি বিশেষ পক্ষপাত প্রদর্শন করিয়াছিলেন এবং আমার মস্তকে তাঁহার পবিত্র স্নেহ-হস্তাবর্ত্তন করিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়াছিলেন।

'সখা' নামক পত্রের আমি গ্রাহক ছিলাম। সে সময় 'সখা'র সম্পাদক মহাশয় বালকগণের রচনায় উৎসাহ দিবার জন্য মধ্যে মধ্যে পুরস্কার রচনার ব্যবস্থা করিতেন। আমি দুইবার উক্ত রচনায় প্রতিযোগিতা করিয়াছিলাম। বিশ্বেশ্বর বাবুকে 'কোন অসদুপায় অবলম্বিত হয় নাই' বলিয়া সার্টিফিকেট দিতে হইত। তদুপলক্ষে তিনি ঐ সব রচনা পাঠ করিয়া বিশেষ প্রীত হইয়াছিলেন। একবার আমাকে বলিয়াছিলেন, "তুমি নিশ্চয় পুরস্কার পাইবে, এত অল্প বয়সে এরূপ সুন্দর রচনা খুব কমই দেখা যায়।"

তাঁহার আশীর্ব্বাদ সার্থক হইয়াছিল। দুই বারেই আমি পুরস্কার পাইয়াছিলাম, কিন্তু তাঁহারা বাঙ্গালা রচনার পুরস্কার ইংরাজি পুস্তক দিয়াছিলেন (লালবিহারী বাবুর Folk Tales of Bengal এবং Smiles এর Character) তৎপূর্ব্বে বাঙ্গালা পুস্তক দিয়াছিলেন, সে সময় আমি মধ্য ইংরাজি বিদ্যালয়ের ছাত্র।

আমার ইংরাজি পুস্তক পুরস্কার পাইবার কথা জানিয়া বিশ্বেশ্বর বাবু হাসিয়া বলিয়াছিলেন, "এতো দেখ্‌ছি বড় সুন্দর বিবেচনা! বাঙ্গালা কাগজ, বাঙ্গালা রচনা—পুরস্কার হোলো ইংরাজি বই!"

গুরুদেবের ঐরূপ স্নেহ এবং উৎসাহ যে আমার বঙ্গবাণী-সেবার ব্রতে বিশেষ উদ্দীপনার কার্য্য করিয়াছিল, তাহা আমি শতবার কৃতজ্ঞতা সহকারে স্বীকার করিতেছি। তাঁহার নিকট ঐরূপ সস্নেহ ব্যবহার, ঐরূপ উৎসাহ এবং ঐরূপ প্রশংসা না পাইলে হয়ত সাহিত্য-জীবনের যে সামান্য স্ফূর্ত্তি হইয়াছে, তাহাও হইতে পারিত না। এই জন্যই এ কথার আমি উল্লেখ করিলাম।

যখন প্রথম শ্রেণীতে আমরা তাঁহার নিকট ইংরাজি পড়িতাম, তখন এরূপ ভাবে তিনি স্বীয় বক্তব্য বিশদ করিয়া বুঝাইয়া দিতেন যে, আর জিজ্ঞাসা করিবার অবসর থাকিত না।

শিক্ষাকার্য্যে তাঁহার কৃতিত্বের বিষয় আর আমি বিশেষ করিয়া কি বলিব; তাহা এ বঙ্গদেশে বোধ হয় সকল শিক্ষিত ব্যক্তিই জ্ঞাত আছেন। Cowper's Mother's Picture কবিতাটী যে তিনি কি সুন্দরভাবে পড়াইয়াছিলেন, মাতৃহীন কবির হৃদয়ের ভাবগুলি তিনি এমন গদ্‌গদ্ কণ্ঠে ব্যক্ত করিতেন যে, তাঁহার পড়িবার ভঙ্গী এবং কণ্ঠস্বরেই আমাদের অর্দ্ধেকের বেশী বোঝা হইয়া যাইত। আমরা কবিতাটীর ভাব,তাঁহার পড়া শুনিয়াই বুঝিয়া লইতে পারিতাম। সময় সময় ইংরাজি কবিতাটীর ভাব মুখে মুখে বাঙ্গালা কবিতাকারে বলিয়া যাইতেন, আমরা মুগ্ধভাবে শুনিতাম।

শিক্ষকরূপে তিনি ছাত্রগণকে প্রাণতুল্য ভালবাসিতেন। সকলের উপর অপক্ষপাত ব্যবহার করিতেন, এমন মিষ্টভাবে কথা বলিতেন যে, হৃদয় তাঁহার প্রতি অনুরক্ত না হইয়া পারিত না। তিনি যে রাগ করিতে পারেন, অথবা শাস্তি দিতে পারেন, তাহা

সে প্রশান্ত মূর্ত্তি দর্শনে কেহ ধারণাও করিতে পারিত না, কিন্তু যদি কেহ কোনরূপ অন্যায় আচরণ করিত, তাহা হইলে তাহার রক্ষা ছিল না।

আমাদের ছাত্রাবস্থাতে একজন ম্যাজিক-ওয়ালা রাত্রিতে স্কুলের হলে ম্যাজিক দেখায়। আমাদের শ্রেণীরই একজন বয়স্ক ছাত্র বিনা-মূল্যে ম্যাজিক দেখিতে না পারিয়া উক্ত ম্যাজিকওয়ালার কতকগুলি কাচের মূল্যবান জিনিস ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া, স্বীয় প্রতিহিংসা সাধন করে। বিশ্বেশ্বর বাবু তাহা জ্ঞাত হইয়া অনুসন্ধান পূর্ব্বক উক্ত বালককে বাহির করিয়া তাহাকে আদর্শ শাস্তি প্রদান করেন, তখন তাঁহার মূর্ত্তি দেখিয়া আমরা আতঙ্কে কম্পিত হইয়াছিলাম। আর একবার আর একটী বালক স্কুলের বাহিরের দেওয়ালে কতকগুলি কুৎসিত কথা লিখিয়াছিল; মাষ্টার মহাশয় তাহাকেও বাহির করিয়া শারীরিক শাস্তি বিধান পূর্ব্বক বিদ্যালয় হইতে বিতাড়িত করিয়াছিলেন। নানা অনুরোধ উপরোধেও তিনি স্বীয় সংকল্পচ্যুত হন নাই।

ছাত্রগণের নৈতিক চরিত্র গঠনের প্রতি তাঁহার তীব্র দৃষ্টি এবং একান্ত আগ্রহ ছিল। প্রতি সপ্তাহে একদিন নৈতিক উপদেশদানের জন্য 'হলে' সভা করা হইত এবং তাহাতে তিনি প্রায়ই নানা সদুপদেশ দিতেন। ছাত্রগণের পীড়া হইলে সর্ব্বদা তাহাদের বিষয় সন্ধান লইতেন এবং বিদেশী ছাত্র হইলে তাহার চিকিৎসা, ঔষধ, পথ্য, শুশ্রূষা ইত্যাদির সুব্যবস্থার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতেন। বঙ্গদেশে তাঁহার অনেক ছাত্র আছেন, তাঁহাদের অনেকে নানা উচ্চপদে ও সম্মানে অধিষ্ঠিত আছেন। তাঁহারা সকলেই স্বীকার করিবেন যে, বিশ্বেশ্বর বাবু স্বীয় চরিত্রগুণে, বিদ্যাবত্তাতে এবং সদয় ব্যবহারে তাঁহার ছাত্রগণের হৃদয় অধিকার করিয়াছিলেন।

তিন বৎসর তাঁহার শ্রীচরণ তলে বসিয়া শিক্ষা লাভ করিয়াছিলাম, তারপরে বহুদিন পর্য্যন্ত তাঁহার চরণকমলে প্রণত হইবার সৌভাগ্য হয় নাই, কিন্তু তাঁহার সেই সৌম্য, শান্ত, স্নেহোজ্জ্বল পবিত্র মূর্ত্তি সর্ব্বদা হৃদয়ের মধ্যে পূজা করিয়াছি, তাঁহার সে পূতস্মৃতি সর্ব্বদা হৃদয়ে আনন্দ দান করিয়াছে।

আমরা যখন প্রথম শ্রেণীতে পড়ি, সেই সময়ই তাঁহার অনুবাদের পুস্তক প্রণয়ন কার্য্য আরম্ভ হইয়াছিল, ঐ পুস্তকের অনেক অংশ আমাদিগকে অনুবাদ করিতে দেওয়া হইত, তারপর সংশোধনাদি হইবার পর প্রেস কাপি প্রস্তুত করিয়া পাঠাইয়া দিতেন। একদিন আমি বলিয়াছিলাম, মাষ্টার মহাশয়, বইখানি ছাপা হইবে, যদি কিছুকাল পূর্ব্বে হইত, তবে আমরা উহার অনেক সাহায্য পাইতাম। তিনি হাসিয়া বলিলেন, "তোমাদের জন্য তো আমি স্বয়ংই আছি বাপু। আমার চেয়েও কি আমার বই বেশী সাহায্য করবে?"

দাদা এন্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার পর নানা কারণে শিক্ষকতা করিয়া এফ্-এ, পড়িতে বাধ্য হন। মাষ্টার মহাশয় তাহা জানিতে পারিয়া আমার নিকট অনেক দুঃখ প্রকাশ করেন এবং বলেন, "ত্রৈলোক্য পড়িলে একটা লোক হতে পারতো। যা হোক, তা সে যেখানেই থাক, প্রতিষ্ঠালাভ করবে।" তাঁর এ ভবিষ্যৎ বাণী বিফল হয় নাই।

দাদা বহুকাল কলিকাতাতেই আছেন, সুতরাং অনেক সময়ই মাষ্টার মহাশয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইত, তখন তিনি সস্নেহে আমার সম্বন্ধেও অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিতেন।

আমার এণ্ট্রান্স পাশ হওয়ার প্রায় ২৮ বৎসর পরে ১৩২৪ সালের আষাঢ় মাসে আমি আমার কন্যার বিবাহ দিবার জন্য যখন কলিকাতাতে দাদার বাসাতে যাই, সেই সময় দাদার নিকট জানিতে পারি যে, বিশ্বেশ্বর বাবু তাঁহার কলিকাতার বাটীতে আছেন। তাহা শুনিয়াই তাঁহার শ্রীচরণ দর্শন করিবার এবং পদধূলি-স্নাত হইবার আশায় হৃদয় আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। আমি বলিতে পারি না যে, সে কি অদম্য আকাঙ্ক্ষা—হৃদয়ের কি উৎকণ্ঠা এবং আকুলতা। এতদিন যে মূর্ত্তি হৃদয়ের সিংহাসনে বসাইয়া ভক্তিপুষ্পাঞ্জলিতে অর্চ্চনা করিয়াছি, শিক্ষকতা ব্রত গ্রহণ করিয়া যে মহাত্মার পবিত্র আদর্শ সর্ব্বদা সম্মুখে রাখিয়া অগ্রসর হইতে চেষ্টা করিয়াছি, সেই সাধন-দেবতার দর্শন পাইবার ভাগ্য আবার ঘটিবে, ইহা ভাবিতেই প্রাণে একটা আনন্দের তরঙ্গ বহিয়া গেল।

অন্তর্যামী গুরুদেব বোধ হয় অন্তরে অন্তরে সে দীন শিষ্যের হৃদ্‌গত অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়াছিলেন, তাই সেই দিনই সন্ধ্যাকালে স্বয়ংই আমাদের বাসায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

আমি আনন্দোদ্বেলিত হৃদয়ে তাঁহার চরণে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিয়া পদধূলিতে গড়াগড়ি দিয়া ধন্য হইলাম। তার পর তাঁহার দিকে চাহিয়া দেখিলাম, অপূর্ব্ব মূর্ত্তি! প্রশান্ত, শ্বেতশ্মশ্রু-বিলম্বিত ঋষির মূর্ত্তি সন্ধ্যায় গোধূলি-রাগ-রঞ্জিত হইয়া আমাকে সেই প্রাচীন আর্য্য ঋষিগণের কথা স্মরণ করাইয়া দিল। আমি পুনরায় আবেগ ভরে সে চরণে প্রণত হইলাম, এবং নিজ পুত্র কন্যাগণকে তাঁহার চরণ ধূলাতে পবিত্র করিয়া লইলাম।

আমরা যখন তাঁহার ছাত্র, সে সময় তাঁহার বয়স চল্লিশ বৎসরও হয় নাই। শ্মশ্রুতেও পক্বতা ধরে নাই, মধ্যে মধ্যে হয়ত রূপার তারের মত দু এক গাছি দেখা যাইত মাত্র। আর আজ ২৮ বৎসর পরে দেখিলাম, এই স্থবির মূর্ত্তি! বয়ঃক্রম ৬৫ বৎসর হইলেও দেহ বেশ সবল এবং সুস্থ; মুখমণ্ডল অধ্যাত্মবিদ্যা-সাধন-গৌরবে কি এক অপূর্ব্ব দীপ্তিতে পূর্ণ!

আমিও ছাত্রাবস্থাতে ষোড়শ বর্ষ দেশীয় কৈশোর যৌবনের সন্ধিস্থলে দণ্ডায়মান বালক ছিলাম, আর এখন চল্লিশ বৎসরের ঊর্দ্ধবয়স্ক প্রৌঢ়! হয়ত. অন্য সময় আমাকে চিনিতেই পারিতেন না। হাসিয়া বলিলেন, "এঁা, তুমি যে বুড়ো হয়ে গিয়েছ!" আমি হাসিয়া মুখ অবনত করিলাম এবং তাঁহাকে বসাইয়া স্বহস্তে তাঁহার তামাক সাজিয়া দিয়া নিজকে ধন্য মনে করিলাম।

তিনি সস্নেহে বলিলেন, "তোমার সঙ্গে বহুকাল দেখা হয় নাই বটে, কিন্তু তোমার সম্বন্ধে খোঁজ আমি লইয়া থাকি। তুমি শিক্ষকতা কার্য্যে সর্ব্বত্রই সুযশঃ অর্জ্জন করিয়াছ, আর বাল্যকালের সেই বঙ্গভাষার সেবাব্রত অক্ষুন্ন রাখিয়া সাহিত্য ক্ষেত্রেও প্রতিষ্ঠা পাইয়াছ,এজন্য আমি বড়ই আনন্দিত। তোমার লিখিত প্রবন্ধাদি আমি আদরের সঙ্গেই পড়িয়া থাকি।"

আমি কুণ্ঠিত ভাবে বলিলাম "সে আপনার স্নেহগুণে। আপনার আশীর্ব্বাদে দশজনে যে আমাকে ভালবাসেন, সে তাঁহাদেরই গুণ। কর্ম্মসূত্রে আমি যেখানে গিয়াছি, উদারচিত্ত মহাপ্রাণ ব্যক্তিগণেরই সাহায্য লাভে ধন্য হইয়াছি, সে আপনারই আশীর্ব্বাদ আর দাদার আশীর্ব্বাদের ফল। সাহিত্য ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা কিছুই পাই নাই, তাহার

যোগ্যও আমি নই—তবে বঙ্গ-ভারতীর সেবা করিয়া যে প্রাণে অনাবিল আনন্দ পাই, সেও আপনাদের ন্যায় গুরুদেবের আশীর্ব্বাদ এবং উৎসাহেরই প্রভাবে। শিক্ষকতাকার্য্যে আপনার মহদাদর্শ সর্ব্বদা আমার সম্মুখে রাখিয়া চলিতে চেষ্টা করি, কিন্তু আমার সাধ্য কি তাহার সম্পূর্ণ অনুবর্ত্তন করা।”

তিনি সহাস্যে বলিলেন, “দেখ, শিক্ষকতার এই সুখ, এই আনন্দ। একদিন কলিকাতার রাস্তায়—সে বহুদিনের কথা—আর কয়েকজন উচ্চপদস্থ বাবুর সঙ্গে বেড়াইতেছি, তাঁহারা আমাকে অনুযোগ দিতেছেন যে, আমি কেন শিক্ষকতা কার্য্য গ্রহণ করিয়াছিলাম,—চেষ্টা করিলে আমি একটা ডেপুটিগিরি অনায়াসে যোগাড় করিতে পারিতাম—তাহা না করিয়া এ কার্য্য গ্রহণে অন্নবস্ত্রের কষ্ট ছাড়া আর সুখ কি আছে? আমি নীরবেই তাঁহাদের তিরস্কার পরিপাক করিতে করিতে অগ্রসর হইতেছি, এমন সময় একজন ৩৫।৩৬ বৎসর বয়স্ক ভদ্রলোক হঠাৎ আমার পদতলে প্রণত হইলেন। তার পর উঠিয়া আমাকে বলিলেন, “মাষ্টার মহাশয়, আমাকে কি চিনিতে পারেন নাই?” আমি একটু তাঁর মুখের দিকে তাকাইয়া তাঁর নাম বলিলাম। তিনি বলিলেন, আজ্ঞা হাঁ! আমার সৌভাগ্য যে, আপনি এখনও আমাকে স্মরণ রেখেছেন। তারপর অন্যান্য দু’চার কথার পর তিনি চলিয়া গেলেন, যাওয়ার সময় আমার কলিকাতার বাসার ঠিকানাটীও জানিয়া গেলেন। কথাপ্রসঙ্গে জানা গেল, তিনি সম্প্রতি ১ম শ্রেণীর মুনসেফ হইয়াছেন। ইহার পরে আমার বন্ধুগণ বলিলেন, “মশায়, এখন বুঝিলাম, আপনার কার্য্যের সুখ ও গৌরব কোথায়। এরূপ আন্তরিক সম্মান ও ভক্তি শিক্ষক ভিন্ন অন্যে পায় না।” আমি হাসিতে লাগিলাম।

তারপর মাষ্টার মহাশয় সে দিন চলিয়া গেলেন। আমাদের বাসা তাঁর বাসা হইতে বেশী দূর নহে; আমি অবসর পাইলেই তাঁহার নিকট যাইতাম এবং তাঁহার সদাপ্রসন্ন মধুর হাস্যোজ্জ্বল মুখের কথামৃতে পরিতৃপ্ত হইতাম। প্রেসিডেন্সি বিভাগের ভূতপূর্ব্ব ইন্‌স্পেক্টর শ্রীযুক্ত ফণীভূষণ মুখোপাধ্যায় (P. Mukherjee নামেই ইনি সুপরিচিত) মহাশয়ও তাঁহার ছাত্র ছিলেন এবং তাঁর সঙ্গে তাঁর বাটীতে সাক্ষাৎ করিতে গেলে ইনি তাঁহাকে বিশেষ সম্মান প্রদর্শন করিয়াছিলেন, এ কথাও তিনি আনন্দের সহিত আমাকে বলিয়াছিলেন।

বিশ্বেশ্বর বাবু গান বড় ভাল বাসিতেন। তাঁহার আনন্দগীতগুলিই তাঁহার সঙ্গীতপ্রিয়তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। ভাবপূর্ণ গান শুনিলে তিনি একেবারে তন্ময় হইয়া যাইতেন। আমাকেও গান করিতে পারি কি না জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার নিকট আমার সুরহীন গলার গানের বিদ্যার পরিচয় দিতে আমার সাহস হয় নাই। আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীমান্ তারক গাহিতে পারে শুনিয়া তাহাকে ডাকাইয়া লইয়া তার গান শুনিয়াছিলেন। গত বৎসর জন্মাষ্টমীর সময়েও তাঁর বাড়ীতে আমরা গানের জন্য আহূত হইয়াছিলাম, শেষে সুমিষ্ট জলযোগে তৃপ্ত হইয়াছিলাম।

বহুকাল নবদ্বীপ হিন্দু স্কুলের কার্য্য দক্ষতার সহিত পরিচালনা করিয়া শেষে তিনি অবসর গ্রহণ করেন এবং কিছুকাল উহার সম্পাদকত্বও করিয়াছিলেন। নবদ্বীপের উন্নতির জন্য তাঁহার চেষ্টা ও উৎসাহ যথেষ্ট

ছিল এবং অনেক কাজও তিনি করিয়াছিলেন।

তাঁহার উদ্যোগে ও চেষ্টায় সেখানে যে সেবা-সমিতির প্রতিষ্ঠা হয়, তাহার দ্বারা অনেক জনহিতকর অনুষ্ঠান তিনি করাইয়াছেন। তাঁহার চরিত্রবলে ও মধুর ব্যবহারে সমিতির সদস্যগণ তাঁহার অতীব বাধ্য ও অনুগত ছিলেন এবং প্রাণদিয়া তাঁহার উপদেশ পালন করিতেন। 'আনন্দগীতি' পুস্তকস্থ গানগুলির আদিম ইতিহাসও নবদ্বীপের একটী সমিতির সহিতই জড়িত। তাহার প্রতি অধিবেশনেই এইরূপ ধর্ম্মভাবময় সঙ্গীত রচিত এবং গীত হইত। মাষ্টার মহাশয়ের নিজের রচনা ব্যতীত আরও কাহারও কাহারও রচিত সঙ্গীতও গীত হইত। তাঁহার কোন কোন গান এবং তাঁহার মাষ্টার মহাশয়-কৃত উত্তরও ঐ পুস্তকের মধ্যে আছে বলিয়া আমার বেশ স্মরণ হয়। এই সব কথাও আমি তাঁহার সহিত কথাপ্রসঙ্গেই শুনিয়াছিলাম, কিন্তু সব এখন ভাল মনে নাই।

মাষ্টার মহাশয়কে তাঁহার ছেলেদের কথা জিজ্ঞাসা করাতে তিনি বলিলেন, "তাদিগকে আর স্ববৃত্তিতে ঢুকাইনি। ব্যবসাতে লাগিয়ে দিয়েছি, তাতেই স্বাধীনভাবে তারা বেশ কচ্ছে। চাকুরী চাকুরী করেই দেশটা গেল। নিজেতো চাকুরীর স্বাদ পাইয়াছি, ছেলেদিগকে আর তাহা দিতে চাহি না। তারা মহাজনীই করুক।"

বর্ত্তমান যুগের শিক্ষাতে কোন কার্য্যকরী শিক্ষার সমাবেশ না থাকার দোষও মাষ্টার মহাশয় প্রসঙ্গক্রমে বলিয়াছিলেন। কেহ এণ্ট্রান্স, কেউ এল্‌-এ, কেউ বি-এ, পাশ করে' করে' বের হচ্ছে বটে, কিন্তু উদ্দেশ্য চাকুরী, চাকুরী—তা পেয়াদাগিরিই বল—আর জজিয়তিই বল। কেউ যে কোন ব্যবসা করবে, কি কোন শিল্পকার্য্য করিবে, কি কৃষিকার্য্য করিবে—তার যো নাই—সে শিক্ষার বর্ণপরিচয়ও এর থেকে হয় না—এমনই হাত পা বেঁধে চাকুরীর গর্ত্তে ফেলে দিয়েছে। চাকুরী করে কেবল গোলামীই শেখা যায়—দেশোন্নতি করার বল জন্মে কি?

তাঁহার স্থাপিত সেবাসমিতিও সরকারের তীব্র দৃষ্টি হইতে বঞ্চিত হয় নাই, সে কথাও একদিন হাসিতে হাসিতে বলিয়াছিলেন। আমার কন্যার বিবাহ-প্রসঙ্গে আমি বলিয়াছিলাম যে, গোড়া হইতেই আমাদের সংকল্প ছিল যে, সাধ্যের অতীত ঋণভার স্কন্ধে লইয়া বর পক্ষের দাবী পূরণ করিয়া কন্যার বিবাহ দিব না, তাহাতে কন্যা যদি ২০ বৎসর অবিবাহিত থাকে, সেও স্বীকার। তারপর এখন আমাদের সাধ্যের মত সম্বন্ধ লইয়া বিবাহ স্থির করিয়াছি। ইহা শুনিয়াও তিনি বড় আনন্দ প্রকাশ করেন। "হাঁ, ঠিক করেছেন। ঐ রকম না করলে আর উপায় নাই। আমাদের বৈদিকদের মধ্যে (মাষ্টার মহাশয় বৈদিক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ ছিলেন) ও রকম হৃদয়হীনতা মোটেই নাই—দরদস্তুর করাও নাই। তোমাদের বারেন্দ্র রাঢ়ীদের মধ্যে এ দোষটা ক্রমেই যেন প্রবল হচ্ছে!"

একদিন কথাপ্রসঙ্গে তিনি বলিলেন, "আজকাল এই যুদ্ধ বাধিবার পর হইতে লোকের জমিজমা কেনার উপর বড় বেশী ঝোঁক পড়েছে, তার কারণ কি জান? লোক ভাবছে কি জানি যুদ্ধে কি হয়! নগদ টাকা কি কোম্পানীর কাগজের তো বিশ্বাস নাই—জমিজমা করে রাখলে সেটা অনেকটা নিরা-

পদ। দেখ, আমার এই বাড়ী কিছুকাল পূর্ব্বে যে দামে কিনেছি, এখন তার দেড়গুণ এমন কি আরও বেশী দিয়ে লোকে কিন্‌তে আগ্রহ কচ্ছে। কিন্তু আমি তো বেচ্‌বো বলে বাড়ী কিনি নাই। তা নইলে তো বেশ দুপয়সা করে নিতে পার্‌তাম।" বলিয়া হাসিতে লাগিলেন।

বিশ্বেশ্বর বাবুর বাগবাগিচার দিকে বিশেষ ঝোঁক ছিল। আমরা যখন পড়িতাম, তখন তাঁহাকে স্বহস্তে নিজ বাগানে কাজ করিতে দেখিয়াছি। তাহাতে তিনি অপমান জ্ঞান করা দূরে থাকুক, বিশেষ আনন্দই বোধ করিতেন।

সাধনরাজ্যে তিনি অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছিলেন বলিয়াই আমার বিশ্বাস। তিনি নিষ্ঠাবান্ হিন্দু ছিলেন, কিন্তু অন্য ধর্ম্মের প্রতি বিদ্বেষ তাঁহার ছিল না। বিগত গ্রীষ্মাবকাশের সময়ও তাঁর সঙ্গে এ বিষয়ে আমার যে কথাবার্ত্তা হইয়াছিল, তাহা হইতে আমি এইরূপই বুঝিয়াছিলাম।

থিওসফিষ্ট সম্প্রদায়ের প্রতি তাঁহার সহানুভূতি ছিল এবং তাঁহাদের অনেকের সঙ্গে তাঁহার বিশেষ সৌখ্য ছিল।

আমার পরম শ্রদ্ধেয় বন্ধুবর বিশ্রুতনামা পণ্ডিত ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ দাদার সঙ্গে তাঁহার বিশেষ জানাশুনা ছিল এবং ক্ষীরোদ বাবুর তিনি অনেক প্রশংসা করিতেন। ক্ষীরোদ বাবুও তাঁহাকে বিশেষ শ্রদ্ধা করেন এবং তাঁহার ধর্ম্মপ্রাণতা ও ভক্তির বিষয়ে আমার নিকট উচ্চ প্রশংসাই করিয়াছিলেন। মাষ্টার মহাশয় কর্ম্মযোগেরই উপাসক ছিলেন বলিয়া বোধ হয়। তিনি একদিন Longfellowর Psalm of Life, The Ladder of St. Augustine, The Builders প্রভৃতি কবিতায় যে আমাদের গীতাদি ধর্ম্মশাস্ত্রেরই উপদেশের প্রতিধ্বনি নিহিত রহিয়াছে, সে প্রসঙ্গেও আলোচনা করিয়াছিলেন এবং তাহাতেও সংসারে কর্ম্মেরই শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদন করিয়াছিলেন।

শ্রীযুক্ত দেবীপ্রসন্ন রায়চৌধুরী মহাশয়কে তিনি খুব শ্রদ্ধা করিতেন এবং তিনি যে সাম্প্রদায়িক গণ্ডীর বাহিরে এবং সর্ব্বদা কেবল সত্যকে অবলম্বন করিয়া চলিতেই তৎপর, তাহাই বলিয়া অনেক প্রশংসা করিয়াছিলেন। আমার সঙ্গে তাঁর পরিচয় আছে এবং আমাকে তিনি স্নেহ করেন, ইহা জানিয়া মাষ্টার মহাশয় আমাকে বলিলেন, "সেটা তোমার সৌভাগ্য।"

কলিকাতা বাসকালে প্রত্যহ প্রাতে তিনি পূতসলিলা ভাগীরথীতে স্নান করিতেন এবং প্রাতর্ভ্রমণ করিতেন। প্রাতর্ভ্রমণ তাঁহার বহুদিনের অভ্যাস। স্বীয় পরিবার মধ্যে তিনি সকলেরই প্রতি স্বীয় কর্ত্তব্য প্রতিপালনে যত্নপর ছিলেন। সদয় স্নিগ্ধ ব্যবহার এবং সুমিষ্ট বাক্য তাঁহার নিত্য সহচর ছিল। আর বেশী কি বলিব, আমাদের ন্যায় ব্যক্তির পক্ষে তিনি সর্ব্বপ্রকারেই আদর্শ পুরুষ ছিলেন। তিনি স্বর্গ হইতে আশীর্ব্বাদ করুন যে, তাঁহার এই অকৃতী অযোগ্য শিষ্য জীবনের অবশিষ্ট দিবসগুলিও তাঁহারই পূতস্মৃতি বক্ষে ধরিয়া, তাঁহার অমৃতবর্ষী উপদেশাবলী পালন করিতে সমর্থ হয়।

আমি তাঁহার জীবনচরিত লিখিতে বসি নাই—তাঁহার চরিত্রে কোথায় কি দোষ ছিল, তাহা দেখিবার বা দেখাইবার সামর্থ্যও আমার নাই। তবে তাঁহার নৈতিক চরিত্র সর্ব্বপ্রকারেই অকলঙ্ক শশধরের ন্যায় পবিত্র, নির্ম্মল এবং স্নিগ্ধ ছিল, তাহা দৃঢ়তার সহিত

বলিতে পারি, কারণ তাঁহার সহিত পরিচয় সৌভাগ্য হইবার সময় হইতে এ পর্য্যন্ত এই ত্রিংশৎ বর্ষাধিক কালের মধ্যে কখনও কাহারও নিকট তাঁহার চরিত্র সম্বন্ধে কোনও রূপ বিরুদ্ধবাদ আমার শ্রুতিগোচর হয় নাই। তাঁহার প্রথমা পত্নীর পরলোকের পরে, তিনি দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ করিয়াছিলেন, কিন্তু তথাপি তাঁহার প্রথমা পত্নীর করুণ স্মৃতি তিনি মুছিয়া ফেলেন নাই—শুনিয়াছি (আমার ছাত্রাবস্থাতে) যে তাঁহার নবদ্বীপের বাটীতে তাঁহার শয়ন কক্ষের মধ্যে শয্যার শিরোদেশে তাঁহার প্রথমা পত্নীর ফটোগ্রাফ্ আলম্বিত ছিল।

সেবাধর্ম্মের প্রতি তাঁহার অত্যন্ত অনুরাগ ছিল এবং সেই জন্য রামকৃষ্ণ মিশনকে তিনি অত্যন্ত স্নেহের চক্ষে দেখিতেন।

বিশ্বেশ্বর বাবু কখন কাহারও মুখাপেক্ষী হইয়া কোন কথা বলেন নাই বা কোন কাজ করেন নাই। স্বীয় মধুর স্বভাবের দ্বারা তিনি সকলকেই আকৃষ্ট করিতেন বটে, কিন্তু তোষামোদ বা চাটুকারিতা তাঁহার প্রকৃতি-বিরুদ্ধ ছিল, সে জন্য সময় সময় তাঁহাকে লোকের বিরাগভাজন হইতে হইয়াছে, কিন্তু তিনি তাহা গ্রাহ্য করেন নাই।

বহুকাল পর গুরুদেবের সহিত সাক্ষাৎ হওয়াতে আশা করিয়াছিলাম, তাঁহার চরণতলে বসিয়া পুনরায় কিছু শিক্ষালাভ করিবার সৌভাগ্যলাভ করিব এবং সাধন-রাজ্যের সম্বন্ধেও অনেক তথ্য অবগত হইতে পারিব। কিন্তু ভগবানের ইচ্ছা অন্যরূপ বলিয়া আমার সে আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইতে পারিল না—সে জন্য হৃদয়ের মধ্যে অনেক খানি ব্যথা জমিয়া রহিয়াছে।

গুরুদেব, আপনি এখন স্বর্গে। জগজ্জননী আপনাকে তাঁহার শান্তিময় ক্রোড়ে আশ্রয় দান করুন, তাঁহার চরণে সর্ব্বদা এই প্রার্থনা করিতেছি। আর আপনার শ্রীচরণকমলে আপনার এ দীন ভক্ত সেবকের এই নিবেদন যে, আপনি তাহাকে স্বর্গ হইতে আশীর্ব্বাদ করুন যে, সে স্বীয় কর্ম্মদ্বারা আপনার শিষ্য বলিয়া পরিচয় দিবার যোগ্যতা লাভ করিতে পারে। ভগবান্ আপনার বিয়োগ-বিধুর পরিবারবর্গের হৃদয়ে শান্তিধারা বর্ষণ করুন।

উদারচেতা মহানুভব আপনি আমার হৃদয়ের শ্রদ্ধাপ্রসূত সামান্য তর্পণাঞ্জলি, অগাধ ভক্তি ও প্রীতির অকিঞ্চিৎকর নিদর্শন স্বরূপে গ্রহণ করিয়া আমাকে কৃতার্থ করুন। এই শেষ নিবেদন। ইতি। ওঁ শান্তি, শান্তি, শান্তি ওঁম্।

শ্রীযদুনাথ চক্রবর্ত্তী।

সান্ত্বনার প্রতি।

স্নেহের সান্ত্বনা!
উজলিত শশিকলা
সুনীল গগন গা'য়,
জোছনা প্লাবনে যেন
দিগন্ত ভাসিয়া যায়;

তরুলতা, বন, গিরি
নদ নদী-জল রাশি,
সারা বিশ্ব হাসি মাখা
মাখি সে চাঁদের হাসি!
সহসা ভীষণ বেশে
কাল মেঘ দিল দেখা,

নিভাইল সব আলো
ঘুচাইল হাসি-রেখা!
আঁধার আঁধার সবি—
প্রাণে উঠে হাহাকার,
এ নির্ম্মম পরিহাস
সহে বা হৃদয়ে কার?

বেহুলা যামিনী যাপে
লোহার বাসর-ঘরে,
কত মণি মুকুতায়
সে বরাঙ্গ শোভা করে।
রত্ন দীপালোকে বালা
পতি মুখ পানে চায়,
মরম উজলি উঠে
প্রেমানন্দ-জ্যোছনায়!
অকস্মাৎ সব গেল—
না পোহাতে শুভ রাকা,
সিঁদুরে পড়িল কালি
খসিল মঙ্গল শাঁখা!
নিভিল সুখের আলো
উছলিয়া অশ্রুধার,
এ নির্ম্মম পরিহাস
সহে বা হৃদয়ে কার?

আমরি "সান্ত্বনা" মেয়ে
মা বাপের আদরিণী,
বড় সান্ত্বনার নিধি
বড় শোক-নিবারিণী;
তার এ অদৃষ্ট-লিপি?—
কে করিল হেন ভুল,
অকালে ফেলিল ছিঁড়ি,
আশ্রয়-পাদপ মূল!
সঁীথির সিন্দুর টুকু
কে নিঠুর দিল মুছি,
জনমের সাধ আশা
একেবারে গেল ঘুচি!

জীবনে ব্যর্থতা হেন
নিদারুণ সর্ব্বনাশ,
সহে কি কাহারো বুকে
এ নির্ম্মম পরিহাস!

আমরা মানব, তাই
নির্জ্জীব নিরীহ রহি,
যা ঘটে নিয়তি, ভাগ্য,
তাই শিরঃপাতি সহি।
তথাপি যে ভালবাসা
এ দুর্ব্বল বক্ষ ভরা,
তথাপি যে সুখ, দুখ,
পরাণ পাগল করা।
মমতা বাঁধনে বাঁধা
গৃহ, ভূমণ্ডলময়,
"নির্ম্মম, নিরহঙ্কার"
ক'জনের সাধ্য হয়?—
আমাদের যাহা কিছু—
মাতা পিতা, ভাই বোন,
জায়া পতি, পুত্র কন্যা,
প্রাণাধিক বন্ধুজন,
সহসা সে কারো যদি
কেড়ে লয় মৃত্যু আসি,
জীবিতের সজীবতা
হয়ে যায় ভস্ম রাশি!
কোথা থাকে অনাদৃত
গীতা ভাগবত আদি—
কোথা শাস্ত্র, তত্ত্ব জ্ঞান,
কামনা—কেবলি কাঁদি!
সোনার নন্দন বন
জলি পুড়ি হয় ছাই,
পরাণ মুরছি পড়ে
মনে হ'লে "সে তো নাই"!
হৃদয়ের অতি-তলে
জাগে শুধু হাহাকার,
অদৃষ্টের পরিহাস
সহে বা পরাণে কার?

তবুও সহিতে হয়
ইহা যে বিধির দান,
অজ্ঞের সে কর্ম্মফল—
আছে ধর্ম্ম, ভগবান!—
অলৌকিকী লীলা তাঁর
অলক্ষ্যে সে শক্তি দিয়া,
ধীরে ধীরে গড়ি' তোলে
শোক মগ্ন ভগ্ন হিয়া।
ইহ-পরলোক-ব্যাপী
বিস্তারে সে ভালবাসা,
মরণের প'রে রাখে
নব জীবনের আশা।
এ জীবন অবসানে
অন্ধকার হবে দূর,
যারা গেছে তা'রা আছে
ও পারে—অমরপুর।
জীবনের সার্থকতা
কর্ম্মযোগে সত্য হয়,
চেয়ে দেখ বিশ্ব পানে,
বিধাতা নির্ম্মম নয়।

শুভাকাঙ্ক্ষিনী
শ্রীবীরকুমার-বধ-রচয়িত্রী।

জাতিভেদ ও অনারেবল্ পেটেলের বিল

প্রথমে ব্রাহ্মণ ছিল, পরে দেশ রক্ষার জন্য বলবান্ লোকেরা ক্ষত্রিয় হইল, পরে কৃষি বাণিজ্যের জন্য বৈশ্য হইল। আর নির্জিত জাতি শূদ্র হইল। গীতাকার বলিলেন—

চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্ম্মবিভাগশঃ।

তবে এত জাতি কোথা হইতে আসিল? তখন রামের সভায় বা যুধিষ্ঠিরের অথবা বিক্রমাদিত্যের সভায়ও কোন মহাত্মা পেটেল বিলের প্রস্তাব করেন নাই। সুতরাং এত সঙ্কর বর্ণ কোথা হইতে আসিল? যে সকল বর্ণ এই সঙ্কর-বর্ণ-ভাবে উৎপন্ন হইয়াছে, তাহারা কি পূর্ব্বে হিন্দু ছিল না? বৈদ্য, কায়স্থ, রাজপুত, ইহারা কি শ্রেষ্ঠ জাতিরূপে গণ্য হইতেছেন না; তবে পেটেলের বিলের বিরুদ্ধে এত আপত্তি কেন?

তখন চন্দ্রগুপ্ত সিলিউকসের কন্যা বিবাহ করিয়াছিলেন বলিয়া, তাঁহাকে কি গ্রীক করা হইয়াছিল? বাপ্পারাও খ্রীষ্টান কন্যার গর্ভসম্ভূত বলিয়া কি বাপ্পারাও খ্রীষ্টান হইয়াছিলেন? তখন জাতীয় তেজ ছিল, তখন ভারত সমস্ত জাতিকে নিজস্ব করিতে পারিত। যাস্ক, নিষ্ক, কণিষ্ক, ইহারা তুরস্কবংশসম্ভূত বলিয়া কি আমরা ইহাদের ফিরিয়া তুরস্কে পাঠাইয়া দিয়াছিলাম? না—তখন মহাপ্রাণ ভারতীয় জাতি সকলকেই সমভাবে গ্রহণ করিতে পারিত। এমন কি, কয়েক শত বৎসর পূর্ব্বে যে পারসীক জাতি ভারতে আসিয়া বাস করিয়াছিল, তাহারাও ভারতীয় হিন্দু জাতির অন্তর্ভূত হইয়া গিয়াছিল। এবং মুসলমান ধর্ম্মের প্রথম ও দ্বিতীয় শতাব্দীতে, অর্থাৎ মুসলমান দিগ্বিজয়ের পূর্ব্বে যাহারা কেবল ধর্ম্মের জন্যই এদেশে আসিয়াছিল; অথবা রোম্যান ক্যাথলিক খ্রীষ্টান মান্দ্রাজ প্রভৃতি স্থানে যে অধিবাস করিয়াছিল, তাহারাও ম্লেচ্ছ বলিয়া গণ্য হয় নাই, ভারতীয় জাতির সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছিল।

জাহ্নবীর তীব্র স্রোতের ন্যায় জাতীয় জীবনের প্রবল আবর্ত্তে সমস্ত জাতি একত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিল। আজি মৃত ভাগীরথীর চড়াময় নদীগর্ভে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্রোত যেমন পরস্পর মিলিত হইতে না পারিয়া প্রত্যেকে একটী একটী ক্ষুদ্র স্রোতস্বতী হইতেছে, তেমনি ভারতীয় জাতি শত শত জাতিতে পরিণত হইয়াছে। যাঁহারা আক্ষেপ করেন, হিন্দুরা মুসলমান ও খ্রীষ্টান হইয়া যাইতেছে, হিন্দুর জাতীয় জীবন ক্রমশঃ ক্ষীণতর হইতেছে; এখনও যদি তাহারা যে হিন্দু, মুসলমান ও খ্রীষ্টানের কন্যা বিবাহ করিতেছে; যে হিন্দু কন্যা মুসলমান বা খ্রীষ্টানের সহিত পরিণীত হইতেছে; অথবা ভিন্ন ভিন্ন জাতির মধ্যে অসবর্ণ সংস্রব করিতেছে; অথবা ব্রাহ্ম বা বৈষ্ণব হইয়াছে; তাহাদিগকে মহান্ হিন্দু জাতির অন্তর্গত বলিয়া গ্রহণ করিবার তেজ ও মহানুভবতা থাকিত, তাহা হইলে কৃশ কেদারবাহিনী ওই ক্ষুদ্র স্রোতস্বতীর ন্যায় হিন্দু জাতি ভারতের এক পার্শ্ব দিয়া বহিতে চেষ্টা করিত না। এই দুরবস্থা হইতে রক্ষা করিবার জন্য অনারেবল্ মিঃ পেটেলের এই বিল।

ক্ষুদ্র, দুর্ব্বল, সঙ্কীর্ণপ্রাণ লোকেরা ভীত হইয়া উঠিয়াছে। চিরদিনের সেই পুরাতন ধুয়া—'ধর্ম্ম গেল, ধর্ম্ম গেল, জাতি গেল, জাতি গেল' বলিয়া চীৎকার করিতেছে। আমি জিজ্ঞাসা করি, যে সময়ে একাদশ রুদ্র দেবযান পথে মধ্য এসিয়া হইতে ভারতে উপনিবেশ সংস্থাপন করিয়াছিলেন; এবং দেবকন্যা, অসুরকন্যা, রাক্ষসকন্যা, গন্ধর্ব্ব-কন্যা বিবাহ করিতেছিলেন, তখন কি তাঁহাদের ধর্ম্ম গিয়াছিল? যখন প্রবল তরঙ্গে গ্রীকজাতি দেশ জনপদ নগর জয় করিয়া সিন্ধুনদীর পশ্চিম তীরে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন, তাহাদের অনেকে পশ্চিম ভারতের অধিবাসী হইয়াছিল, তখন হিন্দু জাতি তাহাদিগকে গ্রহণ করিয়াছিলেন, তখন হে সঙ্কীর্ণ সমাজ, তুমি কোথায় ছিলে? যখন বৌদ্ধপ্লাবন-পীড়নে সমস্ত ভারতীয় জাতি ব্রাহ্মণ, শ্রমণ, ভিক্ষু এই তিন জাতিতে পরিণত হইলে আবার শঙ্করের প্রবল প্রভাবে পুনরায় বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছিল, তখন তাহাদিগকে কি হিন্দু সমাজ গ্রহণ করে নাই? তখন তেজ ছিল, মনুষ্যত্ব ছিল, মহাপ্রাণতা ছিল। আজি ফল্গুনদীর অন্তঃসলিলা প্রবাহবৎ স্বল্পপ্রাণ হিন্দু জাতি কাঁদিতেছে, 'হায় ধর্ম্ম গেল, জাতি গেল'। আমি বলি, তোমরা যে চীৎকার কর, তোমরা ত একঘরে। এক ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, এই মৌলিক জাতি ব্যতীত আর সকলেই একঘরে। ভাই মূর্দ্ধাভিষিক্ত, বৈদ্য, রাজপুত, কায়স্থ, কামার, কুমার, তেলী, মালী, নাপিত, ধোবা, চণ্ডাল, কৈবর্ত্ত, চর্ম্মকার, জেলে, ভুঁইমালী, বাগ্দী, এবং হিন্দু জাহ্নবীর শতমুখী সমুদ্রগামী তরঙ্গগণ তখন তোমরা কোথায় ছিলে? তোমরা বৈদিক যুগের বা দ্বাপর যুগেরই একঘরে। তোমরা আগে যে প্রকারে ও যে কারণে উৎপন্ন হইয়াছিলে, আজি তাহারই প্রতিবাদের জন্য গলা ফাটাইয়া চীৎকার করিতেছ?

ভারতের সকল প্রদেশের কথা বলিতে পারি না। বঙ্গদেশের কথা জানি। দশ বৎসর পরে পরে মানব-গণনায় হিন্দু জাতির সংখ্যার যে শোচনীয় পরিণাম দৃষ্ট হয়, তাহাতে হে চীৎকার-প্রবণ ধর্ম্ম গেল, জাতি গেল-সম্প্রদায়, কয়েক শতাব্দী পরে তোমরা

কোথায় যাবে? তোমরা কি মুসলমান বা খ্রীষ্টানের কুক্ষিভূত হইবে না? আমি একটী জেলার বিবরণ লিখিতেছি।

আমি ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে যখন বগুড়ায় গিয়াছিলাম, তখন সম্ভবতঃ হিন্দু জাতির জনসংখ্যা শতকরা ২২ জন ছিল। ঠিক সংখ্যা মনে নাই। চল্লিশ বৎসরও এখনও হয় নাই, ত্রিশ বৎসর পরে গণনায় শতকরা ১২ জন হইয়াছিল। এবার বোধ হয় ৮ জন হইবে। এ সব লোক কোথায় গেল? প্রথমে ব্রাহ্মণ হইতে আরম্ভ করি।

ধোধাখোলা গ্রামে দুই ঘর ব্রাহ্মণ ছিল। এক ঘর রাঢ়ী, এক ঘর বৈদিক। এক ঘরের পাত্রী আনিতে শ্রীহট্ট যাইতে হইত, আর এক ঘরের যশোহর নদীয়া যাইতে হইত। প্রতিবাসীদের মধ্যে বিবাহ হইত না। তথায় ব্রাহ্মণ বৃদ্ধি হয় নাই, সম্ভবতঃ কমিয়াছে। ঠেঙ্গামারায় এক ঘর ব্রাহ্মণ ছিল, তথায় আর ব্রাহ্মণ নাই, আম্রকাননে পরিণত হইয়াছে। চাঁচাইতাড়ায় দুই ঘর ব্রাহ্মণ ছিল, এক ঘর রাঢ়ী, প্রায় বিলুপ্ত। তাহাদের মধ্যে উপাধিধারী পণ্ডিত একজন পাত্রী না পাইয়া বৃদ্ধকাল পর্য্যন্ত অবিবাহিত থাকিয়া জীবলীলা সম্বরণ করিয়াছেন। বগুড়া হইতে ধূপচাঁচিয়া আট ক্রোশ। সেখানে একজন ব্রাহ্মণ ছিলেন, তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। বিবাহের অভাবই এইরূপ ব্রাহ্মণ লোপের কারণ। বর্ণ ব্রাহ্মণের সংখ্যা আরও কম। চাঁচাইতাড়ায় শাহাদের ব্রাহ্মণ ছিল। তাহারা প্রায় বিলুপ্ত সেদিন শুনিলাম, সূত্রধরের একজন ব্রাহ্মণ মরিয়া গিয়াছে, আর তাহারা ব্রাহ্মণ পায় না। ছয় ক্রোশ দূরের এক ব্রাহ্মণ সত্যনারায়ণের ছিন্নি দিতে ৫৲ দাবী করিয়াছে। যদি রাঢ়ী, বারেন্দ্র, বৈদিক, বর্ণ ও আচার্য্য ব্রাহ্মণের মধ্যে অবাধ বিবাহ হইত, তাহা হইলে এত শোচনীয় অবস্থা হইত না। আরও অন্যান্য ব্রাহ্মণ সমাজ দেখিয়াছি, যেমন গ্রহাচার্য্য। সকল দেশেই তাহারা বিলুপ্ত হইতেছে—কারণ দারিদ্র্য ও বিবাহের অভাব।

বগুড়া সেন্সাসে বৈদ্যের নাম নাই, কারণ জনসংখ্যা ৫০০এর কম হইলে তাহার উল্লেখ হয় না। মালতীনগর, চাকোস্তা, আঁচলাই প্রভৃতি স্থানে বৈদ্য ছিল। ইহার মধ্যে মালতীনগরে ২৷৩ ঘর আছে; আর সকল বিদেশীয়, কার্য্যোপলক্ষে ওখানে বাস করিতেছে।

কায়স্থ সংখ্যা তুলনায় কিঞ্চিৎ বেশী থাকিলেও পূর্ব্বে যে গ্রামে ৫ ঘর ছিল, সেখানে দুই ঘর হইয়াছে। কয়েকটী গ্রামে একেবারে বিলুপ্ত হইয়াছে। যেমন অস্তাহার, তিলিরপাড়া, ইত্যাদি।

নবশাখ প্রকৃত হিন্দুত্ব এখনও রক্ষা করিতেছে। ফোঁটা তিলককাটা, দাড়ী গোফ কামান, নিরামিষ ভোজন, বিশুদ্ধ হিন্দু আচার রক্ষা তাহাদের মধ্যেই আছে। তাহারা গেলেই হিন্দুজাতি যাইবে। কিন্তু তাহাদের দুর্দ্দশার কথা বলিতেছি। বগুড়ায় এক ঘর মালাকর আছে। সে ঘরটী মরিয়া মরিয়া একজনে পরিণত হইয়াছিল। তাহার স্ত্রী মরিলে তাহার দ্বিতীয় বিবাহ জন্য নদীয়া জেলা হইতে স্ত্রী আনিতে হইয়াছে। যে সব গ্রামে তিলি ছিল, কতক নির্ব্বংশ, কতক স্থানান্তর হইয়াছে। শেরপুর তিলিদের মধ্যে দুই পাড়ায় কয়েক ঘর আছে, তাহারা জমিদার অথবা মহাজন। অথচ তাহাদের মধ্যে বিবাহ হয়। নাটোর, দীঘাপতিয়া, পাবনা হইতে তাহাদিগকে পাত্রী আনিতে হয়।

সুবর্ণবণিক মধ্যে আগে কয়েকটী পাত্র ছিল, তাহাদিগের মৃত্যুর পরে কয়েকটী পাত্র হইয়াছে, তাহাদের জন্য পাত্র পাওয়া যাইতেছে না। শাহাদিগের মধ্যে কয়েকটী গ্রাম বেশ বর্দ্ধিষ্ণু ছিল, তাহারাও ক্রমে বিলুপ্ত হইয়া আসিতেছে।

এই সমস্ত নবশাখ জাতির ভিতরে প্রায় একরকম রীতিনীতি প্রচলিত। এবং সমাজে ইহারা একই পদস্থ। বাণিজ্য ও ব্যবসায়ে ইহারা ধনী। এই কামার, কুমার, তেলী, মালী, বণিক, কংসবণিক, নাপিত, কৈবর্ত্ত, তন্নিম্নে শাহা, সুবর্ণবণিক, ইহাদের মধ্যে সহজেই বিবাহ চলিতে পারে। এবং তাহাতে কেহ অবনত হইল, তাহা মনে করিতে পারে না। অথচ বারটা নারিকেলের দ্বারা তেরজন ব্রাহ্মণের ঘাড় ভাঙ্গার মত বাড়ী বাড়ী পাত্র থাকাতেও ইহারা নির্ব্বংশ হইয়া যাইতেছে। এক্ষণেও যদি অন্তর্বিবাহ প্রচলিত হয়, তবে হিন্দুজাতির জাতিত্ব রক্ষা হয়।

বিবাহ হইতেছে না, অথচ অনেকে চরিত্রভ্রষ্ট হইয়া বৈরাগী, মুসলমান ও খ্রীষ্টান হইয়া যাইতেছে। যদি বৈষ্ণব বা মুসলমানের মেয়ে বিবাহ করিয়াও জাতি রক্ষা করিতে পারিত, তবে হিন্দুজাতি এত শীঘ্র বিলুপ্ত হইত না। সাহেব যদি হিন্দু বা মুসলমান স্ত্রী গ্রহণ করে, তাহার জাতি যায় না, মুসলমান যদি হিন্দু, খ্রীষ্টান স্ত্রী গ্রহণ করে, তাহার জাতি যায় না। হায় হিন্দুর জাতি! তোমার মত নশ্বর ও অপদার্থ জগতে আর কিছু নাই।

শ্রীপ্যারীশঙ্কর দাসগুপ্ত।

অসবর্ণ বিবাহ আইনের পাণ্ডুলিপি।*

(জঙ্গীপুর বার লাইব্রেরীতে উক্ত পাণ্ডুলিপি আলোচনা সভায় পঠিত)

বড়লাট সভায় অসবর্ণ বিবাহ বিধিবদ্ধ করিবার জন্য পাণ্ডুলিপি পেশ হইয়াছে। তদ্রূপ বঙ্গের ছোটলাট সভায় গ্রাম্য সমিতির প্রতিষ্ঠা দ্বারা স্বায়ত্তশাসনের ভিত্তিস্থাপনের চেষ্টা আরব্ধ হইয়াছে। এই উভয় চেষ্টাই পৃথিবীব্যাপক মহাসমরের পরবর্ত্তী নব্যব্যবস্থার ভারতবর্ষীয় অঙ্গ মাত্র। যুদ্ধে লিপ্ত রাজ্যগুলির এবং পরোক্ষভাবে অন্যান্য রাজ্যগুলির সর্ব্বত্রই রাজনৈতিক ও সমাজনৈতিক শাসন অভিনব পন্থা অবলম্বন করিবে, সন্দেহ নাই। লৌহকে অগ্নিদ্বারা পোড়াইয়া তাহাকে যথোচিত আঘাত দিয়া সময়োচিত কার্য্যোপযোগী অস্ত্র প্রস্তুত করিতে হয়; সেইরূপ এই বৃহৎ সমরানলে দগ্ধ হইয়া প্রায় সকল দেশ অসবর্ণ ধারণ করিয়াছে, হাতুড়ের আঘাত দ্বারা তাহাদিগকে এক্ষণ কার্য্যোপযোগী করিয়া লইতে হইবে। এই আঘাত প্রত্যেক দেশের সামাজিক ও রাজনৈতিক উভয় অঙ্গকেই যুগপৎ সহ্য করিতে হইবে। কেন না, যখন বৃহৎ পরিবর্ত্তন আবশ্যক হয়, তখন সমাজনীতি ও রাজনীতি হাতে হাত ধরিয়াই চলিয়া থাকেন। ইহারা যমজ ভগিনী; ইহাদের প্রসূ প্রকৃতিদেবী স্বয়ং।

* গত কার্ত্তিক মাসের নব্যভারতে শ্রীযুক্ত শ্রীনাথ দত্ত মহাশয় Intercaste marriageকে অসবর্ণ বিবাহ মনে করেন; আমরাও সেই শিরোনাম রাখিলাম; কিন্তু আমরা ইহাকে জাত্যন্তর বিবাহ মনে করি।

অসবর্ণ বিবাহ প্রস্তাব এই অবস্থারই ক্রমবিকাশ এবং স্বায়ত্তশাসনের অনুকূল; ইহার একটী অপরটী ছাড়া সম্যক পরিস্ফুট হইবে না। এজন্য যাঁহারা স্বায়ত্তশাসন চাহেন, জননির্ব্বাচিত ব্যক্তিবর্গের দ্বারা দেশের কার্য্য সুশৃঙ্খলিত করিতে চাহেন, লৌকিক একতা যাঁহাদের প্রকৃত উপায়, তাঁহারা সেই উপায়ের উপায় অসবর্ণ বিবাহ, যাহাতে রক্তের একতা সঞ্জাত হইবে, তাহা যে কেন চাহিতেছেন না, আমরা তাহা বুঝিতে পারি না। এমন আত্মঘাতিনী চেষ্টা ভারতের রুগ্নাবস্থারই পরিচায়ক।

তার পর, অসবর্ণ বিবাহ কি? ভারতবর্ষে কি অসবর্ণ বলিয়া একটা জিনিষ আছে? এই কথার উত্তর দিতে হইলে আমাদিগকে সেই বর্ণের কথাটা তুলিতে হইতেছে।

পৃথিবীতে প্রাচীনতম গ্রন্থ ঋগ্বেদে মাত্র দুইটী বর্ণের উল্লেখ আছে; "দাসবর্ণ" ও "আর্য্যবর্ণ"। (১) এই "দাসবর্ণ" কৃষ্ণবর্ণ; এই "আর্য্যবর্ণ" শ্বেতবর্ণ। এতদ্ভিন্ন অন্য কোন বর্ণের উল্লেখ নাই; অথচ ইহাই হিন্দুর অপৌরুষেয় শাস্ত্র; অন্য শাস্ত্র ইহার শাখা-প্রশাখামাত্র। যাহা ঋগ্বেদে নাই, তাহা ধর্ম্মতঃ উপেক্ষা করিলে দোষ হয় না।

সত্য বটে, বর্ত্তমান মনুসংহিতায় চারি বর্ণের কথা বলা হইয়াছে;—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য তিন বর্ণ দ্বিজাতি; শূদ্র এক জাতি; পঞ্চম বর্ণ নাই। এই নির্দ্দেশের কোন সার্থকতা দেখা যাইতেছে না। ইহার ঐতিহাসিকতাও দোষাবহ।

চারি বর্ণের পরে আর বর্ণ নাই, এ কথা কখনও সমাজে স্বীকৃত হয় নাই। দাক্ষিণাত্যে "পঞ্চম" বর্ণ বলিয়া এক শ্রেণীর লোক আছে, তাহাদের জনসংখ্যাও বিপুল; সেখানে মনুর নির্দ্দেশের সার্থকতা কোথায়? অন্যান্য দেশে, এমন কি, বঙ্গেও চারি বর্ণের বাহিরে যে সকল অস্পৃশ্য জাতি আছে, তাহা সমগ্র বঙ্গবাসী হিন্দুর শত করা ৫৮ জন। এখানেই বা তাঁহার চারি বর্ণ ভিন্ন বর্ণ নাই, এ নির্দ্দেশের সার্থকতা কি? যেখানে সমগ্র জনসংখ্যার অর্দ্ধাংশের অধিক লোকে তাঁহার বাক্যের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে, সেখানে তাঁহাদিগকে শূদ্র বলিয়া তিনি ব্যাখ্যা করিতে চাহিলেও, সে ব্যাখ্যা ঘটনার সঙ্গে সমঞ্জস হয় না, সে ব্যাখ্যা তাঁহার মত মাত্র (opinion)

ইতিহাসের চক্ষু দিয়া দেখিতে গেলেও চারি বর্ণের কথা অমূলক কল্পনা মাত্র। আমরা জানি না, কে বর্ত্তমান মনু সংকলন করিয়াছেন; তিনি যিনিই হউন, তিনি কোথায় চারি বর্ণের উল্লেখ পাইলেন, ইহার ত কোন প্রমাণ দেখান নাই। কৃষ্ণ-যজুর্ব্বেদীয় মানবসূত্র হইতেই এই অনুষ্টুভ-ময়ী মনুসংহিতা প্রসূতা হইয়াছেন। কৃষ্ণ-যজুর্ব্বেদীয় মানবসূত্রে কি চারি বর্ণের কথা ছিল? তাহার প্রমাণ কোথা?

কেহ হয়ত বলিবেন, মহাভারতে চারি বর্ণের কথা সুস্পষ্ট রহিয়াছে। সেখানে আছে, আগে সব এক বর্ণ ব্রাহ্মণ ছিলেন; তন্মধ্যে যাঁহারা ক্রোধন ও আরক্তিম ছিলেন,

---

(১) যো দাস বর্ণমধরং গুহাকঃ ঋগ্বেদ।—২।১২।৪
যিনি (ইন্দ্র) দাসবর্ণকে গুহায় স্থাপন করিয়াছিলেন।

"কৃষ্ণ দিগে দীপ্ত তেজে করুন সংহার।"
—ঋগ্বেদ ৩।৩১।২১

"গতিশীল মরুদগণ সহ পুরুহুত
করিলেন পৃথিবীতে বজ্রেতে নিহত,
শিষ্য সবে দস্যুগণে, ক্ষেত্র ভাগ করে
লইলেন শ্বেত মিত্রগণ সহ পরে।"
ইন্দ্রের মিত্র আর্য্যেরা শ্বেতবর্ণ ছিলেন।
—ঋগ্বেদ ১।১০০।১৮

তাঁহারা ক্ষত্রিয় হইলেন; যাঁহারা পীতাভ কৃষিবাণিজ্য তৎপর ছিলেন, তাঁহারা বৈশ্য এবং যাঁহারা কৃষ্ণবর্ণ ছিলেন, তাঁহারা শূদ্র হইলেন। *

মহাভারতের মধ্যে যিনি এই কারুকার্য্য করিয়া গিয়াছেন, তিনি মনুসংহিতাকারের একজন বিশিষ্ট সাক্ষী, সন্দেহ নাই। চারি বর্ণ কি কি, এ কথার ত একটা উত্তর হওয়া চাই, নচেৎ মনুসংহিতাকে বিশ্বাস করিবে কে? ইহা পূরণ করার জন্যই মহাভারতের লিপিকর, শ্বেত, লাল, পীত ও কৃষ্ণ যথাক্রমে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্রের বর্ণ বলিয়া সাক্ষ্য দিয়া গিয়াছেন। কিন্তু এ সাক্ষীতে বিশ্বাস করা যায় না। যে সকল বিখ্যাত ক্ষত্রিয়ের নাম আমাদের জানা আছে, তাহাদের কেহই ত আরক্তিম বা লালবর্ণের লোক ছিলেন না। রাম, কৃষ্ণ, বলরাম, ভীম, অর্জ্জুন, ভীষ্ম, দ্রোণ বা কর্ণ, ইহার কে আরক্তিম বা লাল বর্ণের লোক ছিলেন? বরঞ্চ কৃষ্ণ, বলরাম, অর্জ্জুন, রাম ও দ্রোণ—কৃষ্ণবর্ণ বা কৃষ্ণবর্ণের নিকটবর্ত্তী শ্যামবর্ণের লোক ছিলেন; দুর্য্যোধনেরা শত ভ্রাতা কৃষ্ণবর্ণের লোক ছিলেন। ভীষ্ম, ভীম, কর্ণ যে আরক্তিম বর্ণের লোক ছিলেন, ইহা ত শুনা যায় নাই। তবে এই মহাভারতের লিপিকর কি উপকরণ অবলম্বনে বর্ত্তমান মনুসংহিতাকে সমর্থন করিবার জন্য উক্তবিধ শ্বেত, লাল, পীত, কৃষ্ণ, চারি বর্ণের লোকের অস্তিত্ব প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিলেন? ফলে লোকতঃ ধর্ম্মতঃ ভারতে চারি বর্ণের কথা অগ্রাহ্য হইয়া আসিতেছে। লোকে ভারতে কখন পৃথক্ পৃথক্ চারি বর্ণের লোক দেখে নাই, এবং নিখিল হিন্দুশাস্ত্র যদি অপৌরুষেয় ঋগ্বেদের নিশ্বাস হয়, তবে সেই ঋগ্বেদে বা মন্ত্রসাহিত্যে কুত্রাপি চারি বর্ণের উল্লেখ নাই।

এই স্থলেই ঋগ্বেদের ১০ম মণ্ডলের ৯০ সূক্তের (পুরুষ সূক্তের) ১১।১২ ঋকের কথা উঠিতেছে। অনেক বার আমরা এই দুই ঋকের আলোচনা করিয়াছি। এখানেও সংক্ষেপে পুনরালোচনা করিতে বাধ্য হইলাম।

যৎ পুরুষং ব্যদধুঃ কতিধা ব্যকল্পয়ন।
মুখং কিমস্য কৌবাহু কাউরু পাদা
উচ্যেতে॥ ১১
ব্রাহ্মণোঽস্য মুখমাসীদ্ বাহু রাজন্যঃ কৃতঃ।
উরু তদস্য যদ্বৈশ্যঃ পদ্ভ্যাম্ শূদ্র
অজায়ত॥ ১২

এই স্থলে প্রশ্নোত্তরচ্ছলে যে চারিটী জনবিভাগের উল্লেখ দৃষ্ট হয়, তাহাই বর্ণ ভেদের মূল কারণ বলিয়া কীর্ত্তিত হয়। কিন্তু এই দুই ঋকের মধ্যে বর্ণ শব্দের উল্লেখ দেখা যায় না। বরঞ্চ ইহার পূর্ব্ববর্ত্তী বিপুল মন্ত্র সাহিত্যে মাত্র দুই বর্ণের উল্লেখ রহিয়াছে। দাসবর্ণ, আর্য্যবর্ণ; দাসীবিশ্, আর্য্যবিশ্; সুতরাং দুই বর্ণ হইতেই ৪টি বিভাগ (classification) করা হইয়াছে, ইহাই বুঝিতে হয়।

ইহা দুই প্রকারেই হইতে পারে (১) দাসবর্ণের সকল লোক শূদ্র; আর্য্য বর্ণের সকল লোক ত্রিধা বিভক্ত হইয়া ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য হইয়াছে। *

(২) আর্য্যানার্য্য মিশ্রিত জনসংখ্যাকে ৪ ভাগ করিয়া গুণকর্ম্মানুসারে ৪টি শ্রেণীর রেখাপাত করা হইয়াছে।

* ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়ো বৈশ্যস্ত্রয়বর্ণা দ্বিজাতয়ঃ।
চতুর্থ একজাতিস্তু শূদ্রোনাস্তি তু পঞ্চমঃ॥ ১০।৪

* সায়নাচার্য্য বেদাধ্যয়নে কাহার কাহার অধিকার আছে, তাহা বলিতে গিয়া বলিতেছেন "স চ ত্রৈবর্ণিক পুরুষঃ।"

আমরা শেষোক্ত মতাবলম্বী। ভারতে আর্য্যাভিবাস হইলে, এদেশের লোকের সহিত পুনঃ পুনঃ যুদ্ধ হইতেছিল; তাহারা পরস্পর ঘোরতর শত্রু, ইহাই সত্য। কিন্তু তাহাদের মধ্যে যৌন সম্বন্ধ হইত না, এ কথা সত্য নহে। অনার্য্য আর্য্যাশ্রিত হইতে পারিত না, এ কথাও সত্য নহে। মোসলমান বিজেতারা যেরূপ হিন্দু রমণীকে পত্নীত্বে বরণ করিতেন, তদ্রূপ আর্য্য রমণীরা কৃষ্ণকায় বিজিত বীর পুরুষগণের অঙ্কশায়িনী হওয়ার প্রমাণ পাওয়া যায়। সম্ভবতঃ কৃষ্ণের মাতা দেবকীই এইরূপ এক ভাগ্যশীলা রমণী। * পক্ষান্তরে দাসবর্ণীয়া উশিজ্‌ গর্ভে ঋষি কক্ষীবাণের জন্ম।

"কক্ষীবন্তং য ঔশিজঃ" ১।১৮।১

পুরুষসূক্তের পূর্ব্ববর্ত্তী সমাজে যদি আর্য্যবর্ণে ও দাসবর্ণে অর্থাৎ শ্বেত কৃষ্ণবর্ণে যৌন সম্বন্ধের দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়, তাহা হইলে আর্য্যবর্ণ নিরবচ্ছিন্ন ভাবে ত্রিধা বিভক্ত হইয়া ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের শ্রেণী উৎপাদন করিয়াছিল, এবং নিরবচ্ছিন্ন দাসবর্ণ সব শূদ্র আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছিল, এ সিদ্ধান্ত গ্রহণযোগ্য নহে। বরঞ্চ তদানীন্তন ঋষিরা পুনঃ পুনঃ যুদ্ধঘটিত, জেতাজিত মধ্যে মনোমালিন্যের হ্রাস করার অভিপ্রায়ে গুণকর্ম্মানুসারে আর্য্যানার্য্য জনসংখ্যাকে মিশ্রিত ভাবে উক্ত ৪ শ্রেণীর মধ্যে সন্নিবেশিত হওয়ার অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছিলেন। * আর্য্যানার্য্যকে একীভূত করার ইহাই প্রথম উদ্যম। তদানীন্তন War conference এর ইহাই প্রথম ফল। আর্য্যানার্য্য মধ্যে দ্বিবর্ণত্ব উঠাইয়া দেওয়ার উদ্দেশ্যে উক্ত সূক্তের নীতি সূচিত হইয়াছিল।

ফলে ভাবিয়া দেখিলে, বর্ত্তমান হিন্দু জনসংখ্যার মধ্যে অসবর্ণের ভাব নাই। ৺বঙ্কিমচন্দ্রের কন্যা যদি শশধর তর্কচূড়ামণির গৃহে বিবাহিত হইত, তাহা কি অসবর্ণ বিবাহ হইত? বঙ্কিমচন্দ্র শ্বেতবর্ণ বা আর্য্যবর্ণের লোক ছিলেন; তর্কচূড়ামণি মহাশয় দাসবর্ণ বা কৃষ্ণবর্ণের পুরুষ। ৺সারদাচরণ মিত্রের সহিত ৺চন্দ্রমাধব ঘোষের যে যৌন সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছে, তাহা কি অসবর্ণ বিবাহ বলিয়া কেহ মনে করিয়াছে বা করে? অথচ সারদাচরণ মিত্র যতটা আর্য্যবর্ণের নিকটবর্ত্তী ছিলেন, চন্দ্রমাধব ঘোষ ততটা অনার্য্যবর্ণের নিকটবর্ত্তী ছিলেন। ৺দীননাথ সেনের পরিবারের কাহার সঙ্গে যদি মাননীয় বৈকুণ্ঠনাথ সেনের পরিবারস্থ কাহার যৌন সম্বন্ধ হয়, তাহা কি অসবর্ণ বিবাহ হইবে? অথচ দীননাথ সেন দাসবর্ণের ও বৈকুণ্ঠনাথ সেন আর্য্যবর্ণের পুরুষ, ইহা ত স্বচক্ষেই দেখিয়াছি। পুনশ্চ মাননীয় বৈকুণ্ঠনাথ যে গোত্রে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, সেই কণ্বগোত্রীয় আদিপুরুষ সেই কণ্ব ঋষি 'শ্যাম' অর্থাৎ কৃষ্ণবর্ণের লোক ছিলেন।

এইরূপ শ্বেত কৃষ্ণের মিশ্রণে যে এক প্রকার বর্ণের ভাব সমগ্র হিন্দু সমাজকে

* ছান্দোগ্য উপনিষদে যে আঙ্গিরস কৃষ্ণের উল্লেখ আছে, সেখানে তাহাকে দেবকী-নন্দন কৃষ্ণ বলা হইয়াছে। জবলার পুত্র যেমন সত্যকাম জাবাল, পিতার উল্লেখ নাই। বেদমন্ত্রদ্রষ্টা আঙ্গিরস কৃষ্ণের মাতারই উল্লেখ আছে, পিতার উল্লেখ নাই। একথা বোধ হয় অনেকে জানেন না, অঙ্গিরা গোত্রীয় পত্র ও সাম ঋষিকে তিতিন্দির রাজা কতকগুলি যাদ (যাদব) দাস উপঢৌকন দিয়াছেন, আঙ্গিরস কৃষ্ণের সেই অঙ্গিরের কাহার গৃহে জন্ম হইয়াছিল, অনুমান করা যায়। তাহার পিতা বাসুদেবের উল্লেখ পরবর্ত্তী সংযোজনা মাত্র।

* এই তিন বর্ণ ও আর্য্যানার্য্য মিশ্র জনসংখ্যার তিন ভাগ মাত্র।

ব্যাপিয়া রহিয়াছে, তাহা কাহার গৃহে, কাহার বংশে, কাহার গ্রামে বা কাহার দেশে নাই? পিতা পুত্রে, মাতায় দুহিতায়, ভ্রাতা ভগিনীতে, শ্বশুরে জামাতায়, ভাগিনেয় মাতুলে যে এইরূপ শ্বেতকৃষ্ণের মিশ্রণ দেখা যায়, তাহা ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্য, নবশাখ এবং অন্যান্য সকল জাতির মধ্যে প্রায় তুল্য ভাবে বিরাজ করে। আমরা দেখিয়াছি যে, বঙ্গের ব্রাহ্মণ সমাজে শতকরা হিসাবে আর্য্যবর্ণত্বের ভাব ২৬শের অধিক নহে, এবং কায়স্থাদি অন্য বর্ণ তাহার পর পর কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ নিম্নে।* ইহাকে কি অসবর্ণ বলিব?

৪০০০ বৎসর পূর্ব্বে ভারতে আর্য্যাভিবাস হইয়াছে। ২০ বৎসরে পুরুষ গণনা করিলে ২০০ পুরুষ হইল শ্বেতবর্ণ আর্য্যগণ ভারত প্রবেশ করিয়াছিলেন; বঙ্গে যে প্রবাদ আছে, কান্যকুব্জ হইতে পাঁচ জন ব্রাহ্মণ আদিশূরের পুত্রেষ্টি যজ্ঞ সভায় আসিয়াছিলেন, যদিও এই প্রবাদের মূলে কোন সত্য নাই, তথাচ আদিশূরের সময়ের ব্রাহ্মণ ছান্দড় প্রভৃতি হইতে যে পুরুষ শাখা হইয়া আসিতেছে, তদ্দৃষ্টে ছান্দড় বংশ বঙ্গেই ২৯।৩০ পুরুষ হইল বাস করিতেছেন। শৈলনদ-শোভিত পঞ্চনদ প্রদেশ হইতে আসিয়া তাহারা কত পুরুষ কান্যকুব্জে ছিলেন, বলা কঠিন। তবে এই ২০০ পুরুষ মধ্যে তাহাদের কাহার যে বর্ণ-ব্যত্যয় ঘটে নাই, এ কথা বলা যায় না। অর্থাৎ শ্বেতবর্ণ বা আর্য্যবর্ণ পিতার কৃষ্ণবর্ণ পুত্র কন্যা এই ২০০ পুরুষের মধ্যে কাহার জন্মে নাই, এমন নির্দ্দেশ বড় ধৃষ্টতার বিষয় হইবে। সুতরাং পুরুষসূক্ত-সূচিত কালের পূর্ব্ব হইতে যে শ্বেতকৃষ্ণ মিশ্র এক বর্ণের ভাব ভারতের হিন্দু সমাজে দাঁড়াইয়া গিয়াছে, তাহা আপাতঃ দৃষ্টিতে কচিৎ কচিৎ বিভিন্ন দেখাইলেও এক বর্ণেরই নানা মূর্ত্তি মাত্র। সুতরাং অসবর্ণ বিবাহের কথা ঐতিহাসিক কথা নহে। ইহার যে কাহারও সহিত যে কাহারও বিবাহ হয়; ইহার ব্রাহ্মণের সহিত কায়স্থের, কায়স্থের সহিত নবশাখের কিম্বা পাল্টা ভাবে কায়স্থের সহিত ব্রাহ্মণের বা নবশাখের সহিত কায়স্থের ইত্যাকারের যে কোন যৌন সম্বন্ধ হয়, তাহাকে অসবর্ণ যৌন সম্বন্ধ বলা যাইতে পারে না। ভারতে যখন বহুদিন হইতে আর্য্যানার্য্য বর্ণের পার্থক্য ক্রমশঃ বিলুপ্ত হইয়া আসিয়াছে, এবং যাহা কিছু বা রহিয়াছে, তাহা যখন কেহ কার্য্যক্ষেত্রে গ্রাহ্য করে না, তখন অসবর্ণ বিবাহের একটা কথাই উঠিতে পারে না।

মিষ্টর পেটেল মহোদয় ভারতবাসীর বিবাহ-বিশৃঙ্খলা নিরাকৃত করিবার উদ্দেশ্যে যে পাণ্ডুলিপি দাখিল করিয়াছেন, তাহাকে আন্তর্জাতিক (Intercaste marriage) বিলের পাণ্ডুলিপি বলাই সঙ্গত, অসবর্ণ বিবাহের পাণ্ডুলিপি বলা চলে না। ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈশ্য, তিলি, মালী, কুম্ভকার, কর্ম্মকার, স্বর্ণকার, নমঃশূদ্র, রাজবংশী প্রভৃতি সম্প্রদায় এক বর্ণেরই লোক, তবে বিবাহ-গণ্ডী সংকুচিত করিয়া স্বতন্ত্র জাতিরূপে প্রতিভাত হইতেছে। জন্মানুসারে তাহাদের বিবাহের সীমা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, পানাহার গণ্ডীর বাহিরে চলিতেছে না, এমন কি, কোন কোন জাতি স্পর্শেরও বহির্ভূত আছে। এই যে কৃত্রিম ব্যবস্থা ভারতীয় সমাজকে সম্পূর্ণরূপে গ্রাস করিয়াছে, এবং কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের পর হইতে, অর্থাৎ প্রায় ৩৫০০ বর্ষ পর্য্যন্ত যাবতীয়

---

* বহু পূর্ব্বে এই নব্যভারতে বর্ণসাম্য ও ধর্ম্মসাম্য নামে একটী প্রবন্ধ আমি লিখিয়াছিলাম। পাঠকবর্গ তাহা অনুসন্ধান করিয়া দেখিতে পারেন।

হিন্দুশাস্ত্র নানা ছন্দেবন্দে যে ব্যবস্থাকে সমর্থন করিয়া আসিতেছে এবং যাহার ফলে ভারতের জনসাধারণ (democracy) হীন হইতে হীনতর হইয়া মনুষ্যত্ব-শূন্য হইয়া পড়িয়াছে, তাহার ঔষধ তদপেক্ষা বৃহত্তর ও পৃথিবীব্যাপক কুরুক্ষেত্র, অর্থাৎ সদ্যসমাপ্ত য়ুরোপীয় সমর ভারতে প্রেরণ করিয়াছে,—পেটেলের পাণ্ডুলিপি সেই ঔষধেরই একটী কৌটা মাত্র। ভারতের কুরুক্ষেত্র যে জাতিভেদ ক্রমশঃ উপস্থিত করিয়া ভারতের দুর্গতির একশেষ সাধন করিয়াছে, পৃথিবীব্যাপক এই কুরুক্ষেত্র প্রতিক্রিয়া বলে তাহা কি নিবারণ করিতে সমর্থ হইবে না? এস্থলে এ কথাটী বলা আবশ্যক যে, জাতিভেদের অঙ্কুর কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের পরবর্ত্তী ঘটনা। দশসহস্রাধিক ঋতমন্ত্র মধ্যে যেমন কুত্রাপি ৪ বর্ণের উল্লেখ নাই, তেমন জাতি এই শব্দটীও নাই। সুতরাং জন্মানুসারে ৪ বর্ণের উৎপত্তির কথা ও তাহাদের অধিকার-নির্দ্দেশের কথা বহু পরবর্ত্তী ঘটনা। ভারতযুদ্ধান্তিক সাহিত্যেই এই ঘটনার প্রথম উল্লেখ দেখা যায়। ইহা হিন্দুজাতির সেই বিখ্যাত ভ্রাতৃবিরোধের ফল।

সদ্যসমাপ্ত ইউরোপীয় কুরুক্ষেত্র দ্বারা প্রণোদিত হইয়া সাম্রাজ্যের কেবিনেট ভারতে স্বায়ত্তশাসনের যে উপায় প্রস্তাবিত করিয়াছেন, তাহাকে সম্যক্ কার্য্যে পরিণত করিতে হইলে আমাদের যে সকল পন্থা অবলম্বন করিতে হইবে, তন্মধ্যে পেটেল-প্রস্তাবিত বিবাহ-সংস্কার, জাত্যন্তরে যৌনসম্বন্ধ স্থাপন, একটী প্রধান পন্থা। কিন্তু দেশের জনসাধারণ যদি এই প্রস্তাবে উৎসাহের সহিত যোগ না দেয়, তবে মাননীয় ভূপেন্দ্রনাথ বসুর এতদ্বিধ প্রস্তাবের ন্যায় ইহাও নিষ্ফল হইবে, সন্দেহ নাই। উত্তরবঙ্গ প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন স্থান হইতে এই শুভকরী প্রস্তাবনার বিরুদ্ধে মত প্রকাশিত হইতেছে দেখিতেছি। তারকেশ্বরেও ১৫০ জন পণ্ডিত-শোভিত সভায়ও বিরুদ্ধ মত প্রকটিত হইয়াছে পড়িলাম। কিন্তু এই মতকে সর্ব্বসাধারণের মত বলিয়া গ্রাহ্য করা যায় না। আশা করি, গবর্ণমেণ্টও তাহা করিবেন না। উত্তর বঙ্গের রাজবংশী, মধ্য বঙ্গের কৈবর্ত্ত ও পোদ এবং পূর্ব্ববঙ্গের গুহ বা চণ্ডাল, যাহাদিগকে এক্ষণে নমঃশূদ্রও বলা হয় এবং সমুদায় বঙ্গের শাক্তিক বা সাহা জাতির পক্ষে আন্তর্জ্জাতিক বিবাহ তাহাদের সামাজিক অত্যাচার হইতে মোক্ষের প্রধানতম উপায়, তাহারা কি ইহার বিরুদ্ধে মত দিতে পারে? তবে উত্তর বঙ্গ হইতে মাননীয় সুরেন্দ্রনাথ রায় কি প্রকারে বলিলেন, তত্রত্য হিন্দুসমাজ পেটেলের পাণ্ডুলিপির বিরুদ্ধ? তাঁহার কথা উচ্চ শ্রেণী অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও বৈদ্যের কথা হইতে পারে, কিন্তু মধ্য ও নিম্ন শ্রেণীর লোকের আন্তরিক ভাবের অভিব্যক্তি নহে।

বঙ্গের ৪,৬৩,০০,০০০ জনসংখ্যার মধ্যে অর্দ্ধেকেরও কম হিন্দু। সেই হিন্দুর শতকরা ১৩ জন উচ্চ শ্রেণীর লোক, ২৯ জন নিম্ন শ্রেণীর লোক এবং ৫৮ জন অস্পৃশ্য জাতির লোক। * নিম্ন ও অস্পৃশ্যের জনসংখ্যা শতকরা ৮৭ জন। এই শতকরা ৮৭ জন, জলচল দ্বারা, আন্তর্জ্জাতিক বিবাহদ্বারা সমুন্নত না হইলে স্বায়ত্তশাসন কেবল উচ্চ শ্রেণীর অর্থাৎ শতকরা ১৩ জনের দ্বারা নিম্ন ও অস্পৃশ্য জাতির নির্য্যাতনের যন্ত্রস্বরূপ হইয়া

* And of this population only 13 percent belong to the upper caste, 29 percent to the low castes and full 58 percent : are "untouchables". D. N. Maitra's lecture on Social Service page 4.

দাঁড়াইবে। যদি গবর্ণমেণ্ট ও দেশের লোক এ দেশে স্বায়ত্তশাসন দিতে ও নিতে চাহেন, তবে জলচল ও পেটেল-প্রস্তাবিত বিবাহ-সংস্কার প্রস্তাবে যুগপৎই হস্ত দিউন। কিন্তু আমরা বুঝিতে পারি না, জলচলের কার্য্যে কতকটা অগ্রসর না হওয়ার পূর্ব্বে আন্ত-র্জ্জাতিক বিবাহ কি প্রকারে প্রকৃষ্টরূপে আবদ্ধ হইতে পারে।

যদিও অসবর্ণ দোষ হিন্দুসমাজের কুত্রাপি ঘটিতে পারে না; কেন না, শ্বেত কৃষ্ণের মিশ্রণ প্রত্যেক পরিবারের ও প্রত্যেক সম্প্রদায়ের মধ্যেই আছে, তথাচ স্পর্শদোষ প্রথার দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীর দ্বারা হিন্দুসমাজ যে দ্বিধাকৃত হইয়া রহিয়াছে, তাহা সেই প্রাচীন আর্য্যানার্য্য বর্ণ বা শ্বেত কৃষ্ণবর্ণ লোকের সামাজিক বিরোধ হইতে না হইলেও, রাজ-নৈতিক বিরোধের চরম ফল। আর্য্যবর্ণের ক্রমশঃ রাজনৈতিক বল যত হ্রাসপ্রাপ্ত হই-য়াছে, সমাজনৈতিক বলের দ্বারা তাহাও পূরণ করার চেষ্টা করা হইয়াছে। কালে কালে এই দুই বিভাগ এমন সুদৃঢ় বিচ্ছেদ দ্বারা এমন পৃথক্কৃত হইয়া রহিয়াছে যে, তাহাদের মধ্যে যৌন সম্বন্ধ স্থাপন আপাততঃ অসম্ভবই হইবে, সন্দেহ নাই। যাহাকে স্পর্শ করিলে স্নান করিতে হয়, যাহার স্পৃশ্য অন্ন গলাধঃকরণ করিলে, গোময় ভক্ষণ করিয়াও জাতিচ্যুতি হইতে রক্ষা পাওয়া যায় না, যাহার ব্রাহ্মণ উচ্চবর্ণের ব্রাহ্মণের সঙ্গে এক পংক্তিতে ভোজন করিতে পারে না, এমন অনাচরণীয় ও অস্পৃশ্য ব্যক্তির সহ পুত্র কন্যার বিবাহ কি প্রকারে সম্ভাবিত হইবে? এজন্য জল-স্পর্শ দোষ, ও খাদ্যদোষ প্রথা উঠাইয়া দিতে না পারিলে আচরণীয় ও অনাচরণীয় সম্প্র-দায়ে রক্তবিনিময় সম্ভবপর নহে। সেইরূপ ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈশ্য, কুম্ভকার, কর্ম্মকার, তিলি, মালী প্রভৃতি জাতিগুলির মধ্যে দেব-স্পর্শ দোষ প্রথা আছে ও পরস্পরের খাদ্য-দোষ প্রথা বশতঃ যে পার্থক্য আছে, এই আইনের কার্য্য সৌকর্য্যার্থে তাহা অগ্রেই উঠাইবার চেষ্টা আবশ্যক। কায়স্থ যখন স্বীয় অর্চ্চিত দেব বিগ্রহ স্পর্শ করে না, কায়স্থের ব্রাহ্মণ-জামাতা তাহার গৃহে আসিয়া দেব স্পর্শাধিকারে বঞ্চিত হইতে চাহিবে কেন? সুতরাং এই পাণ্ডুলিপি আইনে পরিণত করিতে হইলে স্পর্শদোষের এই তিনটী ভাব সমাজ হইতে উঠাইয়া দিতে হইবে।

১। দেবস্পর্শ-দোষ।
২। খাদ্যস্পর্শ-দোষ।
৩। জলস্পর্শ-দোষ।

মিষ্টর পেটেলের পাণ্ডুলিপি আইনে পরি-ণত হইলেই উপরোক্ত তিন বিভাগে গবর্ণ-মেণ্ট পক্ষীয় ও স্বদেশীয় পক্ষীয় সম্ভ্রান্ত ও অবস্থাপন্ন এবং কার্য্যক্ষম ইচ্ছাবান্ কতিপয় বিজ্ঞ ব্যক্তিকে লইয়া সমিতি গঠন পূর্ব্বক প্রকৃত প্রস্তাবে কার্য্যে হাত দিতে হয়। তাহা হইতে যে নবোৎসাহ জনসাধারণে সঞ্চারিত হইবে, তাহাতেই কেবল পেটেল বিলকে সার্থকতার দিকে লইয়া যাইতে পারে। কার্য্য কঠিন হইলেও অসম্ভব নহে। বিশেষতঃ দেশ যখন স্বায়ত্তশাসন-সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়াছে, শত সহস্র তরঙ্গাঘাত মস্তকের উপর দিয়া গড়াইয়া গেলেও কূল পাইবার চেষ্টা না করিয়া উপায়ান্তর নাই।

পেটেল বিলের আর এক আপত্তি অবশ্য এই হইবে যে, আন্তর্জ্জাতিক বিবাহোৎপন্ন সন্তান সম্পত্তিতে অধিকার প্রাপ্ত হইলেও তাহার জাতিনির্ণয় কি প্রকারে হইবে? যাহাকে সৌধ্যমিক শাস্ত্র বা স্মৃতি বলা যায়;

এ রকম যত জাতি উৎপন্ন হইয়াছে, তাহারা উচ্চ নীচ পিতৃভেদে অনুলোম ও প্রতিলোম সংজ্ঞক জাতি বলিয়া সেই সব শাস্ত্রগ্রন্থে স্থান পাইয়াছে; এবং লোক বিশ্বাসেও এই ধারণা দৃঢ়ীভূত, ইহাতে সন্দেহ করা চলে না। কিন্তু ভাবিয়া দেখিলে এই সঙ্কর থিওরী ভিত্তিশূন্য। যদিও বহুকাল হইতে, সঙ্করবর্ণ বা জাতির কথা শুনা যাইতেছে, এমন কি, শ্রীকৃষ্ণ গীতায় "সঙ্করস্য চ কর্ত্তা স্যাম্‌" বলিয়া ভীত হইতেছেন, তথাচ আমরা বলিতে বাধ্য যে, সঙ্কর জাতি সম্বন্ধে যে শাস্ত্রোক্তি সকল দৃষ্ট হয়, তাহা সমালোচনা করিয়া দেখিলে বিশ্বাস-যোগ্য বোধ হয় না।

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি, পুরুষসূক্তের ১১।১২ ঋক্ দীর্ঘকালব্যাপক আর্য্যানার্য্যের যুদ্ধ পরম্পরায় মীমাংসাত্মিকা উদার নীতির অভিব্যক্তি মাত্র। ইহা দ্বারা গুণকর্ম্মানুসারে অনার্য্য বর্ণকে আর্য্য বর্ণের তুল্যতা প্রদানের প্রস্তাব হইয়াছিল; উক্ত ঋক্‌কে বেদের অন্যান্য অংশের সংযোগে বুঝিতে গেলে ইহাই বুঝিতে হয় যে, আর্য্য বর্ণের লোক শূদ্র হইতে পারে, দাস বর্ণের লোক ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য হইতে পারে। হইয়াছেও তাহাই। এজন্য ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, সকল শ্রেণীর লোকেই দ্বিবর্ণত্বের ভাব অদ্যাপি দৃষ্ট হইতেছে। যাহার চক্ষু আছে, সে একথা অস্বীকার করিতে পারে না।

এইরূপ আমরা শ্রোতৃবর্গকে জিজ্ঞাসা করিতেছি, পুরুষসূক্তের ৪ শ্রেণী প্রতিষ্ঠায় নীতি সূচিত হইবামাত্রই কি ভারতীয় জনসংখ্যা একেবারে চারি ভাগে বিভক্ত হইয়াছিল? ইহাও কি সম্ভবপর? এই যে মহাসমরান্তিক Self-determination নীতি সূচিত হইয়াছে, তাহা কার্য্যে পরিণত করা যেমন কাল সাপেক্ষ, সম্ভবতঃ কখনই সম্পূর্ণরূপে হইবে না এবং সম্পূর্ণরূপে কার্য্যে পরিণত করিতে গেলে, পুনর্ব্বারও সমর হইতে পারে; সেইরূপ উক্ত ১১।১২ ঋক্ সূচিত সমাজ প্রতিষ্ঠা এক দিনে হয় নাই ও বিনা রক্তপাতেও হয় নাই। কুরুক্ষেত্রের পূর্ব্ববর্ত্তী ব্রাহ্মণ সাহিত্যে প্রাধান্য লইয়া ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের মধ্যে এমন ঘাতপ্রতিঘাতের বর্ণনা পাওয়া যায় যে, একবিংশতিবার ক্ষত্রিয়কুল নির্ম্মূলের উপন্যাস বিবৃত আছে। আমরা মনে করি, এই ব্রাহ্মণ-প্রাধান্য স্থাপন জন্যই কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ হইয়াছিল। এই যুদ্ধের সময় যাঁহারা ব্রাহ্মণ-প্রাধান্য সমর্থন করিয়াছিলেন, তাঁহারাই পাণ্ডবপক্ষ; আর যাঁহারা করেন নাই, তাঁহারাই কৌরবপক্ষ। এই উভয় পক্ষের সৈন্যের অনুপাত ৭ : ১১। সুতরাং এ সময়েও অর্দ্ধাংশের অধিকতর জনসংখ্যা ৪টী শ্রেণীর অন্তর্গত হন নাই। তাঁহাদের পানাহার ও আদান প্রদান পূর্ব্ববৎ যথেচ্ছা ক্রমে চলিতেছে; আর যাঁহারা বাক্যতঃ শ্রেণীভেদ সমর্থন করিতেছিলেন, তাঁহারাও পানাহার ও যৌন সম্বন্ধ একেবারে স্থগিত করেন নাই; ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ে, ক্ষত্রিয়ে বৈশ্যে, বৈশ্যে শূদ্রে বিবাহ হইতেছে, কিন্তু তত্তৎ বিবাহজাত সন্তান পৃথক্ হইয়া নূতন গণ্ডী সৃষ্টি করিতেছে, মহাভারতের মৌলিকাংশ পাঠ উপলব্ধি হয় না।

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পর পানাহার ও যৌন সম্বন্ধ সঙ্কুচিত করিয়া উক্ত শ্রেণী চতুষ্টয় যখন ক্রমশঃ সম্যক্ স্বতন্ত্র জাতিতে পরিণত হইতে চলিয়াছিল, তদ্দৃষ্টান্তে সাধারণ জনসংখ্যা হইতে ঐরূপে পানাহার বর্জ্জিত ও আদান প্রদান রহিত ব্যবসায়ী শ্রেণী ও কুলগুলি

পৃথক্‌ভূত হইয়া দাঁড়াইতে লাগিল। ইহারাই কল্পসূত্রের সঙ্কর জাতি। উচ্চ নীচ পিতৃ মাতৃ-ভেদে যে অম্বষ্ঠ, সূত, উগ্র, চণ্ডাল, বেণ প্রভৃতি জাতি উৎপন্ন হইয়াছে, ইহা বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি জন্মে না। বর্ণান্তরই বল আর জাত্যন্তরই বল, এইরূপ বিবাহোৎপন্ন সন্তান যে জন্মিবা মাত্র পিতৃ মাতৃ ক্রোড় হইতে নীত হইয়া স্বতন্ত্র ভাবে প্রতিপালিত, আচরিত ও বিবাহিত হইতেছিল, কোন শাস্ত্রগ্রন্থেই তাহার উল্লেখ নাই। বর্ণান্তর বা জাত্যন্তর যৌন সম্বন্ধ জাত সন্তান পিতা মাতার একতর জাতিতেই সন্নিবিষ্ট হইত। যাহারা সঙ্কর বলিয়া নূতন জাতি বর্ণিত হইয়াছে, তাহারা ব্যবসায়াত্মক (trade guild) বা কুলাত্মক (race caste) জাতি মাত্র, যৌন সম্বন্ধের ফল নহে। জাত্যন্তর যৌন সম্বন্ধের ফল সর্ব্বত্রই সমান, তাহা ব্রাহ্মণে, ক্ষত্রিয়ে, বৈশ্য ও শূদ্রে যেমন স্ব স্ব জাতিতে মিশিয়াছে, সঙ্করেও সেইরূপ ঘটিয়াছে।

তবে তাহাদিগকে সঙ্কর বলা হইল কেন? সঙ্কর বলার কারণ এই যে, যে সময় সঙ্কর থিওরী উদ্ভাবিত হয়, সে সময়ে লোকবিশ্বাসে জাতিভেদ অর্থাৎ ৪টী মূল জাতি ব্রহ্মার ৪ অঙ্গ হইতে উৎপন্ন, এ বিশ্বাস দৃঢ় হইয়াছিল, সুতরাং পানাহার-আদান-প্রদান-রহিত যত নূতন সম্প্রদায় শাস্ত্রকারগণের নিকট স্ব স্ব জাতির উৎপত্তি জানিতে যাইত, তাঁহারা তাহা-দিগকে মূল ৪ জাতির সংশ্রবে সঙ্কর বলিয়া ব্যাখ্যা করিতেন। এই প্রকারে সঙ্কর জাতির সংখ্যা বসিষ্ঠ কল্পসূত্রে ১০টী, গৌতম কল্পসূত্রে ১২টী, বৌধায়ন কল্পসূত্রে ১৪টী এবং মনু-সংহিতায় ৩৮টী, কিন্তু ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণের সময় সঙ্কর জাতির সংখ্যা ১১০ হইয়াছে। অদ্যাপিও ইহার সংখ্যা শেষ হয় নাই।

দৃষ্টান্তস্থলে আমরা এই উপবিভাগের ৩টী জাতির উল্লেখ করিতেছি (১) নাগর, (২) ধানুক, (৩) চাঁই। ইহাদের সম্বন্ধে প্রবাদ এই,—

নাগর, ধানুক, চাঁই;
কোন জাতির মধ্যে নাই।

মুরসিদাবাদ, মালদহ, সন্তাল পরগণায় এই সকল জাতির লোক দেখা যায়। শুনি-য়াছি, ইহারা স্ব স্ব জাতি নির্ণয় করিবার জন্য টাকা লইয়া কাশী অঞ্চলের পণ্ডিতদিগের নিকট গিয়াছিল। তাঁহারা কি ব্যবস্থা দিয়াছেন, জানি না। যে ব্যবস্থাই তাঁহারা দিউন, সঙ্কর থিওরী ভিন্ন উপায় নাই, অমুক পিতা অমুক মাতা হইতে তুমি নাগর উৎপন্ন, সেইরূপ অমুক পিতা, অমুক মাতা হইতে তুমি ধানুক উৎপন্ন ইত্যাদি। কিন্তু এইরূপ পিতা মাতা নির্ণয় করিবার জন্য পণ্ডিত শ্রেণীর হাতে কি উপকরণ আছে? ইহাদের অভি-প্রায় অনুসারে একটা উৎপত্তি বিবরণ তাঁহারা বলিয়া দিবেন, এই মাত্র। সেই উৎপত্তি কাহিনী কি সত্যমূলক হইবে?

পুনশ্চ, শূদ্র পিতা, ব্রাহ্মণী মাতা হইতে গুহ বা চণ্ডাল জাতির উৎপত্তি। ইহাদের সংখ্যা বঙ্গে ২৩ লক্ষ। ইহাদিগকে এক্ষণে নমঃশূদ্র বলে। ইহারা প্রতিলোম জাতি, অনাচরণীয়। অনুলোম জাতিগুলি আচর-ণীয়। ইহারা আচরণীয় হইবার আকাঙ্ক্ষায় ব্রাহ্মণ পিতা শূদ্র মাতা হইতে উৎপন্ন জাতি বলিয়া ব্যাখ্যাত হইতে চাহে। কোন কোন পণ্ডিত ব্যাখ্যাও দিয়াছেন। কিন্তু জিজ্ঞাস্য এই, এই সকল পণ্ডিতেরা এই ২৩ লক্ষ লোকের পিতৃ মাতৃ বিপর্য্যয় জানিলেন কি প্রকারে? সেই প্রকারে মদ্গু নিষাদ পিতা আয়োগবী মাতা হইতে কৈবর্ত্তের

উৎপত্তি যে বর্ণিত আছে, তাহাদিগকে সেই ২৯ লক্ষ লোককে ক্ষত্রিয় পিতা বৈশ্য মাতা হইতে উৎপন্ন স্থির করিয়া মাহিষ্য বলিয়া ব্যাখ্যা করিবার জন্য ব্যবস্থাদাতা পণ্ডিতগণের হস্তে অধুনা কি উপকরণ আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে ?

ফলে এই সঙ্কর জাতিগুলি Self determination বা আত্ম ব্যাখ্যার ফল। ব্রহ্মার চতুরঙ্গ হইতে ৪ জাতির উদ্ভব স্থিরীকৃত হইয়া গেলে, যে জাতি যেরূপ যৌন সম্বন্ধ হইতে উৎপন্ন স্বীকার করিয়াছে,শাস্ত্রকারেরা তাহাকে সেইরূপই স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। এমন কি, কোন কোন জাতির বিভিন্ন স্থানে বাস হেতু, সেই সেই স্থানের স্থানীয় কারণ বশতঃ বিভিন্ন প্রকার আত্ম-ব্যাখ্যা দেখা যাইতেছে। যথা কায়স্থ, কোথাও ক্ষত্রিয়, কোথাও সঙ্কর, কোথাও শূদ্র ও কোথাও অন্ত্যজ বলিয়া ব্যাখ্যাত।

এইরূপ হওয়ার কারণ এই যে, পুরুষসূক্ত যাহাকে পুরাণে ব্রহ্মকায় বলে, পুরুষ সূক্তে যাহাকে সহস্রশীর্ষ যজ্ঞীয় পুরুষ বলা হইয়াছে, তাহা রচিত কালের পূর্ব্ববর্ত্তী আর্য্যানার্য্য মিশ্র জনসংখ্যা প্রথমতঃ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, চারিটী সম্প্রদায় স্খলিত হইলে,তৎপর যত সম্প্রদায় স্খলিত হইয়া স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করিয়াছে, সঙ্কর থিওরী অনুসারে তাহাদের উৎপত্তি ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। যৌন সম্বন্ধই যে সঙ্করোৎপত্তির কারণ, তাহা নহে। পেটেল বিল পাস হইলে, আন্তর্জাতিক বিবাহজাত সন্তানগণই আমাদের কথার সাক্ষ্য প্রদান করিবে। সারদা মঠের শঙ্করাচার্য্য-প্রমুখ পণ্ডিতমণ্ডলী এবং বিভিন্ন প্রাদেশিক প্রাচীন হিন্দু সমাজ, ইহা হইতে অনিষ্ট আশঙ্কা করিতেছেন বৃথা। বিশুদ্ধ হিন্দু ধর্ম্মের সহ এই বিলের উদ্দেশ্য অসমঞ্জস নহে। লোকাচারের সহ কতকটা অনৈক্য হইলেও, লোকাচার ত পরিবর্ত্তন স্রোতে গা ঢালিয়া দিয়াছে ; তাহা অধিকতর পরিবর্ত্তিত হইলে, ধর্ম্মে হস্তক্ষেপ করা হয় না।

জাত্যন্তর বিবাহ যে হইতেছে না, তাহা নহে। জঙ্গীপুর উপবিভাগের বেণিয়া গ্রাম অঞ্চলে কতকগুলি জাত্যন্তর বিবাহ হইতে একটী সম্প্রদায় উৎপন্ন হইয়াছে, তাহাকে 'ত্রিশা' বলে। আমার মনে হয়, ১৯০১ সনের সেন্সাস সময়ে আমি এই জাতিকে উক্ত নামে রেকর্ড করিয়াছিলাম। আমি তখন ঐ অঞ্চলের চার্জ্জ-সুপার-ইন্‌টেণ্ডেণ্ট। ব্রাহ্মণী মাতা, শূদ্র পিতা হইতে যে বঙ্গের ২৩ লক্ষ গুহ জাতির ব্যাখ্যা শুনা যায় ; ইহারা সেইরূপ একটী মাত্র সঙ্কর মিথুন হইতে উৎপন্ন হয় নাই। নানাবিধ সঙ্কর মিথুন যুক্ত হইয়া এক্ষণে একটী জাতি হইয়া পড়িয়াছে।

এক শ্রেণীর ব্যবসায়ী ব্রাহ্মণ নানা জাতীয় কন্যা লইয়া গিয়া দুঃস্থ ব্রাহ্মণের কাছে ব্রাহ্মণ কন্যা বলিয়া বিবাহ দেয়। নৌকায় নৌকায় তাহারা বিক্রেয় কন্যা লইয়া ঘুরিয়া বেড়ায়। এই কন্যাগুলিকে "ভরার মেয়ে" বলে। ইহাও জানা গিয়াছে, কোন কায়স্থ ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয় দিয়া ব্রাহ্মণ কন্যা বিবাহ করিয়াছে, এবং যশোহরে কোন নমঃশূদ্রও ব্রাহ্মণ কন্যা বিবাহ-করিয়াছিল। তজ্জন্য মোকদ্দমাও হইয়াছিল। এইরূপ যৌন সম্বন্ধ স্থাপন মিথ্যাবাদের সাহায্যেই চলিতেছে। পেটেল বিল পাস হইলে সমাজ এই মিথ্যাবাদ হইতে রক্ষা পায় ও ধর্ম্মের পথে অগ্রসর হয়।

বঙ্গে প্রায় ৩০টী জাতি জাত্যুন্নতি জন্য ব্যগ্র হইয়াছে। তন্মধ্যে কৈবর্ত্ত (২৯ লক্ষ)

নমঃশূদ্র (২৩ লক্ষ) ও কায়স্থ (১১ লক্ষ) বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইহারা যে অপেক্ষাকৃত উচ্চ জাতির রক্ত-সংশ্রবে আসিতে চাহে না, তাহা নহে। যে সব জাতির জনসংখ্যা কম এবং যাহাদের জনসংখ্যা বিক্ষিপ্ত হইয়া দূরবর্ত্তী জনপদবাসী হইয়াছে, তাহারা যে জাত্যন্তর বিবাহের বিরুদ্ধ, ইহা হইতেই পারে না। সুতরাং যাঁহারা বলিতেছেন, হিন্দু জাতির অধিকাংশ লোক পেটেল বিলের বিরুদ্ধ, তাঁহারা হিন্দুর সর্ব্বসাধারণের মত ব্যক্ত করিতেছেন না; আর যাঁহারা শাস্ত্রের দোহাই দেন, তাঁহারা এ কথা ভুলিয়া যান যে, বেদের মন্ত্রভাগ হইতে আরম্ভ করিয়া ধর্ম্মশাস্ত্রান্তর্গত রামসংহিতা পর্য্যন্ত (১১শ খ্রীষ্টীয় শতাব্দী) অর্থাৎ মোসলমান আগমনের সূত্রপাত পর্য্যন্ত চারি বেদ চৌদ্দ শাস্ত্রের কুত্রাপি জাত্যন্তর বিবাহ নিষিদ্ধ হয় নাই।

পুরাণ-ন্যায়-মীমাংসাধর্ম্মশাস্ত্রাঙ্গ মিশ্রিতাঃ।
বেদাঃ স্থানানি বিদ্যানাম্ ধর্ম্মস্যচ চতুর্দ্দশ॥

এই যে ৪ বেদ, ১৪ শাস্ত্র; ইহার কোথায় ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্রাদি ব্রহ্মকায়ের বিভিন্ন স্খলিতাংশগুলির মধ্যে যৌন সম্বন্ধ নিষিদ্ধ হইয়াছে?

তারপর একটা কলিকালের কথা আছে। সত্য, ত্রেতা, দ্বাপরে এইরূপ জাত্যন্তর বা বর্ণান্তর বিবাহ বিধেয় ছিল, কিন্তু কলিকালে তাহা হইতে পারে না। এও একটা আপত্তির কথা। কিন্তু কলিকালটা কি মোসলমান রাজত্বের সময়কে বলা হয়? সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলির বয়স এইরূপ পঞ্জিকায় দৃষ্ট হয়।

সত্য— ৩৪,৫৬০০০ বৎসর
ত্রেতা—১২,৯৬০০০ বৎসর
দ্বাপর— ৮,৬৪০০০ বৎসর
কলি— ৪,৩২০০০ বৎসর
৬৪,৮০০০০ বৎসর।

মন্ত্র সাহিত্যের সময় হইতে ব্যাসসংহিতার সংকলন সময় পর্য্যন্ত কিঞ্চিদূর্দ্ধ ৩০০০ বৎসরের অধিক হইবে না। বিপাশশুতুদ্র নদীর তীরবাসী সুদাস রাজার ঋত্বিক বিশ্বামিত্র ও বসিষ্ঠ, ত্রেতার রামচন্দ্রের সমসাময়িক; বিশ্বামিত্র, জমদগ্নি, ভরদ্বাজও সমসাময়িক; কেন না, ইহারা হরিশ্চন্দ্র রাজার একই যজ্ঞে চারিজন ঋত্বিক ছিলেন। পরশুরাম রাম-রাবণ যুদ্ধ দেখিয়াছেন, এবং কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের প্রাক্কাল পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন বলিয়া বর্ণনা পাওয়া যায়।

জামদগ্ন্য ইদং বাক্যমব্রবীৎ কুরুসংসদি
—মহাভারত।

কেহ বোধ হয় এক্ষণে আর বিশ্বাস করেন না যে, উক্ত যোদ্ধা ১৩ লক্ষ বৎসর জীবিত ছিলেন। ইহাদের কাহার ২য় পুরুষে, কাহার ৩য় পুরুষে, দ্বাপরান্তিক কুরুপাণ্ডব যুদ্ধ হইয়াছে। সুতরাং এই কলিকাল থিওরী অনেক বাদ দিয়া বুঝিতে হয়। কলিকালের আয়ু ত বৈদিক সময়ও ডিঙ্গাইয়া যায়, সে সময়ে ত ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র চারিটী শ্রেণীই উৎপন্ন হয় নাই, তখন মাত্র আর্য্যানার্য্য মিশ্রিত এক অখণ্ড প্রকাণ্ড স্বদেশী সমাজ, ইহা পুরুষসূক্তের পুরুষ ও পুরাণের ব্রহ্মকায়, এই সমাজস্থ লোককে কায়স্থ বলিলে, বলা যাইতে পারে। কেন না, তাহারা ব্রহ্মকায়েই সঙ্গত ছিল। কেন না ঐ ব্রহ্মকায়েই সব জাত্যাঙ্কুর বিলীন ছিল।

ফলে ৪ বর্ণের থিওরী, সঙ্কর থিওরী ও ৪ যুগের উক্তরূপ আয়ুষ্কাল থিওরী এক শ্রেণীর চিন্তাপ্রসূত। জাতিভেদের উৎপত্তি, গতি ও পরিণতি ভালমত পরীক্ষা করিলে, তাহা নির্দ্দোষ বোধ হয় না। আশ্চর্য্যের বিষয় এই, এক কলিকালের কথা, অর্থাৎ

মুসলমান সময়ের কথা বাদ দিলে ইহার কোথাও অসবর্ণ বা জাত্যন্তর বিবাহ নিষিদ্ধ হয় নাই। সময় সময় ইহা নিয়মিত হইয়াছে বটে, কিন্তু কখনই নিষিদ্ধ হয় নাই। পেটেল বিল ধর্ম্মবিরুদ্ধ প্রস্তাব নহে। হিন্দুধর্ম্ম রক্ষা করার প্রস্তাব।

আত্রেয়ী বিশ্ববরা এক মন্ত্রে বলিতেছেন,—

"বিবাহ সম্বন্ধানল কর দেব সুশৃংখল
নিজ বলে পরাভূত কর পরবল।"

সেই যে সুদূর অতীতে জ্ঞানবতী আত্রেয়ী বিশ্ববরা অনল (অগ্নিকে) সম্বোধন করিয়া যৌন সম্বন্ধ সুশৃঙ্খল করিতে প্রার্থনা করিতেছেন, আমরা এই ৪০০০ বৎসর পরেও সেই যৌন সম্বন্ধ সুশৃঙ্খল করিতে বলিতেছি। প্রত্যেক ব্যক্তির হৃদয়স্থ অনল যদি ইহা সমর্থন না করে, চেষ্টা বিফল হইবে। সুতরাং যে জাতি যত নিম্নে, সে জাতি তত ঊর্দ্ধ গমনের এই সুবিধা পরিত্যাগ করিবেন না; আবার যে জাতি যত ঊর্দ্ধে ও ক্ষয়শীল, সে জাতি ইহা প্রত্যাহার করিয়া দ্রুততর বেগে মৃত্যুর দিকে অগ্রসর হইবেন না। ইহাই আমার বিনীত নিবেদন। স্মরণ রাখিবেন, ৪০ বৎসর পূর্ব্বে যে লোকগণনা হইয়াছে, তাহাতে বঙ্গে মোসলমান অপেক্ষা হিন্দু ৪ লক্ষ বেশী ছিল, আর ৪০ বৎসর পরে লোকগণনায় হিন্দু অপেক্ষা মোসলমানেরা ৩০ লক্ষ অধিক হইয়াছে। বিবাহ সংস্কার যে অনাবশ্যক, এ কথা কেবল রুগ্ন, মৃত্যুকামী ব্যক্তির মুখেই সাজে।

আমরা এজন্য মিষ্টার পেটেল মহাশয়ের পাণ্ডুলিপি যাহাতে আইনে পরিণত হয়, তজ্জন্য সকলকে মত দিতে অনুরোধ করিতেছি।

শ্রীমধুসূদন সরকার।

শান্তিশতক।

(কবিবর শিহ্লন প্রণীত)

দিবানিশি দুই কূল করি' বিদারিত
করাল কালের স্রোতঃ বহে অনিবার,
এই স্রোতে একবার হইলে পতিত
না আছে আশ্রয় নাহি পথ ফিরিবার!
হায় রে এ সব আছে যা'দের বিদিত
তাহাদেরও মন হয় মোহ-কলুষিত! ৬০॥

বহুকাল ধরি' যদি ভুঞ্জ অর্থ ধন
একদিন তবু তাহা যাইবে নিশ্চয়,—
তাহার বিয়োগে তবে কি আছে এমন
স্ব-ইচ্ছায় যাহে মন না ছাড়ে বিষয়?
বিষয় আপনা হতে যদি চলি' যায়
ঘোর পরিতাপ মনে করে অধিকার,
স্বয়ং যদ্যপি কেহ ত্যাগ করে তা'য়
তাহার হৃদয়ে রাজে আনন্দ অপার! ৬১॥

এই ভবারণ্য ভীম, ওহে জনগণ,
দেহ-গৃহ শত ছিদ্র জানিও নিশ্চয়,
ভীষণ তস্কর কাল করয়ে ভ্রমণ,
মোহরাত্রি সদা হেথা অন্ধকারময়!
সন্ন্যাস ফলক যা'র হেন জ্ঞান-অসি,
শীল-বর্ম্ম অঙ্গে তব করিয়া ধারণ,
সুস্থির নয়ন করি' স্থিরভাবে বসি'
সমাহিত মনে সদা কর জাগরণ! ৬২॥

পার্শ্ববর্ত্তী গৃহে চোর প্রবেশ করিয়া
অল্পমাত্র ধন যদি করিলা হরণ,—
এ কথা শুনিলে লোক সতর্ক হইয়া
আপন নিলয় সদা করয়ে রক্ষণ।
শরীর-ভবন হ'তে করি' আকর্ষণ

প্রতিদিন কত নরে যেবা লয়ে যায়,
সেই যম নহে কিরে ভয়ের কারণ?
সাবধান—জাগো, জাগো—জন
সমুদায়! ৬৩ ॥

তোমরা আমার কেবা? আমি—
তোমাদের?
এ সংসার সীমাহীন নীরধির প্রায়!
উঠে, পড়ে কত হেথা উর্ম্মি কর্ম্মের,—
মিলিত আমরা তাহে ফেনপুঞ্জ প্রায়!
জগতের যাহা কিছু সকলি নশ্বর,—
তা'সবে কিহেতু চিত্ত দাও পুত্রগণ?
জগতের অন্তরাত্মা অনন্ত ঈশ্বর,—
সর্ব্ব কর্ম্ম সনে তাঁ'তে হও নিমগন! ৬৪ ॥

যেজন সুজন সেই কর্ণতৃপ্তিকর
বলুক বচন মোরা না হব মুদিত,—
বলুক, অথবা যেবা অসূয়া-তৎপর,
বিষময় বাক্য, মোরা না হব দুঃখিত!
যাহার প্রকৃতি যাহা করুক প্রকাশ
তাহে আমাদের নাহি চিন্তার কারণ,
যে কর্ম্মে ছিঁড়িবে ঘোর সংসারের পাশ,
সেই কর্ম্ম অনুষ্ঠিব মোরা অনুক্ষণ! ৬৫ ॥

মোর নিন্দা করি' যদি তুষ্ট কেহ হয়
অনায়াসে অনুগ্রহ লভিনু তাহার!
তুষিতে অপরে যা'র অভিলাষ হয়,
তাহার ক্লেশের কিবা আছে আর পার?
কত দুঃখে যেই ধন করয়ে অর্জ্জন
পরের সন্তোষ হেতু ত্যজে সেই
ধন! ৬৬ ॥

যদি কেহ বলে মোরে পরুষ বচন
তুষ্ট হই আমি পরি' ক্ষমা-অলঙ্কার,
—শোক কিন্তু হয় মোর মনে সেইক্ষণ
মোরই তরে ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিল
তাহার! ৬৭ ॥

মম অপরাধ-শুদ্ধি তরে যেই জন
নিজ ধর্ম্ম অবহেলি' করিলা যতন,
আমি যদি ক্ষমা নাহি করি সেই জনে
কৃতঘ্ন আমার মত রবে কি ভুবনে? ৬৮ ॥

আত্মতত্ত্ব মনে সদা করহ চিন্তন,
গৃহসুখ অভিলাষ কর পরিহার,
দূরে থাক পরিহরি' আত্মীয় স্বজন,
সুরশৈবলিনী তীরে কর বাস আর;—
ভিক্ষালব্ধ অন্নে কর উদর পোষণ,
সমুচিত পুণ্যকর্ম্ম করহ সঞ্চয়,
ধ্যান কর মনে সদা শ্রীবিষ্ণু চরণ
পরব্রহ্ম ভাবনায় হওরে তন্ময়! ৬৯ ॥

ক্ষমা কর সবে, শ্রুতি করহ অভ্যাস,
মনেরে নির্লোভ কর, গাও শিবনাম,
ধ্যানে মতি হোক্ ভিক্ষাধর্ম্মে অভিলাষ,
সংসার-আসক্তি হ'তে লভরে বিরাম;
একান্তে বসতি কর, নম গুরুগণে,
সত্যে প্রীতি কর, কর অনঙ্গে বিজিত,
যাপন কররে কাল সাধুগণ সনে—
তা'হলে মুক্তির পথে হ'বে
অবস্থিত! ৭০ ॥

বিষয়-আমিষ তুমি করেছ সেবন
অবসাদ আজি তাই এসেছে তোমার,
নিভিয়াছে জ্ঞানজ্যোতিঃ হৃদয়ে এখন
লভিবে কিরূপে এবে প্রসাদ আত্মার?
এ আমিষ হ'তে মন যাহে নিবর্ত্তয়
কর এবে সেই কর্ম্ম যতনে সাধন,
তা'হলে করিবে দগ্ধ তব দোষত্রয়
উদিয়া হৃদয়ে সেই জ্যোতিঃ
অনিন্ধন! ৭১ ॥

তত্ত্বকথা মানবের বুদ্ধি অগোচর,
সে নিগূঢ় কথা গুরু বুঝাতে না পারে,
—করুণাদি-গুণে যা'র পূরিত অন্তর
স্বয়ং তত্ত্ব উদে তা'র হৃদয়-মাঝারে! ৭২ ॥

ক্রমশঃ।

শ্রীহরিসত্য ভট্টাচার্য্য।

প্রথম বক্তৃতা।*

পূজনীয় ব্যক্তিগণ এবং প্রিয় গ্রামবাসীগণ,

আমার সভাপতির আসন গ্রহণ প্রস্তাব যে প্রকার করতালী দ্বারা সমর্থিত হইয়াছে, তাহাতে মনে হইতেছে, আমি গ্রাম-জননীর অযোগ্য সন্তান হইলেও আমার প্রতি আপনাদের যথেষ্ট অনুগ্রহ আছে। সকলেই জানেন, আমি গত ৩০ বৎসর ডাকঘরের শিকলে বাঁধা ছিলাম। আজ তিন দিন হইল, সে শিকল হইতে মুক্ত হইয়াছি এবং এক দিনও অন্যত্র অপেক্ষা না করিয়া বঙ্গবাসীর জননীরূপিণী কলিকাতা নগরী ত্যাগ করিয়া গ্রাম-জননীর ক্রোড়ে ছুটিয়া আসিয়াছি। সন্তান মাতার রূপ দেখে না, সে চায় মাতৃক্রোড় ও মাতৃস্তন্য। কাঙ্গালিনীর সন্তান যেমন সালঙ্কারা রাজরাণীর ক্রোড় উপেক্ষা করিয়া নিজ মাতার ক্রোড়েই যাইতে চাহে, আমিও সেইরূপ এক সপ্তাহের মধ্যে তাড়াতাড়ি এলাহাবাদ, কাশী ও কলিকাতা ছাড়িয়া কোঁড়কদী আসিয়া সুস্থির হইয়াছি। ৫ দিন পূর্ব্বে আমি কাশীতে ছিলাম। আত্মীয় বন্ধুগণ সকলেই বলিলেন, পেনসন লইবার পর কাশীবাসই শ্রেয়ঃ। একজন বন্ধু, যাঁহার চিরদিন ধর্ম্ম ধর্ম্ম করিয়া বেড়ান অভ্যাস, এবং যিনি পরকালের ভাবনায় অস্থির হইয়া আজ কাল নানা প্রকার পূজা আচ্চায় মন দিয়াছেন, বৃদ্ধ বয়সে গ্রামে যাওয়ার কথা শুনিয়া আশ্চর্য্য হইয়াছিলেন। আমি পারসীক কবি সাদীর কবিতা আওড়াইয়া তাঁহাকে বলিয়াছিলাম "আপনি কি পৃথিবীর সব কাজ ঠিক করিয়াছেন যে, আকাশের দিকে যেতে চাচ্চেন?" বলিয়াছিলাম—"যে বিশ্বই চিনিতে পারিল না এবং যে বিশ্বের কাজে লিপ্ত হইতে পারিলে জীবন সার্থক মনে করে, তাহার পক্ষে মুক্তির আশায় বিশ্বেশ্বরের পুরীতে পড়িয়া থাকা ঠিক কি?" সকলেই বলিলেন, গ্রামে যেতে চাচ্চেন যান, দুদিনে সখ মিটে যাবে। কাশীবাসী অন্তরঙ্গগণ, যাঁহারা এক সময়ে গ্রাম-জননীর উৎসাহী সন্তান ছিলেন, তাঁহারাও আশ্চর্য্য হইতেছিলেন যে, ৩০ বৎসর সহরে ইংরাজপ্রদত্ত সুখ সুবিধা ভোগ করিয়া কেন গ্রামে মরিতে যাইবার কল্পনা করিতেছি। উত্তরে বলিয়াছিলাম, গ্রাম-জননী যে রোগে, শোকে, অন্নাভাবে এবং বস্ত্রাভাবে ক্লিষ্ট, তাহা আমি খুব জানি এবং আরও জানি, তাঁহার অন্য সন্তান সন্ততিগণ কুলধর্ম্মরূপ পৈত্রিক সম্পত্তি হইতে আমাকে বঞ্চিত করিতেও ব্যস্ত; তথাপি আমি গ্রাম-জননীর ক্রোড়ে আশ্রয় লইতে চাই; কেন না, কুপুত্রের প্রতি মাতার স্নেহ অধিক, একথা চিরপ্রচলিত। আমার নিজের কথা বলিবার এ সময় নহে, আমার আশা ও আকাঙ্ক্ষার কথা ক্রমে বলিব।

গ্রামের লোকে কথায় কথায় বলে, "এ ঠাকুর রামচন্দ্রের মাটি, এ মাটিতে যে পা দেয়, সেই বুদ্ধিমান হইতে চায়"। সাহকুল (মুর্শিদাবাদ) ত্যাগ করিয়া ঠাকুর রামচন্দ্র কেন কোঁড়কদী আসিয়া বসতি করিয়াছিলেন, একথা স্বতঃই মনে হয়। তিনি দায়ে পড়িয়া স্বগ্রাম ছাড়িয়া আসিয়াছিলেন, না সুখ শান্তির আশায় এবং স্বচ্ছন্দে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ

* রামধন তর্কপঞ্চানন লাইব্রেরীর ইষ্টকনির্ম্মিত গৃহ প্রবেশোপলক্ষে বক্তৃতার সারমর্ম্ম।—১লা কার্ত্তিক, ১৩২৫।

হইবে মনে করিয়া, এই দূর দেশে আসিয়াছিলেন, তাহা বুঝা যায় না। আমার মতে শেষোক্ত কারণই সঙ্গত বলিয়া মনে হয়। কেহ বলেন, সীরাজদ্দোলার অত্যাচারের ভয়ে মুর্শিদাবাদের ভদ্রাসন ত্যাগ করিয়া আসিয়াছিলেন। এ কথা ঠিক নহে; কেন না, সিরাজদ্দোলার শাসন প্রতিষ্ঠিত হইবার বহু পূর্ব্বে যে গ্রাম স্থাপিত হইয়াছিল, তাহার প্রমাণ সহজে দেওয়া যায়। আমার বৃদ্ধ প্রপিতামহী "সতী" হইয়াছিলেন। সতীদাহ প্রথা ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দে রদ হয়। অনুসন্ধানে যতদূর জানিয়াছি, তাহাতে বুঝা যায় যে, সতীদাহ প্রথা রদ হইবার কিছু পূর্ব্বে আমার বৃদ্ধ পিতামহ, পূজনীয় রঘুনাথ লাহিড়ী মহাশয়, কাশীধামে দেহরক্ষা করেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৭০ বৎসর ধরিয়া লইলেও ১৭৫৮ খ্রীষ্টাব্দে বা তাহার কাছাকাছি তাঁহার জন্ম হইবার কথা। তিনি রামচরণ লাহিড়ী মহাশয়ের পৌত্র। রামচরণ, ঠাকুর রামচন্দ্রের প্রপৌত্রী সুমিত্রা দেবীকে বিবাহ করিয়া কোঁড়কদীতে আসিয়া বাস করেন। এই সমস্ত হিসাব ধরিয়া অনুমান করা যায় যে, ১৭০০ খ্রীষ্টাব্দের প্রথমে গ্রামের পত্তন হইয়া থাকিবে। কেহ কেহ বলেন, ঠাকুর রামচন্দ্র সংগ্রাম সার গুরু ছিলেন। সংগ্রাম সার কীর্ত্তি, মথুরাপুরের দেউল। তিনি ভূষণার সুবেদারের অধীনে সেনাপতি ছিলেন, এবং বাংলা দেশে বসতি করিয়া, বাঙ্গালী হইতে চাহিয়াছিলেন। প্রবাদ আছে যে, তিনি ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের জিজ্ঞাসা করেন যে, ব্রাহ্মণের পরেই আর কোন জাতির সম্মান বেশী। তাঁহারা বলিলেন, বৈদ্য জাতি। সংগ্রাম সা বলিয়া উঠিলেন "হাম্ বদ্দি হায়"। এই প্রবাদের মূল্য আছে কি না, জানি না, তবে "হাম বদ্দি" বলিয়া এদেশে যে এক শ্রেণীর বৈদ্য আছেন, তাহা সকলেই জানেন। সংগ্রাম সার সম্বন্ধে আমি কোন প্রমাণ সংগ্রহ করিতে পারি নাই। জনশ্রুতির উপর নির্ভর করিয়া এই কয়েকটী কথা বলিলাম।

গ্রীসের উন্নতির যুগে স্পার্টান-(Spartans)দের সম্বোধন করিয়া বলা হইত "You are born into a noble city; strive to be worthy of it"। আমিও আমার গ্রামবাসী যুবকবৃন্দকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছি যে, তাহাদের এ গ্রামে জন্ম হইয়াছে বলিয়া লজ্জিত হইবার কিছু নাই। তাহারা যেন পিতৃপুরুষদের গৌরবের কথা স্মরণ করেন, এবং নিজেরা মানুষ হইতে চেষ্টা করেন। যে দেশে যে পরিমাণে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করেন, সেই দেশ সেই পরিমাণে উন্নত বলিয়া খ্যাতিলাভ করে। কোন দেশেই মাটি ও জলের অভাব নাই, কিন্তু মানুষের মতন মানুষ না জন্মিলেই দেশ হীনাবস্থায় পতিত হয়। এখানে আমাদের বংশের একটী প্রবাদের উল্লেখ না করিয়া পারিতেছি না। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আমার বৃদ্ধ প্রপিতামহী "সতী" হইয়াছিলেন। বৃদ্ধারা তাঁহার কালী সাধনা ছিল বলিয়া বিশ্বাস করেন। তিনি যে ঘরে বাস করিয়া গিয়াছেন, ছোট বেলায় সেই ঘরে যাইতে আমাদের গা ছম্ ছম্ করিত, কেন না সকলেই বলিতেন, ঐ ঘর দেবীস্থান, এবং রাত্রে কাঁসর ঘণ্টার শব্দ হয়। আমার পিতামহ যখন গর্ভে, তখন তাঁহার গর্ভধারিণী বলিতেন যে, তাঁহার সেই গর্ভের সন্তান বংশ উজ্জ্বল করিবে। যখনই সত্য আঁকড়াইয়া ধরিতে ভয় হইয়াছে, তখনই সতী বাক্য আমাকে রক্ষা করিয়াছে। আমার পুত্র ও ভ্রাতুষ্পুত্রদের সতী বাক্য সর্ব্বদা স্মরণ

করাই এবং বলি, সতীর বংশধরদের অগ্নি পরীক্ষার ভয় করিতে নাই। গ্রামের সুখ সমৃদ্ধি হইয়াছিল, নীলের ব্যবসায়ে। এই ব্যবসা ১৭৯৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রথমে যশোহর জেলায় আরম্ভ হয়। রঘুনাথ লাহিড়ী মহাশয়ের সময়ে যে আমাদের নীলের কুঠি ছিল, তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দে নীল বিদ্রোহের সূত্রপাত হয়। সেই সময়ে ও তাহার পরবর্ত্তী সময়ে নীলকর সাহেবদের সহিত লাঠালাঠি করিয়া লাহিড়ী ও সান্ন্যালেরা কি প্রকারে নিজ নিজ কুঠিগুলি রক্ষা করিয়াছিলেন, সে কাহিনী শুনিয়া বাল্যে শরীর রোমাঞ্চিত হইত। গাঁড়াখোলার কুঠি লুঠ এবং স্বরূপ চাকীর বাড়ী লুঠের গল্প ছোট বেলায় শুনিয়া কতই না আমোদ অনুভব করিয়াছি। সে সময়ে এ দেশে আত্মবোধের অভাব হয় নাই, আত্মরক্ষার ভার চৌকীদারের ঘাড়ে দিয়া গ্রামবাসীগণ নিশ্চিন্ত মনে নিদ্রা যাইতে শেখে নাই। খুল্লতাত রাজকুমার লাহিড়ী মহাশয় লাঠি খেলায় কি প্রকার পারদর্শী ছিলেন, তাহা অনেকেই দেখিয়াছেন। নীলকর সাহেবদের সহিত সর্ব্বদা লাঠালাঠি করিতে হইত বলিয়া তাঁহাকে লাঠি খেলা শিখিতে হইয়াছিল। পদ্মলোচন সান্ন্যালের মহাভারত "পুঁথি" পাঠের সময়েই, যাহাতে নৌকায় রান্না করা ডাইল ঢালা হইয়াছিল, ত্রিলোচন সান্ন্যালের ১০৮ কালীপূজা, রাজকুমার লাহিড়ীর তুলা দান এবং শ্রীকান্ত লাহিড়ীর পিতৃ শ্রাদ্ধে রূপার দানসাগরের খ্যাতি এ অঞ্চলে আজও রহিয়া গিয়াছে। ইহারা যে এত খরচ পত্র করিতে পারিবেন, তাহার কারণ তাঁহারা নীলের ব্যবসা বুঝিয়াছিলেন। ব্যবসা বুদ্ধির অভাবেই লাহিড়ী সান্ন্যাল পাড়ার হতশ্রীর কারণ। কেরাণীগিরি করিয়া আর পূর্ব্ব সমৃদ্ধি লাভের উপায় নাই।

ঠাকুর রামচন্দ্রের বংশে যে সকল মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে পণ্ডিতাগ্রগণ্য রামধন তর্কপঞ্চাননের ন্যায় কেহই খ্যাতি অর্জ্জন করিতে পারেন নাই। সমসাময়িক পণ্ডিতদের মধ্যে তাঁহার পাণ্ডিত্যের প্রভাব কি পরিমাণে ছিল, তাহা বৃদ্ধদের অনেকেই অবগত আছেন। তাঁহার সময়ে "রামধন তর্কপঞ্চাননের কোঁকড়দী" বলিয়া এই গ্রাম প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। এই মহাপুরুষের নামে লাইব্রেরী স্থাপন সুচিন্তার পরিচয়, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। আজ যে মন্দির প্রতিষ্ঠা করা হইল, ইহাতে জ্ঞানের উৎস খুলিয়া যাইবে, এই আমার আশা এবং এই আশায় প্রণোদিত হইয়াই আজ মন্দিরের দ্বারোদ্‌ঘাটন করিতেছি। প্রিয়দর্শন * শিবকুমার বহু পরিশ্রমে বাংলার বিদ্যোৎসাহী ধনী বৃদ্ধের নিকট হইতে অর্থ সংগ্রহ করিয়া এই পাকা মন্দির সংস্থাপন করিলেন। সাধারণে মিলিত হওয়ার এই প্রকার হল গ্রামে কেন, সহরে হইলেও তাঁহার কৃতিত্ব ঘোষণা করিত। বর্ত্তমান সময়ে লাহিড়ীকুল-ধুরন্ধর বিনোদবিহারী গ্রামে হাই স্কুল সংস্থাপন করিয়া এবং ভট্টাচার্য্য-কুলোদ্ভব শিবকুমার এই লাইব্রেরী স্থাপন করিয়া যে অক্ষয় কীর্ত্তি স্থাপন করিলেন, তাহার তুলনা নাই। আশা করি, ইহাদের দৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত হইয়া আরও অনেকে দেশহিতকর বিষয়ে মন দিবেন এবং যাহাতে গ্রামের মঙ্গল হয়, প্রাণপণে তাহার চেষ্টা করিবেন।

শ্রীরাধিকামোহন লাহিড়ী।

---

* এই সভার কয়েক দিন পরেই পণ্ডিতপ্রবর শিবকুমার তর্কদর্শনতীর্থ বৃদ্ধ পিতা মাতা এবং আত্মীয় স্বজনকে শোকসাগরে ভাসাইয়া পরলোক গমন করিয়াছেন। তাঁহার মৃত্যুতে গ্রামের যে ক্ষতি হইল, তাহা পূরণ হইবার সম্ভাবনা দেখা যায় না।

পুরাতন লেখা। (১)

বৌদ্ধদর্শন।

"নাসতো বিদ্যতে ভাবঃ নাভাবো বিদ্যতে সতঃ"—যাহা সত্য, তাহা নিত্য—ছিল, আছে, থাকিবে। যাহা ছিল, কিন্তু নাই, আছে কিন্তু থাকিবে না—তাহা সত্য নহে। অসত্যের স্থায়িত্ব নাই, সত্যের অভাব নাই।

স্থাবর জঙ্গম সত্য নহে, বৃক্ষ লতা, আকাশ, পবন, গ্রহ, নক্ষত্র, সত্য নহে। দেহ প্রাণ সত্য নহে। সত্য কেবল দুঃখ—ত্রিবিধ দুঃখ; ভৌতিক, দৈবিক ও আধ্যাত্মিক। ত্রিবিধ দুঃখের অত্যন্ত বিনাশের নাম মোক্ষ বা নির্ব্বাণ।

দুই অনন্তের মধ্য বিন্দুর নাম জীবন—অনন্ত অতীত, অনন্ত ভবিষ্যৎ মধ্যে জীবন। পশ্চাতে অনন্ত মরুভূমি, সম্মুখে অনন্ত মরুভূমি, মধ্যে মরীচিময় বায়ুরাশি। পশ্চাতে অনন্ত নীল সাগর, সম্মুখে অসীম পয়োরাশি, মধ্যে সফেন তরঙ্গ, দুরধিগম্য, দুরবগাহ।

এই বায়ুক্ষেত্রে মানুষ নিরন্তর কল্পনার সহিত সংগ্রাম করে। শ্রান্ত, ক্লান্ত, ঘর্ম্মাক্ত-কলেবরে নিরন্তর যুদ্ধ চলিয়াছে—চলিয়াছে আপন মস্তিষ্কপ্রসূত কল্পনার সহিত। স্বপ্নে সুষুপ্ত, স্বপ্নকল্পিত রাক্ষসের সহিত সংগ্রামে চীৎকার করিতেছে, পলাইতেছে, পর্য্যুদস্ত হইতেছে। কল্পিত জয়লাভে কখন অট্টহাস্য করিতেছে। এইটুকু জীবনের প্রহসন, নতুবা সকলি শোকাবহ জীবন-নাটক, শোকান্ত-মরণে তাহার যবনিকাপাত।

আঁধারে সে কোয়াসার সহিত সংগ্রামে পর্য্যুদস্ত। নিবিড় অন্ধকারেও দৃষ্টি চলে—আলো আঁধারে অন্ধকার নিবিড় হয়। মরীচিকা না থাকিলে মরুক্ষেত্রে সহজে হরিণীর প্রাণান্ত ঘটে না। সুখের তড়িতালোকে অমানিশার আঁধার ভীষণতর হইয়া উঠে।

সুখ সকলেই চাহে, অথচ সুখ কিসে হয়, কেহ ভাবে না। জন্মজরামরণগত জীবনের দুঃখ নিত্য ঘটনা। নিত্যকে অনিত্য কল্পনা করিয়া, অনিত্য সুখের কল্পনায় সকলেই মুগ্ধ। দুঃখকে নিত্য করিয়া দুঃখের হস্ত হইতে মুক্তি লাভের জন্য কয়জন উপায় উদ্ভাবন করে? যে করে, সেও হৃদ্‌মন্দিরে কল্পনাদেবীর প্রতি ভক্তির আধিক্যে চিন্তার কঠোরতা কোমল করিয়া ফেলে।

দুঃখের নিত্যতা চক্ষু ঝলসিয়া দেয়। এজন্য বুঝিয়াও লোকে বুঝিতে চাহে না, একটা কল্পনা, একটা আশার আবরণে চক্ষু ঢাকিয়া রাখে। স্বর্গের আশা, ভবিষ্যতে ক্ষতিপূরণের আশা প্রকারান্তরে পার্থিব দুঃখের নিত্যতা প্রমাণ করে।

পার্থিব দুঃখের নিত্যতা স্বীকার করিয়া কিরূপে সে দুঃখের হ্রাস হইতে পারে, চিন্তা করা সকলের কর্ত্তব্য। শাক্যসিংহের বৌদ্ধদর্শন এই সমস্যার আলোচনা। য়ুরোপে সুপনার এই তথ্যের আলোচনা করিয়াছিলেন। শাক্যদর্শনে অতিমানুষী শক্তির পর্য্যালোচনা হয় নাই। সুপনার সে কথা ছাড়িয়া দিয়াছেন। শাক্য কর্ম্মফলে জীবভাগ্যের যাতনা আরোপ করিয়াছিলেন, সুপনার ইহাও অতিমানুষী বলিয়া উপেক্ষা করিয়াছিলেন। যাতনা হ্রাসের পন্থা উভয়েরই প্রায় এক।

জরামরণ-যাতনা জন্মগত—জন্ম কর্ম্মগত, কর্ম্ম বাসনাগত, বাসনা অবিদ্যাগত—সুতরাং অবিদ্যা, মোহ বা মায়ার বিনাশ হইলে যাতনার নির্ব্বাণ হয়, ইহাই বৌদ্ধদর্শন। এক তথাগত ভিন্ন জীবনে নির্ব্বাণ আর কেহ পায় নাই—ইহা বৌদ্ধেরা স্বীকার করেন।

সুতরাং জীবন-মুক্তি জগতে দুর্লভ। এজন্য সুপনার বলেন, যাতনার বিনাশ হয় না, হ্রাস হইতে পারে মাত্র।

ভাগ্যবল বা will পার্থিব দুঃখের কারণ। সুতরাং দুঃখ অদৃষ্টগত, নিত্য। লইব কিনা, ইহা ভাবিবার কাহারও অধিকার নাই। পরপ্রয়োগে সকলেই সমানভাবে দুঃখপীড়িত —জাতিভেদ নাই, উচ্চ নীচ নাই। এইটী সম্যক্ ধারণা হইলে সকলের প্রতি সহানুভূতি জন্মে। সহানুভূতি, অহঙ্কার বা স্বার্থপরতা হ্রাস করে, পরপ্রয়োজনে আত্মনিয়োজন একান্ত ইচ্ছা, সহানুভূতি, স্বার্থপরতার বিনাশ, Renunciation বা নিষ্কাশ, নিত্য দুঃখ হ্রাসের একমাত্র কারণ। শাক্যের দর্শনের উপর ধর্ম্ম স্থাপিত, এজন্য শাক্যকে দর্শনে যুক্তির তীব্রতা কমাইয়া কর্ম্মফল স্বীকার করিতে হইয়াছিল। ধর্ম্মপ্রচারক না হইয়া কেবল দর্শনকার হইলে এ কাণ্ডটুকু ঘটিত না, কিন্তু কোমত বা সুপনারের মত দর্শনকার শাক্যের শিষ্য-শ্রেণী মুষ্টিমেয় হইত। দর্শনমত কার্য্যে পরিণত করিতে কোমত ও সুপনারও বুদ্ধের জ্যোতি কমাইয়া শেষে রফা বন্দোবস্ত করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। কিন্তু সে এমনি মোটা রকম হইয়াছিল যে, না দর্শনে, না ধর্ম্মে তাহা প্রকৃষ্টতা লাভ করিয়াছে।

দর্শন বিচারে কর্ম্মফল নিত্য। নিত্য কর্ম্মফলের বিনাশ নাই। ইচ্ছার স্বাধীনতা নাই, মানুষ যাহা করে, তাহা সহস্র কারণের সমষ্টি ফল—অবশ্যম্ভাবী। "যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি" ইহাই দার্শনিক তথ্য। সত্যের তীক্ষ্ণতায় স্বর্গ নরক, যাগ যজ্ঞ সকলই ভস্ম হয়। শাক্য ইহা স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। কিন্তু শেষ রক্ষা করিতে পারেন নাই—উচ্ছৃঙ্খলতা নিবারণ আশায় তাঁহাকে ইহার পরিণাম ফল গোপন করিতে হইয়াছিল। সুপনার ইহার কুটিলতায় প্রবেশ করেন নাই। কিন্তু দুঃখের নিত্যত্ব স্বীকার করাতেই তিনি বিষম বিপন্ন হইয়াছিলেন। নিত্যের হ্রাস বৃদ্ধি নাই, স্বীকার করিতে সকলেই বাধ্য। কিন্তু সে স্বীকার্য্যের ভিতরে সংসারের প্রাণ—অন্ধকারের গভীরতায় জীব হাঁপাইয়া পড়ে। এজন্য তাঁহাকেও নিত্যের নিত্যতা গোপন করিয়া সংসারের উপযোগী রফা করিতে হইয়াছিল। "সাধকানাং হিতার্থায়" মনে পড়িলেই জ্ঞানের কঠোরতা কোমল হয়। সহানুভূতি, অসত্যবাদিতা ও অসত্য আচরণের প্রশ্রয় দিতে পারে, ফলের প্রকৃষ্টতায় উপায়ের হীনতা মন্তব্য বলিয়া স্বীকৃত হইতে পারে। ইহাকেই বলে অধিকারী ভেদে প্রচার। প্রচারকের সরলতা বিশ্বাস করিতে নাই। দেবগণই যেখানে চক্ষু আচ্ছাদন করেন, মনুষ্য মস্তক অবনত করিবে, আশ্চর্য্য কি? যে করে না, সে বুঝে নাই।

শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র রায়চৌধুরী।

সঙ্কলিকা।

(৫৪)

ইনফ্লুয়েঞ্জা এবার পৃথিবীর সকল গৃহকেই যেন শ্মশানে পরিণত করিয়াছে! সকল গৃহেই হাহাকার, সকলের মুখেই বিষাদের ছায়া!! এরূপ পৃথিবীব্যাপী মহামারীর কথা আর শুনা যায় নাই। বিধাতার কি ইচ্ছা, কে জানে!

এই মহামারী বঙ্গদেশের যে কি অনিষ্ট সাধন করিয়াছে, তাহা ব্যাখ্যাত হওয়ার নয়। শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ কর ও শ্রীযুক্ত অজিত-কুমার চক্রবর্ত্তীর ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা রোগে প্রাণ-ত্যাগে সকলের হৃদয়েই শেল বিদ্ধ করিয়াছে। শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ কর (R. G. Kar) বেলগেছিয়া মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠার জন্য যে প্রভূত পরিশ্রম করিয়া গিয়াছেন, তাহা অসাধারণ। পুণ্যশ্লোক ৺ব্যোমকেশ মুস্তাফী, শ্রীযুক্ত গৌরহরি সেন এবং শ্রীযুক্তা কৃষ্ণভাবিনী দাসের অদম্য নীরব সাধনাই তাহার তুলনার স্থল। রাধা-গোবিন্দ মিষ্টভাষী, অদম্য-কর্ম্মী, মহা চরিত্র-বান ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার স্থান আর পূরিত হইবে বলিয়া আশা নাই। বেল-গেছিয়া মেডিকেল কলেজ তাঁহার অক্ষয় কীর্ত্তি। বাঙ্গালা ভাষায় তিনি যে সকল মহা-মূল্য বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ লিখিয়াছেন,তাহা দ্বিতীয় কীর্ত্তি। বিধাতা তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারে শান্তিধারা বর্ষণ করুন।

শ্রীযুক্ত অজিতকুমার চক্রবর্ত্তী, ৺শ্রীচরণ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র। কোটালি-পাড়ার যে চারিজন ব্রাহ্মণকুল-তিলক চরিত্র-গুণে দেশের মুখ উজ্জ্বল করিয়াছেন, তন্মধ্যে শ্রীচরণ চক্রবর্ত্তী অন্ততর। বাঙ্গালা ভাষার শ্রীবৃদ্ধি-সাধনে শ্রীচরণ আজীবন কঠোর তপস্যা করিয়াছিলেন। তাঁহার অসাময়িক মৃত্যুর পর, পিতার মহা তপস্যার ফলে তাঁহার সুযোগ্য পুত্র, সাহিত্য-সেবায় মন প্রাণ উৎসর্গ করেন। বি-এ উত্তীর্ণ হইয়া তিনি সাহিত্য-সেবায় তাঁহার সকল শক্তি নিয়োগ করেন। রবীন্দ্র-বিশ্লেষণ তাঁহার জীবনের প্রধান ও মহান কার্য্য। এই কার্য্যে তিনি যে কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন, তাহা এ দেশ ভুলিবে না। এই কাজ করিতে করিতেই রবীন্দ্রের পিতৃদেবের জীবনের প্রতি তিনি আকৃষ্ট হন। নাম করা যাইতে পারে, "আত্মচরিত" ভিন্ন মহর্ষির এমন জীবন-চরিত সুদীর্ঘ কালেও প্রকাশিত হয় নাই, এজন্য তিনি ক্লেশ অনুভব করিতেন। তাঁহার কঠোর সাধনার ফলে মহর্ষির সুবিস্তীর্ণ, সুসংবদ্ধ, সুসংযত জীবনচরিত প্রকাশিত হয়। অজিতকুমারের তাহা অক্ষয় কীর্ত্তি। চরিত্র-সংশ্লেষণে তিনি যে কৃতিত্বের পরিচয় দিয়া গিয়াছেন, তাহা এদেশ কখনও ভুলিবে না। তিনি বাঙ্গালা ভাষায় বহু প্রবন্ধ ও আরো পুস্তক লিখিয়াছিলেন, কালে তাহারও বিশেষ আদর হইবে। অজিতকুমার যৌবনের প্রারম্ভ হইতে যে চরিত্রের সাধনা করিয়াছিলেন, তাহার পরিচয় পাইয়া আমরা সর্ব্বদা ঈশ্বরের নিকট তাঁহার মঙ্গল কামনা করিতাম। অজিতকুমার সর্ব্বপ্রকারে শ্রীচরণের মুখ উজ্জ্বল করিয়া গিয়াছেন। সবে তাঁহার সাহিত্য-জীবন আরম্ভ হইয়াছিল, জীবিত থাকিলে না জানি আরো কত অক্ষয় কীর্ত্তি রাখিয়া যাইতে পারিতেন। তাহা হইল না বলিয়া আমরা বড়ই দুঃখিত। কিন্তু তিনি যাহা করিয়া গিয়াছেন, তাহা যে কোন লেখকের মুখ উজ্জ্বল করিতে পারে। অজিতকুমার ফরিদপুর এবং বঙ্গদেশের মুখ উজ্জ্বল করিয়া গিয়াছেন। যত দিন বাঙ্গালা ভাষার আদর থাকিবে, তত দিন মহর্ষির জীবনচরিত আদৃত হইবে। বিধাতা তদীয় জননী, পত্নী ও ভ্রাতার হৃদয়ে শান্তি দিন।

(৫৫)

যুদ্ধের অবসানে, এই ভারতবর্ষে, দমন-নীতি চিরস্থায়ী করার জন্য রাউলাট কমি-সনের অনুপ্রাণনায় দুই খানি বিধিদন

বিল বড়লাট সভায় উপস্থিত করা হইয়াছে। একখানির বলে, সন্দেহজনক পুস্তক বা কাগজ কাহারও ঘরে থাকিলে, চিরকাল তাহার প্রতিবিধান করা চলিবে; দ্বিতীয় খানির চাতুর্য্যে যে-কেহকেই আবদ্ধ বা দেশান্তরিত করা যাইতে পারিবে। দেশীয় সদস্যগণের বিশেষ প্রতিবাদে দ্বিতীয়খানি ৩ বৎসর চলিবে বলা হইয়াছে। সকল গৃহীর সকল লাইব্রেরী যখন-তখন সার্চ্চ হইতে পারিবে। সংস্কার-আইনের প্রবর্ত্তনের প্রারম্ভেই এইরূপ আয়োজন হইতেছে। কোন্ দিকে বায়ু বহিতেছে, তাহা বুঝিতে আর কাহারও বাকী নাই। মডারেট নেতাগণ এখনও আশার স্বপ্ন দেখিতেছেন, ইহাই দুঃখের বিষয়। গান্ধি বলেন, দেশের আশা ভরসা সব বিসর্জ্জিত হইয়াছে। তিনি নিশ্চেষ্ট বাধা "প্যাসিভ রিজিসট্যান্সের" পক্ষপাতী হইয়াছেন, এবং সুরেন্দ্রনাথ অন্য দলে নাম দিয়াছেন। বিধাতা এদেশের সহায় হউন। আমাদের বলিবার কিছুই নাই।

(৫৬)

মহাত্মা তিলক বিলাতে মহা শক্তিশালী ভ্যালেণ্টাইন চিরোলের বিরুদ্ধে যে মানহানির মোকর্দ্দমা উপস্থিত করিয়াছিলেন, তাহা খরচাসহ ডিস্‌মিস্ হইয়াছে। এই সংবাদে ভারতের চতুর্দ্দিকে বিস্ময় উপস্থিত হইয়াছে। বিস্ময়ের কারণ কি? বায়ু কোন্ দিকে বহিতেছে, ইহাতে তাহারই পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। নরম দল তবু বিশ্বাসী!

(৫৭)

একসেস্-টেকস্-বিল লাটসভার সিলেক্ট কমিটীতে গিয়াছে। কাজ কর্ম্ম, ব্যবসা বাণিজ্যের অবস্থা যুদ্ধের ফলে এদেশে কিরূপ হইয়াছে, সকলেই জানেন। তদুপরি এই আয়োজন! কত কারবার যে ফেল হইবে, ধারণা করা যায় না। দেখিয়া শুনিয়া ঘোর বিষাদে ভারত নিমগ্ন হইয়াছে। সুখের বিষয়, আয়কর ১০০০৲ হইতে ২০০০৲ টাকায় উঠিয়াছে। অর্থাৎ ২০০০৲ টাকা আয় না হইলে কাহারও আয়কর ধরা হইবে না। কিন্তু কর ধরিবেন, সেই এসেসরগণ!!

(৫৮)

শ্রীযুক্ত পেটেলের নাম এদেশে অক্ষয় হইবে। তিনি একজন অসাধারণ দেশ-হিতৈষী ব্যক্তি। অসবর্ণ-বিবাহ-আইন পাশ হইলে ব্যভিচারের স্রোত কতক পরিমাণেও হ্রাস হইবে বলিয়া মনে করি। কোন কোন ব্যক্তি মনে করেন, বহুবিবাহ এই আইনে নিবারিত হইবে না। বহুবিবাহ ৺বিদ্যাসাগর মহাশয়ের চেষ্টাতেই এক প্রকার নির্ম্মূল হইয়াছে। এখন কোন্ সম্ভ্রান্ত পরিবারে বহুবিবাহ আছে, কেহ সে বিবরণ সংগ্রহ করিয়াছেন কি? এদেশে এখন বহুবিবাহ নাই বলিলেই হয়। অসাধারণ আইনজ্ঞ শ্রীযুক্ত রাসবিহারী ঘোষ-প্রমুখ ব্যক্তিগণ এই বিলের পক্ষাবলম্বন করিয়াছেন, ইহা বাঙ্গালার গৌরব। রায় শ্রীযুক্ত রাধিকামোহন লাহিড়ী বাহাদুর প্রভৃতি হিন্দু সমাজের মহা মহা ব্যক্তিগণ এ সম্বন্ধে বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন, ইহা বড়ই আনন্দের কথা। এই বিলের অনুকূলে প্রথমেই শ্রীযুক্ত শ্রীনাথ দত্ত মহাশয় নব্যভারতে আন্দোলন উত্থাপন করেন। এবারও দুটী প্রবন্ধ প্রকাশিত হইল। ইহা প্রকাশের জন্য অনেক প্রয়োজনীয় বিষয় রাখিয়া দিতে হইল। পাঠকগণকে এই দুটী প্রবন্ধ এবং ১৫ই ফাল্গুনের সঞ্জীবনীতে প্রকাশিত সংস্কৃত কলেজের শ্রীযুক্ত মুরলী বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের "অসবর্ণ বিবাহের বিরোধী যুক্তির বিচার"

সম্বন্ধীয় সুযুক্তিপূর্ণ শাস্ত্রসঙ্গত প্রবন্ধটী পাঠ করিতে অনুরোধ করি। বিধাতা সুবুদ্ধি দিন এবং এই আশুপ্রয়োজনীয় বিল আইনে পরিণত হউক।

(৫৯)

দেশের অবস্থা দিন দিনই শোচনীয় হইয়া উঠিতেছে। চতুর্দ্দিকে অন্ন বস্ত্রের হাহাকার উঠিয়াছে, দরিদ্রগণ এক-বেলাও আহারের সংস্থান করিতে পারিতেছে না; এবং অনেকেই অর্দ্ধ উলঙ্গবৎ রহিয়াছে। আমরা স্বচক্ষে দেশের নিম্নশ্রেণীর দুরবস্থা দেখিয়া মর্ম্মাহত হইতেছি। দেশব্যাপী দুর্ভিক্ষের করাল ছায়া বিস্তৃত হইতেছে, কে কাহাকে সাহায্য করিবে? গবর্ণমেণ্ট এ সময়ে মুক্তহস্ত না হইলে দেশ রক্ষার আর উপায় নাই। দেশের এই শোচনীয় অবস্থার দিনেও গান বাজনা, নৃত্য তামাসা চলিতেছে, ইহা ভাবিলে প্রাণ অস্থির হয়। কোথায় সহানুভূতি, কোথায় দরিদ্র-প্রেম, কোথায় মনুষ্যত্ব! হায় রে হায়!!

(৬০)

দরিদ্রদের আশা, এদেশের রামকৃষ্ণ-সেবা-আশ্রম। কিন্তু তাহা যেন মহা সমুদ্রের মধ্যে বারিবিন্দু। বিবেকানন্দ দরিদ্রনারায়ণ-সেবার যে মত প্রচার করিয়া গিয়াছেন, তাহার ফলে অসংখ্য ব্রহ্মচারী সেবা-ব্রত গ্রহণ করিয়া কত শত সহস্র লোকের যে জীবন-রক্ষা করিতেছেন, তাহার সংখ্যা নাই। বিধাতার আশীর্ব্বাদ এই আশ্রমে বর্ষিত হউক। দেশ-রক্ষার মহা পুণ্যের বলে এই সেবা-ব্রত এদেশে অক্ষয় হউক।

(৬১)

এবার বড়দিনের সময়ে দিল্লীনগরীতে জাতীয় মহাসমিতির অধিবেশন মহা সমারোহে হইয়া গিয়াছে। মডারেটদলের প্রাচীন নেতৃগণ অধিবেশনে উপস্থিত না হইলেও, বহু প্রতিনিধি উপস্থিত হইয়াছিলেন। শুনিয়াছি, এত প্রতিনিধি-সমাবেশ আর কখনও হয় নাই। আরো শুনিয়াছি, ভারতের পশ্চিমাঞ্চলে এবার যে উৎসাহ প্রকাশিত হইয়াছে, এরূপ আর কখনও হয় নাই। আরো শুনিয়াছি, মহাত্মা মদনমোহন মালব্য মহোদয়ের ন্যায় ধীর, স্থির, শান্ত, চরিত্রবান, নীরব সাধকের চেষ্টায় এবার কংগ্রেসের দলাদলি নির্ব্বাণ হইয়াছে। মদনমোহন এই ভারতের আদর্শ ব্যক্তি। তদীয় পুণ্যপূত জীবনের কাহিনী যত শুনা যায়, ততই ভাল লাগে। দলাদলিতে জাতীয় মহাসমিতি ক্ষত বিক্ষত হইতেছেন—পরস্পরের বিদ্বেষ, হিংসা, গালাগালি প্রচারে এদেশ অস্থির। এহেন সময়ে মালব্য মহাশয়ের নেতৃত্ব এদেশের সৌভাগ্য। তিনি যদি কংগ্রেসকে দলাদলির হস্ত হইতে রক্ষা করিতে পারেন, তাঁহার জীবন ধন্য হইবে—ভারতের মুখ উজ্জ্বল হইবে।

(৬২)

কলিকাতার অধীন কালীঘাটে (১৫৭ নং বাড়ীতে) শ্রীযুক্ত সি. আর. দাস মহাশয়ের সভাপতিত্বে এবং শ্রীযুক্ত ইন্দুভূষণ সেনের সম্পাদকতায় "ভারত-অরফানেজ ও রেসকু হোম" প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই কাজ অতি পবিত্র কাজ। শ্রীযুক্তা কৃষ্ণভাবিনী দাস, মহিলা শিক্ষার জন্য এবং শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ মৈত্র দরিদ্র-রক্ষাকল্পে যে নীরব সাধনা করিতেছেন, সি. আর. দাস এবং ইন্দুভূষণের এই কাজও সেইরূপ। বিধাতা এই পবিত্র কাজের সহায় হউন।

পুলিস কমিসনার সাধারণ-ব্রাহ্মসমাজের

সম্পাদক মহাশয়কে উদ্ধৃতা পতিতা-রমণীদের ভার গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিয়া, মহত্ত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন। দুঃখের বিষয়, তাহা কার্য্যে পরিণত হয় নাই। ব্রাহ্মসমাজে এজন্য যে সভা হইয়াছিল, তাহা অনেক কাজের ন্যায় পণ্ড হইয়া গিয়াছে। প্রস্তাব গৃহীত হইলেও, তাঁহারা "কেউটে" ধরিতে সাহস করেন নাই। কাজ বড় শক্ত। ৺প্রাণকৃষ্ণ দত্ত মহাশয়ের প্রতিষ্ঠিত অনাথা-শ্রমে কয়েকটী উদ্ধৃতা মহিলার ভার গ্রহণ করিয়া যেরূপ ক্লেশ পাইয়াছেন, তাহা বিশেষ চিন্তার বিষয়। শুনিয়াছি, একটী উদ্ধৃতা মহিলা অনাথ-আশ্রম হইতে প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করিয়া পলায়ন করিয়াছিলেন। এ সম্বন্ধে বাধা-শাসন প্রয়োজন। অবশেষে এ ভার অনাথাশ্রমের কমিটী পরিত্যাগ করিয়া প্রস্তাব করিয়াছেন, ৭ বৎসর বয়স অতিক্রম করিলে পুলিস-চালানী মেয়েদিগকে তাঁহারা আর আশ্রমে গ্রহণ করিবেন না। মহাত্মা সি. আর. দাস এবং ইন্দুভূষণ যদি ইহাতে কৃতকার্য্য হন, এদেশে নব-আদর্শ সংস্থাপিত হইবে। শুনিয়াছি, ব্রাহ্মসমাজ ভার না নেওয়ায় উদ্ধৃতা রমণীদিগকে স্যালভেসন-আর্ম্মিতে দেওয়া হইয়াছে। ব্রাহ্মসমাজ বক্তৃতা করিতে পারেন বটে, এরূপ কাজে কৃতকার্য্য হইবেন কেন? শ্রীযুক্তা কৃষ্ণভাবিনী দাসের অন্তঃপুর স্ত্রীশিক্ষা-ব্রত ও দ্বিজেন্দ্রনাথ মৈত্রের হিতসাধনার ভার যদি ব্রাহ্মসমাজ গ্রহণ করিতেন, জয় জয়কার হইত। যাহাতে লাভ নাই, সেরূপ কাজ ব্রাহ্মসমাজ করিবেন কেন? এজন্যই কি, ৺উমেশচন্দ্র-প্রতিষ্ঠিত মূক-বধির বিদ্যালয়ের ভার, ও ৺প্রাণকৃষ্ণ দত্তের প্রতিষ্ঠিত অনাথ-আশ্রমের ভার ব্রাহ্ম-সমাজ গ্রহণ করেন নাই?

(৬৩)

প্যারিস সন্ধি-সভায় পৃথিবীর শান্তি পরিচালনের জন্য জাতি-সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। চতুর্দ্দিকে ধার্ম্মিকপ্রবর উইলসনের জয় ঘোষিত হইতেছে। কিন্তু এমেরিকায় প্রশ্ন উঠিয়াছে, অক্ষত-শরীর এমেরিকা কেন জাতি-সঙ্ঘের আদেশে পরিচালিত হইবেন;—কেন য়ুরোপের ভ্রুকুটিতে চলিবে। উইলসনের বিচক্ষণতা, ইংলণ্ডের চাতুর্য্যের নিকট পরাভূত হইবে বলিয়া আশঙ্কা হইতেছে। যুদ্ধ-নেতাই কি সর্ব্বাপেক্ষা বুদ্ধিমান? শুনিতেছি, তাঁহার প্রস্তাবই চলিতেছে। পৃথিবী হতভম্ব।

প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

১৭। The Thirty-first Annual Report of the Lowis Jubilee Sanitarium, Darjeeling, 1917. এই আশ্রমের কার্য্য অতি সুন্দর এবং সুশৃঙ্খলার সহিত চলিতেছে। ইহা বাঙ্গালী কৃতিত্বের মহা গৌরব। ডাক্তার শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার পাল এবং সম্পাদক শ্রীযুক্ত হরিমোহন চন্দ্রের জয় জয়কার হউক। এই আশ্রমের দ্বারা কত লোকের যে উপকার হইতেছে, তাহার সংখ্যা নাই। এই আশ্রমের বিবরণ পড়িয়া আমরা সুখী হইলাম।

১৮। মনোরমার জীবন-চিত্র। দ্বিতীয় খণ্ড—মূল্য ১।০ (বাঁধান)। এই পুস্তকের প্রথম খণ্ড পাঠে আমরা যেমন আনন্দ লাভ করিয়াছিলাম, এই খণ্ড পাঠেও তেমনি আনন্দ লাভ করিলাম। মনোরমার স্বামীর

ইহা মহা-তপস্যার ফল। ইহাতে মনোরঞ্জনের জীবনের অনেক কথা প্রসঙ্গক্রমে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। তাহাতে মনোরঞ্জন বাবু কিছু সঙ্কুচিত হইয়াছেন। কিন্তু সঙ্কোচের কারণ কি? তিনি এই সঙ্কোচের আনুগত্যের জন্য যদি এ পুস্তক প্রকাশ না করিতেন, বাঙ্গালা-সাহিত্যের মহা অভাব থাকিয়া যাইত। মাতৃজাতির ধর্ম্মভাব এ দেশে চির-প্রসিদ্ধ। এই মাতৃজাতির গুণকীর্ত্তন অনেকের অসহ্য। মহানুভব মনোরঞ্জন যে মহা কাজ করিলেন, তাহার তুলনা নাই। এই জীবন-চরিত ধর্ম্মবিশ্বাসীদিগের জীবনের সম্বল হইবে। আমরা সাম্প্রদায়িকতা মানি না, সকল বিশ্বাসীদিগের ইহা যে আদরের জিনিস হইবে, সে বিষয়ে আমাদের সন্দেহ নাই। এই পুস্তকের অসংখ্য খণ্ড প্রচারিত হইলে আমরা আনন্দিত হইব।

১৯। অনুষ্ঠান-সঙ্গীত। দ্বিতীয় ভাগ। শ্রীকালীনাথ ঘোষ প্রণীত, মূল্য ।০। এই পুস্তকখানি প্রথম ভাগের উপসংহার। ইহা রসের খনি। ইহা শোকের উৎস, মহাপ্রাণতার উচ্ছ্বাস। এই পুস্তকে লেখকের সহৃদয়তা এবং মহা-ভাবের গভীর স্ফুরণ হইয়াছে।

২০। নূরনবী (সচিত্র) মোহাম্মদ এয়াকুব আলী চৌধুরী প্রণীত, মূল্য ১॥০। অতি সুন্দর লেখা। স্বদেশের গৌরব মুসলমানদিগের দ্বারা বাঙ্গালা ভাষার কিরূপ উপকার হইতেছে, এ পুস্তক তাহার নিদর্শন। যেমন সুন্দর লেখা, তেমনি রুচি, তেমনি ধর্ম্মভাব। পুস্তকখানি পড়িয়া বিমল আনন্দ পাইলাম।

২১। ভাষা ও সুর। শ্রীআশুতোষ মুখোপাধ্যায়, বি-এ প্রণীত, মূল্য ১৲। ইহা গীতি-কবিতা-সমষ্টি। এই পুস্তকের অনেক কবিতাতেই প্রকৃত কবিত্বের পরিচয় পাওয়া গিয়াছে।

২২। তপস্যা। শ্রীযতীন্দ্রমোহন সিংহ কবিরঞ্জন প্রণীত, মূল্য ॥০। এই পুস্তকে এই কয়েকটী বিষয় আছে। (১) বিশ্বামিত্রের তপস্যা, (২) ত্রিবিধ জীবন, (৩) জাতীয়তা ও বিশ্বমানবতা, (৪) শরতের প্রকাশ, (৫) উমার তপস্যা, (৬) সাহিত্যে মৌলিকতা, (৭) সর্ব্বানন্দের সিদ্ধিলাভ।

এই পুস্তকখানি বিশুদ্ধ ভাষায় লিখিত। বিষয়গুলি সুনির্ব্বাচিত। যতীন্দ্রমোহনের জীবনের তপস্যার যে নিগূঢ় তত্ত্ব প্রকটিত হইয়াছে, ইহাতে তাহারই অভিব্যক্তি হইয়াছে, তাহারই ছায়া পড়িয়াছে। যতীন্দ্রমোহনের লেখনীতে পুষ্পচন্দন বর্ষিত হউক।

২৩। মহাত্মা গান্ধী। শ্রীযোগেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রণীত, মূল্য ॥০। মহাত্মা গান্ধী এদেশের আদর্শ পুরুষ। এরূপ নিষ্কাম যোগী, নীরব দেশ-নায়ক এদেশে দ্বিতীয় আছে কি না, জানি না। গ্রন্থকার এই মহাপুরুষের জীবনাদর্শ বাঙ্গালা ভাষায় প্রকাশ করিয়া অতি মহৎ কার্য্য করিয়াছেন। জীবিত কালে কাহারও জীবনচরিত প্রকাশিত হয়, আমরা তাহা ভাল মনে করি না, কিন্তু এই সাধক সে নিয়মের অতীত। যখন কথার প্রচার এদেশে খুব হইতেছে, এবং প্রকৃত চরিত্র এবং কাজ ডুবিয়া যাইতেছে, তখন এমন আদর্শ লোকের সজীব কথা এদেশে নব যুগ আনয়ন করিতে পারে বলিয়া, গান্ধীর জীবন-কাহিনী প্রচারের আমরা পক্ষপাতী। গান্ধী এদেশের অপ্রতিদ্বন্দ্বী, অনন্যবিক, কিন্তু সর্ব্ব-স্বীকৃত নেতা। আমরা বর্ত্তমান যুগের সকল সম্প্রদায়কেই বলিয়া থাকি, যে সম্প্রদায়ের চরিত্র জাগিবে, সেই সম্প্রদায়ই এদেশের ভাবী নেতৃত্ব পাইবে। 'দ'লো ভাব জাগিলে চরিত্র জাগে না, বরং দল-মাহাত্ম্যে সকল দুষ্কৃতি ঢাকা পড়ে। যে চরিত্রে বড়, সে-ই সকলের বড়, যে দল চরিত্রের গৌরব করিতে

পারে, সেই দলই সকল সম্প্রদায়ের শ্রেষ্ঠ। গান্ধী-চরিত্রে দেবতা; যে ব্যক্তি প্রতিজ্ঞা করিয়া তাহা আজীবন প্রতিপালন করিতে পারে, "মদ্য মাংস ও রমণী স্পর্শ করিব না" তিনি আদর্শ পুরুষ। যিনি বলিতে পারেন, "প্রেমে বিদ্বেষকে জয় কর" তিনি নর-দেবতা। গান্ধী প্রেমে সকলকে জয় করিতেছেন। গান্ধীর উপদেশ "সত্য-গ্রহরূপ মহাস্ত্র তোমার সঙ্গে সতত রহিয়াছে, এই ভাব হৃদয়ে পোষণ কর।" "যে মরিতে ভয় করে, সে সত্যগ্রাহী হইতে পারে না।" "অহিংসা ত্যাগ করিও।" এই সকল উপদেশানুসারে তিনি জীবনকে নিয়মিত করিয়া জীবন-পথে শনৈঃ শনৈঃ নির্ভয়ে অগ্রসর হইতেছেন। পায়ে পাদুকা নাই, শরীরে বসন ভূষণের পারিপাট্য নাই, মুখে অধিক কথা নাই—এই নীরব সাধক কি ভারতে নবোত্থিত ম্যাট্‌সিনি? লাট সাহেব যাঁহার সন্দর্শনপ্রয়াসী, তিনি সামান্য মানুষ নহেন। যাঁহার কৃতিত্বে এই ভারত গৌরবান্বিত, তিনি কি স্তোভবাক্যে ভুলিবেন?

২৪। শোণিতাঞ্জলি। "ত্রিশূল" পত্রে প্রকাশিত, শ্রীযুক্ত রাজা শশিশেখরেশ্বর রায় বাহাদুরের লিখিত প্রস্তাব। মূল্য।০।

এই আর এক মহাত্মা, যিনি জীবনে, কথায় এবং কাজে একত্ব সাধন করিয়া জীবন-পথে অগ্রসর হইতেছেন। তিনি গঙ্গী-মাহাত্ম্যের মায়ায় সত্য-মহিমা-ঘোষণায় কখনও বিরত নহেন। তাঁহার সুসংযত উদার মতগুলি আমরা সর্ব্বদা আদরের সহিত পাঠ করিয়া থাকি। তাঁহার কথাগুলি যেন অমৃতের খনি।

কাশীতে অনেক দুষ্কার্য্য হইয়া থাকে, অনেক মহৎ কার্য্যও হইয়া থাকে। কিন্তু কাশীতে স্ত্রীশিক্ষার জন্য উৎসাহ প্রদর্শিত হয় না, ইহা বড়ই দুঃখের বিষয়। মহাত্মা শ্রীযুক্ত কিশোরীলাল সিকদারের বালিকা-বিদ্যালয় সাহায্য অভাবে মৃতবৎ—কাশীর ইহা বড়ই কলঙ্ক। হরপার্ব্বতীর মাহাত্ম্য-ঘোষণায় যে কাশী ব্যাপৃত, সেই কাশীতে মাতৃরূপিনী কুমারীদের সুশিক্ষার ব্যবস্থা নাই, ইহা বড়ই দুঃখের বিষয়। পুটিয়ার রাণী মাসিক ২৲ দিতেন, তাহাও বন্ধ হইয়াছে! রাজা শশিশেখরেশ্বর অনেক মহৎ কাজ করিয়া জীবনকে ধন্য করিতেছেন, তিনি কি কাশীর এই কলঙ্ক দূর করিতে পারেন না? এই অপ্রাসঙ্গিক কথা বলিবার উদ্দেশ্য এই—তিনি ত বাক্‌সংযত বীর, কার্য্যকে ও নিরপেক্ষতাকে জীবনের সম্বল করিয়াছেন, তিনি এই মহৎ কার্য্য করিয়া হর-পার্ব্বতী-ধামের মহা কলঙ্ক দূর করুন। যিনি কাউণ্ট টলষ্টয়, অগস্ত কোমৎ প্রভৃতির মহত্ত্ব ঘোষণায় তৎপর, তিনি এই মহৎ কাজ করুন, তবে বুঝিব, শোণিতাঞ্জলির উপদেশ রাশি সার্থক হইয়াছে। রাজার জীবনে মহা কার্য্যসমূহ সুফল প্রসব করুক।

২৫। ভক্ত-চরিতমালা। শ্রীশশিভূষণ বসু প্রণীত, মূল্য ২৲। এই পুস্তকে অদ্বৈতাচার্য্য, শ্রীচৈতন্য, নিত্যানন্দ, হরিদাস, রামানন্দ রায়, রূপ, সনাতন ও জীবগোস্বামী, রঘুনাথ দাস, শ্রীনিবাস আচার্য্য, নরোত্তম দাস, গোপাল ভট্ট ও প্রকাশানন্দ সরস্বতী, শঙ্করাচার্য্য, রামানুজ, মধ্বাচার্য্য, বল্লভাচার্য্য, ও নিম্বাদিত্য, তুকারাম, কবীর, নানক ও তুলসী দাসের জীবনব্যাপী তপস্যা ব্যাখ্যাত হইয়াছে। ভাষা প্রাঞ্জল, বিশুদ্ধ এবং সবল। শশিভূষণ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রচারক—স্থায়ী সাহিত্যের জন্য তিনি কঠোর তপস্যা করিতেছেন, ইহাতে আমরা বড়ই আনন্দিত। দ'লোভাব পরিহার করিয়া তিনি সত্য-ঘোষণায় ব্যাপৃত, ইহা এদেশের পরম সৌভাগ্য। ভক্তের জীবনে ভক্তি প্রকট মূর্ত্তিতে আবির্ভূত। এই গ্রন্থ এ সম্বন্ধে আদর্শ গ্রন্থ। গ্রন্থখানির সর্ব্বত্র আদর হইলে আমরা সুখী হইব।

২৬। নীল মাণিক। রায়সাহেব শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন কবিশেখর বি-এ প্রণীত। শ্রীযুক্ত জ্যোতিষচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় এই পুস্তকের বিস্তৃত সমালোচনা প্রেরণ করিয়াছেন। অনেক চেষ্টা করিয়াও এবার তাহা প্রকাশ করিতে পারিলাম না, আগামী বারে প্রকাশিত হইবে।

মাইকেল স্মৃতি-সভা

"আমি স্বখাদ সলিলে ডুবে মরি শ্যামা।—"

অদ্যকার সভায় আমার সেই দশা। কবিবর মাইকেল মধুসূদন দত্তের মৃত্যাহে প্রতিবৎসর লোয়ার সারকুলার রোডস্থিত সমাধিক্ষেত্রে স্মৃতি-সভার আয়োজন হইয়া আসিতেছে। কয়েক বৎসর হইতে আমাদের সুযোগ্য স্থায়ী সভাপতি, কবিভূষণ যোগীন্দ্রনাথ বসুর নিকট মাইকেল-ভক্তগণ আবেদন করিয়া আসিতেছিলেন যে, ভরা-বর্ষার দিনে খোলা সমাধিক্ষেত্রে স্মৃতি-সভা করা সকলের পক্ষে সুবিধাজনক হয় না। এ আবেদন আমার দ্বারাই প্রতিবৎসর দাখিল হইয়া আসিয়া এ বৎসর আমারই দুর্ভাগ্যক্রমে মঞ্জুর হইয়াছে।—যেমন ঘটে তেমনি ঘটিয়াছে; আমি আমারই সৃষ্ট সেই "আনার মাঝারে" পড়িয়া আজ বিপন্ন। "বৃষ্টি এল"—"বৃষ্টি এল" শব্দে "ছত্রধারী" সভাপতি, নিজ সঙ্কল্পিত বক্তৃতা শেষ করিবার পূর্ব্বেই, স্বর্গলোকের রামযাত্রার অমর নীলকমল—ওরফে "বাছা হনুমানের" স্থায়, রণাস্তে ঝটিতি বিশ্রামলাভের অবকাশ করিয়া লন। এ বৎসর সে ব্যবস্থা বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে। এই সুরম্য রামমোহন-স্মৃতিসৌধ-তলে মাইকেল স্মৃতি-সভা আশ্রয়লাভ করিয়াছে; অতএব সভাপতির উক্ত "অজুহতে" ঝটিতি সভাভঙ্গ করিয়া পলায়নের সে পন্থা রুদ্ধ হইয়াছে।

ভালই হইয়াছে। প্রাতে সমাধি-স্তম্ভের নিকট কবির প্রতি শ্রদ্ধা-নিদর্শন স্বরূপ কুসুমার্ঘ্য সমর্পিত হইয়াছে। বাবু প্রফুল্লনাথ ঠাকুরের মনোরম উদ্যানের সুরভি পুষ্পসম্ভার ভক্তগণের আনন্দ বর্দ্ধন করিয়াছে। কবির মৃত্যাহে অর্ঘ্যসৌরভ দিগ্‌দিগন্তে তাঁহার স্মৃতি-সৌরভ ছড়াইয়া যেন সাধারণের নিকট তাঁহার অমর কাহিনীর পুনঃ প্রচার করিয়াছে। এই সান্ধ্য-সমিতিতে মিলিত হইয়া কবির ভক্তগণ তাঁহার স্মৃতির প্রতি "বাচিক" সম্মান-প্রদর্শনের জন্য সমবেত। এ বরেণ্য সভার সভাপতিত্বে আহ্বান ও বরণ করিয়া আপনারা আমাকে নিতান্ত শ্লাঘা ও গৌরব-মণ্ডিত করিয়াছেন; তজ্জন্য আমি সভার কর্তৃপক্ষ ও সভ্যমণ্ডলীকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। সাহিত্য-সেবা আমার কপালে না ঘটিলেও আমি ও আমার বংশ চিরদিন সাহিত্যিক-সেবী এবং আমি শ্রীমধুসূদনের আজীবন অকৃত্রিম ভক্ত। এ গৌরবের আসনে অধিকারের আমার অপর কোন দাবি নাই।

যোগীন্দ্রবাবু স্বভাবসুলভ ও আবাল্য স্নেহবশে আমায় লিখিয়াছিলেন যে "আপনার বক্তৃতাই সভার প্রধান শ্রোতব্য বিষয় হইবে।" যথার্থই যদি তাহা হইত, সভার কার্য্য বহুপূর্ব্বেই শেষ হইতে পারিত; এ সভায় বলিবার মত নূতন তথ্য প্রচার আমার সাধ্যায়ত্ত নহে। যে স্থায়ী স্মৃতি-সভায় সভাপতি মাইকেলের অপূর্ব্ব জীবনচরিতকার স্বয়ং শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ এবং যাঁহার সম্পাদক উত্তর-চরিতকার শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ, সে সভা কর্তৃক আহূত বার্ষিক স্মৃতি-সভায় মাইকেল সম্বন্ধে নূতন কথার অবতারণা কোন সভাপতির পক্ষেই সম্ভব বোধ হয় না। আমার পক্ষে ত কোন মতেই নয়। যোগীন্দ্রবাবু আমার সনির্ব্বন্ধ আবেদনের উত্তরে জানাই-

য়াছেন যে, নূতন মশলা যোগান অসম্ভব। যাহা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব, আমার পক্ষে তাহা কখন কোন মতে সম্ভবপর হইতে পারে না। "যাহা নাই ভারতে, তাহা নাই ভারতে।" যোগীন্দ্র, নগেন্দ্র যে মাইকেল-তথ্য অবিবৃত রাখিয়াছেন, তাহা উদ্‌ঘাটন করার সাধ্য কাহারও নাই। আবর্জ্জনা সংগ্রহ করা যদি সম্ভবপর হয়, তাহার ফলে মাইকেলদ্বেষীগণের উপকার হইতে পারে। মাইকেলভক্তগণের তাহাতে আসিয়া যাইবে না।

স্থায়ী সভার সভাপতি ও সম্পাদকের মিলিত যত্ন, চেষ্টা ও লিপি-কৌশলে মাইকেলের পূর্ণজীবনী যদি প্রকাশিত হয়, তবেই বাস্তবিক সোণায় সোহাগা হইবে এবং এই স্মৃতিসভার অস্তিত্বের এবং কার্য্যকুশলতার পূর্ণ প্রমাণ পাওয়া যাইবে। প্রতীচ্যে এইরূপ সভাসমিতির চেষ্টা, সাহায্য ও উৎসাহে এই শ্রেণীর কার্য্যেরই প্রণোদন হয়। শুধু বক্তৃতা কিম্বা গানে ফুলে সভার কাজ শেষ হয় না। অনেক বরেণ্য কবির সার রত্নের আবিষ্কার ও উদ্ধার এইরূপে হইয়াছে।

কবির জীবন কবিই ব্যাখ্যা করিতে পারেন, বুঝিতে পারেন ও বুঝাইতে পারেন। কবিভূষণ যোগীন্দ্রনাথের মাইকেল-চরিতে অনেক স্থানেই পড়িয়াছি—এবং কথাটাও সত্য—যে কবির গ্রন্থই কবির জীবন। অসংযমী শ্রেষ্ঠ কবির অসংযত জীবনের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ সংযমী শ্রেষ্ঠ কবি দ্বারা "দুর্ব্যাখ্যা বিষমূর্চ্ছিত" না হইয়া যেন উজ্জ্বলতরই হইয়া উঠিয়াছে। কাঁচা সোণা সহজে সোহাগার আশ্রয় চায় না। তাই পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বে যখন যোগীন্দ্রনাথ পুণ্যভূমি—"দেবঘর"—বা "দেওঘরে" এই মহদনুষ্ঠানের আয়োজন করিয়াছিলেন, তখন অনেক মাল মশলা বাজে মনে করিয়াই হউক, আর গ্রন্থ-বিস্তৃতি ভয়েই হউক, ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। মাইকেলের অকৃত্রিম এবং আবাল্যসুহৃদ্‌ বাবু গৌরদাস বসাকের সুযোগ্য পুত্র শ্রীযুক্ত লালবিহারী বসাকের সৎসাহায্যে নগেন্দ্রনাথ সে সকল পরিত্যক্ত মশলার ক্রমশঃ সুব্যবস্থা করিয়াছেন। ইহা অবশ্য পরম সন্তোষের কথা। কিন্তু তাঁহার গবেষণা এখনও মাসিক পত্রের কবলে। কবে যে তাহা সে কবলমুক্ত হইবে, এখনও তাহার স্থিরতা নাই। সে যাহা হউক, যোগীন্দ্র ও নগেন্দ্রের মিলিত চেষ্টায় যে উপাদান সংগৃহীত হইয়াছে, তাহা যথাসম্বদ্ধ আকারে লোকের নয়নগোচর হওয়ার প্রয়োজন। প্রতীচ্যের জীবনী লেখকেরা এ বিষয়ে অনেক অগ্রসর হইয়াছেন। আমাদের দেশেও ক্রমশঃ সে চেষ্টা পরিস্ফুট হইতেছে। যোগীন্দ্র বাবু যখন প্রথম মাইকেল জীবনী প্রকাশ করেন, তখন এ শ্রেণীর সাহিত্য নিতান্ত বিরল ছিল।

আমি যে সমবেত চেষ্টার কথার ইঙ্গিত করিতেছি, তৎসম্বন্ধেও সংযম এবং সুবিবেচনার প্রয়োজন আছে। স্থায়ী স্মৃতি-সভার সভাপতি ও সম্পাদককে এখন সকল দিক বুঝিয়া কাজ করিতে হইবে। এ শুভ সংযোগের ব্যবস্থা করিবার জন্য তাঁহাদিগকে আমার আজ প্রথম আমন্ত্রণ।

এই আমন্ত্রণের সময় আমাকে বলিতে হইতেছে যে, যোগীন্দ্র বাবু আমার সতীর্থ হইলেও শৈশব হইতেই তিনি প্রৌঢ়। এক এক জনের রোগ আছে যে, তরুণাবস্থায় তিনি প্রৌঢ়ের অধিকার লাভে সচেষ্ট হন; কাহারও কাহারও রোগ প্রৌঢ়ে তারুণ্যের অভিনয় করা। প্রথম রোগটা যোগীন্দ্রনাথের বেশই ছিল। তাহার প্রমাণ স্বরূপ আমি বলিতে

পারি যে, তীর্থদর্শন-ব্যপদেশে যখন রাজনারায়ণ বাবুর দরবারে আমরা হেয়ার, রিচার্ডসন, ডিরোজিও, বেথুন, মাইকেল, রামতনু, রামগোপাল, দক্ষিণারঞ্জন, প্রসন্নকুমার, কৃষ্ণ বন্দ্যো, ও রসিকলাল প্রভৃতির গল্পমাত্র শুনিয়াই সন্তুষ্ট থাকিতাম, যোগীন্দ্রবাবু তখন মাইকেলের অপূর্ব্ব জীবনীর উপাদানসংগ্রহে ব্যস্ত। আর, নিশীথে না হউক, ঘন সন্ধ্যার নিবিড় আঁধারে রাজনারায়ণ বাবুর পুত্র যখন ভৃত্য সমভিব্যাহারে লণ্ঠন লইয়া "প্রাত-ভ্রমণে" বাহির হইতেন, তখন আমাদের সহিত আলোচনাচ্ছলে সেই সকল উপাদানের পুনরাবৃত্তি করিতেন।

সে সকল স্নিগ্ধ প্রীতিদীপ্ত সান্ধ্য আলোচনার কথা কখন ভুলিব না। অনেকের সাহিত্যানুরাগ, চরিত্রানুরাগ, ধর্ম্মানুরাগ, ও দেশানুরাগ রাজনারায়ণ বাবুর এই দরবারে জন্মলাভ করে। যোগীন্দ্রনাথের মাইকেল জীবনী সে সকল জল্পনার স্থায়ী কীর্ত্তি। তাঁহার প্রতিভা সে কীর্ত্তির গৌরব বাড়াইয়াছে। তখন বালেনণ্টাইন জামিরে ডুবালের জীবন-চরিত মাত্র আমাদের মহামন্ত্র ছিল। নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ভয়ে ভয়ে রামমোহন রায়ের এক নাতিবিস্তৃত জীবনী কিছু পরে প্রকাশ করিয়াছিলেন। আধুনিক প্রচলনানুসারে জীবন-চরিত-প্রণালী তখনও জনসাধারণের গ্রহণীয় হয় নাই। "সূক্ষ্ম সমালোচকের খুটি-নাটি" লইয়া নাড়া-চাড়া তখনও চলতি হয় নাই। অতএব সহজ-প্রাপ্য অনেক মসলা যোগীন্দ্রবাবুকে ভয়ে ভয়ে ত্যাগ করিতে হইয়াছিল। তাই আজকার বাজারে বহুমূল্য অনেক মসলা নষ্ট হইয়া গিয়াছে। এখনও যাহা আছে, তাহা যথেষ্ট না হইলেও প্রচুর। অতএব উভয় জীবনীকারের মিলিত যত্নে তাহার সংরক্ষণ প্রয়োজনীয়। বর্ষে বর্ষে মাইকেল-স্মৃতি-সভায় এবং বর্ষমধ্যে মাসিক পত্রিকায় কবির সম্বন্ধে অনেক প্রয়োজনীয় তথ্য প্রকাশিত হইয়াছে। তাহার একীকরণ এবং যথাস্থানে সংস্থাপন একান্ত বাঞ্ছনীয়।

আজকাল তাপসশ্রেষ্ঠ মহারাজ বালানন্দের দর্শনলালসা অনেক দেওঘর-যাত্রীকে "রামনিবাস" কিম্বা "তপোবনের" দিকে আকর্ষণ করে। "সেকাল—একালের" ঋষি রাজনারায়ণ বাবুকে দর্শনের আকাঙ্ক্ষাও তখন অনেককে দেওঘরে "বড়াল বাঙ্গলার" দিকে লইয়া যাইত। রাজনারায়ণ বাবুর সমসাময়িক অনেকের পান ভোজনের বিলক্ষণ অসংযম ছিল। অনেকের পক্ষে "সৌ কর্ত্তব্যৌ" ছিল। সে বিষয়ে যদিও রাজনারায়ণ বাবু স্বয়ং আংশিক ভুক্তভোগী ছিলেন, লোকশিক্ষাকল্পে কিন্তু সে যুগের অনেক রহস্যময় কাহিনী তিনি বিবৃত করিতেন। একজন পল্লীবিলাসী কলিকাতায় আসিয়া খাটের বাজু আঁকড়াইয়া ধরিয়া বমন করিতে করিতে নিত্য কিরূপে "পণির অভ্যাস" করিতেন, অন্য আর একজন পল্লীবিলাসী উইলসন্ হোটেলে গিয়া কিরূপে খানসামাদিগকে তারস্বরে বলিতেন—"ও খানসামা—খানসামা, আমায় আর একটু গোরু দাও ত", সে সকল "কেচ্ছা" রাজনারায়ণ বাবু অকপটচিত্তে বলিয়া নিজ যুগের প্রায়শ্চিত্ত এবং শ্রাতৃবর্গের উপকার সাধনের চেষ্টা সতত করিতেন।

কিন্তু এমন কথা কখনও তাঁহার নিকট বা দায়িত্বজ্ঞানী অপর কাহারও নিকট শুনি নাই যে, মধুসূদন বাণীসেবার অঙ্গীভূত বা অঙ্গ নিতান্ত প্রয়োজন ব্যপদেশে প্রথম মকারের চূড়ান্ত সাধন করিতেন। যাহা করিতেন,

তাহা ভাগ্যদোষে, স্বভাব দোষে। "মদ না খাইলে কবিত্বের স্ফূর্ত্তি হয় না"—ইষ্টদেবী চরণে এ কলঙ্ক-কালিমা মাইকেল স্বতঃপরতঃ কখন অর্পণ করেন নাই।

এ কথা এখন বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিবার বিশেষ প্রয়োজন আছে। সাহিত্যের দায়িত্বের কথা অনেকে এখন ভূয়িষ্ঠ প্রণিধান করেন না। যাঁহারা করেন, তাঁহাদের অনেকে সে কথা মনে করেন না। অথবা মনে করিয়া কাজ করেন না—এমন কথা মনে করা যাইতে পারে। অনেকের ধারণা, বিলাত যাইতে কিম্বা বিলাতে বাস করিতে হইলে মদ খাওয়া নিতান্ত প্রয়োজনীয়। এ কথার অসারতা আমার "ইউরোপে তিন মাস" প্রবন্ধে প্রতিপন্ন করিতে যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছি। আবার এক শ্রেণীর লোকের ধারণা যে সাহিত্য-চর্চ্চা, অন্ততঃ কবিত্ব সৃষ্টির জন্য সুরাসেবা নিতান্ত অপরিহার্য্য। একথা নিতান্ত ঘৃণ্য। তাঁহাদের ও দেশের দুর্ভাগ্য-ক্রমে যে সকল শক্তিশালী লেখক সুরাদাসত্ব স্বীকার করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে কেহ স্বকীয় অসংযম লইয়া আস্ফালন বা গর্ব্ব করেন নাই। বরং স্বীয় চরিত্রহীনতার জন্য নিজের সম্মুখে সতত নত-মস্তক থাকিতেন। কথাটা মাইকেলের জীবনী আলোচনা সম্বন্ধে একটু পরিষ্কার করিয়া বুঝিতে চাই।

অনেকের ধারণা যে, সুরা সেবন না করিলে মধুসূদন একছত্র কবিতা বা গদ্য লিখিতে পারিতেন না, এবং গেলাস, বোতল ও সংস্কৃত অভিধান তাঁহার লিখিবার প্রধান সরঞ্জাম ছিল। একথা বহু দিনের ধারণাসঙ্গত হইলেও অমূলক। সুকবি রসময় লাহা এ বিষয়ে মধুসূদনের এক পত্রের প্রতি আমার মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছেন। তাহাই অবলম্বন করিয়া আমি এ বিষয়ের আলোচনা করিতে চাই। নানা কারণে সে আলোচনা এখন সময়ের নিতান্ত উপযোগী। পত্রখানি যদিও কবির প্রকাশিত জীবনীর অন্তর্গত, কেন জানি না, অনেকে সে পত্রের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত ভুলিয়া গিয়া মাইকেল প্রতিভায় অযথা কলঙ্কারোপের সহায়তা করিয়াছেন। হাল ফ্যাসন মত আমি "চূণকাম" করার ব্যবসায় খুসি নাই। সিরাজ্‌উদ্দৌলা পরম ধার্ম্মিক, নীরোর ন্যায় লোকহিতৈষী সম্রাট শ্রীরামচন্দ্রের পর আর জন্মগ্রহণ করেন নাই, কিম্বা মাইকেলের নৈতিক অধঃপতন তাঁহার ও দেশের দারুণ মনস্তাপের কারণ হয় নাই, ইহা আমার প্রতিপাদ্য নহে। তবে যাহা ঘটিয়াছে, তাহা দেশের ও কবির ভাগ্যদোষে, কবির উচ্ছৃঙ্খল স্বভাব দোষে; কলা, সাহিত্য বা আর্টের পুষ্টিসাধন উদ্দেশে নয়। তাহাতে কলা, সাহিত্য এবং আর্টের পুষ্টি সাধিত না হইয়া বিশেষ ভাবে হ্রাসই হইয়াছিল।

১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ই জুলাই তারিখে মধুসূদন রাজনারায়ণ বসু মহাশয়কে একখানি ইংরাজী পত্র লেখেন; তাহাতে এই কথা পাওয়া যায়—

"Talking about wine and all vicious indulgences, though by no means a saint and teetotal prude, I never drink when engaged in writing ;, for if I do, I can never manage to put two ideas together. There is not a line in Tillottoma written under tne inspiration of even such a mild thing as a glass of sherry or beer".

সুরাপান ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক দুর্নীতি

নিবারণ কল্পে যাঁহারা প্রাণপাত করিতেছেন, ইহা তাঁহাদের পক্ষে বিশেষ আশার বাণী। তিলোত্তমা মদ্যপের লেখনীপ্রসূত হইলেও মদোন্মত্তের রচনা নহে—ইহা আশ্বাসের কথা। সনাতন হিন্দু ভাবে অনুপ্রাণিত, খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বী, (মেঘনাদবধ-ব্রজাঙ্গনা-বীরাঙ্গনার রচয়িতা মদের মুখে যা' তা' বলেন নাই ইহাও আশ্বাসের কথা। "একেই কি বলে সভ্যতা", এবং "বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ," দুর্নীতি-দমনের আন্তরিক চেষ্টার প্রমাণ, একথা স্মরণ করিয়া দুঃখিত অথচ কৃতজ্ঞচিত্তে রচয়িতার নৈতিক দৌর্ব্বল্যের আংশিক ক্ষমা সংস্থান চেষ্টা নিতান্ত বিচিত্র নহে। যত ক্ষীণ চরিত্রই হউন, মাইকেল যে নিমচাঁদের মূল আদর্শ নহেন, একথা এখন সর্ব্বত্র গ্রাহ্য। দীনবন্ধু, মধুসূদনের স্নেহপাশে বদ্ধ ছিলেন। সহস্র অসংযম সত্ত্বেও মাইকেলকে নিজ প্রতিভাবলে চিরদিনের জন্য হাস্যাস্পদ ও লোকচক্ষে কৃপাপাত্র করিয়া রাখা দীনবন্ধুর ন্যায় মহাপ্রাণ কবির পক্ষে সম্ভবপর নহে।) বঙ্কিমচন্দ্র স্বয়ং বলিয়া গিয়াছেন, তোতারাম ভাট দীনবন্ধুর সাহিত্য-জীবনের একমাত্র কলঙ্ক। নিমচাঁদ সৃজনে সে কলঙ্ক-কালিমা কবির জীবন নিবিড় ভাবে স্পর্শ করিলে, বঙ্কিমচন্দ্র কদাপি তাহা ক্ষমা করিতেন না।

দীনবন্ধুর মাইকেলের প্রতি অনুরাগ সুরধনীকাব্যে কথঞ্চিৎ প্রকাশিত :—

মহাকবি মাইকেল গাম্ভীর্য্যমণ্ডিত
প্রবল কবিতাস্রোত বেগে প্রবাহিত,
রত্নোদ্দেশে শব্দসিন্ধু করিয়া মন্থন
অমিত্রাক্ষরের সুধা করেছে অর্পণ,
'তিলোত্তমা' 'মেঘনাদ' কাব্য চমৎকার
"ব্রজাঙ্গনা" কাব্যে বাজে মধুর সেতার।

"গাম্ভীর্য্যমণ্ডিত" মহাকবিকে লইয়া বাঁদর নাচান দীনবন্ধুর ন্যায় মহাকবি ও মহাপ্রাণের অযোগ্য ও অসম্ভব। নিমচাঁদ কোন ব্যক্তি বিশেষকে লক্ষ্য করিয়া সৃষ্ট হয় নাই সাময়িক যাবতীয় নিম একত্র বাটিয়া ছাঁকিয়া এই অপূর্ব্ব চাঁদের সৃষ্টি হইয়াছিল। বঙ্গ নাট্য জগতে ইহাকে তিলোত্তমা বলিলেও বলা যায়।

একবার কোন অনুসন্ধিৎসু দীনবন্ধুকে নিমচাঁদের সনাক্তি উপলক্ষে মাইকেলকে কাটগড়ায় হাজির করাতে দীনবন্ধু বলিয়াছিলেন, "মধু কি কখন নিম হয়" ?

সকল কথার উত্তর এইখানে হইয়া গেল। কবির সৃষ্ট চরিত্রাবলীর মধ্যে তোমারই বর্ণনা মধ্যে তোমারে খুঁজিয়া দেখি—চেষ্টা অধুনা সম্মত উচ্চ সমালোচনা High criticismএর অন্তর্ভুক্ত। কোথাও কোথাও সনাক্তি কঠিন না হইলেও হইতে পারে। সেকসপীয়র ঘুষজীবী, কি মসীজীবী, কি ব্যবহারাজীবী ছিলেন, ইহার আলোচনা শেষ হয় নাই—শীঘ্র হইবার সম্ভাবনাও নাই। প্রাচ্য সাহিত্যে এ বালাই বড় ছিল না ; পাশ্চাত্য সংঘর্ষণে এখন আসিয়া পড়িয়াছে। নিজনামের ভণিতা দেওয়া কাব্য অথবা নীতিবচনা বহুদিন প্রচলিত। কবির মাতা পিতা ও অন্যান্য বৃত্তান্তের ইঙ্গিতও তাহাতে পাওয়া যায়। কিন্তু কবির সৃষ্ট চরিত্রাবলী মধ্যে তাঁহাকে সনাক্ত করিবার উপায়ের প্রাচুর্য্য বড় দেখা যায় না। হরদেব ঘোষালকে সনাক্ত—নবীস জগদীশ রায় বলিয়া সনাক্ত করিলে পুলিসের অমর্য্যাদা করা হয় কি না, জানি না। কিন্তু নগেন্দ্র দত্তর সহিত বঙ্কিমচন্দ্রের সৌসাদৃশ্য স্থাপন করা খুব পাকা ডিটেকটিভেরও কর্ম্ম নয়। তবে নবন্যাসকারের ন্যায় সমালোচকেরও অবারিত দ্বার।

কবির রচনার মধ্যেই কবির কথায় যদি তাঁহাকে সনাক্ত করিয়া লইতে হয়, তাহা হইলে পৃথ্বীরাজের কবিভূষণকে সনাক্ত করা দুর্ঘট হইবে না। তিনি তুঙ্গাচার্য্য ও মানচিত্র দর্শনের সংযমী গুরুদেব আদর্শ না হইলে, আজ আমরা "প্রসাদের" এত প্রসাদ পাইতাম না। এস্থলে গুরু-শিষ্য উভয়েই ধন্য। কিন্তু মাইকেল কৃতী ব্যবহারজীব না হইলেও ব্যবসায়ে ব্যবহারজীব; তাঁহার সম্পাদিত দলিলের মধ্যে তাঁহাকে সনাক্ত করা আমার তত সহজ মনে হয় না। সম ব্যবসায়ী বলিয়া বোধ হয় আমার এই অসুবিধা।

মাইকেলের জীবনচরিত-লেখক তাঁহার নিজ জীবনের অসংযম তৎকপোলকল্পিত রাবণের অসংযমের সহিত যে তুলনা করিয়াছেন, তাহা যদি ভিত্তিহীন হয়, তাহা হইলে নিমচাঁদের সহিত মাইকেলের তুলনা অধিকতর ভিত্তিহীন। মাইকেলের আদর্শের সহিত রাবণের তুলনায় প্রামাণ্য সম্বন্ধে অনেকের সন্দেহ আছে। মিল্‌টন্ কাব্যসৌন্দর্য্যের অনুরোধে সয়তানকে বাড়াইবার জন্ত শ্রীভগবানকে খাট করিবার চেষ্টার ত্রুটী করেন নাই। কিন্তু তিনি জানিতেন,—সকলেই জানে—ভগবৎ মর্য্যাদার তাহাতে হানি হয় না। শত্রু ভাবে ভগবান ভক্তের উপর সকল শাস্ত্রানুসারেই বিশেষ তুষ্ট—কারণ কি, তাহা জানি না। কিন্তু তাহার জন্ত পিউরিটান-প্রধান মিল্টনের ভগবৎভক্তি সম্বন্ধে সন্দেহের বিন্দুমাত্র কারণ থাকিতে পারে না। যদি যোগীন্দ্রবাবু-প্রদর্শিত সনাক্ত-প্রণালী অবলম্বন করা যায়, রাজদ্রোহপ্রবণ মিল্টনের "এক নম্বর মহাপ্রভুর" সহিত তুলনা অপরিহার্য্য। কিন্তু সয়তানের সহিত মিল্টনের তুলনা অসহনীয়।

এই সঙ্গে আর একটী কথা স্বতঃই আসিয়া পড়ে; রাম লক্ষ্মণকে ছোট গজ-কাটিতে মাপিয়া মূল আদর্শের অপেক্ষাকৃত—এবং বোধ হয় অনিচ্ছাকৃত—অমর্য্যাদা করিলেও রাম লক্ষ্মণকে কমাইবার চেষ্টা অপেক্ষা রাবণকে বাড়াইবার চেষ্টার জন্তই কিছু অঘটন ঘটিয়াছে। মাইকেলের পত্রাবলীর মধ্যে রামচরিত্রের অমর্য্যাদাসূচক যে সকল উচ্ছ্বাস আছে, তাহাও মনের কথা নয়—বিদ্রূপ প্রণোদিত সাময়িক উচ্ছ্বাস মাত্র। জামাইবারিক দরবারে "রামাটা ভ্যাবাগঙ্গারাম" সাব্যস্ত হওয়ায় রাম-আদর্শের যে ক্ষতি হইয়াছে, হয় ত সাধারণ চক্ষে মাইকেলের আদর্শে তদপেক্ষা কিছু ক্ষণিক ক্ষতি সাধন করিয়া থাকিতে পারে; কিন্তু তাহা সম্পূর্ণ ক্ষণিক। সে মহান আদর্শ চিরদিন অক্ষুণ্ণ থাকিবে। সীতার আদর্শ ক্ষুণ্ণ করিবার জন্ত বেনামীতে সম্প্রতি যে সকল চেষ্টা হইয়াছে, অথবা যাহাকে লোকে চেষ্টা মনে করে, তাহাও তদনুপাতে অকর্ম্মণ্য।

"দূতীর আকৃতি দেখি ডরিনু হৃদয়ে"

অচল সদৃশ অটল সংযমীর এরূপ রহস্য-কথার উল্লেখে স্নিগ্ধ বীর, ধীর জননায়ক আদর্শ নেতা রামচন্দ্রের অমর্য্যাদা কবির কখনই ঈপ্সিত নহে। অন্ততঃ সে অসাধু ঈপ্সিত সাধন হয় নাই। সয়তানের প্রতি মিল্টনের আকর্ষণ বা পারিসের প্রতি হোমারের আকর্ষণ তাহাদের নৈতিক দৌর্ব্বল্যের জন্ত দীনতার প্রতি বিপথগামী করুণা মাত্র। অপাত্রে ন্যস্ত করুণা জীবনে অনেক সময়ে কুফল প্রসব করিয়াছে দেখা যায়। এইরূপ করুণাই রাবণের প্রতি মাইকেলের আংশিক আকর্ষণের মত অঘটন ঘটনের জন্ত দায়ী।

কিম্বা ঝটিতি বাণীর নিগড় ছিন্নকারী

বিজয়ীর উল্লাস "একটা যা হয় কিছু কর, একটা নূতন কিছু কর" পথে ছুটিয়া এ অঘটন ঘটাইয়াছে—তাহাও আশ্চর্য্য নয়। নব-সভ্যতাপ্লাবিত ইঙ্গবঙ্গে রাবণের চরিত্রানুকারী লোকের নিতান্ত অসদ্ভাব ছিল না। উত্তর রামচরিতের সময় হইতে শ্রীরামের আদর্শ দেশে ক্রমশঃ একটু ক্ষুণ্ণ হইয়া আসিতেছিল। তা'রপর যাত্রাওয়ালা ও কথকমহাশয়ও সে আদর্শ অজ্ঞাতসারে ও অনিচ্ছাসত্ত্বেও খাট করিবার চেষ্টার ক্রটী করেন নাই। বলা বাহুল্য, কীর্ত্তিবাসের ও বাল্মিকীর আদর্শের যথেষ্ট পার্থক্য রহিয়াছে। গজকাটি জাতীয় অবনতির সহিত ক্রমশঃ যেন ছোট হইয়া আসিয়াছে। কৃষ্ণচরিত্র ও রামচরিত্র এ উভয়-ক্ষেত্রে বাঙ্গালার গজকাটির হ্রস্বতা ভাবুক ও ভক্ত মাত্রেই অনুভব করিবেন। সে বিস্তৃত সমালোচনার স্থান ও সময় এখন নহে। রামচরিত্রের আদর্শের ক্ষুণ্ণতা পূর্ব্ব হইতে ক্রমশঃ অনেকটা ঘটিয়া মাইকেলের জন্য জমি প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছিল। তা'রপর মাইকেল মনে করিয়া থাকিতে পারেন, কীর্ত্তিবাসী কিম্বা বাল্মিকীর আদর্শের একটু নাড়া-চাড়া দিয়া নূতন যা' হয় একটা করিয়া যাইতে পারিলে মন্দ হয় না।

এখনও রাজনৈতিক এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, প্রথমে একটা সোরসরাবৎ করিয়া নাম কিনিবার জন্য নিজের মত-বিশ্বাসের বিরুদ্ধেও একশ্রেণীর লোক বেজায় হৈ চৈ করিয়া সরগরম করে; তা'রপর পসার জমিয়া গেলে নিজের গণ্ডী সীমানার মধ্যে পুনরায় নিজেকে আকুঞ্চিত করিয়া নিজের পূর্ব্বমত বজায় করিয়া থাকে। (মাইকেলের এত মার-প্যাঁচ ছিল না সত্য; কিন্তু নূতন ছন্দের পত্তন করিয়া আরও "নূতন একটা কিছু করার" বাতিক জাগিয়া উঠা অস্বাভাবিক নহে। নূতন একটা কিছু করিয়া ঝটিতি কৃতী হওয়ার লোভ অনেকেই সম্বরণ করিতে পারেন না। বিশেষতঃ সমাজের সহিত কোন কারণে যাঁহাদের মনোবাদ ঘটিয়াছে, তাঁহারা সমাজের প্রিয় আদর্শকে ক্ষুণ্ণ করিতে পারিলে কৃতার্থ হ'ন। সর্ব্বদাই দেখিতে পাই—সামান্য কৃতিত্ব পরিচয় যে দিয়াছে, তাহার কৃতিত্বের গ্লানির চেষ্টা সর্ব্ববাদিসম্মত। সমাজের সহিত মাই-কেলের বিবাদবিদ্বেষের কারণ যথেষ্ট ছিল।) পরম উপকারী বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকট করুণা ভিক্ষা করিবার সময়ও সমাজদ্রোহিতার সহজ পরিচয় তিনি দেন নাই। মাইকেলের জীবনী ইহার যথেষ্ট পরিচয় দিবে। তাহার বিস্তারিত প্রসঙ্গ এস্থানে নিষ্প্রয়োজন; এক জায়গায় বিদ্যাসাগর মহাশয়কে মাইকেল লিখিয়াছেন—Though a Bengali you are noble; বাঙ্গালী হইলে noble হওয়া অসম্ভব, একথা বাঙ্গালীর আদর্শ কবির আদর্শ, ইহা মনে করিতেও গ্লানি। আত্ম-দোষ ক্ষালনে প্রকৃষ্ট পথ হইলেও এ ধৃষ্টতা অমার্জ্জনীয়। অথবা ইহা তাঁহার প্রাণের কথা নয়। রাম চরিত্র খাট করা তাঁহার মনের কথা নয়, কিম্বা মনের কথা হইলে তাহা গ্রহণীয় কথা নয়।

(সমাজে যে আদর্শ চিরপ্রিয়, তাহার বিরুদ্ধে লেখনী চালনের লোভ অসম্বরণীয় নাই বা হইবে কেন? বিশেষতঃ সয়তান, প্যারিস, প্রভৃতি প্রতীচ্য ভাব-পুরিত চিত্র কবির আদিম আদর্শ। তাহাদেরই ফলে রাবণ মেঘনাদকে টানিতে হইবে। নতুবা কবির কল্পিত কাব্যের শোভা রক্ষা হয় না। তাহাতে রাম লক্ষ্মণের ও দেশের পোড়া ভাগ্যে যাহা ঘটে ঘটুক।)

কিন্তু অসংযম ও দুর্নীতির তাড়নে মাই-কেল যতই অপদার্থ হউন, ইচ্ছা করিয়া দুর্নীতি ও অসংযমের মাহাত্ম্য-প্রচার কখনও তিনি করেন নাই; বরং তাহার দমনের চেষ্টাই তিনি করিয়াছেন। সাহিত্যের দায়িত্ব জ্ঞান তাঁহার যথেষ্ট না থাকিলেও প্রচুর ছিল। টলষ্টোয়া, ইবসেন, মেটারলিঙ্ক, জোলা, ষ্ট্রিণ্ডবার্গ, বার্ণাড সা, অস্কার ওয়াইল-ডের ন্যাকারপ্লাবিত বঙ্গ-সাহিত্য ক্ষেত্রে রস, আর্ট ইত্যাদির ভাণে ও নামে যে সকল বিভীষিকা সঞ্চারের উপক্রম হইতেছে, তৎ-সম্বন্ধে মাইকেলের সংযমের কথা মনে রাখা ভাল। যোগীন্দ্র বাবুর মতে এক তারার পত্র ব্যতীত যথার্থ দুর্নীতিদোষে দুষ্ট রচনা মাই-কেলের দেখা যায় না। অস্কার্ ওয়াইলডের্ সালোমী অভিনয় লইয়া পেম্বার্টন বিলিং সম্প্রতি বিলাতের ৪৭০০০ প্রধান পুরুষ ও মহিলা সম্বন্ধে বীভৎস উক্তি প্রকাশ্য আদালতে অকুতোভয়ে করিয়াও দণ্ড না পাইয়া মুক্তি পাইয়াছেন, ও তজ্জন্য সানন্দ বিজয়োল্লাস হইয়াছে। সে শ্রেণীর বিভীষিকার হস্ত হইতে দেশ ও সমাজকে যদি রক্ষা করিতে হয়, সাহিত্যকে যদি বাঁচাইতে হয়, তাহা হইলে সময় থাকিতে এই সকল বিষয় সম্বন্ধে বিশেষ প্রণিধান প্রয়োজন।

কিন্তু অবান্তর কথা আসিয়া পড়িতেছে— কথা বাড়িতেছে। কাল নিরবধি এবং পৃথ্বি বিপুল কবিপক্ষে হইলেও স্মৃতি-সভার সভা-পতির পক্ষে নয়। অমৃত সমান মধুকথা নিতান্ত অকর্ম্মণ্যের হাতে পড়িয়াও আপনা আপনি বাড়িয়া যায়। কিন্তু সময়ের ত স্থিতিস্থাপকতা নাই। অতএব কথা জোর করিয়া গুটাইয়া লইতে হইতেছে।

মাইকেলের কথা কোথায় আরম্ভ করিব, কোথায় শেষ করিব, তাহা খুঁজিয়া পাই না। সময়োপযোগী একটা নিতান্ত প্রয়োজনীয় কথাই বলি। বাঙ্গালা ভাষার সাহায্যে ইংরাজী ও অন্যান্য বিদেশীয় ভাষা শিখাইবার চেষ্টার কথা আজকাল বিশেষ ভাবে প্রবল হইয়াছে। ভরসা করি, সে চেষ্টা শীঘ্র সফল হইবে, এবং সে সাফল্যের সহিত বাঙ্গালীর ইংরাজীজ্ঞানের দখলও কমিবে না। কারণ বর্ত্তমান অবস্থায় এ উপকরণ পারিপাট্য আমাদের একান্ত প্রার্থনীয়। কিন্তু কথাটা নূতন নহে। মাইকেলের মত ইংরাজনবীশ এদেশে অতি কমই জন্মিয়াছেন। কৃষ্ণ বন্দ্যো, শ্যামাচরণ সরকার প্রভৃতি নানাভাষা-বিৎ পণ্ডিত বাঙ্গালীর মধ্যে জন্মিয়াছেন। কিন্তু সকল ভাষাতেই মাইকেলের মত অসাধারণ জ্ঞান ও দখল অল্প লোকেরই ছিল। ইদানীন্তন কালে হরিনাথ দে, রবি দত্ত এবং আমার শ্রদ্ধাস্পদ সহযোগী শ্রীযুক্ত বাবু কালীনাথ মিত্র মহোদয়ের অনুজ কৃষ্ণনাথ মিত্র এবিষয়ে এবং অন্যান্য কোন কোন বিষয়ে মাইকেলের কথা আমায় সময়ে সময়ে স্মরণ করাইয়া দেন। মাইকেল ভূয়োভূয়ঃ অতি কাতর প্রাণে বলিয়া গিয়াছেন যে, যদি হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও রামগোপাল ঘোষের মত দেশহিতৈষী, কৃতী বক্তা ও লেখক মাতৃ-ভাষায় মাতৃসেবায় নিজ নিজ শক্তি সামর্থ্য ব্যয় করিতেন, তাহা হইলে দেশের অজস্র উপকার হইত। একথা তখন সকলের কাণে—অনেকের প্রাণে—পৌছায় নাই। এখন হাওয়া ফিরিয়াছে। এখন বিশ্ব-বিদ্যালয় হইতে পল্লী-বিদ্যালয় পর্য্যন্ত এক সুর প্রতিধ্বনিত হইতেছে। মাইকেলের প্রতিভা বিকাশের বিরুদ্ধে যে সকল সংস্কৃত আলঙ্কারিক প্রথমে বদ্ধপরিকর হইয়া পরে তাঁহার রস-

বন্যায় প্লাবিত হইয়া মুক্তকণ্ঠে আশীর্ব্বাদ প্রয়োগ করিয়াছিলেন, যাহাদের সনির্ব্বন্ধ চেষ্টার অভাবে বঙ্গবাণী ইংরাজীশিক্ষার বিস্তারের পূর্ব্বে বন্ধ্যাপ্রায় হইয়াছিলেন, সেই ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত-মণ্ডলীর মধ্যেও একথা প্রতিধ্বনিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। তাহা বিশেষ আশার কথা।

মাতৃভাষা অচিরে যদি স্বীয় প্রাপ্য গৌরবে মণ্ডিত হইবার অধিকার পান, মাইকেল ও তাঁহার সমসাময়িকগণের এ সম্বন্ধে সেবা, জননী ও তাঁহার ভক্তগণ কখনও ভুলিতে পারিবেন না। খ্রীষ্টীয়ান মিশনারী ও ইংরাজী শিক্ষার প্রভাবে আপাত ধর্ম্মভ্রষ্টরূপ গণ্যদল হিন্দুর হিন্দুত্ব রক্ষাকল্পে ও মাতৃভাষার পুষ্টি সাধনকল্পে যে সাহায্য করিয়াছেন, তাহা কখন ভুলিবার কথা নয়। খ্রীষ্টধর্ম্মে পূর্ণবিশ্বাসী অথচ মনপ্রাণে পূর্ণহিন্দুভাবাপন্ন মাইকেল মধুসূদন দত্ত এ দলের অগ্রণী। বাঙ্গালার মধ্যে ইংরাজী বুকনী চালান মাইকেল নিতান্ত বিদ্বেষ করিতেন। দেওঘরে আমাদের রাজনারায়ণ-দরবারে এই বিদ্বেষের পুষ্টিসাধক এক সুন্দর নিয়ম ছিল। বাঙ্গালা কথোপকথনের মধ্যে কেহ ইংরাজী বুকনী দিলে দরিদ্রনারায়ণের সেবাকল্পে তৎক্ষণাৎ তাহাকে এক পয়সা জরিমানা দিতে হইত। রাজেন্দ্রলাল, কৃষ্ণদাস পাল প্রভৃতি বিশিষ্ট ইংরাজনবীশগণের মধ্যেও আমি এরূপ বুকনী-স্পৃহা অতি অল্পই দেখিয়াছি। জরিমানা প্রণালীটার পুনঃ-প্রবর্ত্তন করিতে পারিলে মন্দ হয় না। কিন্তু সে দরবার আর কৈ? সেনাপতি বহুল-পরিপুষ্ট সৈনিকদলে আদেশ পালন করান কিছু কঠিন।

পেটের দায়ে পুলীশকোর্টের ইন্টারপ্রিটারী করিতে হইয়াছিল বলিয়া, এবং অন্যান্য গুহ্য কারণে বিলাত হইতে ফিরিয়া মাইকেলের মহামান্য হাইকোর্টের ব্যারিষ্টার পদবীতে আরোহণ সম্বন্ধে একটা বিষম বিঘ্ন ঘটিয়াছিল। কৃষ্ণদাস পালের অনুবাদ কার্য্য শাটুর সাহেবের মনোনীত হয় নাই বলিয়া, তিনি কৃষ্ণদাস পাল হইবার অবকাশ পাইয়াছিলেন। মাইকেলের ভাগ্যেও পুলিশে ইন্টারপ্রিটারী লাভ সম্বন্ধে সেইরূপ অকৃতকার্য্যতা হইলে বোধ হয়, উত্তরকালে ব্যারিষ্টার হইবার সময় এত লাঞ্ছনা তাঁহাকে সহ্য করিতে হইত না। কোন কারণে ব্যারিষ্টারী পদ প্রাপ্তি সম্বন্ধে বিঘ্নটা আমার বিস্তারিত ভাবে মনে আছে। সেই কথাটা একটু বলি।

পাঁচ বৎসর বয়সের অনেক কথা অনেকেরই মনে থাকে—আমারও আছে। এই বিঘ্ন, বা সেকালের চলিত কথায় "দায়" উপলক্ষে মাইকেল আমার পাঁচ বৎসর বয়সের সময় আমাদের ৫৩ নং ওয়েলিংটন ষ্ট্রীটস্থ বাটীতে সর্ব্বদা আসিতেন। এরূপ দায় অদায়ে পড়িয়া আসা যাওয়া অনেকের ঘটিত। এখন "থুতু ফেলিয়া" কেহ কাহারও উপকার করিতে চায় না। কারণ এখনকার লোক দেশহিতৈষিতা জনহিতৈষিতা শিখিয়াছে। —তারস্বরে "সেবাধর্ম্মের" মাহাত্ম্য স্বীকার শিখিয়াছে। "নন্দলালের" ন্যায় সামান্য ধর্ম্মে মন দিবার সময় তাহারা অন্ধ। ঠাকুরমার ভাজা গরম গরম লুচি, আলু ভাজা মাইকেলের জন্য বহন করিয়া ধন্য হইতাম। পুরস্কার স্বরূপ তাহার তিন চারি বৎসর পরে সদ্য-প্রকাশিত হেক্টর্ বধ কাব্য একখণ্ড আমায় করিয়াছিলাম। হলদে মলাটের সে অমূল্য গদ্য আদর্শ আমার অদ্যকার প্রবন্ধের ভাষার জন্য দায়ী মনে করিলে, আমি বিনা ক্লেশে

দেখাই পাইব। ফ্রান্স বাসকালে মাইকেল জার্ম্মাণ সাহিত্যের পরম ভক্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন। হেক্টর্‌ বধের গদ্য অনেকটা জর্ম্মাণ ছাঁচে ঢালা। সংস্কৃত ভাষায় মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন মহাশয়ের সঙ্কলিত গদ্যপাঠ পাঠের পর দশ বৎসর বয়সে স্কুল গণ্ডীর বাহিরে ইহাই আমার প্রথম বাঙ্গালা গদ্যপাঠ। ফলে "গদ্যপাঠ" যাহা ঘটিয়াছে, শুনিতেই পাইতেছেন। তাই আমার চক্ষে হেক্টর্‌ বধের এত উচ্চ স্থান। কিন্তু সাধারণ পাঠক ও সমালোচক হেক্টর্‌ বধকে মাইকেলের কলঙ্ক মনে করেন। গ্রন্থখানি অনেক যত্ন করিয়া রাখিয়াছিলাম। জল খাবারের পয়সা হইতে ৩৪০ টাকা দামের ডেস্ক পুরাতন কাঠ্‌রার দোকান হইতে খরিদ করিয়া যখন স্বয়ম্ভু "ফ্যামিলি লাইব্রেরীর" প্রথম পত্তন করি, তখন সেই বইখানি ছিল। তার পর জ্যেষ্ঠতাত ও পিতৃদেবের পুস্তক রত্নরাজি ঝাড়িবার এবং গুছাইবার অধিকার পাইয়া যখন উভয় লাইব্রেরীর একীকরণ হইল; তখন কোন সাহিত্য-রসিক পুস্তকখানি সনাতন ধর্ম্মানুসারে "না বলিয়া চাহিয়া লইয়া" গেলেন, তাহা বলিতে পারি না। I. C. Boseএর বহুবাজার ষ্ট্রীটস্থ Stanhope Press হইতে প্রকাশিত মাইকেলের প্রিয়, সংযুক্ত-হস্তী সিংহ নিদর্শন এবং "মন্ত্র বা সাধয়েৎ শরীরং বা পাতয়েৎ" মূল মন্ত্র যুক্ত, আদিম সংস্করণের অনেক পুস্তক বহু যত্ন করিয়া রাখিয়াছিলাম। কিন্তু তথাকথিত সাহিত্য রসবন্যা হইতে কাহাকেও বাঁচাইতে পারি নাই। রাজকিশোর দেব পর, জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস ও দীননাথ সান্যাল মহাশয়ের প্রকাশিত সংস্করণগুলিও সেই পথগামী হইয়াছে। স্মৃতি-সভার জন্য প্রস্তুত হইতে চেষ্টা করিয়া দেখিলাম যে, সকল সংস্করণই একে একে কোথায় ভাসিয়া গিয়াছে। দেশের সৌভাগ্য ও ভাষার সৌভাগ্য যে, এত লোক মাইকেলের পুস্তক না বলিয়া লইয়া যায় এবং ফিরিয়া দিতে ভুলিয়া যায়।

এরূপ পুস্তক-স্পৃহার একটা কারণ হইতে পারে যে, সুলভ ও সুন্দর সংস্করণের নিতান্ত অভাব হইয়া পড়িয়াছে। এ সকল বিষয়ে আমরা বিলাতের অনেক পশ্চাতে। Milton Paradise Lostএর পারিশ্রমিক তিন পাউণ্ডই পান আর তিন লক্ষ পাউণ্ডই পান, পরবর্ত্তীগণের সুবিধার্থ সকল দামের মিল্টনের নানা সংস্করণ শত সহস্র সংখ্যা অক্লেশে পাওয়া যায়। রাজ-সংস্করণ, প্রজা-সংস্করণ, সম্রাট-সংস্করণ, যে সংস্করণ চাও, অজস্র পাইবে। জর্ম্মণ "কুল্টার্‌"-বাদীরা সেকস্‌পীয়রের আবিষ্কর্ত্তা বলিয়া পূর্ব্বে নিজেদের গরিমা করিতেন। খোস্‌ মেজাজে থাকিলে তাঁহারা হয়ত এতদিন সেকস্‌পীয়রের কাইজার্‌-সংস্করণ পর্য্যন্ত বাহির করিতেন। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্যবশে মাইকেলের সমগ্র পুস্তকাবলীর তেমন সংস্করণ কিছুই নাই। আমি অনেক স্মৃতি-সভায় বলিয়াছি, আবার বলিতেছি যে, যথার্থ মাইকেল-ভক্তগণ তাঁহার গ্রন্থের সহজপ্রাপ্য সুন্দর সংস্করণের সৃষ্টি করিয়া তাঁহার স্মৃতির প্রতি যে সম্মান দেখাইতে পারেন, তাঁহার স্মৃতিস্তম্ভ পুষ্পপত্রে শোভিত করিয়া কিম্বা স্মৃতিসভায় অজস্র বক্তৃতা করিয়া তাহা পারিবেন না। দেশের অনেক আধুনিক ও প্রাচীন গ্রন্থকার সম্বন্ধে একথা বলা চলে। প্রাচীন দুষ্প্রাপ্য পুঁথির উদ্ধার ও প্রকাশ যেমন প্রয়োজনীয়, প্রচলিত শুভ-সাহিত্যের বহুল প্রচারও তদপেক্ষা অল্প প্রয়োজনীয় নহে।

মিউনিসিপালিটির সাহায্যে রাস্তার নামকরণ আজকাল স্মৃতিরক্ষার একটা প্রকৃষ্ট উপায়। মাইকেলের স্মৃতিরক্ষাকল্পে খিদিরপুরে সে উদ্যোগ হওয়াতে মাইকেল প্রচলিত প্রকরণে ধন্য হইয়াছেন। অন্যদিকে যোগীন্দ্র বাবুর ২৫ বৎসরের খেদও মিটিয়াছে। রাজা রামমোহন রায়ের স্মৃতিচিহ্নও স্থাপিত হইয়াছে। এই রামমোহন লাইব্রেরী গৃহ-প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, আজ আমরা সেইখানে অতিথি। রাজার স্বগ্রাম রাধানগরেও রাজা রামমোহন রায়ের স্মৃতিসৌধ নির্ম্মাণের চেষ্টা হইতেছে। রাজা রামমোহন রায় এখনও বোধ হয় মিউনিসিপ্যাল সম্মান প্রাপ্ত হন নাই। সময়ে পাইলেও পাইতে পারেন। কিন্তু রাজা রামমোহন রায়ের গ্রন্থাবলী দুষ্প্রাপ্য; মাইকেলেরও প্রায় তাই। স্মৃতি-সভা এ সম্বন্ধে কি আয়োজন প্রস্তাব করেন, জানি না।

মাইকেল-গ্রন্থাবলী কোন কোন সাপ্তাহিক পত্রের পুস্তকভাণ্ডার-অন্তর্গত। কিন্তু আদমসুমারী লইলে গুপ্তপ্রেস পঞ্জিকার মত ঘরে ঘরে যে সে গ্রন্থও পাওয়া যাইবে, তাহা বোধ হয় না। হেমচন্দ্রের অমর কথায়, দেশে এখন ডমরুধ্বনির সময় আসিয়াছে। সেই যুগের মহাকবি মধুসূদনের গ্রন্থের বহুলপ্রচার বিশেষ প্রয়োজন।

অতএব ঐ বিষয়ে যে বিশেষ একটা করণীয় আছে, সে সম্বন্ধে সন্দেহ নাই। মাইকেলের কাব্য ও নাটক এখন নাট্যশালায় স্থান পায় না, কারণ তাহা আধুনিক নাট্যামোদীগণের রুচিসঙ্গত নহে। কাজেই নাট্যাচার্য্য ও নাট্যাধ্যক্ষগণ সে বিষয়ে ভয় পান। ইউনিভারসিটির বড় পাঠ্যগ্রন্থাবলী-তালিকায় স্ত্রীবিভাগে মাইকেলের কোন কোন গ্রন্থের কিছু প্রতিপত্তি আছে, কিন্তু তাহা নামমাত্র। "গুরুমহাশয়" তিলক রাজনারায়ণ বসু মহাশয়কে ধরিয়া "গুরুমহাশয়"দিগের সর্দ্দারের সাহায্যে এডুকেশন ডিপার্টমেন্টের সনাতন প্রথামত মাইকেল তিলোত্তমাকে স্কুলে চালাইবার চেষ্টা করিয়া ব্যর্থমনোরথ হইয়াছিলেন।

কোন কোন স্কুলপাঠ্য পদ্যগ্রন্থে ছোট ছোট মাইকেলী কবিতা দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু সাধারণ শিক্ষিত লোক যে মাইকেলের কাব্য এখন বিস্তৃতভাবে পাঠ করে তা' বোধ হয় না। সেই জন্য এই সকল স্মৃতিসভায় মাইকেলের গ্রন্থ হইতে আবৃত্তি ও সঙ্গীতের প্রস্তাব আমি অনেকবার করিয়াছি, এবং এ সভায় সে প্রস্তাব আংশিক ভাবে গৃহীত হইয়াছে, ইহা আশা ও আনন্দের কথা। উপযুক্ত "পাঠকের" অভাবে বোধ হয় কর্ত্তৃপক্ষগণের সংকল্প কার্য্যে সম্পূর্ণরূপে পরিণত হইবার অবকাশ পায় নাই; কিন্তু সভাশেষে কিছু উত্তম নমুনা আপনারা পাইবেন।

আমরা নিজ পরিবারের মধ্যে বৎসরে অন্ততঃ একবার ছুটীর সময় সমগ্র মেঘনাদবধকাব্য পাঠের নিয়ম করিয়াছিলাম। ফলে আমার দশ বৎসর বয়স্কা কন্যা, বর্ণপরিচয় প্রথম ভাগ, তা'রপর কথামালা তা'রপর বোধোদয় পড়িয়াই, মেঘনাদ-বধ আমার অপেক্ষা সুন্দর আবৃত্তি করিতে পারিত। বারাণসীধামে কাজের ভিড়ে একবার পূজার বন্ধে আমার মেঘনাদ-বধ পাঠ অসম্পূর্ণ ছিল বলিয়া, কন্যারা দুঃখ করিয়া বলিয়াছিলেন যে, "এবারে আমাদের পশ্চিম আসাই মঞ্জুর হইল না।" অনুসন্ধানে জানিলাম, ভোজনাদি প্রসঙ্গে এ দুঃখের কথা উঠে নাই। লজ্জিত হইয়া ত্রুটী শোধন করিয়া তবে বাড়ী ফিরি।

একথা পূর্ব্বে এক স্মৃতি-সভায় উল্লেখ করিয়াছিলাম। কিন্তু এ ভাব এখন সচরাচর বালক বালিকার মনে বড় স্থান পায় না।

আর একবার সদ্যোবৈধব্যপ্রাপ্তা পতি-পুত্রবিহীনা কয়েকটী হতভাগিনীর দরবিগলিত অশ্রুধারায় মর্ম্মাহত হইয়া, তানসেনের দিবসে বেহাগ আলাপের বিরুদ্ধে প্রতিজ্ঞার ন্যায়, প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম যে, এরূপ শ্রোত্রী-বর্গের নিকট কখনও মেঘনাদের শেষ সর্গ পাঠ করিব না। কবিভূষণের অপূর্ব্ব চিত্র সংযুক্তার চিতারোহণ সর্গ প্রকাশের পর সে প্রতিজ্ঞাচ্যুতি ঘটিয়াছিল; কারণ আপনারা সহজেই অনুমান করিতে পারেন। স্থির ধীর পাঠক সংযুক্তার চিতারোহণ ও প্রমীলার চিতারোহণ বর্ণনা তুলনা করিবেন, সঙ্গে সঙ্গে কবিভূষণ এবং মাইকেলের প্রতিভার তুলনাও করিবেন। এখানে সে সমালোচনার বহু বিস্তার অসম্ভব।

কথা হইতে কথা আসিয়া পড়িতেছে। ব্যারিষ্টারী বিপত্তি হইতে অব্যাহতি পাইবার জন্য জ্যেষ্ঠতাত প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারী মহাশয়ের ও তাঁহার সহৃদয় বন্ধুগণের প্রশংসা-পত্র মধুসূদনের প্রয়োজন হয়। সে বিষয়ে পূজনীয় পিতৃদেব অনেক চেষ্টা করেন। কলিকাতার অন্যান্য গণ্যমান্য ব্যক্তির প্রশংসাপত্রের সঙ্গে এই প্রশংসাপত্র হাই-কোর্টে দাখিল হইলে, মাইকেল ক্রূর বিদ্বেষীর ঈর্ষানল হইতে অব্যাহতি পান। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম মহাশয় মধুস্মৃতিতে একথা বিস্তারিত ভাবে প্রকাশ করিয়াছিলেন। সেই উপলক্ষে মাইকেলের ৫৩নং ওয়েলিংটন ষ্ট্রীটের বাড়ীতে আসা যাওয়া, গরম লুচি ও আলু-ভাজা সেবা বহুদিন চলিয়াছিল, (জ্যেঠা মহাশয় গরম আলু-ভাজার নিপুণ কারিগর ও গুণগ্রাহী জহুরী ছিলেন; তাঁহার বংশ-ধরেরাও, অন্য অধিকার না পাউক, কেহ কেহ সে আস্বাদনের অধিকারী হইয়াছে)। সেই ভাঙ্গা মোটা গলায় মাইকেলের স্বরচিত গ্রন্থের স্মৃতিপথে চিরস্থায়ী পাঠ এখনও মনে আছে। তাহা কখনও ভুলিবার নয়। ওয়েলিংটন ষ্ট্রীটের বাটীতে তখন এবং পরে কবি ও সাহিত্যিকের মেলা বসিত। বিদ্যা-সাগর মহাশয়ের বেতালের প্রথম অংশ ও রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের টেলি-মেকস্ ও নীতিবোধ সেই বাটীতেই রচিত হয়। আমাদের স্বগ্রামবাসী এবং চাকরীর উমেদার পিতৃপিতামহ পূজিত পাচকপ্রবর "মধুদাদা" ডালে কাটি দিতে দিতে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের চটিজুতার শব্দ পাইলেই "উর্জ্জয়িনী নগরে" "উর্জ্জয়িনী নগরে" চীৎকার শব্দে বেতালের পাঠাভ্যাস পরিচয় প্রদান করি-তেন! মধুদাদা শিক্ষাবিভাগ উজ্জ্বল করিতে কৃতসংকল্প হইয়াছিলেন, এবং পিতার ও জ্যেষ্ঠতাতের পরমবন্ধু বিদ্যাসাগর মহাশয় সে বিভাগের কর্ত্তা। অনেক বিভাগের চাকরী এই প্রণালীতেই জোটে; কিন্তু মধুদাদা চির-দিনই পাচক ব্রতে ব্রতী থাকিয়া ব্রত উদ্‌যাপন করেন। হেমচন্দ্র, রঙ্গলাল ও বিহারীলাল চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি সকল কবির গ্রন্থেরই প্রথম পাঠ আমাদের সেই দীনভবনে সম্পন্ন হইলে তবে পাণ্ডুলিপি মুদ্রাঙ্কনের ব্যবস্থা হইত। পিতৃদেবের সাহিত্য-চর্চ্চার অবকাশ অল্পই ছিল; রোগীর গৃহ হইতে গৃহান্তরে গমনের সময় গাড়ীতে পড়িয়া তাঁহার ব্যাকরণ কাব্য ধর্ম্মশাস্ত্রে যেরূপ অধিকার জন্মিয়াছিল, কলেজে বা টোলে পড়িয়া অনেকের তাহা হয় না। "গাড়ীই" পিতৃদেবের ঠিকানা তদানীন্তন রসিক বন্ধুগণের মতে সিদ্ধান্ত ও প্রচারিত

হইয়াছিল। সময়ে সময়ে আহারের সময়ও সাহিত্যচর্চ্চা চলিত। মধ্যাহ্ন ভোজনের সময় বিহারীলাল চক্রবর্ত্তী মহাশয় তাঁহার সুবিপুল গৌরকান্তি দেহ ভূমিতল সংলগ্ন করিয়া বঙ্গসুন্দরীকে যখন আসরে নামাইতেন, সে দৃশ্য ভুলিবার নয়। আর হেমচন্দ্রের মোটা গলায় ভারতসঙ্গীত আবৃত্তি যে শুনিয়াছে, সে অমরপদবী লাভের যোগ্য। বিহারীলালের বঙ্গসুন্দরী পিতৃদেবের নামে উৎসৃষ্ট হয়। নিসর্গ-সুন্দরী, সারদা-মঙ্গল, সঙ্গীত-শতক প্রভৃতির প্রথম পাঠও এই আসরে হইত। রাজেন্দ্রলাল মিত্রের বিবিধার্থ সংগ্রহ ও রামকমলের রেকন সন্দর্ভের পাণ্ডুলিপি পাঠও শুনিয়াছি। উত্তর কালে পিতৃগৃহ-তাড়িত শ্রীযুক্ত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় এই বাসায় বাস করিয়া যখন আমাদিগকে ধন্য করিয়াছিলেন, তাঁহার "নির্ব্বাসিতের বিলাপ" পাঠ নিজমুখে শুনিয়া তাঁহার অনেক সেবা করিয়াছি। ব্যাঘ্রাচার্য্য বৃহল্লাঙ্গুল এই সভায় স্বীয় লাঙ্গুল বিস্তার প্রথম করেন। নৃসিংহ মুখোপাধ্যায়ের অর্থশাস্ত্র ও গোলাপচন্দ্র শাস্ত্রীর নানা স্মৃতিশাস্ত্রের অনুবাদ, প্রসন্নকুমারের পাটীগণিত, বীজগণিত, রাজকুমারের ইংলণ্ডের শাসন-প্রণালী ও হিন্দু দায়াদাধিকার এই বৈঠকখানাতেই রচিত হয়। রজনীকান্ত গুপ্তের পাণিনি, জয়দেব এবং সিপাহী বিদ্রোহের কাহিনী এইখানেই প্রথম দিবালোক দর্শন করে। এত কোকিল-কাকলীর মধ্যে পালিত হইয়া আজ এই বায়স-নিন্দিত স্বরে ও ভাষায় সভার ধৈর্য্যচুতি যে এত ক্ষমা পাইতেছে, সে কেবল আপনাদের ক্ষমাগুণে।

রঙ্গলাল, হেমচন্দ্র ও মাইকেল মধুসূদন, জ্যেষ্ঠতাত মহাশয় ও পিতৃদেবের সহিত ৫৩নং ওয়েলিংটন ষ্ট্রীটেই প্রথম পরিচিত নহেন। ইহঁাদের সকলেরই বাল্যকাল খিদিরপুরে কাটে এবং সেই সময় হইতে ইহাঁরা সকলে অচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ। খিদিরপুর পিতৃদেব ও জ্যেষ্ঠতাত মহাশয়ের আদিশিক্ষার সময়ের বাস। মুনসীর বাগান রাস্তা যিনি সরকারকে বিনামূল্যে দিয়া গিয়াছিলেন, সেই মুনসী রামনারায়ণ সর্ব্বাধিকারী মহাশয়ের বাসগৃহ তখনও খিদিরপুরে। তদুপলক্ষে জ্যেষ্ঠতাত ও পিতৃদেবের সহিত মধুসূদন, হেমচন্দ্র, রঙ্গলালের বিশেষ সৌহার্দ্দের সৃষ্টি হয়, এবং তদুপলক্ষেই বৃত্র-সংহারের ভাবী কবি—মেঘনাদের আদি ভূমিকার রচয়িতা। সে অপূর্ব্ব সমাবেশ বঙ্গদেশ আর কখনও দেখিয়া ধন্য হইবে কি না সন্দেহ। খিদিরপুরের পদ্মপুকুর বাস্তবিক শ্বেত নীল নানা পদ্মে তখন সুশোভিত। আধুনিক পদ্মপুকুর থানার অন্তর্গত ৫৩ নং ওয়েলিংটন ষ্ট্রীটেও সে সৌরভ পরে ছুটিয়া আইসে।

তারানাথ তর্কবাচস্পতি, তারাশঙ্কর, তারাকুমার, নীলাম্বর মুখোপাধ্যায়, তারিণীচরণ চট্টোপাধ্যায়, দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ, হরিনাথ ন্যায়রত্ন, রামনারায়ণ তর্করত্ন, গিরীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন, নীলমণি ন্যায়লঙ্কার প্রভৃতি সাহিত্যিকগণ স্বীয় রচনার অনেক পাণ্ডুলিপি এই বৈঠকেই পেস করিয়া বংশকে ধন্য করিতেন। শশীভূষণ চট্টোপাধ্যায় ও ক্ষেত্রমোহন গুপ্ত ও কালীকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য, উমেশচন্দ্র গুপ্ত মহাশয়ের হাতেখড়িও এইখানে। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর অসাহিত্যিক অবস্থায় পদধূলিও অনেক সময় এইখানে পড়িয়াছে। মনমোহন ঘোষ, তারকচন্দ্র পালিত, এবং সদ্যোসিবিলসার্ভিসচ্যুত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়গণের রাজ-

নৈতিক জল্পনাও উত্তর কালে অনেক সময় এইখানে হইত। ইণ্ডিয়ান এসোশিয়েশনের ভিত্তিকল্পে পালকী করিয়া সুরেন্দ্রবাবু অনেক সময় আসিতেন। সময়, ভারতবাসী, ইণ্ডিয়ান ওয়াল্ড´, হিন্দুপেট্রিয়ট প্রভৃতি সংবাদ পত্র এইখান হইতে পরিচালিত হইত। ইংলণ্ডে বঙ্গ মহিলা, মনোরমা, তারাবাই, অশ্রুবিলাপ প্রভৃতি রমণী-রচনার সমাদর ও সম্বর্দ্ধনও এইখানে হইত।

মাইকেলের বংশের সহিত আমাদের বংশের দূর সম্পর্ক ছিল। এই দূর সম্পর্ক খিদিরপুরে উভয় বংশের নৈকট্য স্থাপনে সহায়তা করে এবং খিদিরপুরবাসী হেমচন্দ্রের সহিত নৈকট্যও আপনাপনি আসিয়া পড়ে।

হেমচন্দ্রের সহিত আমাদের বংশের কত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল, বাবু মন্মথনাথ ঘোষ হেমচন্দ্রের জীবনচরিতে তাহার আংশিক পরিচয় দিয়াছেন। সে পরিচয় নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

"মানসী ও মর্ম্মবাণী।
চৈত্র ১৩২৪ ; ১৬১ পৃঃ।

একণে পরিবারের আর্থিক অবস্থা নিতান্ত অসচ্ছল হইল। এই সময়ে পরোপকারী পণ্ডিত প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারী পাঠাবস্থায় অপূর্ব্ব কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়া হিন্দুকলেজের অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করিয়াছিলেন। শিক্ষা-পরিষদের সভাপতি পুণ্যস্মৃতি ড্রিঙ্কওয়টার বেথুন এবং শিক্ষাবিভাগের সকল অধ্যাপক প্রসন্নকুমারকে স্নেহ করিতেন। প্রসন্নকুমার পূর্ব্বে খিদিরপুরে বাস করিতেন। হেমচন্দ্রের জননী মানদাময়ী একদিন প্রসন্নকুমারের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহার দুর্দ্দশার কথা জ্ঞাপন করিলেন এবং সাহেবদিগকে বলিয়া হেমচন্দ্রের জন্য একটী ১৫।২০ টাকার চাকুরীর চেষ্টা করিতে অনুরোধ করিলেন। প্রসন্নকুমার বালক হেমচন্দ্রের সুগঠিত দেহ ও আয়ত লোচনের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া তাঁহাকে উত্তমরূপে শিক্ষিত করিতে পরামর্শ দিলেন। হেমচন্দ্রকে ইংরাজী বিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট করাইয়া উত্তমরূপে শিক্ষা দিবার সঙ্গতি নাই, শুনিয়া প্রসন্নকুমার স্বয়ং হেমচন্দ্রের শিক্ষার ভার গ্রহণ করিলেন। প্রসন্নকুমারের নিকট হেমচন্দ্র ইংরাজী শিক্ষার প্রথমপাঠ গ্রহণ করেন। হেমচন্দ্র অসামান্য অধ্যবসায় ও পরিশ্রম সহকারে মনীষী প্রসন্নকুমারের নিকট নানাবিষয় অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন। প্রসন্নকুমার এই দরিদ্র বালকের কমনীয় স্বভাবে মোহিত হইয়া তাঁহাকে অনুজ সহোদরের ন্যায় স্নেহ করিতেন। হেমচন্দ্রের তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, অপূর্ব্ব মেধা ও প্রখর স্মৃতিশক্তি দেখিয়া প্রসন্নকুমারও মুগ্ধ হইলেন। অতি অল্প বয়সের মধ্যে হেমচন্দ্র পাঠে এত উন্নতি দেখাইলেন যে, প্রসন্নকুমার তাঁহাকে উচ্চতর শিক্ষার জন্য হিন্দুকলেজ সংশ্লিষ্ট স্কুলে সিনিয়ার ডিপার্টমেণ্টে একেবারে দ্বিতীয় শ্রেণীতে প্রবিষ্ট করাইয়া দিলেন। বোধ হয় প্রথমে প্রসন্নকুমারই হেমচন্দ্রের শিক্ষার ব্যয়ভার গ্রহণ করিতেন।"

"মানসী ও মর্ম্মবাণী।
আষাঢ় ১৩২৫ ; ৫৩৪ পৃঃ।

এই স্থানে সূর্য্যকুমারের সহিত হেমচন্দ্রের যে কিরূপ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল, তাহার দৃষ্টান্তস্বরূপ একটী গল্প বিবৃত করা যাইতে পারে। এ গল্পটী হেমচন্দ্রের মধ্যমজামাতা শ্রীযুক্ত আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয় হেমচন্দ্রের জননীর মুখে শুনিয়াছিলেন এবং উহার সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহ করিবার কোনও কারণ নাই।

সূর্য্যকুমার সর্ব্বাধিকারীর সহিত হেমচন্দ্রের আবাল্যপ্রণয় ছিল। প্রাতঃকালে সূর্য্যকুমার হেমচন্দ্রের বাটীতে আসিলে হেমচন্দ্রের জননী আনন্দময়ী আঁচলে মুড়ী রাখিতেন এবং দুই বন্ধু বসিয়া গল্প করিতে করিতে তাহা খাইতেন। যখন উভয়ে সংসারক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হইয়া উচ্চ সম্মান ও যশোলাভ করিয়াছিলেন, তখনও সূর্য্যকুমার হেমচন্দ্রের বাটীতে আসিয়া সময়ে সময়ে সেই শৈশবের সুখস্মৃতিবিজড়িত পূর্ব্বকথা স্মরণ করিয়া আনন্দময়ীকে বলিতেন—"মা, আপনি আজ আবার আঁচলে মুড়ী লইয়া বসুন, আমরা আবার দেখি—ছেলেবেলার মত দুজনে আপনার আঁচল হইতে মুড়ী লইয়া খাই"। হেমচন্দ্রের জননী তাহাই করিতেন। দুই বন্ধু তাঁহার দুই পার্শ্বে বসিয়া কত কথা, কত গল্প, করিতে করিতে তাহা আহার করিতেন। কি সুন্দর, কি মধুর সে দৃশ্য।"

হেমচন্দ্র বি-এ পাশ হইবার পরই জ্যেষ্ঠতাত মহাশয় তাঁহার রাধানগরের স্কুলের প্রধান শিক্ষক পদে নিযুক্ত করেন। শ্রীযুক্ত নীলাম্বর মুখোপাধ্যায়, শ্যামাচরণ গাঙ্গুলী, দীননাথ মুখোপাধ্যায়, তারিণীচরণ চট্টোপাধ্যায়, শিবচন্দ্র গুঁই, প্রসন্নকুমার ঘোষ প্রভৃতি প্রথিতনামা শিক্ষকগণ এই বিদ্যালয়ের শিক্ষকতা করিতেন এবং এই বিদ্যালয় উমেশচন্দ্র বটব্যালের ন্যায় ছাত্র প্রসব করিতেন। জ্যাঠা মহাশয়ের আয় তিনশত টাকার মধ্যে দুইশত টাকা নানা সাংসারিক কষ্ট ক্লেশ স্বীকার করিয়াও এই স্কুলে ব্যয়িত হইত। সেদিন বহুদিন গিয়াছে।

দ্বারকেশ্বর সে বিদ্যালয় গৃহ গ্রাস করিয়াছে এবং আমরাও কেহ সে মহাপ্রাণতার উত্তরাধিকারী হই নাই।

আইন বিশেষ ফৌজদারী আইনের সহিত বাঙ্গলা সাহিত্যের কেন যে এতটা ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ, তাহা জানি না; ডিপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটের দল সাহিত্যক্ষেত্রে অগ্রণী। বন্দেমাতরংএর কবি, বাজিল ব্রিটিশ বাদ্যের কবি, স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায়রের কবি, আমার দেশের কবি—সকলেই এই শ্রেণীভুক্ত। ডিপুটিগিরির জন্য দরখাস্ত করিয়া লাটুশ সাহেবের ন্যায় কোন গুণজ্ঞের মহিমায় মাইকেল ডিপুটী পদলাভে হতাশ্বাস হন। যদি ডিপুটিগিরি জুটিত হয়-ত তাহা হইলে তাঁহার মান্দ্রাজ গমনও ঘটিত না,—Captive Ladyর জন্মগ্রহণ করা হইত না। হেমচন্দ্র জুনিয়ার গবরমেণ্ট প্লীডার, রমেশচন্দ্র উড়িষ্যা বিভাগের কমিশনার হইয়া ফৌজদারী আইনের সহিত বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট। চেষ্টা করিলে বাণী-মন্দিরে ফৌজদারী-আইনের দোর্দ্দণ্ড প্রতাপের আরও পরিচয় পাওয়া যাইতে পারে। নবনীত কোমল হৃদয় না হইলে ডাকবাবুদের হর্ত্তাকর্ত্তা দীনবন্ধুও অনেককে ফৌজদারী সোপর্দ্দ করিতে পারিতেন।

Captive Ladieর কথায় মাইকেলের কবি-প্রতিভার আর এক দিকের কথা মনে পড়িতেছে। দাম্ভিক মধুসূদন আবাল্য দাম্ভিক; তিনি উত্তরকালে মহাকবি হইলে যিনি তাঁহার জীবনাখ্যায়িকা লিখিয়া অমর হইবেন, তাহার নির্দ্দেশ করিতে অষ্টাদশবর্ষীয় বালক পশ্চাৎপদ হন নাই। শুনা যায়, পাঠ্যাবস্থায় লর্ড কর্জ্জন বন্ধুদিগকে বলিতেন যে, তিনি ভারতবর্ষের ভাইসরয় হইবেন কিম্বা ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী হইবেন, তাহা স্থির করিতে পারিতেছেন না, তাঁহার একটা হইয়া গিয়াছে, দ্বিতীয়টা না হওয়াও অসম্ভব

নহে। দাম্ভিকতা ও প্রতিভার এইরূপ চির দিন জয়-জয়কার। স্বয়ং শুকদেবও "তেজীয়সাং ন দোষায়" বলিয়া দাম্ভিকতার দোহাই দিতে বাধ্য হইয়াছেন। অষ্টাদশবর্ষীয় মধুসূদন গৌরদাস বাবুকে টমাস মুরের পদে বরণ করিয়াছিলেন। যোগীন্দ্র বাবু গৌরদাস বসাক মহাশয়কে আর্থার হ্যালামের পদ দিয়া স্বয়ং টমাস মুরের পদ গ্রহণ করিয়া দেশকে এবং বঙ্গ-সাহিত্যকে ধন্য করিয়াছিলেন। মাইকেলের অমর আত্মা তাহাতে তৃপ্ত হইয়াছেন, সন্দেহ নাই; আজ বাৎসরিক শ্রাদ্ধ-বাসরে যেন তাহা স্বতঃই প্রতীয়মান হইতেছে। মাইকেল বোধ হয় বসওবেল শ্রেণীর চরিতকার পাইলে তুষ্ট হইতেন না—টমাস মুর তাঁহার আদর্শ হইত বলিয়াই মনে হয়। গৌরদাস বাবু তাঁহাকে রেয়াৎ করেন নাই। আর যে গৌরদাস বাবুর সযত্নরক্ষিত উপাদানের সুব্যবস্থা করিয়া লোকনয়নসমক্ষে মাইকেলের জীবনচরিত আলো ও ছায়ার অনুপাতে যোগীন্দ্র ও নগেন্দ্রবাবু আঁকিয়াছেন, তাঁহারাও তাঁহাকে রেয়াৎ করেন নাই। তাঁহারা সুনিপুণ এবং গুণজ্ঞ অথচ ধর্ম্মমুখাপেক্ষী শিল্পী। সার্থক রং ফলাইয়াছেন, সার্থক তুলি ধরিয়াছেন, Cromwellও তাঁহাদিগকে স্বীয় চিত্র আঁকিতে দিতে বোধ হয় পশ্চাৎপদ হইতেন না।

স্বর্ণ পাটিকেলে তাঁহারা উচ্চচূড় স্মৃতিমঠ আকাশপটে গাঁথিয়া তুলিয়াছেন।

যোগীন্দ্র বাবু মাইকেলের জীবন-চরিত-লেখক হইয়া সাহিত্যলীলা শেষ করিলেও ধন্য হইতেন। কিন্তু তিনি কবি—কবিভূষণ। অথচ কড়া-পাকের মাইকেলী মসলা এতদিন ঘাঁটিয়াও তাঁহার ছাঁচ স্বতন্ত্র। ক্যাপটিব লেডি মাইকেলের কবি-প্রতিপত্তির কুশাগ্র প্রসার-সাধনেও সমর্থ হয় নাই; কিন্তু দেশী পোষাকে সেই সংযুক্তা মাইকেলের মন্ত্রশিষ্যের হাতে পড়িয়া এক মুহূর্ত্তে পাঠক, সমালোচক ও বিদ্রূপকারীর হৃদয় অধিকারে সমর্থ। সাহিত্য ক্ষেত্রে এ এক অপূর্ব্ব কাহিনী। তাই তাঁর তুলনা টমাস মুরের সহিত। নবীনচন্দ্র ব্যতিরেকে বৃত্র-সংহারের দুর্দ্দশার পর বঙ্গ-সাহিত্যে মহাকাব্যের মকসা বুলাইতে আর কেহ সাহসী হন নাই। কৃতী কবিভূষণ নূতন আশার বাঁশী শুনাইয়াছেন। কবিই কবিকে জানে, চেনে, বোঝে। নতুবা মাইকেল-জীবন-রচনায় বিলম্ব হইত।

অষ্টাদশ বর্ষে গৌরদাসকে মাইকেল লিখিয়াছিলেন—"How I should like to see you write my life if I happen to be a great poet, which I am almost sure I shall be, if I can go to England."

ইংলণ্ডে যাইবার অপেক্ষায় তাঁহার মহাকবি হওয়া বন্ধ হয় নাই এবং ইংলণ্ড হইতে ফিরিয়া আসিয়াও মহাকবিত্বের নূতন বিশেষ পরিচয় দেওয়া ঘটে নাই। প্রবীণ বয়সেও বাল্যের ইংলণ্ডগমনবাসনা যে কতদূর জাগরূক থাকা সম্ভব এবং সে বাসনা যথার্থ ফলবতী হইলে যে ফল ফলে, তাহার সাক্ষ্য দিতে বর্ত্তমান পক্ষ প্রস্তুত। তবে ইংলণ্ডে যাইয়া কৃতিত্বলাভের জন্য দেশীয় আচার-ব্যবহার, বেশ ভূষা সব বিসর্জ্জন দিয়া, পুরা-দস্তুর সাহেব—অন্ততঃ বাহিরেও সাজিতে হয়—একথা তীব্র জেরার উত্তরেও প্রকাশ করিতে পারি নাই এবং পারিব না।

ফ্রান্সের মধ্য দিয়া বিলাতযাত্রাকালে মনে হইয়াছিল—নাসীকের নিকট দণ্ডকারণ্য বর্ণনা মাইকেলের মনে স্থান কোনমতেই

পাইতে পারে নাই; মধ্য ফ্রান্সের সাজান বাগান দেখিয়াই তিনি সে অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। সে কথা নাকি প্রামাণিক নহে, কারণ কবির মেঘনাদ-বধ রচনা সম্পূর্ণ হইবার পর তাঁহার ইংলণ্ডযাত্রা। পুরাতন সংস্করণের সহিত মিলাইয়া না দেখিলে একথা সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করিতে পারি না। দণ্ডকবর্ণন সম্বন্ধে ফরাসি প্রাকৃতিক দৃশ্যের উজ্জ্বলতা বড় অধিক ভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। হয় ত ফিরিয়া আসিয়া সে চিত্রের ঔজ্জ্বল্য সাধন করিয়া থাকিবেন—অথবা কবি-প্রতিভার নিকট সকলই সম্ভব।

বিজাতীয় ভাবের বিসদৃশ গোঁড়া হইলেও বিজাতীয় ছাঁচেই দেশীয় আদর্শের প্রতি আন্তরিক আস্থা মাইকেলের চিরদিন।

"Written at the Hindoo College by a Native student" কবিতাটী এ বিষয়ে সাক্ষ্য দিতেছে।

Gray's Elygyর ধরণে বাল-কবি গাহিতেছেন :—

"Perchance unmarked some here
　　are budding now,
Whose temples shall with Laureat
　　leaves be—crowned.
Tuned by the sisters nine whose
　　angel tongue
Shall charm the world with their
　　enchanting song.
Some perchance here are
Who with a Newton's glance
　　shall nobly trace,
The course mysterious of each
　　wandering star
And like a God unveil the hidden
　　face
Of many a plant to man's
　　wondering eye
And give their names to immor-
　　tality."

ঘটিয়াছিলও তাই। বঙ্গদেশে সে যুগে যত গৌরবমণ্ডিত জ্যোতিষ্কের আবির্ভাব হইয়াছিল, একত্রে কখনও তাহা হয় নাই—হইবে না। সে কথার বিস্তারিত বর্ণনা যোগেন্দ্রবাবুর মাইকেল জীবনী এবং শ্রদ্ধাস্পদ শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের রামতনু লাহিড়ীর জীবন-চরিতে দেখিতে পাইবেন। এখন সে কথার বহুল বিবরণ নিষ্প্রয়োজন এবং অসাময়িক।

পরযুগে রবীন্দ্রনাথ, জগদীশচন্দ্র ও প্রফুল্লচন্দ্র দেশ বিদেশে have given their names to immortality—শিল্প-সাহিত্য বিজ্ঞান রাজনীতি ও অন্যান্য ক্ষেত্রেও নানা দেশনায়ক কবির ভবিষ্যৎ বাণীর সার্থকতা সাধন করিয়াছেন। কিন্তু ইউরোপে অবস্থানকালীন টেনিসান গোল্ড্‌ষ্মিথ ভিক্টর হুগোর সহিত সখ্যতাসূত্রে আবদ্ধ সেই immortalদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ immortal শ্রীমধুসূদন। Kiplingএর এখনও ইচ্ছা যে the East is East—the West is West and the twain shall ne'r meet. বীর—কবি মধুসূদন, হেমচন্দ্র, রঙ্গলাল যে দুন্দুভিনিনাদে দিগন্ত ধ্বনিত করিয়া গাহিয়াছিলেন, জাতীয় হৃদয়ে আজ তাহার প্রতিধ্বনি উঠিয়াছে। হিন্দু মুসলমানের দ্বন্দ্ব বিদ্বেষ অবলম্বন না করিয়াও দেশ-হিতৈষণায় ও বীররসে হৃদয় কিরূপ ভাসিতে পারে, মধুসূদনের নিপুণ লেখনী তাহা জীবন্তভাবে দেখাইয়াছে। Bengal Ambulance Corps, Bengali Regiment, University Corps, ও Bengal Light Cavalry সে প্রেরণার আংশিক বিকাশ মাত্র। সুবেদার মিত্র, সুবেদার-মেজর শৈলেন্দ্রনাথ বসু এবং রণদাসাহা

সে বিকাশের অগ্রদূত। দূরদৃষ্টি ইটালীরাজ এবং রাজকবি ভিক্টর ইমানুয়েল স্বহস্তে লিখিত বাঙ্গলিপিতে "Ring between the Oriental and Occidental" বলিয়া মধুসূদনকে সম্মানিত করিতে পশ্চাৎপদ হন নাই। আজ ভারতসাহায্যে বিজয়ী ইউরোপীয় সেনার অগ্রণীগণ সে কথার প্রত্যাহার না করিয়া সমর্থন করিবেন, সন্দেহ নাই। খেদ এই যে, নশ্বর নেত্রে মধুসূদন এ বীরকীর্ত্তি দেখিতে পাইলেন না,—তাঁহার নশ্বর লেখনী এই বীরকাহিনী গাহিয়া দেশবাসীকে উৎসাহিত, চমকিত, পুলকিত করিতে পারিল না। তা নাই হউক, তাঁর অমর আত্মা আজ এ পুণ্য শ্রাদ্ধবাসরে আমাদের প্রীতি অর্ঘ্য লইবার জন্য এবং দেশবাসীকে উৎসাহিত করিবার জন্য সভাস্থ। আমরা নতমস্তকে তাঁহার আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করি, তাঁহার যশোগান করি, তাঁহার জয় উচ্চারণ করি, কারণ নবভাবে জাতীয়-জীবন-উন্মেষণ-ব্রতে তিনিই প্রধান এবং আদিম ঋত্বিক।

তাঁহারই কথার আংশিক পরিবর্ত্তন করিয়া আজ সমগ্র জাতীয় জীবন সমন্বয়ে তাই শ্রদ্ধা-প্রীতি সহিত গাহিতে চায়—

> শুভক্ষণে গর্ভে তোমা শ্রীমধু ধরিল
> জাহ্নবী জননী তব—তব কীর্ত্তিগানে
> পূরিবে ভারত চির, কহিনু তোমারে,
> দেবতুল্য অমর হইবে।

শ্রীদেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী।

ইরাবতী তীরে।

পঞ্চনদের নিদাঘ-তাপ উপভোগ করিতে করিতে যে দিন প্রথম লাহোর নগরে পদার্পণ করি, সেই দিনই বিলক্ষণ জ্ঞান জন্মে যে, এ নদী-মাতৃক বঙ্গদেশ নহে। বঙ্গের রাজধানী কলিকাতা হইতে পঞ্জাবের রাজধানী লাহোর যে অনেক বিষয়েই বিভিন্ন, প্রথম দৃষ্টিই তাহা মনের মধ্যে জাগাইয়া দেয়। প্রশস্ত রাজপথ ও সুদৃশ্য বৃক্ষশ্রেণীর মধ্যেও এমন একটা শুষ্কতা অনুভব করি, যাহা বঙ্গের সিক্ত বায়ুতে ঘোর গ্রীষ্মকালেও কল্পনার বিষয়ীভূত।

যে সুদৃশ্য বৃক্ষশ্রেণী ও প্রশস্ত রাজপথের কথা বলিলাম, তাহা লাহোর নগরের নূতন অংশে। প্রাচীন অংশ বা 'সহর' বারাণসীর বাঙ্গালী টোলা ও আগরা প্রভৃতি প্রাচীন সহরের স্মৃতি জাগাইয়া দেয়। প্রাচীর ও পরিখা প্রায় অন্তর্হিত হইয়া থাকিলেও, প্রাচীন নগরে প্রবেশের সেই দ্বার সেকাল ও একালের মধ্যে যে প্রভেদ, তাহার সাক্ষ্য স্বরূপ এখনও বর্ত্তমান। সেই নিবিড় বসতি, সেই বায়ু ও আলোকের সহিত সংগ্রাম, সেই নাসিকা-তৃপ্তিকর নর্দ্দমা নিঃসৃত গন্ধ, সেই বাসগৃহ ও বিপণী-শ্রেণীর একত্র সমাবেশ বিলক্ষণ বুঝাইয়া দেয় যে, নগর নির্ম্মাণে স্বাস্থ্যতত্ত্ব নিতান্তই আধুনিক সামগ্রী।

লাহোরের যে অংশে গবর্ণমেণ্টের আফিস আদালত অবস্থিত এবং ইংরেজ ও অধিকাংশ বিদেশী লোকের বাস বা কর্ম্মস্থল, তাহা বাস্তবিকই সুন্দর। ভারতের প্রধান নগরী কলিকাতা সে সৌন্দর্য্যের গর্ব্ব অনুভব করিবার একেবারেই অধিকারিণী নহে। চৌরঙ্গী, ময়দান ও বৃহৎ বৃহৎ অট্টালিকা কলিকাতার সৌন্দর্য্য অপেক্ষা সমৃদ্ধিরই

অধিক পরিচায়ক। লাহোরে কিন্তু কর্তৃপক্ষের অনুগ্রহে জনাকীর্ণ নগরী হইতে প্রকৃতি দেবীকে বিদায় গ্রহণ করিতে হয় নাই। প্রমোদোদ্যান ও শস্পক্ষেত্র তাঁহার পত্র পুষ্প বক্ষে ধারণ করিয়া অনেক স্থানেই বিরাজমান। এরূপ বৃক্ষ-পত্রাদি-শোভিত বিশাল রাজপথ বাঙ্গালার কোন নগরেই নাই। গ্রীষ্ম দুঃসহ হইলেও সৌভাগ্যক্রমে বঙ্গদেশের ন্যায় দীর্ঘকাল স্থায়ী নহে। কিন্তু শীতের প্রতাপ যথেষ্ট। কেবল পর্জ্জন্য দেবই সাধারণতঃ তদ্দূর প্রতাপ বিস্তার করিতে পারেন না, কিন্তু কখন কখন তাঁহারও বিলক্ষণ বিক্রম দেখা গিয়াছে। বাঙ্গালায় বসন্ত ঋতুর অস্তিত্ব নাই বলিলেও চলে। শীতের পরই প্রায় অতর্কিত ভাবে গ্রীষ্ম আসিয়া গাত্রজ্বালা উৎপাদন করে। লাহোরে বৎসরে প্রায় তিনমাস প্রস্ফুটিত কুসুমের প্রাচুর্য্য ও নাতিশীতোষ্ণ জলবায়ু বসন্তের আগমন মনে জাগাইয়া তোলে।

উপরে 'ইরাবতী তীরে' লিখিয়াছি, পাঠক, মাপ করিবেন। পূর্ব্বে লাহোর দুর্গের পাদদেশ ধৌত করিয়া রাভি বা ইরাবতী নদী প্রবাহিত ছিল বটে, কিন্তু এক্ষণে নদীটী প্রায় ৩ মাইল সরিয়া গিয়াছে। বোধ হয় লৌহবর্ত্মের শুভাগমনের সংবাদ পাইয়াই, ইরাবতী দেবী একটু স্থান ছাড়িয়া সরিয়া দাঁড়াইয়াছেন। গঙ্গা যমুনাদির ন্যায় তিনিও পর্ব্বত-দুহিতা, তবে তাঁহার পার্ব্বত্য ভাবটী এখনও পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান। তিনি এখনও গৈরিক বাসে, কখনও স্থূল, কখনও সূক্ষ্ম শরীরে মানব-সমাজে দর্শন দিয়া তৃপ্তিলাভ করেন। তবে গবর্ণমেণ্টের পূর্ত্তবিভাগের প্রতাপে তাঁহাকেও দেহের স্থূলতা কমাইয়া শস্যক্ষেত্রের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিতে হইয়াছে।

অল্পের মধ্যে লাহোরে প্রাদেশিক সভ্যতার সকল উপকরণই আছে। বিশ্ববিদ্যালয়, ছোটলাট ও তাঁহার সভা, মেডিক্যাল কলেজ, পুরুষ ও স্ত্রীলোকের ডাক্তারখানা, জলের কল, বৈদ্যুতিক আলো, চীফকোর্ট (হাইকোর্টের ক্ষুদ্র সংস্করণ) মিউজিয়ম, চিড়িয়াখানা, সকলই দেখিতে পাওয়া যাইবে। অবশ্য ট্রাম গাড়ী নাই। চিড়িয়াখানাটীও ছোট এবং মিউজিয়মটীকে একেবারে পকেট এডিশন বলিলেও চলে। কিন্তু এখানকার অর্দ্ধ-উলঙ্গ একঘোড়ার টানা গাড়ী, ট্রামগাড়ীর অভাব অনেকটা দূর করিয়াছে এবং পশুশালা ও যাদুঘর ক্ষুদ্র হইলেও দর্শনীয়। বলা বাহুল্য, লাহোর কেবল আধুনিক সভ্যতার স্থান নহে। নিজ লাহোর নগরই বহু প্রাচীন কীর্ত্তিতে গৌরবান্বিত এবং ইহার চতুঃপার্শ্বস্থ বহু স্থানই অসংখ্য বিপ্লবের মধ্যে কোনমতে আত্মরক্ষা করতঃ যুগ যুগান্তের সভ্যতার নিদর্শন বক্ষে ধারণ করিয়া আছে। এখানকার ক্ষুদ্র যাদুঘরে প্রাচীন কীর্ত্তির যে সকল নিদর্শন রক্ষিত আছে, তাহা ভারতের সন্তান মাত্রেরই বিস্ময় ও গৌরবের সামগ্রী। সুদূর উত্তর পশ্চিম সীমান্তে (যেখানে এখনও প্রবল বৃটিশ-রাজ-শাসনদণ্ড উপেক্ষা করিয়া কত বর্ব্বরজাতি আপনার পার্ব্বত্য উশৃঙ্খলতার মধ্যে স্বাধীনভাবে বাস করিতেছে) স্মরণাতীত কালে শাক্যসিংহের সাম্যবাদ কতদূর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল ও সেই সঙ্গে সঙ্গে বৌদ্ধধর্ম্ম কতকটা পৌত্তলিকতায় পরিণত হইলে ভাস্কর্য্য শিল্পের কতদূর উন্নতি সাধিত হইয়াছিল, তাহা এই ক্ষুদ্র যাদুঘর বৃহৎ রূপেই বুঝাইয়া দেয়। অনেক প্রাচীন শিলালিপি ও মুদ্রা এখানে সযত্নে রক্ষিত আছে। শিলালিপির মধ্যে কতকগুলির

বর্ণমালা এখনও অপরিচিত। প্রত্নতত্ত্ববিৎগণের চেষ্টায় কালে এগুলির উদ্ধার হইলে ভারতের প্রাচীন ইতিহাসের অঙ্গ হইতে যে আরও খানিকটা আবরণ উন্মুক্ত হইবে, তাহা নিশ্চিত। উপযুক্ত পণ্ডিত কর্ত্তৃক এই সকল অতি প্রাচীন শিলালিপি পাঠোদ্ধারের চেষ্টা হইতেছে কি না, তাহা জানি না।

লাহোর সমুদ্রতীর হইতে বহুদূরে অবস্থিত বলিয়া বৈদেশিক দ্রব্য এখানে ব্যয়সাধ্য। স্থানীয় দ্রব্যাদিও অধিকাংশই দুর্ম্মূল্য। বাঙ্গালীকে যে মৎস্যের অভাব বিশেষরূপ অনুভব করিতে হয়, তাহা বলাই বাহুল্য। বিশুদ্ধ ঘৃতও প্রায় অতীতের বস্তু হইয়া দাঁড়াইয়াছে। মাংস ও আটা বাঙ্গালা অপেক্ষা সুলভ হইলেও বাঙ্গলার মাটী, বাঙ্গালার জলে উৎপন্ন বিবিধ ফল তরকারীর প্রাচুর্য্য বাঙ্গালী এ দেশে আসিয়া সহজে ভুলিতে পারে না। যখন বাজারে গিয়া শুনিতে পায়, আমের দর ৮০ কি ১৲ সের, অথবা সাধারণ একটী আতার মূল্য ৵০, তখনই সাহিত্যের হিসাবে না হইলেও, মন স্বভাবতঃই বলিয়া উঠে 'হে বঙ্গ, ভাণ্ডারে তব বিবিধ রতন, তা সবে' ইত্যাদি।

অবশ্য আঙ্গুর দাড়িম্বাদি বাঙ্গালা অপেক্ষা সুলভ, কিন্তু যুদ্ধের বাজারে তাহাও বিশেষ সুলভ নহে।

পঞ্জাবের জলবায়ুরও বিলক্ষণ অধঃপতন ঘটিয়াছে। প্লেগ ও কলেরার কথা দূরে থাকুক, বাঙ্গালীর শুভাগমনেই হউক, কি যে জন্যই হউক, ম্যালেরিয়া এখানে বৎসরের কয়েক মাস বেশ প্রতাপশালী। প্লীহা ও যকৃতের ভার বৃদ্ধির সহিত পঞ্জাবী বেশ পরিচিত হইয়া পড়িতেছে।

অপ্রবাসী বাঙ্গালীরও জানা আছে যে, বঙ্গদেশ হইতে পশ্চিমে আসিলেই আর নগ্নশির বড় দেখা যায় না। কোন কোন বাঙ্গালীও এখন পঞ্জাবী পাগ্‌ড়ীর অনুকরণ করিতেছেন। বাঙ্গালার প্রাচীন পুস্তকাদিতে পাগ্‌ড়ী ব্যবহারের পরিচয় পাওয়া যায়। কেন এবং কোন্ সময় যে ইহা বঙ্গদেশ হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়াছে, বলিতে পারি না। পঞ্জাবের প্রখর রৌদ্র ও প্রচণ্ড শীত দুই-ই মস্তক আবৃত রাখিতে বলিয়া দেয়। উচ্চ নীচ সকল শ্রেণীর মধ্যেই পাগ্‌ড়ীর ব্যবহার প্রচলিত। আজকাল পোষাকে পঞ্জাবী শনৈঃ শনৈঃ ইংরেজের অনুকরণ করিতেছে। নেকটাই এর ব্যবহার এত অধিক যে, সময় সময় ইহা পাজামা ও সার্টের উপর কোটের সাহচর্য্য ভিন্নও বিরাজ করিতে কুণ্ঠিত নহে। পাজামা, দেশী পাদুকা ও পাগ্‌ড়ী নিম্নশ্রেণীর মধ্যেও অত্যধিক পরিমাণে প্রচলিত। নিম্নশ্রেণীর স্ত্রীলোকেরাও পাজামা ও পাদুকা ব্যবহারে অভ্যস্ত। উচ্চশ্রেণীর স্ত্রীলোকেরাও যে অনভ্যস্ত, এমন কথা বলিতে পারি না।

লাহোরের প্রাচীন কীর্ত্তির মধ্যে নগরপ্রান্তস্থ দুর্গ, তাহার নিকটবর্ত্তী বাদ্‌সাহী মস্‌জিদ, রণজিৎসিংহ, গুরু অর্জ্জুন সিংহ প্রভৃতির সমাধি, সুবর্ণ মস্‌জিদ প্রভৃতি দ্রষ্টব্য। বাদসাহ জাহাঙ্গীর ও তাঁহার ভুবনবিখ্যাত পত্নী নুরজাহানের সমাধি সহর হইতে কিছু দূরে। সাজাহানের সুবিখ্যাত শালিমার উদ্যানও কয়েক মাইল দূরে।

দুর্গটী অতি প্রাচীন, ইতিহাস-বিশ্রুত জয়পাল ও আনন্দ পালের স্মৃতির সহিত জড়িত। সম্রাট্‌ আকবর ইহার পূর্ণনির্ম্মাণকর্ত্তা। শিখ সৌভাগ্যের সময় ইহা মহারাজ রণজিৎ সিংহের দুর্গ ও বাসভবনে পরিণত হয়। দিল্লী ও আগরার দুর্গের ন্যায় বাদসাহী

আমলের সুখ সমৃদ্ধির নানা নিদর্শন (অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রাকারে হইলেও) ইহার মধ্যে বিরাজমান। সেই দেওয়ানী খাস্ ও দেওয়ানী আম, সেই অন্তঃপুরে বিবিধ সুখভোগ ও বিলাসের ব্যবস্থা। একটী মতি মস্‌জিদও ইহার কুক্ষিগত। বর্ত্তমান কালে একটী ক্ষুদ্র গৃহ বিবিধ প্রাচীন অস্ত্র ও যুদ্ধোপকরণের প্রদর্শনী স্বরূপ ব্যবহৃত হইতেছে।

বাদসাহী মস্‌জিদ একটী প্রকাণ্ড ভজনালয়—সম্রাট্ আওরঙ্গজেবের কীর্ত্তি—মক্কার অল-ওয়ালিদ মস্‌জিদের অনুকরণে নির্ম্মিত। চারিধারে চারিটী মিণারেট্। মস্‌জিদে প্রবেশের তোরণোপরি কাচপাত্রে হজরৎ মহম্মদ এবং মুসলমান ধর্ম্মের অপর কয়েক জন নেতার স্মৃতিজ্ঞাপক দ্রব্যাদি রক্ষিত হইয়াছে। কথিত আছে, মহম্মদের মস্তকের কেশ, উষ্ণীষ, ব্যবহৃত বস্ত্র ও পাদুকা প্রভৃতি এবং বিবি ফতেমার রুমালাদি এই স্থানে অবস্থিত। তৈমুরলঙ্গের দিগ্বিজয় কালে এই দ্রব্যগুলি নাকি তিনি ডামাস্কাস নগর হইতে সংগ্রহ করেন এবং তাহার বংশধর বাবর কর্ত্তৃক ইহা ভারতবর্ষে আনীত হয়। অনেক ভাগ্য-বিপর্য্যয়ের পর এগুলি আবার চক্রবৎ পরিবর্ত্তনে মুসলমানের হস্তে আসিয়া এই স্থানে রক্ষিত আছে। রণজিৎ সিংহের প্রাধান্য কালে এই মস্‌জিদ গৃহে তাঁহার যুদ্ধোপকরণ রক্ষিত হইত।

রণজিৎ সিংহের সমাধি গৃহে তাঁহার দেহাবশেষ ভস্ম রক্ষিত। রণজিৎ সিংহের সহিত তাঁহার ৪টী রাণী ও ৭টী দাসী সহমৃতা হয়। দুইটী পারাবতও ঘটনা ক্রমে সেই চিতাগ্নিতে দগ্ধ হইয়া জীবন-লীলা সাঙ্গ করে। ইহাদের সকলেরই দেহ ভস্ম এই সমাধি-স্থলে রক্ষিত। রণজিৎ সিংহের পুত্র খড়্গ্ সিংহ ও পৌত্র নেহাল সিংহের সমাধি তাঁহার নিজ সমাধির পার্শ্ববর্ত্তী একই অট্টালিকার ভিন্ন অংশে।

অর্জ্জুন সিংহের সমাধি গৃহতল মর্ম্মর প্রস্তরে গ্রথিত—মহারাজ রণজিৎ সিংহের নির্ম্মিত। অর্জ্জুন সিংহ শিখদিগের বেদব্যাস। শিখ ধর্ম্মগ্রন্থের বিভিন্ন লিপি সংগ্রহ করতঃ তিনি তাহার সম্পাদন করেন, শিখদিগের আচার পদ্ধতি তিনি নির্দ্ধারণ করেন। তাঁহার সময়েই অমৃতসর শিখদিগের প্রধান আড্ডায় পরিণত হয়। মুসলমান সম্রাটের কোপানলে তিনি লাহোর দুর্গে অবরুদ্ধ হন। ভক্ত শিখ-দিগের বিশ্বাস, তিনি সেই সময়ে একদিন ইরাবতীতে অবগাহন করিবার অবসর পাইয়া অন্তর্হিত হন। কথিত আছে, যেখানে তাঁহার সমাধি গৃহ নির্ম্মিত, সেই স্থানে পূর্ব্বে পুণ্য-তোয়া ইরাবতীর সলিল ক্রীড়া করিত। এই সমাধিগৃহ শিখদিগের এক তীর্থ ক্ষেত্র স্বরূপ—অনেক সময়ে ধর্ম্মগ্রন্থের পাঠ ও ব্যাখ্যার শব্দে মুখর।

দুর্গের যেস্থানে এখন সৈন্যবিভাগের রসদাদির গুদাম গৃহ অবস্থিত, তাহার একটু উত্তরে লবের প্রাচীন মন্দির। মন্দিরের পাদদেশ দুর্গের বহির্দেশস্থ ভূমির সহিত একই সমতলে অবস্থিত। কথিত আছে, রঘুবংশাবতংস রামচন্দ্রের পুত্র হইতেই লোহবর বা লাহোর নামের উৎপত্তি, এবং লাহোর নগর তাঁহারই স্থাপিত। লাহোর হইতে কিয়দ্দূর-বর্ত্তী কুশাবর বা কসুর নগর কুশ কর্ত্তৃক স্থাপিত, এরূপ প্রবাদ। উত্তর সীমান্তস্থ গ্রাম্য গীতি অনুসারে লাহোর পূর্ব্বে বনের নিকটে ছিল। বিভিন্ন ক্ষত্রিয় জাতি লাহোর নগরকে তাহাদের আদি স্থান বলিয়া নির্দ্দেশ করে। ইহা যে নানা সময়ে নানা রাজপুত বা

ক্ষত্রিয় রাজবংশের ক্রীড়াভূমি ছিল, তাহা নিশ্চিত। প্রত্নতত্ত্বের আলোচনা করিতে গিয়া পাঠকের বিরক্তি উৎপাদনের চেষ্টা করিব না। সংক্ষেপে বলা যাইতে পারে, লব কর্ত্তৃক স্থাপিত না হইলেও ইহা যে বহু-প্রাচীন কাল হইতে তাঁহার স্মৃতির সহিত জড়িত, তাহা নিশ্চিত। নানা ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণ বংশের রাজত্বের পর ইহা গজনীপতি সুলতান মামুদের হস্তে আইসে। মামুদ লাহোর নগর পুনর্নির্ম্মাণ করেন। ভারতবর্ষে লাহোর মুসলমান রাজবংশের একটী আদি উপনিবেশ। মুসলমান রাজগণের ভাগ্যচক্রের বিবিধ আবর্ত্তনের মধ্যে লাহোরের পুনঃ পুনঃ উল্লেখ পাওয়া যায়।

প্রাচীন হিন্দুকীর্ত্তি এখানে এখন অল্পই বিদ্যমান্ আছে। নগর হইতে প্রায় তিন মাইল দূরবর্ত্তী ইচ্‌রা গ্রামের নিকটস্থ "ভৈরোঁকা থান" তাহার একটী। এখানে ভৈরবের শিলাময় বিগ্রহের পূজা হয় এবং অনেক সাধু সন্ন্যাসীর সমাবেশ ও সমাধি দেখিতে পাওয়া যায়। এখানে কয়েকজন পঞ্জাবী কানফট্ট যোগীর সাক্ষাৎকার লাভ হইয়াছিল। বাঙ্গালার ময়নামতী ও গোপীচাঁদের কীর্ত্তির সহিত তাহারা বিলক্ষণ পরিচিত। রাণী ঝিন্দনের প্রিয়পাত্র সেনাপতি লাল সিংহ এখানে অনেক অর্থ ব্যয়ে হর্ম্ম্যাদি প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন।

লাহোরে মুসলমান কীর্ত্তির অভাব নাই। মস্‌জিদ ও সমাধি নগরের সর্ব্বত্রই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। নগর হইতে প্রায় ৩ মাইল উত্তর পশ্চিমে সাহদারায় জাহাঙ্গীরের বিখ্যাত সমাধি গৃহ। তাঁহার প্রাসাদ নির্ম্মাতা পুত্র সাজাহান ইহারও নির্ম্মাণ কর্ত্তা। সমাধি গৃহের সুবিশাল প্রাঙ্গন চতুর্দ্দিকে প্রাচীর বেষ্টিত, উত্তর ও দক্ষিণ দিকে তোরণ। প্রাঙ্গনের প্রথম খণ্ডের চতুর্দ্দিকে পান্থশালা দ্বিতীয় খণ্ড পয়ঃপ্রণালী ও উৎসমালায় অলঙ্কৃত। সমাধিস্থল শ্বেত মর্ম্মর প্রস্তরে গ্রথিত, তদুপরি কোরাণের মন্ত্র খোদিত। নুরজাহানের প্রিয় দিলকুসা উদ্যানে জাহাঙ্গীরের দেহ রক্ষিত। প্রাচীরের কিয়দংশ এক সময়ে ইরাবতীর কুক্ষিগত হইয়াছিল, কিন্তু এক্ষণে দেবী স্থানটী ছাড়িয়া দিয়াছেন। শিখরাজগণের হস্তে এই সমাধি গৃহ এক সময়ে বিশেষরূপে লাঞ্ছিত হয়। কথিত আছে, ইহার অনেক মণিরত্ন এখনও অমৃতসরের সুবর্ণ মন্দিরের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিতেছে। অনেক বহুমূল্য প্রস্তর না কি আফগান-অতিথিদিগের কৃপায় অন্যত্র অপসারিত হইয়াছে।

মমতাজমহলের পিতা নুরজাহানের ভ্রাতা আসফ্‌জার মর্ম্মর-প্রস্তর-গ্রথিত সমাধি জাহাঙ্গীরের সমাধিরই নিকটবর্ত্তী। সমাধি গৃহটী ইষ্টক-নির্ম্মিত। ইহাও সম্রাট্ সাজাহানের কীর্ত্তি।

অদূরেই নুরজাহান এবং তাঁহার কন্যা লাড্‌লী বেগমের সমাধি। কালের কুটিল গতিতে মহারাজ রণজিৎ সিংহের হস্তে বিবিধ লাঞ্ছনার পর এই প্রথিত-নাম্নী সম্রাট-পত্নীর চির বিশ্রাম-গৃহ গোশালায় পরিণত হইয়াছিল। ইংরেজরাজের অনুগ্রহে তাঁহার সম্মান রক্ষা পাইয়াছে, কিন্তু সমাধি গৃহটী যে তাঁহার ন্যায় ঐশ্বর্য্যশালিনী রমণীর উপযুক্ত, ইহা কেমনে বলিব?

শালিমার উদ্যানও সাজাহানের কীর্ত্তি। উদ্যানটী ত্রিতল বা চতুস্তল। বিবিধ ফল পুষ্পাদির বৃক্ষ, ইষ্টক-গ্রথিত জলাশয় এবং প্রায় সার্দ্ধ চারি শত কৃত্রিম উৎসে ইহা

সুশোভিত। গ্রীষ্মকালে ইহা বাদসাহের পুরাঙ্গনাগণের বিলাসভূমি ছিল। চতুঃপার্শ্বস্থ গৃহগুলিতে তাঁহারা অবস্থিতি করিতেন। গৃহগুলির পূর্ব্ব সৌন্দর্য্যের এক্ষণে কিছুই নাই, কিন্তু উদ্যানটী এখনও মনোহর। অদূরবর্ত্তী সেনানিবাস হইতে অপরাহ্লে অনেক ইউরোপীয় এই স্থানে ভ্রমণ করিতে আইসেন।

নিজ লাহোরের অধিবাসিগণের সান্ধ্য ভ্রমণের প্রধান স্থান লরেন্স উদ্যান। ইহা অবশ্য ইংরেজরাজের কীর্ত্তি। পঞ্জাবের সুবিখ্যাত শাসনকর্ত্তা সার্ জন লরেন্সের (পরে লর্ড লরেন্স) নামে পরিচিত। কলিকাতায় ইহার ন্যায় সুরম্য উদ্যান নাই। বসন্ত কালে বিবিধ সুগন্ধি পুষ্পের গন্ধে স্থানটী যে কিরূপ আমোদিত হয়, তাহা বলা কঠিন। স্থানে স্থানে কৃত্রিম টিলা ইহার শোভাবর্দ্ধন ও বিশুদ্ধ বায়ু সেবনের সহায়তা করিতেছে। ইহারই এক পার্শ্বে পশুশালা। লাহোরের আশে পাশে উদ্যান যথেষ্ট। শীতকালে কমলা লেবুর বাগানগুলি মনোহর মূর্ত্তি ধারণ করে। প্রাচীন আমীর ওমরাহগণ অনেকেই এখানে উদ্যান নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। এগুলির উল্লেখ করিয়া প্রবন্ধের কলেবর বাড়াইতে চাহি না। আধুনিক বাগানের মধ্যে এক কাশ্মীরী পণ্ডিতের যত্নে নির্ম্মিত শালিমার উদ্যান বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। ইহা নগর হইতে কিঞ্চিদ্দূরে এক পল্লীগ্রামে অবস্থিত, এবং বিবিধ সুরম্য বৃক্ষ লতা উৎসাদিতে সজ্জিত।

লাহোরে বাঙ্গালী কর্ম্মচারীরা অনেকেই এক্ষণে নূতন সহরের "আনার কলি" অংশে বাস করেন।

"আনার কলি" নামটী দাড়িম্ব কলিকার ন্যায় রূপবতী কোনও মুসলমান যুবতীর নাম হইতে হইয়াছে। বাদশাহের অন্দর মহলে থাকিয়া অবৈধ লোলুপ-দৃষ্টিপাতের অপরাধে এই রমণীটীর জীবন্ত সমাধি হয়। কিন্তু লাহোরের অংশ বিশেষ নাম বহন করিয়া, তাঁহাকে চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিয়াছে।

কালীবাড়ীর উল্লেখ না করিলে বাঙ্গালীর নিকট লাহোরের বিবরণ নিতান্তই অঙ্গহীন থাকিয়া যায়। পশ্চিমের অনেক স্থানেই বাঙ্গালীর তত্ত্বাবধানে একটী করিয়া কালীবাড়ী আছে। লাহোরেও আছে। এখানে বাঙ্গালী পুরোহিত চাঁদার উপর নির্ভর করিয়া মায়ের পূজাদি করিয়া থাকেন। অপরিচিত বাঙ্গালী এখানে আশ্রয় ও আহারাদি পায়। বাঙ্গালীর পাঠের জন্য এখানে একটী পুস্তকালয় আছে।

সাধারণতঃ বাঙ্গালীদের সভাসমিতি এই স্থানেই হইয়া থাকে। ইহার নিকটও কতক বাঙ্গালীর বাস। স্থানটী প্রাচীন সহরের অন্তর্গত এবং দুর্গ হইতে অনতিদূরে।

সেনানিবাস লাহোর হইতে কয়েক মাইল দূরবর্ত্তী। মিয়ানমির নামক সিটান দেশীয় কোনও মুসলমান সাধু পুরুষের নাম হইতে এই স্থানের নাম মিয়ানমির হইয়াছে। তাঁহার সমাধি-গৃহ এখনও বর্ত্তমান। সেখানে সেবাইৎ আছে, অনেক ভক্ত যাত্রীর সমাবেশ আছে। ফকীর কৌমার্য্য ব্রতাবলম্বী ছিলেন। এখনও তাঁহার সমাধি-গৃহে স্ত্রীলোকের প্রবেশাধিকার নাই। তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রীর সমাধি গৃহের বাহিরে।

লাহোরে কিছুদিন বাস করিলেই দেখা যায়, দীর্ঘ-দেহ বলিষ্ঠ পঞ্জাবী হইতে দূরে দূরে থাকিবার বিশেষ কোন প্রয়োজন নাই। ভদ্রলোকেরা অনেকেই সুভাষী ও আতিথেয়।

হিন্দুরা সাধারণতঃ নিরামিষাশী। আহারের ব্যয় সাধারণতঃ অধিক নহে। পোষাকের বায়টা বরং আমাদের অপেক্ষা বেশী। সামাজিক আচার ব্যবহারে ইংরাজের সংশ্রবে আসিয়া পঞ্জাবী অনেকটা উদার হইয়া পড়িতেছে। বোধ হয়, দীর্ঘকাল মুসলমান সংশ্রবও ইহার একটী কারণ। উচ্চশ্রেণীর হিন্দুর মধ্যেও বাল্যবিবাহের অত্যাচার নাই, যুবতী-বিবাহ বিলক্ষণ প্রচলিত। আহারাদিতে স্পর্শদোষ বাঙ্গালা দেশের ন্যায় প্রবল ভাবে নাই।

শ্রীবিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য।

পোলাও।

চতুর্থ উচ্ছ্বাস।

"সাঝের বাতি" জ্বালিয়ে হোথা
"শেফালি" ফুল তুল্‌ছে কে ?
Original শীর্ষে উহার
সোণার তাজটা পরিয়ে দে।

সরল ভাষায় চিত্রগুলি
সৌরীমুখো আঁকেন বেশ,
"নির্ঝর" তাঁর ঝরঝরিয়ে
প্লাবন করে যাচ্ছে দেশ।

প্লাবন ক'রে পাবন করে
হাসি কান্না পাশাপাশি,
যাচ্ছে ব'য়ে ভঙ্গি করে
কভু কাঁদি কভু হাসি।

ঠাকুরালির গন্ধ শুধু
ভাষায় যেন একটু পাই
তবু যেন মনে হয়
'শুক্ল' আমার আপন ভাই।

শব্দগুলির কেউ মরা নয়
সবাই যেন সুস্থকায়
সবার মুখেই কুন্দ হাসি
সবাই দীপ্ত প্রতিভায়।

বিজয় রত্নের "অঞ্জলি"রে
জলধরে বেশ বলেছে,
ও সজনি ভয় কি আর
বাস্তু সাপে ছোঁ তুলেছে।

Aesthetic রস হচ্ছে যার
মেঘের বুক চিরে
দেখ্‌বি যদি পোড়ার মুখি
বলছি আয় ফিরে।

গাবের গাছের নূতন পাতার
শোভা নিয়ে কে এল,
'সবুজ পত্রে'র আড়ালে বসি
অমন গান কে গেলো।

কাণের ভিতরে পীযূষ ঢালিয়ে
প্রাণ মাতাইয়া ছুটিছে সুর
আনন্দে শরীর উঠেরে কাঁপিয়া
নয়নে লেগেছে নবীন নূর।

'প্রমথ' এটনা উগারিছে ওই
জগৎ সাহিত্যরস,
Bookful বটে block head নয়
কিনিতে চান না যশ।

শ্যামল বঙ্গে শ্যামল কবির
শ্যামল বীণার গান,
শ্যামলিত হ'য়ে ধরণী মাতা'য়ে
এখনও ছুটায় তান।

'কেঁদুলে' দাঁড়া'য়ে ঐ কবি দেখ
পুরাণে নূতন করে,
চণ্ডীদাসের বীণায় ঝঙ্কারে
এখনও অমৃত ক্ষরে।

শ্যামবঙ্গ সনে বিলাতি সবুজ
করিতেছে কোলাকুলি,
শ্যামলে সবুজে, সবুজে শ্যামলে
রচিছে মধুর বুলি।

নূতনে পুরাণে মিলিয়া গুলিয়া
হবে অপরূপ নূতন,
বঙ্গ ভাবায় বঙ্গ মাতার
উজল হইবে বদন।

ধূর্জ্জটীর প্রিয় বঙ্গ নায়ক
নামটী তাহার দীনেশ,
দীন ছিলেন ভক্ত বলিয়া
হ'য়েছেন আজি ধনেশ।

যেদিন ইনিই রায় গুণাকরে
হেসে করিলেন নির্ব্বাসন,
সেদিন হইতে বিদ্যাসুন্দর
কাটছে বাজারে বড়ই কম।

বাঙ্গালী পাঠক স্রোতে গা ঢেলে
পারে ভাসিতে,
বিজ্ঞজনের হাসিটী দেখিয়া
পারে হাসিতে।

উজাতে চাহে না উজাতে জানে না
আগ্রহ করিয়া গ্রন্থ কেনে না,
যদি কেহ কেনে পড়ে কদাচন,
চাহে না রুচিরে করিতে মার্জ্জন,
প'ড়ে যদি কেহ বুঝিতে নারে
গ্রন্থকারে গালি পাড়ে।
গোকামি ভূতটা সবারি ঘাড়ে
না বুঝেও তারা গালি ঝাড়ে।

Tame tame tame
আস্ছে না আর ঝুর ঝুরিয়ে
নবীন আলো মেখে গায়,
উথলে দিয়ে মলয় বায়
গোলাপ গন্ধ ছড়িয়ে দিয়ে
মন মাতান কবিতা।
নির্ঝর আর গায় না গান
নিজের বুকের রাঙা স্বপন
দেখায় না আর তেমন নাচন
প্রাণ ভোমরা
কচ্চে না আর কমল মধু পান
মান করেছেন বনিতা!

বলি "ওঠ" "ওঠ" চাঁদের হাসি
আর থেক না মান করে,
প্রাণের মাঝে 'বউ কথা কও'
ডাক্‌ছে শোন প্রাণ ভরে।

Tennyর কবর এই কথাটা
এখনও কচ্চে Plead
The song that nerves a nation's
heart
Is in itself a deed.

কবীন্দ্রের স্বষ্ট সখা
গুণ গুণিয়ে কচ্চে গান,
তাল বোধ নেই ধুব বোধ গায়
জবাই ক'রে গোড়ার প্রাণ।

রমণী কবির বিলাসবতী
কবিতা মধুর নিচোলে
বাহার দেওয়া জরির ফিতে
শুধুই কেবল ঝল্‌মলে।

পুষ্প আছে নাইকো আলো
রং ফুটাবে কিসে
শুষ্ক artয়ে মন গলে না
প্রাণ থাকে না মিশে।

Lessing ছোঁড়ার Laocoon খান
পড়্‌লে নেহাত হয় না মন্দ,
ছত্রে ছত্রে রবিয়ানার
বার হয় না তীব্র গন্ধ।

হেমন্তের পাতার মত
রং মাখান প্রতিভায়
বুড়ো রবি লিখ্‌ছে Ballad
একটু একটু হাসি পায়।

দেবেন সেন in his youth
Began in gladness,
লেখার মধ্যে এখন জাগ্‌ছে
Despondency and madness.

'ঝরাফুল' যেন রূপসী উর্ব্বশী
নিবিড় যৌবন ভরা,
শেবলতা তার অঙ্গের গুণ
ঠাকুর চিত্তহরা।

তালীর ছায়া বুকে ধরা
(ওই) আদর দীঘির ধারে
করুণা কার ঠাকুর কবি
বাঁধিল করুণারে।

'ঝরাফুল' ওতো মর্ম্মর ফুল
Art আছে নাহি প্রাণ,
(তাই) এতই দৃপ্ত এতই নৃত্য
এতই অভিমান।

মানকুমারী ভাবের রাণী
Utopeaর প্রজা নন,
প্রেম প্রীতি হাসি কান্নার
করে মন বিলোড়ন।

"বিকাশ-মাতার" দেখিয়াছি
মনোমোহিনী প্রতিভার,
হ'য়েছিলাম মুগ্ধ বটে
কেয়াফুলের মদিরার।

মানকুমারী মা-হারা-মা
আমার সোণার মেয়ে
কোনওরূপই লাগে না ভাল
তোমার রূপের চেয়ে।

রবির চেলা সতোন হারে
মাটী কল্লে প্রতিভার
কবিতাটা ঢেকে রাখে
কেমন একটা আব্‌ছায়ায়

শক্তি আছে ভক্তি আছে
প্রেমের স্থানটা শূন্য,
অধর যজ্ঞে সিদ্ধ হ'লে
অর্জ্জন কর্‌তেন পুণ্য।

কি মাধুরী আছে বালা নয়নে তোমার
নির্ভয়ে লিখিয়া কবি লইল বাহার।
চন্দন বনের গন্ধে মোদিত মধুর
সে সুধা করাল পান নাথেরে প্রচুর।
কবিতাটা নবমুখী নবমুখে করে পান
একটু উজ্জ্বল রস সে মুখেতে কর দান।

"প্রবাসী" ফুলাবে ঠোঁট দুর্নীতির অপবাদ
দধিবৎ বশে তব ঘটাইবে পরমাদ।
তাই—
নেশায় পোড়ে রূপের রঙে
চুমার প্রলেপ চাও না দিতে,
প্রেমের ছবি আঁকুলে না ভাই
সরল ভাবে জগৎ হিতে।

গীতাঞ্জলির রবিরে ভাই
আমরা বলি রবি নয়,
শুষ্ক গীতে নাহিকো দেখি
"মানসীর" অভিনয়।

'সোণার তরী' রূপের তরী
ভাস্‌ছে প্রেমের দরিয়ায়,
প্রেমিক যে তার স্থান আছে তথি
প্রেমহীন কেঁদে ফিরে যায়।

চিত্রাঙ্গদা—সুধার খনি
চিত্রাঙ্গদা—উজ্জ্বল মণি
চিত্রাঙ্গদায় র‍্যাফেল দিচ্ছে উঁকি
চিত্রাঙ্গদায় প্রেমিক কবি সুখী।

কালিদাস থাক্‌লে পরে
কত ভালবাসি,
রবির গলে আপন মালা
দিতেন খুলে হাসি।

প্রতি পাতে লাগিয়ে দিব
যতন ক'রে জলছবি,
আচ্ছা ধূমো হস্তিকায়
বই লিখেছে 'দেবকবি'।

নিত্য কথার বস্তা বেঁধে
এত কেন গোলযোগ,
যদি মাল টানাই সার
লোকে বল্‌বে কর্ম্ম ভোগ।

কবির জীবন কাব্যে বিকাশ
ইয়ার দলে নয়,
অন্তর্দৃষ্টি থাক্‌লে পরে
বুঝ্‌তে সমুদয়।

রবির কাব্যে কামের গন্ধ
ঈর্ষা 'fata' কল্লে বার

ওমনি গর্জ্জি চেলাগুলো
উঠ্‌লো ব'লে মার মার।

বেশ লিখেছ খুব লিখেছ
সুধার গন্ধে ঢাক্‌ছি নাক
If it has no name to be known by
তবে সে কথাটা চাপা থাক।

খেতেন দ্বিজু মৎস্য যখন
অবাক চোখে চাইত পুষি,
হরু, সুরু, নরু, জ্ঞানেন
মনে মনে হতেন খুসী।

হায় রে কপাল কবির জীবন
এই ভাবে কি লিখ্‌তে হয়,
দ্বিজুর জীবন 'সাজাহানের'
প্রতি পৃষ্ঠে অভ্যুদয়।

সে—
আপন জীবন আপন হাতে
লিখে গেছে কাব্যে তার,
তুচ্ছ কথার আলোচনে
প্রকাশ করে ব্যভিচার।

বড়াল ভক্ত নবকৃষ্ণ
যা লিখেছেন সহা যায়,
ধৈর্য্য রাণী অধৈর্য্যের
গুহার মাঝে না পালায়।

সরল পরাণ বড়াল কবি
হারিয়া ফেলে প্রিয়ায়
'এষা' বুকে বসে আছেন
উচ্চ যশের আশায়।

সখ্যহীন প্রেমহীন
জীবনটা ত মরুময়
লক্ষ্মীছাড়া হ'লে পরে
এ দুর্দ্দশা সবার হয়।

ওরে বুড়ো আছিস্‌ বেঁচে
তবু কেন দিস্‌ না সাড়া
সব ফেলেছিস্‌ হারিয়ে কিরে
এমন দিনে বধুহারা

কবির সম হৃদয় ছিল
কবির সম মমতা,

কোথায় গেল গলাগলি
এমন দিনে বল তা?

'কস্তুরী' আর 'চন্দনেরে'
মুক্তহস্তে বিলাইয়ে,
'গোবিন' গেল পাঁজর ভেঙ্গে
কাল সাগরে মিশাইয়ে।

ভিজে চোখে আজকে তোরে
মনে করছি 'অক্রুরে'
'গোবিন' গেছে কাল হ'য়েছে
বাঙ্গালা দেশের মধুরে।

আমার দেশটা আমার দেশটা
আমার চোখে কেমন ঠেকে
এরা
বউকে রাখে বুকের মাঝে
পায়ে ঠেলে বুড়ো মাকে।

তৃষ্ণা কাতর গবুর মুখে
দিল না কেউ জলের কণা,
বেদনাটা এমন দিনে
দারিদ্র বলে জানাল না।

বই পড়ে? না মলাট পড়ে?
পড়্‌তে জানে কয় জনায়,
পাঠক তেমন থাক্‌লে পরে
বুঝ্‌ত গবুর সাধনায়।

আমি ভজব না কৃষ্ণ রাধা
ওতে আছে অনেক বাধা
লক্ষ মন্ত্রে শুধুই সাধা
(এঁদের) চোখের দৃষ্টি বয়স দোষে
নাহিকো বলে জগৎ ঘোষে।
আমি আপন হাতে
গড়্‌ব শিবে ছেনে কাদা
আমি ভজ্‌ব না আর
কৃষ্ণ রাধা।

জটা হ'তে নেমে করুণা তটিনী
বহিয়া যেতেছে দিবস যামিনী
কত দীন জন সুকৃতি সুজন
শিবের মাহাত্ম্য করিয়া কীর্ত্তন
দারিদ্র্য বেদনা করিছে বর্জ্জন

আমি আপন হাতে
গড়ব শিবে ছেনে কাদা
আমি ভজ্‌ব না আর
কৃষ্ণ রাধা।

(তিনি)
পদ্য পড়েন আঁকড়ে ধরেন
মোটা ভাবের মোটামি,
উপাসনায় ব্যক্ত করেন
ভাঁড়ামি আর জ্যাটামি।

রসের বিচার কত্তে ছোটেন
বুকে ধ'রে হর্ষ,
তিন পুরুষে করেনি যার
'সন্মট' খান স্পর্শ।

ভাবের ভাষা হয়নিকো যা'র
আভাস নিয়ে খেলা,
বোঝনি যা বুঝ্‌লে না তা
গাধায় চক্ষু মেলা।

কমলবনে শুব্‌রে পোকা
ফুলের বুকে কাঁটা,
খেয়ালি যে লেজের দিকে
কাট্‌তে চায় পাঁটা।

কাব্য পড় বুঝ্‌তে শেখ
কারে বলে ধ্বনি,
বুড়ো হ'লে শিখ্‌বে কবে
ওরে যাদুমণি।

শ্রীবেণোয়ারীলাল গোস্বামী।

নীলমাণিক। *

রায় সাহেব দীনেশচন্দ্র সেন সর্ব্বত্র সুপরিচিত। "নীলমাণিক" তাঁহারই অমৃত-ময়ী লেখনী-প্রসূত। তাঁহার "বেহুলা," "জড়ভরত" প্রভৃতি ছোট ছোট বইগুলি যেরূপ সাশ্রু নয়নে আমরা পড়িয়াছি, এই পুস্তিকাখানিও আমরা সেইরূপ পড়িয়াছি। অধিকন্তু ইহা পাঠকালে আমরা সময়ে সময়ে আত্মহারা হইয়াছি। এই বই বাঙ্গালার প্রত্যেক ছেলে মেয়ের হাতে থাকা উচিত। ইহা সম্প্রতি গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এন্ড সন্‌স্ কর্ত্তৃক তাঁহাদের আট আনা সংস্করণ গ্রন্থমালার অন্যতম গ্রন্থরূপে প্রকাশিত হইয়াছে এবং ইহা কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের বঙ্গভাষার অধ্যাপক (অবসরপ্রাপ্ত সি, আই, এস্) শ্রীযুক্ত জে, ডি, এন্ডারসন্ মহোদয়ের নামে উৎসর্গী-কৃত হইয়াছে।

কেবল একমাত্র ইংরাজী শিক্ষা অবলম্বন করিয়াই বাঙ্গালী তাহাদের প্রাচীন পারিবারিক ও সামাজিক আদর্শ ভুলিয়া যাইতেছে। তখনকার কালে, ইংরাজী লেখাপড়া না শিখিলেও যে যেমন-তেমন পাড়াগেঁয়ে বাঙ্গালী মনুষ্যত্বের হিসাবে বড়লোক হইতে পারিত, আর এখনকার কালে ইংরাজী বিদ্যা-বারিধি হইলেও বাঙ্গালীর পক্ষে সেরূপ হওয়া বুঝি সহজ নহে, লেখক এই কথাটুকু বুঝাইবার জন্য একটী পল্লীগ্রামের সামান্য এক বৈষ্ণব পরিবারের কাহিনী অবলম্বন করিয়া এই গল্পের বইখানি লিখিয়াছেন। কাহিনীটী কল্পিত হইলেও, তাহাতে বিবৃত মানসিক উচ্চ ভাব সকল পূর্ব্বকালে সকল বঙ্গীয় পরিবারেই অল্পাধিক ফুটিত। তাহাই মহাপ্রভুর আবির্ভাবের পর তাঁহার কার্য্যপথ সুগম হইয়াছিল, কেমন করিয়া, কে জানে,

* নীলমাণিক। রায় সাহেব দীনেশচন্দ্র সেন কবিশেখর বি, এ। ভিক্‌টোরিয়া প্রেস, গোয়াবাগান, কলিকাতা।

বাঙ্গালীর ভিন্ন ভিন্ন জাতীর স্তর হইতে সহসা সহস্র সহস্র মস্তক তাঁহার আত্মাবহনের জন্য তাঁহার শ্রীচরণপ্রান্তে যুগপৎ অবনত হইয়াছিল। এই সকল লোকদের শিখাইয়া কার্য্যোপযোগী করিয়া রাখিয়াছিল কে?—তখনকার সমাজ। আর, এই সে দিন নূতন ইংরাজী শিক্ষার বানডাকার সময়েও সেই সমাজের কঙ্কালমাত্র ছিল বলিয়াই, আমরা তদুপযোগী রামমোহন, কেশবচন্দ্র প্রভৃতিকে দেখিয়াছি। তাহার পর, এখন সে সমাজের কঙ্কালটুকুও ভস্মে পর্য্যবসিত হইয়াছে; কাজেই আর কাহাকেও দেখি না। এখন ঘরে বাহিরে যে নির্ধর্ম্ম (Secular) শিক্ষায় বাঙ্গালীর চরিত্র গঠিত হইতেছে, তাহাতে মনুষ্যত্বের স্ফূর্ত্তি হয় কি?

কল্পনার জাঁকজমক (Plot-interest) সম্বন্ধে নীলমাণিকের বিশেষ কিছু দাবি নাই। কিন্তু ইহাতে লব্ধপ্রতিষ্ঠ গ্রন্থকার যে সকল চিত্র অঙ্কন করিয়াছেন, তাহা পাষাণে রেখাপাতের ন্যায় বঙ্গ-সাহিত্যে চিরদিনের জন্য থাকিবে, ও হয়ত একদিন জাতীয় চরিত্রগঠনের সহায় হইবে। Wilkie Collinsএর "Woman in White" আছে বলিয়া কি George Eliotএর "Adam Bede" "Middle March" প্রভৃতি সাহিত্যে শ্লাঘার বস্তু নহে।

ভগবান অধিকারী জনৈক বৈষ্ণব গৃহস্থ। বৃদ্ধ বয়সে তাহার একটি ছেলে হইল। তাহারই নাম নীলমাণিক। নীলমাণিকের শৈশবকালীন চিত্র গ্রন্থকার নিম্নলিখিত ভাবে আঁকিয়াছেন:—

'মানভঞ্জন', 'মুক্তালতাবলী', এবং 'রামায়ণ' পাঠ শুনিত। ইহারা গৃহস্থ-বৈষ্ণব ছিল, প্রায় প্রতিদিনই বাড়ীতে মহোৎসব বা কীর্ত্তন হইত। যখন নীলমাণিকের বয়স সাত, তখন সে 'রামায়ণ' প্রায় সমস্তটা মুখস্থ বলিতে পারিত; বৈষ্ণব পদ ও নরোত্তম দাসের প্রার্থনা সে নিজের মনে একা বসিয়া আবৃত্তি করিত। বিদ্যালয়ে সে খ্যাতি লাভ করিতে পারে নাই; কিন্তু চিন্তা দিদি গানের সুরে যে সকল পুস্তক পড়িত, তাহা তাহার কণ্ঠস্থ হইয়া যাইত।"

তখনকার ব্রাহ্মণ হইতে চণ্ডাল পর্য্যন্ত সকল জাতির চরিত্র গঠন এইরূপে হইত। সেই চরিত্র গঠনের অবিসম্বাদিত গুরু ছিলেন, কৃত্তিবাস, কাশীদাস এবং বৈষ্ণব কবিগণ। সকলের উপর কার্য্যকারিতায় শ্রেষ্ঠ ছিল, কীর্ত্তন গান। তাহা বাঙ্গালীকে কোন অজানা দেশের সন্ধান বলিয়া দিয়াছিল; বাঙ্গালী চিরজীবন সেই দেশে গন্তব্য পথের পথিক হইত। তাহাই সে দ্বেষশূন্যতা, বিনয়, কোমলপ্রাণতা, পরোপকার, সেবাভিলাষ প্রভৃতি অপার্থিব গুণে বিভূষিত হইয়াছিল। পার্থিব কুরুক্ষেত্রে গীতার পাঞ্চজন্য নাদ বুঝি তাহার কাণে তেমন পৌঁছে নাই। ইহা মনুষ্যত্ব কি কাপুরুষতা, তাহা জানি না, তবে ইহার সদুত্তর সহজ নহে। ইউরোপীয় মনীষীগণের মধ্যেও এতৎসম্বন্ধে মতভেদ দৃষ্ট হয়। দৃষ্টি ঊর্দ্ধে ন্যস্ত হইলে, তাহা নিম্নে—কর্ম্মক্ষেত্র পৃথিবীতে—পড়ে না। রমানন্দ স্বামীর শিষ্য চন্দ্রশেখরে আমরা ইহা পরিস্ফুট দেখিয়াছি; তাই তিনি শৈবলিনীকে তেমন অমানুষিক ভাবে ক্ষমা করিতে পারিয়াছিলেন। আর আমরা এখনই দেখিব, নীলমাণিকও তাহার স্ত্রীরাণীকে সেই ভাবে ক্ষমা করিয়াছিল। কিন্তু উভয়ের ক্ষমার পার্থক্য আছে। নীলমাণিকের ক্ষমা, ক্ষমা নহে; তদতিরিক্ত আরও কিছু। সে কথা পরে বলিব।

নীলমাণিক অল্প দিনের জন্য স্কুলে গিয়াছিল; কিন্তু তথায় তাহার লেখাপড়া হইল না। শেষে নিকটবর্ত্তী গ্রামের জনৈক বিলাসপ্রিয় বৈষ্ণবের কন্যা রাণীর সহিত তাহার বিবাহ হইল। বাপের বাড়ীর দোষে রাণীর স্ত্রীজনোচিত কোন শিক্ষাই হয় নাই। ইহার উপর সংযম কাহাকে বলে, তাহা সে জানিতই না। বিবাহ করিয়া নীলমাণিক কীর্ত্তন শিখিতে বীরভূম জেলার ময়নাডাল গ্রামের মিত্রঠাকুরদের বাটীতে গেল। কয়েক মাস সেখানে থাকিয়া ফিরিয়া আসিয়া যখন সে কমনীয় কুসুমোপমা রাণীকে পুনরায় দেখিল, তখন রাণীর প্রতি তাহার এককালে দুর্দ্দমনীয় প্রেমের সঞ্চার হইল। এই অবস্থায় কিছুদিন পরে তাহাকে আবার ময়নাডাল যাইতে হইল, কিন্তু তাহার হৃদয় রাণীর কাছেই রহিল। সে না খাইয়া, না পরিয়া, পিতৃপ্রেরিত অর্থ হইতে রাণীর জন্য কত সাজসজ্জা কিনিল। বাটী ফিরিয়া আসিয়া "পূজারীর ন্যায় প্রীতির সহিত সেগুলি সে রাণীকে দিলে রাণী কুটিল হাসিতে অধর-বক্র করিয়া নিতান্ত উপেক্ষার সহিত সেগুলি রাখিয়া দিল।" তাহার পর নীলমাণিকের শত সাধনায় তাহার দেবীর প্রীতি হইল না। চিন্তাদিদি রাণীর গতিক দেখিয়া কাশীধামে যাত্রা করিলেন। বাড়ীতে রহিলেন, কেবল ভগবান ও তাঁহার স্ত্রী অন্নপূর্ণা। অনতিকাল মধ্যে ভগবান অধিকারীর দেহত্যাগ হইল। তাহার পরে শ্রাদ্ধ চুকিয়া যাইলে একদিন রাত্রিতে কাহাকেও না বলিয়া রাণী কোথায় চলিয়া গেল। তাহার আর কোন খোঁজই পাওয়া গেল না। নীলমাণিকের চক্ষে যেন জগতের সকল জ্যোতি অন্তর্হিত হইল। কিন্তু এই ঘটনাই তাহার ভাবী আধ্যাত্মিক জীবনের বীজস্বরূপ হইল। তখন তাহার হৃদয় অন্ধকারে ভরা; কিন্তু সেই আঁধারেই সে কোন অননুভূতপূর্ব্ব প্রীতির অনির্ব্বচনীয় জ্যোতি দেখিতে পাইল; বিষাদ বুঝি কি এক চিরন্তন হর্ষকে দেখাইয়া দিল! শ্রীভগবানের কৃপা অনেক সময়ে এইরূপ বিষাদের ভিতর দিয়াই আসিয়া থাকে। এই জন্য অনেকের নিকট বিপদ আরাধ্য বস্তু; তাই কবির কথায় বিপদ, "Tamer of the human breast."

বুকের ভিতরের এই বিষাদ, কীর্ত্তনের সুরে স্ফূর্ত্তি লাভ করিয়া, নীলমাণিককে ব্যাস বাল্মীকির দুর্লভ যে ক্ষমতা, তাহা প্রদান করিয়াছিল। সে ক্ষমতা কি তাহা গ্রন্থকারের কথায় শুনুন :—

"সহসা নীলমাণিক সেই দেশে উৎকৃষ্ট কীর্ত্তনীয়া বলিয়া খ্যাতি লাভ করিল। তাহার পিতার দলটী নাবিকহীন তরণীর ন্যায় স্রোতের জলে ভাসিতেছিল। তাহারা বলিল—"নীলা, তুমি ত ময়নাডালা হ'তে কীর্ত্তন শিখিয়া এসেছ—তোমার সুরও মন্দ নহে। আমাদের এত দিনের দলটী কি একবারে নষ্ট হ'য়ে যাবে?" নীলমাণিক কীর্ত্তন গাহিতে স্বীকার করিল। সে প্রথম দিন 'অভিসার' পালাটী ভালরূপ অভ্যাস করিয়া লইয়া এক বড় গৃহস্থের বাড়ীতে আসরে আসিয়া দাঁড়াইল। গৌরচন্দ্রিকা শেষ করিয়া যখন সে "শ্যাম অভিসারে—চলল বর সুন্দরী"—অনন্ত দাসের এই পদটী ধরিল, তখন এক অপূর্ব্ব উন্মাদনার সৃষ্টি হইল। তাহার মুখ হইতে গানের একটু অংশ বাহির হইতে না হইতেই লোকে কাঁদিয়া আকুল হইল।"

ঐ যে পূর্ব্বকথিত বিষাদ-জড়িত স্মৃতি,

উহারই বলে ত নীলমাণিক এত কাণ্ড করিতে পারিল। Elizabeth Laudon সত্যই বলিয়াছেন,"Remembrance makes the poet." আবার Tupper আরও স্পষ্ট ভাবে বলিয়াছেন, "Memory and absence cherish it as the balmy breathing of the south." তাই কি কীর্ত্তনের "বিরহ" এত মধুর ?

স্মৃতিতে কবিত্বের উদ্বোধন, বিষাদে তাহার উদ্দীপন। ভারতীয় কবিগুরুর প্রথম অনুষ্টুপ্‌ছন্দের শ্লোক "মা নিষাদ" ইত্যাদি গভীর বিষাদেই তদীয় মুখ হইতে নির্গত হইয়াছিল। Rogers তাই বুঝি কাঁদিয়া বলিয়াছেন ;—

"There is such a charm in melon-
choly,
I would not if I could be gay"

Shelley ও বুঝি তাই বলিয়াছেন :—

"Our Sweetest songs are those that tell of saddest thoughts" কীর্ত্তন এই "Saddest thoughts"এ উচ্ছ্বসিত। কীর্ত্তনের মূলে, শুধু মূলে কেন, ইহার সকল রসেই, বিষাদের একটা ছায়াপাত, একটা যেন অজ্ঞাত অভাব-জ্ঞাপক কোন-কিছু আছে। Shelley পাখীর ডাকে আত্মহারা হইয়া তদুদ্দেশে বলিয়াছেন :—

A Thing wherein we feel
There is some hidden want."

Shelleyর এই কথা কীর্ত্তন গানের প্রতি সম্পূর্ণ প্রযুজ্য। বাসনার অচরিতার্থতাই কীর্ত্তনের প্রাণ। মা যশোদার আদর করিয়া আশা মিটিতেছে না—তাহাতে মাতার দুঃখ, সখা শ্রীদামসুবলাদির সঙ্গ করিয়া তৃপ্তি হইতেছে না—তাহাতেই তাঁহাদের কাতরতা, আর মহাভাবময়ী "অভাগী" শ্রীরাধার ত সেই ব্রহ্মাণ্ড-ভাণ্ড-কটাহ-ভেদী আর্ত্তনাদ—"নয়ন না তিরপিত ভেল !" যেন কি একটা অতৃপ্তির, কি একটা ভোগের অসম্পূর্ণতার মর্ম্মভেদী নিশ্বাস কীর্ত্তনের সুরে—সুখে দুঃখে ওতপ্রোত ভাবে সদাই জড়িত।

কীর্ত্তনের এই যে ভাব, সংস্কৃত অলঙ্কার শাস্ত্রের সিদ্ধান্তানুসারে ইহা কোন্ রসের অন্তর্গত ? ভাবিয়া দেখিলে কোন রসেরই নহে। বাস্তবিক অলঙ্কার শাস্ত্রের বিচারে পৃথিবীর অনেক বিখ্যাত কাব্যের রস রস-মধ্যেই গণ্য নহে। Shakespeareএর "Julius Ceaser" দেখুন। Mark Antonyর বিশ্ববিশ্রুত বক্তৃতা পড়ুন। হরি ! হরি ! অলঙ্কার শাস্ত্রের গজকাটিতে উহার মাপই হয় না। উহা তৎকথিত কোন্ রসান্তর্গত ? আধুনিক শিক্ষিত বাঙ্গালী Mill এর দৃষ্টান্ত * অনুসরণ করিয়া উহাকে "Eloquence" বলিতে পারেন, কিন্তু Eloquence রস নহে, Poetryতে যেমন রস থাকে, তেমনি Eloquenceএও রস থাকে ; অতএব পুনরায় প্রশ্ন করা যাইতে পারে, কথিত বক্তৃতা কোন রসান্তর্গত ? দেখা যায়, ঐ বক্তৃতার ভিতর একটা "মতলবী"-ভাব আছে, একটু "খেলা" আছে। তাহাই উহার রস। সে রসের নাম সংস্কৃতে নাই, পূর্ব্বে ইউরোপেও ছিল না। এখন Goethe-প্রমুখ ইউরোপীয় সমালোচকগণ উহার নাম দিয়াছেন, "Beauty"। এই "Beauty" বা সৌন্দর্য্য আমাদের অলঙ্কার শাস্ত্রের সকল রসেই আছে, অপিচ তাহার বাহিরেও আছে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, ইহা "ভয়ানকেও"

* Dissertations and Discussions, by John Stuart Mill, Vol. I.

আছে, ইহা "বীভৎসেও" আছে—ইহা এমনিই জিনিস! কথাটা আরও একটু ভাল করিয়া বলিব। হিন্দুর প্রতিমা গঠন ব্যাপারে আলঙ্কারিকের রসের বিকাশ যথেষ্ট আছে। সংহারিণী শক্তি দেবী কালিকায় "ভয়ানক" রসের সমাবেশ বিলক্ষণ আছে। তাঁহার ধ্যান পড়িলে আতঙ্কে প্রাণ কাঁপিতে থাকে। ধ্যানের প্রথমেই আছে—"করালবদনাং ঘোরাং"। কিন্তু শাস্ত্রকারের এই ভীষণ হইতে ভীষণতর মূর্ত্তি-কল্পনার মধ্যে রামপ্রসাদ কি সৌন্দর্য্যই না দেখিয়াছেন? এই ধ্যানগত "ভয়ানক" রসের ভিতর যে Beauty বা সৌন্দর্য্যের স্রোত বহিতেছে, কবির চক্ষু না হইলে সে সৌন্দর্য্য অন্তের চক্ষে ফুটিবে কেন? তাই সে সৌন্দর্য্য একাধারে কবি ও সাধক রামপ্রসাদের চক্ষে (বাঙ্গালী সাধকদের মধ্যে বুঝি সকলের অগ্রে) প্রতিভাত হইয়াছিল। তাঁহার পরবর্ত্তী কমলাকান্ত প্রভৃতি তেমন ভাবে সে সৌন্দর্য্য দেখিয়াছিলেন কি না, জানি না, তবে তাঁহারা যে অনেকটা রামপ্রসাদের পদানুসরণ করিয়াছিলেন, তাহার সন্দেহ নাই। সাধকগণ কবি হইতেও কবি, মহাকবি, জগদ্‌গুরু। তাই যাহা তুমি আমি এখনও বুঝি না, রামপ্রসাদ সে সৌন্দর্য্য-তত্ত্ব বুঝিয়াছিলেন। অনুপাত ক্রমে বৈষ্ণব কবিরা তাহা আরও অধিক বুঝিয়াছিলেন, বুঝি বুঝার চরম বুঝিয়াছিলেন—তাহার উপর আর জোড় চলে না।

সংস্কৃত আলঙ্কারিকদিগের মধ্যে আমরা একজনকে জানি, যিনি ইউরোপীয়দিগের সৌন্দর্য্যকেই রস বলিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার কথা বোধ হয়, এতদ্দেশে সমীচীন বলিয়া গৃহীত হয় নাই। তাহা হইলে এই সৌন্দর্য্য-তত্ত্ব এখনকার আলঙ্কারিকদিগের অবিদিত থাকিত না। যাঁহার কথা আমরা বলিতেছি, তাঁহার নাম নারায়ণ। তিনি বলেন:—

রসে সারঃ চমৎকারঃ সর্ব্বত্রৈবানুভূয়তে।

"সৌন্দর্য্য" কথার পরিবর্ত্তে তিনি "চমৎকার" কথা ব্যবহার করিয়াছেন, এবং সকল রসের সার যে "চমৎকার" রস এবং সকল রসেই যে তাহার বিদ্যমানতা আছে, এ কথা তিনি দার্ঢ্যের সহিত বলিয়াছেন। ইহা অল্প অনুভূতির কার্য্য নহে!

এখন প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের এইরূপে ভাব-সমন্বয় করিয়া আমরা আমাদের পূর্ব্ব-কথিত প্রশ্নের উত্তর দিব। আমাদের মতে, কীর্ত্তনের পদাবলীতে—সুখে, বিষাদে বা যে কিছুতে—এই নারায়ণ-কথিত "চমৎকার" রস জীবন্ত ভাবে দীপ্যমান। তবে কীর্ত্তনে ভয়ানক বা বীভৎস রসাদির আদৌ সমাবেশ নাই।

পূর্ব্বকথিত ভাবে কীর্ত্তনকে ধরা, তাহাকে তেমন ভাবে বুঝা, যে-সে হৃদয়ের কার্য্য নহে। গ্রন্থকার যে সে পরীক্ষায় সম্পূর্ণ উত্তীর্ণ হইয়াছেন, তাহা বলা বাহুল্য। পড়িতে পড়িতে অনেক সময় বোধ হয়, নীলমণিক তাঁহার হৃদয়ে মুকুর স্বরূপ। বস্তুতঃ রচনায় এমন কোমল-প্রাণতার পরিচয় অল্প লেখকের পাওয়া যায়।

কিছুদিন পরে নীলমণির মাতা অন্নপূর্ণা ইহলোক ত্যাগ করিলেন। এই অন্নপূর্ণার চিত্র পুত্র বাৎসল্যের উৎকর্ষ। বইখানি না পড়িলে তাহা দুই এক কথায় বুঝা যাইবে না। অন্নপূর্ণার মৃত্যুর পর নীলমাণিক আর ঘরে টিকিতে পারিল না। সে গৃহ ত্যাগ করিল, আর কেবল কীর্ত্তন গাইয়াই সে সান্ত্বনা পাইতে লাগিল। একদিন মাথুর গাহিতে গাহিতে সে ভয়ঙ্কর মূর্চ্ছাপ্রাপ্ত হইয়াছিল। কিছুদিন পরে সে শ্রীবৃন্দাবন

ধামে যাওয়া স্থির করিল। তৎপূর্ব্বে সে একবার পিতৃপুরুষের স্থান মহাতীর্থ জন্মভূমি দর্শন করিল। সেখানে সে কত ভাবেই না আপ্লুত হইল! লেখকের মোহিনী লেখনী সে সকল বর্ণনা করিতে কি সুধাই না বর্ষণ করিয়াছে! তাহার পর সে শ্রীধামে গেল। তথায় সহসা তাহাকে একদিন সন্ধ্যা বেলা একটী স্ত্রীলোক তাহার "মাইজীর" আহ্বান জানাইয়া তাহাকে নিকটস্থ এক কুঞ্জ দেখাইয়া দিল। পরে যাহা ঘটিল, তৎসম্বন্ধে গ্রন্থকর্ত্তা যাহা লিখিয়াছেন, তাহা আরো সুন্দর, স্থানাভাবে তাহা উদ্ধৃত হইল না, পাঠক পুস্তকে দেখিবেন।

এখন দেখুন, নীলমণিকের ক্ষমা। সে রাণীকে একেবারে বলিয়া ফেলিল, "তোমার কোন পাপ নাই, যদি থাকিত, তাহা আমি শুনিতে চাহিতাম না, সবই মাপ করিতাম।" ইহাকে কি ক্ষমা বলিব? যে ক্ষমা করে, তাহাকে অপরের কৃতাপরাধ মনে করিয়া ক্ষমা করিতে হয়—অপরাধীর অপরাধের কথা তাহার মনে আসেই। কিন্তু এখানে কাহাকেও অপরাধী ভাবা দূরে থাকুক, অপরাধের কথাই ত কেহ শুনিতে চাহে না। ইহাই যথার্থ বৈষ্ণবের—যথার্থ প্রেমিকের চিত্ত। বিদ্যাপতি গাইয়াছেন :—

"পূরবক ভানু যদি পশ্চিমে উদয়।
সুজনক পিরীতি কবহুঁ দূর নয়॥"

হউক না কেন দুইয়ের একজন শত অপরাধী, অপর জন প্রেমিক হইলে সে অপরাধের কিছুই দেখিতে পাইবে না। "আঁধুয়া প্রেম নয়নে নাহি হেরত" ইত্যাদি। আর তখনও তাহার :—

"টুটইতে নাহি টুটে প্রেম অদভুত।
যৈছনে বাঢ়ত মৃণালক সূত॥"

এই অবস্থাই থাকিবে। Cupid অন্ধ, ইহা বৈষ্ণবের কাছে কিছুই নূতন নহে। Southey এই জন্যই বলিয়াছেন :—

"They sin who tell Love can die"

এ ক্ষমা দেখিবার ও ভাবিবার জিনিস। ইহা সেই পতিত-পাবনের নিজস্ব। যাহার ইহা আছে, সে মানুষ নহে।

এখন নীলমণিক তাহার চিরবাঞ্ছিত পীতবাসকে উন্মত্তের ন্যায় খুঁজিতে লাগল। সহসা যেন কে বলিল, "দেখাবে যদি দেখা দিব, প্রতীক্ষা করিয়া থাক।"

সেই দিনই সে একখানি ছোট বাসুদেবমূর্ত্তি পাইল; এবং তাহাতেই সে তাহার চিরসান্ত্বনা পাইল। কবিশেখর গ্রন্থকার তাঁহার স্বাভাবিক কবিত্ব শক্তির সাহায্যে তাহার যে হৃদয়গ্রাহী বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা অতি মনোরম। গ্রন্থকার দীর্ঘজীবী হইয়া বাঙ্গালা ভাষার মুখ উজ্জ্বল করুন।

শ্রীজ্যোতিশ্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

বিশ্ববিদ্যালয়ে বঙ্গভাষা।

ভারত-গবর্ণমেণ্টের অনুমতি লইয়া কলিকাতা য়ুনিভার্সিটী এতদ্দেশে দেশে যে যুগান্তর সূচনা করিয়াছেন, তাহা অনেকেই জানেন না। আমাদের সংবাদ পত্র সমূহে এ বিষয়ের কিছুমাত্র আলোচনা হয় নাই। যাঁহারা এতদ্দেশে দশের জন্য চিন্তার ভার লইয়াছেন, তাঁহারা নিজের স্বীকৃত কর্ত্তব্য বিষয়ে সকল সময়ে জাগরিত নহেন, ইহা

আমাদের সামান্য দুরদৃষ্টের ও ক্ষোভের বিষয় নহে। যাহা নিতান্ত সন্নিহিত এবং আসন্ন, তাহা অকিঞ্চিৎকর হইলেও আমাদিগকে এতই ব্যতিব্যস্ত এবং ব্যগ্র করিয়া তুলে যে, যাহা দূরান্বিত অথচ যাহার ফল ও বল অদূর ভবিষ্যতে আমাদের অদৃষ্টে অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠিবে, তেমন বিষয়েও আমাদের মনোযোগ আকৃষ্ট হইতেছে না।

কলিকাতা য়ুনিভার্সিটী বর্ত্তমান এম্-এ পরীক্ষার ক্ষেত্র যে ভাবে প্রসারিত করিয়াছেন, তাহা সংক্ষেপে এই—

পরীক্ষার্থী ভারতের প্রচলিত ভাষাসমূহের একটিকে মুখ্য পাঠ্যরূপে গ্রহণ করিতে পারিবেন ;—

১ম দিনের পরীক্ষার বিষয়—ওই ভাষার সমগ্র সাহিত্যের সাধারণ ইতিবৃত্ত।

২য় দিনের পরীক্ষা—ওই ভাষার প্রাচীন যুগের গ্রন্থাদি হইতে নির্দ্ধারিত পাঠ্য এবং পাঠ্যের অতিরিক্ত বিষয় সম্বন্ধেও গৃহীত হইবে।

৩য় দিনের পরীক্ষা—ওই ভাষার মধ্য যুগের এবং আধুনিক কালের গ্রন্থাদি হইতে নির্দ্ধারিত পাঠ্য এবং পাঠ্যের অতিরিক্ত বিষয় সম্বন্ধেও গৃহীত হইবে।

৪র্থ দিনের পরীক্ষার বিষয়—(ক) ওই ভাষায় নির্দ্দিষ্ট যুগবিশেষের সাহিত্যগত অথবা ভাষা-প্রকৃতিগত ইতিহাস, (খ) নির্ব্বাচিত যুগবিশেষের সাহিত্য বিজ্ঞান সমাজ অথবা ধর্ম্ম সম্পর্কিত প্রবৃত্তির ইতিহাস।

পরীক্ষার্থী অপর একটী ভাষা আনুষঙ্গিক পাঠ্যরূপে গ্রহণ করিবেন ; এবং

৫ম দিনের পরীক্ষা—ওই ভাষা সম্বন্ধে নির্দ্ধারিত সরল পাঠ্যগ্রন্থ এবং পাঠ্যাতিরিক্ত বিষয়ে গৃহীত হইবে।

৬ষ্ঠ দিনের পরীক্ষার বিষয়—ওই ভাষার ব্যাকরণ, ভাষাবিজ্ঞান এবং সাহিত্যের স্থূল ইতিহাস।

উল্লিখিত দুইটী ভাষা ব্যতীত পরীক্ষার্থীকে প্রাকৃত, পালি, পারসিক, পাস্তু, এই চারি ভাষার যে কোন দুইটার প্রাথমিক জ্ঞান লাভ করিতে হইবে। এবং

৭ম দিনের পরীক্ষা—নির্ব্বাচিত ভাষাদ্বয়ের ব্যাকরণ এবং সাহিত্যের নির্দ্দিষ্ট গ্রন্থ সম্বন্ধে গৃহীত হইবে।

৮ম দিনের পরীক্ষার বিষয়—প্রদেশ ভাষা সমূহের উৎপত্তি এবং বিকাশের সম্পর্কিত আর্য্যভারতীয় ভাষা বিজ্ঞান।

উপরে যে পরীক্ষার বিষয়গুলি উল্লিখিত হইল, তাহাদের পশ্চাতে শিক্ষা থাকিবে, বলাই বাহুল্য, এবং কলিকাতা য়ুনিভার্সিটী সত্বর এই শিক্ষার ভার গ্রহণ করিতেছেন। এখন ধরুন, কোন ছাত্র বাঙ্গালা ভাষাকেই প্রধান বিষয়রূপে গ্রহণ করিল ; তা হইলে সে বাঙ্গালায় এম্-এ হইতে পারিবে, এবং বাঙ্গালায় এম্-এ হইতে হইলে যে জ্ঞান উপার্জ্জন করা অপরিহার্য্য হইবে, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন শেষ পরীক্ষার্থীর জ্ঞানগৌরব হইতে তাহার কোন অংশে ন্যূনতা হইবে না। এইরূপে বাঙ্গালায় এম্-এ হইতে হইলে, ছাত্রের পক্ষে একদিকে যেমন ইংরেজী এবং (অনুল্লিখিত থাকিলেও) সংস্কৃতের জ্ঞান লাভ অপরিহার্য্য হইয়া গেল, অন্যদিকে আরও তিনটী ভাষার সাধারণ জ্ঞান! বাঙ্গালায় এম্-এ বলিয়া উপাধিটী নিতান্ত 'খেলো' হইবে না!

এখন, এই প্রবর্ত্তনার ফল বঙ্গসাহিত্যে এবং বঙ্গদেশে কি ভাবে উপজাত হইতে পারে? কেবল যাহারা মুখস্থ প্রশ্নোত্তর

উদ্গীরণ করিয়া যুনিভার্সিটীকে ফাঁকি দিয়া পরীক্ষা-সঙ্কট উত্তীর্ণ হইবার প্রয়াসী, তাহাদের কথা ধরিতেছি না, তাহাদের দ্বারা কোন দিকেই বা কি উপকারের সম্ভাবনা আছে? কিন্তু, যদি ভাষা সাহিত্যের ক্ষেত্রে প্রকৃত কর্ম্ম বুদ্ধিমান একটী ছাত্রও এই বাঙ্গালা বিভাগে আকৃষ্ট হইয়া ছয়টী ভাষাপ্রকৃতির সম্যক জ্ঞান লাভ পূর্ব্বক আপন তত্ত্বে স্থির হইয়া দাঁড়ায়, তাহার হস্তে বঙ্গভাষা ও সাহিত্য কত দিকে উদ্বর্ত্তনা লাভ করিতে পারে? এবং এইরূপে দশ বৎসর কার্য্য চলিলে, উহাতে বাঙ্গালার শব্দসম্পত্তি, উহার প্রকাশের শক্তি অন্ততঃ বাঙ্গালা গদ্যের শক্তি কতদিকে সহায়তা লাভ করিয়া বঙ্গভাষাকে ভারতের যাবতীয় প্রদেশ ভাষার শীর্ষস্থানে তুলিয়া ধরিতে পারে। উপযুক্ত ছাত্র শিক্ষকের সুযোগ ঘটাইতে পারিলে, এই ব্যাপারের ফল দশ বৎসরের মধ্যেই আমাদের জাতীয় জীবনে কত দিকে নূতন প্রবর্ত্তনার সূচনা করিবে! তখন ইতিহাস এই যুগ-প্রবর্ত্তয়িতার দূরদৃষ্টি এবং মাহাত্ম্য সম্যক বুঝিয়া উঠিতে পারিবে।

আমাদের জাতীয় চরিত্রে একটী ভাবুকতার লক্ষণ অত্যন্ত উগ্র হইয়া উঠিয়া, ইদানীং আমাদিগকে যে জীবনক্ষেত্রে নিদারুণ ভাবে দুর্ব্বল এবং অন্ধ করিয়া দিতেছে, তাহা মনে রাখিয়া প্রত্যেক বাঙ্গালীকে জাগ্রত ভাবে চলিতে হয়। আমাদের সাহিত্যের একটা প্রধান লক্ষণ বা গুণ যেমন এই ভাবুকতা, তেমন ইহা ভুলিলেও চলিবে না যে, আমাদের পাঠক-সংঘ সাহিত্যিক ভাবুকতাকে সমুচিত ভাবে গ্রহণ করিতে না পারিয়া, দুর্ব্বলধী এবং ক্ষীণচেতা হইয়া পড়িতেছে; মনুষ্য জীবনের কঠোর সত্য সমূহের আলোচনায় বীতস্পৃহতা এবং শিথিল মস্তিষ্কের পরিচয় দিতেছে। ওইদিকে মদ্র, মহারাষ্ট্র বা উত্তর পশ্চিম প্রদেশের সাহিত্যসেবী কিম্বা সাহিত্য-প্রেমিক হইতেও কূট-কঠিন নব্যন্যায়ের জন্মদাতা বলিয়া গৌরব-গর্ব্বশীল বাঙ্গালী পশ্চাতে পড়িয়া গেল! সম্প্রতি এই দৌর্ব্বল্যের দিকেই আমাদের প্রতীকার বুদ্ধি এবং ক্রিয়া-বুদ্ধি সচেতন করা আসন্ন কর্ত্তব্যরূপেই দাঁড়াইয়াছে। আমাদের কবিত্ব শক্তি এবং পদ্য রচনা যে গদ্যের শক্তি বা সত্য-আলোচনার শক্তি হইতে অনেক অগ্রগামী হইয়া গেল, এই সাহিত্যে কাব্যের, গল্পের বা কাল্পনিকতার ক্ষেত্রে যে প্রতিভাসঙ্গম ঘটিয়াছে, বিজ্ঞান দর্শন বা সত্যালোচনার দিকে যে তাহার দশমাংশও হয় নাই, তাহা স্বীকার না করিয়া পারা যায় না। এই দিকে বাঙ্গালীর মনীষা এবং গবেষণার দুর্ব্বলতা তাহার চরিত্র-দৌর্ব্বল্যই প্রমাণ করিতেছে। এই দুর্ব্বলতার বিরুদ্ধে জাগ্রত ভাবে ক্রিয়াপর হইয়া দেশের অভ্যন্তর হইতে সমুচিতকর্ম্মী এবং প্রতিকার-ক্ষম প্রতিভার উদ্বোধন করিতে না পারিলে, আমাদের কুত্রাপি শ্রেয়ঃ নাই।

এখন আমাদের পক্ষে আদৌ ভাষা এবং সাহিত্যের উন্নতি, তার পরেই অন্য কথা! সরস্বতী, যিনি জ্ঞানমাতা এবং ভাবমাতা, তিনিই পরমুহূর্ত্তে কর্ম্মদেবতারূপে প্রকটিত হন। বাঙ্গালী এ যাবৎ জগতে যাহা যাহা করিয়াছে, তাহার সমস্তই আদৌ ভাবজগতে তাহার বাণীমাতার স্তন্যরূপে লাভ করিয়াই কর্ম্মরূপে পরিণত করিয়াছে। জীবন সাধনার এই সামান্য সূক্ষ্ম কথা যে ব্যক্তি বুঝিতে পারে না, এবং বুঝিয়াও উদামক্ষেত্রে মুখ্য বলিয়া গ্রহণ করিতে চাহে না, তাহার সঙ্গে আমাদের কথা নাই।

দেখিতেছি, কলিকাতা য়ুনিভার্সিটীর এই সং সঙ্কল্পে এখনও দেশ সম্যক জাগে নাই। দেশের নিকট সংবাদ দান করা, বা কোন বিষয়ে কর্ম্ম-উদ্যম জাগ্রত করা যাঁহারা নিজের কর্ত্তব্য বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছেন, তাঁহারাই এ ব্যাপারের গুরুত্ব বুঝিতেছেন না! গবর্ণমেণ্ট য়ুনিভার্সিটীর প্রস্তাবে সম্মতি দিয়া থাকিলেও, এই নূতন ব্যাপারে অর্থ সাহায্য করিতে চাহেন না—হয়ত বর্ত্তমান অবস্থা গতিকেই পারেন না। এ অবস্থায় যাঁহারা অর্থ সাহায্য করিয়া দেশকে উন্নতি-পথে পরিচালিত করিতে ক্ষমতা রাখেন, তাঁহারা অগ্রসর না হইলে বাঙ্গালীর য়ুনিভার্সিটীর এই কর্ম্ম-কল্পনা যে হৃদয়ে উত্থিত হৃদয়েই বিলীন হইবে, তাহা বলাই বাহুল্য। বাঙ্গালার ধনীগণের পক্ষে যে অর্থ-সাহায্য যৎসামান্য বলিলেও অত্যুক্তি হয় না, প্রতি বৎসর আমোদ উৎসবেই যে দেশে এইরূপ কার্য্য-প্রয়োজনের চতুর্গুণ অর্থ উড়িয়া যায়, তাঁহাদের মধ্যে যদি দেশের মহোন্নতি-সূচক সৎকর্ম্মের জন্য উদ্যমশীল একজনও না থাকেন, তা হইলে বাঙ্গালী জাতির আর আশা কোথায়? যেদিন স্যর আশুতোষের প্রস্তাবে ভারত-গবর্ণমেণ্টের অনুমোদন সংবাদ প্রকাশিত হয়, সে দিনই দেশের হিতার্থিগণ লক্ষ লক্ষ মুদ্রা হস্তে পরস্পর প্রতিযোগী হইয়া য়ুনিভার্সিটীর দ্বারস্থ হওয়া বাঞ্ছিত ছিল।

সাহায্য করা দূরের কথা, দেখিতেছি, শোনা মাত্রই আমাদের কেহ কেহ বিসদৃশ বৈরভাব প্রকাশ করিয়া ফেলিয়াছেন! ঐ সংবাদে দেশের কোন গণ্যমান্য ব্যক্তি এই মর্ম্মে বলিয়া বসিয়াছেন যে, "তোমরা ত য়ুনিভার্সিটীর সর্ব্বোচ্চ পরীক্ষায় বাংলাকে লইয়া গেলে, কিন্তু কেবল 'পণ্ডিতী বাঙ্গালা'ই (বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার, বঙ্কিমচন্দ্র প্রভৃতির ভাষা?) যদি বাঙ্গালা ভাষার নমুনা হয়, তা হইলে আমার কিছুমাত্র সহানুভূতি নাই, যেহেতু, উহাতে আমাদের যুবকগণের উদ্ভাবনী শক্তি এবং মৌলিকতার পথে অত্যন্ত বাধা দিতেছে।" এমন একটা অযৌক্তিক এবং বিপরীত কর্ম্মবুদ্ধির কথা আর ত হইতে পারে না! প্রথমতঃ, য়ুনিভার্সিটী কেবল বাঙ্গালাকেই মুখ্য করার সংকল্প করেন নাই; প্রধান উদ্দেশ্য Higher Studies of Indian Vernaculars। তারপর, য়ুনিভার্সিটীর কর্ম্মসংকল্প যাহা প্রকাশিত হইয়াছে, উহাতে বঙ্গভাষার কোন সর্ব্বজনমান্য রীতির সমর্থন করিয়া মনুষ্যকে উদ্বেজিত করার কোন অভিসন্ধিও বুঝা যায় না। ছাত্রকে আদিম বাঙ্গালার নমুনা হইতে আরম্ভ করিয়া উহার আধুনিকতম প্রবৃত্তি পর্য্যন্ত যথানুক্রমে অধ্যয়ন করিতে হইবে। অবশ্য, এই অধ্যয়নের ফল স্বরূপ বুদ্ধিমান্ ছাত্র মাত্রেরই রুচি গঠিত হইয়া গিয়া রীতি-নির্ব্বাচনের ক্ষেত্রে তাহার সহায় হইবে বলিয়াই য়ুনিভার্সিটী আশা করিতে পারেন। তবে সমালোচক যাহাকে 'পণ্ডিতী বাংলা' বলিয়া কটাক্ষ করিয়াছেন, যাহাকে সচরাচর আমরা সাধু বাঙ্গালা বলি, উহা একেবারে কতকগুলি 'সেকেলে' পণ্ডিতের মস্তিষ্ক হইতেই বঙ্গদেশে ভূমিষ্ঠ হইয়া গিয়া, দুর্ভাগ্য বাঙ্গালী যুবকের কোমল হৃদয়কে জগদ্দলের মতই চাপিতে আরম্ভ করিয়াছে, তাহা ত কোন মতেই ধারণা করিতে পারি না! উহাতেই বাঙ্গালী জাতির তাবৎ উদ্ভাবনী ক্ষমতা দমাইয়া দিল! দল বাঁধিয়া কিম্বা একটা সাজোস করিয়া কেহ একটী ছন্নমতী ভাষাকে বিপুল দেশের দিক্‌দিগন্তে সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে পারে বলিয়াও মনে করি

না। যেরূপেই হউক, এই পণ্ডিতী বাঙ্গালা বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, কৃত্তিবাস হইতে, বৈষ্ণব যুগের 'চরিত' কবিগণ হইতে, অন্ততঃ কবি-কঙ্কন ও ভারতচন্দ্র হইতে আরম্ভ করিয়া, এতদ্দেশে সাহিত্য সম্মিলনের জন্য শত শত বৎসরের শক্ত মাটী এবং উহার উপরেই এতকাল সর্ব্ব বঙ্গের লোক এক সমতলে আসিয়া ভাবের আদান প্রদান পূর্ব্বক আপনাদিগকে বাঙ্গালী বলিয়া অনুভব করিতেছে? অবশ্য, কিছুদিন হইতে উহারই কোন কোন দিকে সহরতলীবাহিনী হুগলীর একটা 'চলচলে' পলিমাটী পড়িয়া জমিয়া দাঁড়াইবার চেষ্টা করিতেছে; কিন্তু, ওই অস্থির পদার্থের উপর ভর দেওয়া মাত্রই পদে পদে পা 'দাবিয়া' যায়, এবং নীচের শক্ত স্তরটীর আশ্রয়েই রক্ষা পায়! যাঁহারা চলার পরামর্শ দিতেছেন, তাঁহাদের অনেককেই ত কেবল "হাঁটি হাঁটি পা-পা" করিয়া, উঠিয়া পড়িয়া, হাঁফাইয়া খোঁড়াইয়া চলিতেই দেখিতেছি! উহার উপর দিয়া, সর্ব্বদা সর্ব্বত্র সর্ব্বসাধারণ ভদ্রলোকের মত চলিতে পারিবে কি না, তাহা এখনও পরীক্ষাস্থল। এ অবস্থায় য়ুনিভার্সিটী যদি এতকাল এইরূপ 'চোরা বালি'র উপর নির্ভর করিয়াই সংশিক্ষার এমারত তুলিতে ব্যগ্রতা না দেখাইয়া থাকেন, য়ুনিভার্সিটীকে ত দোষ দেওয়া যায় না! সমালোচক নিজেই বলিয়াছেন, উহার এখনো Fluid stage.

সাহিত্যের ক্ষেত্রে নূতনত্বের পথে পরীক্ষা করার সাহসকে আমরা নিন্দা করিতে পারি না; প্রতিভাবান্ ব্যক্তিগণ উহা করিয়া থাকেন। তাঁহাদের ওইরূপ পরীক্ষা ব্যাপার প্রথমে বাতুলতা বলিয়া নিন্দিত হইয়াও অনেক সময় পরিশেষে ইতিহাসের পূজালাভ করিয়াছে। তবে, সকলেই জানেন যে, বাহিরের দৃষ্টিতে বাতুলতা ও প্রতিভা যমজ ভগিনী; প্রথম অবস্থায় উহাদের চেহারা সনাক্ত করাও দুষ্কর। সফলতায় উত্তীর্ণ হইতে পারিলেই বাতুলতার নাম হয় প্রতিভা! এবং উহার বিকাশের জন্য কোনরূপ নিয়ম-বিধি বা শৃঙ্খলা বলিয়া ব্যাপার ও মনুষ্যের বিজ্ঞান দর্শন আবিষ্কার করিতে পারে নাই। নবনবোন্মেষী প্রতিভামাত্রকেই প্রথম প্রথম পারিপার্শ্বিক সমাজের গঞ্জনা লাঞ্ছনা সহ্য করিয়া, এবং আত্মশিক্ষা ঘটনা করিয়াই অগ্রসর হইতে হয়! এইরূপ জীবন-পরীক্ষা সফলতার সহিত উত্তীর্ণ হইতে পারে বলিয়াই ত প্রতিভার প্রধান সম্মান! কিন্তু, য়ুনি-ভার্সিটী হইতেছে একটা সর্ব্বজাতি-সাধারণ শিক্ষাগার। একই আদর্শে, একই ব্যয়ে, নির্দ্দিষ্ট প্রণালীতে বহু যুবককে শিক্ষিত করিয়া, দেশে একটা উচ্চশিক্ষা এবং সভ্যতার ন্যূনাধিক সাধারণ সমতল সৃষ্টি করাই হইল য়ুনিভার্সিটীর লক্ষ্য! যতদূর পারা যায়, ঐ সাধারণ প্রণালীতেই ব্যক্তিবিশেষের মৌলিকতার উন্মেষে সাহায্য করাও তাহার উদ্দেশ্য। সকল দেশের সাধারণ শিক্ষাগৃহ বা য়ুনিভার্সিটী মাত্রের ওইরূপ উদ্দেশ্য নহে কি? সুতরাং কোন য়ুনিভর্সিটী বা একেডেমীর পক্ষে ন্যূনাধিক স্থিতিশীল না হইয়া একেবারে 'উড়ন চড়ুই'র বৃত্তি গ্রহণ করা চলে কি? তাহার ঐ শিক্ষাপ্রণালী মানিয়া লইয়া, বা তাহার পরীক্ষা পথের যাত্রী হইয়া, ব্যক্তি-বিশেষ যদি সঙ্গে সঙ্গে নিজের অন্তরস্থিত প্রতিভা-বহ্নির ইন্ধনও যোগাইয়া যাইতে পারেন, এবং উহার সাহায্যেই বিশ্বপরিদৃশ্য হইয়া উঠিতে পারেন, য়ুনিভার্সিটী তাহাতেই কৃতার্থ হয়। কারণ, এইরূপে সাধারণের

সমতল-উল্লঙ্ঘী অসামান্যতার বিকাশ হইতে যেমন দেশের গৌরব, তেমন য়ুনিভার্সিটীরও গৌরব! কিন্তু, গৌরব বলিয়াই, য়ুনিভার্সিটী এইরূপ একটা অনিশ্চিত এবং অসামান্য আকস্মিকের আশাতেই সহস্র সহস্র ছাত্রের শিক্ষাবলম্বনকে সমস্ত স্থিতি শৃঙ্খলা হইতে খারিজ করিয়া, শিক্ষাপুরীকে একটা পাগলখানায় উদ্বর্ত্তিত করিতে পারে না। কবে স্বাধীন প্রতিভার সৌভাগ্য-যোগ ঘটিবে, তাহার উদ্দেশ্যেই ছাত্র শিক্ষকের 'লেকচর রুম'কে একেবারে প্রত্যেকের স্বতন্ত্র-কণ্ঠ-বিলাসী চিড়িয়ার গৃহে পরিণত করিতে পারেন না!

পূর্ব্বোক্ত সমালোচক মহাশয়ের উক্তি হইতে আরও একটা আপত্তির কথা এই দাঁড়ায় যে, বঙ্গভাষার বাংলা আর্য্য-রীতি বা বিদ্যাসাগর প্রভৃতির 'পণ্ডিতী রীতি' তাহার সমস্ত উন্নতি এবং বিকাশের সম্ভাবনাও যেন বঙ্গদেশে নিঃশেষে পরীক্ষিত হইয়া গিয়াছে; ওই পথে আর উদ্ভাবনাও সম্ভবপর নহে, এবং কেবল বলিবার কদরের উপরেই সাহিত্য ক্ষেত্রের যাবতীয় প্রতিভা কার্য্য এবং উদ্ভাবনা নির্ভর করিতেছে! যাহাই হোক, য়ুনিভার্সিটীতে দশজন বসিয়া যাহা নির্দ্ধারণ করিবেন, তাহা ব্যক্তিবিশেষের মতে ভ্রমাত্মক হইতে পারে, প্রকৃত প্রস্তাবেও ভ্রমাত্মক হইতে পারে, তথাপি দশের মতের উপরেই নির্ভর না করিয়া উপায় কি? এ ক্ষেত্রে প্রবেশ ভাষার শিক্ষাবোর্ডকে কোণায় ঠেলিয়া কোনও এক ব্যক্তিকে সর্ব্বাধিপত্য প্রদান করিলেই কি বঙ্গভাষার সচ্চরিত্র সুরক্ষিত হওয়ার সম্ভাবনা আছে?

যেমনই হোক, প্রত্যেক বাঙ্গালীরই ন্যায্য সমালোচনা করিয়া তাহার য়ুনিভার্সিটীকে পরামর্শ দিবার স্বত্ব আছে—কারণ ইহা সকলের কাজ। আমার কথা হইতেছে, সকলেই এখন ইহাকে নিজের কাজ বলিয়াই বুঝিয়া লউন। যে মাতৃভাষা প্রকৃত প্রস্তাবে ভারতের অন্য কোন য়ুনিভার্সিটীর প্রবেশ-পথে পদক্ষেপ করিতেও পারে নাই, তাহাকে যে বাঙ্গালী নিজের সর্ব্বোচ্চ শিক্ষাপুরীতে লইয়া গিয়া, একে একে সোপান পরম্পরা অতিক্রম পূর্ব্বক পরিশেষে সিংহাসনে অভিষিক্ত করিতে পারিল, সমগ্র জাতিটী কি এই পরম সৌভাগ্যের সুফল চয়নে প্রাণমনে অগ্রসর হইবে না?

শ্রীশশাঙ্কমোহন সেন।

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতা।

কুচবিহারের রাজ্ঞী।

কোন্ দুর্ব্বাসার শাপে কোন্ যুগে—কবে,
প্রীতির বন্ধন ছিন্ন, পরস্পর ভিন্ন ভিন্ন,
শ্রীহীন অমরপুর বিহীন গৌরবে!
অতীতে গণনাহীন, হায় সে অশুভ দিন,
মলিন ত্রিদিব—পূর্ণ হাহাকার রবে!
অন্ন কষ্ট মহামারী, ক্লিষ্ট পিষ্ট নরনারী,
পড়িয়াছে পঙ্গপাল তিল ধান্য যবে!
ধর্ম্মে কর্ম্মে শত ভেদ, কথাকণ্ঠ ব্যবচ্ছেদ,
বিচ্ছেদে ব্যথিত বক্ষ দেবগণ সবে,
কোন্ দুর্ব্বাসার শাপে কোন্ যুগে—কবে!

এস রাজ্ঞি! মহালক্ষ্মি! কল্যাণি ইন্দিরা!
এস দেবি! কক্ষে চাপি, অমৃত অক্ষয় ঝাঁপি,

ঐক্যে সখ্যে পরিপূর্ণ মণিরত্ন হীরা!
এস লক্ষ্মি কোজাগরী, নিদ্রিতে জাগ্রত করি,
নব জাগরণ দেশে নিয়ে এস ফিরা!
উত্তিষ্ঠ জাগ্রত রবে, উদ্বোধিত কর সবে,
জাগুক জগত-শ্রেষ্ঠী মণিদীপ্ত-শিরা।
যে আছে যেখানে ঘুমে, গিরি মরু বনভূমে,
জাগুক যে জড়তার নাগপাশ ছিঁড়া।
শাপান্তে তোমারে আজ, লভিলা সে দেবরাজ,
নবলক্ষ্মী পূর্ণিমায় নবীনা ইন্দিরা!
নব জাগরণ দেশে নিয়ে এস ফিরা।

শ্রীগোবিন্দচন্দ্র দাস।

ঋগ্বেদীয় ব্রহ্মস্তোত্র।

(ঋগ্বেদ। ১০ মণ্ডল, ৮২ সূক্ত)।

নিবাত হিল্লোলহীন কারণ-নিবহে,
অক্ষয় অব্যয় দ্যুতি ঘনীভূত বহে।
সে দিব্য জ্যোতির মাঝে কবে কোন্ দিন,
ফুটিয়া উঠিল বিশ্ব শাশ্বত নবীন!

হে বিরাট বিশ্বকর্ম্মা, পুরুষ-পুরাণ!
কি বিশাল দ্যাবা-পৃথ্বি করিলে নির্ম্মাণ!
ব্রহ্মাণ্ডের আদি পিতা, ওহে জন্মদাতা!
সর্ব্ব দেবতার মাঝে তুমিই বিধাতা!

কে তুমি, কোথায় তুমি, কোন্ দিকে ধাম?
কর্ম্ম-শেষে কোন্ দেশে লভিবে বিশ্রাম?
কারণ-পয়োধি-গর্ভে কোথা স্থির ভূমি—
হে বিরাট বিশ্বপ্রাণ! যেথা আছ তুমি?

দিক্-হারা পান্থ প্রায় কুহেলি ধাঁধায়,
ভ্রান্ত মোরা ভ্রমিতেছি বিভ্রম-আঁধায়!
কল্পনায় তব লাগি যজ্ঞ-আয়োজন,
কত স্তুতি, কত ঘটা, পঠন, পূজন!

তুমি কোন্ দূরে রহি হাসিতেছ লুকি;
মানবের ব্যর্থ চেষ্টা হেরি হে কৌতুকী!

দয়বেশ।

সোণার ভারত।

(১)

কোথায় পূর্ব্বে চতুর্ব্বেদ সৃষ্ট ধাতার ধ্যানে!
ব্রাহ্মণেরা কোথায় প্রথম জাগলো ব্রহ্মজ্ঞানে!
উপনিষদ কোথায় প্রথম দেখায় সত্য পথ!
প্রচার করে নানান্ শ্রুতি নূতন অভিমত!
মনুর ধর্ম্মশাস্ত্র কোথায় প্রথম প্রচারিত!
চন্দ্র সূর্য্য যদুবংশ কোথায় অস্তমিত!
অগ্নি বায়ু বরুণ অরুণ কোথায় পূজা পায়!
সর্ব্বভূতে পরম পুরুষ কোথায় শোনা যায়!
এই সে ভারত জগদ্বন্দ্যা পূজ্যা মহীয়সী!
সকল জাতির পালনকর্ত্রী, তীর্থ বারাণসী!!

(২)

দাতা দধীচ হরিশ্চন্দ্র বলী কর্ণ শিবি,
কোথায় এমন কয়টি দাতা ছিলেন সাহেব বিবি!
কোথায় সগর দশরথের ছিল সোণার পুরী!
জনক রাজার মত রাজা কোথায় ভূরি ভূরি!
রামের মত পিতৃভক্ত কোথায় অবনীর!
ভীষ্মের মত কোথায় ছিল ব্রহ্মচারী বীর!
রণক্ষেত্রে কৃষ্ণ কোথায় শোনায় পুণ্য গীতা!
কোথায় গার্গী দময়ন্তী সাবিত্রী আর সীতা!
এই সে ভারত জগদ্বন্দ্যা পূজ্যা মহীয়সী!
সকল জাতির পালনকর্ত্রী, তীর্থ বারাণসী!!

(৩)

যুধিষ্ঠিরের মত সাধু কোথায় ছিল কবে!
ভীমের মত শক্তিশালী আর কেহ কি হবে!
কপিল কণাদ জৈমিনী আর পতঞ্জলী ঋষি,
মিল্‌বে কি রে আকাশ পাতাল খুঁজলে দশদিশি!

ব্যাস বশিষ্ঠ নারদ সম কোথায় দার্শনিক !
বাল্মীকি যে আদি কবি বিশ্ব জানে ঠিক !
কালিদাসের মত কাহার রসের অনুভূতি !
কোথায় কবি ভর্ত্তৃহরি দণ্ডী ভবভূতি !
এই সে ভারত জগদ্বন্দ্যা পূজ্যা মহীয়সী !
সকল জাতির পালনকর্ত্রী, তীর্থ বারাণসী !!

(৪)

আরব মিশর রোম তুর্কী গিরিস ম্যাসিডন,
ইউরোপে কার সভ্যতাকে করলো বিতরণ !
অহিংসাটা পরমধর্ম্ম শিখায় কাহার ছেলে !
অশোক কাহার ধর্ম্মপ্রচার করলো অবহেলে !
শ্যাম তিব্বত ব্রহ্ম তাতার লঙ্কা জাপান চীন,
ধর্ম্ম কাহার অদ্যাবধি মানছে প্রতিদিন !
হায় কি গভীর অধঃপতন, হায় কি অপমান !
পাদ্রি কাকে আঁধার থেকে আলোয়
নিতে চান !
এই সে ভারত জগদ্বন্দ্যা পূজ্যা মহীয়সী !
সকল জাতির পালনকর্ত্রী, তীর্থ বারাণসী !!

(৫)

চণকপুত্র সম কোথায় রাজনীতি জানে !
নন্দবংশ ধ্বংস হলো কাহার অপমানে !
রাজ্য পেল চন্দ্রগুপ্ত কাহার বুদ্ধি বলে !
বিশ্ব পরিব্রাজক কোথায় আসতো দলে দলে !
কোথায় এল মেগাস্থিনিস হুয়েন ফাহিয়ান !
কাহার খানিক কীর্ত্তি গেয়ে তারা কীর্ত্তিমান্ !
কোথায় ছিল আর্য্যভট্ট, কাহার নালন্দায়
জগতের সব ব্রহ্মচারী বিদ্যা শিখে যায় !
এই সে ভারত জগদ্বন্দ্যা পূজ্যা মহীয়সী !
সকল জাতির পালনকর্ত্রী, তীর্থ বারাণসী ! !

(৬)

উত্তরে কার দেয় পাহারা বিশাল হিমালয় !
দক্ষিণে কার ফেনিল সাগর কেবল গরজয় !
কার প্রতীচে কাবুল যেচে কবুল করে প্রীতি !
প্রাচ্যে কাহার শ্যাম ব্রহ্ম করছে যশোগীতি !
ব্রহ্মপুত্র শোন্ যমুনা গঙ্গা বুকে কার !
শতদ্রু ব্যাস্ চেনব্ ঝিলম্ কাহার কণ্ঠহার !
গোদাবরী মহানদী তাপ্তি নর্ম্মদার,
কার মেখলা উজ্জ্বল হলো মধুর সুষমায় !
এই সে ভারত জগদ্বন্দ্যা পূজ্যা মহীয়সী !
সকল জাতির পালনকর্ত্রী, তীর্থ বারাণসী ! !

(৭)

এমন বাহার আকাশ কাহার, বাতাস
এমন মিঠে !
কোথায় এমন ফুলে সুবাস, এমন
রঙের ছিটে !
ষড়ঋতু কোথায় এমন হরণ করে মন !
কোথায় এমন পাখীর গানে হিয়ার উচাটন !
কাহার শস্যে কাহার ফলে জগদ্বাসী বাঁচে !
ঘাসের উপর হাঁটলে কোথায় আহ্লাদে প্রাণ
নাচে !
ধনৈশ্বর্য্যের লোভে কাহার মানুষ বারংবার,
সাগর মেরু পাহাড় মরু করলো একাকার !
এই সে ভারত জগদ্বন্দ্যা পূজ্যা মহীয়সী !
সকল জাতির পালনকর্ত্রী, তীর্থ বারাণসী !!

(৮)

একটা ভীষণ ওলট পালট, বিকট একাকার,
আনলো কোথায় হাজার অভাব লক্ষ
ব্যভিচার !
বামুন করে জুতা সেলাই, চণ্ডী পড়েন মুচি ;
তন্ত্র মন্ত্র তুচ্ছ এখন, নাই সে হৃদয় শুচি !
প্রাণে এখন শ্রদ্ধা কোথায়, ভক্তি এখন
ঠোঁটে ;
পিতৃপুরুষ পিণ্ড পাবেন নাই সে আশা মোটে !
ধুতি চাদর পায় না আদর, সবাই মামা হারা !
সেই ভারতের আত্মা কোথায় যাচ্ছে মাঠে
মারা !
এই যে ভারত নয় সে ভারত পূজ্যা মহীয়সী !
আর নহে সে মুক্তিদাত্রী তীর্থ বারাণসী !!

শ্রীযতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য।

হিন্দুদেবতার প্রকৃত স্বরূপ ও সনাতন ভাব

মান্যবর

শ্রীযুক্ত "প্রচার" সম্পাদক মহাশয়

মান্যবরেষু।

সবিনয় নিবেদন এই,

মহাশয়! গত জুলাই মাসের প্রচারে "মূর্ত্তিপূজা ব্রহ্মজ্ঞানের সোপান কিনা" এবং "বিজ্ঞানে দেবতার তিরোভাব" শীর্ষক যে দুইটী প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে, তৎসম্বন্ধে আমার কিঞ্চিৎ বক্তব্য আছে। নিম্নে সেই বক্তব্য সংক্ষেপে ব্যক্ত করিতেছি, আশা করি, আপনার সুবিখ্যাত পত্রিকায় ইহা মুদ্রিত করিয়া বাধিত করিবেন :—

উল্লিখিত প্রবন্ধ দুইটীরই উদ্দেশ্য হিন্দুর সাকারোপাসনার অকিঞ্চিৎকরতা প্রতিপাদন করা। কিন্তু এই উভয় প্রবন্ধেই হিন্দুর সাকারোপাসনার প্রকৃত মর্ম্ম গ্রহণ করার কোন চেষ্টার পরিচয় পাওয়া যায় না। হিন্দুর সাকারোপাসনা কেবল মূর্ত্তি বা জড়পদার্থেরই উপাসনা নহে। পরন্ত ইহা সৃষ্টিতে পরম চিন্ময়সত্তারই উপাসনা। সৃষ্টিতে স্রষ্টার আবির্ভাব অনুভব; ইহাতেই সাকারোপাসনার প্রথম উৎপত্তি। সমগ্র বিশ্বসৃষ্টি "প্রকৃতি" নামেই অভিহিত হইয়া থাকে। এইরূপে প্রকৃতির মধ্যে পরম পুরুষরূপী চেতনসত্তার উপলব্ধিতেই সাকারোপাসনার প্রথম সূচনা হইয়াছে। প্রকৃতির মধ্য দিয়া প্রকৃতির আত্মভূত চরম তত্ত্বের সাক্ষাৎ, ইহাই সাকারোপাসনার প্রকৃত লক্ষ্য। সাকারোপাসনার এই প্রণালীতেই ইহা প্রাকৃতিক উপাসনা হইয়াছে। এই প্রাকৃতিক উপাসনাই বৈদিক ধর্ম্মের মূল ভিত্তি। এই প্রাকৃতিক উপাসনা কিন্তু প্রকৃতি সম্বন্ধে অজ্ঞতামূলক উপাসনা নহে; পরন্ত ইহা প্রকৃতি সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞানমূলক উপাসনা। প্রকৃতির অশেষ বৈচিত্র্য, ও বিভবের মধ্যে বিশ্বস্রষ্টার অপার মহিমা কিরূপে প্রকটিত হইয়াছে, বৈদিক উপাসনা তাহারই পর্য্যবেক্ষণমূলক উপাসনা; সর্ব্বশক্তিমান্ পরমেশ্বরের অনন্ত শক্তি সৃষ্টিতে কিরূপ অনন্তরূপে বিকাশপ্রাপ্ত হইয়াছে, বৈদিক উপাসনা তাহারই বিশ্লেষণমূলক উপাসনা। হিন্দুর তেত্রিশ কোটী দেবতা অনন্তস্বরূপ পরমেশ্বরের অনন্ত বিভূতিরই রূপক ব্যতীত আর কিছুই নহে। হিন্দুর বহু-দেববাদ, একেশ্বরবাদ, অদ্বৈতবাদ প্রভৃতি সমস্ত ধর্ম্মমত এই প্রাকৃতিক উপাসনারই উপর প্রতিষ্ঠিত। আমরা আমাদের বক্তব্যের সমর্থনে প্রথমতঃ একজন প্রসিদ্ধ মিশনরীর মতই উদ্ধৃত করিব :—

"It seems to be always the fate of the Hindu thinker, that he no sooner abstracts the idea of God from natural phenomena than he loses sight of nature altogether, and merges all in God. He carries his love of unity to its highest fruition, to the absolute

---

* এই প্রবন্ধটী খ্রীষ্ট ধর্ম্মের অন্যতর মুখপত্র "প্রচারে" প্রকাশার্থ প্রেরিত হইয়াছিল। সম্পাদক প্রকাশ করিতে সাহস না করিয়া প্রতিপ্রেরণ করায় "নব্যভারতে" প্রকাশার্থ প্রেরণ করা গেল। আশা করি, "নব্যভারত" সম্পাদক মহোদয় প্রবন্ধটী প্রকাশিত করিয়া স্বকীয় স্বভাবসুলভ নিরপেক্ষতার পরিচয় প্রদান করতঃ বাধিত করিবেন। ইতি লেখক।

identity of the ego and the non-ego, mind and matter, subject and object, the creator and the creation, God and the universe. Hence polytheism and ideal pantheism are two streams, which, from the earliest times, have run parallel in India. As it was in the Vedic age, so it is now. Polytheism is the religion of the ignorant multitude and ideal pantheism is the religion of the thoughtful few."—The Teaching of the Vedas, by Maurice Phillips. (London Mission, Madras) P. P. 72—73.

"হিন্দু ভাবুকের পক্ষে ইহাই সর্ব্বদা বিধিনির্দ্দিষ্ট বলিয়া বোধ হয়, যে প্রাকৃতিক ব্যাপার হইতে ঈশ্বর ধারণাটীকে নিষ্কাশিত করামাত্রই, বাহ্যপ্রকৃতি তাঁহার চক্ষু হইতে সম্পূর্ণ ই অন্তর্হিত হয়, তখন সমস্তই ঈশ্বরে বিলীন হইয়া যায়! বিষয় ও বিষয়ী, জড় ও চেতন, জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়, স্রষ্টা ও সৃষ্টি, ব্রহ্ম ও বিশ্বের সম্পূর্ণ অভেদভাবে তদীয় অভীষ্ট ঐক্যভাব চরম ফল প্রাপ্ত হয়। ইহাতেই বহুদেববাদ ও শুদ্ধাদ্বৈতবাদ অতীব পুরাকাল হইতেই ভারতবর্ষে দুইটী সমান্তরাল স্রোতের ন্যায় প্রবাহিত হইয়াছে। ইহা বৈদিক কালে যেরূপ ছিল, এখনও তদ্রূপই রহিয়াছে। বহুদেববাদ জনসঙ্ঘের ধর্ম্ম; শুদ্ধাদ্বৈতবাদ কতিপয় জ্ঞানী ব্যক্তিরই মাত্র ধর্ম্ম।"

সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক সুপণ্ডিত রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় এই ভাবটীকেই আরও বিশদরূপে এই প্রকারে ব্যক্ত করিয়াছেন :—

"But while the popular mind in ancient India thus imagined a deity in every striking natural phenomenon, and while hymns were sung to the different nature-gods at sacrifices, the wise and the thoughtful believed, even in this early age, that all the operations of nature were the work of One Supreme Power, and all the gods invoked were but the different names of One Supreme God. It is necessary to remember this distinction between the popular faith and the underlying philosophical faith in India, for the distinction which we mark in the Vedic Age has continued to the present day. The common people in India have always paid worship to many gods, while the wise and the learned have always these different gods as the various powers or the various names of One Supreme Being. It is necessary to remember this duality in Hindu faith and doctrine in order to comprehend the history of the Hindu religion during four thousand years."—The Civilisation of India, by R. C. Dutt C. I. E. (Temple Primer Series) pp. 12—13.

"কিন্তু একদিকে যখন প্রাচীন ভারতের সাধারণ লোক, প্রত্যেক বিশিষ্ট প্রাকৃতিক ব্যাপারে এইরূপে দেবতার কল্পনা করিতে লাগিলেন ও যখন যজ্ঞে ভিন্ন ভিন্ন প্রাকৃতিক দেবতার উদ্দেশে স্তোত্র সকল গীত হইতে লাগিল; তখন জ্ঞানী ও চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ এই আদিম যুগেও বিশ্বাস করিতে লাগিলেন যে, প্রাকৃতিক সমস্ত ব্যাপার একই পরাশক্তির কার্য্য এবং উপাস্য সমস্ত দেবতাই একই পরমেশ্বরের ভিন্ন ভিন্ন নাম মাত্র। ভারতের সাধারণ ধর্ম্মবিশ্বাস এবং ইহার অন্তরালবর্ত্তী দার্শনিক

ধর্ম্মবিশ্বাসের মধ্যে এই পার্থক্য স্মরণ রাখা আবশ্যক; কারণ, বৈদিক যুগে লক্ষিত পার্থক্য বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত চলিয়া আসিয়াছে। ভারতের সাধারণ লোক সর্ব্বদাই বহু দেবের উপাসনা করিয়াছে; পক্ষান্তরে জ্ঞানী ও বিজ্ঞ লোক সকল সর্ব্বদাই এই সমস্ত দেবগণকে একই বিশ্বসত্তার বিবিধ শক্তি বা বিবিধ সংজ্ঞা বলিয়া মনে করিয়াছে। হিন্দু ধর্ম্মের চারি সহস্র বৎসর ব্যাপী ইতিহাসের সম্যক্ ধারণা করিবার জন্য হিন্দুধর্ম্ম-বিশ্বাস ও হিন্দু ধর্ম্মমতের এই দ্বিবিধ ভাবটী স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য।*

হিন্দুর প্রাকৃতিক উপাসনার যে দুইটী ব্যাখ্যা আমরা উপরে প্রদান করিয়াছি, তাহা হইতেই "প্রচারের" প্রাগুল্লিখিত প্রবন্ধ দুইটীর যথাযথ উত্তর পাওয়া যাইতে পারে। হিন্দুর সাকার ও নিরাকার উপাসনা একই প্রাকৃতিক উপাসনার মূল উৎস হইতে আবহমান কাল প্রবাহিত হইয়া আসিতেছে। অধিকারী ভেদে গন্তব্যপথ ভিন্ন হইলেও উভয়ের একই লক্ষ্য। প্রকৃতি-যোগে পরমেশ্বরের উপাসনাই যখন হিন্দুর সাকারোপাসনা বলিয়া সিদ্ধান্ত হইতেছে, তখন যতই বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার হউক্ না কেন, তাহাতে হিন্দুর সাকারোপাসনা বিলোপের কোন আশঙ্কার কারণ হইতে পারে না। যেহেতু প্রকৃতির সহিত যখন হিন্দুর সাকারোপাসনা একান্ত ভাবেই অনুস্যূত, তখন প্রকৃতি যতদিন থাকিবে, ততদিন সাকারোপাসনা কখনই বিলুপ্ত হইতে পারে না। বিজ্ঞানের আবিষ্কারে প্রকৃতির আশ্চর্য্য রহস্য যতই প্রকাশ পাইবে, প্রকৃতির অধিষ্ঠাতৃ দেবতার মাহাত্ম্য ও ততই বর্দ্ধিত হইবে। প্রকৃতি, পরম দেবতারই কার্য্য। কার্য্যের মধ্যেই কর্ত্তার শক্তি ও গুণের পরিচয় পাওয়া যায়, এবং কার্য্যের গৌরবেই কর্ত্তার গৌরব প্রখ্যাপিত হইয়া থাকে। হিন্দুর সাকারোপাসনা বিলোপ প্রাপ্ত হইবে না বলিয়া আমরা যে বলিয়াছি, অনুরূপ সাকারোপাসনার যে উদ্বোধন আমরা বর্ত্তমান ইংরেজ কবির মধ্যে পর্য্যন্ত দেখিতে পাই, তাহাতেই উহার যাথার্থ্য বিশেষরূপে প্রতিপাদিত হইতে পারে। প্রবন্ধ দীর্ঘ হইবে ভয়ে আমরা কয়েকটী স্থলমাত্র উদ্ধৃত করিতেছি।

Addison এর 'Ode' নামক কবিতায় নক্ষত্রাদি-খচিত নভোমণ্ডল ও সূর্য্য কিরূপে স্রষ্টার পরিচয় প্রদান করে, তৎসম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে :—

The spacious firmament on high,
With all the blue ethereal sky,
And spangled heavens, a shining frame,
Their great original proclaim.
Th' unweary'd sun, from day to day,
Does his Creator's power display;
And publishes, to every land,
The work of an Almighty hand."

Moore এর 'Address to the Deity' কবিতায় সৃষ্টিতে কিরূপে স্রষ্টার প্রতিবিম্ব দেখিতে পাওয়া যায়, তৎসম্বন্ধে লিখিত হইয়াছে :—

"Thou art, O God ! the life and light
Of all this wondrous world we see;
Its glow by day, its smile by night,
Are but reflections caught from Thee;
Where'er we turn, Thy glories shine,
And all things fair and bright are Thine."

"Country Life" নামক কবিতায় কৃষক মাঠের তৃণ ক্ষেত্রের মধ্যে ঈশ্বরের মহিমা কিরূপ অঙ্কিত দেখিতে পায়, তাহাই বর্ণনা করিয়া, কবি Herick লিখিতেছেন :—

"Thou seest a present God-like power
Imprinted in each herb and flower."

'প্রচারের' বিজ্ঞানগর্ব্বিত লেখক কি এই গভীর আধ্যাত্মিক উচ্ছ্বাসগুলিকে সাকারোপাসনা বলিয়া উপেক্ষা করিতে সাহস করেন? তাহা হইলে তাঁহার সাহস যে নিতান্ত দুঃসাহস বলিয়াই বিবেচিত হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

শ্রীশীতলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

গীতোক্ত ত্রিগুণতত্ত্ব। (৬)

ত্রিগুণের আধিভৌতিক অর্থ—জড়শক্তিবাদ।—এইরূপে আমরা ক্ষুদ্রতম পরমাণু হইতে শ্রেষ্ঠ মানুষ পর্য্যন্ত সর্ব্বভূতে বা জীবে পুরুষপ্রকৃতির লীলা, এই ত্রিগুণের ক্রিয়া হইতে, জানিতে পারি। কিন্তু যখন অজ্ঞান বশে তমঃপ্রভাবে আমাদের জ্ঞান আবৃত থাকে, তখন আমরা এই বাহ্য বিষয়ের মধ্যে কেবল জড়ের ক্রিয়াই দেখিতে পাই। বাহ্য জগৎ আমাদের নিকট জড় জগৎ রূপেই প্রতিভাত হয়। তাহাতে জড় ও জড় শক্তির ব্যাপারমাত্র আমরা ধারণা করিতে পারি। জড়বাদী পণ্ডিতগণ এই জড় ও জড়শক্তির ক্রিয়ার দ্বারাই বাহ্য প্রত্যক্ষের সাহায্যে এই জগত্তত্ত্ব বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছেন। আধুনিক বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণের এই জড়শক্তিবাদের মূলেও এই ত্রিগুণ-তত্ত্বের আভাস পাওয়া যায়। জগতের এই মূল কারণরূপে যে এক অনন্ত, অক্ষয়, অবিনাশী অজ্ঞেয় মহাশক্তি আছে, তাহা অনেক আধুনিক বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক পণ্ডিত স্বীকার করেন। বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণের মতে এই শক্তির হ্রাসবৃদ্ধি নাই, উৎপত্তি ক্ষয় নাই, তবে ইহা নিয়ত-পরিণামী বা পরিবর্ত্তনশীল (ইহাই Law of conservation and transformation of Energy)। এই শক্তি কখন আলোকরূপে, কখন তড়িৎরূপে, কখন তাপরূপে, কখন চুম্বক-শক্তি ইত্যাদি রূপে আমাদের জ্ঞানগোচর হয়। ইহা কখন তড়িৎরূপ হইতে রূপান্তরিত হইয়া, আলোকরূপ বা তাপরূপ হয়, কখন চুম্বকশক্তিরূপ হয়, কখন রাসায়নিক ক্রিয়াশক্তিরূপ ইত্যাদি হয়। এইরূপে মূল শক্তির কখনও উৎপত্তি নাশ বা হ্রাস বৃদ্ধি হয় না; ইহা নিত্য। সে যাহা হউক, বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণ এই মূল শক্তিকে কিরূপে ধারণা করেন, তাহা এস্থলে বুঝিবার প্রয়োজন নাই। তাঁহারা যে এই মূল শক্তি স্বীকার করেন, ইহা বুঝিলেই যথেষ্ট হইবে। অনেক দার্শনিক পণ্ডিতগণও এই নিত্য আদি শক্তি স্বীকার করেন। পণ্ডিতবর হার্বার্ট স্পেন্সর এই মূল শক্তিকেই "Eternal inexhaustible energy" বলিয়াছেন। প্রসিদ্ধ দার্শনিক পণ্ডিত কুঁজে বলিয়াছেন —"The Universe is the Deity passing into activity but not exhausted by the act!" যে সকল বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত এ জগৎটাকে এক বৃহৎ কারখানা মনে করেন; (Dynamical কিংবা Mechanical theory দ্বারা জগৎ

ব্যাপার বুঝাইতে চান) এবং এই কারখানার মধ্যে এক অতি বড় Engineএর শক্তি দ্বারা এই সব জগৎ কার্য্য চলিতেছে সিদ্ধান্ত করেন ; অথচ তাঁহারা এই কারখানার পরিচালককে দেখিতে পান না। তাঁহারাও এই মহাশক্তির মধ্যে তাহার ত্রিবিধ ভাব স্বীকার করেন।

এই সকল পণ্ডিতগণ এই আদি শক্তির দুই অবস্থা স্বীকার করেন। এক শান্ত, নিষ্ক্রিয় অব্যক্ত (potential) অবস্থা, আর এক প্রবৃত্ত সক্রিয় (kinetic) অবস্থা। সক্রিয় বা কার্য্যাবস্থায় ইহার অভিব্যক্তি হয় ; উচ্চ অবস্থা হইতে নিম্ন অবস্থায় ইহার পরিণতি হয়। (এই উচ্চ অবস্থা Higher potential অবস্থা, আর নিম্ন অবস্থা Lower potential অবস্থা)। কিরূপে কার্য্য হয়, তাহা বুঝিতে হইলে, শক্তির এই দুই অবস্থা স্বীকার করিতে হয়। বিজ্ঞানমতে শক্তির এই উচ্চ ও নীচ ভাব মধ্যে আদান প্রদান চলিতে থাকে। তখন শক্তির উচ্চতর অবস্থা হইতে ক্রমশঃ নিম্নতর অবস্থায় পরিণত হইতে আরম্ভ হয়। এই পরিণামের অবস্থাই ক্রিয়ার অবস্থা। অর্থাৎ যখন উচ্চতর শক্তি নিম্নতর শক্তিতে পরিণত হইতে থাকে, তখনই কার্য্য হয়, সেই অবস্থা শক্তির কার্য্যাবস্থা। বিজ্ঞানের কথায় যখন higher potential Energy, lower potential Energyতে, সংক্ষেপতঃ Lower potentialএ পরিণত হয়, তখনই work হয়—Energy Kinetic হয়।

জড় শক্তিবাদ অনুসারে এই শক্তির উচ্চ (Higher potential) অবস্থার সহিত সত্ত্ব গুণের, ইহার ক্রিয়া-অবস্থার সহিত রজোগুণের এবং নিম্ন (Lower potential) অবস্থার সহিত তমোগুণের তুলনা করা যাইতে পারে। আদি শক্তির এই ত্রিবিধ ভাব গ্রহণ করিয়া যেমন সাংখ্য দর্শনে পরিণাম-বাদ বা ক্রমোন্নতি-বাদ (বা Evolution theory) স্থাপিত হইয়াছে, সেইরূপ আধুনিক বিজ্ঞানে ও দর্শনে এই মূল শক্তি ও তাহার উক্ত ত্রিবিধ ভাব গ্রহণ করিয়া একরূপ পরিণামবাদ স্থাপিত হইয়াছে। সাংখ্য দর্শন অনুসারে এই ত্রিগুণের ক্রিয়া হেতু যেরূপে সমষ্টিভাবে এই জগতের অভিব্যক্তি ও পরিণতি হয়, এবং ব্যষ্টিভাবে পরমাণু হইতে প্রত্যেক ভূতের অভিব্যক্তি ও ক্রমপরিণতি হয়, তাহার তত্ত্ব আমরা পূর্ব্বে সংক্ষেপে বিবৃত করিয়াছি। কিরূপে ব্যক্তি জীবের ও জীব জাতির ক্রমবিকাশ ও পরিণতি হয়, তাহা আমরা পূর্ব্বে সংক্ষেপে উল্লেখ করিয়াছি। Darwin, Spencer প্রভৃতি আধুনিক পণ্ডিতগণও সেইরূপ এই জড় শক্তি ক্রিয়ার উপর জগতের ক্রমাভিব্যক্তি ও জীবজাতির ক্রমোন্নতিবাদ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহারা ব্যক্তিজীবের ক্রমোন্নতি তত্ত্ব আবিষ্কার করেন নাই, এবং এই ত্রিগুণের ক্রিয়া হেতু কিরূপে প্রত্যেক মানুষের উন্নতি বা অবনতি হইতে পারে, কেমন করিয়া তাহার জ্ঞান শক্তির বা কর্ম্ম শক্তির বিকাশ হয়, কিজন্য তাহাদের সে শক্তি অভিভূত থাকে, তাহার নিম্ন অবস্থা হইতে উচ্চ অবস্থায় উন্নতির উপায় কি, তাহা আবিষ্কার করিতে চেষ্টা করেন নাই। কেবল জড়প্রকৃতি ও তাহার ত্রিবিধ অবস্থামাত্র স্বীকার করিলে, এ তত্ত্ব বুঝা যায় না। যাহা হউক, পরিণামবাদের যে সকল মূল তত্ত্ব সাংখ্যদর্শনে সূচিত হইয়াছে, আধুনিক পরিণামবাদী পণ্ডিতগণও তাহারই উপর তাঁহাদের পরিণামবাদ প্রতিষ্ঠা

করিয়াছেন। এ সকল কথা এস্থলে আলোচনায় প্রয়োজন নাই। এই সকল আধুনিক পণ্ডিতগণের এই আদি শক্তি ও তাহার ত্রিবিধ অংস্থার তত্ত্ব বুঝিতে পারিলে, তাহা হইতে সাংখ্যের মূল প্রকৃতি (Nature) ও ত্রিগুণ-তত্ত্ব বুঝিবার কতকটা সাহায্য হইতে পারে; এজন্য এস্থলে আমরা তাহার উল্লেখ করিলাম।

ক্রমশঃ

শ্রীদেবেন্দ্রবিজয় বসু।

সঙ্কলিকা।

(৮৪)

৺কৃষ্ণভাবিনী দাস—জন্ম ১৮৬৪ খ্রী, মৃত্যু ১৩ই ফাল্গুন, ১৩২৫, বৃহস্পতিবার।

এই আদর্শ মহিলা সম্বন্ধে সময়, বাঙ্গালী ও Bengalee লিখিয়াছেন—

(ক)

"নিতান্ত শোকসন্তপ্ত হৃদয়ে ইঁহার আত্মীয় পরিচিত ও অসংখ্য উপকৃত ব্যক্তির নিকট ইঁহার মৃত্যু সংবাদ দিতেছি। এখনকার কাল ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা-নিউমোনিয়া রোগে ৮ দিন ভুগিয়া গত বৃহস্পতিবার, ১৩ই ফাল্গুন, ইনি মহাপ্রস্থান করিয়াছেন। স্বার্থত্যাগের জীবন্ত মূর্ত্তি এই রমণী নিজের দেহ মন ও সর্ব্বস্ব পরোপকার ও দেশ-সেবায় অর্পণ করিয়াছিলেন। ইঁহার জন্য এখন কত আত্মীয় পরিচিত ও উপকৃত ব্যক্তি যে চক্ষের জল ফেলিতেছে, তাহার সংখ্যা নাই। এই হতভাগ্য লেখকের সংসার পুড়িয়া গিয়াছে, যে ঘরপোড়া কাট ছিল, যমরাজের তাহাও সহিল না, টানিয়া লইলেন। শ্রীমতী কৃষ্ণভাবিনী ইংরাজি ও বাঙ্গালায় উচ্চশিক্ষিতা রমণী ছিলেন, স্বামীর সহিত বহু বৎসর ইংলণ্ডে বাস করিয়াছিলেন, কিন্তু স্বামীর মৃত্যুর পর সম্পূর্ণ দেশাচার মতে চলিয়াছিলেন। ইনি এক জন লেখিকা ছিলেন, ইংলণ্ডে বঙ্গমহিলা প্রভৃতি কতকগুলি পুস্তক লিখিয়াছিলেন, মাসিক পত্রাদিতে অনেক প্রবন্ধ দিয়াছিলেন। ভারত-স্ত্রী-মহামণ্ডল ও তৎসংক্রান্ত অন্তঃপুরিকা বিদ্যালয় ও স্কুলগুলি প্রধানতঃ ইঁহার পরিশ্রমে ও চেষ্টায় চালিত হইত। এক কথায় ইনি শিক্ষা-বুদ্ধি-নীতি ও ধর্ম্মে অসামান্যা রমণী ছিলেন। এখন সব শেষ হইয়া গেল, মৃত্যুকালে ইঁহার বয়স ৫৪ বৎসর হইয়াছিল, কিন্তু পূর্ণ শক্তি-সম্পন্ন ছিলেন।"—সময়, ১৭ই ফাল্গুন, ১৩২৫।

(খ)

"শ্রীযুক্তা কৃষ্ণভাবিনী দাস আর নাই। গত বৃহস্পতিবার রাত্রি অনুমান ৯টার সময় তিনি লোকান্তরিত হইয়াছেন। কাল ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা রোগই তাঁহার মৃত্যুর কারণ। ইঁহার স্বামী প্রসিদ্ধ অধ্যাপক স্বর্গীয় মিঃ ডি, এন, দাস সাধুচরিত্র ব্যক্তি ছিলেন। কৃষ্ণভাবিনী স্বামীর সহিত বিলাতে গিয়াছিলেন। ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ইংলণ্ডে থাকিয়া ইঁহারা স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। অধ্যাপক দাস মহাশয় যখন সেঞ্চুরী স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন, সে সময়ে ইনি তাঁহার স্বামীর যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছিলেন। স্বামী ও কন্যার মৃত্যুর পর দাস মহোদয়া সমাজের কল্যাণে আত্মোৎসর্গ করেন। হিন্দুর অন্তঃপুরচারিণীগণের মধ্যে শিক্ষার বিস্তার তাঁহার জীবনের প্রধান ব্রত ছিল। ভারত-স্ত্রী-মহামণ্ডলের সদস্যারূপে তিনি সে ব্রত যে ভাবে পালন করিয়া গিয়াছেন, তাহা যে কোনও মানুষকে গৌরবান্বিত করিতে পারে। সমাজে যাহাদের স্থান নাই, অধঃপতনের পথ ভিন্ন অন্য অবলম্বন যাহাদের নাই, মুহূর্ত্তের অবিবেচনার দোষে যাহাদের পদস্খলন হইয়াছে, যাহাদের ভবিষ্যৎ অন্ধকারময়, সেই সকল নিরাশ্রয়া পতিতা রমণীদের কল্যাণের জন্য তিনি একটী আশ্রমের

প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। তিনি স্বয়ং মোটা ভাত কাপড় পরিয়া, সকল রকম বাজে খরচ বন্ধ করিয়া, এই সকল নিরাশ্রয় রমণীর ভরণপোষণের উপায় করিয়া দিতেন। ইহার গুপ্ত দানের সীমা ছিল না। কৃষ্ণভাবিনীর মৃত্যুতে কত যে দরিদ্র নিরুপায় লোকের অন্ন গেল, তাহা বলা যায় না। কেবল সমাজের কল্যাণে নহে, বাঙ্গালা সাহিত্যের সেবায়ও এক সময়ে ইনি আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। 'সাহিত্য' মাসিক পত্রে ইংলণ্ড-প্রবাসিনী মহিলার পত্র বলিয়া বহু প্রবন্ধ বাহির হইয়াছিল, সেই গুলিতে ইহার চিন্তাশীলতার পরিচয় পাওয়া যায়। সেই সকল প্রবন্ধই পরে 'ইংলণ্ডে বঙ্গমহিলা' নামক পুস্তকে পুনর্মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছিল। 'জীবনের দৃশ্যমালা' নামক আর একখানি গ্রন্থও ইহার লেখনী-প্রসূত। কৃষ্ণভাবিনী আদর্শ-মহিলা ছিলেন। তাঁহাতে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের গুণাবলীর একত্র সমাবেশ হইয়াছিল। তাঁহার পরলোকগমনে দেশের ও সমাজের যে ক্ষতি হইল, তাহার পূরণ সহজে হইবে না। আমরা 'ভারত-স্ত্রী-মহামণ্ডলে'র ভবিষৎ ভাবিয়া শঙ্কিত হইয়াছি। কৃষ্ণভাবিনীর স্বামী 'সময়'-সম্পাদক শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ দাস মহাশয়ের কনিষ্ঠ ভ্রাতা। তাঁহার শোকে আমরা সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি।"
—বাঙ্গালী।

(গ)

"The news of the sudden death, from Influenza, of Sreemati Krishnabhabini Das, widow of the late Mr. D. N. Das, B. A, Cantab, and daughter-in-law of the late Babu Sreenath Das will be received with sorrow by all. She passed away on the night of Thursday, February 27. Known to the public as the beloved and revered "Mrs. Das" of the "Bharat-Stree Mahamandal," her loss is a loss not only to Bengal, but to the whole country. The mother of helpless widows and orphans, the consecrated and ceaseless worker in the cause of female education and of the uplift of Indian womanhood, her death is a national calamity.

Born in 1864, in the village of Berhampore, she came of a respectable Kayastha family of Bengal. She accompanied her husband Mr. D. N. Das to England and lived there till 1891 when both husband and wife returned to India. Mrs. Das was of great help to her husband when he started the Century School which afterwards became the Century College.

After the death of her husband and her only daughter in 1909, she emerged, out of the baptism of sorrows and trials, as one of the noblest and consecrated workers of this generation. The last ten years of her life was a wonderful record of ceaseless work and devoted service in the cause of womanhood. As the life and soul of the "Bharat-Stree Mahamandal" and the Rescue Home, as the mother of helpless widows and orphans, the friend of woman workers, there has been none like her in our midst. Her early life and education, her travels and studies, her trials and sorrows, all stood her in good stead in the noble works she undertook and pursued with such singleness of devotion. She leaves behind her not only a new and original way of approach to the problem of womanhood but a noble example,

a beautiful life which will for ever shine as a beacon-light to those who follow her in the path of service and administration.

Her prose work in Bengali entitled "Inglande Bangamahila" (A Bengali lady in England) and her poems collected under the title of ' Jibaner Drishyamala" (scenes of life) give an insight into her life full of startling changes and strange developments, all culminating in a new type of woman workers. In her, the East while imbibing the good of both the East and the West retains the stamp of the oriental genius and character. And now that she is gone, it is the duty of all friends of the woman's cause to see that the work started by her may not suffer, that efforts be made to keep her memory sacred and shining in our midst, and that her example and life be a source of unfailing inspiration to all who would work for the cause for which she worked herself to death."
—*Bengalee, March 5,' 19.*

এই আদর্শ মহিলা সম্বন্ধে বক্তব্য বিষয় সবই এক প্রকার বলা হইয়াছে। দাস-প্রতিভাকে খর্ব্ব করিতে কলিকাতা এবং বরিশালে অনেক চেষ্টা হইয়াছিল, কিন্তু তাহা হয় নাই। অগ্নি কি আবর্জ্জনায় চাপা থাকে? দাস-প্রতিভা চিরোজ্জল। রাণী-ভবানী, অহল্যাবাই, মহারাণী স্বর্ণময়ী ও রাণী শরৎসুন্দরীর স্থায় পরদুঃখ-কাতরা মহিলার কথা এদেশে আর শুনা যায় নাই। কৃষ্ণ-ভাবিনী তাঁহাদের নামের গৌরব রক্ষা করিয়া গিয়াছেন। তিনি সামান্ত মোটা কাপড় পরিধান করিয়া কেবল মাতৃজাতির উন্নতির জন্ত চতুর্দ্দিকে ঘুরিতেন। যেমন অমায়িকতা, তেমনই স্বার্থত্যাগ; যেমন বিচক্ষণতা, তেমনই পরার্থ-পরায়ণতা। এরূপ মহিলার বঙ্গাসোদর্শনে আজ বঙ্গ ধন্য হইয়াছে। এরূপ নীরব সেবিকা একালে আর দেখি নাই। বিধাতা তাঁহার আদর্শ কন্তাকে চরণে আশ্রয় দিন।

(৬৫)

মহামতি গান্ধির মত লাট-সন্দর্শনের পরও পরিবর্ত্তিত হয় নাই। কিন্তু তাঁহার "সত্য গ্রহ"কে আমাদের নেতা শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়, "unreasonable and mischievous" বলিয়াছেন। (See Daily News, 13th March' 19, page 2) সুরেন্দ্রবাবু এক্সেস্ প্রফিট্ টেক্সের বিরুদ্ধে চলিবেন কলিকাতায় বলিয়া গিয়াছিলেন, কিন্তু দিল্লিতে যাইয়া সপক্ষ হইয়াছেন। তাঁহার দলের লোক স্যর বিনোদ এবং শ্রীযুক্ত প্রভাসচন্দ্র মিত্র কি কি করিয়াছেন, সকলেই জানেন। আমরাই যখন আমাদের বিরোধী, তখন এ দেশের আর আশা কোথায়?

(৬৬)

ব্রাহ্মসমাজের বর্ত্তমান অবস্থা স্মরণ করিলে চক্ষে জল আইসে—অনেক স্থলের ব্রহ্মমন্দির আচার্য্য ও উপাসকের অভাবে এক প্রকার বন্ধ হইয়া যাইতেছে। কলিকাতার সাধনাশ্রমের দৈনন্দিন উপাসনা করিবার জন্যও সব দিন আনুষ্ঠানিক আচার্য্য জুটে না। মুহূর্ত্ত পূর্ব্বে একস্থানে মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া কিরূপে, একই ব্যক্তি, সাধনাশ্রমে সেই মন্ত্রের পুনরুক্তি করেন, আমাদের সামান্ত বুদ্ধিতে বুঝি না। ইহা কি সাধনার পারম্পর্য্য? আমাদের মনে হয়, উপাসনাকে কখনও জীবনোপায় করা উচিত নয়। ইহা কি উপাসনা, না ব্যবসাদারী জুলুম? আচার্য্য নাই, উপাসক নাই, তবুও ছেঁদো কথার ছড়াছড়ি, বক্তৃতার বাঁধাবাঁধি আছে! প্রাণ-শূন্ত ফাঁকা আওয়াজ বেশী হইলে যেরূপ হয়, তাহাই হইতেছে। নেতাগণ আমাদের প্রতি বিরক্ত হউন, কিন্তু অবস্থাটা এক একবার ভাবিবেন।

পুরাতন লেখা

কবি-বচন।

কোহিনুর জগতে দুর্লভ। যাহা দুর্লভ, তাহাই মূল্যবান, সকলে তার আদর করে। এক জনের নিকট হইতে অন্যে তাহা কাড়িয়া লয়—ছলে বলে কৌশলে। পরস্বাপহরণে লজ্জা ভয় থাকে না। যে দ্রব্যের যত মূল্য, সে দ্রব্য কাড়িয়া লইতে লজ্জা তত কম হয়, আত্মগৌরব মানুষের এতই প্রবল। সাধারণ দ্রব্য লইলে চুরি করা হয়—চুরি করা বড় ঘৃণিত, ছোটলোকের কাজ। ডাকাতি গৌরবের জিনিস।

কবি-বচনে এক একটী কোহিনুর দেখিতে পাওয়া যায়। কবিমণ্ডলে সে কোহিনুরের কাড়াকাড়ি। ডাকাতি করিয়া লইয়া কেহ বা নূতন রকমে কোথায় একটু ছাঁটছুট করিয়া আপনার মনের মত করিয়া লইতে চেষ্টা করিয়াছেন, কেহ বা যেমন তেমনি রাখিয়াছেন, পরের না আমার বলিয়া প্রতারণা করিতে চেষ্টা করেন নাই। পরের জিনিস গুণে দখল করিয়াছি বলিয়া পরিচয় দিলে গৌরব বৃদ্ধি হয়। কবি-বচনের কাড়াকাড়ির কয়েকটী দৃষ্টান্ত আজ পাঠকগণকে উপহার দিব।

রাবণ সীতাকে হরণ করিয়া বহুদূরে সাগর পারে লইয়া গিয়াছে শুনিয়া রামচন্দ্রের হৃদয় আকুলিত হইয়া উঠিল। এই সময় কোন প্রাচীন কবি রামের মুখে এই শ্লোকটী আরোপিত করিয়াছিলেন—

হারো না রোপিতঃ কণ্ঠে ময়া বিশ্লেষ ভীতয়া

অথবা

ইদানীং মা বয়োর্মধ্যে সরিত সাগর ভূধরাঃ।

মহানাটক

(অধুনা) ইদানীমন্তরে জাতাঃ পর্বতাঃ সরিতো দ্রুমাঃ। শাৰ্ঙ্গধর

তারানাথ কবিরত্ন তাঁহার নূতন পুস্তক কবি-বচন-সুধায় এই শ্লোকটী এইরূপে অনুবাদ করিয়াছেন—

> বক্ষে বক্ষে ব্যবধান ঘুচাবার তরে
> হার ছড়াটীও নাহি দিতে বক্ষ পরে
> প্রিয়তমে আজি দেখ তোমার আমায়
> গিরি নদী মহাসিন্ধু ব্যবধান হায়।

কবি বিদ্যাপতি এই ভাবটী এইরূপে রাধিকার মুখে আরোপ করিয়াছেন,—

> ধরা চির চন্দন উর হার ন দেলা
> সো অব নদীগিরি আঁতর ভেলা।

জ্ঞানদাস গাহিয়াছেন—

> হিয়ায় হিয়ায় লাগিব লাগিয়া চন্দন না
> পরে অঙ্গে।

বলরাম দাস গাহিয়াছেন—

> হার নাহি পিয়া গলায় পরয়ে চন্দন না
> মাখে গায়।

একজন অজ্ঞাত কবি গাহিয়াছেন—

> হার উতারহুঁ যহোঁ মিলন মে
> সো অব কাহে নিঠুর ভয়ে
> যব বিরহিণী পরদেশা রহত হে
> বিচহি মে কত ন দিয়া কহে।

কৃষ্ণকান্ত পাঠক গাহিয়াছেন—

> একদিন কুঞ্জে করিতে বিহার
> গলে ছিল মম নীলকণ্ঠ হার,
> পরিহরি হার পরিহরি হার,
> হরি হার তুলে লইলাম গলে।

আর একটী ভাব দেখুন :—

একজন কবি লিখিয়াছিলেন—

হৃদি বিসলতা হারো নায়ং ভুজঙ্গম নায়কঃ
কুবলয় দল শ্রেণী কণ্ঠে ন স গরল দ্যুতি
মলয়জ রজো নেদং ভস্ম প্রিয়া রহিতে ময়ি
প্রহরণ হর ভ্রান্ত্যা নঙ্গ ক্রুধা কিমু ধাবসি।

সাহিত্যদর্পণ—শার্ঙ্গধর।

বিদ্যাপতি এই ভাবটী এইরূপে অনুবাদ করিয়াছেন—

কতিহু মদন তনু দহসি হামারি
হাম নহু শঙ্কর হবু বর নারী
নহ জটা কিঞ্চিত বেণী বিভঙ্গ
মালতী মাল শিরে নহ গঙ্গ
মোতিম বচয়ু মৌলি নহ ইন্দু
ভালে নয়ন নহু সিন্দুর বিন্দু
কণ্ঠে গরল নহ মৃগমদ সার
নহ ফণিরাজ উরে মণিহার
নীল পটাম্বর নহ বাঘ ছাল
কেলিক কমল ইহ নহয়ে কপাল
বিদ্যাপতি কবি ইহ সুদন্দ
অঙ্গে ভস্ম নহ মলয়জ পঙ্ক।

কবিওয়ালা রামবসু এইরূপে গাহিয়াছেন—

হর নহি হে আমি যুবতী
কেন জ্বালাতে এলে রতিপতি,
করোনা আমার দুর্গতি।
বিচ্ছেদে লাবণ্য হয়েছে বিবর্ণ
ধরেছি শঙ্করের আকৃতি।
ক্ষীণ দেখে অঙ্গ, আজ অনঙ্গ
একি রঙ্গ হে তোমার
হর ভ্রমে শরাঘাত কেন করিতেছ
বারবার।
ছিন্ন ভিন্ন বেশ দেখে, কত মহেশ
চেননা পুরুষ প্রকৃতি
হায় গুন শম্ভু অরি, ভেবে ত্রিপুরারি
বৈরী হয়ো না আমার
বিচ্ছেদে এ দশা বিগলিত কেশ
নহে এতো জটা ভার।
কণ্ঠে কালকূট নহে, দেখ পরেছি নীল রতন
অরুণ হলো লোচন, করে পতি বিরহে রোদন
এ অঙ্গ আমার ধূলায় ধূসর, মাখি নাহি
বিভূতি।

আর একজন গাহিয়াছেন—

বেহালা—আড়াঠেকা।

আমি নারী হর নহি শুনরে মদন
বিনা অপরাধে বধ অবলার জীবন।
নাথের বিরহে সদা ধূলিতে শয়ন
ধূলি ধূসরিত অঙ্গ সেহ সে কারণ।
তুমি তাহা না ভাবিলে রাগের প্রভাবে
বুঝিলে কি বিভূতি ভূষণ।
ললাটে সিন্দুর বিন্দু আর চন্দন হেরিয়া
ভাবিলে কি চন্দ্র হুতাশনে,
পরাজয় ঋণ যদি চাও সুধিবারে
যাও তবে হেরেরি সদন।

বিদ্যাপতি ও রাম বসু বিরহিণী রমণীকে শঙ্কররূপে সাজাইয়াছেন। গোবিন্দ দাসের রাধিকা চন্দ্রাবলীর অঙ্কগত শ্রীকৃষ্ণকে এইরূপে বর্ণন করিয়াছেন :—

আকুল চিকুর চূড়োপরি চন্দ্রক ভালহি
সিন্দুর দহনা।
চন্দন চান্দমাহা লাগল মৃগমদ তৈঁ বেকত
তিন নয়না।
মাধব অব তুঁহু শঙ্কর দেবা
জাগর পুণ ফলে প্রতিরে ভেটলু দূরহি
দূরে রহু সেবা
চন্দন রেণু ধূসর ভেল সব তনু সোই ভসম
সন ভেল
তৈঁহারি বিলোকনে মঝুমনে মনসিজ মনোরথ
সঙ্কে জরি গেল।

মন্মথ বিরহিণীকে শঙ্কর ভ্রমে শরাঘাত

করেন, খণ্ডিতার মনোরথ শঙ্করের অক্ষি জ্বালায় দগ্ধ হয়। কবির কারীকরী এইখানে।

বিদ্যাপতির বৃন্দা রাধিকাকে এই উপদেশটী দিয়াছিলেন—

পহি লহি বৈঠবি শয়নাক সীন
হের ইতে পিয়ামুখ মোড় বিগীম
পরশিতে তুহুঁ করে বারবি পাণি
মৌলী করবি পঁহু করইতে বাঁণী
যব হাম সোপব করে কর আপি
সাধসেসে বরজি উলটি মোহে কাঁপি।

গীতচিন্তামণিতে একটু পাঠান্তর দৃষ্ট হয়—

যব পিয়া ধরি বলে লয় নিজ পাশ
নহি নহি বলবি গদ গদ ভাষ
পিয় পরিরম্ভণে মোড়বি অঙ্গ
রভশ সময়ে পুন দেয় বিভঙ্গ।

শশিশেখর রায় এই কথাটী পুনরুক্তি করিয়া বলিয়াছেন—

আধ নেহারবি বঙ্কিম গীম
পাহিলহি ভেটবি শয়নক সীম
হরি পরিরম্ভনে মোড়বি অঙ্গ
হাঁ হুঁ না বলবি প্রেম তরঙ্গ।

বিদ্যাপতির এই কথাটী মদনমোহন তর্কালঙ্কার অপহরণ করিয়াছিলেন। বাবু জগদ্বন্ধু ভদ্র তাঁহার বিদ্যাপতি গ্রন্থে এ সকল দেখাইয়া দিয়াছেন।

খোখল সকল মহীতল গেহ
ক্ষীর নীর সম না হেরিনু লেহ
যব কোই ক্ষীর আনল মুখে আনি
ক্ষীর দগু দেই নিবসত পানি
তবহুঁ ক্ষীর উমড়ি পড়ু তাপে
বিরহ বিয়োগ আগ দেই ঝাপ
যব কোহি পানি আনি তাহে দেল
বিরহি বিয়োগ তবহি দূরে গেল।

তর্কালঙ্কার লিখিয়াছেন—

প্রাণ দিয়া দুগ্ধেরে বিনাশ যবে করে
ক্ষীরের প্রীতিতে নীর আগে ভাগে মরে
জলের দেখিয়া মৃত্যু দুগ্ধ তার স্নেহে,
উথলিয়া উঠে ঝাঁপ দিতে সেই দাহে।

বৃন্দাবনে বাঁশী কিছু বেশী গোলমাল করিয়াছে। বাঁশীর মিষ্ট স্বরে পশুপক্ষী মুগ্ধ হয়—এটী বৈজ্ঞানিক সত্য; সম্প্রতি আমেরিকায় ও য়ুরোপে এ সত্যের চর্চ্চা হইতেছে। বৈষ্ণব কবিগণ অনেক দিন পূর্ব্বে এ সত্যের আবিষ্কার করিয়াছিলেন। বাঁশীর স্বরে শুধু জীব-জন্তু মুগ্ধ হয়, তাহা নহে—বাঁশী রবে যমুনার জল উজান বহে।

বাঁশী কিন্তু বাজিবার সময় জানে না। অসময়ে বাজিয়া পাগলিনী রাধাকে বড় বিপদগ্রস্ত করিয়া ফেলে। বাঁশীর দৌরাত্ম্য বৈষ্ণব কবি বিদ্রোহী হইয়াছেন, অথচ বাঁশীর মন-মজানে মধুর সুরের দিকে সকলকে কাণ পাতিয়া থাকিতে দেখা যায়। বৈষ্ণব কবি বলিয়াছেন—

ও সখি কোন্ বনে মুরলীর ধ্বনি শুনা যায়,
বংশী বট কি ভাণ্ডীর বনে দেখে আয়।

আর একটু বেশী মিষ্ট করিয়া অপর এক কবি গাহিয়াছেন।

সখি—ঐ বুঝি বাঁশী বাজে
বন মাঝে? কি মন-মাঝে?

একজন সংস্কৃত কবি যাহা বলিয়াছেন, তারানাথ তাহার এইরূপ অনুবাদ করিয়াছেন—

রন্ধন সময়ে ওহে রসময়
ও বাঁশরী ধ্বনি করিতে কি হয়?
শুষ্ক কাষ্ঠে বহে রসের উজান
জলন্ত উনান হয়রে নির্ব্বাণ।

চণ্ডীদাস গাহিয়াছেন—

সখি হে বংশী দংশিল মোর কাণে
ডাকিয়া চেতন হরে, পরাণ না রহে ধরে
তন্ত্র মন্ত্র কিছুই না মানে।

কালার লাগিয়া হাম হব বনবাসী
কালা নিল জাতি কুল প্রাণ নিল বাঁশী
তরল বাঁশের বাঁশী নাশে বেড়ার জাল
সতার সুলভ বাঁশী রাধার হৈল কাল
অন্তরে আমার বাঁশী বাহিরে সরল
পিবয়ে অধর সুধা উগারে গরল
যে ঝাড়ের তরল বাঁশী ঝাড়ের লাগি পাউ
ডালে মূল উপাড়িয়া সায়রে ভাসাউ।

পূর্ব্ব বাঙ্গালার কোন গ্রাম্য কবি চণ্ডীদাসের গানটী আপন ভাষায় অনুবাদ করিয়াছেন, কিন্তু শেষ চরণটী যথাযথ রাখিয়া দিয়াছেন,

বাঁশী বাজান জান না
যখন আমি বসে থাকি গুরুজনার মাঝে
নাম ধরিয়া বাজে বাঁশী শুনে মরি লাজে।
রন্ধনশালাতে বসে যখন আমি রাঁধি
ভিজে কাষ্ঠ চুলায় দিয়ে ধুঁয়ার ছলে কাঁদি
যেনা ঝাড়ের বাঁশী ও তার লাগুর যদি পাই
জড়ে মূলে উঠাইয়া সায়রে ভাসাই।

কবি দীনদাস কাঁদিয়াছেন—

তুয়া বঁধু পড়ে মনে, চাহি বৃন্দাবন পানে
আলুইল কেশ নাহি বান্ধি
রন্ধনশালাতে যাই, ধুঁয়াতে যাতনা পাই
ধুঁয়ার ছলনা করি কাঁদি।

কবি বসন্ত রায় গাহিয়াছেন—

সখি হে শুন শুন বাঁশী কি বলে
আনন্দ আধার কিয়া সে নাগর আইল
কদম্বতলে
নাম বেড়া জাল...জগতে সহজ বিষজ্ঞ বাঁশী
কানু উপদেশে কেবল কঠিন কামিনী-মোহন
ফাঁসী।

বাঁশীর তানে যমুনার জল উজান বহে—

আর বাঁশী বাজাও না, ওরে নিলজ শ্যাম
হরে নিলে অবলার প্রাণ
বাঁশী তোরে করি মানা, আমার আছে সব
জানা
যমুনার জল উজান চলে শুনে বাঁশীর গান।

অনন্তদাস গাহিয়াছেন—

মুরলীর আলাপনে পবন রহিয়া শুনে
যমুনায় বহয়ে উজান।
না চলে রবির রথ, বাজি নাহি পায় পথ,
দর বয়ে দারু পাষাণ।

আর এক কবি বলিয়াছেন—

শুনিয়া মুরলির ধ্বনি ধ্যান ছাড়ে যত মুনি
জপ তপ কিছুই না ভায়
তৃণ মুখে ধেনু যত, ঊর্দ্ধ মুখে রহত বাছুরে
দুগ্ধ না খায়।

এক অজ্ঞাত কবি গাহিয়াছেন—

দেশমল্লার—ঝাঁপতাল।

বনমে ব্রজরাজ কি, বাঁশরী কাঁহে বাজিয়ে
বয়নামে চয়ন নাহি, নিদ নাহি আওয়ে
উড়ত আকাশে পেয়াময়ে চাতকী
মুরলী কি ধ্বনি শুনি নীর নাহি খাওয়ে।
মরুত স্থগিত হই, পাষাণ দ্রবত ভেই,
উলট যমুনা বহই, পালট নাহি আওয়ে।

সত্যই সে 'মুরলির আলাপনে, পবন
দাঁড়াইয়ে শুনে,
মৃত তরু মুঞ্জরে, যমুনা বহে উজান।

বিদায় কালে সমস্ত প্রাণ তোলপাড় হইয়া উঠে, মনে কত কথাই জাগে; চোখের জলে বুক ভাসিয়া যায়, কণ্ঠে বাক্য স্ফুরে না। বলি বলি করিয়া আর বলা হয় না—ভাবের আধিক্যে কথা বাহির হয় না। এই ভাবটী অনেকেই প্রকাশ করিয়াছেন।

রাম বসু গাহিয়াছেন—

মনে রইল সই মনের বেদনা
প্রবাসে যখন যায় গো সে
তারে বলি বলি বলা আর হল না।

রবীন্দ্রনাথ গাহিয়াছেন—

তোল না তোল না সই
মরমে মরম লুকান রহিল বলা আর হল না,

বলি বলি বলি তারে কত মনে করিনু
হোল না হোল না সই
বলা আর হোল না।

বিদায় সহা যায়, কিন্তু বিদায়ের কথা 'যাই যাই' সহা যায় না—

যদি গচ্ছসি নাথ নিশ্চিতং যাষি যাষি বচনং হিমাবদ
অশনঃ পতে ন বেদনা শব্দধ্বানতীব দুঃসহম্।

ইহা এইরূপে অনুবাদিত হইয়াছে—

হে কান্ত একান্ত যদি করিবে গমন
যাও কিন্তু যাই যাই বলো না বচন,
বজ্রের পতনে তত নহে ত বেদনা
কিন্তু পতনের শব্দ সহে না সহে না।
(তারানাথ)

দীননাথ ধর—

যাবে নাথ যদি যাও তবে যাও
যাই যাই বলি কেন আমারে জ্বালাও।

প্রণয় চুম্বকের মত অজ্ঞাতসারে আকর্ষণ করে। সে অজ্ঞাত আকর্ষণের এত বল যে, প্রতিরোধ করিতে পারা যায় না। 'না জানি কি সন্ধান জানে' স্রোতে ভাসিতে ভাসিতে এ বিলাপ কাহিনী অনেকেই গাহিয়াছেন। ভাবের একতা যে ঘটনা সাপেক্ষ এবং তজ্জন্যই এরূপ সৌসাদৃশ্য কবি সাধারণের মধ্যে দেখা যায়, একথা পূর্ব্বে আর এক প্রবন্ধে প্রতিপন্ন করা হইয়াছে। কিন্তু এরূপ সাধারণতার উপর লক্ষ্য রাখিলে অকবিও যে ভাবুক বলিয়া পরিচিত হইতে পারে, তাহাই প্রতিপাদন করিতে চেষ্টা করিব।

প্রণয়ের স্বভাব এই যে, সহস্র নির্য্যাতন সত্বেও প্রণয়ী প্রণয়ীর মঙ্গল প্রার্থনা করে। ভালবাসিয়াই সুখ পাইব, এ ভাব প্রণয়ীমণ্ডলে দুর্লভ। একটা আদান প্রদানের আকাঙ্ক্ষা স্বাভাবিক—নিঃস্বার্থ ভালবাসা, নিষ্কাম প্রেম প্রায় দেখা যায় না। নির্য্যাতনের সময়েও আশা থাকে, এ দুঃখের অবসান হইবে—ইহজন্মে না হয় পরজন্মে হইবে। সখার সহানুভূতি পরজন্মে মিলিবে, মরিবার সময়েও এ আশা হৃদয় হইতে দূর হয় না।

"Even in the ashes live the wanted
fire."

রাধিকার কাতরোক্তি শুনিয়া 'হয়রে পাষাণ', মনে হয়, অভাগিনী যদি ভালবাসিয়াই তৃপ্ত হইত, প্রতিদান না চাহিত, তবে বুঝি সে সুখী হইত। সে যাহা হউক, রাধিকার এই দশা বর্ণনে কবিমণ্ডলে বড়ই সাদৃশ্য লক্ষিত হয়।

মনে যদি আসে বনমালী বলো শ্যামে
মরিল ধনী। (দীনবন্ধু মিত্র)

আমি মাত্র এই চাই, মরি তাহে ক্ষতি নাই
তুমি আমার সুখে থেকো, এ দেহে
সকলি সবে। (নিধুবাবু)

সোহি পদমূলে রই কাহলো হা মরি মরণ
না ভেল
নহ—শ্যাম শ্যাম শ্যাম শ্যাম নাম জপরি
ছার তনু করব বিনাশ।
(বঙ্কিমচন্দ্র)

তুমি যাতে ভাল থাক সেই ভাল
গেল গেল বিষেতে প্রাণ আমারই গেল।
(রাম বসু)

সেখানে সতত বৈসে রসিক মুরারি
সেখানে লেখিহ মোর নাম দুই চারি
সখীগণ গণাইও গণিহ মোর নাম
পিয়া মোর বিদগধ বিহি ভেল বাম
দিনে একবার পঁহু লিও মোর নাম
অরুণ দুলহ করে দিও জল ··

শ্রবণহি শ্যাম নাম করু গান
শুনইতে নিকশউ কঠিন পরাণ।
(বিদ্যাপতি)

আবার দেখুন :—

তোমরা যতেক সখি থেকো মঝু সঙ্গে
মরণ কালে কৃষ্ণ নাম লিখো মঝু অঙ্গে
ললিতা প্রাণের সখি মন্ত্র দিও কাণে
মরা দেহ পড়ে যেন কৃষ্ণ নাম শুনে।
না পোড়াইও রাধা অঙ্গ না ভাসাইও জলে
মরিলে তুলিয়া রেখো তমালের ডালে
সেইত তমালতরু কৃষ্ণবর্ণ হয়
অবিরত তনু মোর তাহে·· রয়
কবহুঁ সো পিয়া যদি আসে বৃন্দাবনে
পরাণ চাওব হাম পিয়া দরশনে।

গোবিন্দদাস বলিয়াছেন—

জনমে জনমে হই সে পিয়া আমার
চিহি পায় মাগো মুই এই বর সার
হিয়ার মাঝারে মোর রহি গেল দুখ
মরণ সময় পিয়ার না দেখিনু মুখ।

বিদ্যাপতির এই ভাবটী শুণবিলাসে অপহৃত হইয়াছে—

দেহ দাহন করো না দহন দহে
ভাসাও না আমায় যমুনা প্রবাহে—
সব সহচরী দুটী করে ধরি বাঁধিও
তমালের ডালে
যদি এই বৃন্দাবন স্মরণ করি
আসে গো আমার প্রাণ-হরি
বঁধুর শ্রীঅঙ্গ সমীর, পরশে শরীর
জুড়াইব সেই কাল।

শশিশেখর রায় কহিয়াছেন—

কহিও কানুরে সই কহিও কানুরে
একবার পিয়া যেন আইসে ব্রজপুরে
নিকুঞ্জে রাখিল এই মোর হিয়ার হার
পিয়া যেন গলায় পরয়ে একবার
সেই তরু শাখায় বলে সারি শুকে
এই দশা পিয়া যেন শুনে ইহার মুখে
এই বনে রহিল মোর রঙ্গিনী হরিণী
পিয়া যেন ইহারে পুছয়ে সব বাণী।

সব জিনিষের তুলনা মিলে না। রাম রাবণের যুদ্ধের তুলনা মিলে নাই! সমতুল্যের অভাবে তাহার সঙ্গে তাহাই তুলনা করার আবশ্যক হইয়া পড়ে।

নদ নদী হ্রদ হতে অন্যে পায় জল
চাতকের কিন্তু সেই তুমিই সম্বল।
(তারাকুমার) ১

আমা হেন কত আছে আশ্রিত তোমার
মোর কিন্তু তোমা ভিন্ন গতি নাহি আর।
চন্দ্রমার কত শত কুমুদিনী রয়
কুমুদিনীর কিন্তু সেই চন্দ্রই আশ্রয়। ২
তোমার তুলনা তুমিই এই মহীমণ্ডলে
(নিধুবাবু)

প্রণয়ীর প্রতারণায় কেহ অভিমানে জর্জ্জরিত, কাহারও দুঃখে চোখে জলধারা ঝরে। হাসিয়া ঠাট্টা করা আশ্রিতায় কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। যে শুধু ভালবাসিয়াই সুখ পায়, সেই কেবল ঠাট্টা করিবার ধীরতা রক্ষা করিতে পারে। যে কাঁদিয়া ফেলে, তাহার অবস্থা শোচনীয়, যে ধীর ভাবে প্রতারককে রহস্যে মর্ম্মে মর্ম্মে বিদ্ধ করিতে পারে, সে আদরণীয়। এরূপ রমণী বৈষ্ণব মণ্ডলে দুর্লভ।

রাম বসু গাহিয়াছেন—

দৈবযোগে যদি প্রাণনাথ হল এ পথে
আগমন
কও কথা একবার কও কথা তোল
ও বিধুবদন
প্রণয় ভেঙ্গেছে ভেঙ্গেছে তায় লজ্জা কি
এমত প্রেম ভাঙ্গা ভাঙ্গি অনেকের দেখি।

বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের রাধিকা কখন বা শুধু একটী ঠাট্টা করিয়া শেষে কাঁদিয়া ফেলিয়াছেন, না হয় দারুণ অভিমানে অপমান করিয়াছেন।

অসময়ে অমৃত গরল বলিয়া বোধ হয়,
কুসুমহারে হৃদয় তার দহিছে—রবীন্দ্রনাথ। ১

সুধার সাগর মোর গরল হইল
এ পাপ কপালে বিধি এমতি লিখিল।
—চণ্ডীদাস। ২

চন্দন পরশে চমকি ঘন উঠই
হিমকর কিরণে মুরছি মহী লুটই
—গোবিন্দ। ৩

মৃগমদ চন্দন লেপন বিখ
মন্দ পবন গন্ধ অনল শিখ
হিমকর উগ্র হুত দিনকর তেজ
নলিনী বিদারত কণ্টক সেজ। ৪
স্তনবিনিহিতমপি হারমুদারং
সা মনুতে কৃশতনুরিব ভারং
সরস মসৃণমপি মলয়জ পঙ্কং
পশ্যতি বিষমিব বপুষি সশঙ্কং। ৫
শীতল সলিল কমলদল লোহ্ চন্দন পুষ্পা
সো সব যত নহি অনল জেলাহ, দশগুণ
দহই মৃগাঙ্কা। ৬ (বিদ্যাপতি)

শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র রায়চৌধুরী।

গীতোক্ত ত্রিগুণতত্ত্ব। (৭)

ত্রিগুণের অর্থ সম্বন্ধে বিভিন্ন মত।—আধুনিক পণ্ডিতগণের মধ্যে যাঁহারা সাংখ্য-দর্শনের এই ত্রিগুণতত্ত্ব আলোচনা করিয়া, তাহাদের স্বরূপ বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছেন, তাঁহারা যে অধিক দূর অগ্রসর হইয়াছেন, তাহা বলা যায় না। এজন্য তাঁহাদের কথা এস্থলে বিশেষ উল্লেখের প্রয়োজন নাই। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ ত্রিগুণের অর্থ যেরূপ করিয়াছেন, কেবল তাহারই উল্লেখ করিব। এস্থলে কেবল আমাদের দেশের বর্ত্তমান শ্রেষ্ঠ দার্শনিক পণ্ডিতের কথা সংক্ষেপে উদ্ধৃত হইল। *

প্রসিদ্ধ জর্ম্মন দার্শনিক সপেনহর বলিয়াছেন—

Rajoguna the powerful will the strong passion *Satwa-guna*—Pure

অবিকল সেইরূপ। কবির কবিতা যখন প্রকাশে বাহির হয়, তখন তাহা দৃষ্টে আমরা যেমন বুঝিতে পারি যে, কবির ভিতরে কবিত্ব রহিয়াছে, তেমনি যে কোন বস্তুর সত্তা যখনি আমাদের নিকট প্রকাশ পায়, তখনি আমরা বুঝিতে পারি যে, সে বস্তুর ভিতরে সত্ত্ব রহিয়াছে,—সে বস্তু সৎপদার্থ। অতএব এটা স্থির যে, কবিতার প্রকাশ যেমন কবিত্ব গুণের পরিচয়, লক্ষণ—সত্তার প্রকাশ তেমনিই সত্ত্বগুণের পরিচয় লক্ষণ। সত্ত্ব গুণের আর একটী পরিচয়-লক্ষণ আছে ; সেটী হোচ্ছে সত্তার রসাস্বাদন-জনিত আনন্দ। কবিতার রসাস্বাদনে যখন ভাবুক ব্যক্তির আনন্দ হয়, তখন সেই আনন্দমাত্রটি যেমন কবির অন্তর্নিহিত কবিত্ব গুণের পরিচয় প্রদান করে; তেমনই সত্তার রসাস্বাদনের চেতনাবান ব্যক্তির যখন আনন্দ হয়, তখন সেই আনন্দ মাত্রটি সৎ-বস্তুর অন্তর্নিহিত সত্ত্বগুণের পরিচয় প্রদান করে। আমরা প্রতিজনে

* শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর "গীতা পাঠ" গ্রন্থে এই ত্রিগুণের যে আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা এই,—"কবি শব্দ হইতে কবিতা এবং কবিত্ব এই দুইটী শব্দ উৎপত্তি লাভ করিয়াছে। সেই রকম সৎ শব্দ হইতে সত্ত্ব এবং সত্তা এই দুইটী শব্দ উৎপন্ন হইয়াছে ; দেখা উচিত যে কবিতা এবং কবিত্বের মধ্যে যেরূপ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ—সত্ত্ব ও সত্ত্বের মধ্যেও

knowing the comprehension of the Ideas *Tamo-guna* the greatest lethergy of the Will and of the knowledge. ফরাসী পণ্ডিত ল্যাসেন (Lassain) সত্ত্বকে Essentia (Essence বা spirit) রজঃকে Impetus (Energy) ও তমঃকে Caligo (Inertia) বলিয়াছেন।

কোন পাশ্চাত্য পণ্ডিত 'সত্ত্ব'কে The

আপনার আপনার ভিতরে মনোনিবেশ করিলে, স্পষ্ট বুঝিতে পারি যে, প্রকাশ এবং আনন্দ সত্তার সঙ্গের সঙ্গী।

* * *

"আমাদের প্রত্যেকজনের আপনার আপনার মধ্যেই সত্তার সঙ্গে সত্তার প্রকাশ এবং সত্তার রসাস্বাদনজনিত আনন্দ মাখামাখিভাবে সংশ্লিষ্ট রহিয়াছে, সেই গতিকে আমরা বেশ বুঝিতে পারিতেছি যে, আমাদের ভিতর সত্ত্ব আছে—আমরা সৎপদার্থ। * * *

"সত্তা সম্বন্ধেও আমরা দেখিতে পাই যে, এক শাখার পুষ্প যেমন অপর কোন শাখার নহে, তেমনি আমার সত্তাও তোমার নহে, তোমার সত্তাও আমার নহে; আর তুমি কোন ব্যক্তির যদি নাম কর, তবে তাহার সত্তা তোমারও নহে—আমারও নহে। ব্যষ্টি সত্তা মাত্রই এইরূপ ভিন্ন দেশকালপাত্রে পরিচ্ছিন্ন; আর সেইজন্য ব্যষ্টিসত্তা বাধাক্রান্ত সত্ত্বগুণ ব্যতীত মিশ্র-সত্ত্ব ব্যতীত অবাধিত সত্ত্বগুণের, শুদ্ধসত্ত্বের, পরিচায়ক নহে। পক্ষান্তরে যেমন সকল শাখার পুষ্পই বৃক্ষের পুষ্প, আর সেই জন্য বৃক্ষের পুষ্পরাজিই সমষ্টিপুষ্প, আর সকল শাখার সকল পুষ্পই সেই সমষ্টি পুষ্পের অন্তর্ভূত, তেমনি প্রকৃতির অধীশ্বর যিনি পরমাত্মা, তাঁহার সত্তাই সমষ্টি সত্তা এবং আর আর সকল সত্তাই সেই সমষ্টিসত্তার অন্তর্ভূত। কাজেই দাঁড়াইতেছে যে, সমষ্টিসত্তাই অবাধিত সত্ত্বগুণের অবাধিত প্রকাশ এবং আনন্দের—অধিষ্ঠানক্ষেত্র। পূর্ব্বে বলিয়াছি, সত্ত্বগুণের পরিচায়ক লক্ষণ দুইটী (১) প্রকাশ এবং (২) আনন্দ। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই যে, প্রকাশকে বাধা প্রদান করে কে? অবশ্য, অচৈতন্য বা জড়তা এবং অবসাদ বা স্ফূর্ত্তিহীনতা। আনন্দকে বাধা প্রদান করে কে? অবশ্য দুঃখ বা পীড়ানুভব এবং অশান্তি বা প্রবৃত্তি চাঞ্চল্য * * । "বিশুদ্ধ প্রকাশ এবং বিমল আনন্দের নাম যেমন সত্ত্বগুণ, অচৈতন্য এবং অবসাদের আর এক নাম তেমনি তমোগুণ; আবার দুঃখ এবং প্রবৃত্তি চাঞ্চল্যের আর এক নাম তেমনি রজোগুণ। যাহা রঞ্জিত করে বা রং করে, তাহাই রজঃ। * * * * *

"রঙ্ সম্বন্ধে জর্ম্মানদেশীয় মহাকবি গেটের একটী সুপরীক্ষিত সিদ্ধান্ত এই যে, বর্ণক্ষেত্র সামান্যতঃ তিনভাগে বিভক্ত; সে তিন ভাগ হচ্চে—একদিকে সাদা, আর একদিকে কালো, আর দুয়ের মধ্যস্থলে রক্ত, নীল, পীত, প্রভৃতি রঞ্জন বা রঙ।......বর্ণক্ষেত্র যেমন তিন ভাগে বিভক্ত—গুণক্ষেত্রও অবিকল সেইরূপ। গুণক্ষেত্রের এধারে রহিয়াছে সত্ত্বগুণের নিরঞ্জন আলোক, ওধারে রহিয়াছে তমোগুণের অঞ্জন, এবং দুয়ের মধ্যস্থলে রহিয়াছে রজোগুণের ব্যঞ্জন। অথবা যাহা একই কথা, একদিকে রহিয়াছে সত্ত্বগুণের প্রকাশ জ্যোতি, আর একদিকে রহিয়াছে তমোগুণের জড়তান্ধকার; এবং দুয়ের মধ্যস্থলে রহিয়াছে রজোগুণের রাগদ্বেষাদি প্রবৃত্তিচাঞ্চল্য।......রজোগুণের নিজমূর্ত্তি কিন্তু রাগ। তার সাক্ষী রজোগুণের প্রধান যে দুইটী অন্তরঙ্গ কাম আর ক্রোধ উভয়ই রাগধর্ম্মি।

রজোগুণের সাক্ষাৎ নিজমূর্ত্তি যে রাগ, তাহা লাল রঙের সহিত উপমেয়। লাল শব্দ আলক্ত (অর্থাৎ আলতা) শব্দের অপভ্রংশ তাহা দেখিতেই পাইতেছি। আলক্তও যা আরক্তও তা—একই। ফলে;—লাল রঙ্গ, রাঙ্গা, রাগ, রঞ্জন, রজঃ, সবাই যে এরা মূলধাতুর সন্তান সন্ততি, তাহা উহাদের গায়ে লেখা রহিয়াছে বলিলেই হয়।...আমাদের আত্মসত্তা যে অংশে আমাদের জ্ঞানগোচর লব্ধপ্রকাশ, সেই অংশে তাহা সত্ত্বগুণ; বহির্বস্তু সকলের আত্মসত্তা যে অংশে অপ্রকাশ, সে অংশে তাহা তমোগুণ; আর আমাদের আত্মসত্তা যে অংশে বহির্বস্তু সকলের অপরিস্ফুট আত্মসত্তার দ্বারা রঞ্জিত হয়, সেই অংশে তাহা রজোগুণ।......

সমষ্টিসত্তা পরমপরিশুদ্ধ সত্তাঃ—তাহা রজস্তমোগুণের দ্বারা অবাধিত, বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণ এক কথায় শুদ্ধসত্ত্ব। বেদান্তাদি শাস্ত্রের এটা একটা সুপ্রসিদ্ধ কথা যে শুদ্ধসত্ত্বে পরমাত্মার মহাজ্ঞান, মহাশক্তি এবং মহানন্দ নিখুঁত পরিষ্কাররূপে প্রতিফলিত হয়।"

principle of the Good, রজঃকে The principle of the evil এবং তমঃকে the principle of Indifference বলেন। কেহ সত্ত্বকে Harmony * রজঃকে activity এবং তমঃকে inertia বলিয়াছেন। কেহ সত্ত্বকে Intelligence, রজঃকে Force,

---

অধ্যাপক শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ শীল মহাশয় ত্রিগুণের (আধিভৌতিক) ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা এই—

"—The unity of Prakriti is a mere abstraction ; it is in reality an undifferentiated manifold and indeterminate infinite continuous of infinitesimal Reals. These reals, termed Gunas may by another obstruction be classed under three heads. (1) Sattoa, the Essence which manifests itself in a phenomenon and which is characterized by the tendency to manifestation, the Essence, in the other words, which serves as the medium for the reflection of intelligence, (2) Rajas, Energy, that which is efficient in a phenomenon and characterized by a tendency to do work, or overcome resistance, and (3) Tamas, mass or inertia, which counteracts the tendency of Rajas to do work, and of Sattva to conscious manifestation.

"The ultimate factors of the universe then are (1) Essence or intelligence-stuff, (2) Energy, and (3) Matter characterized by mass or inertia."

"These Gunas are conceived to be reals, substantive entities not however as self-subsistent or independent entities (prodhan) but as independent moments in every Reals or substantive existence." * * * "Every phenomenon it has been explained consists of three fold *arche*, intelligible Essence, Energy and Mass. In intimate union they enter into things as essential constitutive factors. The essence of a thing (Sattva) is that by which it manifests itself to intelligence, and nothing exists without such manifestation in the universe of consciousness. But the essence does not possess mass or gravity. Next there is the element of Tamas, mass, inertia, matter-stuff, which offers resistance to motion as well as to conscious reflection.

* সত্ত্বগুণ সুখস্বরূপ বলিয়া ইহাকে Harmony বলা হইয়াছে। এই Harmony শব্দের বাঙ্গালা প্রতিশব্দ সামঞ্জস্য—সমতা। বিভিন্ন চিত্তবৃত্তির মধ্যে সামঞ্জস্য, বাহ্য বিষয়ের সহিত অন্তরের সামঞ্জস্য থাকিলে, তাহার ফলে সুখ হয়। এই সমতা ভাবই সুখ ভাব। শাস্ত্রে আছে "নিরঞ্জনং পরমং সাম্যং— (মুণ্ডক ৩।১।৩) "সুখানাং কারণং সমঃ" (চরক সংহিতা)। এই সম = Harmony = State of equilibrium সত্ত্বগুণ কেবল সুখের কারণ নহে, ইহা প্রকাশ ও জ্ঞানেরও কারণ; এজন্য ইহা শুধু Harmony নহে।

"The intelligence-stuff, and the matter-stuff, cannot do any work and are devoid of productive activity in themselves. All work come from Rajas, the principle of energy, which overcomes the resistance of matter and supplies even intelligence with energy which it requires for its own work of conscious regulation and adaptation.

"The Gunas are always uniting separating, uniting again. Everything in the world results from their peculiar arrangement and combination, in varying quantities and groupings. But though co-operating to produce the world of effects, these···never coalesce. In the Phenomenal product whatever energy there is due to the element of Rajas.···All matter, resistance, stability is due to *Tamas*, and all conscious manifestation to Sattva. ("পরস্পরাঙ্গাঙ্গিত্বেঽপি অসংভিন্নশক্তিবিভাগ" :— ব্যাসভাষ্য)। ("অন্যোন্যাঙ্গাঙ্গাদিভাবেন উৎপাদিকেঽপি দ্রব্যে প্রকাশগুণঃ সত্বমেব, ক্রিয়াগুণ রজস এব, স্থিতি-গুণ-তমস এব," বিজ্ঞান ভিক্ষু।")

* * "In order that there may be evolution with transformation of Energy, there be a preponderence of Either Energy or Mass-resistance or Essence over other moments. * * *"

Introduction to P. C. Roy's Hindu Chemistry Vol-II pp 60—64.

এবং তমঃকে Matter বলিয়াছেন। অনেকেই সত্ত্বকে Essence, রজঃকে Energy এবং তমঃকে Mass বা Inertia বলিয়াছেন। "আদি সৃষ্টিশক্তি ও তাহার তিনরূপ বিকাশ" এবং "প্রবৃত্তি ধর্ম্ম ও নিবৃত্তি ধর্ম্ম" এই দুইটী প্রবন্ধে আমরা আধিভৌতিক অর্থে সত্ত্বকে Mind, রজঃকে Motion এবং তমঃকে Matter বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছিলাম। আমরা পূর্ব্বে দেখিয়াছি যে, আধুনিক বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণ এই জড় জগতের মূল কারণরূপে জড় (Matter) ও গতি বা তাহার মূলশক্তি (Force) এই দুই তত্ত্ব মাত্র গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহারা জ্ঞানকে জগতের এক মূল কারণ বলিয়া স্বীকার করেন নাই। বিলাতী দার্শনিক পণ্ডিত ক্লিফোর্ড (Clifford) প্রমুখ কোন কোন পণ্ডিত জগতের মূল কারণরূপে Mind stuff বা Intelligence-stuff-এর অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াছেন। প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত হেকেলের (Haekel) মতে এই জগতের মূল যে ইথর (Ether) বা আকাশ তত্ত্ব তাহার মধ্যে বীজভাবে স্থূল জড় ও শক্তির ন্যায় Mind stuffএর অস্তিত্ব নিহিত আছে। তাঁহারও মতে যাহা কারণে নাই, তাহা কার্য্যে অভিব্যক্ত হয় না।

এইরূপে নানাভাবে পণ্ডিতগণ সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের অর্থ বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছেন। কেহ আন্তর-অনুভূতি হইতে, কেহ বা বাহ্য প্রত্যক্ষ হইতে ইহাদের অর্থ ধারণা করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। আমরা এ পর্য্যন্ত যাহা বুঝিলাম, তাহার সঙ্কলিতার্থ এইরূপ :—

সাংখ্য ও যোগ শাস্ত্র অনুসারে,—

সত্ত্ব—শুক্ল, প্রকাশক, জ্ঞানস্বরূপ, সুখস্বরূপ, লঘু, শান্ত ও প্রীত্যাত্মক।

রজঃ—লোহিত, ক্রিয়া বা কর্ম্মশক্তিরূপ, চলন (বা পরিচলনরূপ) প্রবৃত্তিরূপ, ঘোর ও অপ্রীতি-আত্মক।

তমঃ—কৃষ্ণ, স্থিতিরূপ, আবরক, মোহাত্মক, গুরু, মূঢ় ও বিষাদাত্মক।

গীতা অনুসারে,—

সত্ত্ব—নির্ম্মল, প্রকাশক, জ্ঞানস্বরূপ, সুখস্বরূপ, অনাময়, সুখসঙ্গে ও জ্ঞানসঙ্গে বন্ধনের কারণ।

রজঃ—রাগাত্মক, তৃষ্ণাসঙ্গ উৎপাদক, লোভ—প্রবৃত্তি—কর্ম্মারম্ভ—অশান্তি—স্পৃহা উৎপাদক। দুঃখসঙ্গে, প্রবৃত্তি সঙ্গে ও কর্ম্মসঙ্গে বন্ধনের কারণ।

তমঃ—অজ্ঞানজ, মোহজনক, জ্ঞানাবরণকারী, প্রমাদ উৎপাদক, অপ্রকাশ ও অপ্রবৃত্তির হেতু। ইহা ভ্রম, আলস্য ও নিদ্রা দ্বারা বন্ধনের কারণ।

পাশ্চাত্য বহু পণ্ডিতগণের মতে,—

সত্ত্ব—Principle of good, Harmony, Substance, Essence, Intelligence, Mind-stuff, Pure knowing.

রজঃ—Principle of evil, Energy, Impetus, Activity, Force, Power to overcome resistence, Will.

তমঃ—Principle of Indifference, Matter, Mass, Inertia, Resistence to action, Passivity, Lethergy.

যাহা হউক, এই আলোচনা হইতে আমরা এই ত্রিগুণ তত্ত্ব কতকটা বুঝিতে পারিব। এ সম্বন্ধে আর অধিক কথা বলিবার প্রয়োজন নাই।

ক্রমশঃ

শ্রীদেবেন্দ্রবিজয় বসু।

দ্বিতীয় বক্তৃতা।

[পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর]

কলিকাতা ছাড়িবার আগে ঠিক করিয়াছিলাম যে, আপনাদের সহিত মিলিত হইয়া নিজেদের ভবিষ্যত চিন্তা করিব। গ্রামে কর্ম্মক্ষেত্র করিয়া সকলের সমবেত চেষ্টা দ্বারা গ্রামবাসীর দুঃখদৈন্য কিসে দূর হয়, তাহার উপায় উদ্ভাবন করিব। ভবিষ্যৎ ভাবিতে গেলেই অতীতের দিকে না তাকাইয়া পারা যায় না, তাই প্রথমেই গ্রামের অতীতকালের বিষয় সংক্ষেপে আলোচনা করিয়াছি। আজ পণ্ডিতপ্রবর শ্রীমান তারানাথ সপ্ততীর্থ হিন্দুর অতীত গৌরবের চিত্র আপনাদের সম্মুখে ধরিবেন। বর্ত্তমানের সহিত তুলনা না করিলে অতীত কালের অবস্থা সম্যক উপলব্ধি হয় না মনে করিয়া আমি আমাদের বর্ত্তমান অবস্থার যথাসাধ্য সমালোচনা করিয়া ভবিষ্যতের লক্ষ্য স্থির করিবার জন্য আপনাদিগকে আহ্বান করিতেছি। তীর্থ স্থান ধর্ম্ম সাধনের অঙ্গ। আপনাদের ভাগ্যে সপ্ততীর্থ জুটিয়াছে। আশা করি, জ্ঞানস্রোতে অবগাহন করিয়া আপনাদের মানসিক মলিনতা দূর হইবে এবং আমরা অতীত গৌরব অনুভব করিয়া বর্ত্তমান জগতে যাহা কিছু হিতকরী, সমস্তই আয়ত্ত করিতে চেষ্টা করিব। তীর্থ-স্নানের পূর্ব্বে অনেক পঙ্কিল-স্থান হইয়া চলিতে হয়। আমি তাই কিছুক্ষণের জন্য সামাজিক অলিগলির ভিতর দিয়া আপনাদিগকে লইয়া যাইতে বাধ্য হইতেছি।

এবারে গ্রামে আসিয়া কি দেখিতেছি? এ যে ব্যাধির আবাস ভূমি, অভাবের মরুতল। অন্নাভাবে, বস্ত্রাভাবে এবং সর্ব্বোপরি অর্থাভাবে আমরা কি হইতে চলিয়াছি! গ্রাম প্রদক্ষিণ করিয়া অনুভব করিয়াছি, স্তূপাকার আবর্জ্জনারাশির মধ্যে বাস করিতে আমরা যেন অভ্যস্ত হইয়া পড়িয়াছি। আবর্জ্জনা পরিষ্কার করিতে আমরা অক্ষম, কেন না নমঃশূদ্রেরা আমাদের বাড়ী ছাপ করিয়া পয়সা রোজগার করা ছাড়িয়া দিয়াছে। সে দিন প্রেসিডেণ্ট পঞ্চাইত মহাশয়ের সহিত গ্রাম প্রদক্ষিণ করিতে গিয়া কূয়া পায়খানার দুর্গন্ধে নাকে কাপড় দিতে গিয়া তাঁহার পুত্র সংকীর্ণ পথের বাঁশের বেড়ার কুঁচি আঙ্গুলে বিঁধিয়া রহিয়াছে। ৩০ বৎসর পূর্ব্বে গ্রামে কূয়া পায়খানা ছিল না। তখন ব্রাহ্মণগণ প্রাতে শয্যাত্যাগ করিয়া প্রাচীন পদ্ধতি অনুসারে তীর নিক্ষেপে মলমূত্র ত্যাগের স্থান ঠিক করিয়া লইতেন না বটে, কিন্তু জনপদ হইতে দূরে যাইতেন। এখন সভ্যতার খাতিরে অনেক বিষয়ে আমাদের কূপের দিকে দৃষ্টি পড়িয়াছে। গ্রামে পানীয় জলের উপযুক্ত একটী পুষ্করিণীও নাই। এখন আর কেহ পুষ্করিণী খনন করিয়া জলদানের ব্যবস্থা করেন না। এখন দানের মধ্যে প্রধান দাঁড়াইয়াছে "কন্যা দান"। এই পুণ্য সঞ্চয় করিতে গিয়া অনেকে যে ভিটা মাটী উচ্ছন্ন করিয়াছেন, তাহার দৃষ্টান্ত আপনাদের চোখের উপরেই রহিয়াছে এবং যাঁহারা দান গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকে যে দারিদ্র্য কূপে পতিত হইয়া ছটফট করিতেছেন, তাহাও দেখিতেছেন।

পুষ্করিণী খননে অসমর্থ হইয়া দুই এক জন ইন্দারা খনন করিয়া পানীয় জলের ব্যবস্থা করিয়াছেন। কিন্তু পাশাপাশি কূয়া পারখানা থাকায় ইন্দারার জল সম্ভবতঃ দূষিত হইতেছে এবং রোগের বীজ উৎপন্ন করিতেছে। জানি, মেথরের অভাবে এবং সর্ব্বোপরি অর্থাভাবে এ দশা ঘটিয়াছে, কিন্তু সমবেত চেষ্টা হইলে কঠিন কাজও সহজ হইতে পারে। গ্রাম-জননীর পরিতোষার্থে কেহ বা অর্থ দিলেন, কেহ বা কায়িক পরিশ্রম দ্বারা সাহায্য করিলেন, কেহ বা বুদ্ধিবলে উপায় উদ্ভাবন করিয়া দিলেন। এই প্রকারে চলিলে গ্রামের সর্ব্ব দুর্দ্দশা অনেক পরিমাণে লাঘব হয় না কি? আপনাদের অনেকে বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলীনের নাম শুনিয়াছেন। এই মহাত্মা ১৭০৬ খ্রীষ্টাব্দে বোষ্টন নগরে গরীবের গৃহে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি কোন স্কুলে পড়েন নাই, অথচ শিক্ষা-দীক্ষায় স্বদেশের কৃতী সন্তান বলিয়া আজও তাঁহার নাম পৃথিবীময় পূজ্য। আমেরিকার জাতীয় জীবনের প্রথম উন্মেষের সময় কায়মনপ্রাণে স্বদেশের সেবা করিয়া তিনি ধন্য হইয়াছিলেন। যৌবনে এই স্বদেশসেবক যখন ফিলেডেলফিয়া নগরে বাস করিতেন, তখন ঐ নগরের লোকসংখ্যা অতি সামান্য ছিল এবং তখন সেখানে Municipality স্থাপিত হয় নাই। এখন এই নগরের লোক-সংখ্যা সাড়ে পনর লক্ষ, অর্থাৎ কলিকাতার দেড় গুণ, এবং এখানেই ১৭৭৬ খ্রীষ্টাব্দে আমেরিকার স্বাধীনতা ঘোষিত হইয়াছিল। তিনি সহরবাসীদের নিকট প্রস্তাব করিয়া বন্দোবস্ত করিলেন যে, প্রত্যেক গৃহস্থ নিজ নিজ বাড়ীর সম্মুখভাগ পরিষ্কার রাখিবেন। একটা কমিটি গঠিত হইয়াছিল, তাহার সভ্যগণ প্রতিদিন দেখিতেন যে, প্রত্যেক গৃহস্থ তাহার কর্ত্তব্য করিতেছে কি না। যাহার যে ত্রুটি হইত, তিনি তাহা সংশোধন করিতে বাধ্য ছিলেন। এই ভাবে প্রতি গৃহস্থের বাড়ীর সম্মুখে আলো দেওয়া হইত। তাই দেখুন, একা ফ্রাঙ্কলিনের চেষ্টায় মিউনিসিপালিটি না থাকিলেও সহরের স্বাস্থ্যরক্ষার উপায় হইয়াছিল। ফ্রাঙ্কলীনই প্রথমে এই সহরে পাড়া প্রতিবাসীর বাড়ীতে যে সমস্ত বই ছিল, তাহা একস্থানে সংগ্রহ করিয়া Circulating Library স্থাপন করিয়াছিলেন। আমরা কি এই ভাবে কিছু করিতে পারি না? সংসারে যত কিছু হিতকর কার্য্য হইয়াছে, সমস্তই দরিদ্র দেশ-সেবক কর্ম্মীদের দ্বারাই হইয়াছে। দেশ-হিতকর কাজ করিবার সুসময়ের প্রতীক্ষায় কোন কর্ম্মীই অপেক্ষা করেন নাই, এবং তাঁহারা যখন কাজ আরম্ভ করিয়াছেন, তখন নিজকে মহৎ লোক মনে করিয়াও কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করেন নাই। সমস্ত মহৎ কাজের সূত্রপাতই নগণ্য লোকের দ্বারা হইয়াছে এবং কাজের সাফল্যের উপর তাঁহাদের সুনাম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ভারতের যাহা-কিছু গৌরবের, সমস্তই পর্ণকুটিরবাসী ঋষিদের দ্বারা অনুষ্ঠিত হইয়াছিল, রাজরাজড়ার দ্বারা হয় নাই। ষ্ট্রং নামক ক্রীতদাসের সঙ্গে যখন গ্রেনভিল সার্পের প্রথম দেখা হয়, তখন সার্পের বয়স ৩০ বৎসর মাত্র এবং তাঁহাকে কেহ চিনিত না। এই দাসের দুর্দ্দশা কাহিনী শুনিয়া সার্প যখন তাহার দাসত্ব মোচনের জন্য নিজকে প্রস্তুত করিতেছিলেন, তখন তিনি স্বপ্নেও ভাবেন নাই যে, তাঁহার অদম্য এবং ঐকান্তিক চেষ্টার ফলে ৭৩ বৎসর পরে দাস প্রথা এককালীন রহিত হইয়া যাইবে

এবং ইহার জন্য পার্লিমেণ্ট ৩০ কোটী টাকা মঞ্জুর করিবে।

বেদ, স্মৃতি, সদাচার এবং আত্মপ্রসাদ, এই চারিটীকে ধর্ম্মের সাক্ষাৎ লক্ষণ বলিয়া ঋষিগণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তাই আমাদের কর্ত্তব্য সদাচারের দ্বারা আত্মপ্রসাদ লাভ করিবার চেষ্টা করা। আমাদের প্রধান অন্তরায়, আমরা দশে মিলিয়া কাজ করিতে পারি না। আমাদের পরস্পরের উপর যে প্রেম, যে ভালবাসা থাকিলে দশের সুখ দুঃখ দশে বুঝিতাম এবং একাগ্র চিত্তে চেষ্টা করিতাম, সে প্রেম, সে ভালবাসা আমাদের নাই। ইহার সহিত উহার বিরোধ, ইহার উপর উহার দ্বেষ, আমরা এক হইব কেমন করিয়া? দ্বেষ থাকে থাকুক, কিন্তু গ্রাম-জননীর সেবায় আমরা সকল সন্তানে মিলিয়া এক হইতে চেষ্টা করিলেই কৃতকার্য্য হইব। ইহাই আমাদের লক্ষ্য হওয়া কর্ত্তব্য। ইহা না হইলে কেহই যে বাঁচিব না, সকলেই যে রোগে, শোকে, অনশনে মরিতে বসিয়াছি। যাহার যাহার বাড়ীর সম্মুখে যে জঙ্গল আছে, তিনি তাহা পরিষ্কার করিতে যে না পারেন, এমন নহে। বিমলাকান্ত প্রভৃতি বি-এ উপাধিধারী যুবকবৃন্দ আমার ইঙ্গিতে দা, কুড়ালী লইয়া জঙ্গল কাটিতে আরম্ভ করিয়াছেন দেখিয়া মনে আশা হইয়াছে। নিজের বাড়ীর নিকট একটু একটু ব্যাগার দিলে নিজের এবং সমস্ত গ্রামের প্রভূত উপকার হইতে পারে। আমি সরকারী কার্য্যোপলক্ষে অনেক গ্রামে গিয়াছি এবং অনেক ভদ্রলোকের সহিত মিশিয়াছি। বাড়ী ঘর অপরিষ্কার দেখিয়া, এবং বাড়ীর সম্মুখে জঙ্গল দেখিয়া কোন কথা বলিলেই অমনি উত্তর, "লোক জন জুটে না, কাজেই পরিস্কার পরিচ্ছন্ন থাকা চলে না।" নিজ হাতে সামান্য জঙ্গল কাটিলে বা সামান্য সামান্য কাজ করিলে শারীরিক পরিশ্রমও করা হয়, বাড়ীও পরিষ্কার থাকে, এই কথা বলিলে অনেকের মুখেই হাসি দেখা গিয়াছে এবং উত্তর পাইয়াছি যে, ভদ্রলোকের ছেলের পক্ষে ছোটলোকের কাজ করা শোভা পায় না। ইহাদের কিন্তু দুবেলা পেটে অন্ন যায় স্ত্রীলোকদিগের পরিশ্রমের জোরে। রমণীরা প্রভাত হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত গতর খাটাইয়া সংসারের সমস্ত কাজ কর্ম্ম করিয়া সন্তান পালন করিতেছেন এবং রান্নাবান্না করিয়া পুরুষদের খাওয়াইতেছেন, আর পুরুষেরা তামাক টানিয়া, দলাদলীর কথা লইয়া বা পরচর্চ্চা করিয়া দিন কাটাইতেছেন, এ দৃশ্য বঙ্গ দেশেই সম্ভব! এখানে যাঁহারা আছেন, তাঁহাদের মধ্যেও অনেকে কেবল আলস্য করিয়া, গাল গল্প করিয়া দিন কাটাইতেছেন, আর সনাতন প্রথার দোহাই দিতেছেন। নিজের শরীর, নিজের বাসস্থান পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা যে সকলেরই কর্ত্তব্য, এ কথা যতদিন না বুঝিব, ততদিন আমাদের সভ্যতার ভাণ করা বৃথা। আমি আশা করি, বালক ও যুবকদের চেষ্টায় সমাজে নূতন জীবনের যে বীজ উপ্ত হইতেছে, তাহাতে কালে সুফল ফলিবে! আমি আরও আশা করি, ইহাদের মধ্য হইতে এমন কর্ম্মী পুরুষ সকলের আবির্ভাব হইবে, যাহাদের দ্বারা পল্লীজীবনে সুখ-শান্তি ফিরিয়া আসিবে। একটা কথা বলিয়া রাখিতে চাই। যাঁহারা দেশ ও সমাজ উন্নতির পথে লইয়া যাইতে চাহেন, তাঁহারা যেন "ভাল ছেলে" বা "ভাল মানুষ" বলিয়া লোক-সমাজে পরিচিত হইতে না চান।

সমসাময়িক লোকের নিকট যাঁহারা প্রশংসা পাইতে চাহেন, তাঁহাদের দ্বারা সমাজের প্রকৃত মঙ্গল হইবার আশা অতি কম। দুই তিনটী দৃষ্টান্ত দ্বারা আমার কথা বুঝাইবার চেষ্টা করিব। খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে ব্রুনো (Geordino Bruno) যখন বলিয়াছিলেন যে, আমাদের এই পৃথিবী (গ্রহ) ছাড়া আরও পৃথিবী (গ্রহ) আছে, তখন সে কথা ধর্ম্মনিষ্ঠ-যাজক সম্প্রদায়ের অসহ্য হইয়া উঠিয়াছিল। রোমক ধর্ম্মবিচার-সভার বিচারে জাগতিক তত্ত্বানুসন্ধানকারী এই নাস্তিককে পোড়াইয়া মারা হইয়াছিল। ব্রুনো যাহা সত্য বলিয়া বুঝিয়াছিলেন, তাহা প্রত্যাখ্যান করিয়া জীবিত থাকা অপেক্ষা আগুনে পুড়িয়া মরাই শ্রেয় মনে করিয়াছিলেন। Copernicus কোপারনিকাস (১৫৪০ খ্রীষ্টাব্দে) যখন বলিলেন, পৃথিবী এবং অন্যান্য গ্রহগণ সূর্য্যকে বেষ্টন করিয়া ভ্রমণ করে, তখন রোমক পাদ্রীগণ "ধর্ম্ম গেল, ধর্ম্ম গেল" বলিয়া চীৎকার করিয়াছিলেন। কোপরনিকাস যদি এই চীৎকারে তাঁহার গবেষণার ফল জগতে প্রচার করিতে বিরত হইতেন, তাহা হইলে তাঁহার যে সিদ্ধান্ত এখন স্বতঃসিদ্ধ বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে, তাহার প্রচারে কেবল যে বিলম্ব হইত, তাহা নহে, জ্ঞান বিজ্ঞানের রাজ্য বিস্তারেও বাধা পড়িত। তাহার পর গ্যালিলিও (Galilio ১৫৬৪—১৬৭২) সূর্য্যগ্রহে কাল কাল বিন্দু সকল (Sun spots) এবং জুপিটার গ্রহের চারিটী উপগ্রহ যখন দূরবীক্ষণের সাহায্যে দেখাইলেন, তখনও ধর্ম্মযাজকগণ সয়তানের খেলা মনে করিয়া দূরবীণের কাঁচে চোখ দিতে রাজী হন নাই, পরন্তু জোর জুলুম করিয়া কোপরনিকসের সিদ্ধান্ত প্রচারে বাধা দিয়াছিলেন। ধর্ম্মযাজকতা এবং আভিজাত্য যে সকল প্রকার সংস্কারের বিরোধী, তাহা যাঁহারা ইতিহাস পড়িয়াছেন, তাঁহারাই জ্ঞাত আছেন। সত্যানুগামী মনীষীগণ যদি ধর্ম্মযাজকদের ভয়ে বা সমাজচ্যুতির ভয়ে নিজ নিজ মত প্রচারে ভীত হইতেন, তাহা হইলে জ্যোতিঃশাস্ত্র প্রচারে বিষম বাধা পড়িত, এবং গ্রহ নক্ষত্রাদি বিষয়ে কুসংস্কার জগতে আরও কত কাল যে থাকিত, তাহার ঠিকানা করা যায় না। ধর্ম্মের নামে পৃথিবীতে যে কত প্রকার অত্যাচার হইয়াছে, তাহা বর্ণনা করা যায় না। প্রকৃত দেশানুরাগী সকল সময়ে দেশের বিধি ব্যবস্থা মানিয়া চলিতে পারেন নাই। তাই বলিতেছি, সকল সময়ে লোকনিন্দার ভয়ে বা সামাজিক অত্যাচারে ভীত হইয়া চলিলে উন্নতির পথে, কল্যাণের পথে যাইতে পারিবে না। দেশানুরাগের বশবর্ত্তী হইয়া কাজ না করিলে দেশের কল্যাণ হইতে পারে না, জাতীয় উন্নতি কল্পনার চক্ষেও দেখা যাইতে পারে না।

গীতায় কথিত আছে, শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি যে দৃষ্টান্ত দেখাইবেন, অন্য লোকেও তাহাই অনুকরণ করিবে। গ্রামের, দেশের, সমাজের উন্নতির জন্য দশে মিলিত হওয়া, এবং অন্যের হিত কামনায় অবিচলিত চিত্তে কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পাদন করা অত্যাবশ্যক। উন্নতির কথা বলি কেন? এ সকলের অভাবে সমাজ টিকিতেই পারে না, উন্নতি ত দূরের কথা। "আপনি বাঁচলে বাপের নাম" "চাচা আপনা বাঁচা" এ সকল কথা, এ সকল ভাব মনে পোষণ করা, মুখে উচ্চারণ করা সামাজিক হিসাবে মহাপাতক বলিয়া গণ্য হওয়া উচিত। আমি আমার, ইহাতে সন্দেহ নাই; আপনি

পূর্ব্ব হইতেই বিদ্যমান; অর্থাৎ, কতকগুলি লোক পূর্ব্ব হইতেই মুক্তির জন্য নিরূপিত, অপর কতকগুলি তাহা নহে। এস্থলে প্রশ্ন এই, মুক্তি সম্বন্ধে পূর্ব্বনির্দ্দেশ প্রযুক্ত হইলে, অনন্ত পতন সম্বন্ধেই বা হইবে না কেন? তর্ক হিসাবে হইতে বাধ্য, কিন্তু সেণ্ট্ আগষ্টাইন্ সে দিকটা যথাসম্ভব চাপা দিয়াছেন।

সেণ্ট্ আগষ্টাইনের চিন্তাশক্তি যতই প্রখরা হউক, যখনই তিনি ভক্তির দিক দিয়া ঈশ্বরকে বুঝিতে চাহিয়াছেন, তখনই তাঁহার নৈতিক উপদেশাবলী ল্যাক্টান্টিয়স্ ও টার্টুলিয়ানের নীতিবাক্যের সহিত অভিন্ন হইয়া পড়িয়াছে। দার্শনিক বিচারে তিনি পূর্ব্বনির্দ্দেশবাদকে সর্ব্বত্র অব্যাহত রাখিয়াছেন, তথায় মানব ও ঈশ্বর উভয়ের একই দশা, কেহই তাহার হাত এড়াইতে পারেন নাই। ভক্তির পথে কিন্তু পূর্ব্বনির্দ্দেশ কেবল মানবের পক্ষেই প্রযুজ্য, তথায় ঈশ্বর নিরপেক্ষ, মহান্ ও অনন্ত। ভাবুক আগষ্টাইনের নিকট নিরপেক্ষ মঙ্গলেই ঐশী ইচ্ছার বিকাশ; ভক্ত আগষ্টাইন্ সৎ ও অসৎ, মঙ্গল ও অমঙ্গল, উভয়কেই ঈশ্বরেচ্ছার অধীন করিয়াছেন। এক পক্ষে ঈশ্বরকে নিয়তির বশে অথবা প্রকৃতির কোন অবশ্যম্ভাবী গূঢ় উদ্দেশ্য সাধন কল্পে যিশুখ্রীষ্টরূপে জন্ম লইতে হইয়াছিল; পক্ষান্তরে, তিনি যে সহস্র সহস্র উপায়ে প্রতিনিয়ত আপন উদ্দেশ্য সাধিয়া লইতেছেন, অবতার হওয়াও তাঁহার সেই সকল উপায়ের একটী উপায় মাত্র।

সূক্ষ্ম বিচার বুদ্ধি ও নৈতিক জ্ঞানের বিরোধ হইতে প্রাচীন যুগ ও মধ্যযুগের যে সীমা নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে, সেণ্ট আগষ্টাইনের দর্শন মতে তাহা সুন্দররূপে প্রকটিত দেখা যায়।

রোমের দুর্দ্দিন, অসভ্য জাতির প্রাদুর্ভাব, নবজ্ঞানালোকের সূচনা।

সেণ্ট্ আগষ্টাইনের জীবদ্দশায়ই রোমীয় রাজনৈতিক গগন ঘনতমসাচ্ছন্ন হইতেছিল। অবিশ্রান্ত গৃহবিবাদের ফলে রোমের একচ্ছত্র শাসন যতই হীনবল হইতে লাগিল, বহিঃশত্রুগণ ততই প্রবলতররূপে সাম্রাজ্য আক্রমণে উদ্যত হইল। চতুষ্পার্শ্ব হইতে বিভিন্ন জাতীয় লোক বন্যাপ্রবাহের ন্যায় রোম সাম্রাজ্যে প্রবেশ করিতে থাকে; রোমানেরা তাহাদের গতিরোধে অসমর্থ হইয়াছিলেন। গল্ ও স্পেন্ ত অচিরে তাহাদের করতলগত হইল, ইটালীও যায় যায় হইয়াছিল। রাষ্ট্রশক্তির অবনতির সঙ্গে সঙ্গে গ্রীস ও রোমের সুপ্রতিষ্ঠিত সভ্যতায় মূলেও আঘাত লাগে। তৎকালে প্রাচীন শিক্ষার যতগুলি দ্বার উন্মুক্ত ছিল, দেখিতে দেখিতে সকলই রুদ্ধ হইয়া যায়। কেবল একমাত্র খ্রীষ্ট সমাজের প্রভাবই অক্ষুণ্ণ থাকে। উত্তর দিগাগত নূতন দেশের নূতন লোক, রোমানেরা যাহাদিগকে অসভ্য বলিতেন, তাঁহারা অপেক্ষাকৃত অধিক আস্থাবান ছিলেন বলিয়া, মিশনারিগণ সহজেই তাঁহাদিগকে সমাজভুক্ত করিতে পারিয়াছিলেন। এ সম্বন্ধে কৃতকার্য্যতার প্রধান উপায় ছিল, বিশুদ্ধ সাম্যনীতি। খ্রীষ্টানেরা বুঝাইয়াছিলেন, ঈশ্বরের রাজ্যে উচ্চ নীচ ভেদ নাই। সকলেই মানব, অতএব ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে কিম্বা জাতিতে জাতিতে ভেদ থাকা ঈশ্বরের অভিপ্রেত নয়। এই উদার নীতির প্রবর্ত্তন হইতে খ্রীষ্টীয় সমাজ ক্রমশঃ পরিপুষ্ট হইতে থাকে, এবং উক্ত সমাজেই শিক্ষার পথ প্রশস্ত হয়। বলিতে কি, রোমের এই দুর্দ্দিনে একমাত্র খ্রীষ্ট সমাজই সভ্যতার

গৌরব রক্ষা করিয়াছিলেন। প্রাচীন শিক্ষার মূল আদর্শগুলি ইতঃপূর্ব্বেই, খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মগ্রন্থ ও দার্শনিক গ্রন্থসমূহে স্থান পাইয়াছিল। এইক্ষণে, পণ্ডিতেরা সেই সকল আদর্শের পুনরুদ্ধার করত তাহাতে নূতন ভাবের সঞ্চার করেন। এই সময় হইতে খ্রীষ্ট সমাজের প্রভুত্বও এত প্রবল হইয়াছিল যে, সমাজ যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পারিতেন। বস্তুতঃ, তথাকথিত বর্ব্বরদিগের নিকট সমাজই স্বর্গের দ্বার স্বরূপ হয় এবং এমন কি, সমাজ কর্ত্তৃক নূতন নূতন জাতিরও প্রতিষ্ঠা হইতে থাকে। সমাজের সাহায্যে এবং অধীনতায় নব-লাটীন্ ও জর্ম্মন্ সভ্যতারও যে শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই।

উল্লিখিত রাষ্ট্রবিপ্লবের পর শান্তি স্থাপিত হইতে ও নূতন জ্ঞানালোকের বিস্তার হইতে বহুকাল লাগিয়াছিল। ইটালীর ভিন্ন ভিন্ন অংশে এবং সাম্রাজ্যের পূর্ব্বপ্রদেশ সমূহে প্রাচীন শিক্ষার তখনও যাহা কিছু অবশিষ্ট ছিল, শান্তিস্থাপনের পর সুযোগ পাইয়া সেই শিক্ষা পুনরায় মস্তক উত্তোলন করে। গ্রীসীয় শিক্ষার ইহাই বিশেষত্ব, ইহার অস্তিত্ব কখনই একেবারে বিলুপ্ত হয় নাই। যাহা হউক, তৎকালে একজন খ্রীষ্টান্ ভাবুক ডিওনিসিয়াস্ নাম গ্রহণ পূর্ব্বক নিওপ্লেটোনিক্ মতে বা নব-আদর্শবাদে খ্রীষ্টীয় মত প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন। তাহার ফলে, দর্শন শাস্ত্রে আর একটী নূতন ভাবের উদয় হয়। ম্যাক্সিমাস্ দি কন্‌ফেসর্ (Maximus the Confessor), স্কোটাস্ ঈরিগিনা (Scotus Erigena), সেণ্ট্ ভিক্টরের হিউগো এবং রিচার্ড (Hugo and Richard of St. Victor), বোহ্‌ম্ এবং ব্রুণো (Bohme and Bruno) প্রভৃতি সকলেই অল্লাধিক পরিমাণে উক্ত ডিওনিসিয়াস্-প্রচারিত মতের সমর্থন করিয়াছিলেন। মার্সিয়েনাস্ ক্যাপেলা (Marcianus Capella) নামে এক ব্যক্তি আনুমানিক ৪৫০ খ্রী: অব্দে বিজ্ঞান-বিষয়ক একখানি কোষ গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। নিওপ্লেটোনিষ্ট সিম্‌প্লিসিয়াসের সমসাময়িক জন্ ফিলোপোনাস্ কর্ত্তৃক অ্যারিষ্টটল প্রণীত গ্রন্থ সমূহের টীকা বাহির হয়। ইনি খ্রীষ্ট ধর্ম্মেরও বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন। বোয়েথিয়াস্ (Boethius) নামে একজন রোমান্ প্রায় সেই সময়েই প্লেটো এবং অ্যারিষ্টটল্ কৃত গ্রন্থের অনুবাদ বাহির করিয়া কৃতী হইয়াছিলেন। তিনি "ডি কন্‌সোলেশিওনি ফিলসফী" (De cosolatione philosophiae) বা দর্শনশাস্ত্র পাঠে আত্মপ্রসাদ বিষয়ে একখানি চিত্তাকর্ষক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। এই পুস্তক পাঠ করিলে এপিক্টেটস্ ও মার্কাস্ অরিলিয়সের জ্ঞানগর্ভ উপদেশ সমূহের ভাব গ্রহণ করা যায়। কেসিওডোরাস্ও (Cassiodorus) কলা-শিল্প বিষয়ে একখানি পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন। এই সকল গ্রন্থ এবং পরফিরি কৃত 'ইসাগোগ' (the Issagoge of Porphyry) গ্রন্থ মধ্যযুগীয় দর্শনশাস্ত্রের ভিত্তিস্বরূপ হইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত ইসিডোর কৃত (Isidore of Seville) বিংশতি খণ্ড ব্যাকরণ গ্রন্থ এবং কনষ্টাণ্টিনোপল্‌বাসী ফোটীয়াস্ (Photius) প্রণীত 'মীরিয়বিলিয়ন্' নামক দার্শনিক কবিতা গ্রন্থ বিশেষরূপ উল্লেখযোগ্য।

উল্লিখিত বিবরণ হইতে স্পষ্টই অনুমিত হয় যে, সাহিত্য বা দার্শনিক সাহিত্য যেন ক্রমশঃ খ্রীষ্টসমাজেই প্রবিষ্ট হইতেছিল।

পশ্চিম প্রদেশ সমূহের ত কথাই নাই; ঐ সকল প্রদেশে যাবতীয় বুদ্ধিবৃত্তি খ্রীষ্টসমাজে কেন্দ্রীভূত হয়। প্রাচীন শিক্ষারও এইরূপে পুনরুদ্বোধন হইয়াছিল, কিন্তু যোগ্যপাত্রের অভাবে সে শিক্ষার গৌরব রক্ষা পায় নাই। যাঁহাদের লইয়া তৎকালে জ্ঞানের চর্চ্চা হইতেছিল, তাঁহারা প্রায় সকলেই 'বর্ব্বর' জাতীয় নূতন দীক্ষিত খ্রীষ্টান। সময়ও তখন শিক্ষার উপযোগী ছিল না। একমাত্র লাটীন্ ভাষায় শিক্ষার আদান প্রদান চলিতেছিল এবং উক্ত ভাষাই শিক্ষিত সুসভ্য সমাজ ও নবাগত 'অসভ্য' সমাজের সংযোগ সাধন করে। ইহার ফলে, উভয় শ্রেণীর লোকে সমভাবে বিদ্যার্জ্জনের সুবিধা পান নাই। খ্রীষ্টীয় সমাজের গোঁড়াগণই কেবল ধর্ম্মতত্ত্ব বা ধর্ম্মের দার্শনিক মীমাংসা লইয়া ব্যস্ত থাকিতেন; নব্য-দীক্ষিত সম্প্রদায় অচিরে ভোগবিলাসের দাস হইয়া পড়েন এবং তাঁহাদের ভিতরে ইন্দ্রিয়সেবার মাত্রা বৃদ্ধি পায়। সেকালের কন্‌ভেণ্ট (Convent) বা খ্রীষ্টীয় মঠগুলি যে জ্ঞানালোকের কেন্দ্রস্থল হইয়াছিল, ইহাই তাহার কারণ। লোকালয়ে পারিপার্শ্বিক ঘটনার আকর্ষণে যে মন নিত্য বিক্ষিপ্ত হইত, কন্‌ভেণ্টের প্রাকার-বেষ্টনীর মধ্যে তাহা সতত সংযত থাকায় আত্ম-চিন্তন বা আত্ম-দর্শনের প্রচুর অবসর ঘটে। এই উপায়ে ভাবুকতার কিঞ্চিৎ সুবিধা হইলেও তদ্দ্বারা কোন বিশিষ্ট মতের প্রতিষ্ঠা হয় নাই। মোটের উপর বলিতে পারা যায় যে, মঠধারী পণ্ডিতগণ অদম্য উৎসাহের সহিত পুরাতন পাণ্ডুলিপিগুলির নকল করিয়াছিলেন বলিয়াই আজও আমরা প্রাচীন গ্রীসীয় ও লাটীন্ শিক্ষার নিখুঁত সৌন্দর্য্য উপলব্ধি করিতে পারিতেছি।

মঠধারীরা যে কেবল পাণ্ডুলিপির নকল করিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছিলেন, তাহা নহে। তাঁহারা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করিয়া যুবকদিগকে শিক্ষা দিতেন এবং সেই সকল বিদ্যালয় বড় বড় ক্যাথিড্রাল্ স্কুলের সহিত প্রতিযোগিতা করিত। গ্রেটবৃটেনেও আদর্শ মঠের অভাব ছিল না এবং পূজনীয় বীড্ * (Venerable Bede) ও আলকুইন্ † (Alcuin) প্রভৃতি ঋষিতুল্য ব্যক্তিগণ মঠের বিদ্যালয়েই শিক্ষালাভ করেন। আল্‌কুইন্ ইয়র্কের বিদ্যালয়ে শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া পরে সম্রাট্ সার্লেমেনের বন্ধু ও উপদেষ্টা হইয়াছিলেন এবং 'প্যালেটিন্ অ্যাকাডেমি' নামক বিদ্যা-

* পূজনীয় বীডের (খ্রীঃ অঃ ৬৭৩—৭৩৫) জীবনেতিহাস অনেকেই অবগত আছেন। অজ্ঞান যুগের অবসানে যে সকল মহাত্মা কর্তৃক প্রথম জ্ঞানালোক বিস্তারিত হয়, তন্মধ্যে বীডের নাম সুপরিচিত। ইনি প্রথম ইংরাজ পণ্ডিত, প্রথম ইংরাজ তাত্ত্বিক এবং প্রথম ইংরাজ ঐতিহাসিকরূপে গণ্য। ইঁহার দ্বারা ইংরাজদিগের জাতীয় শিক্ষা প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয়। বীড বলিতেন, "অধ্যয়ন, অধ্যাপন ও লিখনেই আমার আনন্দ।" জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত তিনি Gospel of John নামক পুস্তকের অনুবাদ করিয়া যান। 'There is yet one sentence unwritten', said the boy. 'Write it quickly' said the dying man 'It is finished now', said the little scribe at last. 'You speak truth', said the master; 'all is finished,' * * Baeda chanted the solemn glory to God, As his voice reached the close of his song. He passed away quietly."—Outline of Christian History.

† (খ্রীঃ অঃ ৭৩৫—৮০৪) বীডের মৃত্যুর বৎসরেই আলকুইনের জন্ম হয়। ইনি টুর্সে ফরাসী শিক্ষার অধ্যাপক ছিলেন। পূর্ব্বদেশীয় খ্রীষ্টানদিগের মূর্ত্তিপূজা বিষয়ক তর্ক (Image controversy) সম্বন্ধে ইনি লেখনী চালনা করিয়াছিলেন বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে।

লয় ও বহু ক্যাথিড্র্যাল এবং মনাষ্টিক্ বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাকল্পে সহায়তা করিয়াছিলেন। তদ্ব্যতীত খ্রীষ্টীয় মধ্যযুগের সুপ্রসিদ্ধ দার্শনিক ও 'সাম্প্রদায়িক আদর্শবাদে'র স্থাপয়িতা স্কোটাস্ ঈরাগেনাও মঠের বিদ্যালয়ে শিক্ষা প্রাপ্ত হন।

সুপ্রসিদ্ধ বেকন দ্বয়, ওকাম্ (Occam) এবং স্কোটাসের জন্মভূমি গ্রেটবৃটনের পক্ষেও আধুনিক দর্শন শাস্ত্রের 'পাইওনিয়র'রূপে গণ্য করিবার যথেষ্ট কারণ আছে। (ক্রমশঃ)

শ্রীদিগ্বিজয় রায়চৌধুরী।

মহারাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণ

ভারতের প্রত্ন ইতিহাসে মিথিলাধিপতি রাজর্ষি জনক, প্রজারঞ্জন ব্রত রামচন্দ্র, ও কপিলাবস্তুর রাজ-প্রাসাদ-জাত নির্ব্বাণ-ঋষি সিদ্ধার্থ প্রভৃতি রাজন্যবর্গের উচ্চ জীবন-কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। আদর্শ-চরিত্র নৃপতিগণের অনুকরণীয় জীবনের ছায়া যে আবার উপযুক্ত আধারে পূর্ণ অথবা আংশিক ভাবে প্রতিবিম্বিত হইতে পারে না, বিধাতার বিধানে তাহা অসম্ভব। উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর সন্ধিস্থলে অতুল ঐশ্বর্য্য ও ধন মানের মধ্যে থাকিয়া যে শান্ত-প্রকৃতি নৃপতির আদর্শ জীবন প্রত্যক্ষ করিয়া আসিলাম, আজ সেই কুচবিহারাধিপতি স্বর্গীয় মহারাজা স্যর্ নৃপেন্দ্রনারায়ণ ভূপ বাহাদুর জি-সি-আই-ই, মহোদয়ের জীবন সম্বন্ধে দুই চারিটী কথা সাধারণের নিকট না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না। ভক্ত ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের জ্যেষ্ঠা কন্যা মহারাণী সুনীতি দেবী সি-আই, মহোদয়ার সঙ্গে বৈবাহিক সূত্রে আবদ্ধ হওয়ার জন্যই যে আমরা স্বর্গগত মহারাজার উচ্চ জীবন অধ্যয়ন করিবার অবসর পাইয়াছি, তাহার আর সন্দেহ নাই। ভক্ত কেশবচন্দ্র যখন শরীরে, তখন তাঁহার "কমল-কুটীরে" "নব বৃন্দাবন" অভিনয়ের সময়ে যুবক মহারাজকে অভিনয়ক্ষেত্রে সাধারণের সঙ্গে সাধারণ ভাবে ও সাধারণ পরিচ্ছদে দর্শক-বৃন্দের মধ্যে বসিতে দেখিয়াছিলাম। বলিতে গেলে, সেই হইতেই মহারাজার হৃদয়ের উচ্চতার দিকে আমার লক্ষ্য পড়িয়াছিল। তাহার পর ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দের প্রারম্ভ হইতে কয়েক বৎসরকাল কুচবিহারে অবস্থান করিয়া মহারাজা বাহাদুরকে যাহা দেখিলাম, তাহা আমাদিগের ও অপর সাধারণের শিক্ষণীয়। আমরা ব্রহ্মমন্দিরে প্রতি রবিবারে সামাজিক উপাসনায় যোগদান করিতাম, মহারাজাও যখন কুচবিহারে থাকিতেন এবং উপাসনায় যোগদান করিতে পারিতেন, তাঁহাকে আমরা সাধারণ ধুতি, পিরিহান্ পরিধান করিয়া মন্দিরের এক প্রান্তে কিম্বা পশ্চাতে সকলের সঙ্গে বেঞ্চের উপরে বসিতে দেখিতাম। সমাজের সম্পাদক মহাশয় তাঁহার জন্য বিশেষ আসনের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, কিন্তু মহারাজা তাহাতে কোন দিন উপবেশন করেন নাই। তাঁহার সম্বন্ধে এই দৃশ্য দেখিয়া তাঁহার জীবনে কাবুলের আমিরের প্রকৃতির ছায়া সর্ব্বদাই মনে আসিত। মস্‌জিদে আমিরের যে প্রকৃতি ও ভাব পরিলক্ষিত হইয়াছিল, তাঁহার ভিতরেও সেই ভাব বর্ত্তমান ছিল। আমাদের মনে আছে যে, কোন সময়ে কুচবিহারের কোন অংশে ভীষণ বিসূচিকা

রোগের প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল, মহারাজা স্বয়ং শকট বা অশ্বারোহণে গমন করিয়া রোগাক্রান্তদিগের সম্বন্ধে যাহা জ্ঞাতব্য ও কর্ত্তব্য, তাহার ব্যবস্থা করিতেন এবং রোগীর সেবা শুশ্রূষায় স্বতঃপ্রবৃত্ত সেবকদিগকে স্পর্শ করিয়া একবার বলিয়াছিলেন যে, তাঁহাদিগকে স্পর্শ করিয়া তিনি ধন্য। দরিদ্রের প্রতি দয়া তাঁহার বড় স্বাভাবিক ছিল। কুচবিহারের অধিকাংশ স্থানে দরিদ্র শ্রেণীর বাস এবং কুচবিহারের অনেক নগর ও পল্লীসমূহের প্রশস্ত পথপার্শ্বে অনেক ফলবান্ আম্র, কাঁঠাল ও গুবাক বৃক্ষ প্রতিষ্ঠিত। এক সময়ে এইরূপ বৃক্ষ হইতে কোন দরিদ্র শ্রমোপজীবী ক্ষুধার্ত্ত হইয়া কোন বৃক্ষ হইতে ফল পাড়িয়াছিল, রাজ-পুলিস্ রাজবিধি অনুসারে সেই অপহারক দরিদ্র ব্যক্তিকে দণ্ডার্হরূপে বন্দী করিয়া রাখে। মহারাজার কর্ণে যখন এই সংবাদ প্রবেশ করিল, তখনই তিনি ষ্টেটের উচ্চতম কর্ম্মচারীকে লিখিয়া পাঠাইলেন যে, তাহাকে ছাড়িয়া দেওয়া হয় এবং ভবিষ্যতে এরূপ শ্রেণীর বৃক্ষাদির ফল যেন দরিদ্রদিগের জন্য অবারিত রাখা হয়। তাঁহার উচ্চ-হৃদয়ের গুপ্ত রহস্য অনেক। এক সময়ে কোন দরিদ্র ব্রাহ্মণ কন্যাদায়গ্রস্ত হইয়া রাজদ্বারে উপস্থিত হয়েন। দ্বারবানেরা তাঁহাকে প্রবেশ করিতে দেয় নাই। মহারাজা তাহা জানিতে পারিয়া খুব দুঃখিত হয়েন এবং সেই কন্যাদায়গ্রস্ত ব্রাহ্মণকে সাধারণের অজ্ঞাতে ডাকাইয়া বিবাহের ব্যয়োপযোগী অর্থ দান করেন। ইঁহার রাজত্বকালে কুচবিহার যে একটা নূতন রাজ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহার আর সন্দেহ নাই। উচ্চশিক্ষা বিস্তারে কলেজ ও স্কুল প্রভৃতি স্থাপন করিয়াই কেবল যে মহারাজা তাঁহার সাধারণ ও লোকহিতকর অনুষ্ঠানের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া ছেলেন, তাহা নহে। শাসন-বিধি ও সমাজ-সংস্কারেও তাঁহার কার্য্যক্ষেত্র বিস্তৃত হইয়াছিল। যে মুসলমান-প্রধান রাজ্যে গো-বধের প্রথা প্রচলিত ছিল—যে রাজ্যে প্রাচীনতম যুগে নরবলি-রূপ ভীষণ আসুরিক অনুষ্ঠানও অনুষ্ঠিত হইয়াছিল, সে রাজ্য হইতে মহারাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণ সে প্রথা চিরকালের জন্য উঠাইয়া দিয়া গিয়াছেন। বহুবিবাহরূপ ভীষণ পাপ যে রাজ্যে একদিন সমাজ-বক্ষকে কলঙ্কিত করিয়াছে, সে রাজ্যে মহারাজা আপনাকে এক-পত্নীক বিবাহের উচ্চ আদর্শ করিয়া সমাজের সমক্ষে এক উচ্চ নৈতিক-চিত্র রাখিয়া গিয়াছেন। দেখিয়া আসিলাম, এই আদর্শে কুচবিহার হইতে এই ভীষণ সামাজিক দৃশ্য ধীরে ধীরে চলিয়া যাইতেছে।

সাধারণতঃ রাজাদিগের মধ্যে যাহা দেখিতে পাওয়া যায় না, তাঁহার ভিতরে অনেক রাজ-দুর্লভ গুণ বর্ত্তমান ছিল। আমাদিগের দেশে রাজাধিরাজদিগের মধ্যে ধনী ও দরিদ্রের সঙ্গে সমভাবে মিশিবার উচ্চভাব খুব কমই দেখিতে পাওয়া যায়। মহারাজা নৃপেন্দ্র নারায়ণের ভিতর এই ভাব-প্রবণতা খুব প্রবল ছিল। ধনী, দরিদ্র, পণ্ডিত, মূর্খ সকলেই সমভাবে তাঁহার সঙ্গে মিশিতে পাইতেন। স্কুল কলেজের ছাত্রদিগের সঙ্গে তিনি যে ভাবে মিশিতেন, সেরূপ দৃশ্য সাধারণতঃ খুবই বিরল। স্কুল, কলেজ কিম্বা রাজ-বাটীর প্রাঙ্গন-ক্ষেত্রে ক্রীড়ার স্থলে তিনিও ছাত্রদের সঙ্গে একজন হইয়া খেলায় প্রবৃত্ত হইতেন। এমন কি, ক্রীড়ার শেষে তাহাদের সঙ্গে একত্রে বসিয়া সোডাওয়াটার ও জলখাবার প্রভৃতি খাইতেন। এতদুপলক্ষে

যে ব্যয় সম্ভব হইত, মহারাজা বাহাদুর তাহা স্বয়ং বহন করিতেন। নিরহঙ্কারতা তাঁহার চরিত্রের একটী বিশেষ গুণ ছিল এবং এই চরিত্রই তাঁহার ভিতরে ঋষি-সুলভ শান্ত প্রকৃতিকে জীবনের একটী অলঙ্কার করিয়া তুলিয়াছিল। ষ্টেটের উচ্চ হইতে অধস্তন কর্ম্মচারী এবং কুচবিহার রাজ্যের প্রজাবৃন্দ তাঁহার মুখ হইতে কঠোর বা কর্কশ ভাষা শ্রবণের অবসর প্রাপ্ত হয়েন নাই। আমরা জানি যে এক সময়ে রাজপ্রাসাদের কোন কক্ষ হইতে প্রথম মহারাজকুমার শিশু রাজনারায়ণের স্বর্ণ-পাত্র অপহৃত হইয়াছিল, তাহাতেও মহারাজা অক্ষুব্ধভাবে কোন কর্ম্মচারীর প্রতি কর্কশ বাক্যও ব্যবহার করেন নাই। অনেক সময়ে অনেক মূল্যবান বস্তু চুরি গিয়াছে, মহারাজা সেই ধীর শান্ত প্রকৃতি ধারণ করিয়াই বসিয়া থাকিতেন। ধন গৌরব ও ধনাভিমান তাঁহার ভিতরে কোন দিন স্থান প্রাপ্ত হয় নাই। তাঁহার সময়ে যাঁহারা কুচবিহারে অবস্থান করিয়াছেন, তাঁহারা দেখিতে পাইয়াছেন যে, কুচবিহার হইতে রেল পথে ভ্রমণকালে অনেক সময়ে তিনি স্বয়ং এঞ্জিন্ চালাইয়া অনেক দূর পর্য্যন্ত চলিয়া গিয়াছেন। তাঁহার পরিহিত কোট প্যাণ্ট কয়লার গুঁড়ায় পরিপূর্ণ, আর সেই অবস্থায় তিনি এঞ্জিন্ হইতে কুচবিহার ষ্টেসন্-প্লাটফরমে অভ্যর্থনাকারী কর্ম্মচারী ও প্রজাবৃন্দের মধ্যে অবতরণ করিতেন। অভ্যর্থনাকারীগণ তাঁহার জন্য নিয়োজিত সেলুনে তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিতে গিয়া দেখিতেন যে, মহারাজা বাহাদুর এঞ্জিন্ হইতে অবতরণ করিতেছেন। পরিশ্রান্ত শকট-পরিচালককে বসাইয়া রাখিয়া তিনি স্বয়ং তাঁহার কার্য্য করিতেন। তাঁহার ইংলণ্ড অবস্থানকালে আমাদের কোন পরিচিত বন্ধু তাঁহাকে ধুতি পরিয়া লণ্ডনের ষ্টেসন্ প্লাটফরমে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়াছিলেন।

একদিকে তাঁহার যেমন নিরহঙ্কার প্রকৃতি ছিল, সেইরূপ, দেশীয় সদনুষ্ঠানের দিকে তিনি মুক্ত-হস্ত ছিলেন। ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দে যখন আমরা কুচবিহার গমন করিলাম, সেই সময়ে আমাদের ব্রাহ্মবন্ধু শ্রদ্ধেয় গণেশপ্রসাদ কুচবিহারে এক অনাথাশ্রম সংস্থাপনের সঙ্কল্প করিয়া মহারাজা বাহাদুরের সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। মহারাজা বাহাদুর সে সময়ে ইংলণ্ডে। তাঁহার নিকট ভাই গণেশপ্রসাদের প্রার্থনা উপস্থিত হইলে ইংলণ্ড হইতেই তাঁহার গভীর সহানুভূতিপূর্ণ অনুমোদন আসিল। সম্মুখে ভাল কাজ ধরিয়া দিলেই মহারাজা অতর্কিত ভাবে তাহা অনুমোদন ও সাহায্যের ব্যবস্থা করিতেন। দরিদ্র-সেবার জন্য, এমন কি, তিনি ষ্টেটের সঙ্গেই একটা দান-ভাণ্ডার প্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন। অনেক দরিদ্র ছাত্র ও দরিদ্র পরিবার সেই প্রতিষ্ঠিত ভাণ্ডার হইতে মাসিক অথবা এককালীন সাহায্য প্রাপ্ত হইয়া থাকে। শিক্ষার জন্য কোন কুচবিহারী ছাত্র জাপান অথবা ইংলণ্ড প্রভৃতি যাইতে চাহিলে মহারাজার সে সম্বন্ধেও মাসিক সাহায্যের ব্যবস্থা আছে। আমরা জানি, এই সাহায্য লইয়া দুইটী কুচবিহারী ছাত্র আমাদের অবস্থানকালে জাপান যাত্রা করিয়াছিল। তাই বলিতেছি যে, রাজ চরিত্রে এরূপ ঋষি-সুলভ চরিত্র অতি দুর্লভ।

শ্রীগৌরীপ্রসাদ মজুমদার।

নবীন-প্রশস্তি

(মহাকবি নবীনচন্দ্র সেনের স্মৃতি-সভায় পঠিত।)

স্তব্ধ হয়ে যাক্ আজি ক্ষণিকের তরে
বাহিরের যত কোলাহল,
শান্ত হয়ে যাক্ আজি নিমেষের তরে
অন্তরের তরঙ্গ চঞ্চল!
ঘুচে যাক্ দ্বিধা-দ্বন্দ্ব-বাধা-ব্যবধান
মুছে যাক্ মান-অভিমান,—
লয়ে শুধু প্রীতি-ফুল্ল উন্মুক্ত পরাণ
এস হেথা মায়ের সন্তান।
অন্তর-বাহির আজি নৈবেদ্যের প্রায়
হোক্ শুদ্ধ পবিত্র নির্ম্মল,
কবীন্দ্রের দিব্য-মূর্ত্তি ধ্যান-নেত্রে হায়,
উদ্ভাসিয়া উঠুক্ উজ্জ্বল!

২

গত আজি অর্দ্ধ যুগ—কত যুগ সম—
থেমে গেছে কবির বাঁশরী,
মায়ের নিকুঞ্জ-বনে নিত্য নিরুপম
জাগে না ত অমৃত-লহরী!
শ্রীকৃষ্ণের পুণ্য-গাথা, ভুবন-জ্যোতির
অতুলন নির্ব্বাণ-আহ্বান,
চৈতন্যের প্রেম-লীলা, বঙ্গ জননীর
স্বাধীনতা সমাধির গান!
উচ্ছ্বসিত অশ্রুজলে গাঁথিয়া যতনে
বাগ্দেবীর চরণ-ছায়ায়,
আরত অঞ্জলি কেহ সারা প্রাণে মনে
নাহি রচে আত্ম-হারা হায়?

৩

নবীন "ভারত"-স্রষ্টা "নবীন" রতনে
বুঝি স্বর্গে ছিল গো অভাব,
মিটেছে সে আকিঞ্চন শূন্য সিংহাসনে
কবীন্দ্রেরে করি আজি লাভ!
বিশ্বের কবীন্দ্রদলে কবীন্দ্র মোদের
ওই হের করেন বিরাজ,
মিলায়ে সবার সনে সুকণ্ঠ নিজের
ওই শুন কি গাহেন আজ!
সে সৌন্দর্য্যে সে সঙ্গীতে অনন্ত আকাশে
মুগ্ধ কত রবি-চন্দ্র তারা,—
এ ধরায় বহে বায়ু, পুষ্প-কলি হাসে,
পাখী গায়, ধায় স্রোত-ধারা!

৪

হে বরেণ্য কবিবর! তুমি শুধু আজ
স্বদেশের কৃতী সুত নহ,
দেশ-কাল-পাত্র নারে ক্ষুদ্রতার মাঝ
বাঁধিয়া রাখিতে অহরহঃ!
বিরাট সিন্ধুর সম বিশাল উদার
স্নেহমাখা হৃদয় তোমার,
অলক্ষ্যে আবৃত করি নিখিল সংসার
রচে যার পূজার সম্ভার!
তোমার এ বিশ্ব-পূজা বুঝিবার তরে
লহ আজি যোগ্য করি সবে,
অন্তরের শ্রদ্ধা-ভক্তি, প্রীতি-প্রেমভরে
পারি যেন অর্পিতে নীরবে!

৫

এত স্নেহ, এত প্রেম, এত অশ্রুজল,
এত হাসি, এত মুক্তপ্রাণ,
হে সৌম্য-দর্শন কবি! তোমাতে কেবল
পেয়েছিনু অজ্ঞাতে সন্ধান!

প্রকৃতির শিশু তুমি! শিশুর মতন
কি সারল্য তরল শোভন!—
সৌন্দর্য্যের উপাসক! চটুল-ভূষণ!
ভাব-মগ্ন তেজস্বী জীবন!
জনমভূমির তব স্নেহ-মুগ্ধ কবি
করে তোমা আজি অর্ঘ্য দান,
আশীর্ব্বাদ-চরু-আশে এ যে মর্ম্ম-হবিঃ
জানি ব্যর্থ হবে না, মহান্!

৬

আমার জনমভূমি! আমার স্বদেশ!
বিশ্ব-রমা জননী আমার!
স্মৃতির এ যজ্ঞভূমে সুধা পরিবেষ
কর মাগো, মুছি আঁখি-ধার!
তোমার সন্তানবৃন্দ মিলিয়াছে আজ
কবিশ্রেষ্ঠে করিতে অর্চ্চন,—
উঠিতেছে উথলিয়া স্বর্গ মর্ত্ত্য মাঝ
কি নিবিড় প্রাণের প্লাবন!
এ পূজা সার্থক হোক্! হোক্ আরবার
মাতৃ-অঙ্কে "নবীন" উদয়,—
হোক্ প্রতিষ্ঠিত বিশ্বে কর্ম্ম-সাধনার
"ধর্ম্মরাজ্য" ধ্রুব জ্যোতির্ম্ময়!

শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত।

শ্রীমতী নগেন্দ্রনন্দিনী দের জীবনী। *

মৃত্যুকালে মাতার বয়স প্রায় ৫৭ বৎসর হইয়াছিল। তিনি কলিকাতার বহুবাজারের তৎকালের প্রসিদ্ধ বসু-বংশে জন্ম গ্রহণ করেন। ৯ বৎসর বয়ঃক্রম কালে মাতার বিবাহ হয়। আমাদের মাতামহ প্রাচীন প্রথানুসারে গৌরী দান করেন। মা আমাদের বাস্তবিক গৌরীই ছিলেন।

বাবা বিবাহের পরেই বিলাত গমন করেন। মায়ের জীবনে চাকচিক্যশালী কোন ঘটনা ঘটে নাই। তিনি, লোকে যাকে বিদুষী বা পণ্ডিতা বলেন, তাহা ছিলেন না। বুঝি বা তাই ছিলেন না বলিয়াই তাঁর জীবন আদর্শ জীবন হইয়াছিল; পাণ্ডিত্য ছিলেন না বলিয়াই আমাদের সকলের এত শ্রদ্ধা, ভক্তি, ভালবাসা আকর্ষণ করিতে পারিয়াছিলেন। বুদ্ধি যে বীজ-গণিতের দুরূহ প্রশ্নের উত্তর দানে বা তদ্রূপ কাজেই স্ফূর্ত্তি লাভ করে বা খোলে, তা ত আমরা বিশ্বাস করিতে পারি না; বুদ্ধি নানা ক্ষেত্রে, নানা স্থলে, নানা প্রকারেই বিকশিত হয়। আমার মা তাহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থল। মা আমার বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী ছিলেন না বটে, কিন্তু সংসার-ক্ষেত্রের, কার্য্য-জগতের, মনুষ্য-স্বভাব জ্ঞানে বড় কম জ্ঞানী ছিলেন না। তাঁহার স্বাভাবিকী বুদ্ধি খুবই প্রখরা ছিল; তার পর নানা অবস্থায় পড়িয়া সে স্বাভাবিকী বুদ্ধি খুবই বিকাশ ও বৃদ্ধি লাভ করে। স্বামীর কার্য্য বা ভ্রমণ উপলক্ষে মা বঙ্গদেশের, ভারতবর্ষের নানা স্থানের অভিজ্ঞতা লাভ করেন। সুদূর বিলাত গমন ও বাসেও সে দেশের অনেক ব্যাপারের প্রত্যক্ষ জ্ঞান অর্জ্জন করেন। মাতাকে মহা দীন, দরিদ্র হইতে রাজা মহারাজা পর্য্যন্ত, মেথর চাপরাশি হইতে জজ, ম্যাজিষ্ট্রেট, কমিশনর, লাট পর্য্যন্ত; নিরক্ষর চাসা হইতে অসাধারণ

* ইনি শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত বি, দে, M.A., I.C.S. (Retired) মহাশয়ের পত্নী। এই জীবনী গত ১৩ই ফাল্গুন তাঁহার শ্রাদ্ধোপলক্ষে পঠিত।

পণ্ডিত পর্য্যন্ত, নানা অবস্থার, নানা পদের লোকের সহিত সংঘর্ষণে আসিতে হয়। এ বিদ্যালয় বড় কম বিদ্যালয় নয়। সে যাহা হউক, আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আমাদের মা পণ্ডিতা ছিলেন না, বা লোকে যাতে মুগ্ধ হয় বা লোকে যাকে যশস্কর বলে, এমন কোন কাজও তিনি করেন নাই। তবুও বলিয়াছি,আমাদের মাতার জীবন আদর্শ জীবন ছিল,—আর্য্য নারীর জীবন যেরূপ হওয়া উচিত, তাই ছিল। কেন? বলিতেছি।

১। তাঁহার সর্ব্বপ্রথম ও সর্ব্বপ্রধান মহোচ্চ গুণ ছিল, তাঁহার কর্ত্তব্যপরায়ণতা। নিজের ঘর পুড়ুক আর মজুক, স্বামী, পুত্র কন্যার স্বাস্থ্যরক্ষা, শিক্ষা, দীক্ষা ভাল হউক আর নাই হউক, তাঁহারা সুখে থাকুন আর নাই থাকুন, আমি সাধারণ-কার্য্যে যোগ দিয়া বক্তৃতা করিয়া, প্রবন্ধ পাঠ করিয়া সাধারণের বাহবা লইব, আমাদের মা এ শ্রেণীর স্ত্রীলোক ছিলেন না;—একেবারেই না। তাঁহার নিজের ঘর, সংসার, পরিবারই তাঁহার সর্ব্বপ্রধান দেবমন্দির ছিল। তাঁহার স্বামী, পুত্র, কন্যা যাহাতে সর্ব্বতোভাবে সুখী হন,তাহাতেই তাঁহার জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন। তাঁহার সংসারই তাঁহার জপ তপ ছিল; তাঁহার তপস্যা ও সাধনা ছিল। অচলা পতি-ভক্তি ও অতুলন পুত্র-কন্যা-বাৎসল্য ঐ কর্ত্তব্য-পরায়ণতার সহিত বিমিশ্রিত ছিল। এসব গুণকে বিশ্লিষ্টভাবে দেখিবার সময় ও স্থান ইহা নহে। গুটীকতক দৃষ্টান্ত কিন্তু না দিয়া থাকিতে পারিলাম না। আমাদের মা বিদ্রূপ-চ্ছলেও পতিনিন্দা সহ্য করিতে পারিতেন না। আমরা তাঁহাকে একটু বিরক্ত করিবার জন্য বিদ্রূপচ্ছলে আমাদের স্বামীর নিন্দা করিলে তিনি বাস্তবিকই রাগিয়া উঠিতেন, আমাদের ভর্ৎসনা করিতেন। আমাদের বাবার স্বাস্থ্যের জন্য সদাই এত উদ্বিগ্ন থাকিতেন যে, বাবার একটু সামান্য, অতি সামান্য কিছু একটু কাশি কি সর্দ্দি হইলেই অমনি ডাক্তার দেখাইবার জন্য ব্যস্ত হইতেন। এত ব্যস্ত হইতেন যে, বাবা যে তাতে একটু বিরক্ত না হইতেন, তা ত বোধ হয় না। পুত্র কন্যা-দের সামান্য অসুখেই আহার নিদ্রা প্রায় পরিত্যাগ করিতেন। আরও একটী কথা বলিব। মাতার লোকজনের অভাব ছিল না। তা হলেও মা তাঁর পতি পুত্র কন্যার তৃপ্তি ও স্বাস্থ্যের জন্য প্রায় প্রতিদিনই দুই একটী ব্যঞ্জন স্বহস্তে রন্ধন করিতেন। আর এ বিষয়ে তাঁহার এরূপ নিপুণতাও জন্মিয়াছিল যে,যিনি একবার তাঁহার হস্তের ব্যঞ্জন খাইয়াছেন, তিনি তা আর কখন ভুলিতে পারিতেন না। জানি না,আজকার দিনে মায়ের অবস্থার ন্যায় অবস্থাপন্না কজন মহিলা এরূপ কাজ করেন।

আরও বলি। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, মায়ের লোকজনের অভাব ছিল না। তবুও নিজে মিউনিসিপাল মার্কেটে প্রায় প্রতিদিনই বাজার করিতেন। উদ্দেশ্য আর কিছুই নয়, ভাল জিনিষ কিনিয়া খাওয়াইয়া পতি পুত্র কন্যার স্বাস্থ্যরক্ষা ও সুখ সম্বর্দ্ধন করা। ৫৭ বৎসর বয়সে মৃত্যুর কিছু দিন পূর্ব্ব পর্য্যন্ত এ কাজ করিয়াছেন। মার সংসার-প্রাণতার কথা কটা বলিব? কিন্তু আর আরও দুটী কথা না বলিয়া যে থাকিতে পারিতেছি না। বাবা যখন দ্বিতীয়বার বিলাত যান, মা তখন তাঁর অনুগামিনী হন। মাতার তখন ছয়টী সন্তান। আমিই তখন সকলের বড়। মা আমাদের সকলকে আমাদের ঠাকুরমার কাছে স্বচ্ছন্দে রাখিয়া যাইতে পারিতেন, যত্নের ক্রটী তিলমাত্র হইত না, বরং বেশীই

হইত; কিন্তু মা আমাদের ছয়টীকেই লইয়া বিলাত চলিলেন। তাতে ব্যয় অনেক হইয়াছিল। এখানেও উদ্দেশ্য আর কিছুই নহে; আমাদের মা বাবা আমাদের ছাড়িয়া থাকিতে পারিতেন না। আর তার সঙ্গে বাবার আনুষঙ্গিক উদ্দেশ্য ছিল আমাদের শিক্ষা।

মায়ের কর্ত্তব্যপরায়ণতা সম্বন্ধে আর একটী কথা বলিয়া এ বিষয়ের বক্তব্য শেষ করিব। মা তাঁহার কন্যাগুলিকে সৎ পাত্রে দান করিবার জন্য কম যত্ন, চেষ্টা, আয়াস, অর্থব্যয় ও ত্যাগ-স্বীকার করেন নাই। আর এ কথাও না বলিয়া থাকিতে পারিতেছি না যে, তিনি তাঁর জামাতাদিগকে ঠিক পুত্রবৎ স্নেহ করিতেন, আমি জানি, তাঁহারা এ জীবনে ঐ স্নেহ ভুলতে পারিবেন না। আমাদের বোধ হয়, এ বিষয়ে যথেষ্ট দৃষ্টান্ত দিলাম। কিন্তু এ সম্বন্ধে আর একটী কথা বলা আবশ্যক। মাতার কর্ত্তব্যপরায়ণতার একটী বিশেষত্ব ছিল এই যে, তাঁর কর্ত্তব্যপরায়ণতা অনায়াস-সাধ্য ছিল। ঐ গুণ যেন তাঁহার অস্থি মজ্জায় গ্রথিত হইয়া গিয়াছিল। নীরবে, বিনা আড়ম্বরে তিনি তাঁর কর্ত্তব্য সাধন করিতেন, একদিনের জন্যও বলেন নাই—আর পারি না বাবু। সংসার-কর্ত্তব্যপ্রাণতা তাঁহার এমনিই স্বভাব-সিদ্ধ হইয়াছিল যে, মৃত্যুশয্যায় যখন বিকারেই বকিতেন, তখন ঐ সংসারের বন্দোবস্তর কথাই বকিতেন; জ্ঞানেও মায়ের সংসার; অজ্ঞানেও সংসার। সুদূর ভবিষ্যতে মনুষ্য সমাজ যদি স্বর্গরাজ্যে পরিণত হয়, তখন আশা করিতে পারা যায় যে, কর্ত্তব্যপালন মানুষের স্বভাবসিদ্ধ হইবে। আমাদের মায়ের জীবনে সেই স্বর্গরাজ্যের যেন পূর্ব্বাভাস দেখিতে পাইতাম।

২। মায়ের আর একটী গুণ ছিল, তাঁহার সরলতা। তিনি সরলতার প্রতিমূর্ত্তি ছিলেন। মনের ভাব আদবেই গোপন করিতে পারিতেন না। এ গুণের জন্য তাঁহার সময়ে সময়ে অনিষ্ট হইত। কিন্তু তা বলিলে কি হয়, ইহা যে তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ গুণ ছিল। মনের ভাব গোপন করা যদি সভ্যতার লক্ষণ হয়, মা আমাদের অসভ্য ছিলেন। আর আমাদের প্রার্থনা এই, তাহা হইলে আমাদের আধুনিক সমাজ যেন অসভ্যই হয়। আজকার কালের ছলনা, কৃত্রিমতা, ভাণ, ছদ্মবেশ তাঁহার ত্রিসীমায়ও যাইতে পারে নাই।

৩। আমাদের মাতার আর একটী মহৎ গুণ ছিল, তিনি দ্বেষ হিংসা কি, তাহা জানিতেন না। বুঝি বা সংসারের সুখ, সৌভাগ্য পূর্ণমাত্রায় পাইয়াছিলেন বলিয়া, তাঁহার পক্ষে হিংসা করিবার কিছু ছিল না।

৪। মাতার আর একটী গুণ ছিল, তিনি সকলের সঙ্গে অতি মিষ্ট ও স্নেহপূর্ণ ব্যবহার করিতেন, আর সেরূপ ব্যবহার তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ছিল। আজকার সমাগত বন্ধু বান্ধবদিগের মধ্যে অনেকেই তার সাক্ষ্যদান করিবেন।

৫। মায়ের আর একটী মহৎ গুণ ছিল যে, তিনি ভৃত্যদের সমধিক স্নেহ করিতেন। ভাল ভৃত্য হইলে তাহাকে বেতন ছাড়া এত অর্থ ও খাদ্য দান করিতেন যে, আমরা দেখিয়া অবাক্ হইতাম। আরও, দীন দুঃখীদের অশ্রু গোপনে মোচন করিতে খুব ভালবাসিতেন। "গোপনে" এই জন্য যে পাছে কেহ নিবারণ করেন। এখানে তাঁহার বাম হস্ত জানিত না, তাঁহার দক্ষিণ হস্ত কি করিতেছে।

মা তাঁহার এইরূপ বিবিধ মহোচ্চ সদ্‌গুণে

তাঁহার পরিবারকে একটী সুখী ও আদর্শ পরিবার করিয়াছিলেন। মা, আমাদের মা বলিয়া আজ এ প্রশংসা করিতেছি না। দেশ দেশান্তরের শত শত লোককে বলিতে শুনিয়াছি যে, মায়ের পরিবার একটী সুখী আদর্শ পরিবার। এ ফল আনয়নে বাবা বিশেষ সহায়তা করিয়াছেন বটে, কিন্তু মাই প্রধান কারণ।

আজ আমরা এরূপ চির-আনন্দময়ী, চির-ভাগ্যবতী, মহোচ্চ-গুণগ্রাম-সম্পন্না মাকে হারাইয়া মাতৃহীনা। মাগো তুমি কোথায় গেলে! একবার এস মা; দেখে যাও মা, তোমার সাধের সংসার আজ কিরূপ শশ্মানে পরিণত হয়েছে; তোমার সাজান বাগানে কি চিতানল জ্বলিতেছে। দেখে যাও তোমার চির-আনন্দপূর্ণ পরিবার কি গভীর বিষাদের ঘন অন্ধকারে নিমজ্জিত হইয়াছে!! দেখে যাও, মা, একবার আজ, যাঁর ধৈর্য্য অচল অটল পর্ব্বতের সমান, সেই বাবা আমার কিরূপ অধীর হইয়া চোখের জল চাপিতে চেষ্টা করিতেছেন, কিন্তু পারিতেছেন না; মাগো আজ পঞ্চাশ বছর ধরে ছায়ার ন্যায় যাঁর সঙ্গের সাথী ছিলে, তাঁর হৃদয়, মন চির-শূন্য করিয়া, তাঁহাকে সকল সুখে চিরদিনের জন্য বঞ্চিত করিয়া কোথায় চলিয়া গেলে? দেখে যাও মা, তোমার পরম স্নেহের পুত্র কন্যাগণ কি নিদারুণ শোকে বিহ্বল হইয়া পড়িয়াছে। দেখে যাও মা, তোমার সাধের ডলি নিনি, বন্তা, শিশিরের বক্ষ দিবানিশি কি তপ্ত অশ্রু ধারায় ভাসিয়া যাইতেছে। মাগো আমি যে এখনও বিশ্বাস করিতে পারিতেছি না, তুমি সত্য সত্যই চিরনিদ্রায় মগ্ন হইয়াছ—বিশ্বাস করিতে পারিতেছি না, তোমার সেই অতুলন প্রেম-স্নেহপূর্ণ হৃদয় আমাদের এই নিদারুণ ব্যথায় ব্যথিত হইতেছে না? না, না, না; আমি ঐ যে যেন দেখিতেছি, তোমার ঐ ভস্মীভূত-হৃদয়-ভস্ম—ঐ কৌটাস্থিত ভস্ম মৃত্যুর পরপারেও স্পন্দিত হইতেছে—আমাদের গভীর বেদনায় ব্যথিত হইতেছে। আমি ঐ যেন শুনিতেছি, ঐ ভস্মীভূত-হৃদয়-ভস্ম আজ সতী সাধ্বীর মর্ম্মস্পর্শী স্বরে বলিতেছে 'শান্ত হও, শান্ত হও, এ বিশ্বের অলঙ্ঘ্য নিয়ম লঙ্ঘিত হইবার নয়।' মাগো, তুমি আশীর্ব্বাদ কর, তোমার ঐ স্বর্গীয় বাণীর মর্ম্ম যেন আমরা বুঝিতে পারি।

আর আজ এ বিশ্বের এক পার্শ্বে বসিয়া ভিখারিণী হইয়া কাতর স্বরে ডাকিতেছি, ব্রহ্মাণ্ডে যেখানে যত খণ্ড অস্তিত্ব আছে, যত খণ্ড শক্তি আছে—সূক্ষ্মই হও আর নরই হও, মানুষই হও, আর দেবতাই হও, পরপার বাহিরেই থাক আর অন্তরালেই থাক—যেখানে যে আছ, যদি তোমাদের একটুমাত্রও শক্তি থাকে, আমাদের এই ছিন্ন ভিন্ন শোকদগ্ধ হৃদয়ে শান্তি জল দান করিবার, তাহা হইলে, এস, এস, আজ আমাদের এ তপ্ত হৃদয়ে সেই জলের এক বিন্দু দান কর।

আর, হে সত্যের সত্য, হে পরম দেব! আমাদের মা ত তোমার অনন্ত অস্তিত্বেই লীন হইয়াছেন। মা বিশ্বজননি, আমি অবোধ, অতি অজ্ঞ, আমি সাধন জানি না, ভজন জানি না; আমি ধ্যান জানি না, আরাধনা জানি না; আমি উপাসনা জানি না, প্রার্থনা জানি না। কিন্তু এ ক্ষুদ্র হৃদয়ের দুটী ভিক্ষা আজ স্বতঃই তোমার সিংহাসন অভিমুখে উত্থিত হইতেছে। প্রথম ভিক্ষা এই যে, ইহাই যদি তোমার বিধান হয় যে, শোকের চিতানল জ্বলিবেই, তবে আমার পিতার, আমার ভাই ভগ্নীর হৃদয়ের

চিতানল তাঁহাদের হৃদয় হইতে তুলিয়া আনিয়া আমার হৃদয়ে জ্বালাইয়া দাও, সকল চিতানল আমারই হৃদয়ে জ্বলুক। তাঁদের সকল অশান্তি, সকল বিষাদ, সকল হৃদয়-ভার আমারই মস্তকে অর্পিত হউক। আমি, মা বিশ্বজননি! অম্লান বদনে, অবনত মস্তকে এ সব সহ্য করিব। কিন্তু, মা বিশ্বজননি! তাঁহাদের ঘোর কালিমাপূর্ণ মুখ আর উষ্ণ অশ্রুজল আর দেখিতে পারি না, আর যেন দেখিতে না হয়। আর আমার দ্বিতীয় ভিক্ষা এই যে, আমরা যেন চির জীবন কর্ত্তব্যপরায়ণতা সম্বন্ধে আমাদের মায়ের পদানুসরণ করিতে পারি, আমাদের মা যেমন মৃত্যু-শয্যায়, বাক্যে না হউক কার্য্যতঃ বক্ষে হস্ত রাখিয়া সত্য সাক্ষী করিয়া বলিতে পারিয়াছিলেন, "আমি প্রাণপণে কর্ত্তব্য পালন করিতে চেষ্টা করিয়াছি" ঠিক সেইরূপ, মা বিশ্বজননি! আমরাও যেন আমাদের অন্তিমকালে আমাদের বক্ষে হস্ত রাখিয়া সত্য সাক্ষী করিয়া বলিতে পারি, আমরা প্রাণপণে আমাদের কর্ত্তব্য সাধনে চেষ্টা করিয়াছি। ধন চাই না, মা বিশ্বজননি! যশ চাই না, চাই না খ্যাতি, চাই না প্রতিপত্তি, তব চরণ-তলে এই ভিক্ষা, কেবল যেন শেষের সে দিন ঐ কথাগুলি বলিতে বলিতে ইহলোক হইতে বিদায় হইতে পারি।

শ্রীহেমনলিনী মিত্র।

বিপদ-বরণ।

(১)

আমার ঘাড়ে ভূত চেপেছে, রক্ষা নাহি আর।
জল-পড়া আর ঝাড়া ফুঁয়ে নয় তা সারিবার!
বিগড়ে গেছে মগজ মাথা,
আবোল তাবোল গাইব গাথা,
গায়ে দিয়ে ছিন্ন কাঁথা ঘুরবো চারিধার।
কষ্ট যেচে হচ্ছে নিতে,
কারণ—ব্যথা হচ্ছে দিতে,
সময় সুযোগ নাই যে এখন একটু ভাবিবার।
বাংলা দেশের লোকালয়ে,
মরার মাথার খুলি লয়ে,
বাজাবো সেই খঞ্জনিটা, গাইবো অনিবার।
প্রকাশ করবো সত্য যাহা,
শুনবো না আর কারুর 'আহা',
দূর করিব বঙ্গবাসীর বিকট ব্যভিচার।
পা-চাটা সব গাধা পাজি,
বলছে যারা 'হাঁজি, হাঁজি,'
যে সব গাধা আনলো দেশে ভীষণ হাহাকার,
যারা 'সাধুত্ব' কামাগিতে,
ঢালছে ঘৃত ঘোর নিশীথে,
মাগীর দালাল হয়ে যারা হচ্ছে জমিদার;
মারবো তাদের গাঁপায় লাথি,
ভাঙবো তাদের বুকের ছাতি,
মুখে পিঠে ছেঁড়া জুতা মারবো বারংবার।
দেহের চামড়া ছিঁড়ে ফেলে,
গরম ঘি-টা দিব ঢেলে,
ঝাঁ-টা ক'রে খেদিয়ে দিয়ে করবো সুবিচার।
আমার ঘাড়ে ভূত চেপেছে, রক্ষা নাহি আর।

(২)

সকল সতীর মর্ম্ম জ্বালা করবো অবসান।
পাপকে ঢেকে রেখে কভু চাই না পেতে মান।
ব্যভিচারের বিরুদ্ধেতে,
দাঁড়াই এবে বক্ষ পেতে,
হিমালয়ের চূড়ার মত পাপ যে দণ্ডমান!
পাপের এত স্পর্দ্ধা দেখে,
রাখতে নারি নয়ন ঢেকে,

মাথা তাদের ফেলবো ভেঙে, আছেন ভগবান্।
পুণ্য র'বে ক্ষুণ্ণ হয়ে,
এ যাতনা থাক্‌বো সয়ে ?
ইহার চেয়ে মরণ ভালো, ঘুচবে অপমান।
এই তো সেদিন হলো বিয়ে,
হয়নি ত্রিংশ কন্যা নিয়ে,
উচিত কথা বলতে কেন করবো নানা ভাণ ?
আসুক্ নানান অত্যাচার,
কষ্ট গভীর যন্ত্রণার,
বজ্র রবে গেয়ে যাব পাপ-দমনের গান।
লড়াই করতে পাপের সাথে,
মানুষ যারা তারাই মাতে,
মরণ তারা বরণ করে এম্‌নি তাদের প্রাণ।
কুকুর শিয়াল নিজের বাটী,
পড়ে থাকুক্ কাম্‌ড়ে মাটি,
পাপের প্রতি থাকুক্ তাদের গভীর প্রেমের টান।
আমি যুবক খাইনা সুরা,
শিশ্ন সেবায় হইনি বুড়া,
শক্ত শরীর, রক্ত গরম, পুণ্য করি পান।
সকল সতীর মর্ম্মজ্বালার করবো অবসান॥

(৩)

আমার দুঃখে কাঁদুক্ সবাই, ভাঙুক্ সবার মন।
তাদের প্রবোধ শোনার আমার নাইকো প্রয়োজন।
কন্যাদায়ের ভীষণ ভয়ে,
থাকুন তাঁরা জুজু হয়ে,
থানাবাড়ীর প্রজার মত হুজুর হুজুর ক'ন্।
অবাধ্য এক কবি আমি,
ধ্বংসের পথে যাব নামি',
ব্যভিচারের বিরুদ্ধেতে করবো মহারণ।
সতীর চোখের অশ্রুবারি,
দেখি যদি মুছতে পারি,
ইহাই আমার এই জীবনের ধনুক-ভাঙা পণ
পাপের পথে টেনে নিয়ে,
স্বার্থ লোভে নারী দিয়ে,
তুষ্ট করি' লুট্‌ছে কাঙাল সাধুর টাকা ধন।
ভুগবে তারা ভীষণ জ্বালা,
গলায় দিব জুতার মালা,
তাহার পরে করবো তাদের বক্ষ বিদারণ।
তাদের তপ্ত রক্ত পিয়ে,
সতীর কাছে ছুটে গিয়ে,
মনের সুখে করবো পূজা তাঁদের শ্রীচরণ।
দেশের কত সাধ্বী নারী,
কাঁদছে সদা দেখ্‌তে নারি,
সতীর পূজা বাহাল রাখার করবো আয়োজন।
করুক সমাজ ত্যাজ্য ছেলে,
দিউক সবাই পায়ে ঠেলে,
শ্মশান মশান না হয় সদা করবো বিচরণ।
আমার দুখে কাঁদুক সবাই, ভাঙুক্ সবার মন॥

(৪)

সহ্য করে ছিলাম আর তো সহ্য নাহি হয়!
ছাই-চাপা এই মনের আগুন আর কি ঢাকা রয়!
সাধ্বী সতী দেবীর দুখে,
আগুন সদা জ্বলছে বুকে,
দেশের অধঃপতন দেখে হৃদয় বিস্ময়!
প্রাণের জ্বালায় জ্বলে আমি,
কাঁদতে ছিলাম দিবসযামি,
ঘরের কোণে পথে পথে সহর-পল্লীময়।
কারুর সাথে কইনি কথা,
বাড়তো কেবল আকুলতা,
তেজস্বী এই প্রাণটা এখন আর করে না ভয়।
হাটের মাঝে ভাঙবো হাঁড়ি,
ভাঙবো পাপের বাড়াবাড়ি,
পাপ বড় কি পুণ্য বড় দেখবো মহাশয়!
রুদ্ধ তোমার নির্য্যাতন,
পিষ্ট কুরো হৃদয় মন,

আগুন তবে ছাইবে ভুবন সত্যি সুনিশ্চয়।
একে একে বলবো সবি,
আঁকবো পাপের নিখুঁত ছবি,
চিরদিনের জন্য খাঁটি পুণ্যের হবে জয়।
দুর্গতি সব আছে জানা,
শুনবো না আর কারুর মানা,
জাতির জীবন করতে শোভন করবো
আয়ু ক্ষয়।
পাপীর রোষাগ্নিতে পড়ি',
উঠবো খাঁটি সোণা গড়ি',
বক্ষ পেতে সইবো তাদের দুঃখ সমুদয়!
সহ্য করে ছিলাম আর তো সহ্য নাহি হয়!!

(৫)

বাল্যাবধি সইছি জ্বালা সইবো চিরকাল।
দুঃখ আমার বক্ষ চষুক, ভাঙুক শত ফাল।
দুঃখ আমার মাতা পিতা,
দুঃখ আমার বন্ধু মিতা,
দুঃখ আমার পুণ্য গীতা, জীবন-তরীর পাল।
দুঃখ আমার পোড়া প্রাণে,
পুণ্য প্রভা নিত্য আনে,
ধর্ম্ম পথে রাখছে টেনে, পূজ্‌ছি মহাকাল।
জমাট দুখের বিরাট মুখে,
সাহস এল শক্ত বুকে,
নির্ভয়ে তাই হাটের মাঝে বাজাই করতাল।
আবার একা আপন মনে,
করছি সাধন নিরজনে,
নয়ন জলের গঙ্গাজলে ধোয়াই দুটী গাল।
দুঃখ প্রাণে শান্তি ঢালে,
আঁধারে মোর আলো জ্বালে,
দুঃখ-শিখার উজল আলোয় জীবন লালে লাল।
সুখ সুবিধার নাইরে আশা,
চাই না বাড়ী চাই না বাসা,
পুণ্যপথে চলবো খাসা, পরবো বাঘের ছাল।
গাছের ফলে নদীর জলে,
কাটবে জীবন কুতূহলে,
চাই না খামার, জমি জমা, লাঙ্গল, গোরু, হাল।
পাপের পূজা অহোরাত্র,
দেখতে আমার জ্বলে গাত্র,
তাই তো বিকট ব্যভিচারের করবো
নাজেহাল।
বাল্যাবধি সইছি জ্বালা সইবো চিরকাল!!

শ্রীযতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য।

সঙ্কলিকা

(৬৭)

ভাবিতেছিলাম, ভারতের দুর্দ্দিনে সাহিত্যিকগণের কর্ত্তব্য কি? রাউলাট-বিল যখন আইনে পরিণত হইল এবং সত্যাগ্রহ উপলক্ষে মহাত্মা গান্ধিপ্রমুখ-ব্যক্তিগণ যখন পুলিসের অত্যাচারে নিষ্পেষিত হইতে চলিলেন, তখন আমাদের কর্ত্তব্য কি? বেঙ্গলী ও বেঙ্গলীর চেলা সঞ্জীবনী বলেন, সত্যাগ্রহ অনেকে গ্রহণ করেন নাই! কি অদ্ভুত সিদ্ধান্ত! গান্ধির অন্তরীণ-রূপ নিষ্পেষণে যখন সমস্ত ভারত ক্ষেপিয়া উঠিয়াছে, তখন সত্যাগ্রহ অধিকাংশ লোকের মজ্জাগত হইয়া গিয়াছে,—কাগজে স্বাক্ষর করুন বা না করুন, অনেকেরই রক্তমাংসে সত্যাগ্রহ বিজড়িত হইয়া গিয়াছে; একথা রাউলাট বিলের নির্লজ্জ প্রবর্ত্তকগণ কেবল অস্বীকার করিতে পারেন; ডেলী-নিউজ বলেন—.

"Politics is an exotic. Religion

is of the soil. "Satyagraha" embodies both. And hence its popularity with the masses. And when it is administered by one, who, on account of his high character, has been raised in popular estimation to the rank of a "Mahatma," its potency is great indeed. This explains Mr. Gandhi's power and influence over the masses—the illiterate men in the alleys and by-ways of Indian life—who never cared for politics and much less for the Bills of Rowlatt fame. He was coming to Delhi and arrested, in that, Delhi was to him forbidden ground. A Bombay telegram tries to make out that he was not "arrested" but sent back against his will. What is an arrest? He did not protest but sent a message to his followers not to give way to brute passion and break the law. The news of his "arrest', acted as a magic." (12th April, 1919.)

যে মধ্যপন্থী দলের লোক রাউলাট-কমিশন্-মন্তব্যে স্বাক্ষর করিয়াছিলেন, সেই দলের ভাগ্যে উপাধি, সম্মানিত পদ এবং সরকারী সম্মান প্রসন্ন হইতে পারে, কিন্তু দেশ সে দলকে চিনিয়াছে। আর কেন, নীরবে গহন বনে তাঁহারা প্রবেশ করুন, আর ঢলাঢলিতে প্রয়োজন নাই।

বড়ই শুভদিন আসিয়াছে, হিন্দু-মুসলমান, মাড়োয়ারী-বাঙ্গালী, পার্শী এবং মাহারাট্টি আজ একাত্মক; কিন্তু নিষ্পেষণও আসিয়াছে। ডেলি-নিউজের সুযোগ্য সম্পাদক, লাট পরিবর্ত্তনের জন্য মন্তব্য লিখিয়াছেন—যথা "That implies, of course, a change of Viceroy, and methods of Government and that is the only way, and this we understood was practically conceded." (See Indian Daily News of 11th April, 1919, Page 4) কিন্তু তাহা হইবে কি? ঘুমন্ত জাতিকে জাগাইবার জন্য যে বিধান মহাত্মা গান্ধির ভিতর দিয়া প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার পরিণাম, নিষ্পেষণ এবং নির্য্যাতন! অন্যদিকে "বলসিভিজম" পৃথিবীকে গ্রাস করিবার জন্য শনৈঃ শনৈঃ অগ্রসর হইতেছে! আভিজাত্য এবং ধন-গৌরবকে খর্ব্ব করিতে এক মহাশক্তি জগতে আবির্ভূত হইয়াছে। জগতের পরিণাম কি, কেহই ভাবিতে পারিতেছেন বলিয়া মনে হইতেছে না। শান্তি-বৈঠকে যে নির্দ্ধারণই হউক না কেন, "বলসিভিজমের" প্রবল পরাক্রম তাহাতে প্রশমিত হইবে বলিয়া মনে হইতেছে না। এই বলসিভিজমের পরিণামও নিষ্পেষণ এবং নির্য্যাতন। আমাদের ত সবই গিয়াছে, আছে কি? প্রেস গিয়াছে, সংবাদ পত্র গিয়াছে, পুস্তক গিয়াছে, মান গিয়াছে, সম্মান গিয়াছে, কত সোণার লোক গিয়াছে, পশ্চাতে পশ্চাতে পুলিস ঘুরিতেছে!! কখন কাহার আরো কি হয়, কেহ জানে না। দেহপাত হইলেই বুঝি বা সব শেষ হয়। এ হেন দুর্দ্দিনে আর কলম-পেশা ভাল কি মন্দ, বুঝিতেছি না। এক এক বার মনে হয়, সাহিত্য-সেবকগণের গহন বনে গমনই সঙ্গত। কিন্তু আবার কে যেন ইঙ্গিত করেন, তাহা হইলে দেশের উপায় কি হইবে? যাহা হইয়াছে, সাহিত্য-সেবকগণের চেষ্টাতেই হইয়াছে, তাঁহারা "নিবৃত্ত-ব্রত" গ্রহণ করিলে দেশের উপায় কি! যে দেশে সহায় নাই, সহানুভূতি নাই, সে দেশে

কালীর অঙ্কনে কি ফল ফলিবে? কে যেন অন্তর কাঁপাইয়া বলেন, ফল হউক বা না হউক—কর্ত্তব্য পালন করিয়া যাও, রক্ত ঢালিয়া দেশের সেবা করিয়া যাও। সম্মান, পদ, উপাধি, ভালবাসা, গৌরব, অর্থ-সাহায্য, সহানুভূতি, সব নিরপেক্ষ হইয়া কেবল কর্ত্তব্য পালন করিয়া যাও। নির্য্যাতন, অত্যাচার, গালাগালি, নিন্দা, অসম্মান, যাহা ভাগ্যে থাকে, আসিতে দেও—দেহপাত করিয়াও দেশোন্নতির কর্ত্তব্য পালন কর। অতএব মাভৈঃ মাভৈঃ।

(৬৮)

কিন্তু ভয় বিভীষিকা চতুর্দ্দিকে—কতদিন কে টিকিয়া থাকিতে পারিবেন, জানি না। বেনামী পত্র, মিথ্যা কথা মস্তকে বহিয়া চতুর্দ্দিকে ঘুরিতেছে, নির্দ্দোষীকে দোষী করিতে, নিরাশ্রয়কে নিগৃহীত করিতে, বেনামী-পত্র চতুর্দ্দিকে ঘুরিতেছে। বিষকুম্ভ পয়ঃমুখ কাপুরুষ জন-সঙ্ঘ বাহাদুরী করিয়া ফিরিতেছেন, অন্যের মিথ্যা কুৎসা শুনিবার জন্য সকলে লালায়িত, সি-আই-ডি মহা সুযোগ পাইয়াছেন!! এই হতভাগ্য বাঙ্গালীর পরিণাম কি! ভারতের সর্ব্বত্র বাঙ্গালীর হতাদর বাড়িতেছে, বাঙ্গালী কোণঠাসা হইয়া পড়িতেছেন। সুরেন্দ্রনাথ খুব ঢলাঢলি করিলেন। তাঁহার জীবনে যেন সত্য হইল,—"মজালি কনক লঙ্কা, মজিলি আপনি।" সময় সময় মনে হয়, আমরা যদি বাঙ্গালী না হইতাম, তবে বুঝি ভাল হইত! বাঙ্গালী বাঙ্গালীর আদর করে না, বাঙ্গালী বাঙ্গালীর নিষ্পেষণে লালায়িত, বাঙ্গালী বাঙ্গালীর তিরোধানে উল্লসিত, বাঙ্গালী বাঙ্গালীর হতমানে আনন্দিত! বাঙ্গালী বাঙ্গালীর নিন্দা ঘোষণায় ব্যাপৃত, এ দুঃখ আর রাখিবার ঠাঁই নাই! দেশের উন্নতির উজ্জ্বল আলোক-বর্ত্তিকা লইয়া রামমোহনের যে ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত, সেও আজ "গোয়েবুল্লা" বেশ ধরিয়াছে, এবং স্বাধীনতার পরিবর্ত্তে খোসামুদীর ইষ্টকে উন্নতির সোপান গাঁথিতেছে! এহেন দুর্দ্দিনে, কি কর্ত্তব্য? ধীর এবং স্থির ভাবে এক একবার চিন্তা করা উচিত নয় কি?

(৬৯)

মহামতি তিলকের মোকদ্দমা গিয়াছে, তাঁহাকে ৫ লক্ষ টাকার খেসারত দিতে হইবে, কিন্তু এ পর্য্যন্ত কেবল ৭৮৲ সহস্র টাকা উঠিয়াছে। এমনই সহানুভূতির অভাব! আমাদের মনে হয়, আদালতে সম্মান অন্বেষণ করিতে না গেলেই তিলক ভাল করিতেন। তাহার কারণ এই, আজীবন দেশ-সেবা করিয়াও কি দেশের অবস্থা তিনি বুঝিতে পারিলেন না? বুঝিতে পারিলেন না কি, "বুরোক্রেসি" কোন্ শনির দশা আক্রমণ করিয়াছে! "ঘুটে পোড়ে, গোবর হাসে" যে দেশের প্রচলিত প্রবাদ, এবং "বল যার রাজ্য তার" যে দেশের চিরন্তন প্রবাদ, সেই দুই দেশকে তিলকের ভাল করিয়া জানা উচিত ছিল। তিলকের ভ্রমের জন্য আমরা বড়ই ম্রিয়মাণ হইয়াছি—এত টাকা দেশসেবায় নিয়োজিত হইলে কত কাজ হইত! হায় রে হায়!

(৭০)

আর কদিন পরেই (৬ই ও ৭ই বৈশাখ ১৩২৬) শনিবার, রবিবার হাবড়ায় সাহিত্য-সম্মিলনীর দ্বাদশ বার্ষিক অধিবেশন বসিবে। কিন্তু এ সম্বন্ধে হাবড়ার পত্রিকা 'আলোচনা'র ফাল্গুন বা চৈত্র সংখ্যায় কোন সংবাদই নাই! ইহার কারণ কি? দুর্গাদাস বাবু কি আলোচনাকেও হাত করিতে পারিলেন না?

সাহিত্য-সেবার বাজারেও "বুরোক্রেসি"কে আহ্বান করিয়া কি সকলের শ্রদ্ধা হারাইতেছেন না? ঘোষিত হইয়াছে, শ্রীযুক্ত আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহোদয় সভাপতি হইবেন। সেবার বাঁকীপুরেও তিনি সভাপতি হইয়াছিলেন না? আর কি এদেশে ভাষাভিজ্ঞ লোক নাই? সাহিত্যের বাজারে খোসামুদী অবাধ-আধিপত্য লাভ করিতেছে, দেখিয়া, আমরা মর্ম্মাহত হইতেছি। এইরূপ ভুল সাহিত্য পরিষদ করিতেছেন, এইরূপ ভুল মণিলাল-কোম্পানী করিতেছেন, এইরূপ ভুল সাহিত্য-সম্মিলনও করিতেছেন! দেখিতেছি, চতুর্দ্দিকে আভিজাত্য এবং খোসামুদীরই রাজত্ব বিস্তৃত হইতেছে! যদি আর উপযুক্ত ব্যক্তি দেশে না থাকে, তবে আশুতোষকে স্থায়ী সভাপতি করা হউক না কেন? তবেই ত সব গোল চুকিয়া যায়!!

(৭১)

স্বাস্থ্য সম্বন্ধে কলিকাতার অবস্থা বড়ই শোচনীয়। ওলাউঠা, বসন্ত, প্লেগ ও ইনফ্লুয়েঞ্জা সহরকে তোলপাড় করিতেছে। বসুমতীর মহামতি উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় গিয়াছেন, দেশের অকৃত্রিম বন্ধু রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী গিয়াছেন, সাহিত্যিক বিষ্ণুচরণ চট্টোপাধ্যায় গিয়াছেন!! চতুর্দ্দিকে হাহাকার! কাহার কথা বাদ দিয়া কাহার কথা লিখিব? দেশের ও সাহিত্যের বাজারের উপর দিয়া শোকের করাল ছায়াপাত হইয়া যাইতেছে! কার কবে পালা আসিবে, জানি না। আমরা প্রস্তুত হইয়া অপেক্ষা করিতেছি! কবে সি-আই-ডি বা কবে যম ধরিবেন, কিছুরই নিশ্চয়তা নাই। বিধাতার মহা ইচ্ছাই পূর্ণ হউক।

(৭২)

১৩২৫ সাল শোকের দারুণ কষাঘাত দিয়াই চলিয়া যাইতেছে, কিন্তু রাখিয়া যাইতেছে—নবজাগরণ। ভারতবর্ষ রাউলাট-আইনের ভয়ে জাগিয়া উঠিয়াছে। হিন্দু-মুসলমানের এমন সংযোগ আর কখনও এদেশে দেখা যায় নাই। বিধাতার নিকট প্রার্থনা করি, নির্য্যাতনের ভিতর দিয়া "মঙ্গল" এদেশে আবির্ভূত হউক। জয় মা জগজ্জননীর জয়।

(৭৩)

শঙ্কর মঠ এ দেশের আধুনিক যুগের এক অক্ষয় কীর্ত্তি। উৎকলে ও ভারতের অন্যান্য স্থানে এরূপ কীর্ত্তি অনেক আছে, কিন্তু বঙ্গে ইহা নূতন। আলোচনা লিখিয়াছেন, "বি-এন্ রেলের সাঁতরাগাছি ষ্টেসনের নিকট সম্প্রতি শঙ্করমঠ নামে একটা বৃহৎ মঠ স্থাপিত হইয়াছে। সাঁতরাগাছি-নিবাসী শ্রীচরণ দাস শেঠের পুত্র বদান্যবর শ্রীযুক্ত মন্মথ নাথ শেঠ মহাশয় প্রায় দুই লক্ষ মুদ্রা ব্যয়ে এই মঠ স্থাপন করিয়াছেন। অনেক আতুর অনাথ, অনেক সন্ন্যাসী এই মঠে আশ্রয় লাভ করিতে পারিবে। বিলাস-ব্যসন-প্লাবিত, স্বার্থ-বিষজর্জ্জরিত বঙ্গদেশে আজও যে এইরূপ লোকহিতকর অনুষ্ঠান হইতেছে, আজও যে পরদুঃখকাতর ধর্ম্মপ্রাণ মহাত্মা স্থানে স্থানে বিরাজ করিয়া দরিদ্রের তপ্তাশ্রু মোচনের জন্য অকাতরে অর্থদান করিতেছেন, তাহা মনে করিলে বাস্তবিকই হৃদয় আনন্দে অধীর হইয়া উঠে। অর্থ অনেকেরই আছে, কিন্তু কয়জন সেই অর্থের সদ্ব্যয় করিয়া থাকেন? জীবমাত্রেই আত্মসুখে রত, কিন্তু যে মানব আত্মসুখের সীমা ছাড়াইয়া পরের সুখ-দুঃখের কথা ভাবিতে শিখিয়াছে, মানব-সমাজে তাহার স্থান অতি উচ্চে, আর যে ধনী বিলাসিতার জন্য অর্থব্যয় না করিয়া সৎকার্য্যে

তাহা নিয়োজিত করেন, তিনিই ভূতলে অতুল কীর্ত্তি রাখিয়া যাইতে পারেন। তাই কবিবর হেমচন্দ্র বলিয়া গিয়াছেন,—

"সাধিতে জগৎ-হিত ধনীর সৃজন,
বিধাতা তাদের হস্তে দিয়াছেন ধন,
জগতের শুভমঙ্গল করিয়া মনন,
এ কথা যে বুঝে মর্ত্ত্যে দেবতা সে জন।
* * * *
বিধাতার বরপুত্র ধনী এ ধরাতে,
স্বর্গ নরকের দ্বার তাহাদের হাতে।"

মন্মথবাবুর কীর্ত্তি অতুলনীয়। শুধু "শঙ্কর মঠ" নয়, আশ্রয়হীনের আশ্রয় দানেও তিনি মুক্তহস্ত, অভাব অভিযোগে দান করিয়া আরও কত মহৎ কীর্ত্তি করিয়া তিনি যে স্বর্গের দ্বার উদ্ঘাটন করিতেছেন, তাহার তুলনা নাই। ভগবান এই পরোপকার-পরায়ণ, দরিদ্রের বন্ধু, ধর্ম্মপ্রাণ যুবককে দীর্ঘ-জীবী করুন—ইহাই প্রার্থনা।"

প্রাপ্তগ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

২৭। ব্রাহ্মধর্ম্মের লক্ষণ। (মাঘোৎসবে বিতরণার্থ) শ্রীক্ষিতেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত, মূল্য ৵৹। গ্রন্থকার বলেন—"ঈশ্বরে প্রীতি সমাজ মন্দিরের চূড়া। প্রীতির ছাদ না থাকিলে সে গৃহ বসবাসের যোগ্য নয়।" ইহা খুব সত্য কথা। লেখা বড়ই সুমিষ্ট।

২৮। সাহিত্য-চন্দ্রিকা। শ্রীউমাচরণ দাস প্রণীত, মূল্য ৷৹। স্কুলপাঠ্য পুস্তক। বহু প্রশংসা-পত্র-সম্বলিত। স্কুলপাঠ্য পুস্তকের অভাবে বিশ্বামিত্র প্রভৃতি প্রবন্ধে যে কি শিক্ষা পাওয়া যায়, বুঝি না। আমরা প্রশংসা করিবার বিশেষ কিছুই পাইলাম না। তবে প্রশংসা ও খোসামুদীর জোরে পাঠ্য-লিষ্ট ভুক্ত হইবে, বিচিত্র নয়।

২৯। রাজকীর্ত্তি ও রাজভক্তি। শ্রীরাখালদাস অধিকারী কবিরত্ন কর্ত্তৃক বিরচিত, মূল্য ৵৹। এত পা-চাটাচাটিতে মনুষ্যত্ব বিনষ্ট হয়, অধিক আর কি লিখিব। ইহাও রাজভক্তির জোরে পাঠ্য লিষ্ট-ভুক্ত হইবে, মনে হয়।

৩০। প্রতীচ্য সমুৎপদ। Cause of Existence. বিষয়টী ভাল, কিন্তু সব কথা ভাল রকম বুঝিলাম না। বড়ই অস্পষ্ট লেখা।

৩১। গীতিকা। শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ গঙ্গোপাধ্যায় প্রণীত, মূল্য ॥৹। বিশেষত্ব-বর্জ্জিত কবিতাগুচ্ছ। গ্রন্থকারের যে ক্ষমতা আছে, তাহার আরো অনুশীলন করিতে হইবে। কালে ভাল লেখা ফুটিতে পারে।

৩২। প্রতিষ্ঠা। শ্রীবিপিনবিহারী নন্দী প্রণীত, মূল্য ১৲। বিপিনবিহারী একজন সুবিখ্যাত গ্রন্থকার। তাঁহার রচিত সপ্তকাণ্ড রাজস্থান অতি উপাদেয় গ্রন্থ। এই পুস্তক-খানি নাটকাকারে কবিতায় লিখিত। ইহাতে গ্রন্থকারের অসাধারণ ক্ষমতার পরিচয় পাইয়া যারপর নাই সুখী হইলাম। ক্রমেই লেখা সরস এবং মনোজ্ঞ হইতেছে। বিধাতার অজস্র কৃপা বর্ষিত হউক।

কাগজ অগ্নিমূল্যে বিক্রীত হইতেছে। এজন্য সাহিত্যের বাজার বড়ই মন্দা। বাঙ্গালা সাহিত্য ঘোর বিপাকের মধ্য দিয়া চলিয়াছে। এহেন দুর্দ্দিনেও যাঁহারা সাহিত্য-সেবা করিতেছেন, তাঁহারা আমাদের প্রণম্য, কেননা, জাতীয় সাহিত্যের উন্নতি ভিন্ন দেশের উন্নতির আশা সুদূরপরাহত।